কাল,
তুমি
আলেয়া

কাল, তুমি আলেয়া

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬৩

সপ্তম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৮৪

—ত্রিশ টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ—কুইক প্রিন্টিং সার্ভিস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৩৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাদের প্রকাশিত

এই লেখকের অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ

পায়ে পায়ে প্রতিধ্বনি   সাত পাকে বাঁধা   সারী তুমি কার   নগরপারে রূপনগর

[illegible]রূপে দেখা   চলাচল   অলকাতিলকা   পঞ্চতপা   শিলা পটে লেখা   স্বয়ংবৃতা

নবনায়িকা   কারণে-অকারণে   মালবী   মালঞ্চ   রাখির ডাক

আবার কর্ণফুলী আবার সমুদ্র

কাল, তুমি আলেয়া

লোহার বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে বসে অলস কৌতুকে ধীরাপদ যেন এক হৃদয়শূন্য কালের কাণ্ড দেখছিল। একের পর এক।

পাকস্থলীর গা-ঘুলনো অস্বস্তিটাও টের পাচ্ছে না আর।

সমান করে ছাঁটা মেহেদির বেড়ায় ঘেরা এই ছোট্ট অবসর বিনোদনের জায়গাটুকুতেও কাল তার পসরা খুলে বসেছে। কেউ দেখছে না। কিন্তু দেখেল দেখার মতই। ধীরাপদ দেখছে। আর এইটুকু দেখার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে এক ধরনের আত্ম-বিস্মৃতির তুষ্টিতে বিভোর হয়ে আছে।

সন্থ রঙ্গপট সামনের ওই খালি বেঞ্চটাই। এক ভদ্রলোক এসে বসেছে। পরনে দামী স্যুট, পায়ে চকচকে জুতো, আর হাতে ঘাস-রঙা সিগারেটের টিন সত্ত্বেও এক নজরে বাঙালী বলে চেনা যায়। চঞ্চল প্রতীক্ষা। কোটের হাতা টেনে ঘন ঘন হাত-ঘড়ি দেখছে, এক পায়ের ওপর অন্য পা তুলে নাচাচ্ছে মুহুর্মুহু, বিরক্তিতে আধ-খাওয়া সিগারেট মেহেদি বেড়ার ওপর ছুঁড়ে ফেলে একটু বাদেই আবার টিন খুলছে।

প্রতীক্ষা সার্থক যার আবির্ভাবে, তাকে দেখে ধীরাপদ প্রায় হতভম্ব। ঢ্যাঙা আধ-বয়সী একটা লোক, পরনে চেক-লুঙ্গি, গায়ে সাদার ওপর সাদা ডোরা-কাটা আধ-ময়লা পাতলা জামা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ভরা মুখের কষে পানের ছোপ। সব মিলিয়ে অশুভ মূর্তি একটি। কিন্তু তাকে দেখা মাত্র সাগ্রহে উঠে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালো স্যুট-পরা ভদ্রলোক। তারপর দুজনেই ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসল বেঞ্চিতে। ফিস ফিস কথাবার্তা। হাত-মুখ নেড়ে ভদ্রলোকই কথা কইছে বেশি। অপর জন অপেক্ষাকৃত নির্বিকার।

কথার মাঝে লোকটা নিজের পকেটে হাত দিতেই ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি সিগারেটের টিন খুলে ধরল। কিন্তু লোকটা নিরাসক্ত। সিগারেটের টিনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরালো। তারপর পরিতৃপ্তি সহকারে গোটা দুই তিন টান দিয়ে কি যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেটের টিনসুদ্ধ দু হাত মাথার ওপরে তুলে নাচ জুড়ে দিল।

দেখায় তন্ময়তায় ধীরাপদ প্রায় ঘুরে বসেছে। লুঙ্গিপরা লোকটা নিস্পৃহ-মুখে সেই নাচের মাঝখানে আবারও কি বলার সঙ্গে সঙ্গে দম-ফুরানো কলের

পুতুলের মতই নাচ থেমে গেল। ধপ করে তার পাশে বসে পড়ল আ৲ টিন খুলে সিগারেট ধরাল। কোটের পকেট থেকে একটা স্ফীতকায় প৲ বার করে গোটাকতক দশ টাকার নোট তার কোলের ওপর ছুঁড়ে ফে দিল। তারপর আর একটি কথাও না বলে শুধু একটা উগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উঠে চলে গেল।

বিড়ি ফেলে নোট কখানা গুনে পকেটে রাখল লোকটা। ধীবাপদর মনে হল গোটা সাতেক হবে। এক্ষুনি উঠে চলে যাবে বোধ হয় লোকটা—ওই যাচ্ছে। মনে মনে এবারে জোরালো রহস্যের জাল বুনবে ধীরাপদ। সম্ভব অসম্ভব অনেক রকম। সময় না কাটলে দুর্বহ বোঝার মত, কিন্তু কাটাতে জানলে পলকে কাটে। ধীরাপদ জানে।

কিন্তু শুরুতেই মেহেদি বেড়াব ওধারে একটা চেঁচামেচি শুনে বহস্যের বুননি ঢিলে হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা কবল। এতক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ দাঁড়ানোর ফলে সর্বাঙ্গের সব ক'টা স্নায়ু একসঙ্গে ঝিমঝিম করে উঠল। চোখে লালচে অন্ধকার, পায়ের নিচে ভূমিকম্প। তাডাতাড়ি বেঞ্চিতে বসে পড়ে দ্রু চোখ বুজে ফেলল। তাবপর একটুখানি সামলে নিয়ে ভয়ে ভয়ে তাকালো। সব ঠিক আছে, কিছুই ওলটপালট হয়নি। উঠে দাঁড়ানোর দরকার ছিল না। চেঁচামেচির কাবণ বসে বসেই অনুমান করা যাচ্ছে। বেড়াব ওধারে বসে নানা রকমের চাট বেচছে একটা লোক। তার সামনে দশ-বারোটি খদ্দেরের রসনা চলছে। তাদেরই কোনো একজনের সঙ্গে হিসেবের গরমিল এবং বচসা।

দিনের ছোট বেলা পড়তে না পড়তে সন্ধ্যে। বিকেলেব আলোয় কালচে ছোপ ধরেছে। এরই মধ্যে বেলা পড়ে আসছে দেখে মনে মনে খুশি। দূরে চৌরঙ্গীর প্রাসাদ-চূড়ার ঘড়িটাতে পাঁচটা বাজে। ওই ঘড়িটাকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছে ধীবাপদ। মাঝে মাঝে অচল হয়, দশ মিনিট পিছিয়ে চলে। ধীরাপদর তাতে আপত্তি নেই, এগিয়ে চললেই আপত্তি। বাড়িটাতে ঢালাও ব্যবসা ছিল ইংবেজদেব, এখন মালিকানা বদলেছে। কিন্তু ঘড়িটা এক-ভাবেই চলেছে। চলছে আর বন্ধ হচ্ছে। দেশেরও মালিকানা বদলেছে। কিন্তু ধীরাপদ এক-ভাবেই চলেছে। চলছে আর থামছে।

বদলাচ্ছে তো সব কিছুই। এই কার্জন পার্কই কি আগের মত আছে? আগের থেকে অনেক সংকীর্ণ হয়েছে, অনেক ছোট হয়ে গেছে। শোভা বেড়েছে বটে—কিন্তু অনেক ছাড়তে হয়েছে তাকে। নরম ঘাস আর নরম

মাটি খুঁড়ে খুবলে পিচ দিয়ে বাঁধানো হয়েছে প্রায় অর্ধেকটা। দেহের শিরা উপশিরার মত ঝকঝকে তকতকে আঁকা-বাঁকা অজস্র ইস্পাতের লাইন বসেছে তাব ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য রোমান্সের হাওয়াও বদলেছে এখানকার। আগে সন্ধ্যা হতে না হতে জোড়া জোড়া দয়িত-দয়িতার আবির্ভাব হত। পরস্পরের কটি-বেষ্টন করে হাঁটত নয়ত গুল্ম ঝোপের আড়ালে বা সুপরিসর মেহেদি বেড়ার নিরিবিলি পাশটিতে বসে বারো মাস বসন্তের হাওয়া গায়ে লাগাত। ধৈর্য ধরে বসে থাকলে আরো গাঢ়তর অনুরাগের আভাসও পাওয়া যেত। বসন্তের সেই সব অনুচর সহচরীরা কোথায় এখন?

বোধ হয় অন্য জায়গা বেছে নিয়েছে।

ভাবনাটা এবারে একঘেয়ে লাগছিল ধীরাপদর। পাকস্থলীর অস্বস্তিকর যাতনাটা চাড়িয়ে উঠতে চাইছে আবার। হাঁটুতে চাপ রেখে আর একটু ঝুঁকে বসল।

দেখতে দেখতে অফিস-ফেরত জনতার ভিড়ে সমস্ত এলাকা ছেয়ে গেল। সার বেঁধে চলেছে বাঙালী, অবাঙালী, শ্বেতাঙ্গিনী, শ্যামাঙ্গিনী। মুখের দিকে ভালো করে তাকালে গৃহ প্রত্যাবর্তনের তাগিদটুকু অনুভব করা যায়। সমস্ত দিনেব খাটুনিব পর এই অধিকারটুকু অর্জন করেছে তারা। এটুকু মূল্যবান। নিস্পৃহ চোখে ধীবাপদ খানিকক্ষণ ধরে এই জনতার মিছিল দেখল চেয়ে চেয়ে। কেউ ব্যস্ত-সমস্ত, কাবো গতি মন্থর। অফিসেব চাপে শুধু ওই ফিরিঙ্গী মেয়ে-গুলোরই প্রাণ-চাঞ্চল্য স্তিমিত হয়নি মনে হল। কলহাস্যে নেচে কুঁদে চলেছে তারা। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন বাঙালী মেয়ে চলেছে একটি দুটি। তাদের চলন বিপরীত। এরই মধ্যে এক-একজনের মোটামুটি বকমের সুশ্রী নারী-অঙ্গে বহুজোড়া চোখেব নীরব বিচরণ লক্ষ্য করছে। সামনেব ওই ফর্সা-মত বিবাহিতা মেয়েটিকে এক-চাপ জনতা যেন চোখে চোখে আগলে নিয়ে চলেছে। ধীরাপদ হাসছে, প্রাকৃতিক চাহিদাব কোন্‌টা না মিটলে চলে? কোন্ জ্বালাটা কম?

দিনের আলো ডুবল। চৌরঙ্গীব প্রাসাদ-চূড়ায় ঘড়িটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না আর। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলোর মেলায় চৌরঙ্গী হেসে উঠবে। একটা দুটো করে আলো জ্বলতে শুরু কবেছে। নিয়ন লাইটের বিজ্ঞাপন-তরঙ্গ শুরু হয়ে গেছে। এখনও জমজমিয়ে ওঠেনি তেমন।

বেঞ্চির একধারে সরে এলো ধীরাপদ। গুটি তিনেক হাল-ফ্যাশানের ছোকবা বাকি জায়গাটুকু দখল কবেছে। ধীরাপদ উঠেই যেত, কিন্তু তাদের রসালো আলোচনা কানে যেতে কান পাতলো। আবছা অন্ধকারে মুখ ভালো দেখা

যাচ্ছে না। বিদেশী ছবির স্তুতির উচ্ছ্বাসে কান ভরে যাচ্ছে। একজনের এই হুবার দেখা হল ছবিটা, একজনের তিনবার, আর একজনের পাঁচবার। বার বার দেখেও পুরনো হচ্ছে না। কি নাম বলছে ওরা ছবিটার! সাগ্রহে ঘুরেই বসল ধীরাপদ।

...বীটার রাইস!

বীটার রাইস! এ-রকমও হয় নাকি আবার কোনো ছবির নাম! ছবি না-ই দেখুক, নাম পছন্দ হয়েছে ধীরাপদরও। অদ্ভুত নাম।...বীটার রাইস। বাংলায় কি হবে? তেতো চাল? কটু চাল? দুর! বাংলা হয় না। বাংলা করলে স্নায়ুর ওপর শব্দ দুটো তেমন করে ঝনঝনিয়ে ওঠে না। বীটার রাইস। খাসা নাম। একবার দেখলে হত ছবিখানা। পারলে দেখবে।

কি বলে ওরা! ও হরি, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করল বুঝি ছবির নায়িকা? ছবির নায়িকাই হবে বোধ হয়। আরো খুশি হল ধীরাপদ। ওদের খেদ শুনে হাসি পায়, বীটার রাইসএর নায়িকা আত্মহত্যা করবে না তো কি। ছবিখানা দেখার আগ্রহ দ্বিগুণ বাড়ল, কিন্তু কোন্ দেশের ছবি? কারা জেনেছে বীটার রাইসএর মর্ম?

ছবির প্রসঙ্গ থেকে নায়িকার আঁটসাঁট অত্যল্প বেশ-বাস উপচে-পড়া যৌবন আর অঙ্গ-সৌষ্ঠবের দিকে ঘুরে গেল ওদের আলোচনা। এবারে দুবার তিনবার আর পাঁচবার করে দেখার তাৎপর্য বোঝা গেল। বীটার রাইসের নায়িকা মরেছে, কাহিনীর নায়িকা মরেছে—ছবির নায়িকা মরেনি। দর্শকের অতনু-মনে উর্বশীর পরমায়ু সেই নায়িকার।

হায় গো সাগর-পারের নায়িকা, তোমার ছায়া এমন, তুমি কেমন?

ধীরাপদ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। আবার না স্নায়ুগুলো ঝিমঝিম করে ওঠে। মাথাটা ঘুরছে একটু, শরীরটাও গুলিয়ে উঠছে কেমন। কিন্তু ও কিছু নয়, দু পা হাঁটলেই সেরে যাবে। হালকা লাগছে অনেক। দেহ সম্বন্ধে সচেতন হলেই যত বিড়ম্বনা। ওইটুকু খাঁচার মধ্যে মনটাকে আবদ্ধ রাখতে চাইলেই যত গোল। এত বড় দুনিয়ায় দেখার আছে কত। সেই দেখার সমারোহে নিজেকে ছেড়ে দাও, ছড়িয়ে দাও, মিশিয়ে দাও। শুধু নিজের সঙ্গে যুঝতে চেষ্টা কোরো না। তাহলেই সব বিড়ম্বনার অবসান, সব মুশকিল আসান। পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত বলতে গেলে এই দেখার আর্টটাই রপ্ত করে ধীরাপদ। রপ্ত করে জিতেছে। যেমন আজকের দিনটাও জিতল।

জেতার আনন্দে বড় বড় পা ফেলে ট্রাম ডিপো আর রাস্তা পার হয়ে চৌরঙ্গীর ফুটপাথএ এসে দাঁড়াল সে। আর সেই আনন্দেই আজকের মত ছেলে পড়ানোর কর্তব্যটাও অনায়াসে বাতিল করে দিতে পারল। ও-কর্তব্যটার প্রতি বিবেকের তাড়না নেই একটুও। নিক্তি মেপে ছাত্রের জন্যে বিদ্যা কেনেন তার অভিভাবক। মাসে তিরিশ টাকার বিদ্যে। প্রতি দিনের কামাই পিছু এক টাকা কাটান। এর বাইরে আর কোনো কৈফিয়ৎ নেই।

সন্ধ্যারাতের চৌরঙ্গী। দিনের পর দিন বছরের পর বছর দেখছে ধীরাপদ। তবু নতুন মনে হয় রোজই। কবে একদিন নাকি এই চৌরঙ্গীতে বাঘ ডাকত। ধীরাপদর হাসি পায়। আফ্রিকায় সিংহের রাজত্ব ছিল শুনলেও হয়ত দূরের বংশধরেরা হাসবে একদিন।

এ আলোয় কি এক মদির উপকরণ আছে। এখান দিয়ে হাঁটতে হালকা লাগে, নেশা ধরে। ধীরাপদ পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে আর লোকজনের আনাগোনা দেখে। এখানকার জীবন যেন এমনি আলোব প্রতিবিম্বিত মহিমা। নারী-পুরুষেরা আসছে যাচ্ছে। হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ। পুরুষের বেশ-বাসে তারতম্য নেই খুব—তকতকে, ফিটফাট। কিন্তু নারী এখানে বিচিত্ররূপিনী। তাদের বাসের ওধাবে অন্তর্বাসের কারুকার্যটুকু পর্যন্ত স্পষ্ট। চার আঙুল কবে কোমর দেখা যায় প্রায় সকল আধুনিকারই। উপকরণের মহিমায় মাঝ-বয়সী রমণীরও যৌবন উদ্ধত। রং-বাহাব রূপেব মেলা। রাতের চৌরঙ্গী আতিশয্যের পরাভব জানে না।

ধীরাপদ দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

বাস-স্টপে সেই মেয়েটা আজও দাঁড়িয়ে।

বাঁয়ে লিণ্ডসে স্ট্রীট, সামনে রাস্তা। রাস্তার ওধারে বাস-স্টপ। সেই-খানে মেয়েটা দাঁড়িয়ে। যেমন সেদিন ছিল। একের পর এক বাস আসছিল, থামছিল, চলে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনো বাসেই ওঠার তাড়া নেই মেয়েটার। নিরাসক্ত মুখে যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখছিল, পথচারীর আনাগোনা দেখছিল। ধীরাপদর প্রথম মনে হয়েছিল কারো প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রতীক্ষাই বটে, কোন্ ধরনের প্রতীক্ষা সেটাই সঠিক বুঝে ওঠেনি।

বছর কুড়ি-একুশ হবে বয়েস। ক্ষীণাঙ্গী। পরনে চোখ-তাতানো ছাপা শাড়ি আর উৎকট-লাল সিল্কের ব্লাউস। বুকের দিকে চোখ পড়লেই চোখে কেমন লাগে। কিন্তু তবু চোখ পড়েই। মুখে আব ঠোঁটের রঙে আর একটু

সুপটু সামঞ্জস্য ঘটাতে পারলে, অথবা ওই পদার্থটুকু পরিহার করলে মুখখানা প্রায় সুশ্রীই বলা যেত। সুশ্রী আর শুকনো।

মেয়েটিও দেখেছিল তাকে সেদিন। একবার নয়। একটু বাদে বাদে বার-কতক। শেষে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল মুখোমুখি। দু পা এগিয়েও এসেছিল। মাঝে রাস্তা। রাস্তা পেরোয়নি। থমকে দাঁড়িয়ে আর একবার তার আপাদ-মস্তক খুঁটিয়ে দেখেছিল। তারপর ফিরে গেছে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখানে।

ধীরাপদ দেখতে জানে। সেই দেখায় ভুল বড় হয় না। কিন্তু সারাক্ষণ ভয়ানক অন্যমনস্ক ছিল সেদিন। সোনাবউদি প্রথম বোঝাপড়া শুরু করেছিল সেই দিনই। সেটা যেমন আকস্মিক তেমনি অভিনব। সেই ভাবনার ফাঁকে সেদিন অনেক দেখাই অসম্পূর্ণ ছিল। এই মেয়েটার হাবভাবও সেদিন তলিয়ে বোঝেনি। তাও বুঝত, যদি না মুখখানা অমন শুকনো দেখাত। ধীরাপদ হতভম্ব হয়ে ভেবেছিল, মেয়েটি কি কোনো বিপদে পড়ে তাকে বলতে এসেছিল কিছু? তাহলে এসেও ও-ভাবে ফিরে গেল কেন?

সঙ্গে সঙ্গে নিজের জামা-কাপড়ের দিকে চোখ গেছে তার। ভদ্রলোক মনে হওয়া শক্ত বটে। গালেও খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তিন-চার দিন শেভ করা হয়নি। কাছাকাছি এসে এইসব লক্ষ্য করেই ফিরে গেছে হয়ত, ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি।

কিন্তু আজ? আজ তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে দিল ওই মেয়েটা কে। কোন্ প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই সাজ-পোশাক, সেই রঙ-চঙ, সেই শুকনো মুখ। বাস আসছে দাঁড়াচ্ছে চলে যাচ্ছে। যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখছে, পথচারীর আনাগোনা দেখছে। মাঝের রাস্তার এদিকে দাঁড়িয়ে ধীরাপদ হেসে উঠল নিজের মনেই। বীটার রাইস্! এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছিল ছবিটার কথা। ছবিটা দেখতে হবে। বেশ নাম।

কিন্তু মেয়েটা যে চেয়েই আছে তার দিকে। কুড়ি-একুশ বছরের অপুষ্ট মেয়ে। সর্বাঙ্গে আলগা পুষ্টিসাধনের কারুকার্য। মোহ ছড়ানোর প্রয়াস। শুধু মুখখানা শুকনো। তাজা মুখ জীবনের প্রতিবিম্ব। সেখানে টান ধরলে প্রতিবিম্ব তাজা হবে কেমন করে? বীটার রাইস-এর নায়িকা আত্মহত্যা করেছিল, আসল রমণীটি তাজা। কিন্তু এই মেয়েটা শুধু আত্মহত্যাই করেছে, ওর মধ্যে তাজা কি আছে? ওর কি প্রত্যাশা?

প্রত্যাশা আছে নিশ্চয়। এক পা দু পা করে এগিয়ে আসছে মেয়েটা। নিজের দিকে তাকালো ধীরাপদ। জামা-কাপড় পরিষ্কারই বটে আজ,

সকালের কাচা। গালেও এক-খোঁচা দাড়ি নেই। নিজেরই ভদ্রলোক ভদ্রলোক লাগছে।

আজও মাঝের রাস্তাটার ওধারে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ আর খুঁটিয়ে দেখার জন্যে নয়। গাড়ি যাচ্ছে একের পর এক। লাল আলো না জ্বলা পর্যন্ত দাঁড়াতে হবে। তারপর আসবে। আসবেই জানে। কিন্তু তারপর কি করবে? ধীরাপদর জানতে লোভ হচ্ছে। কিন্তু আর সাহসে কুলোচ্ছে না। আত্মহত্যার পরেও যারা বেঁচে থাকে তারা কেমন কে জানে।

হনহন করে লিণ্ডসে স্ট্রীট ধরেই হাঁটতে শুরু করে দিল সে। বেশ খানিকটা এসে ফিরে তাকালো একবার। লাল আলো জ্বলছে এখন। গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা এধারে চলে এসেছে। আর, ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকেই দেখছে। এক-নজর তাকিয়েই ধীরাপদর মনে হল দেখছে না, নীরবে অনুযোগ করছে যেন। প্রেতের অনুযোগ অমন খচখচিয়ে বেঁধে? ধীরাপদর বিঁধছে কেন? মুখখানা বড় শুকনো আর বড় করুণ। অপটু প্রসাধনের প্রতি ধীরাপদর বিতৃষ্ণা বাড়ল। ওই মেয়ে কোন্ মন ভোলাবে? কিন্তু নিজের মাথাব্যথা দেখে ধীরাপদ আবারও হেসেই ফেলল।

ফুটপাথের শো-কেস্ ঘেঁষে চলেছে। যা চোখে লাগে দেখে, না লাগলে পাশ কাটায়। ও-গুলো যে কেনার জন্য একবারও মনে হয় না। দেখতে বেশ লাগে।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে আবারও একটু। বড় রাস্তা ধরে হনহন করে খানিকটা হাঁটতে পারলে ঠিক হত। ওই মেয়েটাই গণ্ডগোল করে দিলে। সুন্দর বিলিতি বাজনা কানে আসছে একটা। দিশি হোক বিলিতি হোক কানে যা ভালো লাগে তাই ভালো। বাজনা অনুসরণ করে সামনের একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। মস্ত গ্রামোফোন রেডিওর দোকান। শো-কেস্-এ নানা রকমের ঝকঝকে বাদ্যযন্ত্র। ভিতরটা আলোয় আলোয় একাকার। সেই আলো ফুটপাথ পর্যন্ত এসে পড়েছে, ভিতরের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধায়।

বাজনাটা মিষ্টি লাগছে ধীরাপদর। যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতর ওপর ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়লে যেমন লাগে। ব্যথা মরে না, আরামও লাগে। বাজনাটা তেমনি করুণ অথচ মিষ্টি।

অভিজাত সঙ্গীত-রসিকের ভিড় এখানে।·· আসছে, যাচ্ছে। কেউ মোটর থেকে নেমে দোকানে ঢুকছে, কেউ বা দোকান থেকে বেরিয়ে মোটরে উঠছে। অবাঙালী মেয়ে-পুরুষের সংখ্যাই বেশি, সাহেব-মেমও আছে।

মুখ তুলে ভিতরের দিকে তাকাতেই ধীরাপদ হঠাৎ হকচকিয়ে গেল একেবারে। বিস্মিত, বিভ্রান্ত!

দোকান থেকে বেরিয়ে আসছেন একটি মহিলা। হাতে খানকতক রেকর্ড। পরনে প্লেন চাঁপা রঙের সিল্কের শাড়ি, সিল্কের ব্লাউস—গায়ের রঙ-ঘেঁষা প্রায়। যৌবন হয়ত গত। যৌবন-শ্রী অটুট।

মহিলা বেরিয়ে আসছেন। আর স্থানকাল ভুলে বেরুবার পথ আগলে প্রায় হাঁ করে চেয়ে আছে ধীরাপদ। নির্বাক, বিমূঢ়।

দরজার কাছে এসে মহিলা ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকালেন একবার। হ্যাংলার মত একটা লোককে এভাবে চেয়ে থাকতে দেখলে বিরক্ত হবারই কথা। থতমত খেয়ে ধীরাপদ সরে দাঁড়াল একটু। মহিলা পাশ কাটিয়ে গেলেন। ধীরাপদ সেই দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার চেতনা যেন সক্রিয় নয় তখনো।

দু পা গিয়েই কি ভেবে মহিলা ফিরে তাকালেন একবার। তারপর থেমে গেলেন। ধীরাপদ চেয়েই আছে। মহিলার দু চোখ আটকে গেল তার মুখের ওপর। দু-চার মুহূর্ত। তারপরেই বিষম এক ঝাঁকুনি খেলেন যেন। এক ঝলক রক্ত নামল মুখে। ফুটপাথ ছেড়ে তরতরিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে গেলেন।

ক্রীম কালারের চকচকে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। তকমা-পরা ড্রাইভার দরজা খুলে দিল। গাড়িতে উঠতে গিয়েও আবার থামলেন মহিলা। ফিরে তাকালেন।

ধীরাপদ চেয়েই আছে। তার দিকেই ঘুরে দাঁড়ালেন মহিলা। দেখলেন। বোধ হয় ভাবলেনও একটু। হাতের রেকর্ড ক'খানা পিছনের সীটে রেখে রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে গেলেন আবার। ধীরাপদর দিকেই, ধীরাপদর কাছেই। এরই মধ্যে সামলে নিয়েছেন বোঝা যায়।

ধীরাপদ···ধীরু না?

চেষ্টা করেও গলা দিয়ে একটু শব্দ বার করতে পারল না ধীরাপদ। ফ্যাসফেসে একটু হাওয়া বেরুল শুধু। ঘাড় নাড়াল।

কি আশ্চর্য! আমি তো চিনতেই পারিনি প্রথমে, তুমি এখানে! কলকাতাতেই থাকো নাকি?

ধীরাপদর বাকস্ফুরণ হল না এবারও, মাথা নাড়ল।

হাঁ করে দেখছ কি, চিনতে পেরেছ তো আমাকে?

ধীরাপদ হাসতে চেষ্টা করল। ঘাড় নেড়ে জানালো চিনেছে।

বলো তো কে?

চারুদি।

যাক্। হাসলেন। কতকাল পরে দেখা, এখানে কি করছ, রেকর্ড কিনবে নাকি? ও, বাজনা শুনছিলে বুঝি? আর শুনতে হবে না, ওদিকে দাঁড়িয়ে কথা কই এসো।

ওদিকে অর্থাৎ মোটরের দিকে। চারুদি আগে আগে রাস্তা পার হলেন। ধীরাপদ পিছনে। এমন যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এমন যোগাযোগ ঘটবে বলেই বোধ হয় দেখার এত সমারোহ আজ। কিন্তু কালের কাণ্ডর মধ্যে এ আবার কোন্ অধ্যায়? ধীরাপদ খুশি হবে কি হবে না তাও বুঝে উঠছে না। কিন্তু চারুদিকে ভালো লাগছে। আগের থেকে অনেক মোটা হয়েছে চারুদি, তবু ভালই লাগছে।

মোটর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে চারুদি বললেন, তারপর খবর বলো, আমাকে তো চিনতেই পারনি তুমি, ভাগ্যো আমি এসে জিজ্ঞাসা করলাম।

জিজ্ঞাসা করার আগে তাঁর চকিত বিড়ম্বনাটুকু ভোলেনি ধীরাপদ। বলল, আমি ঠিকই চিনেছিলাম, তুমি পালাচ্ছিলে।

তা কি করব! অপ্রস্তুত হয়েও সামলে নিলেন, ভাবলাম কে না কে, এতকাল বাদে তোমাকে দেখব কে ভেবেছে! তার ওপর চেহারাখানা যা করেছ চেনে কার সাধ্য! চোখ দেখে চিনেছি, আর কপালের ওই কাটা দাগ দেখে।

কপালের কাটা দাগের প্রসঙ্গে সম্ভবত ধীরাপদর মায়ের কথা মনে পড়ল চারুদির। মায়ের হাতের তপ্ত খুন্তির চিহ্ন ওটুকু। ছেলেবেলার দস্যিপনার ফল। পাথর ছুঁড়ে খুড়তুত ভাইয়ের মাথা ফাটালেও এমন কিছু মারাত্মক হয়নি সেটা। কিন্তু এই চারুদি না আগলালে ওকে বোধ হয় মা মেরেই ফেলত সেদিন। খুন্তির এক ঘায়েই আধমরা করেছিল। একটু হেসে চারুদি জিজ্ঞাসা করলেন, মাসিমা কোথায়? এখানে? আর শৈল? সব এখানে?

তাঁর মুখের ওপর চোখ রেখে ধীরাপদ আঙুল দিয়ে আকাশটা দেখিয়ে দিল।

আ-হা, কেউ নেই! চারুদি অপ্রস্তুত। একটু বিষণ্ণও।—কি করে আর জানব বলো, কারো সঙ্গেই তো—

থেমে প্রসঙ্গ বদলে ফেললেন, তুমি আছ কোথায়? কি করছ আজকাল? সাহিত্য করা ছেড়েছ না এখনো আছে? নাম-টাম তো দেখিনে·

একসঙ্গে একাধিক প্রশ্নের সুবিধে এই যে একটারও জবাব না দিলে

চলে। ওগুলো প্রশ্ন ঠিক নয়, এক ধরনের আবেগ বলা যেতে পারে। দ্বিধা কাটিয়ে সামনে এসে দাঁড়ানোর পর থেকেই চারুদির এই আবেগটুকু লক্ষ্য করছে ধীরাপদ। একটু হেসে জবাব এড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি যাবে কদ্দূর?

অনেক দূর। সাগ্রহে আরো একটু কাছে সরে এলেন চারুদি।—তুমি যাবে আমার সঙ্গে? চলো না, গাড়িতে গেলে কত আর দূর। চলো, আজ তোমাকে সহজে ছাড়ছি না, ড্রাইভার তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে'খন—তাড়া নেই তো কিছু?

তাড়া নেই জানাতে একেবারে হাত ধরে গাড়িতে তুললেন তাকে। নিজেও তার পাশে বসে ড্রাইভারকে হিন্দীতে বাড়ি ফেরার নির্দেশ দিলেন। এমন দামী গাড়ী দূরে থাক, মোটরেই শিগগীর চড়েছে বলে মনে পড়ে না ধীরাপদর। নরম কুশনের আরামটা প্রায় অস্বস্তিকর। নরম আদরের মত। ধীরাপদ অভ্যস্ত নয়। সেই সঙ্গে মিষ্টি গন্ধ একটু। পার্শ্ববর্তিনীর সুচারু প্রসাধনে রুচি আছে বলতে হবে। আরো বুক-ভরে নিঃশ্বাস টানতে ইচ্ছে করছিল ধীরাপদর, কিন্তু কোন্ সংকোচে লোভ দমন করল সে-ই জানে।

গাড়িতে উঠেই চারুদি হঠাৎ চুপ করেছেন একটু। বোধ হয় এই অপ্রত্যাশিত যোগাযোগের কথাই ভাবছেন। হয়ত আর কিছু ভাবছেন। ভিড় কাটিয়ে গাড়ি চৌরঙ্গীতে পড়তে সময় লাগছে। মোড়ের মাথায় আবার লাল আলো। ধীরাপদ তাড়াতাড়ি ঝুঁকে সেই বাস-স্টপের দিকে তাকালো। ওই মেয়েটা নিশ্চয় দাঁড়িয়ে আছে এখনো। কালই দেখতে হবে ছবিটা—বীটার রাইস—কোথায় হচ্ছে কে জানে। মনে মনে এখনো নামটার জুতসই একটা বাংলা হাতড়ে বেড়াচ্ছে ধীরাপদ।

···নেই। ধীরাপদ অবাকই হল একটু। সঙ্গী পেল? ওই ক্ষীণ তনু আর উগ্র প্রসাধন সত্ত্বেও! শুকনো মুখখানা অবশ্য টানে। কিন্তু সে তো অন্য জাতের টান, সঙ্গী জোটানোর নয়। ওই মেয়েটা সঙ্গী পেয়েছে ··ও নিজেও কি সঙ্গিনী পেল? চারুদির মত সঙ্গিনী! এও তো অবাক হবার মতই—

সবুজ আলো দিয়েছে। গাড়ি ডাইনে ঘুরল।

কি দেখছিলে অমন করে?

পিছনের গদিতে শরীর এলিয়ে দিল ধীরাপদ। পিঠে সেই রকমই ঈষদুষ্ণ অস্বস্তিকর নরম স্পর্শ। কিছু না—

কাউকে খুঁজছিলে মনে হয়?

না, এমনি দেখছিলাম—

চারুদি টিপ্পনী কাটলেন, আগের মত সেই ড্যাবড্যাব করে দেখে বেড়ানোর অভ্যেসটা এখনো আছে বুঝি!

চারুদি যদি জানতেন এত কাছ থেকেও একেবারে ঘুরে বসে তাঁকেই নির্নিমেষে খুঁটিয়ে দেখার ইচ্ছেটা ধীরাপদ কি ভাবে ঠেকিয়ে রেখেছে, তাহলে বোধ হয় এই ঠাট্টা করতেন না। তার অভ্যেসের খবর জানলে চারুদি হয়ত গাড়িতে টেনে তুলতেন না তাকে। গ্রামোফোন দোকানের সামনে তাকে চিনে ফেলার পর দ্বিধা আর সঙ্কোচ কাটিয়ে কাছে না এসে শেষ পর্যন্ত না চিনেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যেতেন। চারুদি আর একটু হাসলেন, আর একটু ঘুরে বসলেন, ওই মিষ্টি গন্ধটা আর একটু বেশি ছড়ালে ধীরাপদ দেখার প্রলোভন আর বেশিক্ষণ আগলে রাখতে পাববে না।···চারুদিকে আজও ভালো লেগেছে তার। চারুদি অনেক বদলেছে, তবু। অনেকটা মোটা হয়েছে, তবু। এত ভালো লেগেছে, কারণ চারুদিও এখন বিশ্লেষণ করে দেখার মতই। কিন্তু অন্যের তা বরদাস্ত হওয়া সহজ নয়। তাই ভয়ে ভয়ে সরেই বসল আর একটু, তারপর জবাব দিল, অভ্যেসটা আরো বেড়েছে।

তাই নাকি! ভালো কথা নয়। চারুদি ঘুরে বসলেন। যতটা ঘুরে বসলে ধীরাপদর মুশকিল, ততটাই।—বিয়ে করেছ?

সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পড়তে ছোট মেয়ের মতই হেসে উঠলেন। মনে পড়েছে ধীরাপদরও। অল্প হেসে মাথা নাড়ল।

ও মা, এখনো বিয়ে করোনি! বয়েস কত হল? দাঁড়াও, আমার এই চুয়াল্লিশ, আমার থেকে ন' বছরের ছোট তুমি—তোমার পঁয়ত্রিশ। এখনো বিয়ে করোনি, আর করবে কবে? আবারও বেশ জোরেই হেসে উঠলেন চারুদি। বললেন, ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে এখনো?

মৃদু হেসে ধীরাপদ পিছনের দিকে মাথাও এলিয়ে দিল এবার। উত্তর কলকাতার পথ ধরে চলেছে গাড়ি। ধীরাপদর ঘুম পাচ্ছে। মাথা টলছে না আর, গা-ও ঘুলোচ্ছে না—রাজ্যের অবসাদ শুধু। শরীরটা শুধু ঘুম চাইছে। চারুদি কখনো থামছেন একটু, কখনো অনর্গল কথা বলছেন। কখনো এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করছেন। ধীরাপদ কিছু শুনছে, কিছু শুনছে না। কখনো হাসছে, কখনো বা হাঁ-না করে সাড়া দিচ্ছে। কিন্তু ভাবছে অন্য কথা।··· চারুদির চুয়াল্লিশ হয়ে গেল এরই মধ্যে! চৌত্রিশ বললেও বে-মানান লাগত না। ওর ছেলেবেলার কথা মনে হতে চারুদি হেসে উঠেছেন। হাসিরই ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্য, চারুদির মনে আছে এখনো!

ধীরাপদ ভোলেনি। তার সেই ছেলেমানুষি সঞ্চয়ের ওপর অনেকবার অনেক দস্যুবৃত্তি হয়ে গেছে। তবু না। কালে-জলে কতই তো ধুয়ে-মুছে গেল কিন্তু এক-একটা স্মৃতির পরমায়ু বড় অদ্ভুত। চোখ বুজলেই সব যেন ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে। কত হল তার? পঁয়ত্রিশ? অথচ আর একটা বয়েস যেন সেই কবেকার পদ্মাপারের ওধারেই আটকে আছে। এক-এক সময় এমনও মনে হয়, বয়েস কি মানুষের সত্যিই বাড়ে? চারুদির বেড়েছে?

পদ্মাপারের মেয়ে চারুদি।

মোটা ছিলেন না এমন। বেতের মত দোহারা গড়ন। জলজলে ফর্সা, একমাথা লালচে চুল। সেই চারুদিকে এক-এক সময় আগুনের ফুলকির মত মনে হত ন বছরের ধীরাপদর। পাশাপাশি লাগালাগি বাড়িতে থাকত। ফাঁক পেলেই পালিয়ে এসে চারুদির গা ঘেঁষে বসে থাকত। ইচ্ছে করত ওই লাল চুলের মধ্যে নিজের দু হাত চালিয়ে দিতে। ওকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখলেই চারুদি খুব হাসতেন।

কি দেখিস তুই?

তোমাকে।

আমাকে ভালো লাগে তোর?

খুব।

এর দু বছর আগেই সে ঘোষণা করে বসে আছে বিয়ে যখন করতেই হবে একটা, চাকদিকেই বিয়ে করবে। এটা সাব্যস্ত করার পর থেকেই চারুদির ওপর যেন অধিকারও বেড়ে গিয়েছিল তার। ওর বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে চাকদি হেসে ফেলেছিলেন এইজন্যেই।

শুধু এই নয়, আরো আছে। চারুদির বিয়ের রাতে মস্ত একটা লাঠি হাতে বিয়ের পিঁড়ির বরকে সরোষে তাড়া করেছিল ধীরাপদ। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা বরদাস্ত করতে পারেনি সেদিন। ধরে না ফেললে একটা কাণ্ডই হত বোধ হয়।

বিয়ের পর চারুদি শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন। এই কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু ধীরাপদর কাছে কলকাতা তখন রূপকথার দেশ। মা আর তার নিজের দিদিমার মুখে সে চারুদির স্বামী জীবটির অনেক প্রশংসা শুনত। শুনে মনে মনে জ্বলত। মস্ত বড়লোক শ্বশুর, মস্ত বাড়ি গাড়ি—চারুদির বরও বিলেত-ফেরত ডাক্তার। অমন রূপের জোরেই নাকি অমন ঘর পেয়েছেন চারুদি। ঘর বাড়ি গাড়ির কথা জানে না, চারুদির বর লোকটাকে

দৈত্য গোছের মনে হত ধীরাপদর। যেমন কালো তেমনি থপথপে। রূপ-কথার দেশ কলকাতা থেকে সেই দৈত্য-বরকে বধ করে চারুদিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার বাসনা জাগত। নেহাত ছোট, আর তলোয়ার নেই বলেই কিছু করতে পারত না।

বছরে একবার দুবার আসতেন চারুদি। খবর পেলে তিন রাত আগের থেকেই ঘুম হত না ধীরাপদর। পেয়ারা কামরাঙা পেড়ে পেড়ে টাল করে রাখত। চারুদিকে দেবে। কিন্তু সেই চারুদি আর নেই। একবার কাছে ডাকতেন কি ডাকতেন না। অথচ সারাক্ষণ কাছে কাছেই ঘুর ঘুর করত সে। কাছে গেলে আদর অবশ্য করতেন। কিন্তু ধীরাপদর অভিমানও কম ছিল না। না ডাকলে বেশি কাছে ঘেঁষত না। লোভ হলেও না। লোভ তো হবেই। রূপকথার দেশের চারুদিকে আগের থেকে আরো ঢের ঢের সুন্দর লাগত। আগুনপানা রঙ হয়েছে প্রায়। আগুনপানা রঙ আর আগুনপানা চুল।

কিন্তু দুটো বছর না যেতে একদিন ধীরাপদ অবাক। এ বাড়িতে মা গম্ভীর, দিদি গম্ভীর। ও-বাড়িতে চারুদির মায়ের কান্নাকাটি। ক্রমে ব্যাপারটা শুনল ধীরাপদ। চারুদির স্বামী লোকটা মারা গেছে। ধীরাপদ ভাবল বেশ হয়েছে। চারুদি এলে আর তাকে কেউ নিয়ে যাবে না।

এবারে চারুদির আসার আনন্দটা শুধু যেন একা তারই। চারুদি আসছে অথচ কারো একটু আনন্দ নেই, মুখে এতটুকু হাসি নেই।

চারুদি এলেন। কিন্তু ধারে কাছে ঘেঁষার সুযোগ পেল না সে। আসার সঙ্গে সঙ্গে কান্নাকাটির ধুম পড়ে গেল আবার। ধীরাপদর মনে হত খামকা কি কান্নাই কাঁদতে পারে চারুদির মা। শুধু কি তাই। কান্নাটা যেন একটা মজার জিনিস। এ বাড়ি থেকে মা আর দিদি পর্যন্ত গিয়ে গিয়ে কেঁদে আসছে। কান্না কান্না খেলা যেন।

দু-তিন দিনের মধ্যে চারুদিকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেল না ধীরাপদ। যখনই যায় চারুদির ঘর বন্ধ। অভিমানও কম হল না। স্বামী মরেছে কিন্তু ও তো আর মরেনি! এ কেমন-ধারা ব্যবহার! ধীরাপদও দূরে দূরে থাকতে চেষ্টা করল ক'টা দিন, কিন্তু কেমন করে যেন বুঝল, হাজার অভিমান হলেও চারুদি এবারে নিজে থেকে ডাকবে না ওকে। তাই ঘর খোলা দেখে পায়ে পায়ে ঢুকেই পড়ল সেদিন।

একটু আগে দিদি ঢুকেছে। শৈলদি। তাই চারুদিকে দেখতে পাওয়ার

আশা নিয়েই এসেছিল ধীরাপদ। কিন্তু এমনটি দেখবে একবারও ভাবেনি। দেখে দু চোখে পাতা পড়ে না। মেঝেতে মুখ গোঁজ করে বসে আছেন চারুদি। পাশে দিদি বসে। দিদির চোখে জল টলমল। দুজনেই চুপচাপ। ধীরাপদ ঘরে ঢুকেছে টের পেয়েও একবার মুখ তুললেন না চারুদি। নাই তুলুক। তবু চোখ ফেরাতে পারছে না ধীরাপদ। চারুদির পরনে কোরা থান। লালচে রঙের সঙ্গে যেন মিশে গেছে। আর তার ওপর একপিঠ তেল-না-পড়া লালচে চুল। এই বেশে এমন সুন্দর দেখায় কাউকে ভাবতে পারে না। পায়ে পায়ে দিদির কাছে এসে দাঁড়াল। যেমনই হোক, একটা শোকের ব্যাপার ঘটেছে অনুভব করেই একটু সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছে হল তারও। বলল, তোমাকে এখন খু-উ-ব সুন্দর দেখাচ্ছে চারুদি।

সঙ্গে সঙ্গে দিদির হাতের ঠাস করে একটা চড় গালে পড়তে হতভম্ব। অপমানে চোখে জল এসে গেল, ছুটে পালাল সেখানে থেকে।

ভেবেছিল, স্বামী মরেছে যখন চারুদিকে আর কেউ নিতে আসবে না। স্বামী ছাড়াও যে নিতে আসার লোক আছে জানত না। চারুদি আবারও চলে গেলেন। এর পরে তাঁর বছরের নিয়মিত আসায় ছেদ পড়তে লাগল। শেষে দু-তিন বছরেও একবার আসেন কি আসেন না। বুদ্ধিতে আর একটু পাক ধরেছে ধীরাপদর। শুনেছে, চারুদির আসায় শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনো বাধা নেই। যখন খুশি আসতে পারেন। কিন্তু নিজেই ইচ্ছে করে আসেন না চারুদি।

এ ধরনের ইচ্ছা-বৈচিত্র্য দুর্বোধ্য।

ম্যাট্রিক পাস করে ধীরাপদ কলকাতায় পড়তে এলো। বোর্ডিংএ থেকে পড়া। অবিশ্বাস্য স্বাধীনতা।

কিন্তু কলকাতাকে আর রূপকথার দেশ মনে হয়নি তখন। শুধু চারুদি আছেন কলকাতায় এইটুকুই রূপকথার রোমাঞ্চের মত। ধীরাপদ প্রায়ই আসত চারুদির সঙ্গে দেখা করতে। চারুদি খুশি হতেন। আগের মতই হাসতেন। তাঁর থান পোশাক গেছে। মিহি সাদা জমির পাড়ওলা শাড়ি পরতেন। বেশ চওড়া নক্সাপেড়ে শাড়ি। হাতে বেশি না হলেও গয়না থাকতই। গলায় সরু হার আর কানে দুলও। ধীরাপদর তখন মনে হত ঠিক ওইটুকুতেই সব থেকে বেশি মানায় চারুদিকে।

চারুদি গল্প করতেন আর জোরজার করে খাওয়াতেন। আগের সম্পর্ক নিয়ে একটু আধটু ঠাট্টাও করতেন। তার কাঁচা বয়সের লেখার বাতিকটা একদিন কেমন করে যেন টের পেয়ে গেলেন তিনি। টের পাওয়ানোর চেষ্টা

অবশ্য অনেকদিন ধরেই চলছিল। এখানে আবার সময় সস্ত সস্ত সব লেখাই ধীরাপদর পকেটের সঙ্গে চলে আসত। চারুদির উৎসাহে আর আগ্রহে সে ছোটখাটো একটি লেখক হয়ে বসেছে বলেই বিশ্বাস করত।

মাঝে মাঝে এই বাড়িতে আর একজন অপরিচিতের সাক্ষাৎ পেত ধীরাপদ। সুশ্রী, সুউন্নত পুরুষ। ধীর গম্ভীর, অথচ মুখখানা সব সময়ে হাসি-হাসি। ফর্সা নয়, সুন্দর নয়, কিন্তু পুরুষের রূপ যেন তাকেই বলে। মার্জিত, অনমিত। গলার স্বরটি পর্যন্ত নিটোল ভরাট—চল্লিশের কিছু কমই হবে বয়েস। কিন্তু এরই মধ্যে কানের দু পাশের চুলে একটু একটু পাক ধরেছে—এই বয়সে ওটুকুরও ব্যক্তিত্ব কম নয়।

শুধু চারুদিকেই গল্প করতে দেখত তাঁর সঙ্গে, আর কাউকে নয়। মোটরে এক-আধদিন বেড়াতেও দেখেছে তাঁদের। একদিন তো চারুদি ওকে দেখেও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন—যেন দেখেননি। তারপর আর এক সপ্তাহ যায়নি ধীরাপদ। চারুদি চিঠি লিখতে তবে গেছে। চারুদি না বললেও ধীরাপদ জেনেছিল, তাঁর স্বামীর সব থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ভদ্রলোক।

কিন্তু এ নিয়ে মনে কোনরকম প্রশ্ন জাগেনি ধীরাপদর। সতের-আঠেরো বছর বয়েস মাত্র তখন। ছেলেদের মুক্ত বয়েস ওটা। আর ওই নিয়ে ছেলেবেলার মত ঈর্ষাও হত না। সেই হাস্যকর ছেলেবেলা আর নেই। তাছাড়া সেদিক থেকে ভদ্রলোকের তুলনায় নিজেকে এমন নাবালক মনে হত যে তাঁকে নিয়ে মাথাই ঘামাত না বড় একটা। শুধু চারুদির একটু আদর-যত্ন পেলেই খুশি। সেইটুকুর অভাব হত না।

এক বছর না যেতে সেই নতুন বয়সের গোড়াতেই আবার একটা ধাক্কা খেল ধীরাপদ। দিন দশ-বারো জ্বরে পড়ে ছিল, কিন্তু চারুদি লোক পাঠিয়ে বা চিঠি লিখে একটা খবরও নেননি। অসুখ ভালো হবার পরেও অভিমান করে কাটালো আরো দিনকতক। ধীরাপদ বলে কেউ আছে তাই যেন ভুলে গেছেন চারুদি। শেষে একদিন গিয়ে উপস্থিত হল চারুদির শ্বশুরবাড়িতে।

শুনল চারুদি নেই।

কোথায় গেছেন, কি বৃত্তান্ত কিছুই বুঝল না। বাড়ির লোকের রকম-সকম দেখে অবাক হল একটু। কেউ কখনো দুর্ব্যবহার করেননি তার সঙ্গে। এও দুর্ব্যবহার ঠিক নয়। তবু কেমন যেন।

এর পর আরো দু-তিন দিন গেছে। সেই এক জবাব। চারুদি নেই। কোথায় গেছেন কবে ফিরবেন কেউ কিছু জানে না।

ধীরাপদ হতভম্ব।

ছুটিতে বাড়ি এসে চারুদির কথা তুলতেই মা বলেন, চুপ চুপ! দিদি বলেন, চুপ চুপ!

এই চুপ চুপের অর্থ অবশ্য বুঝেছিল ধীরাপদ। চুপ করেই ছিল। কিন্তু ভিতরটা তার চুপ করে ছিল না। কলকাতায় এসেও অনর্থক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে। অন্যমনস্কের মত দু চোখ তার কি যেন খুঁজেছে। আর মনে হয়েছে, এই রূপকথার দেশে কি যেন তার হারিয়ে গেছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?

চারুদির কথায় চমক ভাঙল ধীরাপদর। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে একটা একতলা বাড়ির সামনে—ছোট লনএর ভিতরে। রাতে ঠিক ঠাওর না হলেও বাড়িটা সুন্দরই লাগল। কিন্তু সে কি সত্যাই ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? কোথায় এলো? কি বলছিলেন চারুদি এতক্ষণ?

এই বাড়ি?

এই বাড়ি। নামো।

চারুদি আগে নামলেন। পিছনে ধীরাপদ। বাবুকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে তাকে নিয়ে চারুদি ভিতরে ঢুকলেন। সামনের ঘরে আলো জ্বলছিল। দোরগোড়ায় একজন বুড়ী মত মেয়েছেলে বসে। কর্ত্রীর সাড়া পেয়ে উঠে গেল।

বোসো, এক্ষুনি আসছি।

রেকর্ড হাতে চারুদিও অন্দরে ঢুকলেন। এই অবকাশে ধীরাপদ ঘরের ভিতরটা দেখে নিল। ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো ঘর। মেঝেতে পুরু কার্পেট। নরম গদির সোফা সেট। বসলে শরীর ডুবে যায়। বসে যেন অস্বস্তি বাড়ল ধীরাপদর। ঘরের দু-কোণায় দুটো কাচের আলমারি। নানা রকম শৌখিন সংগ্রহ তাতে। উল্টোদিকের দেয়ালের বড় আলমারিটা বইএ ঠাসা। এই রকম ঘরে আর এই রকম জোরালো আলোয় নিজের মোটামুটি ফর্সা জামা-কাপড়ও বেথাপ্পা রকমের স্থূল আর মলিন ঠেকেছে ধীরাপদর চোখে।

দিনের বেলা এসো একদিন, ভালো করে বাড়ি দেখাব তোমাকে। বাগানও করেছি। ভালো ডালিয়ার চারা পেয়েছি, মস্ত ডালিয়া হবে দেখো।

চারুদি ফিরে এসেছেন। ওকে ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখতে দেখেই হয়ত খুশি হয়ে বলেছেন। বড় একটা সোফায় শরীর এলিয়ে দিলেন তিনি। কাব্য করে

বললে ধসিয়ে হয়, অলস শৈথিল্যে তনুভার সমর্পণ করলেন। ধীরাপদ দেখছে, এরই মধ্যে শাড়ি বদলে এসেছেন চারুদি। মিহি সাদা জমির ওপর টকটকে লাল ভেলভেট-পাড় শাড়ি। আটপৌরে ভাবে পরা। মুখে-চোখে জল দিয়ে এসেছেন বোঝা যায়। মুছে আসা সত্ত্বেও ভিজে ভিজে লাগছে। কপালের কাছের চুলে দুই এক ফোঁটা জল আটকে আছে মুক্তোর মত। ঘরের সাদা আলোয় ধীরাপদ লক্ষ্য করল, চুল আগের মত অত শুকনো লাল না হলেও লালচেই বটে। এই ঘরে ঠিক যেমনটি মানায় তেমনই লাগছে চারুদিকে। ভারী স্বাভাবিক।

কিন্তু কোনো কিছুরই কাছে আসতে পারছে না ধীরাপদ। বাড়ি না গাড়ি না বাগান না ডালিয়া না—এমন কি চারুদিও না। এমন হল কেন? মাথাটা কি টলছে আবার? গা ঘুলোচ্ছে? কিন্তু তাও তো এখন টের পাচ্ছে না তেমন!

তার দৃষ্টি অনুসরণ করেই বোধ হয় চারুদি বললেন, মুখ হাত ধুয়ে এলাম—ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল না দিয়ে পারিনে, মাথা গরম হয়ে যায়।

শুনে একটু খুশি হল কেন ধীরাপদ? এই একটি কথায় মাটির সঙ্গে যোগ পেল বোধ হয়। শ্যামবর্ণা বেশ স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল। পরিচারিকা বা রাঁধুনী হবে। হুকুমের প্রতীক্ষায় কর্ত্রীর দিকে তাকালো।

তোমাকে চা দেবে তো?

ধীরাপদ মাথা নেড়েছে। কিন্তু হাঁ বলছে, না না বলছে? বোধ হয় না-ই বলেছে। মাথা নাড়ার সময় খেয়াল ছিল না, মেয়েটিকে দেখছিল। পরিচারিকা হোক বা রাঁধুনী হোক, আসলে বোধ হয় প্রহরিণী হিসেবেই এই পুরুষ-শূন্য গৃহে বহাল আছে সে। একেবারে বাঙালী গৃহস্থঘরের মেয়ের মত আটপৌরে শাড়ি না পরলে পাহাড়িনী ভাবত। অনুমান মিথ্যে নয়, ইঙ্গিতে তাকে বিদায় দিয়ে চারুদি হেসে বললেন, কেমন দেখলে আমার বডিগার্ড?

ভালো। কিন্তু ওর গার্ড দরকার নেই?

চারুদি হাসলেন খুব। অত হাসবেন জানলে বলত না।

ধীরাপদর মনে হল অত হাসলে চারুদিকে ভালো দেখায় না।

চারুদি বললেন, কি মনে হয়, দরকার আছে? ধারে-কাছে ঘেঁষবে কেউ? আগে শহরের মধ্যে থাকতুম যখন দুই-একজন ঘুরঘুর করত বটে—তাদের একজনের সঙ্গে ডাব-কাটা দা নিয়ে দেখা করতে এগিয়েছিল পার্বতী। তারপর থেকে আর কেউ আসেনি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে পার্বতী-সমাচার শুনতে হল ধীরাপদকে। পাহাড়ী

পার্বতীই বটে। বছর দশেক বয়সে চারুদি শিলঙ পাহাড় থেকে কুড়িয়েছিলেন ওকে। সেই থেকে গত পনেরো বছর ধরে চারুদির কাছেই আছে। এখন এক বাংলা ছাড়া আর কিছু বড় বোঝেও না, বলতেও পারে না।

তারপর তোমার খবর বলো শুনি! পার্বতী-সংবাদ শেষ করে প্রসঙ্গান্তরে ঘুরলেন চারুদি। কিছুই তো বললে না এখনো। যাচ্ছেতাই চেহারা হয়েছে, থাকার মধ্যে শুধু চোখ দুটো আছে, সেও আগের মত অত মিষ্টি নয়, বরং ধার-ধার—কে দেখে-শোনে?

চারুদি হাসলেন। ধীরাপদও। দেখা-শোনার কথায় সোনাবউদির মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ফলে আরো বেশি হাসি পেল ধীরাপদর। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে হলেই যত বিড়ম্বনা।...বেশ তো নিজের কথা বলছিল চারুদি। এবারের বিড়ম্বনাও কাটিয়ে দিল পার্বতী ঘরে ঢুকে। জানালো, টেলিফোন এসেছে। মা যাবেন, না ফোন এখানে আনা হবে?

মা-ই গেলেন। ফিরেও এলেন একটু বাদেই। ধীরাপদ ঠিকই আশা করেছিল। কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন চারুদি ভুলে গেছেন। চারুদি শুনতে চান না, কিছু বলতে চান। বলে বলে আগের মতই হালকা হতে চান আর সহজ হতে চান। ধীরাপদর সেই রকমই মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, মনের সাধে কথা বলার মত লোক চারুদি এই সতেরো-আঠারো বছরের মধ্যে পাননি। শেষ দেখা কতকাল আগে? সতেরো-আঠারো বছরই হবে।

ফিরে এসেই চারুদি গল্প জুড়ে দিয়েছেন আবার। অসংলগ্ন, এক-তরফা। ...শহরের হাটের মধ্যে হাঁপ ধরত সর্বদা, তাই এই নিরিবিলিতে বাড়ি করেছেন। মনের মত বাড়ি করাও কি সোজা হাঙ্গামা, বিষম ধকল গেছে তাতেও। টাকা ফেললে লোকজন পাওয়া যায়, কিন্তু বিশ্বাস কাউকে করা যায় না। যতটা পেরেছেন নিজে দেখেছেন, বাকিটা পার্বতী। কেনা-কাটার জন্যে সপ্তাহে দু-তিন দিন মাত্র শহরে যান—তার বেশি নয়।

শুনতে শুনতে ধীরাপদর আবারও ঝিমুনি আসছে কেমন। গা এলাতে সাহস হয় না আর।

অমুক রেকর্ড পছন্দ, অমুক অমুক লেখকের লেখা। ধীরাপদ লেখে না কেন, বেশ তো মিষ্টি হাত ছিল লেখায়—লিখলে এতদিন নাম-ডাক হত নিশ্চয়। অমুক ফুলের চারা খুঁজছেন, নিউ মার্কেট তন্ন তন্ন করে চষেছেন—নামই শোনে নি কেউ। তবে কে একজন আনিয়ে দেবে বলেছে।...মালীটা ভালো পেয়েছেন, বাগানের যত্ন-আত্তি করে। ড্রাইভারটাও ভালো– তবে ওদের সঙ্গে

হিন্দীতে কথা কইতে হয় বলেই যত মুশকিল চারুদির। হিন্দীর প্রথম ভাগ একখানা কিনেছেনও সেইজন্য, কিন্তু ওলটানো আর হয়ে ওঠে না। এখন বিশ্বস্ত একজন বন্দুকঅলা গেট-পাহারাদার পেলেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন চারুদি।

শ্রোতার মুখের দিকে চেয়ে একটু সচেতন হলেন যেন।—ওমা, আমি তো সেই থেকে একাই বকে মরছি দেখি, তুমি তো এ পর্যন্ত সবসুদ্ধ দশটা কথাও বলোনি! কথা বলাও ছেড়েছো নাকি? শুধু দেখেই বেড়াও?

কি যে হল ধীরাপদর সে-ও জানে না। ঝিমুনি ভাবটা কেটে গেল একেবারে। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। চোখে চোখ রেখে হাসল একটু। যেন মজার কিছু বলতে যাচ্ছে। বলল, না, কথাও বলি। তবে বড় গল্পকথা। আমাকে কিছু খেতে দিতে পারো?

॥ দুই ॥

ধীরাপদর এক রাতের সুখনিদ্রার শেষ তৃপ্তিটুকু খানখান হয়ে গেল শকুনি ভট্চাযের পাঁজর-দুমড়ানো প্রভাতী কাশির শব্দে।

প্রথম ভোরে সর্বত্র স-কলরবে পাখি জাগে। এই সুলতান কুঠির প্রথম ভোরে স-কাশি শকুনি ভটচায জাগেন। বারোয়ারী কলতলায় এক বালতি জল নিয়ে বসে বিপুল বিক্রমে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে কাশেন। অন্ধকারে শুরু হয়, আলো জাগলে শেষ হয়। ধীরাপদ রোজই শোনে, শুনতে শুনতে আবার পাশ ফিরে ঘুমোয়। কিন্তু এই একটা রাত সুলতানের মতই সুলতান কুঠিতে ঘুমিয়েছিল ধীরাপদ। ঘুমের থেকেও বেশি। সুপ্তি-ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

একটানা ঠনঠন কাশির শব্দে ঘোর কেটে গেল। সেই কাশির ঘায়ে সারা রাতের সর্বাঙ্গ-জড়ানো নরম অনুভূতিটুকু মিলিয়ে যেতে লাগল। দুই চোখ বন্ধ রেখেই হাতড়ে হাতড়ে অনুভব করে নিল, গা-ডোবানো পালঙ্ক নয়—সে শয়ান ভূমি-শয্যায়। দুই চোখ বুজে বিস্মৃতির অতলে ডুবতে চেষ্টা করল আবারও। কিন্তু সাধ্য কি!

ধীরাপদ চোখ মেলে তাকালো। আবছা অন্ধকার। খুশি হল। সুলতান কুঠির বাস্তবের ওপর আলোকপাত হয়নি এখনো। এক ওই বেদম কাশি ছাড়া। সোনাবউদি বলে ঘাটের কাশি। সোনাবউদিকে নিয়ে চারুদির সামনে

দাঁড় করিয়ে দিলে কেমন হয়? মনে মনে ওই দুজনকে মুখোমুখি দেখতে চেষ্টা করে ধীরাপদ হেসে ফেলল। সোনাবউদির বয়েস বছর তিরিশ, আর চারুদির চুয়াল্লিশ। কিন্তু মেয়েদের আসল বয়েস নাকি যেমন দেখায় তেমন। সোনাবউদির বয়েস যখন যেমন মুখ খোলে তখন তেমন।

শুয়ে শুয়ে ধীরাপদ গত রাতের ব্যাপারটাই ভাবছে আর বেশ কৌতুক অনুভব করছে। সে এ-রকম একটা কাণ্ড করে বসল কেন? ও-ভাবে খেতে চাওয়ার পরে চারুদির মুখের চকিত কারুকার্য ভোলবার নয়। আগে চারুদি অনেক খাইয়েছেন, কালও যদি ও সহজভাবে বলত, চারুদি খিদে পেয়েছে, কি আছে বার করো—কিছুই মনে করার ছিল না। এতক্ষণ না বলার জন্য মৃদু তিরস্কার করে তাড়াতাড়িই খাবার ব্যবস্থা করতেন তিনি। কিন্তু তার বদলে অপ্রস্তুতের একশেষ একেবারে। স্বপ্নরাজ্য থেকে তাঁকে যেন একেবারে রূঢ় বাস্তবে টেনে এনে আছড়ে দিয়েছে ও। চারুদি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ছিলেন মুখের দিকে। এতক্ষণের মধ্যে সেই যেন প্রথম দেখলেন তাকে। তারপর ত্রস্তে উঠে গেছেন। একটি কথাও বলতে পারেননি। ক্ষুধার্তকে অতক্ষণ ধরে খাদ্যের বদলে কাব্য পরিবেশনের লজ্জাভোগ করেছেন। খাবার আসতে সময় লাগেনি খুব। পার্বতীর গম্ভীর তত্ত্বাবধানে উগ্র রকমেরই হয়েছিল খাওয়াটা। কি লাগবে পার্বতী একবারও জিজ্ঞাসা করেনি। সরাসরি দিয়ে গেছে।

চারুদির ভর-ভরতি আত্মমগ্নতার মধ্যে ও-ভাবে খেতে চেয়ে দুজনের ব্যবধানটা হঠাৎ বড় বিসদৃশ ভাবেই উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে এসেছে সে। চারুদি আর তেমন সহজ হতে পারেননি। চেষ্টা করেছেন। পারেননি। ব্যবধান থেকেই গেছে। অন্তরঙ্গ আগ্রহে চারুদি তার ঠিকানা নিয়ে রেখেছেন, বার বার করে আসতে বলেছেন, গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়েছেন—তবু। গাড়ি অবশ্য বাড়ি পর্যন্ত আনে নি ধীরাপদ। আগেই ছেড়ে দিয়েছে। সুলতান কুঠির আঙিনায় ওই গাড়ি ঢুকলে অত রাতেও বাড়িটার গোটা আবহাওয়া চকিত বিস্ময়ে নড়েচড়ে উঠত। কিন্তু এতকাল বাদে দেখা চারুদির সঙ্গে সে এমন একটা কাণ্ড করে বসল কেন? জঠরের চাহিদা তো অনেক আগেই ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। অমন খুশির মুখে এ-ভাবে অপ্রস্তুত করতে গেল কেন চারুদিকে? জেনেশুনেই করেছে। হঠাৎ রূঢ় ছন্দপতন ঘটানোর লোভটা সংবরণ করতে পারেনি কিছুতে। চারুদির কথাবার্তা হাসি-খুশি চিন্তা-ভাবনা ঘরের আবহাওয়া, এমন কি তাঁর বসার শিথিল সৌন্দর্যটুকু পর্যন্ত কি একটা প্রতিকূল ইন্ধন যুগিয়েছে। ক্ষুধার চিত্রটা ঠিক ওইভাবেই প্রকাশ না করে পারেনি।

কিন্তু হঠাৎ এমন হল কেন ?

ধীরাপদ নিজের মনেই হাসতে লাগল, সোনাবউদির বাতাস লাগল গায়ে ?

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো স্পষ্টতর। ধীরাপদ ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে উঠে বসল। আর শুতে ভালো লাগছে না। জানালা দিয়ে চুনবালি খসা দাগ-ধরা দেয়ালের ওপর ভোরের প্রথম আলোর তির্যক রেখা পড়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। এই সুলতান কুঠিরও সকালের প্রথম রূপটা মন্দ নয় যেন। দেখা বড় হয় না ধীরাপদর, বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। বুড়ো বুড়ো গাছগুলো আর ওই মজা পুকুরটাও যেন এই ভোরের আলোয় শুচিস্নান করে উঠেছে। স্নিগ্ধ নম্রতাটুকু চোখে পড়ার মতই। দুই-একজন অতিবৃদ্ধকেও সুন্দর লাগে। সকালের এই সুলতান কুঠির পরিবেশটিও তেমনি। বুড়িয়ে গেছে, কিন্তু একেবারে যতিশূন্য হয়নি।

খানিক বাদেই এই রেশটুকু আর থাকবে না। উষাবর্ণের ওপর আর একটু আলো চড়লেই সুলতান কুঠির অতি বৃদ্ধ হাড়-পাঁজর শিরা-উপশিরাগুলো গজগজিয়ে উঠবে। মানুষগুলো একে একে জেগে উঠলেই নিক্রিয় হবে সুলতান কুঠির হৃৎপিণ্ড—কুৎসিতই মনে হবে তখন। শকুনি ভটচায জেগে উঠেছেন, কিন্তু তিনি কল-পারে কাশছেন বলে এদিকটার মৌন ছন্দে ছেদ পড়েনি। পড়বে—ওই কদমতলার বেঞ্চিতে হুঁকো হাতে একাদশী শিকদার এসে বসলেই। শকুনি ভটচাযের পর তাঁর জাগার পালা। গায়ে একটা বিবর্ণ তুলোর কম্বল জড়িয়ে ওই বেঞ্চিটাতে বসে গুড়গুড় করে তামাক টানবেন আর অপেক্ষা করবেন।

অপেক্ষা করবেন খবরের কাগজের জন্যে।

তাঁর সেই সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা নিয়ে সোনাবউদি অনেক হাসাহাসি করেছে, টিকা-টিপ্পনী কেটেছে। অবশ্য শুধু ধীরাপদর কাছেই। ধীরাপদ নিজের চোখেও দেখেছে দুই-একদিন। খবরের কাগজ পড়ার জন্যে এই বয়সে আর এমন নিক্রিয় জীবনে এত আগ্রহ বড় দেখা যায় না। তামাক টানেন আর পুকুরধারের সাইকেল-রাস্তাটার দিকে চেয়ে থাকেন। কাগজওয়ালার লালরঙা সাইকেলটা চোখে পডামাত্র সাগ্রহে দুমড়ানো মেরুদণ্ড সোজা করে বসেন। জানালা দিয়ে সোনাবউদির ঘরে কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে যায় কাগজওয়ালা। হুঁকো হাতে শিকদার মশাই ঘুরে বসেন একেবারে। সামনের বন্ধ দরজার ওপর দু চোখ আটকে থাকে। আহার-রত গৃহস্বামীর মুখের দিকে যেমন করে চেয়ে থাকে ঘরের পোষা বেড়াল—তেমনি। একটু বাদে দরজা খুলে যায়। একটা ছোট ছেলে

ঝা মেরে কাগজ দিয়ে যায় তাঁকে। কাগজ নয়, উপোসী লোকের পাতে রাজভোগ দিয়ে যায় যেন। হুঁকোটা বেঞ্চির কোণে রেখে শশব্যস্তে কাগজ খোলেন শিকদার মশাই।

কিন্তু আরো অবাক কাণ্ড, এত আগ্রহের পরে কাগজখানা পড়ে উঠতে পুরো দশ মিনিটও লাগে না তাঁর। পড়লে ঘণ্টাখানেক লাগার কথা। কিন্তু তিনি পড়েন না, দেখেন। দেখা হলে কাগজখানা ভাঁজ করে পাশে রেখে দেন। ওই ঘর থেকে আবার কোনো বাচ্চা-কাচ্চা বেরিয়ে এলে দিয়ে দেবেন। ধীরে সুস্থে শিথিল হাতে তামাক সাজেন আবার। একটা বাদামী রঙের ঠোঙায় বাড়তি টিকে তামাক মজুত থাকে পাশে। ওদিকে কল-পারের কাশি-পর্ব সেরে শকুনি ভটচায ব্রাহ্ম-স্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকেন। কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে আরো খানিক ভগবানের নাম করেন। পাশাপাশি ঘরের বাসিন্দাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় তখন। অতঃপর খেলনা-বাটির মত খুব ছোট একটা এনামেলের বাটি হাতে জবাকুসুম সংকাশং স্মরণ করতে করতে কদমতলার বেঞ্চএ এসে বসেন শকুনি ভটচায।

বাটিতে গঙ্গাজল।

শিকদার মশাই তাড়াতাড়ি হুঁকো এগিয়ে দেন। গঙ্গাজলে হুঁকো শুদ্ধি করে নিয়ে তামাক খেতে খেতে শকুনি ভটচায সেদিনের খবরের কাগজের খবর-বার্তা শোনেন। দশ মিনিটে পড়া কাগজের মর্ম দু ঘণ্টা ধরে বলতে পারেন একাদশী শিকদার। কিন্তু তাঁর বলা না বলাটা শ্রোতার আগ্রহের ওপব নির্ভর করে। আলোচনা জমে উঠলে হুঁকো হাতা-হাতি হতে থাকে ঘন ঘন, নতুন করে সাজা হয় তামাক। ছোট্ট বাটিব গঙ্গাজলে হুঁকো শুদ্ধি হতে থাকে বার বার। ইতিমধ্যে শ্রোতা এবং হুঁকোর ভাগীদার আর একজন বাড়ে। কোণা-ঘরের রমণী পণ্ডিত। রোজ না হোক, প্রায়ই আসেন তিনিও। প্রায় অপরাধীর মতই গুটিগুটি এসে বেঞ্চির একেবারে কোণ ঘেঁষে বসেন। বয়েস এঁদের থেকে কিছু কমই হবে। বোবা-মুখে বসে বসে তত্ত্বকথা শোনেন, আর মাঝে মাঝে একটু-আধটু নিরীহ সংশয় অথবা নির্বোধ বিস্ময় প্রকাশ করে বসেন। আলোচনাটা তখনি জমে। শকুনি ভটচায আর শিকদার মশাইয়ের রসনা চড়তে থাকে। কারণ রমণী পণ্ডিত মানুষটা যত নিরীহ হোন, তাঁর মুখের অজ্ঞ সংশয়ের হাবভাবটুকু খুব সহজে বিলুপ্ত হয় না। ফলে অন্য দুজনের মন্তব্য আর টিপ্পনী প্রায় কটূক্তির মত শোনায়। কিন্তু অভিজ্ঞজনের শ্লেষ গায়ে বেঁধে না রমণী পণ্ডিতের। আরো বার দুই-তিন তামাক সাজার কষ্টটা তিনিই করে

যান। তিন্ন হাতে তখন হুঁকো বদল হতে থাকে আর গঙ্গাজলে শোধন হতে থাকে।

শকুনি ভটচাষের ঘরে পতিতপাবনীর অনিঃশেষ অনুগ্রহ।

সুলতান কুঠি থেকে গঙ্গা অনেক দূর। ধীরাপদর ধারণা পুণ্যও। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে পুণ্য চয়ন অথবা গঙ্গাজল সংগ্রহে বেগ পেতে হয় না একটুও। গঙ্গোদক এবং পুণ্যদানের ভাণ্ডারী শকুনি ভটচায। ত্রিসন্ধ্যাশ্রয়ী শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। পুণ্যের স্টকিস্ট হলেও হতে পারেন, কিন্তু গঙ্গাজল? ধীরাপদ বোকার মতই ভাবত আগে, অত গঙ্গাজল আসে কোথা থেকে?

ধীরাপদর অজ্ঞতা দেখে সোনাবউদি একদিন হেসে সারা।—এমন বুদ্ধি না হলে আর এই অবস্থা হবে কেন—এক-সের দুধের সঙ্গে দু সের জল মিশিয়ে তিন সের খাঁটি দুধ হয়, আর এক কমণ্ডলু গঙ্গাজলের সঙ্গে কলের জল মিশিয়ে দশ বালতি খাঁটি গঙ্গাজলও হতে পারে না?

ওই রকমই কথাবার্তা সোনাবউদির। সোজা কথা সোজা ভাবে বলে না বড়। তবু ব্যাপারটা বুঝেছে ধীরাপদ।

ভূমি-শয্যায় উঠে দাঁড়িয়ে একবাব বাইরেটা দেখে নিল। তারপর আবার বসল। একাদশী শিকদার এখনো আসেননি। বেঞ্চিটা খালি। শীতেব সকাল আর একটু উষ্ণ না হলে হাড়ে কুলোয় না বোধ হয়। আজ এত ভোরে উঠেই পড়েছে যখন তাঁর মুখখানা একবার দেখার ইচ্ছে আছে ধীরাপদর। ফলে আজ আহার না জোটে না-ই জুটুক।

ভদ্রলোকের নাম একাদশী নয়, শকুনি ভটচাযের নামও শকুনি নয়। এক দঙ্গল ফাজিল ছেলের আবিষ্কার এই নাম দুটো। ওই নামে তাঁদের কাছে ডাকে চিঠি পর্যন্ত পাঠিয়েছে দুষ্টু ছেলেরা। কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় ভদ্রলোকদের সব রাগ গিয়ে পড়েছিল ধীরাপদর ওপর। তাঁদের ধারণা সে-ই পালের গোদা। কারণ, ও তখন ওই বাউণ্ডুলে ছেলেগুলোকে একত্র করে কুঠি সংস্কারের কাজে মন দিয়েছিল। কিন্তু সে সব পুরনো কথা। সংস্কারের ঝোঁক বেশিদিন টেকেনি। ছেলেগুলোর বেশির ভাগই চলে গেছে। ওই অক্ষয় নাম দুটি রেখে গেছে।

নামহানির অমর্যাদায় ও বেদনায় ক্রুদ্ধ এবং কাতর হয়ে দুজনেই তাঁরা গোপনে একে একে ধীরাপদর কাছেই আবেদন আর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু ধীরাপদ প্রতিকার কিছু করতে পারেনি। ফলে বিদ্বেষ। এতদিনে ওঁদের আসল নাম সকলেই ভুলেছে। এমন কি ওই নামে বাইরে থেকে কেউ খোঁজ

করতে এলেও তাঁরাই বেরিয়ে আসেন। কিন্তু বিদ্বেষটুকু থেকেই গেছে। এক কুঠিতে ধীরাপদ তাঁদের সঙ্গে বাস করে আসছে ট্রেনের এক কামরায় নিস্পৃহ যাত্রীর মতই। যোগ আছে, তবু বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সে নিস্পৃহ থাকলেও তাঁরা নিস্পৃহ নন।

আজ সকালে উঠে একাদশী শিকদারের মুখখানি দেখার বাসনার পিছনে কারণ আছে একটু। গত তিন দিন ধরে আগের মতই আধ মাইল পথ ঠেঙিয়ে একটা স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে কাগজ পড়ে আসতে হচ্ছে ভদ্রলোককে। সোনাবউদি সুলতান কুঠিতে ডেরা নেবার আগে যেমন পড়তেন। গত দু'বছর ওই মেহনত আর করতে হয়নি। বাড়ির আঙ্গিনায় বসে কোলের ওপর কাগজ পেয়েছেন। দুটো বছরে বয়েসও দু বছর বেড়েছে, এতদিনের অনভ্যাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাগজ দেখার ধকল সয় না। স্টলের সামনে হাঁটু মুড়ে বসতে হয়েছে তাঁকে। সেই অবস্থায় তিন দিনের মধ্যে দু দিনই ধীরাপদর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেছে। দুর্দশা দেখে দুঃখও হয়েছে, হাসিও পেয়েছে। সোনাবউদিই বা এ-রকম কেন? পাঠিয়ে দিলেই তো পারে কাগজখানা।

গত তিন দিন ধরে সোনাবউদির ঘর থেকে কদমতলার বেঞ্চিতে কাগজ যাচ্ছে না। গেলে আর ফুটপাতে বসে কাগজ পড়বেন কেন শিকদার মশাই?

সুলতান কুঠিতে একমাত্র সোনাবউদির ঘরেই রোজ সকালে খবরের কাগজ আসে।

একখানা নয়, দুখানা আসে। একটা ইংরেজি একটা বাংলা।

গণুদা, অর্থাৎ গণেশবাবু খবরের কাগজের অফিসের পাকাপোক্ত প্রুফ রিডার। ইংরেজি বাংলা দুখানা নামকরা কাগজ বেরোয় সেই দপ্তর থেকে। গণুদা বাংলার প্রুফ রিডার হলেও দুখানা কাগজই বিনা পয়সায় পায়।

আর খানিক বাদেই হয়ত সিকদার মশাই বেঞ্চিতে এসে বসবেন। তার একটু পরে কাগজওয়ালা জানালা দিয়ে কাগজ ফেলে যাবে সোনাবউদির ঘরে। নেশাগ্রস্তের মত চনমনিয়ে উঠবেন একাদশী শিকদার। ঘুরে বসে বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে থাকবেন নির্নিমেষে। দরজা একসময়ে খুলবে ঠিকই, কিন্তু কেউ কাগজ দিয়ে যাবে না তাঁর কাছে।

তারপর শকুনি ভটচায আসবেন, খবরের কাগজের খবর নিয়ে কথা উঠবে না নিশ্চয়ই। শিকদার মশায়ের প্রাতঃকালীন কাগজ পাঠে বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছে তিনিও জানেন। দু দিন ধরে সকালের আসরে রমণী পণ্ডিতকে দেখা যাচ্ছে না। এঁদের মন-মেজাজ বুঝেই হয়ত কাছে ঘেঁষতে সাহস করছেন না।

অবশ্য সবই ধীরাপদর অনুমান। অনুমান, ভটচায এবং শিকদার মশাই গণুদাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে কিছু আলোক দান এবং কিছু পরামর্শ দান করেছেন। সংসারাভিজ্ঞ শুভার্থী প্রতিবেশীর কর্তব্য-বোধ তো এখনো জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি একেবারে। তার ওপর গণুদা নির্বিরোধী মানুষ, কোনো কিছুর সাতে-পাঁচে নেই। সকলেই জানে গণুদা ভালো মানুষ। নিজের আপিস নিয়েই ব্যস্ত সর্বদা। কোনো সপ্তাহে সকালে ডিউটি, কোনো সপ্তাহে বিকেলে, কোনো সপ্তাহে বা রাত্তিরে। রাত্তিরে অর্থাৎ সমস্ত রাত। এর ওপর আবার বাড়তি রোজগারের জন্য মাসের মধ্যে দু সপ্তাহ ডবল শিফট ডিউটি করে। ঘর দেখার ফুরসৎ কোথায় তার?

কিন্তু তার নেই বলে কি আর কারো নেই? গুণী বক্তি নিজের ঘরের দিকে তাকাবার ফুরসৎ না পেলেও আর দশ ঘরের নাড়ীর খবর রাখে। আর কর্তব্য-চেতন গুণী পড়শী নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে। এ তো এক বাড়ির ব্যাপার। অতএব কর্তব্যবোধেই ভটচায আর শিকদার মশাই ভালো-মানুষ গণুদার জটিলা রমণীটির হালচালের ওপর খরদৃষ্টি রাখবেন সেটা বেশি কিছু নয়। আর কর্তব্যবোধেই তাঁরা ভালো মানুষটিকে একটু-আধটু উপদেশ দেবেন তাই বা এমন বেশি কি?

তবে তাঁদের এই কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে একটু আভাস ধীরাপদ রমণী পণ্ডিতের কাছ থেকে আগেই পেয়েছিল। কিন্তু ধীরাপদ তখন তলিয়ে ভাবেনি কিছু। অনর্থক অমন অনেক কথাই বলেন রমণী পণ্ডিত। ফাঁকমত সকলের সঙ্গেই একটু হৃদ্যতা বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করেন। ধীরাপদ সেদিন কুঠির দিকে আসছিল আর তিনি যাচ্ছিলেন কোথায়। পথে দেখা। বাড়িতে দেখা হলে না দেখেই পাশ কাটিয়ে থাকেন। পথটা বাড়ির থেকে অনেক নিরাপদ বলেই হয়ত দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। হাসিমুখে যে-ভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন, মনে হবে অন্তরঙ্গ পরিচিত জনের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা। শেষে বলেছেন, আজ এরই মধ্যে বাড়ি ফিরছেন? তা কি-ই বা করবেন, যে-বকম বাজার পড়েছে চট করে কিছুই আর হয়ে ওঠে না···অনেক দিন ভেবেছি আপনার হাতখানা একবার দেখব, তা আপনার তো আর ও-সবে বিশ্বাসটিশ্বাস নেই—তবু দেখাবেন না একবার, আপনার তো আর পয়সা লাগছে না।

ধীরাপদ হাসিমুখেই মাথা নেড়েছিল।

যাচ্ছেন? আচ্ছা যান পুকুরধারে, শিকদার আর ভটচায মশাইকে দেখলাম বসে গণুবাবুর সঙ্গে গল্পসল্প করছেন—

অকারণে বোকার মত একটু বেশিই হেসেছিলেন পণ্ডিত। গণুদাকে বাড়ির কারো সঙ্গে বড় একটা মিশতে দেখে না কেউ। কখন থাকে না থাকে হদিস পাওয়াই ভার। সেই গণুদার সঙ্গে মজা-পুকুরের ধারে বসে গল্প করছেন একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচায···ভাবলে ভাবার মত কিছু ছিল বই কি। পণ্ডিত সেদিন বোকার মত হাসেননি। বোকার মত সে-ই বরং ওই পণ্ডিতের দুরাশার কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরেছিল। বড় আশা ভদ্রলোকের, শহরের জাঁক-জমকের মধ্যে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে জাঁকিয়ে বসবেন। জ্যোতিষার্ণব হবেন। মস্ত সাইনবোর্ড ঝুলবে। দু-পাঁচ জন সাগরেদ থাকবে, রীতিমত অফিস হবে—চকচকে ঝকঝকে দু-পাঁচটা গাড়িও এসে দাঁড়াবে দোড়গোড়ায়। সবই হত, অভাব শুধু মূলধনের। সম্বলের মধ্যে অনেকগুলো ছেলেপুলে আর রুগ্না স্ত্রী। হাঁড়িতে জল ফোটে, দোকানে চাল। তবু আশা পোষণ করেন রমণী পণ্ডিত।

তাঁর দোষ নেই। আশা আর বাসা ছোট করতে নেই।

পণ্ডিতের সেই বোকা-হাসির অর্থ ধীরাপদ পরে বুঝেছিল। এখানে দিন যাপনের একটানা ধারাটা আচমকা ধাক্কায় ওলট-পালট হয়ে যাবার পরে। আর সেই সঙ্গে সকালে একাদশী শিকদারের খবরের কাগজ বন্ধ হতে দেখে। একটার সঙ্গে আর একটার যোগ অনুমান করা কঠিন হয়নি। অনেক কিছুই অনুমান করা সম্ভব হয়েছে তারপর। সেদিন দাঁড়িয়ে শুনলে রমণী পণ্ডিত হয়ত আরো খানিকটা আভাস দিতেন। কারণ এর আগে শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদারের কর্তব্যবোধের ধকলটা তাঁর ওপর দিয়েই গেছে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে ভদ্রলোক কোটা-ঘরে পালিয়ে বেঁচেছেন।

সচকিতে জানালার দিকে ঘাড় ফেরাল ধীরাপদ। কদমতলায় যাঁদের আশা করেছিল তাঁরা নয়। তার জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে সোনাবউদি। মুখে-চোখে সদ্য ঘুম-ভাঙা জড়িমা। চুপচাপ দেখে যেতে এসেছিল বোধ হয়। ধরা পড়ে অপ্রতিভ একটু, কিন্তু এত সকালে কম্বল মুড়ি দিয়ে শয্যায় ও-ভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক আরো বেশি। এগিয়ে এসে এক হাতে জানালার গরাদ ধরে জিজ্ঞাসা করল, কার ধ্যান হচ্ছে?

কম্বল ফেলে ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল। কিন্তু দরজার দিকে এগোবার আগেই সোনাবউদি বাধা দিল আবার, থাক্ দরজা খুলতে হবে না, এই সাতসকালে ও-ঘর থেকে আমাকে বেরুতে দেখলে ঘাটের কাশি একেবারে ঘাটে পাঠিয়ে ছাড়বে।

হেসে চট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে কদমতলার দিকটা দেখে নিল একবার।

তারপর ঈষৎ কৌতুকভরা দু চোখ ধীরাপদর মুখের উপর রাখল। শুধু কৌতুকভরা নয়, প্রচ্ছন্ন সন্ধানীও। গায়ে কম্বল না থাকায় শীত-শীত করছে ধীরাপদর। কিন্তু সোনাবউদির শীতের বালাই নেই। শাড়ির আঁচলটাও গায়ে জড়ায়নি, স্রস্ত শৈথিল্যে কাঁধের ওপর পড়ে আছে। রাতের নিদ্রায় মাথার চুল কিছুটা অবিন্যস্ত। তিন ছেলেমেয়ের মা সোনাবউদিকে রূপসী কেউ বলবে না। গায়ের রঙ ফর্সাও নয়, কালোও নয়। নাক মুখ চোখ সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়। স্বাস্থ্য খুব ভালও নয়, তেমন মন্দও নয়। তবু ওই ভারী সাধারণের মধ্যেও কিছু যেন আছে যা নিজের অগোচরে ধীরাপদ অনেক সময় খুঁজেছে। আজকের প্রথম উষায় জরাজীর্ণ সুলতান কুঠিরও একটা ভিন্ন রূপ দেখেছে। ধীরাপদর লোভ হল, এই সকালে সোনাবউদির মুখটির দিকে ভালো করে তাকালেও সেই কিছুটা হয়ত চোখে পড়বে। কিন্তু সোনাবউদি যে-ভাবে দেখছে, ওর পক্ষে ফিরে সেইভাবে তাকে দেখা সম্ভব নয়।

বিব্রত মুখে ধীরাপদ দাগধরা দেয়ালটার দিকে চেয়ে হাসল একটু।

একেবারে রাত কাবার করেই ফেরা হল বুঝি ?

হালকা সুর, হালকা প্রশ্ন। মাঝের এই ক'টা দিন ছেঁটে ফেলতে পারলে একেবারে স্বাভাবিক। ঘাড় ফিরিয়েও ধীরাপদ মুখের দিকে তাকাতে পারল না ঠিক মত। কারণ সোনাবউদির দু চোখ তখনো ওর মুখের ওপর বিশ্লেষণরত। নিরুত্তর দৃষ্টি তার কাঁধ-ঘেঁষে কদমতলার খালি বেঞ্চিটার ওপরে গিয়ে পড়ল। ফলে সোনাবউদি চকিতে আরো একবার ফিরে দেখে নিল সেখানে কেউ এসেছে কিনা।

রাতটা কোথায় ছিলেন কাল ?

এই ঘরেই।

এলেন কখন, মাঝরাতে ?

না, গোড়ার রাতেই।

ওমা আমি তাহলে কি কচ্ছিলাম! জেগে ঘুমুচ্ছিলাম বোধ হয়। বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা, তারপর আর একবার আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে বলল, ঘণ্টাখানেক বাদে একবার ঘরে আসবেন, একটু কাজ আছে।

সোনাবউদি চলে যাবার পরও ধীরাপদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। ভাবছে, মাঝের এই ক'টা দিন কি মিথ্যে? কিছুই ঘটেনি? মিথ্যে নয়। ঘটেছেও। কিন্তু যা ঘটেছে তার থেকেও ধীরাপদ আজ অবাক হল আরো বেশি। ঘণ্টাখানেক বাদে ঘরে যেতে বলে গেল ওকে। ঠিক আদেশও নয়,

অনুরোধও নয়। ওই রকম করেই বলত আগে। কিন্তু আগের সঙ্গে তো এখন অনেক তফাত। আবার কি তাহলে আপস হবে একটা? ধীরাপদ আর তা চায় না। সোনাবউদির সব মানায়, আপস মানায় না।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ যেতে আর ভাবা হল না। হুঁকো আর তামাকের ঠোঙা হাতে শিকদার মশাই আর গঙ্গাজলের বাটি হাতে শকুনি ভটচায একসঙ্গেই এসে কদমতলার বেঞ্চিতে বসলেন। আর কাগজ আসে না বলেই বোধ হয় শিকদার মশাইয়ের আগে আসার তাড়া নেই। হাত বদলে বদলে প্রথমে চুপচাপ খানিকক্ষণ তামাক টানলেন তাঁরা। তারপর একটা দুটো কথা। কি কথা ধীরাপদ এখান থেকে জানবে কি করে? কিন্তু কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বসে দুজনেই তাঁরা বাড়িটার দিকে তাকালেন। প্রথমে গণুদার ঘরের দিকে, তারপর এদিকে। জানালার এধারে তাকে দেখেই তাড়াতাড়ি ফিরে বসলেন আবার।

কিন্তু মুখ দেখে তাঁদের খুব রুষ্ট মনে হল না ধীরাপদর। বরং তুষ্ট যেন কিছুটা। একটা দুষ্ট বুদ্ধি জাগল হঠাৎ। ওই বেঞ্চিতে গিয়ে বসলে কি হয়? সম্পত্তি তো নয় কারো। বসুক না বসুক ধীরাপদ ঘরের বন্ধ দরজাটা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে লাল সাইকেল হাঁকিয়ে কাগজওয়ালার আবির্ভাব। একাদশী শিকদারের হুঁকো টানা বন্ধ হল। কাগজওয়ালা কাগজ ফেলে দিয়ে প্রস্থান করল। সতৃষ্ণ নেত্রে ঘবেব দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। তাঁর হাত থেকে হুঁকো টেনে নিলেন শকুনি ভটচায খেয়াল নেই। পাশের ঘরেব দোরগোড়ায় ধীরাপদ দাঁড়িয়ে আছে তাও না।

সুলতান কুঠির আজকের এই দিনটাই অন্য সব দিনের থেকে আলাদা বুঝি। দু-চার মিনিটের মধ্যেই যে-দৃশ্যটি দেখল, ধীরাপদ নিজেই হতভম্ব। আধ-হাত ঘোমটা টেনে কাগজ হাতে ঘর থেকে বেরুল স্বয়ং সোনাবউদি। কুলবধূর নম্র-মন্থর চরণে কদমতলার বেঞ্চির দিকে এগিয়ে গেল। শিকদার মশাই শশব্যস্তে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। শকুনি ভটচাযও। কাগজখানা হাতে নিয়ে একাদশী শিকদার সসঙ্কোচে কিছু বললেন। হয়ত নিজে কাগজ নিয়ে আসার জন্যেই বললেন কিছু।

এটুকু দেখেই ধীরাপদ অবাক হয়েছিল; পরের কাণ্ডটা দেখে দুই চোখ বিস্ফারিত তার। গলায় শাড়ির আঁচল জড়িয়ে দুজনকেই একে একে প্রণাম করে উঠল সোনাবউদি। যেমন তেমন প্রণাম নয়। ভক্তি-ললিত প্রণাম।

বিস্ময়াভিভূত শিকদার-ভটচাযের যুগপৎ আশিস-বর্ষণ শেষ হবার আগেই তেমনি ধীর-নম্র চরণে সোনাবউদি ফিরল আবার।

আধ-হাত ঘোমটা সত্ত্বেও ধীরাপদকে দেখেছে নিশ্চয়। কিন্তু কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে গেল।

বিমূঢ় মুখে ধীরাপদ নিজের বিছানায় এসে বসল।

ছোটখাটো একটা ভোজবাজি দেখে উঠল যেন। এ পর্যন্ত সোনাবৌদির অনেক আচরণে অনেকবার হকচকিয়ে গেছে ধীরাপদ। সে-সবই তার স্বভাবের সঙ্গে মেলে। এ একেবারে বিপরীত।

সোনাবউদি কড়াপাকের সন্দেশ রে, আসলে খারাপ নয়।

খট্ করে রণুর কথা ক'টা মনে পড়ে গেল ধীরাপদর। রণু বলত। রণেশ। গণুদার ছোট ভাই। এদের সঙ্গে যোগাযোগের অনেক আগেই এই সোনা-বউদিটির কথা শোনা ছিল ধীরাপদর। স্বর্ণবালা থেকে সোনাবউদি। মস্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের মেয়ে নাকি। কিন্তু পণ্ডিত হলে হবে কি, ইস্কুলমাস্টারের আর আয় কত। তার ওপর মেয়েও একটি নয়। রণু বলত, তাই তাদের মত ঘরে এসে পড়েছে, নইলে···

তখনকার এই অদেখা সোনাবউদিকে নিয়ে ধীরাপদ ঠাট্টাও কম করেনি।

হঠাৎ রণুর কথা মনে হতে ধীরাপদ জোরে বাতাস টানতে চেষ্টা করল আর বিরক্ত হল। মনে পড়ে কেন? এত নিস্পৃহতা সত্ত্বেও এখনো বুকের মধ্যে এ-ভাবে টান পড়ে কি করে?

দু ভাইকে পাশাপাশি দেখলে সহোদর ভাবা শক্ত। বেঁটে-খাটো গোলগাল চেহারা গণুদার—ধপধপে ফর্সা রঙ। সুখী আদল। রণু ঠিক উল্টো। কলেজে পড়তেই ধীরাপদর কেমন মনে হত ছেলেটা বেশি দিন বাঁচতে আসেনি। খুব দূরের কিছুর সঙ্গে কেমন যেন যোগ ওর। আধ-ময়লা রোগা লম্বা চির-রুগ্ন মূর্তি। কথাবার্তা কম বলত, বেশি দিন টিকবে না নিজেই বুঝেছিল বোধ হয়।

সোনাবউদির সঙ্গে ধীরাপদর সাক্ষাৎ এবং পরিচয় হাসপাতাল থেকে রণুকে বাড়ি নিয়ে আসার পরে। গণুদার বাড়ি বলতে তখন এক আধা ভদ্র-বস্তির দুখানা খুপরি ঘর। হাসপাতাল থেকে রণুর জবাব হয়ে গেছে। একটা চেস্ট বাকি। পিঠের ঘুণ-ধরা হাড়ের গোটা অংশটা কেটে বাদ দেওয়া। সেই অপারেশনও তখন মাদ্রাজের কোথায় হয়, এখানে হয় না। চিকিৎসা বলতে টাকার খেলা।

গণুদা ঘাবড়ে গিয়েছিল। আরো বেশি ঘাবড়েছিল রোগীকে আপাতত বাড়ি নিয়ে যেতে হবে শুনে। ঢোঁক গিলে দ্বিধা প্রকাশ করেছিল, কি যে করি, ইয়ে আমার ওখানে একটু অসুবিধে আছে।

বিপদের সময় সেই মিনমিনে ভাব দেখে ধীরাপদ চটে গিয়েছিল। জোরজার করে রণুকে সে-ই একরকম ওখানে এনে তুলেছিল। বলেছে, অসুবিধের কথা পরে ভাবা যাবে। সোনাবউদি মুখ বুজে সেই দু ঘরের এক ঘরে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে ধীরাপদর মনে হয়েছিল কাজটা ভালো হল না। আর মনে হয়েছিল, গণুদার অসুবিধার কারণ বোধ হয় ইনিই। হাসপাতালেও কোনদিন দেখেনি মহিলাকে। রণুর মুখের দিকে চেয়ে মায়া হত বলেই কোনদিন তার কথা জিজ্ঞাসা করেনি। নইলে ধীরাপদর মনে হত ঠিকই।

শুধু মনে হওয়া নয়, তারপর কানেই শুনতে হয়েছে অনেক কিছু। হাসপাতাল থেকে রণুকে নিয়ে আসাব দিনতিনেক পরের কথা। বিকেলের দিকে ওর বিছানার পাশে ধীরাপদ বসেছিল। পাশের ঘর থেকে নারীকণ্ঠের তর্জন শোনা গেল। শোনাতে হয়ত চায়নি, কিন্তু যেমন ঘর না শুনে উপায় নেই।

যেখান থেকে হোক টাকা যোগাড় করে পাঠিয়ে দাও, টাকা নেই বলে কি গুষ্টিসুদ্ধ মরতে হবে!

আঃ, লোক আছে ও-ঘরে। গণুদার গলা।

থাক্ লোক। আর দুটো দিন সবুর করে যেখানে পাঠাতে বলছে ওরা একেবারে সেখানে পাঠালেই হত, সাত-তাড়াতাড়ি এখানে এনে তোলার কি দরকার ছিল?

ক্লান্তিতে দু চোখ বোজা ছিল রণুব। কানে গেছে নিশ্চয়। কিন্তু একটুও বিব্রত বোধ করেছে বলে মনে হয়নি। বরং ধীরাপদই না বলে পারেনি। হালকা ঠাট্টায় ফিসফিস কবে বলেছে, তোর বউদি কড়াপাকের ছানার সন্দেশ, না ইটের সন্দেশ রে!

চোখ মেলে রণু অল্প একটু হেসেছিল মনে আছে। নির্লিপ্ত মুখে বলেছিল, টাকা আদায় করার জন্য ও-ভাবে বলছে। ধীরাপদ বিশ্বাস করেনি। কিন্তু রণুর বিশ্বাস দেখে অবাক হয়েছিল।

অবাক ধীরাপদ আরো হয়েছিল। সেটা তার পরদিনই। দুপুরের দিকেই এসেছিল—যেমন আসে। কিন্তু ঘরে ঢোকার আগেই সোনাবউদি এগিয়ে এলো। বলল, ও ঘুমুচ্ছে, এ-ঘরে আসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে—

ধীরাপদ তাকে অনুসরণ করে অন্য ঘরটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। এ ঘরটা আরো অপরিসর। মেঝের একদিকে ছোট দুটি ছেলে-মেয়ে ঘুমুচ্ছে, অন্যদিকে একটি চার-পাঁচ মাসের শিশু হাত-পা ছুঁড়ছে। কোণ থেকে একটা গোটানো মাদুর নিয়ে সোনাবউদি আধখানা পেতে দিয়ে বলল, বসুন—

অনতিদূরে নিজেও মেঝেতে বসল পা গুটিয়ে। দুই এক পলক ওকে দেখে নিল তারই মধ্যে।—বিপদের সময় আর লজ্জা করে কি হবে, তাই ডাকলুম। আপনার সঙ্গে ঠাকুরপোর অনেকদিনের পরিচয় শুনেছি, আপনার কথা প্রায়ই বলত।

গরমে হোক, বা যে জন্যেই হোক, ধীরাপদ ঘেমে উঠেছিল। সোনাবউদি আর এক নজর দেখে নিল। ধীরাপদর মনে হল কিছু বলবার আগে যেন যা চাই করে নিল আর এক প্রস্থ।

আপনি কি করেন?

কথা আছে বলে ঘরে ডেকে এনে বসিয়ে এ আবার কি প্রশ্ন! ধীরাপদ ফাঁপরে পড়ল।

তেমন কিছু না··

সে তো জানি, তেমন কিছু করলে আর এ বাড়ির সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে কেমন করে। ভাবল একটু, তারপর সোজাসুজি তাকালো মুখের দিকে।—বন্ধুর চিকিৎসার জন্য শ পাঁচেক টাকা আপনাকে কেউ ধার দিয়েছে শুনলে লোকে বিশ্বাস করবে?

ধীরাপদর মুখের অবস্থা কেমন হয়েছিল কে জানে। কারণ তার দিকে চেয়ে সোনাবউদি হেসেই ফেলেছিল।—ভয় নেই, আপনাকে ধার করতে বেরুতে হবে না, কাল একটু সকাল সকাল আসুন, বিশেষ দরকার আছে। কাউকে কিছু বলবেন না।

সকাল সকালই এসেছিল পরদিন। এসে দেখে সোনাবউদি কোথায় বেরুবার জন্য প্রস্তুত। বাচ্চাগুলো ঘরের মধ্যে ঘুমুচ্ছে আগের দিনের মতই। বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে ঘরের শিকল তুলে দিল।—আসুন।

তিনটে বাচ্চাকে এইভাবে ঘরে বন্ধ করে কোথায় যেতে চায় ধীরাপদ কিছুই বুঝল না। জিজ্ঞাসা করার ফুরসৎ পেল না। রাস্তায় এসে সোনাবউদি নিজে থেকেই বলল, ভালো একটা গয়নার দোকানে নিয়ে চলুন, কলকাতায় থাকলেও কিছুই চিনি না—

ধীরাপদও তেমনিই চেনে গয়নার দোকান। তবে দুই একটা দেখেছে বটে।

সোনাবউদি গয়না বিক্রি করল। সেকেলে আমলের ভারী গোট হার একটা। সোনার দাম চড়া। মোটা টাকাই পেল। চুলচেরা হিসেব বুঝে নিয়ে খাদের সম্ভাব্য পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে ঝকাঝকি করে তারপর টাকা নিল। তবু সংশয় যায় না, ঠকল কি না সারা পথ চুপচাপ তাই ভাবছিল বোধ হয়।

বাড়ির কাছাকাছি এসে বলল, ঠাকুরপো বা কাউকে কিছু বলবেন না··· অবশ্য এটা ওরই জিনিস, তবু শুনলে দুঃখ পাবে।

গয়নার দোকানে সোনাবউদির দর কষাকষি ধীরাপদর ভালো লাগছিল না। বাচ্চাগুলোকে ওভাবে ঘরে বন্ধ করে আসাটাও না। রণুর জিনিস শোনামাত্র মনটা বিরূপ হবার সুযোগ পেল। রণুর মা-ঠাকুমা খুব সম্ভব ওর নামে রেখে গেছেন। বিক্রির জন্য সেটা বিশ্বাস করে ধীরাপদর হাতে না ছেড়ে দিতে পারাটা অন্যায় নয়। কিন্তু ও-কাজটা তো গণুদাকে দিয়েও হত। এত অবিশ্বাস আর এত গোপনতা কিসের!

রণুর পাশে এসে বসা মাত্র সে জিজ্ঞাসা করল, কি রে, হার বিক্রি করে এলি?

ধীরাপদ অবাক। সামলে নিয়ে বলল, করব না তো কি, হার ধুয়ে জল খাবি? তুই জানলি কি করে?

হাসল একটু।—আমি হাসপাতালে থাকতেই জানতুম এবার ওটা খসবে। ধীরাপদ বিরক্ত হচ্ছিল, কিন্তু পরের কথাটা শুনে বিস্ময়ে থমকে গেল। রণু বলল, ও-টুকুই ছিল সোনাবউদির—

সোনাবউদির! কিন্তু তিনি যে বললেন ওটা তোর?

বলল, না? খুশিতে শীর্ণ মুখ ভরে উঠেছিল রণুর। সোনাবউদি ওই রকমই বলে। প্রথম অসুখে ওটা বার করে বলেছিল, এই দিয়ে চিকিৎসা করো। আমি বলেছিলাম দরকার হলে পরে নেব। সেই থেকে ওটা আমার হয়ে গেছে। ওটা ওর দিদিমার দেওয়া।

ধীরাপদর মনে আছে সুলতান কুঠির এই ভূমিশয্যায় সেই একটা রাতও প্রায় বিনিদ্র কেটেছিল তার। সমস্তক্ষণ কি ভেবেছে এলোমেলো, আর ছট্‌ফট করছে। থেকে থেকে মনে হয়েছে, রণুর মত সে-ও যদি ঠিক অমনি করে সোনাবউদি বলে ডাকতে পারত! পারলে বলত, সোনাবউদি তোমার ওপর বড় অবিচার করেছিলাম। দোষ নিও না।

রণু মারা গেছে।

ভিতরে ভিতরে ধীরাপদ আবারও নাড়াচাড়া খেয়েছিল। মারা গেছে বলে নয়। যাবে জানতই। কিন্তু এমন নিঃশব্দ বিদায় কল্পনা করেনি। যেন কোনো যাত্রাপথের মাঝখানে দিনকতকের জন্য থেমেছিল। সময় হল চলে গেল। তারপর কেউ এলো খবর করতে। খবর পেল, নেই। চলে গেছে।

ধীরাপদও খবরটা পেয়েছিল অনেকটা সেইভাবেই। রণুকে মাদ্রাজে পাঠানোর পর আর রোজ আসত না। পাঁচ-সাত দিন পরে পরে এসে খোঁজ নিয়ে যেত। কথাবার্তা গণুদার সঙ্গেই হত। একটা অপারেশান হয়ে গেছে —আরো একটা হবে—তাও হয়ে গেল—হ্যাঁ ভালই আছে বোধ হয়—ও, তুমি জান না বুঝি? আজ চার দিন হল রণু মারা গেছে।

গণুদার অফিসের তাড়া, ভাই ছেড়ে নিজে মরলেও প্রেস অপেক্ষা করবে না। ঘরের মধ্যে ছেলে আর মেয়েটা হুটোপুটি করছে, কোলের শিশুটা শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। সোনাবউদি কলতলায় জামাকাপড় কাচছে।

যে নেই তার দাগও নেই।

গণুদা বসতে বলে গেছে তাকে, সোনাবউদির কি কথা আছে নাকি।

এককালে রবি ঠাকুরের কিছু কবিতা পড়েছিল ধীরাপদ। স্বর্গচ্যুত কোনো শাপভ্রষ্ট দেবতার যখন মাটিতে টান পড়ে—শোকহীন হৃদয়হীন স্বর্গভূমি উদাসীন তখনো। কিন্তু মাটির শেকল-ছেঁড়া মানুষের শোকে বসুন্ধরার আকুল কান্না। কবির চোখে সেই শোক হৃদয়ের সম্পদ। স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের এটুকুই তফাত।

ধীরাপদর হাসি পাচ্ছিল, তফাত ঘুচতে খুব দেরি নেই।

আড়ড় গায়ে শাড়িটা বেশ করে জড়িয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সোনাবউদি এসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিল, আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা এবারে শেষ হল বোধ হয়?

জবাব না দিয়ে ধীরাপদ চুপচাপ মুখের দিকে চেয়েছিল। নিজের অগোচরে শোকের দাগ খুঁজছিল হয়ত··গম্ভীরই দেখাচ্ছে বটে। ছেলে-মেয়ের চেঁচামেচিতে মহিলা একবার শুধু ফিরে তাকাতেই সভয়ে ঘর ছেড়ে পালালো তারা। ভয়টা স্বাভাবিক, মায়ের হাতে তাদের নিগ্রহ ধীরাপদ নিজের চোখেই দেখেছে।

সোনাবউদির দু চোখ তার মুখের ওপর ফিরল আবার।—আপনার দাদা বলেন, মস্ত বড় বাড়িতে নাকি থাকেন আপনি, আর, একটু চেষ্টা করলে আমাদেরও সেখানে জায়গা হতে পারে। তাঁর ধারণা আমি আপনাকে

বললে আপনি সে-চেষ্টা করবেন—বলছি না বলে রাগ। কিন্তু, বন্ধু থাকতেই করেন নি যখন এখন আর কেন করবেন বুঝছি না।

ধীরাপদ হাঁ করেই চেয়েছিল খানিকক্ষণ। স্টেশনে রণুকে ট্রেনে তুলে দেওয়ার আগে পর্যন্ত অফিস কামাই করেও গণুদা মাঝে মাঝে সুলতান কুঠিতে আসত বটে। ব্যবস্থা-পত্র সম্বন্ধে পরামর্শ করত, মিনমিন করে নিজের সুবিধে-অসুবিধের কথা বলত। বাড়িটাও একদিন ঘুরে ঘুরে দেখেছিল মনে পড়ে।

ঠিক এই মুহূর্তে এই স্বার্থের কথাগুলো না শুনলে ধীরাপদ কিছু মনে করত না। এমন কি, রণুর প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলার পরেও যদি বলত তাহলেও খারাপ লাগত না। কিন্তু সব সত্ত্বেও সোনাবউদির বলার ধরনটা বিচিত্র মনে হয়েছিল।

গণুদা মনস্তাত্ত্বিক নয়, খবরের কাগজের প্রুফরিডার। সোনাবউদি বললে সে চেষ্টা করবে এটা বুঝেছিল কি করে? যে-করেই হোক বুঝেছিল ঠিকই। ধীরাপদ চেষ্টা করেছিল। যে চলে গেছে তার শোক আঁকড়ে কে ক'দিন বসে থাকে? স্বার্থ কার নেই? রণুর জায়গা দখল করার একটুখানি প্রচ্ছন্ন লোভ কি ভিতরেও উঁকিঝুঁকি দেয়নি? না দিলে সোনাবউদির কথাগুলো অলক্ষ্য তাগিদের মত অমন অষ্টপ্রহর মনে লেগে থাকত কেন। আর তাদের এখানে নিয়ে আসার জন্য অমন এক অদ্ভুত কাণ্ডই বা করে বসেছিল কি করে!

বরাতক্রমে কোণা-ঘর দুটো খালিই ছিল তখন। বাসের অযোগ্য নয়, তবে সুলতান কুঠির অন্যত্র ঠাঁই পেলে ওখানে সাধ করে ঠাঁই নেবে না কেউ। সপরিবারে গণুদাকে ওখানেই এনে তোলা যেত। আর ভদ্রলোক হাঁফ ফেলে বাঁচত তাহলেও।

কিন্তু ধীরাপদর বাসনা অন্য রকম।

রমণী পণ্ডিতকে ওখানে চালান করার সুযোগটা ছাড়েনি সে। ধীরাপদ নিজের মনে হেসেছে আর নিজেকেই পাষণ্ড বলে গাল দিয়েছে।

তার পাশের ঘরেই সোনাবউদির সংসার—সেখানে তখন থাকতেন রমণী পণ্ডিত। অনেকগুলো ছেলে-মেয়ের মধ্যে মেয়েটি বড়। বড় বলতে বছর তের-চৌদ্দ বয়েস তখন। রমণী পণ্ডিতের সাধ ছিল মেয়ে লেখাপড়া শিখবে, আই-এ বি-এ পাস করবে। ছেলের থেকেও আজকাল লেখাপড়া জানা মেয়ের কদর বেশি। ধীরাপদ অনেকবার তাঁকে বলতে শুনেছে, মেয়ের হাতটিতে বিদ্যাস্থান বড় শুভ। কিন্তু মেয়েকে বিদ্যার খোঁয়াড়ে ঠেলে দিতে না পারলে

সরস্বতী ঠাকরোন যেচে এসে হাতে বসবেন না। আশা পূরণের একটাই উপায় দেখেছিলেন রমণী পণ্ডিত। যদি মেজে ধীরাপদ যদি মেয়েটাকে প্রথম ধাপ অর্থাৎ, স্কুল ফাইন্যালটা পার করে দিতে পারে তাহলে বাকি ধাপগুলো মেয়ে নিজেই টপাটপ টপকে যাবে।

ধীরাপদ রাজী হয়েছিল। রাজী হয়ে অথৈ জলে পড়েছিল। মেয়ের হাতে বিগ্যাস্থান যত শুভ মগজে ততো নয়। রোজই পড়তে আসত। মুখ বুজে পড়ত বা পড়া শুনত। চৌদ্দ বছরের মেয়ে কুমুর ধৈর্যের অপবাদ দিতে পারবে না ধীরাপদ। সে অপবাদটা বরং ওর নিজেরই প্রাপ্য। সে নিজেই হাল ছেড়েছিল।

কিন্তু কুমুর হাতে বিগ্যাস্থান যে বড় শুভ, রোজ সকালে একগাদা বই হাতে তার আগমন ঠেকাবে কি করে? দিনকে দিন ধীরাপদ নিজেই হতাশ হয়ে পড়ছিল।

নি-খরচায় মেয়ের বিগ্যালাভের ব্যবস্থা করার সময় সুলতান কুঠির নীতির পাহারাদার দুটির কথা মনে হয়নি রমণী পণ্ডিতের। একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচাযের কথা। দিনকতক চুপচাপ দেখলেন তাঁরা, তারপর ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন। ধীরাপদর অবশ্য টের পাওয়ার কথা নয়, ক্ষোভের মাথায় রমণী পণ্ডিতই প্রকাশ করে দিয়েছেন।—কি রকম মানুষ ওঁরা বলুন তো—ওই কচি মেয়ে—আর আপনি এমন একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, কারো সাতে নেই পাঁচে নেই, আমার অনুরোধ ঠেলতে না পেরে দয়া করে মেয়েটাকে পড়াচ্ছেন একটু—তাতেও ওদের চোখ টাটায়! নীচ্, নীচ্—একদম নীচ্! বুঝলেন? আমি নিজে হাত দেখেছি ওদের—কোথাও কিছু ভালো নেই, বুঝলেন?

বুঝে একটু আশ্বস্ত হয়েছিল ধীরাপদ। কিন্তু পরদিনও যথাপূর্ব বিগ্যাস্থানে বিগ্যার বোঝা-সহ কুমুকে এসে দাঁড়াতে দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে। এক-ভাবেই চলছিল। ঠিক একভাবে নয়, একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচাযের টিকা-টিপ্পনী আর গঞ্জনার মাত্রা যে বাড়ছে সেটা ধীরাপদ অনুমান করেছিল রমণী পণ্ডিতকে দেখে। মেয়ের পড়ার সময়টায় প্রায়ই বারান্দায় পায়চারি করতেন তিনি, অকারণে এক-আধবার ঘরেও ঢুকতেন। কদমতলার বেঞ্চির শুভার্থী দুজন ভালয় ভালয় তাঁকে কোণা-ঘরে উঠে যেতে পরামর্শ দিচ্ছেন, এ খবরটাও কেমন করে যেন ধীরাপদর কানে এসেছিল।

ঠিক এই শুভ-মুহূর্তে সোনাবউদির মারফৎ গণুদার সেই ঠাঁইয়ের তাগিদ।

ঘর খালি থাকলে আর সুলতান কুঠিতে কাউকে এনে বসাতে হলে কোনো বাড়ি-অলার কাছে দরবার নিষ্প্রয়োজন। যাকে খুশি এনে বসিয়ে দাও আগে, পরের কথা পরে। কার বাড়ি কে মালিক সে খবর এখনো ভালো করে জানা নেই কারো। বাড়ির তদারক করে বিহারী দারোয়ান শুকলাল। কুঠি-সংলগ্ন একটা পোড়ো-ঘরে থাকে সে। ভাড়াটেদের ফাই-ফরমাশ খেটেও দু-এক টাকা বাড়তি রোজগার হয় তার। সুলতান-কুঠিরক্ষক দারোয়ানের মেজাজ নয় শুকলালের। ঠাণ্ডা মেজাজের ভালো মানুষ। পুরানো বাসিন্দা হিসেবে ধীরাপদর সঙ্গে খাতিরও আছে। মাসকাবারে মনি-অর্ডার ফর্ম লেখানো বা মাঝেসাজে খাম-পোস্টকার্ডে ঠিকানা লিখে দেওয়ার কাজটা তাকে দিয়েই হয়।

সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত। কিন্তু সোনাবউদির জন্য ওই কোণা-ঘর দুটো পছন্দ নয়।

হঠাৎ ধীরাপদর পড়ানোর চাড় দেখে শুধু ছাত্রী নয়, ছাত্রীর-বাবা পর্যন্ত হকচকিয়ে গিয়েছিলেন।

সকালে বই হাতে কুমু এসে হাজির হবার আগেই তার ডাকাডাকি শুরু হল। ভোরে ওঠা আর সকাল সকাল পড়তে বসার সুবর্ণ ফল-প্রসঙ্গে মুখ বুজে মেয়েটাকে অনেক বক্তৃতা শুনতে হয়েছে। পড়ানোর সময় কল্পিত গোলযোগের কারণে ঘরের দরজা চারভাগের তিনভাগ বন্ধ। ছাত্রী পড়া না পারার ফলে ধীরাপদর হাসিটা বাইরে রমণী পণ্ডিতের চকিত কানে অনেকবার গলিত শিসার মত গিয়ে ঢুকেছে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের পাঠ দান আর ঘরে বসে সুবিধে হয়নি তেমন। ওই মজা-পুকুরের ধারে একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচাযের চোখের নাগালের মধ্যে ছাত্রীসহ বিচরণ করতে করতে সেই পাঠ সম্পন্ন হয়েছে। ক'দিনে অনেক শিখেছিল বিস্ময়-বিমূঢ় চতুর্দশী কুমু। কেমন করে আকাশে মেঘ হয়, মেঘ গর্জায় কেন, সকালের বাতাসে স্বাস্থ্যোপযোগী কি কি উপাদান আছে, কোন্‌টা উপকারী কোন্‌টা নয়, গাছপালা বেঁচে থাকে কি করে—এমন কি মজা-পুকুরের শেওলা দেখে শেওলা আসে কোথা থেকে, হাসিমুখে সে-সম্বন্ধেও নিজের মৌলিক গবেষণামূলক কিছু তথ্য শোনাতে কার্পণ্য করেনি ধীরাপদ।

সেই বেপরোয়া পড়ানো দেখে ছাত্রী হতভম্ব, ছাত্রীর বাবা তটস্থ, কদমতলার বেঞ্চির শুভার্থীরা নির্বাক। বেগতিক দেখলেও ভরসা করে মুখ খুলবেন রমণী পণ্ডিত, তেমন খোলামুখ নয় তাঁর। কিন্তু শেষে রাত্রিতেও অঙ্ক পাঠ নেবার জন্য পাশের ঘরে মেয়ের ডাক পড়তে তাঁর অঙ্কের হিসেবটা একেবারে বরবাদ হয়ে

গেল। সেই রাতে অঙ্ক শেখা শেষ করে শ্রান্ত ছাত্রী ঘরে ফিরতে না ফিরতে ও-ঘরের চাপা রোষ চাপা থাকে নি। এ-ঘর থেকেও তার কিছু আভাস পাওয়া গেছে। মারধরও করেছে বোধ হয়, মেয়েটা কান্না চাপতে পারেনি। সত্যিই নিজেকে একেবারে পাষণ্ড মনে হয়েছিল ধীরাপদর।

এর দু দিনের মধ্যেই সপরিবারে রমণী পণ্ডিত কোণা-ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন।

দুড়দাড় পায়ের শব্দে ধীরাপদর চমক ভাঙল। গণুদার আট বছরের বড় মেয়েটা ঘরে ঢুকল।—ধীরুকা, মা ডাকছে। জলদি!

তলব জানিয়েই যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

বাইরে রোদ চড়েছে। কদমতলার বেঞ্চি থেকে শিকদার আর ভটচায মশাইও কখন উঠে গেছেন।

॥ তিন ॥

পাশের ঘরের দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়ালেই সোনাবউদির গোটা সংসারটা চোখে পড়ে।

মস্ত ঘর। যে-দুটো ঘরে থাকত এই একটাই তার চারগুণ। কালের জরায় ঘরের জলুস গেছে, কাঠামো যা আছে তাও তাক লাগার মত ধীরাপদর মনে আছে ঘর দেখাতে এনে সোনাবউদির দু চোখে আনন্দের বন্য দেখেছিল। রাজ-পুরুষের আমলে এটা নাকি ছিল মজলিস কোঠা। ভিতরের দরজা দিয়ে সঙ্গে একটা খুপরি ঘর। এটার তুলনায় বে-খাপ্পা ছোট। সোনা-বউদি আরো খুশি, এটা মজলিস ঘর আর ওটা কী?

ওটা কি বা কেন, ধীরাপদ ভাববার অবকাশ পায়নি তখনো। কি করেই বা পাবে, একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচাযের গঞ্জনায় আর ওর ছাত্রী পড়ানোর দাপটে নাজেহাল হয়ে আগের দিন মাত্র মজলিস ঘরের বাস তুলেছেন রমণী পণ্ডিত। আর তার পরদিনই গণুদা আর সোনাবউদিকে ঘর দেখাতে নিয়ে এসেছিল ধীরাপদ। সোনাবউদির আনন্দ দেখে তারও আনন্দ হয়েছিল। বলেছিল, এটা বোধ হয় রসদ-ঘর, মজলিসের রসদ মজুত থাকত।

এই রসদ-ঘর এখন গণুদার শয়ন-ঘর।

প্রথম দিন থেকেই সেই ব্যবস্থা সোনাবউদির। প্রস্তাবনাটা ধীরাপদ আজও

তোলেনি। গণুদার দিকে চেয়ে বেশ হালকা করেই বলেছিল, যেমন রসদই হোক যোগাচ্ছ যখন—তুমি ওই ঘরটাতেই থাকো।

যে ঘরে এতকাল থেকে এসেছে সে-তুলনায় ওই খুপরি ঘরও স্বর্গ। তবু এমন গড়ের মাঠের মত জায়গা পড়ে থাকতে তাকে ওখানে ঠেলার ব্যবস্থাটা গণুদার মনঃপূত হয়নি। মৃদু আপত্তিও করেছিল, এত জায়গা থাকতে আবার ওখানে কেন, ও-ঘরে জিনিসপত্র—

শেষ করে উঠতে পারেনি। কাচের সরঞ্জামগুলো মুছে মুছে সোনাবউদি তাকের ওপর তুলে রাখছিল। সেখান থেকেই ফিরে তাকিয়েছিল শুধু। গণুদা আমতা আমতা করে বলেছে, ও-ঘরটায় তেমন বাতাস লাগবে না বোধ হয়—

থাক্, আর বেশি বাতাস লাগিয়ে কাজ নেই—

ধীরাপদর চোখে চোখ পড়তে সোনাবউদি হেসে ফেলে তাড়া দিয়েছে, সং-এর মত দাঁড়িয়ে না থেকে একটু গোছগাছ করলেও তো পারেন!

একটু আগে বেশি ব্যস্ত হওয়ার জন্য তাড়া খেয়ে ধীরাপদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল।

সোনাবউদি ঘরনী পটু। এত বড় ঘরটাকে বেশ সুবিন্যস্ত ভাবে কাজে লাগিয়েছে। একটা দিক ভাগ করে নিয়ে গৃহস্থালি পেতেছে, অন্যদিকে নিজের আর ছেলেমেয়েদের শোবার জায়গা। মাঝখানটা ফাঁকা। তার ওধারে একফালি ঢাকা বারান্দায় রান্নার ব্যবস্থা।

ধীরাপদ ঘরে ঢুকল। এক কোণে ঘাড় গুঁজে মেয়ে উমারাণী হাতের লেখা মক্স করছে। ঘরের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে মুখ দিয়ে একটা কল্পিত এঞ্জিন চালাচ্ছে পাঁচ বছরের টুনু। আর তার পরের বাচ্চাটা দিদির পাশে বসে নিবিষ্টচিত্তে একখণ্ড কাগজ বহু খণ্ডে ভাগ করছে।

ওদিক ফিরে বসে সোনাবউদি বাটিতে দুধ ভাগ করছিল। কারো পদার্পণ অনুমান করেই ফিরে তাকালো। তোলা উনুনে ছোট জলের কেটলিটা চাপিয়ে দিয়ে ঘরে এসে মেয়েকে বলল, খেয়ে নে গে যা, ওদের নিয়ে যা—

ধীরাপদর দিকে ফিরল। আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?

না...।

সেই কখন থেকে তো উঠে বসে আছেন দেখলাম, এতক্ষণ কি করলেন?

আপনার প্রণামের ঘটা দেখে ভক্তিতত্ত্বের কূলকিনারা খুঁজছিলাম—

হেসে ফেলেও সামলে নিল। পেলেন?

না। চৌকির একধারে বসল সে।

পাপী-তাপী মানুষ, পাবেন কি করে—অমন শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, পায়ের ধুলো পাওয়াও ভাগ্যি—বসুন, চা করে আনি।

উনুনে কেটলি চাপাতে দেখে মনে মনে ধীরাপদ এই ভয়টাই করছিল। যতটা সম্ভব সহজভাবেই বাধা দিল চা থাক, কি কাজ আছে বলছিলেন?

দু বছরের মধ্যে সম্ভবত এই প্রথম চায়ে অরুচি। বাধা পেয়ে সোনাবউদি দাঁড়িয়ে গেল। প্রচ্ছন্ন কৌতুকাভাস।—চা থাকবে কেন, ক'টা দিন দিইনি বলে?

এই প্রসঙ্গ ধীরাপদ এড়াতে চেয়েছিল। আজ এই ঘরে আবার তার ডাক পড়াটা সহজভাবে নিতে পারেনি। নেওয়া সম্ভবও নয়। নয় বলেই বাইরের সহজতাটুকু বজায় রাখার তাগিদ। তাছাড়া, দিন তার একেবারে খারাপ যাচ্ছে না সে-রকম একটু আভাস সোনাবউদি পাক। নির্লিপ্ত জবাব দিল, কাল রাতের খাওয়াটা বড় বেশি হয়ে গেছে···এখনো ভার-ভার লাগছে।

সোনাবউদি সেখান থেকেই মেয়েকে নির্দেশ দিল চায়ের কেটলিটা উনুন থেকে নামিয়ে রাখতে। তারপর ঠোঁটের ডগায় হাসি চেপে বেশ সাদাসিধে-ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, কাল রাতের খাওয়াটা অমন বেশি হয়ে গেল কোথায়?

আর কথা বাড়াতে আপত্তি নেই ধীরাপদর।—অনেককাল বাদে এক দিদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তার ওখানে।

আপনার দিদি আছে জানতুম না তো!

নিজের দিদি নয়।

পাতানো দিদি? হেসে ফেলেও চট করেই গম্ভীর আবার। প্রাতরাশ শেষ করে ছেলেমেয়ে ঘরে ঢুকেছে। সোনাবউদি মেয়েকে আদেশ দিল বাপের খুপরি ঘরে বসে পড়তে। মায়ের মেজাজ মেয়ে ছেলে এমন কি ওই দু বছরের বাচ্চাটাও বুঝতে শিখেছে। বোনের সঙ্গে সঙ্গে তারাও সরে গেল। সোনাবউদির উৎফুল্ল হাসি তারপর।—আপনার যদি একটুও জ্ঞানগম্যি থাকত, পাতানো বউদি দেখেও শিক্ষা হল না, আবার পাতানো দিদি!

ধীরাপদ হাসিমুখেই জানিয়ে দিল, এ সম্পর্কটা তিরিশ বছর আগের। কি বলবেন বলুন, একটু বেরুব···

দিদির ওখানে যাবেন?

না।

ঈষৎ চিন্তিতমুখেই সোনাবউদি তাকে ডাকার কারণটা ব্যক্ত করল এবার।

বলল, এমন দিনেই ব্রত সাঙ্গ হল, সৎ ব্রাহ্মণ দুজন আহার করবেন, কিন্তু কাকে দিয়েই বা ব্যবস্থা করি··

ধীরাপদ অবাক।—ভটচায মশাই আর শিকদার মশাই?

মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যেত সোনাবউদির চিন্তাটা বাহ্যিক। বড় নিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিল, হ্যাঁ, কপালগুণে ওঁরাই আজ গোপাল ঠাকুর।

আমাকে গিয়ে নেমন্তন্ন করতে হবে?

তাকে আঁতকে উঠতে দেখে সোনাবউদি এবারে হেসেই ফেলল।—আপনার নেমন্তন্ন ওঁরা নেবেন কেন? সে কাজটা আপনার দাদা কাল রাতেই সেরে রেখেছে। কিন্তু বাজারটা করাই কাকে দিয়ে, আপনার আবার দিদি জুটে যাবে জানলে ব্রতটা আপাতত সাঙ্গ না করলেও হত।

ভোরবেলার ব্যাপারটা স্পষ্ট হল এতক্ষণে। সদাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে, ব্রত-পার্বণ পালন অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু দুর্বোধ্য লাগছে। দু বছরের মধ্যে কোনরকম আচার-অনুষ্ঠান দেখা দূরে থাক, এ-সবে মতি আছে বলেও মনে হয়নি কথনো।

কিসের ব্রত ছিল?

তোরঙ্গ থেকে টাকা বার করে এনে সোনাবউদি ঠাট্টার সুরেই ফিরে জিজ্ঞাসা করল, ক'টা ব্রত আপনার জানা আছে? নিন, আর দেরি করবেন না।

টাকা নিয়ে ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল। কি আনতে হবে?

হাতী ঘোড়া বাঘ ভালুক যা পান—হেসে ফেলল, যা ভালো বোঝেন আনবেন, নিন্দে না হলেই হল, আর একটু বেশি বেশিই আনবেন—

বাজার করা এই প্রথম নয়, সপ্তাহে তিন-চার দিনই করতে হত। কিন্তু টাকার সঙ্গে কি আনতে হবে না হবে তারও একটা চিরকুট থাকত সোনাবউদির। আজ নেমন্তন্নের দিনেও সেটা নেই কেন অনুমান করা খুব শক্ত নয়। বাজারের পথে যেতে যেতে ধীরাপদ সেই কথাই ভাবছিল। নির্ভরতা দেখালো। আজ অনেক কিছুই দেখিয়েছে সোনাবউদি। সকালে প্রণামের ঘটা, দুপুরে আবার ওই দুজনেরই নেমন্তন্ন। তাঁরা এখন থেকে তুষ্টই থাকবেন বোধ হয়। ধীরাপদ বাইরে শান্ত, কিন্তু ভিতরটা তার তুষ্ট নয় একটুও। তার সঙ্গে নতুন করে এই আপসের চেষ্টা কেন সোনাবউদির, সে-ও কি ওঁদেরই একজন? ডাকলে কাছে আসবে, ঠেলে দিলে দূরে সরে যাবে? সোনাবউদির ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সহজতার মুখোশটা আপনি খসে গেছে। কি করবে স্থির করে নিতে এক মুহূর্তও দেরি হয়নি।

বাজার নিয়ে কুঠি-সংলগ্ন দারোয়ানের পোড়ো ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। এখান থেকেও তাদের ঘর বেশ খানিকটা পথ। ডাকল, শুকলাল আছ?

মাঝ-বয়সী দারোয়ান শুকলাল তক্ষুনি বেরিয়ে এলো। নোমস্কার ধীরুবাবু, কি খোবর বলেন—

খবর ভালো, আমার বিশেষ তাড়া আছে, তুমি এগুলো একটু পৌঁছে দিয়ে এসো তো—

ওনেক বাজার দেখি! হৃষ্টচিত্তে শুকলাল থলে দুটো নিল। কোন্ ঘরে কার কাছে পৌঁছে দিতে হবে তার জানাই আছে।

নিশ্চিন্ত মনে ধীরাপদ বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল আবার। ভিতরে ভিতরে তারও এক ধরনের আনন্দ হচ্ছে বৈকি। বাজার পৌঁছে দিয়েই শুকলাল ফিরে আসবে না। রান্নার বারান্দার কাছেই গ্যাঁট হয়ে বসবে। বাজার দেখে তারিফ করবে। তাই থেকেই জিনিস-পত্রের দুর্মূল্যের কথা উঠবে, দিন-কালের কথা উঠবে। দুটো আলু একটা বেগুন একটুকরো কুমড়ো ইত্যাদি তার দিকে এগিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত ওঠার তাড়া দেখা যাবে না। মুখ ফুটে চাইবে না কিছু, দিলে বরং সলজ্জ আপত্তি জানিয়েই গ্রহণ করবে সেগুলো।

সে এসে বসলেই সোনাবউদি হাসে।

…আজ হাসবে?

ধীরাপদ খুশি হতে চেষ্টা করছে, তবু কোথায় অস্বস্তি একটুখানি। মাঝে মাঝে বিমনাও হয়ে পড়ছে। নিজের ওপরেই বিরক্ত হল সে, যা করেছে বেশ করেছে—ও নিয়ে আর মাথা ঘামানো কেন, তার এখন অনেক কাজ।

কাজের তাগিদে দ্রুত পা চালিয়ে দিল॥

কাজ বলতে বিজ্ঞাপন লেখার কাজ। সেও বাধাধরা কিছু নয়, যখন জোটে। আর বিজ্ঞাপন বলতেও ফলাও কোনো ব্যাপার নয়। ছোট ছোট দুটো কবিরাজের দোকান আর একটা পুরনো বইয়ের দোকানের সঙ্গে কি করে একদিন যোগাযোগ হয়েছিল আজ আর মনেও নেই। কবিরাজদের নতুন নতুন ঔষধ উদ্ভাবনে রোগ সারুক আর না সারুক, বিজ্ঞাপনের চটকে কাজ হয়। রোগীও তুষ্ট চিকিৎসকও তুষ্ট।

বিজ্ঞাপন আশা-সঞ্জীবনী।

বইয়ের দোকানের বিজ্ঞাপন লেখার কাজটা একটু অন্যরকমের হলেও মনে মনে ধীরাপদর সেটা আরো অপছন্দ। পুরনো বইয়ের দোকানে পুরনো

বই মেলেই—সেই সঙ্গে বটতলার কাগজে ছাপা রঙ-বেরঙের মলাট দেওয়া নতুন বইও মেলে অনেক। স্বর্গ-দরজার কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ার মত আচার-অনুষ্ঠান ক্রিয়া-কলাপ বিধি-বিধানের পুস্তিকাও আছে, আবার সম্মোহন বশীকরণ দেহ-বিজ্ঞান নব-যৌবনলাভের সুলভ তথ্যের রসদও মজুত। দোকানের মালিক নিজেই পছন্দ-মত লেখক সংগ্রহ করে সুযোগ সুবিধে-মত এ ধরনের দুই-একখানা করে বই ছেপে ফেলেন।

ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখতে হলে ওষুধ খেতে হয় না, কিন্তু বইয়ের বিজ্ঞাপন লিখতে হলে বইগুলো পড়তে হয়। এইজন্যই এ কাজটা ধীরাপদর ততো পছন্দ নয়। পড়ার পরে আর লিখতে মন সরে না। এখানকার বিজ্ঞাপন-স্ফুলিঙ্গের পতঙ্গ কারা সেও নিজের চোখেই দেখেছে। দেখে দেখে ধীরাপদর এক-এক সময় মনে হয়েছে, এই কালটাই ব্যাধিগ্রস্ত।

বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবু বলেন মন্দ না। আভাসে ইঙ্গিতে অনেকবার টসটসে জোরালো কিছু একটা লেখার প্রেরণা দিয়েছেন তাকে। জোরালো বিজ্ঞাপন নয়। জোরালো আর কিছু। শেষে হাল ছেড়ে বলেছেন, আপনাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না—আরে মশাই, যে মদ খায় সে খাবেই, এ দোকানে না পেলে অন্য দোকানে খাবে—কোথাও না পেলে নিজে তৈরি করে খাবে—তাহলে দোকান খুলে বসতে দোষ কি। আপনারই বা লিখতে আপত্তি কি?

স্বচ্ছ দৃষ্টি।

জোরালো অন্যকিছু না হোক, সে-দিন জোরালো বিজ্ঞাপন লিখে অন্তত দে-বাবুকে খুশি করেছিল ধীরাপদ।

মশাই যে! কবে ফিরলেন? প্রত্যাশী-জনের প্রতি অম্বিকা কবিরাজের স্বভাবসুলভ বিদ্রূপ।

ধীরাপদ আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করল, কাজ ছিল নাকি?

না। এই ছা-পোষা দোকানের কি আর কাজ—পাঁচজনে এসে জ্বালাতন করে, তবু পুরনো লোককে না খুঁজে পারিনে বলেই যত ঝামেলা—কাল একবার আসবেন।

অম্বিকা কবিরাজ ঘুরে বসলেন, যেন আর তার মুখদর্শনও করতে চান না।

ধীরাপদ বেরিয়ে এলো। এ-রকম অভ্যর্থনা গা-সওয়া। কাজ থাক বা না থাক, অনুগ্রহভাজনেরা দিনান্তে একবার এসে দেখা না দিয়ে গেলে তারা নিজেরাই একটু দুর্বল বোধ করেন বোধ হয়। বইয়ের দোকানের মালিক দে-

বাবুর অন্য অভিযোগ।—কাজ তো আছে মশাই, কিন্তু আপনাকে দিয়ে হবে কি না ভাবছি···আপনার লেখাগুলো বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে, আর তেমন টানছে না।

তারপর রয়ে সয়ে যে সুসংবাদ জ্ঞাপন করলেন তার মর্ম, এবারে যাকে বলে টাকা-বর্ষানো বই-ই বার করছেন তিনি—সরল যৌগিক ব্যায়ামের বই একখানা, মাইনর পাস বিদ্যে নিয়েও ও-বই অনুসরণ করলে মনের জোরে পাহাড় টলবে। ছাপা প্রায় আধাআধি শেষ, চারখানা মলাটের ওপর এবারে এমন কিছু লিখতে হবে যাতে একবার হাতে নিলে ও-বই আর হাত থেকে না নামে। আর খবরের কাগজের অনুকূল মন্তব্যও কিছু পাওয়া দরকার।—তারা লিখবে না কেন, এ তো আর খারাপ বই কিছু নয়, কি বলেন ?

গণুদার সহায়তায় একবার তার কি একটা বইয়ের দু লাইন সমালোচনা ধীরাপদ কাগজে বার করিয়েছিল। একটু নিরীহ রসিকতার লোভ ছাড়তে পারল না। বলল, তা লিখবে না কেন, ভালো বই-ই তো।···বিজ্ঞাপনের কাজটাও অন্য কাউকে দিয়েই করিয়ে দেখুন না, অন্যহাতে অন্যরকম তো কিছু হবেই।

ভুরু কুঁচকে ঝপ করে কাগজ-পত্রে মন দিলেন দে-বাবু। ধীরাপদ উঠে দাঁড়াতে মুখ তুললেন আবার।—ব্যবসায় নামলে পাঁচটা দিক ভাবতেই হয়, বুঝলেন ? সামনের হপ্তায় একবার আসবেন।

আপাতত পাঁচটা টাকা দেবেন ?

টাকা চাইলেই বিরক্তিতে মুখখানা যে রকম করে ফেলেন, অভ্যাসবশত দে-বাবু সেই রকমই করলেন প্রথম। সে শুধু মুহূর্তের জন্যে। এ-যাচনা অবাঞ্ছিত নয় খেয়াল হল বোধ হয়।—কথা শুনে তো মনে হচ্ছিল আপনার দু পকেট ভরতি টাকা !

কাঠের টেবিলের ড্রয়ার খুলে আধ-ময়লা একটা পাঁচ টাকার নোটই সামনে ফেলে দিলেন।

বাইরে এসে হাঁফ ফেলল ধীরাপদ। মুখে এঁরা যে যাই বলুন নিজের কদরটাও মনে মনে ভালই জানে সে। এত সস্তায় আর এমন মুখ বুজে কাজ করার লোকও সব সময় মেলে না। হঠাৎ চারুদির কথা মনে পড়তে হাসি পেয়ে গেল, সাহিত্য করা ছেড়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিল। সাহিত্য কোথায় এসে ঠেকেছে জানলে কি বলত ?

কাজ পাকা না পাক এদিকে এসে আরো দু-পাঁচটা দোকানে ঘোরে

সাধারণত। কিন্তু আজ আর ভালো লাগছে না। বেলা বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে জঠরের তাগিদও বাড়ছে।···সেই পরিচিত হোটেলেই যেতে হবে, নতুন করে আবার একটা ব্যবস্থাও করতে হবে। দশ বছরের পুরনো খদ্দের সে। সাত পয়সার 'মিল' দু বছর আগে ছ আনায় ঠেকেছিল। এই দু বছরে সেটা কতয় দাঁড়িয়েছে জানা নেই।

হোটেলের ম্যানেজার পুরনো খদ্দেরকে দেখেই চিনলেন। আদর-যত্নও করলেন একটু। পুরনো খদ্দেরের খাতিরে নিজে থেকেই দশ আনায় মিল রফা করলেন। আর, হৃদ্যতাসূচক রসিকতাও করলেন একটু, চেহারা-পত্র তো দিব্বি ফিরে গেছে আপনার, দেখেই মনে হয়েছিল বে-থা' করেছেন বুঝি।

খেতে বসে ধীরাপদ খাওয়ার তাগিদটা অনুভব করছে না তেমন। এ দু বছরে মুখ বদলে গেছে। আজ ভালো না লাগলেও দু দিন বাদে এই বেশ লাগবে। সে-জন্যে নয়, শুকলালের হাতে বাজার পাঠানোর পরের সেই অস্বস্তিটাই আবার উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। সোনাবউদি যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। এটুকু তাকে বোঝানো দরকারও ছিল। তা ছাড়া সে তো আর তার ব্রত-সাঙ্গর ব্রাহ্মণ নয়।

দু বেলার খাওয়াটা সোনাবউদির ওখানেই বরাদ্দ ছিল। ধীরাপদই বরং তাতে আপত্তি করেছিল প্রথম প্রথম। সোনাবউদি শোনেনি। বলেছে, যে টাকাটা আপনি খাওয়াব পিছনে খরচ করেন সেটা বরং আমাকে দেবেন। তার আগে অবশ্য হোটেলে সে কি খায় না খায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শুনে নিয়েছিল। আর বলেছিল, হোটেলের থেকে ভালো খাওয়াব, ভয় নেই।

প্রথম ক' মাস ছেলে পড়ানোর টাকা হাতে এলেই তার থেকে কুড়িটি করে টাকা সোনাবউদির হাতে দিয়েছে। সম্প্রতি গণুদার চাকরির মোড় ঘুরেছে হঠাৎ। সাংবাদিক রাজ্যের নতুন বিধি-ব্যবস্থার ফলে মাইনে রাতারাতি অনেক বেড়ে গেছে। প্রুফ রীডারও সাংবাদিকদের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু তখন বেশ অনটনই ছিল। ফলে সোনাবউদির মেজাজ বিগড়াতো প্রায়ই। গণুদাকে যে-ভাবে খোঁচা দিয়ে কথা বলত, এক-এক সময় ধীরাপদর এমনও মনে হয়েছে যে সেটা শুধু গণুদার উদ্দেশেই নয়। আর, সে-রকম একবার মনে হলে তার গ্লানিও কম নয়। এ-রকম দুই একবার শোনার পর ধীরাপদ ছেলে পড়ানোর তিরিশ টাকাই সোনাবউদির হাতে তুলে দিয়েছে। অনুপস্থিতির দরুন মাইনে দু-চার টাকা কাটান গেলে

পরে তাও উশুল করে দিয়েছে। বিজ্ঞাপন লিখে মাসে গড়পড়তা বিশ-পঁচিশটা টাকা আসেই।

প্রথমবার টাকা বেশি দেখে সোনাবউদি অবশ্য একটু অবাক হয়েছিল। তিরিশ টাকা কেন?

ধীরাপদ বলেছে, রাখুন না, তিরিশ টাকাই বা কি এমন…

সোনাবউদি খানিক তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল শুধু, আর কিছু বলে নি। আপত্তিও করেনি।

পরোক্ষেও অনটনের গঞ্জনা আর শুনতে হয়নি। এর থেকে সোনাবউদি যদি সরাসরি ওকে এসে বলত, ধীরুবাবু কুলিয়ে উঠতে পারছি না, আরো কিছু দিতে পারেন কি না দেখুন—ধীরাপদ খুশি হত। সেটা অনেক সহজ হত, সুশোভনও হত। তবু সে-গ্লানি কেটে যেতে দু দিনও লাগেনি। সুলতান কুঠির এই রঙ্গভূমিটুকুতে এ পর্যন্ত অনেক কৃপণতা দেখেছে, অনেক সংকীর্ণতা দেখেছে। সেখানে সোনাবউদির আসাটা উষর রিক্ততার মধ্যে একটুখানি সবুজের আভাসের মতন। নিজের অগোচরে অল্প আলোর আর অল্প কিছু মায়ায় ধীরাপদর শুকনো বুকের অনেকটাই ভরে উঠেছিল।

কিন্তু এক ধাক্কায় সব তছনছ হয়ে গেছে। ধীরাপদর মোহ ভেঙেছে। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই হেসেছে শেষ পর্যন্ত। যা হবার তাই হয়েছে, যা স্বাভাবিক তাই ঘটেছে। উপোসী মনের তাগিদে সে একটা মায়ার জাল বুনছিল শুধু। সেটা ছিঁড়েছে ভালই হয়েছে। ও মোহ তো রোগের মোহের মতই। আবার সে ওতে জড়াতে যাবে কেন? ফিরে আবার ডাকলেই বা সোনাবউদি।

খাওয়া অনেকক্ষণ সারা। হাতমুখ ধুয়ে বাইরের সরু বারান্দায় হাতল-ভাঙা একটা কাঠের চেয়ারে এসে বসল। পড়তি বেলায় হোটেলের কর্ম-ব্যস্ততা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

ধীরাপদও সুস্থ বোধ করছে একটু।

না, শুকলালের হাতে বাজার পাঠিয়ে দিয়ে সে কিছু অন্যায় করেনি। সোনাবউদির পরোক্ষ আমন্ত্রণ এ-ভাবে প্রত্যাখ্যান করাটা কিছুমাত্র অন্যায় হয়নি তার।

…সোনাবউদি নিজে একদিন তার সংসারে ডেকে নিয়েছিল তাকে। আর, বিদায় করেছে গণুদাকে দিয়ে।

বিদায় করেছে একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচাযের ভয়ে? আর

যে-ই বিশ্বাস করুক ধীরাপদ বিশ্বাস করে না। গণুদা বিশ্বাস করেছে কিন্তু ও করেনি। বক্তব্য পেশ করতে এসেও বিড়ম্বনার একশেষ গণুদার। তিনবার ঢোঁক গিলে তবে বক্তব্য শেষ করতে পেরেছে।···তোমার বউদির মেজাজ তো জান ভাই, একেবারে ক্ষেপে গেছে, আর এ-সব শুনলে কে-ই বা···পাঁচজনের সঙ্গে বাস, বুঝতেই তো পারছ · তোমাকে ভাই দু বেলার খাওয়ার ব্যবস্থাটা আবার···

আর বলার দরকার হয়নি। বলতে পারেওনি গণুদা।

কথা হচ্ছিল ধীরাপদর দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে। স্ত্রীর উদ্দেশে গণুদা হঠাৎই একটা হাঁক দিয়ে বসেছিল তারপর। কই গো, শুনছ—

আসবে ধীরাপদ ভাবেনি। কিন্তু সোনাবউদি দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর সেই থমথমে মুখের দিকে ধীরাপদ নির্দ্বিধায় তাকাতেও পেরেছিল। ডেকে ফেলে বরং একটু বিব্রতবোধ করেছিল গণুদা নিজেই।—ধীরুকে বুঝিয়ে বললাম সব, ও আপনজন বুঝবে না কেন! কই আজ ওকে চা দিলে না এখনো?

চায়ের বদলে দু চোখে আগুন ছড়িয়ে সোনাবউদি আবার ঘরে ঢুকে গেছে।

গণুদার ঘরনী ক্ষেপে যে গেছে সেটা নিজের চোখে দেখেও ধীরাপদ বিশ্বাস করেনি। করেনি কারণ, অনুভূতির রাজ্যে যুক্তি অচল। সেই অনুভূতির ইশারাটা অন্য-রকম। শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদারের রসনার বক্র আভাস শুরু হয়েছিল তাদের সংসারটিকে ওখানে এনে বসানোর দিন-কতকের মধ্যেই। সোনাবউদি সে-সব গায়ে মাখা দূরে থাক, হাসি-বিদ্রূপে নিজেই পঞ্চমুখী। বলেছে, তিন ছেলে-মেয়ের মা তাতে কি, মেয়েরা মেয়েই—কদর দেখুন একবার! চোখ পাকিয়ে তর্জ্জন করেছে, আপনি নাকি রমণী পণ্ডিতের ওই চৌদ্দ বছরের মেয়েটার দিকে পর্যন্ত চোখ দিয়েছিলেন? অ্যাঁ?

দু বছরে নিরুদ্‌বেগ-সম্প্রীতি বেড়েছে বই কমেনি। ওই শিকদার আর ভটচায মশাই বরং হাল ছেড়েছিলেন। বদ্ধ জলাতেই আলগা আগাছা পচে, কিন্তু স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে যায়। তাঁদেরও উদ্যম ফুরিয়েছিল। এত দিন পরে রাতারাতি হঠাৎ আবার তাঁরা এমন সবল হয়ে উঠলেন কোন্ মন্ত্রবলে? হলেও সোনাবউদি গণুদাকে দিয়ে এভাবে বলে পাঠাতো না। নিজেই এসে বলত। বলত, আর পারা গেল না ধীরুবাবু, এবার নিজের ব্যবস্থা নিজে দেখুন। সেই রকমই বাচন-বচন তার। আসলে যা ঘটেছে, সেটা কোনো

অপবাদের ভয় নয়। ভয় যা করে, সেটা আজ তার প্রণামের বহর দেখে আর বেছে ওই বৃদ্ধ দুটিকেই নেমন্তন্ন খাওয়ানোর ব্যবস্থা থেকে আরো ভালো করে বোঝা গেছে। এত সহজে এমন কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন সোনাবউদির দ্বারাই সম্ভব।

অপবাদ উপলক্ষ মাত্র আর কোনো হেতু আছে যা প্রকাশ্যে বলার মত নয়, যা ধীরাপদ অনেক ভেবেও সঠিক ঠাওর করে উঠতে পারেনি। যে স্থূল কারণটা বার বার মনে আসে সেটাই সত্যি বলে ভাবতে এখনো ভেতরটা টনটন করে ওঠে। গণুদার অনেক মাইনে বেড়েছে, অনটনের দুর্ভাবনা গেছে, বাইরের লোক এখন বাড়তি ঝামেলার মতই।·· এই কারণেই কি?

হোটেলে বিকেলের সাড়া জাগতে উঠে পড়ল। সন্ধ্যায় একেবারে ছেলে পড়ানো শেষ করে ঘরে ফিরবে। শীতকালের বেলা, দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হবে। ধীরাপদ চৌরঙ্গীর দিকে পা চালিয়ে দিল। অন্যমনস্ক তখনো। গণুদার চাকরির উন্নতিতে সে-ও মনে মনে খুশি হয়েছিল। সোনাবউদি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে ভাবতে হালকা লেগেছিল।

মায়ের কথা মনে পড়ে ধীরাপদর।

বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে পর্যন্ত পরিচয় ছিল না, ভালো করে একখানা চিঠি পড়ে উঠতে পারত না। বাবা তেমন বড় না হোক ভালো উকীল ছিল। আর সংসারেও প্রাচুর্য না থাক, অনটন ছিল না। সেই সংসার মা চালাতো। কিন্তু হিসেব-পত্র ঠিকমত রাখতে পারতো না, কি দিয়ে কি করছে না করছে সব সময় মনে থাকত না। ফলে এক-এক সময় বাবার ওকালতি-জেরায় পড়ে মাকে ফাঁপরে পড়তে হত। বাবা কখনো বিরক্ত হত, কখনো বা মায়ের বিদ্যে-বুদ্ধি নিয়ে প্রকাশ্যেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। এরই মধ্যে মফঃস্বল ইস্কুলের চাকরি খুইয়ে সপরিবারে কাকা তাদের ওখানেই এসে উঠেছিল। কাকিমাকে বোধ হয় আশ্বাস দিয়েছিল শহরে গেলেই চট করে কিছু একটা জুটে যাবে। কিন্তু শিগগীর জোটেনি। বাবা মুখে কিছু বলত না, কিন্তু মাসের খরচ ঠিক মত কুলিয়ে উঠতে না পারলে বেশ গম্ভীর হয়ে যেত। মা তার বিপরীত, কাকা কাকিমা এসে আছে এ-যেন তাদেরই অনুগ্রহ। কিন্তু ছেলেপুলে নিয়ে আর একজনের কাঁধে ভর করে অনুগ্রহ দেখানোর বাসনা কাকিমার অন্তত ছিল না। কাকাকে প্রায়ই গঞ্জনা দিত। অশান্তি আর খিটিরমিটির লেগেই থাকত দুজনায়। আর তাই শুনে মা কোথায় পালাবে ভেবে পেত না।

সেই অশান্তির অবসান হয়েছিল। দু মাস না যেতে কাকিমার মুখে হাসি

…কষা চাল…কটু চাল…বীটার রাইস! স্যাকরার ঠুকঠুক কামারের এক ঘা—বাংলা হয় না!

কিন্তু আর একটা কথাও ভাবছে সেই সঙ্গে। কথা ঠিক নয়, বিপরীত অনুভূতি। তেতো হোক কষা হোক কটু হোক—দুনিয়ায় বেঁচে থাকার শক্তিটাও বড় অদ্ভুত।

শীত করছে বেশ। ছোট বেলা, দেখতে দেখতে অন্ধকার। ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল, ছাত্র পড়ানো আছে। দূরের রাস্তায় আলো জ্বলছে, ওখানে পৌঁছুতে হলেও অন্ধকার মাঠ অনেকটা ভাঙতে হবে। দে-বাবুর পাঁচ টাকার বেশির ভাগই অবশিষ্ট আছে, ট্রামে-বাসে যাওয়া যাবে। কিন্তু ছেলে পড়ানোর নামে মাঠ ভেঙে ঐ রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছুতেও পা দুটোর বেজায় আপত্তি। তার ওপর শীত। শীত করছে মনে হতেই ধীরাপদ ধুপ করে বসে পড়ল আবার। এই অবস্থায় ছেলে পড়াতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। ঠাণ্ডায় সে হি-হি করবে আর ছেলেটা অবাক হবে। ভাববে হয়ত, মাস্টার ছেঁড়া চাদরটাও বেচে দিলে নাকি!

আজকের মতও থাক ছেলে পড়ানো। শীতের প্রতি কৃতজ্ঞ। মাসকাবারে সোনাবউদির হাতে তিরিশ টাকা গুনে দেবার তাগিদ তো আর নেই। নিশ্চিন্ত। ছেলে পড়াতে যাবে না ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডাটা আর তেমন কনকনে লাগছিল না। তবু বিবেকের কাছে চক্ষুলজ্জা আছে একটু—কাপড়ের খুঁটটা টেনে জামার ওপর দিয়েই গায়ে জড়িয়ে নিল। আর একটু বাদেই ওঠা যাবে, তাড়া নেই।

সোনাবউদি, না সোনাবউদি থাক। চারুদি। সকাল থেকে সোনাবউদির কাণ্ডকারখানায় চারুদিকে মনে পড়েনি। ঠিকানাপত্তর নিয়ে রেখেছে চারুদি, বার বার আসতে বলেছে আবার, সম্ভব হলে আজই যেতে বলে দিয়েছিল। ওইভাবে খেতে চাওয়ার ধাক্কা সামলে সহজ হবার জন্যে চারুদির সেই অন্তরঙ্গ আগ্রহ দেখে ধীরাপদ বেশ কৌতুক বোধ করেছিল মনে মনে। কালকের মত আজও অমনি একটা যোগাযোগ হয়ে গেলে কেমন হয়! শীতের সন্ধ্যার ধোঁয়াটে অন্ধকারে মাঠের মধ্যে একা ওকে এইভাবে বসে থাকতে দেখলে চারুদি আঁতকে উঠত বোধ হয়।

কিন্তু হঠাৎ আঁতকে উঠল ধীরাপদ নিজেই। গায়ের সমস্ত রোমে রোমে কাঁটা। এক ঝটকায় একেবারে উঠে দাঁড়াল সে। বিকৃত উত্তেজনায় বলে উঠল, কে? কে তুমি?

খানিক দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটি মেয়েই। না চারুদি নয়। ধীরাপদর হঠাৎ মনে হয়েছে প্রেতিনীর মত কেউ যেন। অন্ধকারে দশ হাত দূরেও ঠিকমত চোখ চলে না, কখন এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি।

জবাব না দিয়ে মেয়েটা কুণ্ঠিতচরণে আরো দু পা এগিয়ে এলো শুধু।

ধীরাপদ চিনল। বাস-স্টপের সেই ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটাই। ক্ষণিকের সঙ্গীর হাতে হাত মিলিয়ে কিছুক্ষণ আগে যে এইখান দিয়ে গেছে। স্বাভাবিক স্থলে এইটুকু এক মেয়েকে দেখে স্নায়ু এতটা বিড়ম্বিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অন্ধকার মাঠের মধ্যে হঠাৎ এই পরিস্থিতিতে পড়ে ধীরাপদ উত্তেজনা দমন করতে পারল না। বিকৃত রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কি চাই?

দ্বিধান্বিত কাতর আবেদন কানে এলো, রাস্তার ওই আলোর ধার পর্যন্ত একটু এগিয়ে দেবেন···

ওই তো আলো দেখা যাচ্ছে চলে যাও না, এগিয়ে দিতে হবে কেন?

অস্ফুট-জবাব শুনল, বড় অন্ধকার, অনেক রকম লোক থাকে···

ধীরাপদ আবারও রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠলো, অনেক-রকম লোক থাকলেও তোমার অসুবিধে কিসের?

তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে ফেরার জন্য নিজেই তাড়াতাড়ি পা বাড়াল। কিন্তু পাবল না। বিকেলে সঙ্গী-লাভের প্রগলভ চপলতা নয়, বাস-স্টপের সেই শুকনো মুখটাই মনে পড়ে। এই অন্ধকারে মুখ অবশ্য দেখতে পায়নি, তবু গলা শুনে সেই মুখই মনে পড়েছে।

ধীরাপদ ঘুরে দাঁড়াল। আমার পিছনে আসতে পারো—কোনরকম চালাকি করতে যেও না।

হনহনিয়ে মাঠ ভেঙে রাস্তার দিকে এগলো সে। একবারও ফিরে তাকালো না। তার সঙ্গ ধরে আসতে হলে মেয়েটাকে যে প্রায় ছুটতে হবে সে খেয়ালও নেই। স্নায়ুগুলি বশে আসেনি তখনো। অন্ধকারে কোনো লোক চোখে পড়েনি। চোখে পড়তে পারে সেভাবে চোখ ফেরায়ওনি কোনদিকে। অন্ধকাবের গর্ভবাস থেকে আলোব কাছে আসার এমন তাগিদ আর বুঝি কখনো অনুভব করেনি ধীরাপদ।

মাঠের ধারের দিকটা অত অন্ধকার নয়। খানিকটা পর্যন্ত রাস্তার আলো এসে পড়েছে। ধীরাপদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। উত্তেজনা কমে আসছে। গতি মন্থর হল। রাস্তার একটা লাইটপোস্টের কাছে এসে তারপর ঘুরে দাঁড়াল সে।

পিছনে পিছনে মেয়েটাও এসেছে। নির্ঝঞ্ঝাটে আসার তাড়নাতেই এসেছে। এসে হাঁপাচ্ছে। কিন্তু মুখের ওপর চোখ পড়তেই ধীরাপদ আবারও বেশ বড় রকমের ধাক্কা খেল একটা। মেয়েটা শুধু হাঁপাচ্ছে না, সেই সঙ্গে কাঁদছেও। কাঁদতে কাঁদতেই এসেছে। চোখের জলে মুখের উগ্র প্রসাধন থকথকে কুৎসিত দেখাচ্ছে। কুশ্রী মুখে জীবন ধারণের বিড়ম্বনা আর বুকভাঙা হতাশার ছাপ শুধু। ধীরাপদ চেয়েই রইল কিছুক্ষণ। তারপর এক নিমেষে বুঝল ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই, পসারিনীর পসারই শুধু লুঠ হয়েছে, দাম মেলেনি। এ ছাড়া অমন ভগ্ন-বিদীর্ণ হতাশার আর কোনো কারণ নেই।

ধীরাপদর সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলো যেন কাঁপছে আবারও। অন্ধকারের শ্বাপদ মানুষের হামলার ভয়ে মেয়েটা প্রাণের দায়েই ওর সঙ্গ নিয়েছে বোঝা যায়। মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়েছিল, এবারে মুখ তুলে তাকালো। একটু কৃতজ্ঞতা, আর সেই সঙ্গে একটু আশা। আশা নয়, আশার আকুতি। যেন আজকের মত বাঁচন-মরণটা তারই অনুকম্পার ওপর নির্ভর করছে। চোখের জলে ভেজা রঙ-পালিশ-করা মুখে হাল-ছাড়া ক্লান্তি।

নিজের অগোচরে ধীরাপদ পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল। দে-বাবুর দেওয়া টাকা কটা আঙুলে ঠেকেছিল। তারপরেই সচেতন হয়ে হাত বার করে নিয়েছে। এক ঝটকায় অনেক দূরে চলে এসেছে। কোথাও যাবার তাড়ায় যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছে সে। ভেতরে কেমন একটা আলোড়ন হচ্ছে, কিছুতে থামানো যাচ্ছে না। লোকজন আসছে যাচ্ছে, কারো দিকে কারো চোখ নেই। ধীরাপদ কি করবে? হাসবে হা-হা করে? নাকি এক-একজনকে ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করবে, মশাই, বীটার রাইস ছবিটা কোথায় হচ্ছে বলে দিতে পারেন!

সন্ধ্যা পেরুলেই সুলতান কুঠির রাত গভীর। কোনো ঘরেই ইলেকট্রিক নেই, লণ্ঠন ভরসা। তেল খরচ করে সেই লণ্ঠনও অকারণে জ্বালায় না কেউ। বড় বড় গাছগুলো আরো বেশি অন্ধকার ছড়ায়। অভ্যস্ত পা না হলে পায়ে পায়ে ঠোকর খেতে হয়।

কে, ধীরুবাবু নাকি?

ধীরাপদ অন্যমনস্ক ছিল বলেই চমকে উঠল। নইলে চমকাবার মত কেউ নয়, রমণী পণ্ডিতের গলা। কদমতলার বেঞ্চিতে বসে আছেন। অন্ধকারে বসে আছেন বলেই ওকে দেখতে পেয়েছেন, ধীরাপদর তাঁকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যক্তির সামনে এসে দাঁড়াল, এই ঠাণ্ডার বশে যে!

এমনি—ঘরে কি আর নিরিবিলিতে হাত-পা ছড়িয়ে দুদণ্ড বসার জো আছে!...তা এই ফিরলেন বুঝি, বেরিয়েছেন তো সেই সকালে!

হ্যাঁ।

বসবেন? বসুন না একটু, দুটো কথা কই, কি আর এমন ঠাণ্ডা—

সুলতান কুঠির এলাকায় বসে রমণী পণ্ডিত ইদানীংকালের মধ্যে ওর সঙ্গে গল্প করার বাসনা প্রকাশ করেছেন বলে মনে পড়ে না। রাতে একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচায নিজেদের ঘরের বাইরে গলা বাড়াবেন না এটুকুই ভরসা বোধ হয়। ধীরাপদ বলল, না আর বসব না, ঘরে যাই।

ও, আচ্ছা—খুব ক্লান্ত বুঝি? যান তাহলে, আর আটকাবো না।

কিন্তু একেবারে কিছু না বলার জন্যে ডাকেননি। ধীরাপদ ঘরের দিকে পা বাড়ানোর আগেই নিরর্থক হাসলেন, তারপর চাপা গলায় বললেন, ইয়ে—এদিকে তো আজ খুব ঘটা করে হঠাৎ এক ব্রত সাঙ্গ হল শুনলাম, ভটচায মশাই আর শিকদার মশাইকে খুব খাইয়েছেন নাকি। আবারও হাসলেন, এরণ্ডোঽপি ক্রমায়তে—যে রাজ্যে গাছ নেই সেখানে আড়গাছও গাছ—সুলতান কুঠিরেও ব্রাহ্মণ বলতে ওঁরাই। তা বলিহারী বুদ্ধি মশাই, ব্রত-টতর কথা কিছু জানতেন নাকি? গণুবাবুর সঙ্গে এত কথা...মানে কত সময় কথা হয়, ব্রত-টতর কথা তো কখনো শুনিনি। ধীরাপদকে নিস্পৃহ দেখে সামাল দিতে চেষ্টাও করলেন, অবশ্য নিন্দের কিছু নেই, আত্মানং সততং রক্ষেৎ—আত্মরক্ষা তো করতেই হবে, যে-ভাবে পিছনে লেগেছিলেন ওঁরা, তাছাড়া থাকতেও পারে ব্রত—কি বলেন?

কিছু না বলে ধীরাপদ ফেরার উদ্যোগ করলেন। কিন্তু রমণী পণ্ডিতের বক্তব্য শেষ হয়নি তখনো। সামনের দিকে আর একটু ঝুঁকে বললেন, আপনাকে আবার শোনাচ্ছি কি, আপনি তো সবই জানেন! আপনিই তো সকালে বাজার করে দিয়ে গেছেন শুনলাম, কে যেন বলছিল—শুকলাল! ব্যবসার জন্যে একটা ঘরের খোঁজ করার কথা বলতে গেছলাম শুকলালকে—ওই বলল। তা আপনারও তো তাহলে নেমন্তন্ন ছিল, অথচ ফিরলেন তো দেখি একেবারে সন্ধ্যা কাবার করে!

ধীরাপদ কিছু বলার আগেই সাগ্রহে আরো হাতখানেকে সরে এসে উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, জবাব দিলেন বুঝি? অ্যাঁ? বেশ করেছেন। আপনাকেও ওদের মতই হা-ভাতে ভেবেছে আর কি! হাত না দেখলেও কপাল দেখেই বুঝতে পারি আমি, আপনার অনেক হবে—আমার কথা মিলিয়ে

নেবেন একদিন। আচ্ছা ঘরে যান আপনি, আর বিরক্ত করব না, আমিও উঠব ভাবছি।

ঘরে ঢুকে ধীরাপদ হাঁপ ফেলে বাঁচল। কষ্ট করে আলো জ্বালার তেমন দরকার ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না। তবু ঘরে ঢুকেই কোণের হারিকেনটা জ্বেলে নিল। গড়ের মাঠের সেই অন্ধকার এখনো যেন চেপে বসে আছে। এখানকার এই অন্ধকারের জাত আলাদা অবশ্য, তবু অন্ধকার অন্ধকারই।

ভূমিশয্যা পাতাই আছে। পাতাই থাকে। সরাসরি কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ল। এখন শীত করছে বেশ।···বেচারা রমণী পণ্ডিত! দুটো লোককে নেমন্তন্ন করে এই একটা লোককে বাদ দিল কেন সোনাবউদি? ওর বদলে না হয় তাঁকেই বলত। সব জেনেশুনেই এ-রকম এক-একটা কাণ্ড করে সোনাবউদি। বললেই ঝামেলা চুকে যেত। ঘরের খোঁজে আর তাহলে শুকলালের কাছে যেতেন না ভদ্রলোক, এই ঠাণ্ডায় বাইরে বসে থাকতেন না! ক্ষোভ হতেই পারে, ওই অন্য দুজনের থেকে একটু ঠাণ্ডা মেজাজের বলে নেমন্তন্নের বেলাও অবহেলা!

দরজা ঠেলে সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল আট বছরের উমারাণী। ঘরের বাসিন্দাটি ফিরেছে টের পেয়ে শুভাগমন। রাতে তাড়াতাড়ি ফিরলেই ও গল্প শুনতে আসে। গত ক'টা দিনের মধ্যে আজই সকাল সকাল ফিরেছে ধীরাপদ। কিন্তু আজ যেন ঠিক গল্প শোনার তাগিদে আসা নয় উমারাণীর। ডাগর ডাগর চোখ দুটিতে কিছু একটা কৌতূহল চিক চিক করছে। মানুষটা চেয়ে আছে দেখেও সরাসরি একেবারেই বিছানায় না এসে একটু দূর থেকেই জিজ্ঞেসা করল, ধীরুকা ঘুমুচ্ছ নাকি?

ধীরাপদও প্রায় গম্ভীর মুখেই জবাব দিল, কি মনে হয়, ঘুমুচ্ছি?

না।

আয়, বোস্—

ইচ্ছে ষোল আনা, কিন্তু ঠিক যেন সাহসে কুলোচ্ছে না। ফিরে আধা-ভেজানো দরজার দিকে তাকালো একবার, তারপর আর একটু এগিয়ে এসে বলেই ফেলল, মা যদি বকে?

এইটুকু মেয়েও জানে কিছু একটা গোলযোগের ব্যাপার ঘটেছে। ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, মা বকবে কেন?

উমারাণীর আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। মাটির ধার ঘেঁষে শয্যায় এসে বসল। তারপর অনুযোগের সুরে বলল, তুমি যে আজ খুব খারাপ

কাজ করে ফেলেছ—

কথা বাড়ানো উচিত কি অনুচিত ভাবার আগেই পরের প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কি রকম খারাপ কাজ?

উমারাণী গড়গড় করে বলে গেল, তুমি খেতে এলে না, তাই মা-ও খেল না। বাবা তখন মাকে বকল আর মাও বাবাকে খুব বকল। বাবা তারপর অফিসে চলে গেল আর মা সমস্ত দিন না খেয়ে শুয়ে থাকল—কত খাবার হয়েছিল আজ জানো?

কাকা একটা ভালো রকমের ভোজ ফসকেছে এটুকুই বক্তব্য। কিন্তু শেষটুকু আর কানে যায়নি। সকালের সেই অস্বস্তিটাই মুহূর্তে দ্বিগুণ হয়ে উঠল। এ-রকম পরিস্থিতি দাঁড়াতে পারে ধীরাপদর কল্পনার বাইরে। বিব্রত বোধ করছে বলেই বিরক্ত আরো বেশি। নিজেরা ঝগড়াঝাঁটি করে যত খুশি না খেয়ে থাকুক, ওকে নিয়ে টানাটানি কেন?

মেয়েটাকে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে ধীরাপদ দরজার দিকে তাকাল। ···সোনাবউদি। গম্ভীর। মায়ের গা ঘেঁষেই মেয়ে ছুটে পালালো। সেইদিকেই চেয়ে ভুরু কোঁচকালো সোনাবউদি, মেয়ের যাওয়া দেখো না, যেন ওকে কেউ মারতে এলো—

ধীরাপদ গায়ে কম্বল জড়িয়ে উঠে বসল।

তার দিকে চোখ রেখে সোনাবউদি দরজার কাছ থেকে দুই এক পা এগিয়ে এলো। নিস্পৃহ গলায় জিজ্ঞাসা করল, আপনি কতক্ষণ?

এই ঠাণ্ডা চাউনি আর বাঁকা কণ্ঠস্বর ধীরাপদ চেনে। এরই থেকে মেজাজ-গতিক ভালই বোঝা যায়। কিন্তু মেজাজ সম্প্রতি ধীরাপদরও খুব ঠাণ্ডা নয়। তেমনি সংক্ষেপে জবাব দিল, এই তো···

আপনার সেই দিদির বাড়ি গেছলেন?

না। একটা জুতসই জবাব দিতে পারলে ভালো লাগত, তবু সে চেষ্টা না করে জবাবটাই দিল শুধু।

সোনাবউদির এবারের ব্যঙ্গোক্তি আগের থেকে একটু হালকা শোনালো। —আমি ভাবলাম আজও বুঝি দিদির ওখানে ভারি খাওয়া হয়ে গেল, তাই সাত-তাড়াতাড়ি এসে শুয়ে পড়েছেন, আর নড়তে চড়তে পারছেন না।

ধীরাপদ কথার পিঠে চট করে কথা কলাতে পারে না। এই একজনের সঙ্গে অন্তত পারে না। ভিতরে ভিতরে তপ্ত হলেও চুপচাপ বসে রইল।

কিন্তু মহিলা তারও আভাস পেল বোধ হয়। আরো হালকাভাবে ক্ষতর ওপর এবারে যেন নুন ছড়িয়ে দিল একপ্রস্থ।—আজ সকাল থেকে এ পর্যন্ত শুধ্ মাঠের হাওয়া খেয়েই কাটল তাহলে?

এইবারে জবাব দিল ধীরাপদ, বলল, হ্যাঁ, কিন্তু আপনার তো তাও জোটেনি শুনলাম—

কাজ হয়েছে। থতমত খেয়েছে একটু। হারিকেনের অল্প আলোয় মুখখানা কঠিন দেখাচ্ছে আবার।—ওই মুখপুড়ি মেয়ে বলে গেল বুঝি!

এক্ষুনি গিয়ে বোধ হয় মেয়েটার চুলের ঝুঁটি ধরবে। সেই দায়েই ধীরাপদ এবারে একটু রুক্ষ কণ্ঠেই বলল, মেয়েটার দোষ নেই, ওইটুকু মেয়ে—না বললেই বরং ভাবনার কথা হত। আপনাদের বোঝাপড়াটা এবার থেকে ওদের চোখ-কানের আড়ালেই করতে চেষ্টা করবেন।

সোনাবউদির মুখভাব বদলাল আবার। দুই চোখে ঈষৎ কৌতুকের ছায়া, ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মত। মেয়েটার ফাঁড়া কাটল বোধ হয়। চুপচাপ দেখল খানিক, তারপর লঘু বিদ্রূপের সুরেই বলল, পুরুষমানুষের ঠমক তো একটু-আধটু আছেই দেখি, তবু এমন অবস্থা কেন?

চকিতে মুখ তুলে তাকালো ধীরাপদ আর সঙ্গে সঙ্গে সুর পালটে সোনাবউদি ঝাঁজিয়ে উঠল প্রায়, দয়া করে উঠে হাত-মুখ ধোবেন না সব ড্রেনে ঢেলে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হব?

মুহূর্তে একটা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে ধীরাপদ একেবারে যেন হাবুডুবু খেতে লাগল। এইখানেই সোনাবউদির জিত আর এখানেই ধীরাপদর হেরেও আনন্দ। এইটুকু যেতে বসেছে বলেই যত যন্ত্রণা। তবু থাক, হৃদয়ের এ-বস্তুর ওপর আর ভরসা করে কাজ নেই। সেই লোভে ভিক্ষার গ্লানি। যাতনা কেমন মর্মে মর্মে জেনেছে। এই একটা দিনের ব্যাপার এক দিনেই শেষ হোক, মিছিমিছি তাকে উপলক্ষ করে আর একজনও না খেয়ে থাকবে কেন?

আপনি যান, আমি আসছি।

থাক অত কষ্ট করে কাজ নেই, এখানেই নিয়ে আসছি।

ধীরাপদ উঠে হাতমুখ ধোবার কথাও ভুলে গেল। আধ-ঘণ্টাখানেক বাদে সোনাবউদি আসন পেতে খাবার সাজিয়ে দিতে তাড়াতাড়ি উঠে হাতটা ধুয়ে এলো শুধু। আগে হলে এত খাবার দেখে খুশিতে আঁতকে উঠত। সবই গরম করে আনা হয়েছে, সেইজন্যও মহিলার একটু স্তুতি প্রাপ্য। কিন্তু

সহজ আলাপের চেষ্টা ছেড়ে ধীরাপদ মাথা গোঁজ করে খেতেই লাগল।

তাও অস্বস্তিকর। অদূরে বসে সোনাবউদি চুপচাপ দেখছে। খানিক বাদে ধীরাপদ সহজভাবেই খোঁজ নিতে চেষ্টা করল, আপনার নিমন্ত্রিতরা খেয়ে খুশি হলেন?

ওঁরা আপনার মত নয়, ষেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাস—খেয়েদেয়ে খুশি হয়ে আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেলেন।

ওদিকের গাম্ভীর্য তরল হয়েছে। ফলে ধীরাপদ নিজেও সহজ বোধ করল একটু। মুখের গরাস জঠরে চালান করে হাসি মুখেই বলল, ওঁদের আশীর্বাদ না হয় আপনার দরকার ছিল কিন্তু আমাকে নিয়ে এ-ভাবে টানা-হেঁচড়া কেন?

জবাবে সোনাবউদি চোখে চোখ রেখে একটু চুপ করে থেকে হাসি চাপতে চেষ্টা করল বোধ হয়। একটা ছদ্ম নিশ্বাস ফেলল তারপর। বলল, সখা যার সুদর্শন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ—

আহারের দিকেই ঝুঁকতে হল আবারও। সোনাবউদি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের মেয়ে। সুলতান কুঠিতে সংস্কৃত বুলি দুই একটা শকুনি ভটচায আর রমণী পণ্ডিতই আওড়ায়। কিন্তু সোনাবউদির বাংলা বচনের ভাণ্ডারটি বড় ছোট নয়। মেজাজ প্রসন্ন থাকলে কথায় কথায় ছড়া পাঁচালির ঘায়ে অনেককেই নাজেহাল করতে পারে। এমন অনেক শুনেছে ধীরাপদ। তবু আজ অবাক একটু, ওর আজকের আচরণে মহিলার শেষ পর্যন্ত খুশির কি কারণ ঘটল?

নিরীহ মুখে এবারে সোনাবউদিই জিজ্ঞাসা করল, ওঁদের আশীর্বাদ আমার দরকার ছিল কেন?

প্রণাম আর নেমন্তন্ন দেখে ভাবলাম—

হুঁ!

যে-ভাবে ভুরু কুঁচকে শব্দটা বার করল, তার সাদা অর্থ, বুদ্ধির দৌড় তো এই!

ধীরাপদর ঠিক বিশ্বাস হল না, তবু এ নিয়ে কথাও বাড়ালো না। হঠাৎ রমণী পণ্ডিতকেই মনে পড়ে গেল। বলল, যে জন্যেই নেমন্তন্ন করুন, আর এক বেচারীকেই বা বাদ দিলেন কেন? দুঃখ করছিল।

দু চোখ প্রায় কপালে তুলে ফেলল সোনাবউদি, কা'কে বাদ দিলুম, ওই বিটলে গণৎকারকে?

হ্যাঁ। এই ঠাণ্ডায়ও কদমতলায় বেঞ্চিতে চুপচাপ বসেছিলেন দেখলাম, মনে বড় লেগেছে।

শোনামাত্র চকিতে সোনাবউদি বাইরের অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। একটা দরজা ভেজানো ছিল, চোখের পলকে উঠে গিয়ে সেটাও সটান খুলে দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ধীরাপদ অবাক। বলল, এতক্ষণে উঠে গেছেন—

দরজা খোলা রেখেই সোনাবউদি ফিরে এলো। মুখ এরই মধ্যে গম্ভীর আবার। বলল, অন্দকারে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বাজি রাখছি, গিয়ে দেখে আসুন এখনো ঠিক বসে আছে—আপনাকে আসতে দেখেও উঠে যাবে! কতটা যত্ন-আত্তি করছি দেখবে না? জায়গা-মত জ্যোতিষী ফলাবে কি করে তাহলে? দেখুক, ভালো করে দেখুক।

রাগের মাথায়ও হেসেই ফেলল।—হাঁ করে দেখছেন কি? ফাঁক পেলেই পুকুরধারে ফিসফিস ফিসফিস—গণনায় চাকরির ডবল উন্নতিটা ফলেছে, স্ত্রীর অবনতিটাই বা ফলবে না কেন? মস্ত জ্যোতিষী যে! যত জ্বালা ঘরের জ্বালা, নইলে ওই দুই বুড়োকে আমি কেয়ার করি ভাবেন?

ধীরাপদ চেয়ে আছে আর হাঁ করেই আছে।

খাওয়া হয়ে গেছে। জায়গাটা মুছে দিয়ে থালা-বাটি নিয়ে সোনাবউদি চলে গেল। ধীরাপদও উঠেছে, হাতমুখ ধুয়ে আবার শয্যায় এসে বসেছে। কিন্তু বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত যেন তখনো।

এমন এক ওলট-পালটের মধ্যে গণুদার কথা তো একবারও মনে হয়নি তার। একটু স্বার্থপর হলেও সাদাসিধে মানুষ বলেই জানে। কিন্তু আসল ঘা'টা এসেছে সেখান থেকেই। তারই কান বিষিয়েছে রমণী পণ্ডিত!

তাই তো স্বাভাবিক, ধীরাপদ ভাবেনি কেন?

রমণী পণ্ডিত শোধ নিয়েছেন। ধীরাপদই তো চক্রান্ত করে কোণা-ঘরে ঠেলেছিল তাঁকে, ওই দুই বুড়োর কাছে নাজেহাল করে ঘর-ছাড়া করেছিল। রাগ আর তাঁর কার ওপর!

ভাবনায় ছেদ পড়ল। সোনাবউদি আবার এসেছে। হাত-কতক দূরে বসে ভণিতা বাদ দিয়ে সোজাসুজি বলল, কথা আছে মন দিয়ে শুনুন—

মন দিয়ে শোনার মত মনের অবস্থা নয়, ধীরাপদ তাকালো শুধু।

এ-ভাবে শরীর মাটি করে ক'টা দিন আর চলবে, কালই একটা কুকার কিনে নিন, কিছু শক্ত কাজ নয়, দুই-এক দিন দেখলেই পারবেন—এই টাকাটা রাখুন।

হাত বাড়িয়ে এক পুরনো খাম এগিয়ে দিল। সেটা নেওয়া দূরে থাক, শোনামাত্র ধীরাপদ সংকোচে তটস্থ।

খামটা সোনাবউদি তার কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, লজ্জা করতে হবে না, আমি দান-খয়রাত করতে বসিনি—ওটা আপনারই টাকা। মাস-খরচ বাবদ দশ টাকা করে বেশি দিতে শুরু করেছিলেন কেন, কথাবার্তাগুলো বিঁধত বুঝি? সেই টাকা সরিয়ে রেখেছি, আপনার কাছে থাকলে কি আর থাকত! অবশ্য আমারও খরচ হয়ে গেছে কিছু, দেড়শ' টাকা আছে ওখানে, গোটা তিরিশেক টাকা আপনি আরো পাবেন—

এত বড় ঘরে ওই লণ্ঠনের আলোটুকুও কি বড় বেশি জোরালো মনে হচ্ছে ধীরাপদর? দুই হাতে করে নিজের মুখটা ঢেকে ফেলতে ইচ্ছা করেছিল বার বার। নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হলে বিষম লজ্জা। যাবার আগে সোনাবউদি আবারও কুকারের সম্বন্ধে কি বলে গেল কানে ঢোকেনি।

একসময় খেয়াল হতে দেখে, শূন্য ঘরের শয্যায় স্থাণুর মত বসে আছে সে। উঠে আলো নিবিয়ে কম্বল টেনে সটান শুয়ে পড়ল। আর কোনো ভাবনা নয়, কিচ্ছু না। স্নায়ুর ওপর দিয়ে আজ অনেক ধকল গেছে, কাল ভাববে। কাল—

কিন্তু জোর করে ঘুমের চেষ্টা বিড়ম্বনা। বাইরে একটানা ঝিঁঝির ডাকে নৈশ স্তব্ধতা বাড়ছে। আর, ওর আচ্ছন্ন চেতনা যেন সজাগ হয়ে উঠছে ক্রমশ। রমণী পণ্ডিত ভুল বলেননি, সোনাবউদির ব্রত-টত কিছু নয়, কিন্তু ভুল তাঁর অন্যত্র হয়েছে। নেমন্তন্ন করে খাইয়ে শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদারের মুখ বন্ধ করতে চায়নি সোনাবউদি, মুখ বন্ধ করতে চেয়েছে রমণী পণ্ডিতেরই। শুধু গণুদার কানেই বিষ ঢেলে ক্ষান্ত হননি ভদ্রলোক, ওই দুজনকেও রসদ যুগিয়ে এবারে উনিই সক্রিয় করে তুলেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সেই জন্যেই অমন প্রণামের ঘটা আর সেইজন্যেই অমন অভিনব ব্যবস্থা!

...আর, সব কিছুই শুধু ওরই জন্য, শুধু ধীরাপদরই জন্য।

কম্বল ফেলে দিল। গরম লাগছে। ঘরের বাতাসও যেন কমে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে অস্বস্তি। বালিশের নিচে টাকার খামটা ··। হাতটা যেন পঙ্গু হয়ে ছিল, তুলে ওটা ফেরত দিতেও পারেনি। থেকে থেকে ওটাও যেন মাথায় বিঁধছে। ঘরের মধ্যে নিঃশব্দচারী কার যেন আনাগোনা।

কে? কে রে তুই? রণু?

বোবা আলোড়ন। ধীরাপদর মনে হল রণু এসে বসেছে তার শিয়রের কাছে। যেমন ও বসত তার রোগ-শয্যায়। মেরুদণ্ডে ঘুণ-ধরা রণু নয়, নিঃশঙ্ক তরতাজা। নিটোল দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দু চোখ টান করে চেয়ে রইল ধীরাপদ। কান পাতল। একটানা ঝিঁঝির ডাক, আর ফিসফিস জিজ্ঞাসা, কি হে, সোনাবউদি কেমন ?

॥ চার ॥

চিঠি এসেছে।

সুলতান কুঠিতে পিওনের পদার্পণ একেবারে নেই বলা ঠিক হবে না। মাসে এক-আধবার তাকে কুঠির আঙিনায় দেখা যায়। এলে সাধারণত রমণী পণ্ডিতের খোঁজ পড়ে। দু-চারটে জানা ঘর আছে, বিয়ের ঠিকুজি মেলানো বা দৈব সমাধানের এক-আধটা খোঁজখবর আসে তাঁর কাছে। খামে নয়, তিন নয়া পয়সা বা পাঁচ নয়া পয়সার পোস্টকার্ডই যথেষ্ট।

দু-চার মাস অন্তর একাদশী শিকদারের কাছেও আসে এক-আধখানা পোস্টকার্ডের চিঠি। ছেলে অন্যত্র কোথায় চাকরি করে। কোথায় থাকে বা কি চাকরি করে সেটা এক শিকদার মশাই ছাড়া আর কেউ জানে না বোধ হয়। তবে তাঁর একখানা চিঠি পিওনের ভুলে একবার নাকি রমণী পণ্ডিতের হাতেই পড়েছিল। সে-চিঠিতে প্রেরকের নাম-ঠিকানা ছিল না, শুধু তারিখ ছিল। তবে পোস্ট অফিসের ছাপটা নাকি চোখে পড়েছিল পণ্ডিতের। সেই চিঠি কলকাতা থেকেই এসেছিল। খেয়াল না করেই পণ্ডিত চিঠিখানা পড়ে ফেলেছিলেন, তিন-চার লাইন মাত্র বয়ান—'টানাটানির সময়, বেশি টাকা দেওয়া সম্ভব নয়, তবু এবারের মত কিছু বেশি দিতে চেষ্টা করব।'

মেয়ে কুমুকে পড়ানোর খাতিরের সময় সেই চিঠির সমাচার পণ্ডিত নিজেই সঙ্গোপনে ধীরাপদর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর ধারণা, ছেলে কলকাতাতেই থাকে, বছরান্তে একটা দিনও বুড়ো বাপ-মাকে দেখতে আসে না সেই লজ্জাতেই গোপন সেটা। তাঁর আরও ধারণা, মাসের গোড়ার দিকে এক-আধদিন ঘরে-কাচা জামা-কাপড় পরে শিকদার মশাইকে বেরুতে দেখা যায়—সেটা পোস্ট অফিসে গিয়ে টাকা আনার উদ্দেশ্যে নয়, ছেলের বাড়ি থেকে টাকা আনার উদ্দেশ্যেই। যাই হোক, এখানে প্রায়-অথর্ব গৃহিণী আর প্রৌঢ়া বিধবা কন্যা নিয়ে শিকদার মশাইয়ের সংসার। দেশ-খোয়ানো ভিটেমাটি বিক্রীর কিছু

পুঁজি তাঁর হাতে আছে। সে-প্রসঙ্গ অবান্তর, কথনো-সখনো পোস্টকার্ডে লেখা এক-আধটা চিঠি তিনিও পান, এটা ঠিক।

শকুনি ভটচাযের কাছে চিঠি লেখার নেই কেউ। তিনি শিকদার মশাইয়েরও বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর গোটা পরিবারটিই এখানে। বঙ্গচ্ছেদের আগে যজমানী করতেন কোথায়, ছেলেরাও চাকরি করতেন। গোলযোগের সূচনাতেই সব ছেড়েছুড়ে স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ-নাতি-নাতনী সহ এই কুঠিতে ঠাঁই নিয়েছেন। দুই ছেলেই প্রৌঢ় বয়সে শহরের উপকণ্ঠের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে কর্ম-জীবন শুরু করেছেন। এ ছাড়া প্রাইভেট ছেলে পড়ানোর কাজও তাঁরা সেখানেই জুটিয়ে নিয়েছেন। অতএব তাঁরা উষায় যান, নিশায় ফেরেন। ঘরে বৃদ্ধা গৃহিণী, পুত্রবধূ দুটি, এমন কি নাতনীরাও প্রায় অসূর্যম্পশ্যা। এ পরিবারে চিঠি আসার বালাই নেই।

এ-দিকের এলাকায় আর থাকল গণুদার সংসার। সেখানে শুধু সাইকেল পিওন আসে আর দুটি খবরের কাগজ আসে। আর কেউ না বা কিছু না।

কিন্তু যে চিঠি এসেছে সেটা রমণী পণ্ডিতের নয়, একাদশী শিকদারের নয়, বা গণুদার ঘরেরও নয়। সেই চিঠি ধীরাপদর। যার কাছে কেউ কোনদিন চিঠি আসতে দেখেনি।

পোস্টকার্ডএ লেখা চিঠি নয়, হালকা নীল শৌখিন খাম একটা।

ধীরাপদ বাড়ি ছিল না। নতুন-পুরনো বইএর দোকানের মালিক দে-বাবুর নতুন বইএর বিজ্ঞাপন লেখার তাগিদে সকালে উঠেই বেরিয়েছিল। ডাকপিওন চিঠি দিয়ে গেছে কদমতলায় শকুনি ভটচাযের হাতে। হুঁকো-পর্বের পরে প্রাক-গাত্রোত্থানের মুহূর্তে। সন্তর্পণে উল্টেপাল্টে দেখে সেটা তিনি শিকদার মশাইয়ের হাতে দিয়েছেন। এ-রকম একটা তকতকে খাম জীবনে তিনি হাতে করেছেন কিনা সন্দেহ। খামটা বাড়িয়ে দেবার সময় রমণী পণ্ডিত সাগ্রহে ঘাড় বাড়িয়ে কৌতূহল মেটাতে চেষ্টা করেছেন। ওদিকে একাদশী শিকদারের নীরব বিস্ময়ও ভটচায মশাইয়ের মতই।

ধীরাপদর ঘর বন্ধ ছিল, জানালা দিয়ে খামটা ভিতরে ফেলে দেওয়া যেত। শিকদার মশাই তা করলেন না। সোনাবউদিকে ডেকে চিঠিখানা তার হাতে দিলেন।—পাশের ঘরের বাবুর চিঠি, এলে দিয়ে দিও।

ধীরাপদর ফিরতে একটু বেলা হয়েছিল। তাড়াতাড়ি চান সেরে খেতে বেরুতে যাচ্ছিল সে। দিনের আহার সেই পুরনো হোটেলেই চলছিল।

কুকারের টাকাটা ধীরাপদ পরদিনই সোনাবউদিকে ফেরত দিতে গিয়েছিল। সোনাবউদি টাকা রাখেনি বা হোটেলে খাওয়া সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেনি। তারপর এ ক'দিনের মধ্যে আর চোখের দেখাও হয়নি।

সোনাবউদি চিঠি দিয়ে গেল। যেন প্রায়ই আসে এমনি চিঠি, আর প্রায়ই দিয়ে যায়—কোনো কৌতূহল নেই।

বিস্মিত নেত্রে খামের ওপর চোখ বুলিয়ে ধীরাপদ মুখ তুলে দেখে সোনাবউদি ততক্ষণে চৌকাঠ পেরিয়ে গেছে।

হোটেলের খাওয়া সেরে ঘরেই ফিরল আবার। অবাক সেও হয়েছে বটে। সেই রাতের পরে সত্যিই আবার চারুদি এমন অন্তরঙ্গভাবে যেতে লিখবে একবারও আশা করেনি। তার ঠিকানা অবশ্য রেখেছিল আর ড্রাইভার দিয়ে গাড়ি করে বাড়িও পৌঁছে দিয়েছিল। ধীরাপদ ভেবেছিল, সেই আন্তরিকতা শুধু চক্ষু-লজ্জার খাতিরে। নইলে ব্যবধান সে ভালই রচনা করে এসেছে। সমানে অসমানে করুণার সম্পর্ক, মিতালির নয়। চারুদির তুয়েতেই বাধবে।

কিন্তু এ-চিঠিতে না যাওয়ার দরুন অনুযোগ এবং অবিলম্বে আসার জন্য অনুরোধ। সতেরো-আঠারো বছর আগে হস্টেলের সেই ছাত্র-জীবনের সঙ্গে মেলে। অভিমান-বশে দিনকতক দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করলে যেমন তাগিদ আসত। সেই তাগিদের প্রতীক্ষাও করত তখন, কিন্তু আজ যাবে কোন্ মুখে? ক্ষুধার যে চিত্র দেখিয়ে এসেছে তাতে শুধু অহঙ্কার নয় আঘাত দেবার বাসনাও ছিল। সেটা চারুদির বুঝতে বাকি নেই। তবু ডাকাডাকি কেন?

বিকেলের দিকে বারান্দায় সোনাবউদির সঙ্গে আর একবার দেখা হয়ে গেল। তুধওয়ালা টাকার জন্য বসেছিল, টাকাটা মেটাতে এসে ওকে দেখে একটু যেন স্বস্তিবোধ করল।—হিসেবটা ঠিক হল কিনা দেখুন তো—

হিসেবের ব্যাপারে সোনাবউদি কোনদিনও চট করে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এ পর্যন্ত হিসেব-পত্র সব ধীরাপদই দেখে দিয়েছিল। এটা বোধ হয় গণ্দার করা।

ঠিক আছে—

তুধওয়ালাকে বিদায় করে সোনাবউদি ঘরমুখো হয়েও ফিরে দাঁড়াল। একটু থেমে আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, আপনার দিদি কি লিখলেন?

নীল শৌখিন খাম দেখেই ধীরাপদ অনুমান করেছিল চিঠি কার। এখন দেখছে, অনুমানটা শুধু তার একার নয়।

যেতে—

গেলেন না ?

জবাব না দিয়ে ধীরাপদ হাসল একটু। তার আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোনাবউদি আবার বলল, জামা-কাপড় কাচা নেই বুঝি ?···জামা তো গায়ে হবে না, ধুতি দিতে পারি। দেব ?

হাসি করুণা বিরাগ বিদ্রূপ কোন্‌টা কখন কার গায়ে এসে পড়ে ঠিক নেই। ধীরাপদ হেসেই জবাব দিল, গেলে এতেই হবে।

সোনাবউদি নিশ্চিন্ত যেন।—থামের বাহার দেখে আমি ভাবছিলাম হবে না বোধ হয়।

হাসি চেপে ঘরে ঢুকে গেল।

পরের ক'টা দিন ধীরাপদ একরকম ঘরে বসেই কাটিয়ে দিল। চারুদির চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও সেখানে ছুটে যাবার মত কোনো তাগিদ যে অনুভব করেনি সেটা সত্যি। এবারে সেখানে গেলে অনুকম্পা জুটবে হয়ত। সেটা বরদাস্ত হবে না। অনুগ্রহ দেখাবার মত সংগতি চারুদির আছে, অমন বাড়ি-গাড়িতেই প্রমাণ।···কিন্তু সে-সংগতি চারুদির এলো কোথা থেকে, কিসের বিনিময়ে ? ফুটপাথে বাস-স্টপের ধারে সেই মেয়েটা দাঁড়িয়ে থাকে যে-বিনিময়ের প্রত্যাশায়, তার সঙ্গে তফাত কতটুকু ? আঠারো বছর আগে যে-চারুদিকে হারিয়ে শূন্য হৃদয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরেছে একদিন, সেই চারুদি হারিয়েই গেছে। তাই চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও সেখানে যাবার চিন্তাটা ধীরাপদ বাতিল করে দিতে পেরেছে।

কিন্তু একদিন চারুদির হারানোটা যেমন অঘটন, আঠারো বছর বাদে গ্রামোফোন-রেডিওর দোকানের সামনে অপ্রত্যাশিত যোগাযোগটা যে তেমনই এক নতুন সূচনার ইঙ্গিত, সেটা জানত না। জানলে চিঠি পেয়েই ছুটত। আর, তাহলে বিব্রতও হত না এমন।

দুপুর গড়িয়ে সবে বিকেল তখন। শুয়ে শুয়ে ধীরাপদ একটা পুরনো বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিল, বইয়ের দোকানের দে-বাবু আর ওষুধের দোকানের অম্বিকা কবিরাজের সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে। আজও না গেলে দে-বাবু অন্তত মারমুখো হবেন।

সোনাবউদি এসে খবর দিল, আপনাকে বাইরে কে ডাকছেন দেখুন—

ধীরাপদ বই নামালো। খবরটা সাদাসিধে ভাবেই দিতে চেষ্টা করেছে সোনাবউদি, কিন্তু তার চোখে মুখে চাপা আগ্রহ। বইয়ের দোকানের

মে-বাবু আবার লোক পাঠালেন কিনা ভাবতে ভাবতে বাইরে এসেই ধীরাপদ একেবারে হতভম্ব।

কদমতলা ছাড়িয়ে অনতিদূরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে চারুদির ঝকঝকে মোটর গাড়িটা। পিছনের সীটএ চারুদি বসে, পাশে আর একটি অপরিচিত মূর্তি—সিগারেট টানছে। এদিকে বিস্ময়ে বিমূঢ় সুলতান কুঠির প্রায় সমস্ত বাসিন্দারা। মোটরের গা ঘেঁষে হাঁ করে চেয়ে দেখছে গণুদার মেয়ে আর বাচ্চা ছেলে দুটো, আর রমণী পণ্ডিতের ছোট ছেলেমেয়ের দঙ্গল। কদমতলার বেঞ্চির কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন রমণী পণ্ডিত, তাঁর খানিকটা তফাতে শকুনি ভটচায। অন্য মেয়ে-বউরা জানালাদরজা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। হুঁকো হাতে শিকদার মশাইও বেরিয়ে এসেছেন।

পরিস্থিতি দেখে ধীরাপদও হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

কি ব্যাপার?

এক লহমা তাকে দেখে নিয়ে চারুদি বললেন, ঠিকানাটা ঠিকই দিয়েছিলে তাহলে!

ধীরাপদ বিব্রত মুখে পিছনের দিকে ঘুরে তাকালো একবার। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষের জোড়া জোড়া চোখ এদিকেই আটক আছে। চারুদির পাশের সুদর্শন লোকটি কুশনে মাথা এলিয়ে সিগারেট টানছে আর পুরু চশমার ফাঁক দিয়ে আড়ে আড়ে কিছু যেন মজা দেখছে।

চারুদি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার চিটি পেয়েছিলে?

হ্যাঁ—মানে যাব ভাবছিলাম, কিন্তু তুমি হঠাৎ? বসবে?

না, জামা পরে এসো।

ধীরাপদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। নামলে কোথায়ই বা বসাতো। বলল, কি কাণ্ড, এই জন্যে তুমি নিজে কষ্ট করে এসেছ! তুমি যাও, আমি পরে যাব'খন—

আঃ! চারুদির মুখে সত্যিকারের বিরক্তি, সংয়ের মত বসে থাকতে পারছি না, তাড়াতাড়ি এসো।

অগত্যা জামা পরার জন্য তাড়াতাড়িই ঘরে আসতে হল তাকে। ভেবেছিল, দরজার আড়ালে সোনাবউদিকেও দেখবে। দেখল না। লোহার হুকে দুটো জামা ঝুলছে, দুটোই আধময়লা। তার একটা গায়ে চড়িয়ে চাদরটা জড়িয়ে নিল।

মোটর চলার রাস্তা নেই। এবড়োখেবড়ো উঠোন ভেঙে গাড়ি রাস্তায় পড়তে চারুদি সহজ ভাবে বললেন, তোমার এই বাড়ির লোকেরা বুঝি মেয়েদের গাড়ি চড়তে দেখেনি কখনো?

ধীরাপদ সামনে বসেছিল। পিছনের আসনেই তাকে জায়গা দেবার জন্যে চারুদি পাশের দিকে ঘেঁষে বসতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই সামনের দরজা খুলে ধীরাপদ সরাসরি ড্রাইভারের পাশের আসনে গিয়ে বসেছে। কথা শুনে ঘুরে তাকালো। হাসিমুখেই বলল, দেখেছে—গাড়ি চড়ে আমার কাছে আসতে দেখেনি কখনো।

চিঠি পেয়ে এলে না কেন? খুব জব্দ—

যেন ওকে জব্দ করবার জন্যেই তাঁর এই অভিনব আবির্ভাব। ধীরাপদ সামনের দিকে চোখ ফেরাল। চারুদির পাশের লোকটিকে আবারও দেখে নিয়েছে। আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বছর বত্রিশ-তেত্রিশ হবে বয়েস। পরনের স্যুটটা দামী হলেও ভাঁজ-ভাঙা আর জায়গায় জায়গায় দাগ-ধরা। মাথার একরাশ ঝাঁকড়া চুলে বহুদিন কাঁচি পড়েনি। মুখ নাক আর চওড়া কপালের তুলনায় চোখ দুটো একটু ছোট বোধ হয়। পুরু লেন্স-এর জন্যেও ছোট দেখাতে পারে।

ধীরাপদ মনে মনে প্রতীক্ষা করছে, ভব্যতা অনুযায়ী চারুদির এবারে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু চারুদি তা করলেন না। একটা লোককে জোরজার করে ধরে আনা হয়েছে তাই যেন ভুলে গেলেন। তাঁর পাশের সঙ্গীটির উদ্দেশেই এটা-সেটা বলতে লাগলেন তিনি। বলা ঠিক নয়, সব কথাতেই অনুযোগের সুর। সে আবার অফিসে ফিরবে কি না, ফেরা উচিত, কাজে-কর্মে একটুও মন নেই—সকলেই বলে। সকলের আর দোষ কি, খেয়াল-খুশিমত চললে বলবেই। কত বড় দায়িত্ব তার, এ-ভাবে চললে নিচের পাঁচজনও ফাঁকি দেবেই। তাছাড়া নিজের ভবিষ্যৎও ভাবা দরকার—

থামো, বাজে বোকো না—

সামনে থেকে ধীরাপদও সচকিত হয়ে উঠল একটু। এমন কি একবার ঘাড় না ফিরিয়েও পারল না। সেই থেকে নিরাসক্ত ভাবে বসে বসে সিগারেট টানাটা ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। উপেক্ষার মত লাগছিল। তাছাড়া চারুদির এমন অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি কে সেই বক্র কৌতূহলও ছিল। কিন্তু এই স্পষ্ট গম্ভীর বিরক্তির ফলে একটু যেন শ্রদ্ধা হল। ধীরাপদ ফিরে তাকাতে চারুদি হেসে ফেললেন, দেখেছ, ও সব সময় এমনি মেজাজ দেখায় আমাকে—

মেজাজ যে দেখায় তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি সেটা চারুদির খেয়াল নেই বোধ হয়। কিন্তু তাঁর উপদেশের ফলেই হোক বা যে কারণেই হোক, মেজাজীর মেজাজ তখনো অপ্রসন্নই মনে হল। প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করতে করতে আবারও অসহিষ্ণুতা জ্ঞাপন করল, কি বাজে বকছ সেই থেকে!

ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে থাকা অশোভন। ড্রাইভারের সামনের ছোট আর্শিতে চারুদিকে দেখা যায়, পার্শ্ববর্তীর একাংশও। চারুদি থপ করে তার হাত থেকে সিগারেটটা টেনে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলেন।—ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সারা গায়ে গন্ধ হয়ে গেল—আমি তো বাজেই বকি সব সময়, বাজে কথা শোনার জন্য আমার সঙ্গে আসতে তোকে কে সেধেছিল?

লোকটা কে না জানলেও ধীরাপদর কৌতুহল এক দফা পাক-মুক্ত হয়ে গেল। উপদেশ বা অনুযোগের অধ্যায়ে চারুদি 'তুমি' করে বলছিলেন। এবারের বাৎসল্য-সিক্ত ব্যতিক্রমটা কানে আসতে ধীবাপদ সুস্থ নিঃশ্বাস ফেলল। প্যাকেটে আর সিগারেট ছিল না, কারণ শূন্য প্যাকেটটা বাইরে নিক্ষেপ করা হল টের পেল। আর্শিতে শুধু চারুদিকেই দেখা যাচ্ছে এখন, পিছন ফিরে না তাকিয়েও ধীরাপদ অনুভব করল, বাৎসল্যের পাত্রটি তার দিকের জানালা ঘেঁষে ঘুরে বসেছে। অর্থাৎ চারুদির কথার পিঠে কথা বলার অভিলাষ নেই।

সেদিন রাতের অভ্যর্থনায় চারুদি অতিশয়োক্তি করেননি। দিনের আলোয় তাঁর বাড়িটা ছবির মতই দেখতে। ঝকঝকে সাদা ছোট্ট বাড়ি। দু'দিকের ফুলবাগানে বেশির ভাগই লালচে ফুল। ফটক থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত লাল মাটির রাস্তা।

বাসায় ঘরে চারুদির প্রতীক্ষায় এক ভদ্রলোক বসে। অবাঙালী, বোধ হয় পার্শী। তাঁকে দেখেই চারুদি ভয়ানক খুশি। বলে উঠলেন, কি আশ্চর্য, আপনি কতক্ষণ? আমার তো খেয়ালই ছিল না, অথচ ক'দিন ধরে শুধু আপনার কথাই ভেবেছি।

চারুদির মুখে পরিষ্কার ইংরেজি শুনে ধীরাপদ মনে মনে অবাক একটু। মনে পড়ে চারুদি ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন বটে, কিন্তু শুধু সেটুকুর দ্বারা এমন অভ্যস্ত বাক-বিনিময় সম্ভব নয়।

—বোসো ধীরু বোসো, অমিত বোসো। নিজেও একটা সোফায় আসন

নিয়ে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গেই আলাপে মগ্ন হলেন চারুদি। ভদ্রলোক ফুলের সমঝদার এবং ফুল-সমস্যা সমাধানে বিশেষজ্ঞ বোঝা গেল। কারণ, রোগী যেমন করে চিকিৎসকের কাছে স্বাস্থ্য-সমাচার জ্ঞাপন করে, চারুদি তেমনি করেই তাঁর ফুল আর ফুল-বাগানের সমাচার শোনাতে লাগলেন।—ডালিয়া তেমন বড় হচ্ছে না, আরো সর্বনেশে কাণ্ড পাতাগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে। আর স্ন্যাপ ড্রাগন নিয়ে হয়েছে এক জ্বালা, শুটগুলো গলা বাড়িয়ে লম্বা হচ্ছে বলে মোটেই ভর-ভরতি দেখাচ্ছে না। প্যান্‌জি? চমৎকার হয়েছে, দেখাচ্ছি চলুন—মিকি মাউসের মত কান উঁচু উঁচু করে আছে সব!···ফ্লক্স হয়েছে তো ভালো কিন্তু সব রঙে মিলেমিশে একেবারে খিচুড়ি—আলাদা আলাদা রঙের চারা যোগাড় করা যায় না? পপির তো বেশ আলাদা আলাদা রঙের বেড হয়েছে। ক্রিসেনথিমাম খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু সারাক্ষণই পোকার ভয়ে অস্থির আমি!

আশঙ্কায় চারুদির দেহে সুচারু শিহরণ একটু। ধীরাপদ হাঁ করে শুনছিল আর তাঁকে দেখছিল। বলার ধরনে সমস্যাগুলো তার কাছেও সমস্যার মতই লাগছিল। কাঁটা বিনা কমল নেই আর কলঙ্ক বিনা চাঁদ নেই। কাঁটা আর কলঙ্ক না থাকলে চারুদির গতি কি হত!

মোটরের সিগারেটখোর কোট-প্যাণ্ট পরা সঙ্গীটি সোফায় শরীর এলিয়ে একটা রঙচঙা ইংরেজি সাপ্তাহিকে মুখ ঢেকেছে। একটু আগে চারুদির মুখে নাম শুনেছে অমিত। হাবভাবে মিতাচারের লক্ষণ কমই। অসহিষ্ণু বিরক্তিতে এক-একবার চোখ থেকে সাপ্তাহিক নামাচ্ছে, তুই-এক কথা শুনছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে—তারপর আবার মুখ ঢেকে সাপ্তাহিকের পাতা ওলটাচ্ছে।

কিন্তু চারুদি তাঁর ফুল আর ফুলবাগান নিয়ে হাবুডুবু। তাদের বসতে বলে ফুল-বিশেষজ্ঞটিকে নিয়ে বাগান পর্যবেক্ষণে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতের সাপ্তাহিক চটাস করে সামনের সেণ্টার টেবিলের ওপর পড়ল। ধীরাপদ সচকিত। লোকটা উঠে বই-ভরা কাচের আলমারির সামনে দাঁড়াল, ঝুঁকে ভিতরের বইগুলো দেখল খানিক। ঝুঁকতে হবে, কারণ তার মাথা আলমারির মাথার সমান। কিন্তু একটা বইয়ের নামও পড়ল না। পাশের ছোট টেবিলে সাজানো ঝকঝকে অতিকায় কড়ি আর শামুকের খোলটা উল্টেপাল্টে দেখল একবার। আবার এসে ধুপ করে সোফায় বসল। অসহিষ্ণুতা নয়নাভিরাম।

আপনার নামটা কি?

আচমকা প্রশ্নটার জন্য ধীরাপদ প্রস্তুত ছিল না। নাম বলল।

চারু মাসি আপনার দিদি ?

চারুদি বলেছে বোধ হয়, কিন্তু বললে আবার এ কেমনধারা জিজ্ঞাসা ! ধীরাপদর মুশকিল কম নয়। বলল, অনেকটা সেই রকমই···

লোকটির দু চোখ নিঃশব্দে তার মুখের ওপর থেমে রইল খানিক। তারপর বলল, আমার নাম অমিত। অমিতাভ ঘোষ। আপনার দিদি আমার মাসি, নিজের মাসি নয়, অনেকটা সেই রকমই··

সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাসিতে ঘরের আসবাবপত্রগুলো পর্যন্ত যেন সজাগ হয়ে উঠল। এমন কৌতুক-ঝরা হাড়-নড়ানো হাসি ধীরাপদ কমই শুনেছে। এই লোক এমন হাসতে পারে একদণ্ড আগেও মনে হয়নি।

কিন্তু তখনো শেষ হয়নি। একটু সামলে আবার বলল, আপনি হলেন তাহলে মামা, মানে অনেকটা সেই রকমই···

সঙ্গে সঙ্গে আবার। এবারের হাসিটা আরো উচ্চগ্রামের অথচ শ্রুতিকটু নয়। ধীরাপদও হাসতে চেষ্টা করছে। লোকটা বুদ্ধিমান তো বটেই, বেপরোয়া রসিকও। অমিত নয়, অমিতাভ···তেজোময়। হাসির তেজটা অদ্ভুত বিষম।

হাসি থামতে সচিত্র সাপ্তাহিকটা হাতে তুলে নিল আবার। অন্য হাতে কোটের এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াতে লাগল।—আপনার কাছে সিগারেট আছে ?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, নেই। কেমন মনে হল, থাকলে ভালো হত।

একেবারে চুপ। একটু আগে অমন বিষম হেসেছে কে বলবে ! ফলে ঘরটাই যেন গম্ভীর। ধীরাপদ আড়চোখে তাকালো, পড়ছেও না, ছবিও দেখছে না—শুধু চোখ দুটোকে আটকে রেখেছে। খানিক আগের সেই প্রচ্ছন্ন অসহিষ্ণুতার পুনরাভাস।

কাগজখানা নামিয়ে ভিতরের দরজার দিকে চেয়ে হঠাৎ হাঁক পাড়ল, পার্বতী—!

সঙ্গে সঙ্গে কাগজ হাতেই উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে গলার স্বর আরো চড়িয়ে দিল, পার্বতী !

সোফায় ফিসে এসে কাগজ খুলল।

আবার কোন্ প্রহসনের সূচনা কে জানে ? যাকে ডাকা হল ধীরাপদ তার কথা ভুলেই গিয়েছিল এতক্ষণ। সেদিনের পরিবেশন করে খাওয়ানোটা ভোলার কথা নয়।

দু হাতে একটা চায়ের ট্রে নিয়ে খানিক বাদে পার্বতীর প্রায় যান্ত্রিক

আবির্ভাব। ট্রেতে দু পেয়ালা চা। দিনের আলোতেও আজ তেমন কালো লাগছে না, পরনের শাড়িটা বেশ ফর্সা। আজও ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ধীরাপদর মনে হল, গৃহ পুরুষশূন্য হলেও চারুদি নিরাপদই বটেন। আঁটসাঁট বসনের শাসনে এই তনু-মাধুর্য ভারাবনত নয় একটুও, যৌবনের এ বিদ্রোহে পার্বত্য গাম্ভীর্য। প্রভাব আছে, ইশারা নেই।

ট্রে-সুদ্ধ আগে অমিত ঘোষের সামনে এসে দাঁড়াল। সে-ই কাছে ছিল। কিন্তু চায়ের বদলে সে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। চেয়ে যে আছে তাও ঠিক খেয়াল নেই যেন।

মেয়েটা ভাবলেশশূন্য। দাঁড়িয়ে আছে পটের মূর্তির মত। ফিরে চেয়ে আছে সে-ও, কিন্তু সে চোখে কোনো ভাষা নেই। চায়ের ট্রে-টা যন্ত্রচালিতের মতই আর একটু এগিয়ে ধরল শুধু। এইবার ঈষৎ ব্যস্ততায় অমিতাভ ঘোষ ট্রে থেকে চায়েব পেয়ালা তুলে নিল।

দ্বিতীয় পেয়ালাটা ধীরাপদকে দিয়ে পার্বতী এক হাতে শূন্য ট্রে-টা ঝুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। দু-চার মুহূর্তের প্রতীক্ষা। কিন্তু গভীর মনোযোগে অমিতাভ ঘোষ চা-পানে রত। যেন শুধু এইজন্যেই একটু আগে অমন হাঁক-ডাক করে উঠেছিল। মন্থর পায়ে পার্বতী ভিতরে চলে গেল।

চুপচাপ চা পান চলল। ধীবাপদ ভাবছে, চারুদি কতক্ষণে ফিরবে কে জানে ?

পার্বতী!

ধীরাপদ চমকেই উঠেছিল এবারে। কি ব্যাপার আবার, চিনি চাই না দুধ চাই ? কিন্তু চায়ের পেয়ালা তো খালি ওদিকে !

পার্বতী এলো। এবারে খালি হাতেই। তেমনি অভিব্যক্তিশূন্য নীরব প্রতীক্ষা।

ড্রাইভারকে বলো এক প্যাকেট সিগারেট এনে দেবে। পেয়ালা রেখে আবার সাপ্তাহিক পত্র হাতে নিয়েছে।

ড্রাইভার নেই।

ও। মুখ তুলে তাকালো, সমস্যাটার সমাধান যেন নিশ্চল রমণী-মূর্তির মুখেই লেখা।

পার্বতী চলে গেল, যাবার আগে পেয়ালা দুটো তুলে নিল। পাছে এবার আবার ওর সঙ্গেই ভদ্রলোকের আলাপের বাসনা জাগে সেই ভয়ে ধীরাপদ মুখ ফিরিয়ে দূর থেকেই কাচের আলমারির বইগুলো নিরীক্ষণ করতে লাগল।

পার্বতী !

ধীরাপদ ততস্থ। সেদিন চারুদির মুখে শোনা, একজনের সঙ্গে পার্বতীর ডাব-কাটা দা হাতে দেখা করতে এগনোর কথাটাই কেন জানি মনে পড়ে গেল।

এবারে মেয়েটা কাছে এসে দাঁড়ানোর আগেই হুকুম হল, সেদিন ক্যামেরাটা ফেলে গেছলাম, এনে দাও।

আবার প্রত্যাবর্তন এবং একটু বাদেই ক্যামেরা হাতে আগমন। ক্যামেরাটা ছোট হলেও দামী বোঝা যায়। সামনের সেণ্টার টেবিলে সেটা রেখে পার্বতীর পুনর্প্রস্থান। ও-মুখে ভাব-বিকার নেই একটুও—বিরক্তিরও না, তুষ্টিরও না।

পার্বতী— !

ধীরাপদ কি উঠে পালাবে এবার ? বাইরে চারুদির বাগান দেখবে গিয়ে ? এ কার সঙ্গে বসিয়ে রেখে গেল চাকদি তাকে ? আড়চোখে তাকালো একবার, ছবি তোলার জন্মে ডাকেনি বোধ হয়, চামড়ার কেসের মধ্যে ক্যামেরাটা সেণ্টাব টেবিলের ওপরেই পড়ে আছে।

পার্বতী !

তার আগেই পার্বতী এসেছে। না হাতে লাঠিসোঁটা বা ডাব-কাটা দা নয়, ছোট মোড়া একটা। অন্ত হাতে বোনার সরঞ্জাম। মোড়াটা ঘরের মধ্যেই দরজার কাছাকাছি রেখে এগিয়ে এলো। হাতে শুধু বোনার সরঞ্জামই নয়, এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা দেশলাইও। সে-হুটো সোফার হাতলে রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল একটু।

ধীরাপদ মনে মনে বিস্মিত, ড্রাইভার তো নেই, এরই মধ্যে সিগারেট এলো কোথেকে ? যে মার্কার সিগারেটের শূন্য প্যাকেট মোটরের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখেছিল সেই সিগারেটই।

এবারের আহ্বানটা কেন সেটা আর বোঝা গেল না। লোকটার দু হাতের মোটা মোটা আঙুলগুলি সিগারেটের প্যাকেট খোলায় তৎপর। সিগারেট কোথা থেকে বা কি করে এলো চোখে-মুখে সে-প্রশ্নের চিহ্নও নেই। ধীরেসুস্থে পার্বতী মোড়ায় গিয়ে বসল, একবার শুধু মুখ তুলে নির্বিকার চোখ দুটো ধীরাপদর মুখের ওপর রাখল। তারপর মাথা নিচু করে বোনায় মন দিল।

ধীরাপদ আশা করছিল, ওই রমণী-মুখের পালিশ করা নির্লিপ্ততার তলায় কৌতুকের ছায়া একটু দেখা যাবেই। আর একটু সংকোচের আভাসও। ঘরের মধ্যে মোড়া এনে বসার একটাই অর্থ, ডাকাডাকি বন্ধ হোক।

কিন্তু কিছুই দেখলো না ধীরাপদ, না কৌতুক না সংকোচ। একেবারে

স্থির, অচল—পার্বত্য। এমনটা সেই রাত্রিতেও দেখেনি। বোনায় ওপর কাঁটা-ধরা আঙুল ক'টা নড়ছে, তাও যেন কলের মতই। অস্থির রোগীকে শান্ত করার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন কিছু একটা ব্যবস্থা করে, ঘরের মধ্যে মোড়া এনে বসাটা তেমনিই একটা ব্যবস্থা যেন।

ব্যবস্থায় কাজও হল। ডাকাডাকি বন্ধ হল।···শান্ত একাগ্রতায় সিগারেট টানছে লোকটা, ধীরেসুস্থে সাপ্তাহিকের পাতা ওলটাচ্ছে, অলস চোখে বোনা দেখছে খানিক, সোফায় মাথা রেখে ঘরের ছাদও দেখছে।

এই নীরব নাটক আরো কতক্ষণ চলত বলা যায় না। দু হাত বোঝাই নানা রকমের ফুল নিয়ে মালী ঘরে ঢুকতে ছেদ পড়ল। কর্ত্রী বাগান থেকে তুলে পাঠিয়েছেন বোধ হয়। কিছু না বলে ফুলসহ সে পার্বতীর কাছে এসে দাঁড়াল। পার্বতী ইশারায় ভিতরে যেতে বলল তাকে। তারপর মোড়াটা তুলে নিয়ে সেও অনুসরণ করল।

অমিতাভ ঘোষ সিগারেটের শেষটুকু শেষ করে অ্যাশপটে গুঁজল। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে শলাই আর প্যাকেট পকেটে ফেলল। তারপর ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যে বসে আছে, তাকে কোনরকম সম্ভাষণ জানানোও প্রয়োজন বোধ করল না।

ধীরাপদ এতক্ষণ যা দেখেছে সে-তুলনায় এ আর তেমন বিসদৃশ লাগল না। আরো আশ্চর্য, এতক্ষণের এই কাণ্ডটা নীতিগতভাবে একবারও অশোভন মনে হয়নি তার। অবাকই হয়েছে শুধু। লোকটার অদ্ভুত আচরণ কতটা বাহ্যিক তাও খুঁটিয়ে দেখতে ছাড়েনি। ওর চোখে ফাঁকি দেবে এমন নিপুণ অভিনেতা মনে হয় না। ধীরাপদ রোগ-নির্ণয় করে ফেলল, হেড কেস্···বড়লোকের মজার হেড-কেস্!

কিন্তু তা সত্ত্বেও কৌতূহল একটু থেকেই গেল।

চারুদি একাই ঘরে ঢুকলেন, ফুল-এক্সপার্ট বাগান থেকেই বিদাই নিয়েছেন। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির ফলে চারুদি বেশ শ্রান্ত। ধীরাপদকে একলা বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, অমিত কোথায়, ভিতরে?

না, এই তো চলে গেলেন।

চলে গেল! সোফায় বসে পড়ে বললেন, ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এখানে কি হাতের কাছে ট্যাক্সি পাবে, না ট্রাম-বাস পাবে! যাকে বলছেন তার সঙ্গে, যে চলে গেল তার কোনো যোগ বা পরিচয় নেই মনে হতেই বোধ হয় প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন।—তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে

রাখঅাম, চা দিয়েছে তো, না তাও দেয়নি ?

দিয়েছে।

এতক্ষণ একা বসিয়ে রাখার কৈফিয়ৎটা শেষ করে নিলেন।—কি করি বলো, ভদ্রলোক এসে গেলেন, আমারও ওদিকে বাগান নিয়ে ঝামেলা, এটা হয় তো ওটা হয় না—ভদ্রলোক জানেন শোনেন খুব, পুণার পোচা নার্সারির লোক।

পোচা নার্সারির লোকের সম্বন্ধে ধীরাপদর কোনো আগ্রহ নেই, বরং অমিতাভ ঘোষ সম্বন্ধে দু-চার কথা বললে শোনা যেত।

চলো ভিতরে গিয়ে বসি, শিগগীর ছাড়া পাচ্ছ না।

ধীরাপদ বলল, আজ একটু কাজ ছিল—

চারুদি উঠে দাঁড়িয়েছেন, ফিরে তাকালেন।—কাজও তাহলে কিছু করো তুমি ? কি কাজ ?

এখানে এই ঘরে বসে কি কাজের কথাই বা বলতে পারে ধীরাপদ ! নতুন-পুরনো বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবুর সঙ্গে দেখা করার কাজটা নিজের কাছেই তার জরুরী মনে হচ্ছে না। জবাব না দিয়ে হাসল একটু।

অন্দরমহলের প্রথম দুটো ঘর ছাড়িয়ে চারুদির শয়নঘর। দামী খাটে পরিপাটি শয্যা আর স্বল্প আসবাবপত্র। বেশ বড় ঘর, একদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার, তার পাশে ইজিচেয়ার। টেবিলে টেলিফোন, লেখার সরঞ্জাম। অন্য কোণে মস্ত ড্রেসিং টেবিল আর আলমারি একটা। মেঝেতে কুশন-বসানো গোটা দুই মোড়া।

বোসো—

চারুদি দোরগোড়া থেকে চলে গেলেন এবং একটু বাদেই আঁচলে করে ভিজে মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এলেন। ধীরাপদর মনে পড়ল, আগের দিন বলেছিলেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল না দিলে মাথা গরম হয়ে যায়।

দাঁড়িয়ে কেন, বোসো—

শয্যার ওপরেই নিজে পা গুটিয়ে বসলেন, ধীরাপদ কাছের মোড়াটা টেনে নিল।

তারপর কি খবর বলো—দাঁড়াও, আগে তোমাকে খেতে দিতে বলি—

খাট থেকে নামতে যাচ্ছিলেন, ধীরাপদ বাধা দিল।—বোসো, আজ খাবার তাড়া নেই কিছু।

কিচ্ছু না ?

না, অবেলায় খেয়েছি।

সত্যি বলছ, না শেষে জব্দ করবে আবার?

ধীরাপদ হাসতে লাগল। সে-দিনে ওভাবে খেতে চাওয়ায় শুধু বদ্দি জব্দ করার ইচ্ছেটাই দেখে থাকে বাঁচোয়া।

চারুদি আবার পা গুটিয়ে নিয়ে খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার চিঠি পেয়েও এলে না কেন?

আসব ভাবছিলাম...।

হুঁ, আসলে তোমার এড়াবার মতলব ছিল। নইলে কতকাল বাদে দেখা, আমি তো ভেবেছিলাম পরদিনই আসবে!

ধীরাপদ হাসিমুখেই বলে বসল, কতকাল বাদের দেখাটা সত্যিই তুমি জিইয়ে রাখতে চাইবে জানব কি করে? এবারে জানলাম।

চারুদি থতমত খেয়ে গেলেন একটু। তারপর সহজভাবেই বললেন, তোমার কথাবার্তাও বদলেছে দেখছি। এবারে জানলে যখন আর বোধ হয় গাড়ি নিয়ে হাজির হতে হবে না!

ধীরাপদ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়ল। কিন্তু চারুদির তার আগেই কিছু যেন মনে পড়েছে। বললেন, আচ্ছা তোমার ঘরের সামনে ওই যে বউটিকে দেখলাম—সেই তো বোধ হয় খবর দিলে তোমাকে, কে?

ধীরাপদর হাসি পেয়ে গেল। মেয়েদের এই এক বিচিত্র দিক। এত লোকের মধ্যে চারুদিরও শুধু সোনাবউদিকে চোখে পড়েছে। নিজের অগোচরেই আঠারো বছরের ব্যবধান ঘুচতে চলেছে ধীরাপদর। গম্ভীর মুখে জবাব দিল, সোনাবউদি।

সোনাবউদি!

হ্যাঁ গণুদার বউ।

চারুদি অবাক। তারা কারা?

চিনলে না?

আমি কি করে চিনব?

ধীরাপদ হেসে ফেলল, ও-বাড়ির কাকেই বা চেনো তুমি!

হাসলেন চারুদিও।...তাই তো, যাকগে তোমার খবর বলো, ওখানেই বরাবর আছ?

হ্যাঁ।

কিন্তু বাড়িটার যা অবস্থা দেখলাম, ও তো যখন তখন মাথার ওপর ভেঙে

পড়তে পারে!

ও-বাড়ির অনেকেই সেই সুদিনের আশায় আছে, কিন্তু বাড়িটা নির্লজ্জের মত শুধু আশাই দিচ্ছে।

শুনে চারুদি কেন জানি একটু খুশিই হলেন মনে হল। মুখে অবশ্য কোপ প্রকাশ করলেন, কি বিচ্ছিরি কথাবার্তা তোমার!

শয্যায় পা-টান করে বসে আবারও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ধীরাপদর এটা স্বাভাবিক লাগছে না খুব। গত আঠারো বছরের ব্যক্তিগত সব কিছুই যেন জানার আগ্রহ তাঁর। কোন্ পর্যন্ত পড়েছে, এম-এটা পড়ল না কেন, তার পর এ ক'বছর কি করেছে, এখন কি করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষের দিকে প্রায় জেরার মত লাগছিল। যেন চারুদির জানারই প্রয়োজন। উঠে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে এসে বসলেন আবার।

দিনের আলো বিদায়মুখী, তবু ঘরের আলো আর একটু পরে জ্বাললেও হত। ধীরাপদর মনে হল উনি মুখেই জেরা করেছেন না, তাঁর চোখও সজাগ। আর জিজ্ঞাসাবাদের ফুরসৎ না দিয়ে বলল, এবারে তোমার পাত্রীর খবর বলো শুনি?

পাত্রীর খবর! চারুদি সঠিক বুঝলেন না।

যে-ভাবে জিজ্ঞাসা করছ ভাবলাম হাতে বুঝি জবর পাত্রী-টাত্রী কিছু আছে!

উৎফুল্ল মুখে চারুদি তক্ষুনি জবাব দিলেন, তোমার পাত্রী তো আমি! আর পছন্দ হয় না বুঝি? যে হতভাগা অবস্থা দেখছি তোমার, তোমাকে মেয়ে দেবে কে?

আজ উঠি তাহলে।

চারুদি হেসে ফেললেন, না, অতটা হতাশ হতে বলিনে—। ভেবে নিলেন একটু, তারপর নিরপেক্ষ মন্তব্য করে বসলেন, কিন্তু এভাবে এতগুলো বছর কাটানো পুরুষমানুষের পক্ষে লজ্জার কথা।

বলার মধ্যে দরদ কমই ছিল, ধীরাপদ উষ্ণ হয়ে উঠল। যেন এমন একটা কথা বলার যোগ্যতা উনি নিজে অর্জন করেছেন। বিরক্তি চেপে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে বলল, তা হবে। কিন্তু যে ভাবে তুমি আমার খবর-বার্তা নিচ্ছ সেই থেকে, মনে হচ্ছিল লজ্জাটা ইচ্ছে করলে তুমিই দূর করে ফেলতে পারো।

চারুদি সোজাসুজি খানিক চেয়ে রইলেন তার দিকে, তারপর খুই স্পষ্ট করে জবাব দিলেন, পারি। তুমি রাজী আছ?

এমন প্রস্তাবের মুখে পড়তে হবে জানলে ধীরাপদ বিদ্রূপের চেষ্টা না করে

খোঁচাটা হজম করেই যেত। কিন্তু যত না বিব্রত বোধ করল তার থেকে অবাকই হল বেশি। রমণী-মহিমায় রাজার রাজ্য টলে শুনেছে, এই বা কম কি! জবাবের প্রতীক্ষায় চারুদি তেমনি চেয়ে আছেন।

হাসিমুখে ধীরাপদ পরাজয়টা স্বীকার করেই নিল একরকম, যাক, তাহলে পারো বোঝা গেল—

তুমি রাজী আছ কি না তাই বলো।

এবারে ধীরাপদর দু চোখ তার মুখের ওপর ঘুরে এলো একবার। পরিহাসের আভাস মাত্র নেই, বরং ওর জবাবেরই নীরব প্রতীক্ষা দেখল। বিস্ময়ের বদলে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে কেমন, মনে হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে চারুদির এতক্ষণের এত জেরা শুধু এই প্রশ্নটার মুখোমুখি এসে দাঁড়ানোর জন্যেই। রমণী-মন-পবনের এ কোন্ ইশারা ঠিক ধরতে পারছে না। রাজী হোক না হোক, এই বয়সে চারুদির এমন জোরের উৎসটা কোথায় জানার কৌতূহল একটু ছিল। হেসে বিব্রত ভাবটাই প্রকাশ করল, ঘাবড়ে দিলে যে দেখি, উপকার না করে ছাড়বে না?

একটু থেমে চারুদি বললেন, উপকারটা তোমার একার নাও হতে পারে।

আর আবার কার—তোমারও?

চারুদি বিরক্ত হয়েও হেসে ফেললেন, বড় বাজে কথা বলো, যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও না?

বিড়ম্বনার একশেষ। ধীরাপদ কেন যেন প্রসঙ্গটা এবারে এড়াতেই চেষ্টা করল। হস্টেলে থাকতে যেভাবে কথাবার্তা কইত অনেকটা সেই সুরেই বলল, এই না হলে আর মেয়েছেলে বলে, আঠারো বছর বাদে সবে তো দু দিনের দেখা—আঠারোটা দিন অন্তত দেখে নাও মানুষটা কোথা থেকে কোথায় এসে ঠেকেছি!

আমার দেখা হয়েছে, সে ভাবনা তোমার। তেমন যদি বদলেই থাকো আজকের ব্যবস্থাও কাল বদলাতে কতক্ষণ?

সাফ জবাব। অর্থাৎ, দেবো ধন বুঝব মন—কেড়ে নিতে কতক্ষণ! কিন্তু এ নিয়ে ধীরাপদ আর বাক-বিনিময়ের অবকাশও পেল না। চারুদি খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

পার্বতী!

এই এক নামের আহ্বান-বৈচিত্র্য আজ অনেকবারই শুনেছে। পার্বতী দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। রাতের আলোয় হোক বা যে জন্যেই হোক, মুখ-

খানা অতটা ভাবলেশশূন্য পালিশ করা লাগছে না এখন।

'জামাবাবু এখানে খেয়ে যাবেন।

নির্দেশ শ্রবণ এবং প্রস্থান। এর মধ্যে আর কারো কোনো বক্তব্য নেই যেন। পার্বতী চলে যাবার পরেও ধীরাপদ হয়ত আপত্তি করত বা বলত কিছু। কিন্তু সেই চেষ্টার আগেই চারুদি সোজা টেবিলে গিয়ে বসলেন। প্যাড আর কলম টেনে নিয়ে দু-চার মুহূর্ত ভাবলেন কি, তারপর চিঠি লিখতে শুরু করে দিলেন।

ধীরাপদ নির্বাক দ্রষ্টা।

রাত মন্দ হয়নি।

আজও চারুদির গাড়ি করেই ধীরাপদ বাড়ি ফিরছে। বুকপকেটের খামটা বার দুই উল্টে-পাল্টে দেখেছে। এ আলোয় দেখা সম্ভব নয়, অস্বস্তিকর কৌতূহলে হাতে নিয়ে নাড়া-চাড়া করেছে শুধু।

তেমনি নীল খাম, যেমন ডাকে এসেছিল সেদিন। অপরিচিত নাম, অপরিচিত ঠিকানা। পরিচ্ছন্ন ভাবে আঁটা, চারুদি খাম আঁটেন বটে। এ-মাথা ও-মাথা নিশ্ছিদ্র। ধীরাপদর কৌতূহল অনেকবার ওই বন্ধ খামের ওপর থেকে ব্যাহত হয়ে ফিরে এসেছে।

আকাশের পরীরা একবার নাকি বড় মুশকিলে পড়েছিল। বিধাতার বরে তাদেরও বর দেবার ক্ষমতা জন্মেছিল। কিন্তু ওদিকে যে বরের যুগের বিশ্বাসটা যেতে বসেছে বেচারীরা জানত না। বর দেবার জন্যে তারা মানুষের রাজ্যে যখন-তখন এসে ঘুর-ঘুর করত আর বর দেবার ফাঁক খুঁজত। চুপি চুপি অনুরোধ-উপরোধও করত একটা বর প্রার্থনা করার জন্যে। একেবারে করুণ-দশা তাদের।

গল্পটা মনে পড়তে ধীরাপদর প্রথমে মজাই লাগছিল। এই আঠারো বছরে চারুদিরও হয়ত কিছু দেবার ক্ষমতা জন্মেছে, কিন্তু নেবার লোক জোটেনি নাকি!

চারুদি বর গছালেন?

পরীর গল্পের শেষটা মনে পড়তে ধীরাপদ একা-একাই হেসে উঠেছিল। এক পরীর তাগিদে উত্ত্যক্ত হয়ে একজন মানুষ বর চেয়েই বসেছিল। চাইবার আগে পরীর মিষ্টি মুখখানি ভালো করে দেখে নিয়েছিল। শেষে বলেছিল, বর দেবে তো ঠিক? পরী বলেছিল, বর দেবার জন্যেই তো হাঁসফাঁস করছি

—সত্যাবদ্ধ হয়ে বর দেব না, বলো কি তুমি!

তাহলে ওই ডানা দুটি আগে খোলো।

কিছু না বুঝেই পরী ডানা খুলেছিল।

এবারে আমার রমণীটি হয়ে এখানেই থেকে যাও।

ভাবতে মন্দ মজা লাগছিল না ধীরাপদর, বর গছিয়ে ফেলে চারুদি যদি বিপদই ডেকে এনে থাকেন নিজের! চিঠিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করল আবারও, আষ্টেপৃষ্ঠে আঁটা—বরের নমুনাটা জানা গেল না।

চিঠি হাতেই থাকল। ভাবছে। প্রথম কৌতুহল আর কৌতুকানুভূতির পরে ভাবনাটা বাস্তবের দিকে গড়াতে লাগল। চিঠি নিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে হবে কাল বা পরশুর মধ্যেই। চারুদির সেই রকমই নির্দেশ। পরশু রবিবার, কি হল না হল সোমবার চারুদিকে এসে খবর দিতে হবে। চিঠি হাতে নিয়েও ধীরাপদ একটু আপত্তি করেছিল, বলেছিল, একেবারে অপাত্রে করুণা করছ চারুদি, চাকরিতে অনেকবার মাথা গলিয়েছি, কোথাও মানিয়ে নেওয়া গেল না—

চারুদি খানিক মুখের দিকে চেয়ে থেকে জবাব দিয়েছেন, সেটাই ভরসার কথা, খুব তাহলে বদলাওনি তুমি!

ধীরাপদর দুর্বোধ্য লেগেছিল। আগাগোড়াই দুর্বোধ্য লাগছে এখনও। কার সঙ্গে দেখা করতে হবে? চাকুরে না ব্যবসাদার? যাই হোন, বড়-লোক নিশ্চয়ই। কিন্তু কে চেনে তো না! কলকাতা শহরে কমলার ভাণ্ডারী তো একটি দুটি নয়—ছড়াছড়ি। এক-একজনের বিত্তের অঙ্ক শুনলে হার্টফেল করার দাখিল। কজনকেই বা চেনে সে!

তবু কে ভদ্রলোক?

স্মৃতির পটে ধীরাপদ একটা মূর্তি হাতড়ে বেড়ালো কিছুক্ষণ। মুখ স্পষ্ট ধরা পড়ছে না। ধীর, গম্ভীর অথচ মুখখানা যাঁর হাসি-হাসি, কানের দু পাশের চুলে একটু একটু পাক ধরায় যাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে প্রায় ছেলেমানুষ মনে হত নিজেকে।

তিনিই কি?

কিন্তু তাঁর তো নিজের গাড়িও ছিল না তখন। চারুদির গাড়িতেই ঘুরে বেড়াতেন।

চিঠি নিয়ে দেখা করতে যাবে কি যাবে না সেটা পরের কথা। বোধ হয় যাবেই না, চিঠিতে চারুদি ওর হয়ে সংস্থান ভিক্ষা করেছেন কিনা কে জানে?

একবার দেখতে পারলে হত কি লিখেছেন। কিন্তু তার তাগিদ নেই জেনেও চারুদির এত আগ্রহ কেন? চারুদির এই ব্যাপারটাই অদ্ভুত ঠেকেছে। শুধু এই ব্যাপারটা নয়, আজকের গোড়া থেকে সবটাই। এর আগের দিন যে-চারুদিকে দেখেছিল, এমন কি পোচা নার্সারির সেই ফুল-বিশেষজ্ঞটির সামনে সমস্যা-ভারাক্রান্ত যে চারুদিকে দেখেছিল, তার সঙ্গে এই চারুদির বেশ তফাত।

এই চারুদির ভিতরে ভিতরে যেন অনেক সমস্যা। এই চারুদি প্ল্যান করতে জানেন।

ধীরাপদ ভাবছে, কিছু একটা জট ছাড়াবার মত করেই ভাবছে। চিঠিতে ডেকে পাঠানো সত্ত্বেও ও যায়নি, গাড়ি হাঁকিয়ে চারুদি নিজেই এসে ওকে ধরে নিয়ে গেছেন। অস্বাভাবিক আগ্রহে ওর এই অলস মরচে-ধরা জীবনের খবরাখবরও জানতে চেয়েছেন। জেনে খুব যে দুঃখিত হয়েছেন মনে হয় না। উল্টে মনে হয়েছে, ওর এই জোড়াতাড়া অবস্থাটাই কিছু একটা উদ্দেশ্যের অনুকূল তাঁর। চারুদি স্নেহ করতেন, ভালও বাসতেন হয়তো—কিন্তু সেই স্নেহ বা ভালবাসাও ছিল ভক্তের প্রতি করুণার মতই। তার বেশি কিছু নয়। ভক্তের প্রতি মায়া একটু-আধটু কার না থাকে? কিন্তু এই দেড় যুগেও সেটা অটুট থাকার কথা নয়। উল্টো হওয়ার কথা এখন। চারুদির এই প্রাচুর্যের মধ্যে সে তো মূর্তিমান ছন্দপতন। তাঁর বিস্মৃতিকামী জীবনের এই অঙ্কের ও তো কোনো সুবাঞ্ছিত দর্শক নয়, বরং স্মৃতির কাঁটার মতই।

চাকদিরই তাকে এড়িয়ে চলার কথা সব দিক থেকে।

তার বদলে এই চিঠি। কিন্তু চিঠি কে জানে? উদ্দেশ্য যাই থাক, তার দারিদ্র্যটাই ফলাও করে এঁকে দেননি তো? দিক, যাচ্ছে কে!

কিন্তু এই এক চিঠির তাড়নায় পরের দিনটাও প্রায় ভেবে-ভেবেই কেটে গেল। এমন কি এই ভাবনার ফাঁক দিয়ে তার প্রতি সুলতান কুঠির বাসিন্দাদের সত্ত জাগ্রত কৌতূহলও দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। গত রাতে ধীরাপদ দূর থেকে গাড়ি ছেড়ে দেয়নি, অন্যমনস্কতার ফলে গাড়িটা সুলতান কুঠির আঙিনার মধ্যেই ঢুকে পড়েছিল।

মধ্যাহ্নে হোটেল থেকে খেয়ে ফেরার সময়ে সোনাবউদির সঙ্গে একবার চোখোচোখি হয়েছিল। সোনাবউদি নিজের ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে মুচকি হেসে সরে গেছে। ঘরে এসে সরাসরি জেরা করতে বসলে বরং ধীরাপদ খুশি হত। কথায় কথায় সবই বলা যেত সোনাবউদিকে। ঠাট্টা করুক আর যাই করুক, পরামর্শ ঠিক দিত।

কিন্তু আসার সময় আসাটা সোনাবউদির রীতি নয়।

চারুদির চিঠি নিয়ে নির্দেশমত কাল একবার দেখা করে আসার কথাই ধীরাপদ ভাবছে এখন। না গেলে চারুদি আবারও এসে উপস্থিত হবেন কিনা ঠিক কি! আর একটা কথাও আজ ভাবছে। শুধু প্রাচুর্য নয়, চারুদির চলনে বলনে বেশ একটা আত্মপ্রত্যয়ী মর্যাদাবোধ ধীরাপদ লক্ষ্য করেছে। অকারণে একটা হালকা ব্যাপার করে বসে চারুদি নিজেকে খেলো করতে পারেন সেটা আজ আর একবারও মনে হচ্ছে না।

ঠিকানা মিলিয়ে ধীরাপদ যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল, চারুদির বাড়ি দেখার পর এমন একটা বাড়িতে আসছে একবারও কল্পনা করেনি। বেঢপ গঠন, স্ফীতি আছে ছাঁদ-ছিরি নেই। খুব পুরনো নাও হতে পারে, কিন্তু অনেকখানি অযত্ন আর উপেক্ষা নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে বোঝা যায়। এক যুগের মধ্যেও ওর বাইরের অবয়বে অন্তত রঙ-পালিশ পড়েনি।

রাস্তা ছাড়িয়ে একটা কানা গলির মুখে বাড়িটা। সামনেই ছোট উঠোনের মত খানিকটা জায়গা। সেখানে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। একটা ছোট একটা বড়। ছোটটা ধপধপে সাদা, নতুন। বড়টা গাড় লাল রঙের, তার চালকটি মাঝের গদিতে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। ছোট গাড়ির চালকের আসন শূন্য।

ধীরাপদ দরজার কাছে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। বাড়িতে জনমানব আছে বলে মনে হয় না। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে জানালাগুলোও বেশির ভাগই বন্ধ। ভিতরে ঢুকেই ডাইনে বাঁয়ে ঘর, সামনে দোতলার সিঁড়ি। দরজার কোণে কলিং বেল চোখে পড়ল একটা। আরো একটু অপেক্ষা করে অগত্যা ধীরাপদ সেটাই চড়াও করে দেখল একবার।

একটু বাদে বাঁ দিকের ঘর থেকে মাঝবয়সী একজন লোক এসে দাঁড়াল। ঠাকুর-চাকর বা সেই গোছেরই কেউ হবে। শয্যার আরাম ছেড়ে উঠে আসতে হয়েছে বোধ হয়, কারণ শীতে লোকটার গায়ে কাঁটা দিয়েছে। এক কথার জবাবে তিন কথা বলে সম্ভাব্য দায় সেরে ফেলতে চেষ্টা করল সে। ধীরাপদ জানল, হিমাংশু মিত্রের এই বাড়ি, কিন্তু সাহেব এখন ব্যস্ত—মিটিং করছেন, আগের থেকে 'এপোণ্টমেন' না থাকলে দেখা হওয়া শক্ত। ইচ্ছে করলে সে ওপরে গিয়ে খোঁজ নিতে পারে।

ধীরাপদ মোলায়েম করে বলল, একবার খবর দিলে হত না?

লোকটা তার দরকার মনে করল না, কারণ ওপরে লোক আছে, তাছাড়া

ছোট সাহেবও আছেন, দেখা যদি হয় ওপরে গেলেই হবে। ⁄ আর কালবিলম্ব না করে সে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতএব পায়ে পায়ে ঊর্ধ্ব-পথে।

দোরগোড়ায় বেয়ারা না দেখে দ্বিধান্বিত চরণে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। আর দু-চার মুহূর্তের একটা নয়নাভিরাম দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে বিব্রত বোধ করতে লাগল। বড় হলঘর একটা, বেশ সাজানো-গোছানো। তার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে বড় পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে একটি মেয়ে। সামনের দিকে মুখ করে আছে বলে মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে। হলের ওধারে আর একটা ঘর। মাঝের হাফ-দরজার সামনে ফাইল হাতে একটি ফিটফাট তরুণ ওখান থেকেই হাতের ইশারায় মেয়েটিকে কিছু বলছে। হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে খুব সম্ভব আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার অনুরোধ। এদিকে মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি। জবাবে ফোলিও ব্যাগসুদ্ধ বাঁ হাত তুলে ডান হাতের আঙুলে করে ঘড়ির কাঁটা ইশারা করছে সে।

সেইক্ষণে আবির্ভাব।

খুব শুভ আবির্ভাব নয় বোধ হয়।

এদিকে ফিরে ছিল বলে দূরের মানুষটিরই আগে দেখার কথা ওকে। সে-ই দেখল। ধীরাপদ ধরে নিল এই ছোট সাহেব। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মেয়েটিও ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ধীরেসুস্থে এগিয়ে এলো। এইটুকুর মধ্যেই ধীরাপদর মনে হল, আসাটা রমণীয় ছন্দের নয় ঠিক, কিছুটা পুরুষ-সুলভ নির্লিপ্ত ঢঙের।

কাকে চান? ওকে নীরব দেখে মেয়েটিই জিজ্ঞাসা করল।

হিমাংশুবাবু—

এক পলক দেখে নিয়ে বলল, মিঃ মিত্র এক্ষুনি উঠে পড়বেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ফ্যাসাদ কম নয়, বলবে চারুদির কাছ থেকে? বলল, একটা চিঠি ছিল, তাঁকে দিতে হবে—

হাত বাড়াল, দিন। সামান্য কথাটা বলতেও ইতস্তত করছে দেখেই হয়ত প্রচ্ছন্ন বিরক্তি একটু।

এই গণ্ডগোলে পড়তে হবে জানলে ধীরাপদ চিঠির কথা বলত কিনা সন্দেহ।

খামটা উল্টে-পাল্টে দেখে নিয়ে মেয়েটি আর একবার তাকালো। ঠিকানায় মেয়েলী অক্ষর-বিন্যাস দেখে সম্ভবত। তারপর চিঠি হাতে ফিরে

চলল। হাফ-দরজা সংলগ্ন সুদর্শনাটি তখনো দাঁড়িয়ে। খামসুদ্ধ রমণী-বাহুর ইশারায় তার প্রতি আর একটু অবস্থানের ইঙ্গিত। পত্রবাহিকার এই ফিরে যাওয়াটুকুও তেমনি সবল-মাধুর্য-পুষ্ট বিলম্বিত লয়ের। দেখে পুরুষের চোখ একটু সজাগ হলেও আত্মবোধ কিছুটা দুর্বল হবার মত।

চিঠিখানা লোকটির হাতে দিতে সেও সেখান থেকে ধীরাপদর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একটা, তারপর হাফ-দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। মেয়েটি ফিরে এসে একটা সোফায় বসল, হাতের অত বড় ব্যাগটা কোলের ওপর। সোফায় মাথা রেখে চোখ বুঝল কিনা বোঝা গেল না।

একটু বাদে সম্ভবপর ছোট সাহেবটি বেরিয়ে এসে দূর থেকেই ধীরাপদকে ইঙ্গিতে জানালো, সে ভিতরে গিয়ে সাক্ষাৎ করতে পারে। তারপর এগিয়ে এসে মেয়েটির পাশে ধুপ করে বসে পড়ল। অসহিষ্ণু অভিব্যক্তি, তাই দেখে মেয়েটির মুখে চাপা কৌতুক।

ডুজোড়া চোখের ওপর দিয়ে ধীরপায়ে ধীরাপদ হাফ-দরজার দিকে এগোলো। এদের চোখে নিজেকে অবাঞ্ছিত লাগছে বলেই অপ্রতিভ। ভিতরে ঢুকল। সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের ওধারে রিভলভিং চেয়ারটা ভরাট করে বসে আছেন একজনই। ঘরে দ্বিতীয় কেউ নেই। ভারি মুখে মোটা পাইপ, আয়ত চোখে লাইব্রেরী-ফ্রেম চশমা। পরনে দামী স্যুট।

মনে মনে ধীরাপদ এঁকেই দেখবে আশা করেছিল।

আঠাবো বছর বাদে দেখেও চিনতে একটুও দেরি হল না। বয়েস এখন বোধ হয় সাতান্ন-আটান্ন। চাকদির শ্বশুরবাড়িতে এঁকেই দেখত মাঝে-সাজে। তেমনি গম্ভীর অথচ হাসিমুখ। কানের দু পাশের চুলে তখনই পাক ধরেছিল, এখন যে কটা চুল আছে সবই রেশমের মত সাদা। আঠারো বছর আগের দেখা সেই পুরুষোচিত রূপে বয়েসেব দাগ পড়েছে, ছাপ পড়েনি।

ধীরাপদ দু হাত জুড়ে নমস্কার জানালো।

রিভলভিং চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে আয়েস করে বসলেন তিনি, দাঁতে পাইপ চেপে মাথা নাড়লেন একটু। সেই ফাঁকে নীরব ঔৎসুক্যে দেখেও নিলেন তাকে। তারপর ইঙ্গিতে সামনের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

চারুদির চিঠিটা টেবিলের ওপর খোলা পড়ে ছিল। সেটা তুলে নিয়ে একবার চোখ বোলালেন। পরে চিঠি পকেটে রেখে চেয়ার ঘুরিয়ে ওর মুখো-মুখি হলেন।—চাকরি চাই?

চাই বলতে বাধল। আর চাইনে বললে এল কেন? নিরুত্তরে হাসল একটু।

চশমার ওধারে দুটো চোখ তার মুখের ওপর আটকে আছে। দু-চারটে মামুলী প্রশ্ন, কতদূর পড়াশুনা করেছে, চাকরির কি অভিজ্ঞতা, এখন কি করছে, ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, ধীরাপদর কোনো জবাবই ত্বরিত নিয়োগের অনুকূল নয়। এরপরে খুব সহজভাবেই ভারী একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসলেন তিনি। বললেন, যিনি আপনাকে চিঠি দিয়েছেন তিনি লিখেছেন আপনি খুব বিশ্বাসী, আই মিন্ ভেরি ভেরি রিলায়েবল—রিয়েলি?

ভদ্রলোকের দু চোখ শিথিল বিশ্লেষণ-রত। ধীরাপদ জবাব কি দেবে! বলল, সেটা উনিই জানেন··

উনি কত দিন জানেন?

ছেলেবেলা থেকে।

ভুরুর মাঝে কুঞ্চন-রেখা পড়ল। তার দিকে চেয়েই কিছু স্মরণ করার চেষ্টা।—ডোণ্ট মাইণ্ড, তাঁর সঙ্গে আপনার কত দিন পরে দেখা?

ধীরাপদর অনুমান, টেলিফোনে এঁর সঙ্গে চারুদির আগেই আলোচনা হয়েছে। তাই প্রশ্নের তাৎপর্য না বুঝলেও যথাযথ জবাব দিল, প্রায় আঠারো বছর···

দেখছেন নিরীক্ষণ করে, মুখ আরো একটু হাসি-হাসি।—এ প্রিটি লং টাইম, এতগুলো বছরে যে কোনো লোক একেবারে বদলে যেতে পারে··· হোয়াট ডু ইউ সে?

বিদ্রূপের আভাস যেন। ধীরাপদর মুখে সংশয়ের চকিত ছায়া একটা। চুপচাপ চেয়ে রইল। তিনি আবার বললেন—বললেন না, পরামর্শ দিলেন যেন।—গরম জলের কেটলির মুখে কিছুক্ষণ ধরে রাখলে খাম খোলা সহজ হয়, নেক্স্‌ট টাইম্ ইফ্ ইউ হ্যাভ টু ডু ইট্, ট্রাই দ্যাট ওয়ে!

এমন অশোভন ব্যাপারে ধরা পড়েই যেন ধীরাপদর এই অনভ্যস্ত পরিবেশে এসে পড়ার জড়তা গেল। নিজের নির্বিকার সহজতায় আত্মস্থ হতে সময় লাগল না। মনে মনে ভদ্রলোকের প্রশংসাই করতে হল। এই দাঁড়াবে ভাবেনি। তাঁর দিকে চেয়েই নিরাসক্ত জবাব দিল, চিঠিটা পড়ে ছিঁড়ে ফেলব বলে খুলেছিলাম। আমার জন্য চাকরি ভিক্ষা করা হয়েছে ভেবেছিলাম। তাতে আপত্তি ছিল।

চোরের মুখ হল না দেখেই ভদ্রলোক বিস্মিত হচ্ছিলেন, কথা শুনে বেশ অবাক।—চাকরির দরকার নেই ?

ধীরাপদ হালকা জবাব দিল, আছে। তবে না পেলেও এখন আর তেমন কষ্ট হয় না। আচ্ছা, নমস্কার—

সীট ডাউন প্লীজ—!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার মুখে অপ্রত্যাশিত একটা তাড়া খেয়ে ধীরাপদ বসে পড়ল আবার। রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে পাইপ ধরানোর ফাঁকে তাঁর বক্র দৃষ্টি আরো বারকতক তার মুখের ওপর এসে পড়ল। আগের মতই হাসি-হাসি দেখাচ্ছে, তুমি কাল থেকে এসো, শ্যাল্ বি গ্লাড টু হ্যাভ্ ইউ উইথ আস—

ইলেকট্রিক বেল-এর বোতাম টিপলেন। প্যাঁ-ক্ করে শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের তরুণটির প্রবেশ। পাইপের মুখ হাতে নিয়ে হিমাংশু মিত্র উঠে দাঁড়ালেন। সৌজন্যের রীতি অনুযায়ী উঠে দাঁড়ানো উচিত ধীরাপদরও, কিন্তু সেটা খেয়াল থাকল না। সে দেখছে, এখনো তেমনি উন্নত ঋজু স্বাস্থ্য ভদ্রলোকের।

ধীরাপদকে দেখিয়ে আগন্তুকের উদ্দেশে বললেন, ইনি কাল থেকে আমাদের অর্গ্যানিজেশনে আসছেন—নাম-ঠিকানা লিখে নাও আর কোন্ কাজ স্যুট করবে আলাপ করে দেখো, তারপর কাল আলোচনা করা যাবে। ধীরাপদকে বললেন, এ আমার ছেলে সীতাংশু—অর্গ্যানিজেশন চীফ্।

ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল। নমস্কার বিনিময়।

হিমাংশু মিত্র ততক্ষণে দরজার কাছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে এসেছে ?

ছেলে গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল।

এলে বলিস তার জন্য আমি ঘড়ি ধরে দু ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। ফ্যাক্টরীতে টেলিফোন করেছিলি ?

নেই সেখানে।

হাফ-দরজা ঠেলে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। অর্গ্যানিজেশন চীফ্ সীতাংশু মিত্র এবারে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। একটুও তুষ্ট মনে হল না। বসতেও বলল না। হাবভাবে ব্যস্ততা। জিজ্ঞাসা করল, কি চাকরির জন্যে এসেছেন বলুন তো ?

ধীরাপদ হাসিমুখে জবাব দিল, আপনাদের কোনো চাকরির সম্বন্ধেই আমার কিছু ধারণা নেই।

টেবিলের প্যাড টেনে নিল। নাম-ঠিকানা বলুন।

হাফ-দরজা ঠেলে এবারে ঘরে ঢুকল সেই মেয়েটি। শিথিল চরণে এবং নিরাসক্ত মুখে ভিতরে এসে দাঁড়াল। হাতে ব্যাগটা নেই।

ধীরাপদ নাম-ঠিকানা বলল। এর পরে আলাপ আরো অস্বস্তিকর লাগবে ভাবছে। কিন্তু আলাপ আজকের মত ওখানেই শেষ দেখে হাঁফ ফেলে বাঁচল। সীতাংশু মিত্র বলল, আচ্ছা আপনি কাল তো আসছেন, কাল কথা হবে—আজ একটু ব্যস্ত আছি।

ওকে বিদায় করার ব্যস্ততায় কাল কখন আসবে তাও কিছু বলল না। নিস্পৃহ রমণী-দৃষ্টি টেবিল-জোড়া কাচ আবরণের নিচের চার্টটার ওপর।

রাস্তায় নেমে ধীরাপদ পায়ে পায়ে হেঁটে চলল। হাসিই পাচ্ছে এখন। কি চাকরি করতে হবে বা কত মাইনে পাবে সে-সম্বন্ধে খুব কৌতূহল নেই। শুধু ভাবছে ব্যাপার মন্দ হল না।

পাশ দিয়ে সেই টকটকে লাল বড় গাড়িটা বেরিয়ে গেল। ধীরাপদ সচকিত একটু। ভদ্রলোক ওকে দেখেননি, পিছনের সীটে মাথা রেখে পাইপ টানছেন। গাড়ি আড়াল হয়ে গেল।

মনে মনে ধীরাপদ আবারও তারিফ করল ভদ্রলোকের। চোখ বটে। কি করে বুঝলেন চিঠি খোলা হয়েছে সেটা এখনো বিস্ময়। কথাবার্তা চালচলন সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক। অথচ মুখখানি হাসি-হাসি। আঠারো বছর আগেও প্রায় এই রকমই দেখেছিল মনে পড়ে।

ধীরাপদ থমকে দাঁড়াল।

আর একটা গাড়ি। সেই ধপধপে সাদা ছোট গাড়িটা ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভ করছে অর্গ্যানিজেশন চীফ্ সীতাংশু মিত্র। পাশে মেয়েটি। আত্মপ্রতীতি-চেতন। পলকের দেখা বসার শিথিল ভঙ্গিটুকুও সেই রকমই মনে হল। ধীরাপদর আবির্ভাবে ছোট সাহেবটির বিরূপ অভিব্যক্তির হেতু বোঝা গেল এতক্ষণে। ও এসে বড় সাহেবকে আটকানোর ফলে এদের কিছু একটা আনন্দের ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটছিল বোধ হয়। ওপরের হলঘরে ইঙ্গিতে একজনের ঘড়ির কাঁটা দেখানোর দৃশ্যটা মনে পড়ল। ধীরাপদ হাসতে লাগল, বিসদৃশ অভ্যর্থনার দরুন আর কোনো অভিযোগ নেই। গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়নি এই ঢের। কত হবে বয়সে? মেয়েটির পঁচিশ-ছাব্বিশ, ছেলেটিরও আটাশ-উনত্রিশের বেশি নয়। কিন্তু মেয়েটির কাছে ছেলেটি একেবারে ছেলে-মানুষ যেন।

কোন্ দিকে যাবে ভাবতে গিয়ে ধীরাপদর মনে হল আজই একবার চারুদির সঙ্গে দেখা করা দরকার। এক্ষুনি। কাল যাবার কথা। চিঠি খোলার ব্যাপারটা চারুদি আর কারো মুখে শোনার আগে ও নিজেই বলবে। স্পষ্ট স্বীকৃতিরও মর্যাদা আছে, আপাতত ওটুকুই হাতের কড়ি। আজ যাওয়াই ভালো।

দূর কম নয় চারুদির বাড়ি। দুটো বাসে মিলিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ।

গেট পেরিয়ে অন্যমনস্কের মতই দালানের দিকে এগোচ্ছিল। হঠাৎ ধীরাপদর দু চোখ যেন একস্তূপ লালের ধাক্কায় বিষম হোঁচট খেল। পা দুটো স্থাণুর মত আটকে গেল।

হতভম্ব। চোখ দুটো কি গেছে! গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত লাল মাটির রাস্তা আর বাগান-ভরা লাল ফুলের সমারোহের মধ্যে সিঁড়ি লগ্ন লাল নিশানাটা তেমন বিচ্ছিন্ন মনোযোগে লক্ষ্য করেনি।

সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হিমাংশু মিত্রের টকটকে লাল গাড়িটা।

সম্বিৎ ফিরতে ধীরাপদ চকিতে ঘুরে গেটের দিকে পা চালিয়ে দিল আবার।

॥ পাঁচ ॥

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥

রমণী পণ্ডিতের উক্তি। সিংহও ঘুমিয়ে থাকলে তার মুখে হরিণ গিয়ে ঢোকে না। নিশ্চেষ্ট ভাবনায় কোন্ সমস্যারই বা সুরাহা হয়? চেষ্টা থাকা চাই। চেষ্টাই আসল। উদ্যমই আসল।

ধীরাপদর ব্যস্ততা দেখে অন্তরঙ্গ শুভানুধ্যায়ীর মত রমণী পণ্ডিত বলেছিলেন কথাগুলো। মজা-পুকুরের ধার দিয়ে ধীরাপদ একটু পা চালিয়েই শর্ট-কাট করছিল। তাড়া ছিল। গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর আগে হোটেলে খেয়ে নিতে হবে। এখানে এ-মূর্তির অবস্থান জানলে সোজা পথ ধরত। প্রাজ্ঞ-বচন শিরোধার্য করেই পাশ কাটিয়েছে। কিন্তু মনে মনে অবাক একটু, চেষ্টার কি দেখলেন এঁরা? বিগত ক'টা দিন ধরে ওকে ঘিরে সুলতান কুঠিতে একটা রহস্যের বুননি চলছে, আজ এই একজনের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ধীরাপদ তার আভাস পেল। চিঠি আসা, চারুদির গাড়ি আসা, চারুদির আসা—

এতগুলো আসার ধাক্কায় আলোড়ন একটু হবারই কথা। কিন্তু তা বলে সিংহ জাগতে চলেছে ভদ্রলোকের এ-রকম অনুমান কেন?

চেষ্টার প্রথম ফল, হোটেল থেকে অভুক্ত ফিরতে হল। অফিস-টাইমের ভিড়ের সঙ্গে এতকাল পরিচয় ছিল না। নিয়মিত বেলা-শেষের আগন্তুক সে। এ দৃশ্য দেখে চক্ষুস্থির। তাড়া না থাকলে বসে দেখার মত। ভোজন-পর্বে এমন তাড়া আর দেখেনি। টেবিলে থালা ফেলার ঠাঁই নেই। প্রত্যেকের পিছনে পিছনে পরের ব্যাচে যাঁরা বসবেন তাঁরা অসহিষ্ণু প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে।

প্রত্যাবর্তন। ভাতের আশায় থাকলে কম করে আরো এক ঘণ্টা।

চেষ্টার দ্বিতীয় ফল, নির্দিষ্ট বাড়িব নির্দিষ্ট হলঘরে এসে দেখে জনমানব-শূন্য। আব্‌ছা অন্ধকার, জানালাগুলো পর্যন্ত তখনো খোলা হয়নি। হাফ-দরজার ওধারে উঁকি দিয়ে দেখে সেখানেও কেউ নেই। সিঁড়ির ওপাশে নিচের তলার মতই একসারি ঘর। ধীবাপদর অনুমান এ বাড়ির ওটাই অন্দরমহল। কাজেই সেদিকে বেশি উঁকিঝুঁকি দেওয়া সমীচীন বোধ করল না। হলঘরেই ফিরে এলো আবার। নিজেই দুটো জানালা খুলে দিয়ে আর একটা আলো জ্বেলে বসল। একটা থমকানো শূন্যতা কিছুটা হালকা হল যেন।

ধীরাপদ বসে আছে। বসেই আছে।

ভুতুড়ে নেমন্তন্নের রসিকতার মত লাগছে। সেজেগুজে এসে দেখে হানাবাড়ি। এর মধ্যে নিচেব তলায় ঘুরে এসেছে একবার, সাহসে ভর করে অন্দরমহলের কড়া নেড়েছে বারকতক, তার পর আবার এসে বসেছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। যাঁর প্রবেশ তিনিও অপরিচিত। ছেঁড়া জুতো, মলিন ধুতি, কালচে কোট চড়ানো একজন প্রৌঢ়। ধীরাপদর প্রতীক্ষার কারণ শুনে একটু বিস্মিত—আজ থেকে কাজে লাগার কথা আপনার? তা এখানে কী? এখানে দেখা করতে বলেছেন?

কোথায় দেখা করতে হবে নির্দেশ না থাকায় ধীরাপদর ধারণা এখানেই। মাথা নাড়ল বটে কিন্তু প্রশ্ন শুনে নিজেরই খটকা লাগছে একটু।

বসুন তাহলে। হাফ-দরজার কাছাকাছি হল-এর এক কোণে টাইপ-রাইটারের দিকে এগোলেন। চেয়ারের কাঁধে কোট ঝুলিয়ে টাইপরাইটারের ঢাকনা খুলে বসলেন তিনি।

বসে বসে ধীরাপদর ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। বড় দেয়াল-ঘড়ির কাঁটা আরো দু'পাক ঘুরেছে। টাইপের অতি-মন্থর খট্‌খট্‌ও এবার বোধ হয় থেমেই গেল। দু ঘণ্টায় পুরো এক পাতাও টাইপ করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। চেয়ার

ছেড়ে ভদ্রলোক কাছে এলেন, পরে তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, কই কেউ এলেন না তো ?

ধীরাপদর মনে হল তার নির্জীব প্রতীক্ষা দেখে পান-খাওয়া ঠোঁটের কোণে উল্টো হাসির আভাসের মত দেখা গেল। অর্থাৎ কেউ এলে সেটাই বিস্ময়ের কারণ হত।

কোট্‌টা আবার গায়ে উঠেছে আর টাইপরাইটারের ওপরেও ঢাকনা পড়েছে। ভদ্রলোকের কাজের মেয়াদ শেষ হয়েছে বোঝা গেল।

হলঘরে একা আবার। এতক্ষণ ভাবছিল, দুপুরের খাবার সময় হলে সাহেবদের আবির্ভাব ঘটবে। এখন সে সম্ভাবনাও দেখছে না। ধীরাপদ উঠে পড়বে কিনা ঠিক করার আগেই আর এক মূর্তির আবির্ভাব। কালকের সেই পরিচারক গোছের লোকটি, ঘুমের তাড়ায় যে তাকে ওপরে ঠেলে পাঠিয়েছিল। এসেই কৈফিয়তের সুরে বলল, টাইপবাবু বলে গেলেন আপনি সেই সকাল থেকে বসে আছেন, কলিং বেল টেপেননি, আমি কি করে জানব বলুন—

যেন তার জন্যেই ধীরাপদ এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে আর সে সেটা জানে না বলে অনুতপ্ত। কথাবার্তায় আজ আর লোকটাকে তেমন বাকবিমুখ মনে হল না ধীরাপদর, মাঝে-মধ্যে একটা-আধটা প্রশ্ন করে অসংলগ্ন অনেক তথ্য আহরণ করা গেল। যেমন, 'সকালোয়' বাড়িতে তো কাউকে দেখা করতে বলা হয় না, বাবুকে বড় সাহেব ফ্যাক্টরীতেই যেতে বলেছেন বোধ হয়—না, সাহেবদের বাড়িতে খাবার পাট নেই, দু'বেলাই সকলে বাইরে খান— মাঝে-সাঝে ডাল-চচ্চড়ি-সুক্তোর ঝোল খেতে ইচ্ছে গেলে ভাগ্নেবাবু আগে থাকতে ওকে খবর দেন, ও-ই তখন সব ব্যবস্থা করে রাখে, কিন্তু ভাগ্নেবাবুর কাছে সব কিছু করবার বাহাদুরি নিতে চেষ্টা করে কেয়ার-টেক বাবু—দু টাকা বাজার করে দশ টাকা লিখে রাখে, বড় সাহেবের তো আর কেয়ার-টেক বাবুর লেখা উল্টে দেখার সময় নেই, মাসকাবারে টাকা ফেলে দিয়েই খালাস! কিন্তু এই মান্‌কে মুখ্যু হলেও বোঝে সব, বুঝেও মুখ বুজে থাকে, জলে নিবাস করে তো আর কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা চলে না!

খেই হারিয়ে মান্‌কের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের মুখটাই আলগা হয়ে গেল। কে ভাগ্নেবাবু বা কে কেয়ার-টেক বাবু ধীরাপদর বোধগম্য হল না।

সাহেবরা ফেরেন কখন ? একেবারে সেই রাত্তিরে। কেউ এখন কেউ তাখন। শুধু ভাগ্নেবাবু মাঝে-সাঝে ইদিক-সিদিক চলে যান। সাহেবরা দুজন রোজই ফেরেন, কখন দোরের কড়া নড়ে উঠবে বা গাড়ির শব্দ শোনা যাবে

সেই পিত্যেশে কান খাড়া করে এই মান্‌কেকেই ঠায় জেগে বসে থাকতে হয়—কেয়ার-টেক বাবুর তখন 'কুম্ভকর্ণের' নিদ্রা, আর 'সকালোয়' উঠেই সাহেবদের কাছে এমন 'মূর্তি' দেখাবেন যেন মাঝরাত অবধি তিনিই জেগে বসে ছিলেন।

ফ্যাক্টরীতে গেলে কার সঙ্গে দেখা হতে পারে? সকলের সঙ্গেই—বড় সাহেব ছোট সাহেব ভাগ্নেবাবু মেম-ডাক্তার—মেম-ডাক্তারকে অবিশ্যি 'বিকেলোয়' ওষুধের দোকানেও পাওয়া যাবে, তেনার সঙ্গে দেখা হলে তিনিও সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন—ব্যবস্থাপত্রের ভার তো সব মেম-ডাক্তারেরই হাতে। সঙ্গে সঙ্গে কি মনে হতে রোগাটে মুখের কোটরগত চোখ দুটো চকচক করে উঠেছে একটু। গলার স্বর নামিয়ে বলেছে, টাইপবাবু বললেন আপনার চাকুরি হয়েছে এখানে, আপনি তো এখন ঘরের লোক, বলতে দোষ কি—সুযোগ-সুবিধে হলে মেম-ডাক্তারকে একটু বলে কয়ে দেবেন কারখানায় যদি চাপরাসীর কাজটা জ্ঞান, বাড়ির কাজ করেই 'কত্তে' পারব—আমি নিজেই একবার সাহসে 'নিত্তর' করে মেম-ডাক্তারকে বলেছিলাম, তা তিনি ভুলেই গেছেন বোধ হয়—এতকাল কাজ কচ্ছি এটুকু না হলে আর আশা কি বলুন? এখানে কেয়ার-টেক বাবুটি তো সব্বক্ষণ বুকে পা দিয়েই আছেন, যেন তেনারই খাস-তালুকের প্রজা আমি!

নদীর গতি সমুদ্রে, মান্‌কের সব কথার বিরাম কেয়ার-টেক বাবুতে এসে। মুরুব্বা ধরা দেখে ধীরাপদর হাসি চাপা শক্ত হচ্ছিল। সকল ব্যবস্থাপত্রের কর্ত্রী মেম-ডাক্তারটি কে অনুমান করা যাচ্ছে। সেই মেয়েটিই হবে। আর কেয়ার-টেক বাবু কেয়ার-টেকার বাবু হবেন। তবু এবার জিজ্ঞাসা করল, কেয়ার-টেক বাবুটি কে?

কেয়ার-টেক বাবু বুঝলেন না? ইঞ্জিরীতে বলে—নিজেই নিজের নাম দিয়েছে, আসলে ও হল বাজার সরকার, বুঝলেন? গিন্নিমায়ের বাপের দেশের লোক কিনা তাই পো বারো—গিন্নিমা চোখ বুজতে এখন তো সব্বেসব্বা ভাবেন নিজেকে, দু হাতে সব ফাঁক করে দিলে, ইদিকে আমি সোরা থেকে জল গড়াতে গেলেও সন্দোয় সন্দোয় ইঁদুর ধরা বেড়ালের চোখ করে তাকাবে—যেন বাসকো ভেঙে টাকা সরাচ্ছি! কাউকে তো বলা যাবে না কিছু, কথাটি কওয়াই দায়, এক ভাগ্নেবাবুকে বলা যায়—তিনি লোক ভালো। কিন্তু তেনাকেও আগে-ভাগেই হাত করে বসে আছে, বাপের পিসীর মত দরদ দেখায়। তবু তেনাকে বললে শুনবেন, ডেকে ধমক-ধামকও করবেন—কিন্তু তারপর? ভাগ্নেবাবু তো

সর্বক্ষণ নিজের তালে থাকেন, নিজের তালে ঘোরেন—কেয়ার-টেক বাবু তখন আমার কলজে ছিঁড়ে কালিয়া বানিয়ে খাবে না ?

ধীরাপদর হাসিও পাচ্ছে, দুঃখও হচ্ছে। যেন সে-ই ওকে ভাগ্নেবাবুর কাছে কেয়ার-টেক বাবুর বিরুদ্ধে নালিশের পরামর্শ টা দিয়েছিল। ভাগ্নেবাবুটি কে ধীরাপদ এখনো জানে না। কিন্তু আঁচ করতে পারছে। সেই লোকটাই হবে—সেই অমিতাভ ঘোষ! মানকের মুখে ভাগ্নেবাবুর স্বভাব আর আচরণের আভাসে সেই রকমই মনে হয়। শুধু তাই নয়, গতকাল হিমাংশু মিত্র ছেলেকে যার সঙ্গে দেখা হলে ঘড়ি ধরে তাঁর দু ঘণ্টা অপেক্ষা করার কথা জানাতে বলে দিয়েছিলেন, ধীরাপদর এখন ধারণা সে-ও ওই একই লোকের প্রসঙ্গে।

মান্‌কের হাবভাব হঠাৎ বদলাতে দেখে ধীরাপদ ফিরে তাকালো। আধ-ময়লা ধুতির ওপর ফটফটে সাদা গেঞ্জি গায়ে যে লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে দেখা মাত্র ধীরাপদ বুঝল, ইনিই কেয়ার-টেক বাবু। মান্‌কের মতই লম্বা, রোগা—ফর্সা মুখে তামাটে ছোপ। অনাবৃত বাহু দুটিতে যেন আগাগোড়া তামাটে ছিটের কাজ করা। মাথা-জোড়া তেলচকচকে টাকের ওপর গোটাকতক মাত্র কাঁচা-পাকা চুল মাথার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনো। এক নজরে তাকে দেখে নিয়ে গম্ভীর প্রশ্ন করল, টাইপবাবু বলে গেলেন আপনি নাকি সাহেবদের জন্য তিন ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছেন ?

সম্ভাব্য অপরাধীকে যেভাবে জেরা করা হয়, অনেকটা সেই সুর। তার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে ধীরাপদ জবাব দিল, তার বেশিই হবে—

মান্‌কে !

দ্বিতীয় ব্যক্তিটির দিকে ঘুরে হাতেনাতে এবারে আসামীই গ্রেপ্তার করা হল যেন। কিন্তু ধীরাপদ লক্ষ্য করল, ওই এক ডাক শুনেই মান্‌কের এতক্ষণের নিরীহ মুখে রুক্ষ ছাপ পড়ে গেছে একটা। অভিযোগ সম্বন্ধে ঠিক সচেতন নয় বলেই মুখে ঈষৎ উদ্ধত প্রতীক্ষা এবং জবাবের প্রস্তুতি।

কেয়ার-টেক্ বাবুর ঝাঁজালো অনুশাসনে মান্‌কের অপরাধ বোঝা গেল। ভদ্রলোক তিন ঘণ্টা ধরে বসে আছেন আর তুই কোথায় যেতে হবে কি করতে হবে বলে দিসনি, আমাকেও ডাকিসনি! উনি যদি সাহেবদের সে-কথা বলেন, আমার মুখ থাকবে কোথায় ?

ধীরাপদ তাজ্জব। এদিকে মান্‌কেরও সমান ওজনের জবাব, বাবু তিন ঘণ্টা ধরে বসে আছেন আমি কি শুনে জানব ? উনি কি বেল্ টিপেছিলেন—জিজ্ঞেস করুন তো!

ও···কেউ এলে ঘণ্টা বাজিয়ে শাঁখ বাজিয়ে তোমাকে জানাতে হবে আর তা না হলে পালঙ্কে শুয়ে পায়ের ওপর পা তুলে সারাক্ষণ তুমি চুরির মতলব ভাঁজবে, কেমন? আসুক আজ সাহেবরা, দুর দুর করে না তাড়াই তো কি বললাম—

সাহেবদের নামে মান্‌কের সুর বদলালো একটু কিন্তু গলা নামলো না। ধীরাপদকেই একটা জাজ্বল্যমান অত্যাচারের সাক্ষী মানলে সে।—দেখলেন? যা নয় তাই বললে দেখলেন? আচ্ছা আমার কি দোষ বলুন তো, এত বড় বাড়ি, হাতি গললে টের পাওয়া যায় না, আপনি তো মানুষ—তাও বেল টেপেননি—

ফের টকটকিয়ে কথা?

একটা থাপ্পড়ের মতই ঠাস করে কানে লাগল। মান্‌কের মুখ বন্ধ। রাগে গজগজ করলেও আর মুখ খুলতে ভরসা পেল না। কেয়ার টেক বাবু এবারে দুই চোখে ধীরাপদকে ওজন করে নিল একটু।—আপনি কোথায় কাজে লেগেছেন, ওষুধের দোকানে না ফ্যাক্টরীতে?

ধীরাপদ ভাবছে, কাজে লাগার কথাটা টাইপবাবুকে না বলাই ভালো ছিল।

লোকটি চিন্তান্বিত।—আপনি না-হয় ওষুধের দোকানেই চলে যান এখন, বিকেলে মস সবকার সেখানে এলে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেবেন।

ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল, হাসল একটু।—আজ আর কোথাও না, সাহেবরা এলে বলে দেবেন।

কেয়ার-টেক বাবু বিলক্ষণ বিস্মিত, আজ কোথাও না মানে আজ কাজে জয়েন করবেন না? কাজ পেয়ে কাজে লাগার আগ্রহ নেই এ আর দেখেনি বোধ হয়। একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করল, আপনি থাকেন কোথায়?

রসিকতার লোভ আর সম্বরণ করা গেল না। মান্‌কের সঙ্গে আগে আলাপের দরুনই হোক বা তার প্রতি কেয়ার-টেক বাবুর অবিচারের ফিরিস্তি শুনেই হোক, ধীরাপদর সহানুভূতি আপাতত আগের জনের প্রতি। যেভাবে দাবড়ানি দিয়ে থামালো লোকটাকে তাতেও টানটা দুর্বলের দিকেই হওয়া স্বাভাবিক। কেয়ার-টেক বাবুর দিকে চেয়ে হেসেই জবাব দিল, এখন পর্যন্ত থাকার ঠিক নেই কিছু, এখানেও থেকে যেতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে মুখের চকিত রূপান্তর। শুধু কেয়ার-টেক বাবু নয়, মান্‌কেও ক্ষোভ ভুলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপর নিজেদের মধ্যেই দৃষ্টি বিনিময়। সাদা অর্থ, এ আবার কি ঝামেলার কথা!

হাসি চেপে ধীরাপদ দরজার দিকে এগোলো। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে

রমণী পণ্ডিতের কথাটাই মনে পড়ে গেল। সিংহও ঘুমিয়ে থাকলে নিজে থেকে হরিণ গিয়ে তার মুখে ঢোকে না—চেষ্টা থাকা চাই। জবাব দিলে হত, শনির দৃষ্টি সামনে পড়লে চেষ্টাতেও কিছু হয় না, পোড়া শোল মাছও পালায়—

কিন্তু ধীরাপদর কিছু লোকসান হয়নি, এতক্ষণের প্রতীক্ষার ক্লান্তিও তেমন টের পাচ্ছে না আর। ওই লোক দুটিই অনেকটা পুষিয়ে দিয়েছে। জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানের এই আল-বাঁধা ক্ষেতে কত রকম জীবনের চাষ তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে?

বাবু! বাবু!

ধীরাপদ ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, ব্যস্ত সমস্ত ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াল।

তাকেই ডাকা হচ্ছে। ডাকছে মান্কে।

হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে বড়সড় একটা দম নিয়ে উদ্ভাসিত মুখে জানালো, এক্ষুনি ফিরতে হবে, ফ্যাক্টরী থেকে ছোট সাহেবের টেলিফোন এসেছে।

ইচ্ছে খুব ছিল না, তবু ফিরতেই হল। কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত যেতে হল না। গায়ে জামা চড়িয়ে আর ক্যাম্বিসের জুতোয় পা গলিয়ে কেয়ার-টেক বাবু নিচে নেমে এসেছে। গম্ভীর মুখে সংবাদ দিল, ভাগ্নেবাবুর খোঁজে ফ্যাক্টরী থেকে ছোট সাহেবের টেলিফোন এসেছিল। কেয়ার টেক বাবু ধীরাপদর কথা জানাতে সঙ্গে করে ওষুধের দোকানে পৌঁছে দিয়ে আসার হুকুম হয়েছে।

ধীরাপদ আপত্তি করল না

মধ্য কলকাতার সাহেব-পাড়ায় মস্ত ওষুধের দোকান। রাস্তায় দশ-বিশ গজ দূরে দূবে যেমন দেখে তেমন নয়। চোখে পড়ার মতই। গোটা একটা দালানের সমস্ত নিচের তলাটা দোকানের দখলে। এমাথা-ওমাথা কাউণ্টারে কম করে পনেরো-বিশজন কর্মচারী দাঁড়াতে পারে। গ্লাসকেস্এ ওষুধ সাজানো। কাউণ্টারের এধারে আগাগোড়া কাচ-দরজার আলমারি। চার আঙুলও ফাঁক নেই ভিতরে, ওষুধে ঠাসা। ভিতরের একদিকে 'ডিসপেনসিং রুম'—মিকশ্চার পাউডার ইত্যাদি তৈরি হয় সেখানে। অন্যদিকে ডাক্তারের চেম্বার। চেম্বারের সামনে গোটাকতক চকচকে বেঞ্চ পাতা, কয়েকটা মোম-পালিশ চেয়ারও।

দুপুরে এত বড় দোকানটায় ঝিমন্ত অবস্থা। এদিকে-ওদিকে দু-চারজন খদ্দের মাত্র। কর্মচারীও এ-সময়ে পাঁচ সাতজনের বেশি দেখল না। ডাক্তারের চেম্বার শূন্য। দূরে আর এক কোণে তকতকে অর্ধেক কাচ-ঘেরা ক্যাশ-চেম্বার।

হাল-ফ্যাশানের বিলিতি কায়দার দোকান। মেডিক্যাল হোম।

ধীরাপদকে সঙ্গে করে এনে প্রথমেই ম্যানেজার বাবুর খোঁজ করল কেয়ার-

-টেক বাবু। চারটের আগে ম্যানেজার বাবু ডিউটিতে আসেন না শুনে নিজের পছন্দমত বাইশ-চব্বিশ বছরের একটি চটপটে ছোকরাকে ডেকে তার হাতে যেন সঁপেই দিয়ে গেল ধীরাপদকে। বলে গেল, সাহেবদের নিজের লোক তাই নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে—ম্যানেজার এলে যেন তাকে বলা হয়, আর ভালো করে কাজকর্ম শেখানো হয়।

ছেলেটি সকৌতুকে সাহেবদের নিজের লোকের আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে মাথা নাড়ল।

কর্তব্য শেষ। কেয়ার-টেক বাবুর প্রস্থান। ধীরাপদর ধারণা, সে-ও মিত্র-বাড়িতে আস্তানা নিতে পারে সেই আশঙ্কাতেই তার এই অন্তরঙ্গ সতর্কতা।

সদ্যপরিচিত ছেলেটি রসিক আর তার রসনাও মুখর। অন্তত সংযত নয় খুব। ধীরাপদকে নিয়ে কোণের বেঞ্চিতে বসল। নাম জেনে নিল, নিজের নাম বলল। রমেন—রমেন হালদার। ছ বছর ধরে এই দোকানে কাজ করছে। ধীরাপদ আগে কোন্ দোকানে কাজ করত, ডিস্পেনসিং শিখবে না কাউণ্টারে দাঁড়াবে? কোনো কিছুরই অভিজ্ঞতা নেই জেনে অবাক একটু। এত লোক থাকতে আর একজন লোক ঢোকানো দরকার হল কেন? ও, সাহেবের নিজের লোক—তাই! মনে মনে হাসছে, কেমন নিজের লোক তা এই সামান্য কাজে ঢোকা দেখেই বুঝে নিয়েছে।

চমৎকার দোকান। এ তল্লাটে বাঙালীর এত বড় দোকান আর কই!

এখন তো দোকান ফাঁকা, দেখবেন বিকেলে আর সন্ধ্যার পর। সকালেও ভিড় থাকে কিছু, বিকেলের মত অত নয়। সন্ধ্যার পর তো এক-কুড়ি লোক কাউণ্টারে দাড়িয়েও হিমসিম খায়। আর ঠেলে রোগীও আসে তখন, সে-সময় আবার ডক্টর মিস্ সরকারের চেম্বার-আওয়ার তো—

পলকের কৌতুকাভাস ধীরাপদর চোখ এড়ালো না। দোকানে সবসুদ্ধ চারজন ডাক্তার বসেন। সকাল আটটা থেকে দশটা একজন, দশটা থেকে বারোটা আব একজন। তারপর বিকেলে চারটে থেকে ছ'টা একজন, শেষে ছ'টা থেকে আটটা মিস সরকার। প্রথম তিন ডাক্তারই বিলেত-ফেরত, তবু মিস সরকাবেরই রোগী বা রোগিণী বেশি। মন্তব্য, হবেই তো—রাতের দিকেই সব রোগের জের বাড়ে, বুঝলেন না?

ধীরাপদ বুঝল। মাত্র বাইশ-তেইশ হ:ব বয়েস। পেকেছে ভালো।

মিস সরকার কোম্পানীর কেউ, না শুধু ডাক্তার?

ব্যস, এইটুকু থেকেই রমেন হালদার আরো ভালো করে বুঝে নিয়েছে

কেমন আপন-জন সাহেবদের! নিশ্চিন্তে মুখ আলগা করা যেতে পারে আরো একটু। বলল, আপনি কি রকম আপনার লোক দাদা সাহেবদের—মিস সরকারকে চেনেন না? উনিই তো দণ্ডমুণ্ডের মালিক আমাদের। কোম্পানীর মেডিক্যাল অ্যাডভাইসার, দোকানের ডাক্তার আর সুপারভাইজার, নার্সিং হোমের অর্ধেক মালিক। সকলে ঠিক পছন্দ করেন না, আমার কিন্তু বেশ লাগে দাদা—

ওদিকটা একবার দেখে নিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল।

ছেলেটা ফাজিল হলেও ধীরাপদর মন্দ লাগছে না। হাসি-খুশিটা প্রাণবন্ত। নার্সিং হোম প্রসঙ্গে জানা গেল, কোম্পানীর সঙ্গে ওটার কোনো সম্পর্ক নেই। ওর মালিক মিস সরকার আর ছোট সাহেব। ইকোয়াল পার্টনার্স। মস্ত মস্ত ঘরের ফ্ল্যাট, একটা মিস সরকারের বেড-রুম, দু ঘরে চারটে বেড, আর একটা ঘরে বাদবাকি যা কিছু। মাস গেলে তিনশ পঁচাত্তর টাকা ভাড়া—মেডিক্যাল অ্যাডভাইসারের ফ্রী-কোয়ার্টার প্রাপ্য বলে ভাড়াটা কোম্পানী থেকেই দেওয়া হয়। আর সেখানে আলমারি বোঝাই যে-সব দরকারী পেটেণ্ট ওষুধ-টষুধ থাকে তাও কোম্পানী থেকেই নার্সিং হোম-এর হেড-এ অমনি যায়, দাম দিতে হয় না। খুব লাভের ব্যবসা দাদা, বুঝলেন?

আবার হি-হি হাসি।

ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক চারটেয় ম্যানেজার হাজির। বেঁটে-খাটো মোটা-সোটা—মাথায় কাঁচাপাকা একরাশ ঝাঁকড়া চুল। বয়েস পঞ্চাশের কম নয়। তাঁকে দেখেই রমেন হালদার চট করে উঠে একদিকে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল কি। ধীরাপদর কথাই হবে। কথার ফাঁকে ছেলেটাকে হাসতেও দেখা গেল। সাহেবদের আপন-জন জানানোর ফুর্তি হয়ত।

ম্যানেজার ঘুরে দাঁড়িয়ে সেখান থেকেই দেখলেন একবার। নিস্পৃহ দৃষ্টি। বিজ্ঞাপন লেখার প্রত্যাশায় এলে অম্বিকা কবিরাজ বা নতুন-পুরনো বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবু যে চোখে তাকান অনেকটা সেই রকম। তাঁদের থেকেও নিরাসক্ত।

উঠে দাঁড়িয়ে ধীরাপদ দু হাত জুড়ে নমস্কার জানালো। জবাবে তিনি ঝাঁকড়া চুলের মাথাটা একটু নাড়লেন শুধু। ডাকলেনও না বা কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না। তার কাজের গুণাবলী বা কেরামতি রমেন হালদারই জানিয়ে দিয়েছে সম্ভবত। প্রথম নির্বাক দর্শনেই লোকটিকে কড়া মেজাজের মনে হল ধীরাপদর।

খানিক বাদে এক ফাঁকে রমেনই কাছে এলো আবার।—ম্যানেজারকে বললাম আপনার কথা, ওঁর মেজাজ.অমনি একটু ইয়ে তো—বলছিলেন, কাজ জানে না কম্ম জানে না হুট করে আবার একজনকে ঘাড়ে চাপানো কেন? আপনি কিছু ভাববেন না, আমি আপনাকে দু দিনেই শিখিয়ে দেব, কোন্ আলমারির কোন্ তাকে কোন্ রকমের ওষুধ থাকে এই তো—

বিকেল থেকে দোকানের চেহারা অন্যরকম। কর্মচারীরা একে একে এসে গেল। খদ্দেরের ভিড়ও বাড়তে লাগল। পাইকিরি আর খুচরো দু-রকমের বিক্রী, ভিড় হবারই কথা। রমেন হালদার বাড়িয়ে বলেনি, সন্ধ্যের দিকে দিশেহারা অবস্থাই বটে। কর্মচারীদের যান্ত্রিক তৎপরতা সত্ত্বেও খদ্দেরের তাড়ায় তাদেরও তাড়া বাড়ছে। ওটা আনো সেটা আনো, ওটা বার করো সেটা বার করো, ওটা দেখাও সেটা দেখাও—। কে কোন্টা আনছে, বার করছে, দেখাচ্ছে, ধীরাপদ হদিস পেয়ে উঠছে না। এরই মধ্যে একটু ফাঁকা হলে কাউণ্টারের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে সে, আবার ভিড় বাড়লে বাইরের দিকে সরে আসছে, বা জায়গা থাকলে বেঞ্চিতে বসছে।

ছটা নাগাদ ফুটপাথের ওধারে গাড়ি দাঁড়াল একটা। কোম্পানীর গাড়ি, স্টেশান-ওয়াগন গোছের। ড্রাইভার শশব্যস্তে নেমে পিছনের দরজা খুলে দিল।

যে নামল, মনে মনে ধীরাপদ তাকেই আশা কর্ছিল হয়ত।·· ডক্টর মিস লাবণ্য সরকার।

গোটা নামটা কেউ বলেনি তাকে। ডাক্তারের চেম্বারের গায়ে অ্যাটেণ্ডিং ফিজিসিয়ানদের নামের বোর্ড থেকে দেখেছে। চারটে থেকে ছটার ডাক্তার একটু আগে বিদায় নিয়ে গেছেন।

আগের দিনের মতই শিথিল চরণে দোকানে ঢুকল। পিছনে সেই মস্ত ব্যাগ হাতে ড্রাইভার। প্রতীক্ষারত রোগীদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে খদ্দেরদের পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। ওদিক দিয়ে অর্থাৎ দোকানের অন্দরমহল দিয়ে চেম্বারে ঢোকার আর একটা দরজা আছে। রোগীদের দেখার সময় ধীরাপদর সঙ্গেও একবার চোখোচোখি হয়েছে, কারণ সে ওদিকটাতেই দাঁড়িয়েছিল। আলাদা করে কিছু খেয়াল করেছে বলে মনে হল না।

ভিতরে যেতে যেতে যে-কজন কর্মচারীর মুখোমুখি হয়েছে, সকলকেই জোড়-হাত কপালে ঠেকাতে দেখা গেছে। রমেন হালদার ওদিক থেকে এগিয়ে এসে সামনাসামনি হয়েছে এবং তৎপর অভিবাদন জ্ঞাপন করেছে।

এমন কি এতক্ষণের হাঁক-ডাক আদেশ-নির্দেশে ব্যস্ত ম্যানেজার এই প্রথম মুখে একটু হাসি টেনে একটা হাত কপালে তুললো, তাঁর অন্য হাতে ওষুধের প্যাকেট।

একটু বাদে এদিকের দরজা ঠেলে রোগীদের সম্মুখীন হতে দেখা গেল মহিলাকে। গায়ে ঢোলা সাদা এপ্রন, হাত কনুয়ের ওপর গোটানো, গলায় হারের মত স্টেথোসকোপ ঝুলছে। দেখে ধীরাপদরও রোগী হবার বাসনা। বেঞ্চি ক'টায় ঠাসাঠাসি লোক। একটা বেঞ্চে শুধু মেয়েছেলে। চেয়ার ক'টাও খালি নয়। এসেই বেয়ারার হাতে স্লিপ দিতে হয়, সেই স্লিপ অনুযায়ী পর পর ডাক পড়ে। যারা আগের পরিচিত রোগী অথবা যারা শুধু রিপোর্ট করতে এসেছে—একে একে তাদের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়েই কথা বলল। অসুখের খবর নিল, প্রেসক্রুপশান দেখল, তারপর নির্দেশ দিয়ে বিদায় করল। ওষুধ বদলানোর প্রয়োজনে কাউকে বা বসতে বলল। তারপর স্লিপ অনুযায়ী একজন একজন করে নিজেই ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। আগের ডাক্তারের সঙ্গে রোগী দেখায় তারতম্য লক্ষ্য করল ধীরাপদ। আগের ডাক্তারটিকে একবারও চেয়ার ছেড়ে উঠে আসতে দেখেনি। লাবণ্য সরকার পর্যবেক্ষণ শেষ করে প্রত্যেকটি রোগীর সঙ্গে বেরিয়ে আসছে আর পরের জনকে ডেকে নিচ্ছে।

ধীরাপদর আর কেনা-বেচার দিকে ফিরে যাওয়া হয়ে উঠল না। সেই এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। বেঞ্চির খালি জায়গা নতুন রোগী বা রোগিণীর আবির্ভাবে ভরে উঠতে সময় লাগছে না। সকলে স্লিপ পাঠাচ্ছে তাও নয়। মনে মনে ধীরাপদ হিমাংশু মিত্রের বুদ্ধির তারিফ করেছে এরই মধ্যে। এমন সবল আকর্ষণ রচনার দরুন বাহাদুরি প্রাপ্য বটে। মহিলার গলার স্বরটি পর্যন্ত চেহারার সঙ্গে মানায়। মেয়েদের তুলনায় নিটোল ভরাট কণ্ঠস্বর। চোখ বুজে শুনলে মনে হবে অল্পবয়সী ছেলের মিষ্টি গলা। যতবার বেরুচ্ছে, ধীরাপদ নিরীক্ষণ করে দেখছে। নামটাও মানায়। লাবণ্য। নারী-সুলভ ঢলঢলে লাবণ্যের চিহ্নমাত্র নেই বলেই ওই নাম বেশি মানায়। যা আছে সেটুকু উপলব্ধি করার মত, দেখার মত নয়। রঙ খুব ফর্সা নয়, ফর্সা করার চেষ্টাও নেই। চুল টেনে বাঁধা, ফলে ওদিক থেকেও কিছুটা লাবণ্য চুরি। চোখের দৃষ্টি গভীর অথচ নিঃসঙ্কোচ, কিছুটা বা নির্লিপ্ত। ঠোঁটের ফাঁকে একটু-আধটু হাসির আভাস কমনীয় বটে, কিন্তু তেমন অন্তরঙ্গ নয়। এক ধরনের জোরালো স্পষ্টতার আড়ালে নারী-মাধুর্য প্রচ্ছন্ন রাখার মধ্যেই লাবণ্য নাম সার্থক।

পুরুষের চোখ অলক্ষ্যে যতই উঁকিঝুঁকি দিক, অমন মেয়ে সামনাসামনি হলে নিজেকে দোসর ভাবা শক্ত।

লাবণ্য সরকার সেটুকুও জানে যেন।

বেঞ্চি আর চেয়ার প্রায় ফাঁকা। এদিক ওদিকে দুই একজন বসে তখনো। শেষের যে লোকটিকে ডেকে নিয়ে গেছে তাকে দেখতে সময় লাগল একটু। ইতিমধ্যে আরও জনাকতক নতুন আগন্তুক বেঞ্চি দখল করেছে। ওই জোড়াটি বোধ হয় স্বামী স্ত্রী। আগেও দু চারজনকে সস্ত্রীক আসতে দেখেছে। স্বামীটি রোগী কি স্ত্রীটি রোগিণী ধীরাপদ অনেক ক্ষেত্রেই ঠাওর করে উঠতে পারেনি। তাদের দিকে চেয়ে মনে মনে সেই গবেষণাতেই মগ্ন ছিল।

দরজা ঠেলে লাবণ্য সরকার বেঞ্চিতে আবার নতুন আগন্তুক দেখে ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তার পরে ধীরাপদর দিকেই চোখ গেল তার। কে তেমন খেয়াল করেনি, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, শুধু সেটুকুই লক্ষ্য করছিল। যে ক'জন প্রতীক্ষা-রত তাদের সকলের আগে এসেছে ভেবেই ডাকল, এবারে আপনি আসুন।

সমস্ত দিনের উপোসী মুখে অসুস্থতার ছাপ পড়াও বিচিত্র নয়। ধীরাপদ যতটা সম্ভব কোণের দিকে মুখ করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। থতমত খেয়ে দু-এক পা এগিয়ে এলো। আহ্বানকারিণী চেম্বারের দিকে এগোতে গিয়েও মুখের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল। ভুরুর মাঝে কুঞ্চন-রেখা। কিছু স্মরণের চেষ্টা।

আপনি আচ্ছা, আসুন। ভিতরে ঢুকে গেল। অগত্যা বেঞ্চি ক'টার পাশ কাটিয়ে ধীরাপদও।

একটা ছোট টেবিলের এদিকে দুটো চেয়ার, উল্টোদিকে ডাক্তারের নিজের। টেবিলের ওপর প্রেসক্রুপশান প্যাড আর সেই বড় ব্যাগটা। দেয়ালের গায়ে রোগী পরীক্ষার হাত-দেড়েক চওড়া ধপধপে বেড।

নিজের চেয়ারটা টেনে বসল লাবণ্য সরকার। ওকে বসতে বলল না। কাছে এসে না দাঁড়ানো পর্যন্ত চেয়ে রইল। ভুল হচ্ছে কি না সেই সংশয়।
—আপনিই কাল মিস্টার মিত্রের বাড়ি গেছলেন না?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, গিয়েছিল।

আপনাকে এখানে কে পাঠিয়েছে?

সিতাংশুবাবু এখানে আসতে বলেছেন শুনলাম

গতকাল হিমাংশুবাবু বলে খোঁজ করতে লাবণ্য সরকার বাবুকে মিস্টার মিত্র করে নিয়ে জবাব দিয়েছিল ধীরাপদর মনে আছে। আজও মুখের ওপর ঠাণ্ডা দুই চোখ একবার বুলিয়ে দিয়ে বলল, তিনি সমস্ত বিজনেসের অর্গা-

নিজেশন চীফ্—সকলে ছোট সাহেব বলে। তা আপনি সেই থেকে ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন, ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

ধীরাপদ ঘাড় নাড়ার আগেই টেবিলের বোতাম টিপল। বেয়ারা হাজির।

ম্যানেজার বাবু—

পরক্ষণে ভিতরের দরজা ঠেলে ম্যানেজারের আবির্ভাব। রোগী ডাকার জন্য লাবণ্য সরকার চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ইনি ওদিকে দাঁড়িয়ে কেন, কি কাজ দেখিয়ে-টেখিয়ে দিন—যান এঁর সঙ্গে।

শেষের নির্দেশ ধীরাপদর উদ্দেশে। গুরুগম্ভীর ম্যানেজারের সঙ্গে বিব্রত দৃষ্টি বিনিময়। তাঁকে অনুসরণ করে ভিতরের দরজার এধারে আসতেই বিরক্তি চাপতে পারলেন না ভদ্রলোক।—ওদিকে হাঁ করে দেখার কি ছিল, এদিকে যান—দেখুন কি হচ্ছে না হচ্ছে। এই তাড়াহুড়োর সময় কাজ দেখান বললেই দেখানো যায় না, কাজ শিখতে হলে দুপুরের নিরিবিলিতে এসে দেখতে হবে—

গজগজ করতে করতে আর একদিকে চলে গেলেন তিনি।

ব্যাপার দেখে ধীরাপদর হাসিই পাচ্ছে। ভিতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার দরুন কাউণ্টারের কর্মচারীদের সঙ্গে মিশে গেল সেও। কেনা-বেচার হিড়িক কমেনি তখনো। যান্ত্রিক তৎপরতায় কর্মচারীরা ওইটুকু পরিসরের মধ্যেই একে অন্যের পাশ কাটিয়ে আলমারির কাচ-দরজা ঠেলে ঠেলে ওষুধ বার করছে—শিশি বোতল প্যাকেট ট্যাবলেট। এ-মাথা ও-মাথা ওষুধ-ঠাসা আলমারির মধ্যে কোথায় কোন্ খুঁটিনাটি বস্তুটি রয়েছে তাও যেন সকলের নখ-দর্পণে। ধীরাপদ ওষুধ অনেক কিনেছে, এভাবে ওষুধ বার করতেও দেখেছে—কিন্তু কাজটা যে এমন দুর্বোধ্য রকমের দুরূহ একবারও ভাবেনি। হালদার আশ্বাস দিয়েছিল দু দিনেই শিখিয়ে দেবে, দু বছরেও ওর দ্বারা হবে কিনা সন্দেহ।

আঃ, আপনি ও-দিকে সরে দাঁড়ান না, কাজের সময়—

সচকিত হয়ে ধীরাপদ তিন-চার হাত সরে দাঁড়াল, প্যাসেজ জুড়ে আড়া-আড়ি দাঁড়িয়েছিল বলে বিরক্তিটা তারই উদ্দেশে। খানিক বাদে আলমারি খুলতে বাধা পেয়ে আর একজন বলল সরে দাঁড়ান। ধীরাপদ আবার দু-চার পা এগিয়েছে। একজন খদ্দের ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রেসক্রুপশান এগিয়ে দিতে বিব্রত মুখে হাত বাড়িয়েছে, সেই সঙ্গে কর্মচঞ্চল ব্যস্ততায় হাত বাড়িয়েছে পাশের কর্মচারীটিও। হাতে হাতে কলিশন। অস্ফুট বিরক্তি, আপনি এটা নিয়ে কিছু বুঝবেন এখন? সরুন ওদিকে—

--

ধীরাপদ আবারও সরেছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে এমনি বারকতক তাড়া খেয়ে সরতে সরতে ধীরাপদ একেবারে দরজার কাছটিতে এসে গেছে। তার পাশেই তখন যে-লোকটি দাঁড়িয়ে সে যদি সরতে বলে, দরজা ঠেলে ধীরাপদকে এরপর দোকানের বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়।

বলার অপেক্ষা না রেখে বাইরেই চলে এলো।

ফাঁকা রাস্তায় পা চালিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিছুই করতে হয়নি তবু বেশ একটা ধকল গেল যেন। চাকরি-পর্বের এখানেই ইতি, আর এ-মুখো হচ্ছে না। শাস্তি। বিবেকের তাড়নায় ভুগতে হবে না আর।

কিন্তু পরদিন এ নিশ্চিন্তটা দুপুরের ও-ধার পর্যন্ত গড়ালো না। ওষুধের দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ওষুধ বিক্রী করার চাকরি দেবার জন্যে চারুদির এমন আগ্রহ—সে-রকম কিছু মনে হচ্ছে না। হিমাংশু মিত্রকে লেখা চিঠির সুর, চিঠির ভাষা মনে আছে। লিখেছিলেন, নির্দ্বিধায় দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। সেটা এই দায়িত্ব? তাছাড়া চিঠি খোলা হয়েছে ধরে ফেলেও হিমাংশু মিত্র যে ব্যবহার করেছেন আর যে-কথা বলেছেন তাতে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ওষুধ বিক্রির কাজটা ঠিক প্রত্যাশিত নয়।

নতুন-পুরনো বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবুর সঙ্গে দেখা করবে বলে বেরিয়েও রাস্তা বদলে ধীরাপদ মধ্য কলকাতার সেই ওষুধের দোকানে এসেই ঢুকল।

আগের দিনের মতই দুপুরের নিরিবিলি পরিবেশ। আজও সেই ছোকরা অর্থাৎ রমেন হালদারই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো।—দাদা কাল পালালেন কখন? ম্যানেজারকে না বলেকয়ে ওভাবে যায়! ম্যানেজার চটে লাল, কড়া মানুষ তো—আজ শোনাবে'খন। তাছাড়া সকালেও তো এলেন না, ডিউটির টাইমও ঠিক হল না।

কোনরকম উৎকণ্ঠার আভাস না দেখে একটু বোধ হয় বিস্মিত হল সে। পরামর্শ দিল, যা-ই বলুক, মুখ শুকিয়ে বলবেন নতুন মানুষ ভুল হয়ে গেছে—

একটু বেশি তড়বড় করলেও ছেলেটাকে গতকালই ভালো লেগেছিল ধীরাপদর। এই নীরস কর্মচঞ্চলতার মধ্যেও প্রাণবন্ত। অন্যের কান বাঁচিয়ে কোণের বেঞ্চিতে বসে ধীরাপদ বলল, ম্যানেজারের জন্যে ভাবনা নেই, ফ্যাক্টরীটা কোথায় বলো দেখি ভাই?

প্রশ্নটা শুনে হালদারকে আসন পরিগ্রহ করতে হল। সেখানে যাবেন?

মাথা নাড়ল।

সাহেবদের সঙ্গে দেখা করবেন ?

ভ্রু চোখ গোল হতে দেখে ধীরাপদ হেসেই ফেলল।

ছেলেটাও হাসল।—আমাদের কাছে ওঁরা আবার ভগবানের মতই কি না ··আপনি এখানে কাজ করবেন না ?

দেখা যাক্ –

ফ্যাক্টরীর হদিস দিয়ে রমেন আবারও সংশয় প্রকাশ করল, কিন্তু আপনি ভিতরে ঢুকবেন কি করে, দরজায় তো বন্দুকওয়ালা পাহারা—এন্‌কোয়ারি ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করতে হবে, সে সন্তুষ্ট হলে সাহেবদের টেলিফোন করবে, হুকুম হলে তবে যেতে দেবে।

এত গণ্ডগোল জানত না, ধীরাপদ দমে গেল একটু।

রমেনই আর একটা সহজ পথ বাতলে দিল। জানালো, তিনটের সময় মেডিক্যাল হোমের গাড়ি যাবে ফ্যাক্টরী থেকে মাল আনতে, ড্রাইভারকে বলে দিলে দোকানের কর্মচারী হিসেবে সেই গাড়িতেই ধীরাপদ বিনা বাধায় ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। সহজ পন্থা দেখিয়ে দেবার ফলে ভয়ও পেল একটু, সাহেবরা রেগে যাবেন না তো ? আমি বলেছি বলবেন না যেন···

ধীরাপদ হেসে অভয় দিল।

তিনটে বাজতে ঘণ্টাখানেক দেরি তখনো। ম্যানেজার আসার আগেই সরে পড়তে পারবে সেটা মন্দ নয়।

রমেন হালদার গম্ভীর মুখেই বলে যেতে লাগল, দেখুন যদি অন্য কিছু পেয়ে যান, এখানে আমাদের যা মাইনে—ছ বছর ধরে আছি, পাচ্ছি মাত্র একশ পঁচিশ—চলে আজকের দিনে ? ম্যানেজারই পায় মাত্র সাড়ে তিনশ—সেই গোড়া থেকে আছে, আমাদের আর কত হবে। অল্প কিছু টাকা হাতে পেলে নিজেই একটা দোকান খুলতাম, আটঘাট সব জেনে গেছি, টাকাই নেই, কি হবে—

কি মনে পড়তে সমস্যার কথা ভুলে চপল কৌতূহলে ভ্রু চোখ উৎসুক হয়ে উঠল তার। –ডক্টর মিস সরকার কাল আপনাকে ঘরে ডেকে কি বললেন ?

বিশেষ কিছু না।

সংক্ষিপ্ত জবাব মনঃপূত হল না। একটু অপেক্ষা করে বলল, কিন্তু তাঁকে ডিঙিয়ে আপনি সাহেবদের সঙ্গে দেখা করবেন···সাহেবরা তো আবার তাঁর

কথান্তেই ওঠেন বসেন, বিশেষ করে ছোট সাহেব—এখানকার যা কিছু সবই মিস সরকারের হাতে।

ধীরাপদ নিরুত্তর। চিন্তিত নয় তা বলে, যেটুকু নাড়াচাড়া করে দেখছে, খেলার ছলেই দেখছে। এতকালের নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে ফিরে যেতে মনের একটা দিক সব-সময়েই প্রস্তুত।

—কিন্তু যাই বলুন দাদা, অন্তরঙ্গ জনের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করার জন্যেই যেন আরো কাছে ঝুঁকে রমেন হালদার গলা খাটো করে বলল, মিস সরকারকে আপনার ভালো লাগেনি? যতক্ষণ থাকেন উনি আমার কিন্তু বেশ লাগে, অমন জোরালো মেয়েছেলে কম দেখেছি, আর তেমনি চালাক, মাইনে বাড়িয়ে নেবার জন্য একটু ইয়ে করতে গিয়ে আমার যা অবস্থা শুনলে আপনি হেসে মরবেন—

হেসে মরার বাসনা না থাকলেও ধীরাপদর শোনার আগ্রহটুকু অকৃত্রিম। মিস সরকারকে তারও ভাল লেগেছে কি না জিজ্ঞাসা করতে নিজের অন্তস্তলে হঠাৎই যেন একঝলক আলোকপাত হয়েছিল। ধীরাপদর যা স্বভাব, মিত্র-বাড়িতে গতকাল ওইরকম প্রতীক্ষার পর কেয়ার-টেক বাবুর সঙ্গে তার ওষুধের দোকান পর্যন্ত আসার কথা নয়। আসার পিছনে নিজের অগোচরে একটুখানি আকর্ষণ ছিল, মানকের মুখে মেম-ডাক্তারের কথা শুনে রমণীটিকে আর একবার দেখার বাসনা হয়েছিল বইকি। সেই বাড়িতে অল্প একটু দেখার ফাঁকে তার নির্লিপ্ত বলিষ্ঠতাটুকু এক ধরনের কৌতূহল যুগিয়েছে। তাই মনে হয়েছে, ভালো করে দেখা হয়নি, ভালো করে দেখতে পারলে কিছু যেন আবিষ্কারের সম্ভাবনা। ধপধপে সাদা মোটরে তার পাশে সিতাংশু মিত্রকে নিষ্কম্প শিখার পাশে চঞ্চল পতঙ্গের মত মনে হয়েছিল ধীরাপদর। যখন খুশি গ্রাস করতে পারে, শুধু তেমন তাড়া নেই যেন।

দোকানের অমন কাজের ঝড়ের মধ্যে মহিলার আবির্ভাব বায়ুগতি কর্ম-রথের বল্‌গা-ধরা সারথিনীর মত। ভ্রূকুটি নেই অথচ এক ভ্রূকুটিতে সব ওলট-পালট হতে পারে। ধীরাপদ তন্ময় হয়েই দেখছিল, সমস্ত দিনের অনাহারের ক্লেশও ভুলে গিয়েছিল। তন্ময়তায় ছেদ পড়েছিল ওকেই ডেকে বসাতে, হক-চকিয়েও গিয়েছিল একটু। কাউন্টারের সেই স্বল্পক্ষণের অভিজ্ঞতার ফলেও আর দোকানমুখো হবার কথা নয় ধীরাপদর। নানান সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে তবেই এসেছে বটে। কিন্তু কোথায় অলক্ষ্য একটু তাগিদও ছিল। ওই ধরনের মেয়ের প্রতিকূলতা করতে পারার মতই পুরুষোচিত লোভের হাতছানি একটু।

কাল নিজেকে বড় বেশি তুচ্ছ মনে হয়েছিল বলেই পুরুষ-চিত্তের সহজাত উস্‌খুস্নি আজও তাকে দোকানের দিকে ঠেলেছে।

মাইনে বাড়িয়ে নেবার উদ্দেশ্যে লাবণ্য সরকারের সঙ্গে একটু ইয়ে করতে গিয়ে কি হাল হয়েছিল, মনের আনন্দে রমেন সেই কাণ্ডর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বসেছে। অনেক দিন পাঁয়তাড়া কষে সামনে সামনে ঘুর ঘুর করেছে, মিস সরকার এলেই ভিতরের দরজার কাছটিতে কাজ নিয়েছে সে, বেয়ারা ইনজেকশানের স্লিপ নিয়ে এলেই প্রত্যেক বার নিজে গিয়ে ইনজেক্‌শানের ওষুধ সাপ্লাই করেছে, বেয়ারার হাত দিয়ে পাঠায়নি। মিকশ্চারের প্রেসক্রপশানও নিজে নিয়ে এসেছে। মিস সরকার ইনজেকশানও দেন সব থেকে বেশি, মিকশ্চারের প্রেসক্রপশানও করেন সব থেকে বেশি। ইনজেকশান দেবার জন্য দু টাকা করে পান—কম্পাউণ্ডার ইনজেকশান করলে এক টাকাতেই হয়, কিন্তু রোগীর সামনেই যখন ইনজেকশান চেয়ে পাঠান রোগী তো আর বলতে পারে না এক টাকা বাঁচানোর জন্যে কম্পাউণ্ডারের হাতে ইনজেকশান নেবে! ওদিকে মিকশ্চারের প্রেসক্রপশানেও টাকায় চার আনা লাভ। কম হল নাকি! ছ'শ টাকা মাইনে পান আরো কোন্ না চার-পাঁচশ এই করে হয়? রোগীদের কাছে ওনারই তো কদর বেশি, এই রোজগারের ওপর নার্সিং হোমের রোজগার—ভাবুন একবার! তা যাই হোক, মাইনে যদি কিছু বাড়ে আর নার্সিং হোমেও যদি একটু কিছু পার্ট-টাইম কাজ-টাজ জোটে সেই আশায় রমেন হালদার অনেক দিন বলতে গেলে ওনার পায়ের জুতোর সঙ্গে মিশে থাকতে চেষ্টা করেছিল। তার পর সুযোগ-সুবিধে বুঝে একদিন—আর যখন একটিও রোগী নেই বাইরে—দুর্গা গণেশ স্মরণ করে ভিতরে এসে দিদি বলেই ডেকে বসেছিল। নিজের দিদি হলে ওটুকুতেই স্নেহে চক্ষু ছলছল করে ওঠার কথা—

তার পর? তার পর সে যা হল—রমেনের মুখ আমসি। দিদি ডাক শুনেই এমন ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন যে মনে হচ্ছিল তার সমস্ত মুখে যেন দু টুকরো বরফ বোলানো হচ্ছে।

একটু বাদে মিস সরকার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি বলবে?

রমেনের মনে হয়েছিল চোখের থেকেও গলার স্বর আরো ঠাণ্ডা, একেবারে হাড়ে গিয়ে লাগার মত। যা বলবে বলে এসেছিল ততক্ষণে সব ভুল হয়ে গেছে। যা মুখে এসেছে তাই বলে বসেছে। বলেছে, আজ একটু আগে বাড়ি যাওয়া দরকার ছিল।

রমেনের ধারণা, এতখানির পর এর থেকে অনেক বড় কিছু নিবেদন আশা করেছিলেন মিস সরকারও। আর, দিদি ডাকে না ভুলে জবাব দেবার জন্যেও তৈরি ছিলেন। ওর আরজি শুনে ঠাণ্ডা ভাবটা কমলো একটু। রাত প্রায় ন'টা তখন, তা ছাড়া ছুটি কেউ কখনো ওঁর কাছে চাইতে আসে না, একদিন দু'দিন পর্যন্ত ছুটি ম্যানেজারই মঞ্জুর করে থাকেন। কিন্তু রমেন তো আর অত সব ভেবে বলেনি, যা হোক কিছু বলে ঘর থেকে পালাবার মতলব। কিন্তু কি বিভ্রাটেই না পড়তে হল ওকে ওইটুকু থেকে—প্যাক করে টেবিলের বোতাম টিপে বসেছেন মিস সরকার, ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, এর বোধ হয় একটু আগে ছুটি দরকার, দেখুন।

ব্যস, বাইরে এসে ম্যানেজার হাঁ করে খানিক চেয়ে রইলেন ওর দিকে, কারণ তিনি তো জানেনই যে ওর ডিউটি শেষ হয়েছে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে—ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারে।

তার পর এই মারেন তো সেই মারেন!

ফন্দিটা রমেন হালদার মন্দ বাতলে দেয়নি। বিনা বাধায় সরাসরি একেবারে ফ্যাক্টরীর এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়া গেল। কোম্পানীর গাড়ি দেখে গেটম্যান গোটা ফটক খুলে দিল। বন্দুক হাতে যেখানে পাহারাওয়ালা বসে, সেখানে দিয়ে পাশাপাশি দুজনও ঢুকতে বা বেরুতে পারে না।

কিন্তু এভাবে ভিতরে ঢুকে ধীরাপদ যেন আরো বেশি ফাঁপরে পড়ে গেল। কোথায় কোন্ দিকে যাবে কিছুই হদিস পেল না। বিস্তৃত ঘেরানো এলাকার মধ্যে তিন-চারটে ছোট বড় দালান। দালান বলতে বিশাল এক-একটা গুদোমঘরের মত। শুধু মাঝখানের বড় দালানটা তিনতলা। অনুমানে ধীরাপদ সেদিকেই এগোলো।

তালকানার মত নিচের বড় বড় ঘরগুলোতে এক চক্কর ঘুরে নিল। কোনো ঘরে সারি সারি মেসিনের মধ্য দিয়ে টুপটুপ করে অবিরাম ট্যাবলেট বৃষ্টি হচ্ছে। কোনো ঘরে মেসিনে করে গোটা দশেক বিশাল বিশাল ডেকচি ঘোরানো হচ্ছে—সব ক'টার মধ্যেই নানা আকারের ট্যাবলেট। একজন লোক ডেকচির মধ্যে রঙের মত কি ঢেলে দিচ্ছে। ট্যাবলেট রঙ করা হচ্ছে বোধ হয়। আর একটা ঘরে ইলেকট্রিক ফিট-করা গোটাকতক মস্ত মস্ত আলমারি। এক-একবার খোলা হচ্ছে, বন্ধ করা হচ্ছে। প্রত্যেক তাকে হাতল-অলা বড় বড় ট্রেতে গুঁড়ো ওষুধ শুকোনো হচ্ছে।

কর্মরত এ-পরিবেশটা ধীরাপদর ওষুধের দোকানের থেকে অনেক ভালো লাগল। নিচে না ঘুরে ওপরে উঠে এলো। সেখানেও ঘরে ঘরে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম—যতদূর ধারণা, ওষুধ বিশ্লেষণের কাজ চলছে এখানে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল হিমাংশু মিত্র আজ আসেননি, আর সিতাংশু মিত্র কণ্ট্রোল-রুমে। কণ্ট্রোল-রুমের খোঁজে এদিক ওদিক বিচরণের ফলে একটা প্যাসেজের মুখে যার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা, সে মেডিক্যাল অ্যাডভাইসার লাবণ্য সরকার। একটা প্যামফ্লেট পড়তে পড়তে এদিকেই আসছিল। ধীরাপদ পাশ কাটিয়ে গেলে লক্ষ্যও করত না হয়ত। কিন্তু ধীরাপদ দাঁড়িয়ে পড়ল আর চেয়ে রইল।

কাছাকাছি এসে প্যামফ্লেট সরিয়ে মুখ তুলল লাবণ্য সরকার। নিজের অগোচরেই ধীবাপদব যুক্ত-কর কপাল স্পর্শ করল। ওদিকে প্যামফ্লেট-ধরা হাতখানা সামান্যই নড়ল।—আপনি এখানে ?

ধীরাপদ একবার ভাবল বলে, এমনি ফ্যাক্টরী দেখতে এসেছে। বলে ফেললে পবে নিজের ওপরেই রেগে যেত। জবাব দিল, সিতাংশুবাবু—মানে ছোট সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করব বলে এসেছিলাম।

নামের ভুলটা হয়ত ইচ্ছে করেই করল আর শুধরে নিল। লাবণ্য সরকার বলল, তিনি ব্যস্ত আছেন, আপনার কি দরকার ?

...আমার দরকার ঠিক নয়, আমাকে তাঁর দবকার আছে কি না জেনে নিতে এসেছিলাম।

জবাবে যা স্বাভাবিক তাই হল। দুই চক্ষু ওব মুখের ওপর প্রসারিত হল। কিন্তু ধীরাপদরই বরাতক্রমে সম্ভবত আর বাক-বিনিময়ের অবকাশ থাকল না। ফিটফাট সাহেবী পোশাক-পরা দুটি লোক হন্তদন্ত হয়ে লাবণ্য সরকারকে চড়াও করে ফেলল। একজনের হাতে খোলা মেডিক্যাল জার্নাল একটা, আর এক-জনের হাতে বই। মুখে কিছু একটা আবিষ্কারের ব্যগ্র আনন্দ। বই আর জার্নাল খুলে কোনো সমস্যা-সংক্রান্ত তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার।

লাবণ্য সরকার নিরুৎসুক দৃষ্টিতে বইয়ের ওপর চোখ বোলালো একবার, তার পর বলল, চলুন দেখছি—

এক পা এগিয়েও ধীরাপদর দিকে ফিরে তাকালো।—মিস্টার মিত্র ওপরে।

দুপাশের দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে সামনের দিকে এগোলো। ধীরাপদ চেয়ে আছে। ভক্ত-সমাবেশে অচপল চরণে দেবীর প্রস্থান।

সিতাংশু মিত্রের সঙ্গে দেখা করার আর তেমন তাগিদ নেই। দেখাটা

হিংমাশু মিত্রের সঙ্গে হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। পায়ে পায়ে উপরে উঠল তবু। সামনের এ-মাথা ও-মাথা বিশাল হলঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল সে। এখানকার কর্মরত দৃশ্যটা নয়নাভিরাম। হল-ভরতি তিন সারিতে নানা বয়সের প্রায় একশ লোক ডিসটিল্‌ড্‌ ওয়াটারে অ্যামপুল ধুচ্ছে। প্রত্যেকের সামনে কল ফিট করা একটা করে বেসিন। কলের মুখ দিয়ে রেখার মত তীরের নালে জল পড়ছে। এক-একটা অ্যামপুল ধোয়া হতে তিন সেকেণ্ডও লাগছে না। তার পর জালের মত গর্ত-করা কাঠের র‍্যাকে উপুড় করে রাখা হচ্ছে সেগুলো। গোটা হলঘরটাই সেই উপুড় করা অ্যামপুলএ ঝকঝক করছে। প্রয়োজন ভুলে ধীরাপদ তাই দেখতে লাগল।

হলের ও-মাথার দরজায় সপার্ষদ সিতাংশু মিত্রের আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে অ্যামপুল-ধোয়া কর্মীদের বাড়তি নিবিষ্টতাটুকু উপলব্ধি করা গেল। সিতাংশু মিত্রের দুপাশে জনা-পাঁচেক অনুগত মূর্তি, হাত নেড়ে তাদের উদ্দেশে কি বলতে বলতে এদিকে এগিয়ে আসছে। এ দরজার দারোয়ান শশব্যস্তে টুল ছেড়ে বুকটান করে দাঁড়ালো।

একনজরে মালিক চেনা যায়।

এদিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুই এক কথার পর অনুসরণরত পার্ষদদের বেশির ভাগই ফিরে গেল। তার পর ধীরাপদর সঙ্গে চোখাচোখি।

চৌকাঠ পেরিয়ে সিতাংশু মিত্র এগিয়ে এলো।—আপনি···ও আপনি! ছোট সাহেবের মনে পড়েছে, আপনাকে তো কাল ওষুধের দোকানে যেতে বলেছিলাম—যাননি?

ধীরাপদ ঘাড় নাড়ল, গিয়েছিল।

কথাবার্তা হয়নি বুঝি কিছু, আমারও মনে ছিল না। আচ্ছা আপনি সেখানেই যান, আমি বলে দেব'খন।

ধীরাপদর মুখে বিব্রত হাসির আভাস।—সেখানে কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে ওষুধ বিক্রি করব?

কাজটা নগণ্য অথবা ওর যোগ্য নয় সেই অর্থে বলতে চায়নি, ওর দ্বারা ও কাজ সম্ভব নয় সেইটুকুই ব্যক্ত করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আগের অর্থটাই দাঁড়াল। আর তাতে সুফলই হল বোধ হয়। ছোট সাহেবের মনে পড়ল, কারো কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসার ফলে বাবা ব্যস্ততা সত্ত্বেও লোকটির সঙ্গে দেখা করেছেন, তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন, কোন্ কাজে স্যুট করবে ভাবতে বলেছেন, আর পরদিন এই প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনা করার ইচ্ছেও ছিল।

আচ্ছা আপনি ঘরে গিয়ে বসুন, আমি আসছি।

বেয়ারার প্রতি ওকে ঘরে নিয়ে বসাবার ইঙ্গিত। আর একদিকে চলে গেল সিতাংশু মিত্র। ব্যস্ত, কোনো কারণে একটু চিন্তিতও যেন।

তিনতলার বেয়ারা দোতলার কণ্ট্রোল-রুমের দরজায় মোতায়েন বেয়ারার হেপাজতে তাকে ছেড়ে দিয়ে গেল।

আগাগোড়া কার্পেট বিছানো মস্ত ঘর। দু'দিকের দেওয়ালের কাছে কাচ-বসানো বড় বড় দুটো সেক্রেটেরিয়েট টেবিল। সামনে দুখানা করে শৌখিন ভিজিটারস চেয়ার। মাঝামাঝি জানালার দিক ঘেঁষে স্টেনোগ্রাফারের ছোট টেবিল। একজন মাঝবয়সী মেমসাহেব টাইপে মগ্ন। দামী মেশিন সম্ভবত, টাইপের শব্দটা খট খট করে কানে লাগছে না, টুক টুক মৃদু শব্দ। বড় টেবিলের একটাতে লাবণ্য সরকার সামনে কতগুলো ছড়ানো কাগজপত্র থেকে লিখছে কি।

ঘরে ঢুকেই বাঁ দিকে একপ্রস্থ দামী সোফা-সেটি। বেয়ারা ধীরাপদকে সেখানে এনে বসালো। লাবণ্য সরকার মুখ তুলল একবার।

দ্বিতীয় শূন্য টেবিলটা নিঃসন্দেহে ছোট সাহেবের। পাশের দেয়ালে মস্ত চার্ট একটা, তাতে খুব সম্ভব কারখানার সমস্ত বিভাগেরই নক্সা আঁকা। ও-পাশের দেয়ালে একটা বোর্ডের গায়ে কোন্ বিভাগে কত কর্মচারী উপস্থিত সেদিন তার তালিকা। বিভাগের নামগুলো স্থায়ী হরফের, উপস্থিতির সংখ্যা খড়ি দিয়ে লেখা।

ধীরাপদ আড়চোখে দেখছে এক-একবার। সোজাসুজি চেয়ে থাকলেও কারো কোনো বিরক্তির কারণ হত না—মহিলার নিরুদ্বেগ কাজের গতিতে একটুও ছেদ পড়ত না। সেটুকু উপলব্ধি করেও ধীরাপদ চুরি করেই দেখতে লাগল। খুব যে একাগ্র মনোযোগে কাজ করছে তা নয়, ধীরেসুস্থে হাতের কাজ সেরে রাখছে মনে হয়।

বাইরে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ। প্রথমে ছোট সাহেবের প্রবেশ, পরে অনুবর্তীদের। লাবণ্য সরকার এবারে মুখ তুলে তাকালো।

আজ তো হলই না, কালও হবার কোনো লক্ষণ দেখছি না।—প্রচ্ছন্ন ক্ষোভে উদ্দেশে খবরটা বলতে বলতে সিতাংশু মিত্র নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

হাতের কলমের মুখটা আটকাতে আটকাতে লাবণ্য সরকার উঠে এসে তার সামনের চেয়ারটাতে বসল। অন্য আগন্তুকরা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে। ধীরাপদর দিকে চোখ নেই কারো। তাদের বাক-বিনিময় থেকে সমস্যা কিছু কিছু আঁচ করা যাচ্ছে। নতুন বয়লার চালানো যাচ্ছে না, কারণ

চীফ কেমিস্টের হুকুম নেই। অথচ পুরানো বয়লারের ওপর সরকারী নোটিসের দিন এগিয়ে আসছে। আগন্তুকরা সম্ভবত ওই কাজেরই কর্মচারী, ছোট সাহেবের মন রেখে তারা বয়লার চালানোর সুবিধের কথাও বলছে, আবার চীফ কেমিস্টের বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনাতেই হয়ত অসুবিধের কথাও বলছে।

লাবণ্য সবকার সামনের বোর্ডটার দিকে ইঙ্গিত করল, লোকজন তো সবই উপস্থিত, তাহলে এমন কি অসুবিধে হবে? আপনি তাঁর সঙ্গেই একবার পরিষ্কার আলোচনা করে নিন না. খেয়াল-খুশিমত হবে না বললে চলবে কেন?

প্রস্তাবেব জবাবে খট করে টেলিফোন তুলে কানে লাগালো সিতাংশু মিত্র। —সি, সি! সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর মৃদু শোনালো।—একবার আসবে? কথা ছিল···

টেলিফোন নামালো। মাথা নাড়ল একটু, অর্থাৎ আসছে। ইঙ্গিতে অন্য সকলকে বিদায় দিল। ধীরাপদর ধারণা, এ ফয়সালার মধ্যে তারা থাকতেও চায় না। সিতাংশু মিত্র ঘাড় ফিরিয়ে কর্মচারীদের উপস্থিতি-তালিকার বোর্ডটা দেখছে। আর সেই সঙ্গে নিজেকে একটু প্রস্তুত করে নিচ্ছে হয়ত। সমস্যার ভারে ধীরাপদর কথা মনেও নেই বোধ হয়। সোফার কোণে নির্বাক মূর্তির মত গা ডুবিয়ে বসে আছে সে।

লাবণ্য সরকার নড়েচড়ে বসলো। পদমর্যাদার ঠাণ্ডা অভিব্যক্তির এই প্রথম ব্যতিক্রম একটু।···ধীরাপদর চোখের ভুল না দেখার ভুল? অভ্যস্ত উদাসীনতার বদলে রমণী মুখে চকিত কমনীয়তার আভাস।···দেখার ভুল না চোখের ভুল?

এবারে যে মানুষের চঞ্চল আবির্ভাব তাকে দেখে ধীরাপদ ভিতরে ভিতরে চাঙ্গা হয়ে উঠল। অমিতাভ ঘোষ। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, পাট-ভাঙা দাগ-ধরা দামী স্যুট, ঠোঁটে সিগারেট।

কি রে, কি খবর—

ছোট সাহেবের মুখে সহজতা বজায় রাখার আয়াস।—বোসো, ব্যস্ত ছিলে নাকি?

না। অমিতাভ ঘোষ দুজনকেই দেখল একবার। শূন্য চেয়ারটায় একখানা পা তুলে দিয়ে চেয়ারের কাঁধ ধরে ঝুঁকে দাঁড়াল।—কি ব্যাপার? বয়লার?

হ্যাঁ, আজ তো চললই না, কালও চলবে না?

না। সাফ জবাব।

লাবণ্য সরকার অন্যদিকে মুখ ফেরালো। ছোট সাহেবের কণ্ঠস্বর ঈষৎ অসহিষ্ণু।—কিন্তু না চললে এদিকে সামলাবে কি করে, তাছাড়া বাবা বার বার বলে দিয়েছেন—

সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। বচন শুনে নিজের উপস্থিতির দরুন ধীরাপদর নিজেরই অস্বস্তি।—মামাকে গিয়ে বল্—ঘরে বসে বার বার বললেই বয়লার চলবে, আর কোনো ব্যবস্থার দরকার নেই—

দুই এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সিতাংশু খোঁচাটা হজম করে নিল, তার পর উষ্ণ জবাব দিল সে-ও। - তোমার তো দুদিন ধরে পাত্তা নেই, সেদিনও বাড়িতে বাবা বহুক্ষণ অপেক্ষা করলেন—ঘরে বসে না থেকে তাহলে তোমার পিছনেই ঘুরতে বলি ?

পায়ে করে চেয়ারটা একটু ঠেলে দিয়ে অমিতাভ সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুখের সিগারেটটা অ্যাশপটে গুঁজল।—আমার যা বলার আমি পনেরো দিন আগেই লিখে জানিয়েছি। বয়লার চালাবে কে ? তুই না আমি না ইনি ? শেষের ইঙ্গিত মহিলার প্রতি।

ছোট সাহেব দৃঢ় অথচ মৃদু জবাব দিল, যারা চালাবার তারাই চালাবে, তুমি আপত্তি করছ কেন ?

চেয়ারটা টেনে নিয়ে এবারে অমিতাভ বসল ধুপ করে।—বেশ, কারা চালাবে ডাকো তাদের, বুঝে নিই কি করে চালাবে। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ছোট সাহেবের সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল।

কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যে সিতাংশুর কাউকে ডাকার অভিলাষ দেখা গেল না। তার বক্তব্য, পুরনো বয়লারের লোক দিয়ে নতুন বয়লার আপাতত চালু করা হোক, পুরনোটা তো বন্ধই হয়ে যাচ্ছে, পরে একসঙ্গে দুটোই যখন চলবে তখন দেখেশুনে জনাকতক পটু কারিগর নিয়ে আসা যাবে। সমর্থনের আশাতেই বোধ করি নির্বাক রমণীমূর্তির দিকে তাকালো সে। কিছু বুঝুক না বুঝুক মেম-টাইপিস্টের হাত চলছে না।

সামনের বোর্ডের ওপর চোখ রেখে লাবণ্য সরকার এই প্রথম মন্তব্য করল, ফুল স্ট্রেংথ তো আপাতত আমাদের আছেই, ওখানকার রিজার্ভ হ্যাণ্ড কজনও পাচ্ছি, তাদের পুরনো বয়লারে লাগিয়ে সেখানকার স্কিল্ড হ্যাণ্ড···

ব্যস ব্যস ব্যস ! অমিতাভ ঘোষ যেন ফাঁপরে পড়ে থামিয়ে দিল তাকে। হাল্কা বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল, এতক্ষণ অমন গম্ভীর হয়ে বসেছিলে খুব ভালো লাগছিল, ছাট ওয়াজ ওয়াণ্ডারফুল !

অম্লান অভিব্যক্তির ধাক্কায় ধীরাপদসুদ্ধ সোফার মধ্যে সন্তর্পণে নড়েচড়ে বসল। মেম-টাইপিস্টের মুখেও কৌতুকের আভাস। ছোট সাহেব গম্ভীর।

লাবণ্য সরকারের গোটা মুখখানাই আরক্ত। সোজা মুখের দিকে তাকালো এবার।— কেন, হবে না কেন?

ঈষত্রুক্ষ চ্যালেঞ্জের জবাবে চীফ কেমিস্ট ফিরে দুই এক পলক চেয়ে রইল শুধু। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আবার। সিতাংশু মিত্রকে বলল, তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পারো, আমি কোনো দায়িত্ব নেব না। লাবণ্য সরকারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, মুখখানি তেমনি লঘু কৌতুকে ভরা।—তুমি বললে এখানে সব হবে, এভরিথিং ইজ পসিব্‌ল্—

দরজার দিকে দু পা বাড়িয়েও দাঁড়িয়ে গেল। ধীরাপদর সঙ্কট আসন্ন এবার, তাকে দেখেই থেমেছে। চিনেছেও।

মামা—মানে অনেকটা সেই-রকম যে! আপনি এখানে বসে, কি ব্যাপার? উৎফুল্ল মুখে কাছে এগিয়ে এলো।

এই পরিবেশে এভাবে আক্রান্ত হবার ফলে নাজেহাল অবস্থা। উঠে যদিও বা দাঁড়ানো গেল, সহজে আলাপের চেষ্টা ব্যর্থ। জবাবে, যার জন্যে বসে ধীরাপদ তার দিকেই শুধু তাকালো একবার। ওদিকে এমন এক অপ্রত্যাশিত আপ্যায়নে লাবণ্য সরকার আর সিতাংশু মিত্রও বিস্মিত। তার অবাঞ্ছিত উপস্থিতি এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি বলে বিরক্তও। ছোট সাহেবের মুখে মালিক-সুলভ গাম্ভীর্য।—আপনি সন্ধ্যার পর দোকানে এসে এঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেবেন।

নির্দেশ জানিয়ে ছোট সাহেব গটগট করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

এঁর সঙ্গে অর্থাৎ লাবণ্য সরকারের সঙ্গে। ক্ষণপূর্বের বিড়ম্বনার সাক্ষী হিসেবে ধীরাপদর অবস্থান মহিলাটির চোখে আরো বেশি মর্যাদাহানিকর বোধ হয়। চীফ কেমিস্টের বিদ্রূপের জেরই তখনও পর্যন্ত সামলে উঠতে পারেনি। ধীরাপদরই কপাল মন্দ। মহিলা যে-ভাবে ঘুরে তাকালো ওর দিকে, মনে হল, ছোট সাহেবের হয়ে কথা বলার পরোয়ানা পেয়ে ঠাণ্ডা চোখে এখনই কিছু একটা কৈফিয়তই তলব করে বসবে।

কিন্তু কিছুই বলল না। যেটুকু বুঝিয়ে দেবার পরেই ভালো করে বুঝিয়ে দেবে, তাড়া নেই যেন। উঠে নিজের জায়গায় গিয়ে হাতের কলমটা টেবিলের ওপর রাখল। খানিক আগে লেখা কাগজটা তুলে নিয়ে সেটার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে সেও দরজার দিকে এগোলো।

অমিতাভ ঘোষ আধাআধি ঘুরে দাঁড়িয়ে উৎসুক নেত্রে একে একে দুজনের

দুটি প্রস্থান-পর্ব নিরীক্ষণ করল। তারপর ধীরাপদর ওপরেই চড়াও হল আবার।
—কি ব্যাপার বলুন তো, এঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?

ধীরাপদ এতক্ষণে হালকা বোধ করছে একটু। মাথা নাড়ল, অর্থাৎ সেই রকমই বাসনা ছিল বটে।

কেন?

প্রশ্নটা নীরস শোনাল। জবাব শোনার আগেই দরজার দিকে পা-ও বাড়িয়েছে।

আর বলেন কেন, চারুদির পাল্লায় পড়ে দু দিন ধরেই তো ঘুরছি! তাকে অনুসরণ করে ধীরাপদও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। একদিনের স্বল্প আলাপের এই একজনকেই কিছুটা কাছের লোক মনে হয়েছে।

চারুদির নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতই কাজ হল বুঝি। আবার বিস্ময় আর আগ্রহ।—চারুমাসি পাঠিয়েছে আপনাকে? কেন? চাকরি?

কি জানি কেন, ধরে-বেঁধে তো পাঠিয়েছেন—

সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল দুজনেই। অমিতাভ ঘোষ ফিরে এবারে ভালো করে নিরীক্ষণ করল তাকে। সপ্রশ্ন খুশির আভাস।—চলুন নিচে চলুন। হাত বাড়িয়ে ধীরাপদর কাঁধ বেষ্টন করে নিচে নামতে লাগল।—আপনি তাহলে চারুমাসির রিপ্রেজেনটেটিভ! তাই বলুন·· কি আশ্চর্য!

ধীরাপদর মনে হল আশ্চর্য বলেই এত খুশি, আর হঠাৎ এই অন্তরঙ্গতাও চারুদির কারণে। তাকে সঙ্গে করে ফুল-বাগান পেরিয়ে সামনের মস্ত একতলা দালানের দিকে পা চালিয়ে অমিতাভ ঘোষ উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল, তা আপনি এদের কাছে ঘুরছেন কেন? মামার সঙ্গে দেখা করুন!

ধীরাপদ বুঝে নিল মামাটি কে। মানকের মুখে শোনা ভাগ্নেবাবুর সমাচারও মনে আছে। দেখা করেছিলাম···চারুদি তাঁর কাছেই চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি পরে কথা বলবেন বলেছিলেন, কিন্তু দু দিনের মধ্যে তাঁর তো দেখাই পাওয়া গেল না।

দেখা পাওয়া শক্ত। হাসতে লাগল, দুটো দিন কি বেশি হল? দু মাস তো হয়নি! পকেট হাতড়াতে লাগল, সিগারেট আছে? থাক, আমার টেবিলেই আছে বোধ হয়। তাহলে আপনার আর ভাবনাটা কিসের এখন?

ভাবনা নয়, এঁদের মেজাজ-গতিক ঠিক সুবিধের লাগছে না·········

অমিতাভ ঘোষ হা-হা করে হেসে উঠল একপ্রস্থ। এ-মাথা ও-মাথা শেড দেওয়া এক মস্ত ফ্যাক্টরী-ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তারা। তপ্ত গুমোট বাতাস।

লোকজন গলদঘর্ম হয়ে কাজ করছে। ইলেকট্রিক প্লেট বসানো সারি সারি চৌবাচ্চার মধ্যে কি সব ফুটছে, লোহার ফ্রেমে ঝুলছে মিটার-বসানো মস্ত মস্ত ড্রাম—বোধ হয় শুকোনো হচ্ছে কিছু, অদূরে কাচ-ঘরের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তিতে বিশাল বিশাল জাঁতার মত ঘুরছে কি আর তাল তাল একটা কঠিন সাদা পদার্থ পিষে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে—সেই তকতকে গুঁড়ো সারি সারি ভ্যাটের মধ্যে ময়দার স্তূপের মত দেখাচ্ছে। চারদিকে গোঁ-গোঁ শোঁ-শোঁ এক-টানা যান্ত্রিক শব্দ। ভিতরে ঢুকেই বাঁ-দিকে অল্প একটু ঘেরানো জায়গায় চীফ কেমিস্টের টেবিল-চেয়ার।

—বসুন। নিজেও বসল, তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত মনে চুপচাপ বসে থাকুন, যাঁর কাছ থেকে আসছেন এঁদের মেজাজের ধার ধারতে হবে না আপনাকে—মামার সঙ্গে দেখা হলে আমি কথা বলব'খন।

হৃষ্টচিত্তে সিগারেট ধরালো একটা।

ধীরাপদর আবারও মনে হল, সে চারুদির লোক, চারুদির কাছ থেকে আসছে—আপনজনের মত লোকটির এই প্রসন্ন অন্তরঙ্গতা শুধু সেইজন্যেই। আর কোনো হেতু নেই। ধীরাপদর ভালো লাগছে বটে, সেই সঙ্গে বুদ্ধির অগম্য কিছু হাতড়েও বেড়াচ্ছে।…চারুদি কাউকে পাঠাতে পারে এ কি জানত নাকি! বোধ হয় জানত, নইলে চারুদির রিপ্রেজেন্টেটিভ বলবে কেন ওকে? চারুদির লোক বলেই ওর জোরটা যেন ঠুনকো নয় একটুও। অথচ যে বলছে, নিজে সে চারুদিকে পরোয়া কতখানি করে তা ধীরাপদ নিজের চোখেই দেখেছে সেদিন, নিজের কানেই শুনেছে। অবশ্য পরোয়া কাউকেই করে বলে মনে হয় না। ছোট সাহেবের ঘরে বসে স্বয়ং বড় সাহেবের উদ্দেশেই তো তার নিঃশঙ্ক ব্যঙ্গোক্তি শুনে এলো খানিক আগে।

চেয়ারের কাঁধে মাথা রেখে অমিতাভ ঘোষ পরম আয়েসে সিগারেট টানছে। গোটাকতক লম্বা টানে সিগারেট অর্ধেক।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, একটু বাদেই বিপরীত রোষে খুশির আমেজ খানখান। অদূরের মিটার বসানো ড্রামগুলোর ওদিক থেকে একজন অল্পবয়সী কর্মচারী কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, আধ ঘণ্টা মিটার দেখা হয়েছে, আর হীট দেওয়া দরকার আছে কি না।

চেয়ারের কাঁধে তেমনি মাথা রেখেই চীফ কেমিস্ট আগন্তুকের মুখের ওপর অলস দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একটা।—তুমি নতুন এলে এখানে?

জবাবে কর্মচারীটির নিবেদন, গত দু দিন চীফ কেমিস্টের অনুপস্থিতিতে

মিস সরকার কাজ দেখেছেন, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বদলে তিনি আধ ঘণ্টা মিটার দেখতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

যান্ত্রিক পরিবেশের সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ যেন বাজ পড়ল একটা।

গেট আউট!

চীফ কেমিস্টের গোটা মুখ রক্তবর্ণ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মারমুখো চিৎকার, সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর প্রচণ্ড চাপড়।

লোকটা সত্রাসে পালিয়ে বাঁচল। কাছে, দূরে সকলেই ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

ধীরাপদ হতভম্ব।

॥ ছয় ॥

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং, স্ত্রীলোকের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য··

মানুষ কোন্ ছার, দেবতাদেরও বোধের অগম্য নাকি।

বচনটি জানা ছিল। তা বলে ভাগ্যের সিঁড়ি রাতারাতি ঊর্ধ্বমুখ হতে পারে কোনোদিন, এমন আশা ধীরাপদর ছিল না। আর, রমণী-চরিত্র প্রসঙ্গে উক্তিটা একমাত্র সোনাবউদির বেলাতেই প্রযোজ্য বলে বিশ্বাস করত। কিন্তু চারুদির বাড়ি এসে প্রাজ্ঞ বচনের নিগূঢ় ইঙ্গিত অনেকটাই প্রসারিত মনে হল। নিজের ভাগ্যের ওপরকার পুরু পরদাটা একদফা নড়েচড়ে উঠল। চারুদির মধ্যেও জটিল নারী-রীতির বৈচিত্র্য দেখল একটু। শুধু চারুদি নয়, ধীরাপদর মনে হল, ওই পাহাড়ী মেয়ে পার্বতীরও ভিতরে ভিতরে অনাবৃত রহস্যের বুনুনি চলেছে একটা।

বাইরের ঘরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ধীরাপদ কাউকে দেখতে পায়নি। মালী ওকে দেখে খবর দিয়েছে তারপর ফিরে এসে ভিতরে যেতে বলেছে।

এসো, তোমার আবার বাইরে থেকে খবর পাঠানোর দরকার কি, সোজা চলে এলেই পারো।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ানোর আগেই চারুদির আহ্বান। ধীরাপদ বুঝল না, সে-ই এসেছে চারুদি জানল কি করে! মালীর নাম বলতে পারার কথা নয়। বাইরে স্যাণ্ডেল জোড়া খুলে ঘরে ঢুকে বেশ একটু সঙ্কোচে পড়ে গেল। তকতকে মেঝেয় বসে চারুদি একটা মোটা চিরুনি হাতে পার্বতীর কেশবিন্যাসে মগ্ন। তাঁর কোলের ওপর কালো ফিতে। ধপধপে ফরসা এক হাতে পার্বতীর

চুলের গোছা টেনে ধরা, অন্য হাতে বেশ জোরেই চিরুনি চালিয়ে চুলের জট ছাড়াচ্ছেন। ধীরাপদর মনে হল পার্বত্য রমণীটি শক্তহাতে বন্দিনী।

বোসো—। যেন ও আসবে জানাই ছিল। চারুদি পার্বতীর চুলের গোছা আরো একটু টেনে ধরলেন।—তোর আবার লজ্জার কি হল, বোস ঠিক হয়ে, মাথা নয়তো আস্ত একখানা জঙ্গল!

ধীরাপদ আগের দিনের মতই অদূরে একটা মোড়ায় বসেছে। জঙ্গল-কেশিনীর মুখে লজ্জার আভাস কিছু চোখে পড়ল না। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে হয়ত, অথবা ঝুঁকতে চাইছে, চারুদির কেশাকর্ষণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। এটুকু ছাড়া মুখভাবে আর কোনো তারতম্য নেই। ওর লজ্জার লক্ষণ চারুদিই ভালো জানেন। তাঁর অগোচরে ধীরাপদ মেয়েটার দিকে দুই-একবার চোখ না চালিয়ে পারল না। পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল বসে আছে···সামান্য ব্যতিক্রমে আঁট-বসনের বাধা ভেঙে তনু-তরঙ্গ উপছে ওঠার সম্ভাবনা। পরি-চারিকার প্রতি কর্ত্রীর এই বাৎসল্যটুকুও মিষ্টি।

এরই মধ্যে ছাড়া পেলে, কোথা থেকে আসছ? দ্রুত হাত চলেছে চারুদির।

ফ্যাক্টরী থেকে।

চারুদি উৎসুক নেত্রে তাকালেন, অমিতের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

ধীরাপদ মাথা নেড়ে জানালো, হয়েছে।

এলো না কেন, আজ আসবে ভেবেছিলাম, টেলিফোনে বলেও ছিল আসবে, তোমার সঙ্গে আলাপসালাপ হয়েছে ভালোমত?

আজই হল। ধীরাপদর দু চোখ পার্বতীর মুখের ওপর আটকালো কেন নিজেও জানে না। অন্তস্তলের রসিক মনটির অনুভূতির কারিগরি আরো বিচিত্র। একজনের আসার সম্ভাবনার সঙ্গে চারুদির এই বাৎসল্যের একটা যোগ উঁকিঝুঁকি দেয় কেন, তাই বা কে জানে?

চটপট চুল বাঁধা শেষ করে চারুদি যেন মুক্তি দিলেন মেয়েটাকে। বললেন, কি আছে মামাবাবুকে তাড়াতাড়ি এনে দে, খেটেখুটে এসেছে—

খেটে আসুক আর না আসুক ধীরাপদর খিদে পেয়েছে। পার্বতীর প্রস্থান। চারুদি উঠে ভিজে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে তাকালেন ওর দিকে। ধীরাপদর চোখ তখনো দোড়গোড়া থেকে ফেরেনি, আপন মনে হাসছিল একটু একটু। চারুদির চোখে চোখ পড়তে কৈফিয়তের সুরে বলল, মনিব ভালো পেয়েছে—

তোয়ালে রেখে চারুদি খাটে বসলেন।—তুমি কেমন মনিব পেলে শুনি, সেদিন এসেও ওভাবে চলে গেলে কেন? পার্বতী বলছিল—

ধীরাপদ অপ্রস্তুত। তার সেদিনের আসাটা কেউ টের পেয়েছে একবারও ভাবেনি। কিন্তু পেলেও এ প্রসঙ্গ চারুদির অন্তত উত্থাপন করার কথা নয়। এসেও ওভাবে ফিরে গেল কেন সেটা তাঁর থেকে ভালো আর কে জানে।

ওকে স্থূল বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে কৌতুক উপভোগ করাটাই চারুদির উদ্দেশ্য বলে মনে হল না। চারুদি যেন বলতে চান, লাল গাড়ি দেখে তুমি পালিয়েছ, কিন্তু পালাবার কোনো দরকার ছিল না।···সঙ্কোচের ব্যাপারটা গোড়া থেকেই কাটিয়ে দিতে চান হয়ত।

জবাব এড়িয়ে বলল, তোমার পার্বতী পাহারাদারও কড়া দেখি।

খুব। এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করলেন না চারুদি। চিঠি খোলার খবরটা হিমাংশু মিত্র বলে গেছেন কিনা, তাও বোঝা গেল না। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল বলো, কাজ করছ?

কি কাজ?

ওমা, সে আমি কি জানি? কাজে লাগোনি?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল। তারপর হেসে বলল, শুধু তুমি কেন, কেউ জানে না—

চারুদি অবাক। এই যে বললে ফ্যাক্টরী থেকে আসছ?

গেছলাম একবার। হালকা করেই বলল, তুমি এভাবে আমার মত একটা লোককে ওঁদের মধ্যে ঠেলেঠুলে ঢোকাতে চাইছ কেন? ও থাকগে—

ভালো লাগছে না? চারুদি হঠাৎ বিমর্ষ একটু। বিরক্তও। তাঁর কিছু একটা প্ল্যান যেন বরবাদ হতে চলেছে।—এখনও তো কাজই শুরু করোনি, এরই মধ্যে এ-কথা কেন?

কাজের জন্যে নয়, ওঁরা ঠিক—

ওঁরা কারা?

ধীরাপদ আর কিছু বলে উঠতে পারল না। অভিযোগ করতে চায়নি, অভিযোগ করার নেইও কিছু। যাওয়া মাত্র সকলে তাকে সাদর অভ্যর্থনায় গ্রহণ করবে এমন প্রত্যাশাও ছিল না। এই দু দিন ঘোরাঘুরি করে নিজেকে একেবারে বাইরের লোক আর বাড়তি লোক মনে হয়েছে বলেই কথাটা তুলেছিল।

কিন্তু চারুদি আমল দিলেন না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই দুটো দিনের খবর

শুনলেন। তারপর একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন, কাজে না ঢুকেই পালাতে চাইছ! এক নম্বরের কুঁড়ে তুমি, দুটো দিন সবুর করো সব ঠিক হয়ে যাবে। ওঁরা সত্যিই এখন ব্যস্ত খুব—

একটু থেমে আবার বললেন, আর একটা কথা, ওখানে কাজ করতে গেছ বলে নিজেকে কারো অনুগ্রহের পাত্র ভাবার দরকার নেই, তুমি তো যেতে চাওনি, আমিই তোমাকে জোর করে পাঠিয়েছি।

তাঁর জোর করে পাঠানোর জোরটা কোথায় সঠিক না জানলেও ধীরাপদর আবারও মনে হল, জোর কোথাও আছেই। সেটা শুধুই কোনো এক পুরুষের ওপর কোনো এক রমণীর জোর নয়। ব্যক্তিগত প্রভাব নয় কারো ওপর, ওই গোটা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটির ওপরই কিছু যেন একটা স্বার্থগত প্রভাব আছে। তার চাকরির ব্যাপার নিয়ে তা না হলে এমন অ-রমণীসুলভ মাথা ঘামাতেন না তিনি, অত আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। চারুদির লোক বলেই তার জোরটা যে ঠুনকো নয় সে-রকম একটা স্পষ্ট আভাস বিকেলে অমিতাভও দিয়েছিল। বলেছিল, যাঁর কাছ থেকে এসেছে—কারো মেজাজের ধার ধরতে হবে না।

ধীরাপদর আরো কাছে এসে আরো ভালো করে আরো নিরীক্ষণ করে দেখতে ইচ্ছে করছিল চারুদিকে। দেখছিল কি না কে জানে। হেসে বলল, অর্থাৎ, পার্বতীর মত আমারও আসল মনিবটি এখানে তুমিই?

চারুদিও হাসলেন। প্রায় স্বীকারই করে নিলেন যেন। হাসির সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক গাম্ভীর্যটুকু গেল। বললেন, আগে তো এই মনিবের টানে টানেই পাশ ছেড়ে নড়তে না, এখন বয়স হয়ে গেছে, আর তেমন পছন্দ হবে না বোধ হয়।

আঠারো বছর বাদে দেখা হওয়া সত্ত্বেও সেদিন চারুদির বয়েসটা ধীরাপদর চোখে পড়েনি। আজও পড়ল না।…কারো কি পড়েছে? সেদিন হিসেব করে বলেছিলেন চুয়াল্লিশ। যাই বলুন, ধীরাপদর এখনো মনে হয়, চারুদির সব বয়েস ওই লালচে চুল আর লাল রঙের মধ্যে হারিয়ে গেছে। ফিরে ঠাট্টা করতে যাচ্ছিল, পছন্দ এখনো কম নয়, কিন্তু মনিবের কাছে সেটা অপ্রকাশ্য।

বলা হল না। খাবার হাতে পার্বতী ঘরে ঢুকেছে।

ধীরাপদ আড়চোখে খাবারের থালাটা দেখল। এত খাবার কেউ আসবে বলে তৈরি করা হয়েছিল বোধ হয়। কে করেছে, পার্বতী না চারুদি? কি দেওয়া হয়েছে চারুদি লক্ষ্য করলেন না, অন্য কিছু ভাবছিলেন তিনি। পার্বতী

চলে যেতে সকৌতুকে তাকালেন তার দিকে।—তার পর, ওখানে মেম-ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল ?

মেম-ডাক্তার ! কার মুখে শুনেছিল ? মনে পড়ল হিমাংশু মিত্রের বাড়ির মানুকেকে বলতে শুনেছিল।...মানুকের সঙ্গে চারুদির যোগাযোগ আছে তাহলে। হঠাৎ এ প্রসঙ্গ আশা করেনি ধীরাপদ। আরো কিছু শোনার আশায় নিরুত্তর।

হাঁ করে চেয়ে আছ কি, লাবণ্য সরকারকে দেখোইনি এ পর্যন্ত ? তুমি সত্যিই ওখানে চাকরি করবে কি করে তাহলে !

ও। ধীরাপদ হাসল এবার, আমি নগণ্য ব্যক্তি তাঁর কাছে।

চারুদি উৎফুল্ল মুখে সায় দিলেন, তা সত্যি—দেখো চেষ্টাচরিত্র করে একটু-আধটু গণ্য হতে পারো কি না, সেই তো বলতে গেলে কর্ত্রী ওখানকার।

আমারও ? ধীরাপদ ঘাবড়েই গেছে যেন।

চারুদির খুশির মাত্রা বাড়ল আরো। তুমি না চাইলে তোমার নাও হতে পারে। কেন, পছন্দ নয় ?

তেমনি নিরীহ মুখে ধীরাপদ পাল্টা প্রশ্ন করল, পছন্দ হলেও চাকরিটা থাকবে বলছ ?

চারুদি চোখ পাকালেন, বেড়ালের মত মুখ করে থাকো, কথায় তো কম নও দেখি। পরমুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হাসি।—তাও থাকবে, চেষ্টা করে দেখতে পারো।

প্রথম দিন এ-বাড়ি এসে পার্বতীর বডি-গার্ড প্রসঙ্গে চারুদিকে এমনি হাসতে দেখে ধীরাপদর মনে হয়েছিল, অত হাসলে চারুদিকে ভালো দেখায় না। আজও তেমনি মনে হল। চারুদির অত হাসি খুব সহজ মনে হয় না। এত হাসি অন্তস্তলের কিছু গোপন প্রতিক্রিয়ার দোসর যেন।

এই দিনও ধীরাপদ ছাড়া পেয়েছে অনেক রাতে। কথায় কথায় এত রাত হয়েছে সেও খেয়াল করেনি। সন্ধ্যার ওই জলযোগের পর রাতের আহারের তাগিদ ছিল না। তবু না খাইয়ে ছাড়েননি চারুদি, বলেছেন, এত রাতে কে আর তোমার জন্যে খাবার সাজিয়ে বসে আছে ? ছদ্ম-সংশয়ও প্রকাশ করেছেন, না কি আছে কেউ ?

ফেরার সময় অন্যান্য বারের মতই তাকে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন।

...চারুদি অনেক গল্প করেছেন আজ। এই দিনের গল্প বেশ নিবিষ্ট আগ্রহে শুনেছে ধীরাপদ। যাদের সঙ্গে ওর নতুন যোগাযোগ, কথা বেশির ভাগ তাদের

নিয়েই। বলার উদ্দেশ্য নিয়ে বলা নয় চারুদির, এক-একটা হাল্কা সূচনা থেকে গভীরতর বিস্তার।

—ওই ছোঁড়াই তো ছুট করে এনে বসিয়েছিল মেয়েটাকে, কারো কথা তো শোনে না কোনদিন, কারো কাছে জিজ্ঞাসাও করে না কিছু—নিজে যা ভালো বুঝবে তাই করবে।

ছোঁড়া বলতে অমিতাভ ঘোষ, আর মেয়েটা লাবণ্য সরকার।

—শুধু নিয়ে এসেছে! এনে ভেবেছে, ভারী দামী একটা আবিষ্কারই করে ফেলেছে।…আমি একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, সব ঝিনুকে মুক্তো নেই জানিস তো? শুনে সে কি রাগ ছেলের! যা নয় তাই বলে বসল আমায়, সবাই নাকি তা বলে আমার মতও নয়। খুব হেসেছিলেন চারুদি, সেই হাসি আবারও প্রাঞ্জল মনে হয়নি ধীরাপদর, খুব ভালো লাগেনি। হাসি থামতে বলেছেন, আসলে ওই বয়েস আর ওই সাদা নরম মন—চটক দেখে মাথা ঘুরে গেছল, বুঝলে না?

চারুদির কথা সত্য হলে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লাবণ্য সরকারের যোগাযোগ বেশ রোমান্টিকই বটে।…যোগসূত্র 'সপ্তাহের খবর'। পরীক্ষার খাতার সাইজের ছোট আট পাতার কাগজ একটা। সপ্তাহে সপ্তাহে বেরোয়, ফেলে দিলে ঠোঙা বানানোর কাজেও লাগে না, এমনি চেহারা-পত্র তার। কিন্তু নিয়মিত পড়ুক না পড়ুক, সেই কাগজের নাম জানে আধা শিক্ষিতজনেরাও। চারুদির মুখে নাম শোনার আগে ধীরাপদও জানত। এখনো জানে। সপ্তাহের খবরে খবরের মত খবর থাকে এক-একটা। চমকপ্রদ চটকদার খবর সব। কাগজখানা অনেক সময়েই ওপরের মহলের ভীতি অস্বস্তি বা চক্ষুলজ্জার কারণ। আর সব সময়েই নিচের মহলের রোমাঞ্চ আর বিস্ময়ের খোরাক। সাধারণ লোক প্রয়োজনীয় একটা ঝাঁটার মতই মনে করে কাগজটাকে। রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি আর হোমরাচোমরা অনেক ব্যক্তিনীতির অনেক অজ্ঞাত জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে এনে ফলাও করে স্তুপীকৃত করা হয় ওখানে। 'সপ্তাহের খবর'-এর খবরের ভিত্তিতে প্রাদেশিক এমন কি কেন্দ্রীয় আইন সভারও প্রতিপক্ষ দলের হুলফোটানো জেরায় সরকারী পক্ষ অনেক সময় নাজেহাল। এই ধরনের খবর যদিও উপেক্ষার গহ্বরেই বিলীন হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, তবু এর সাময়িক প্রভাব বড় কম নয়। শিকার যাঁরা তাঁরা অন্তত এই সাময়িক আলোড়নটুকুতে বেশ পর্যুদস্ত বোধ করেন। অন্ধকারের জীব হঠাৎ আলোর ঘা খেলে যেমন গোলমেলে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে যায়, অনেকটা তেমনি।

বহুরূপীর ভোল বদলানোর মত এ পর্যন্ত অনেকবারই নাম বদলাতে হয়েছে কাগজখানার। শুধু নামই বদলেছে, ভোল বদলায়নি। অনেকবার কোর্ট-কাছারি করতে হয়েছে, ছোটখাটো খেসারত দিতে হয়েছে একাধিকবার, গুরুদণ্ড বা গুরু খেসারতেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু নাম? নামে কি আসে যায়? গোলাপ ফুল নাম-চাপা পড়ে কখনো! ভিন্ন নামে আর ভিন্ন নামের সম্পাদনায় রাতারাতি সেই গোলাপই ফুটেছে আবার। অজ্ঞজনের কৌতূহল, এ বাজারে ওই কাগজ চালানোর খরচ পোষায় কোথা থেকে? ছয় নয়া পয়সা ছাপার খরচও তো ওঠার কথা নয়! বিজ্ঞজনের অভিমত, খরচের ঘানি ভয় যাদের তারাই টানে—আট পাতার কাগজে এক-একবার চার পাতা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে না? আর দায়ে ঠেকলে সব সময়ে যে চোখে-পড়ার বিজ্ঞাপনই দেবে সকলে, তারই বা কি মানে?

বছর কতক হল 'সপ্তাহের খবর' নাম-ভূষণে চলছে কাগজখানা। যে-নামে বা যে-নামের সম্পাদনায়ই চলুক, এর আসল মালিক আর সম্পাদকের নামটিও বলতে গেলে সর্বসাধারণের পরিচিত। তিনি বিভূতি সরকার। কীর্তি-মান পুরুষ।

এই বিভূতি সরকার লাবণ্য সরকারের দাদা। অনেক বড় দাদা, বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস।

এখান থেকে লাবণ্য-প্রসঙ্গ শুরু চারুদির।—গেল বন্যায় বিনি পয়সায় কোম্পানীর বাক্স বাক্স ওষুধ পাঠানো হয়েছিলো অসুস্থ বন্যার্তদের জন্যে। অনেক জায়গায় মহামারী লেগেছিল। ওষুধ সাহায্য করে প্রতিষ্ঠান নাম কিনেছিল বেশ। কাগজে কাগজে সাহায্যের খবর বেরিয়েছিল, প্রশংসা বেরিয়েছিল।

কিন্তু 'সপ্তাহের খবর'-এর এক ফলাও খবরে সব প্রশংসা কালি। দুর্গত অঞ্চলের ডাক্তারদের বিবেচনায় সাহায্যপ্রাপ্ত ওষুধের নাকি মান খারাপ বলে প্রকাশ। যে ওষুধে অবধারিত কাজ হওয়ার কথা, সেই ওষুধেও আশাপ্রদ ফল দেখা যাচ্ছে না। সপ্তাহের খবরে বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।' তার নিচে আসল সংবাদ আর সম্পাদকীয় সংশয়, টীকা-টিপ্পনী, মন্তব্য।

অমিতাভ ঘোষ তার দিনকতক আগে বিলেত থেকে ট্রেনিং নিয়ে চীফ কেমিস্ট হয়ে বসেছে। সব ক'টা কাগজের সঙ্গে প্রচারের যোগাযোগ তখন সে ই রাখত, বিজ্ঞাপনও সেই পাঠাতো। দুর্গতদের সাহায্যের জন্য কোন্ লট-এর কি ওষুধ পাঠানো হয়েছে, ভালো করে জানেও না। এদিকে ফ্যাক্টরী

তছনছ, ওলট-পালট করল, অসহিষ্ণু সন্দেহে কত চন্দনসই ওষুধও নষ্ট করল ঠিক নেই—অন্যদিকে কাগজের মুখ চাপা দেবার দায়ও তারই।

বিভূতি সরকার সবিনয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

কিন্তু পরের সপ্তাহেই আবার আক্রমণ। প্রচারের লোভে অপচিত ওষুধ দান করার নৃশংসতা, নরম-গরম কটু-কাটব্য, উঁচু মহলের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান-প্রধানের অর্থাৎ হিমাংশু মিত্রের অন্তরঙ্গ যোগাযোগ প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ।

অমিতাভ ঘোষ আর যেত কি না সন্দেহ, কিন্তু হিমাংশু মিত্রই আবার তাকে পাঠিয়েছেন। দরকার হলে একসঙ্গে ছ-মাসের বিজ্ঞাপনও বুক করে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবারেও বিভূতি সরকার অমায়িক ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জনসাধারণ যে তদন্ত দাবী করে সম্পাদকীয় লেখার জন্য চাপ দি:চ্ছ তাঁকে, সে-কথাও বলেছেন। মামার কথা ভেবেই অমিতাভ ঠাণ্ডা মেজাজে বসেছিল। যাই হোক, বাঙালী প্রতিষ্ঠানের প্রতি এবারে সহযোগিতার আশা এবং আশ্বাস দিয়ে সাদামাটা একটা ব্যক্তিগত সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন বিভূতি সরকার। তাঁর বোনটি সেবারে ডাক্তারী পাস করেছে, ভালো যোগাযোগ কিছু হয়ে উঠছে না—সেই বোন এখন দাদাকে ধরেছে ওদের কোম্পানীতে কিছু সুবিধে হয় কিনা। বোনকে ডেকে তখুনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

ব্যস, চারুদি হেসে উঠেছিলেন, ছেলে ওখানেই কাত। বি-এস্‌সি পাস ডাক্তার শুনে আরো খুশি—শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে কেমিস্টের কাজেও সাহায্য করতে পারবে ওকে। সটান গাড়িতে তুলে একেবারে মামার কাছে এনে হাজির!

চারুদি আরো মজার কথা বলেছেন, তার পর ক'টা মাস সে কি আনন্দ আর উৎসাহ ছেলের! ওকে পেয়ে লাভটা যেন শেষ পর্যন্ত ওদের হল। বিভূতি সরকার বোনের হিল্লে করে দিয়েই চুপ হয়ে গেছল নাকি? অমন পাত্রই নয়, নিজের স্বার্থের কাছে বোনটোন কিছু নয়—অতটা খোলাখুলি না হলেও মাঝে-মধ্যে খোঁচা দিতে ছাড়ত না কাগজে—তাই নিয়ে এক-একদিন অমিতের সামনেই বোনের সঙ্গে ভাইয়ের ঝগড়া।

এদিকে মাসির কাছে অর্থাৎ চারুদির কাছে লাবণ্য সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অমিতাভ ঘোষ। সঙ্গে করে নিয়েও এ:সছে অনেক দিন। আই-এস্‌সি পাস করেই লাবণ্যর নাকি ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে ছিল, পয়সার অভাবে পা:রনি—সকাল-বি:কল মেয়ে পড়িয়ে তো পড়া চালাতো। বি-এস্‌সি পাস

করার পর অবস্থাপন্ন ভগ্নীপতি ডাক্তারি পড়বার খরচ চালাতে রাজী হন। ভগ্নীপতির মস্ত মুদীর দোকান, মোটা রোজগার মাসে। তাঁর এত উদারতার পিছনে আসল লক্ষ্যটিও অমিতাভ ঘোষ বার করে নিতে পেরেছিল লাবণ্যর কাছ থেকে। ভগ্নীপতিটি বিপত্নীক, পাঁচ-ছটি ছেলেপুলে। ভগ্নীপতির আশা বুঝেও লাবণ্য তাঁর সাহায্য গ্রহণ না করে পারেনি। ঋণ পরিশোধের জন্যে তাঁকে যদি বিয়ে করতে হয় তাও করবে, তবু নিজের পায়ে দাঁড়াবে সে—ডাক্তার হবে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

চারুদি ঠাট্টা করেছিলেন, খুব প্রতিষ্ঠা হোক, কিন্তু মেয়েটার এত সব ঘরোয়া খবরে তোর এত মাথা-ব্যথা কেন?

তাতেও রাগ, মেয়েরা নাকি মেয়েদের ভালো শুনতে পারে না, একটা মেয়ের অমন মনের জোর দেখে ছেলে তখন মুগ্ধ। সব মেয়ে এমন হলে এই দেশটাই নাকি অন্যরকম হত। চারুদির হাসি।

গল্পের মাঝে এইখানে ধীরাপদ ছন্দপতন ঘটিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, উনি ভগ্নীপতিকেই বিয়ে করবেন তাহলে?

চারুদির হাসিভরা দুই চোখ ওর মুখের ওপর আটকে ছিল খানিকক্ষণ। তারপর মন্তব্য করেছেন, তুমি একটি নিরেট!

চারুদির মতে অমিতাভ ঠিকই বলেছিল—প্রতিষ্ঠা-লাভের ব্যাপারে লাবণ্য সরকারের আর কোনো কিছুর সঙ্গেই আপস নেই। সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে কাকে ধরতে হবে, কাকে ছাড়তে হবে, কোন্ পথে চলতে হবে, কিভাবে চলতে হবে, সেটা ভালো করে বুঝে নিতে তার নাকি ছ মাসও লাগেনি। প্রতিষ্ঠার সিঁড়ি ধরে এখনো তাই চড়চড়িয়ে উঠেই চলেছে।

ফাঁকা রাস্তায় ঘুম-চোখে ড্রাইভার খুশিমত স্পীড চড়িয়েছে। ধীরাপদর খেয়াল নেই। ভাবছে। চারুদির অমন নিটোল হাসি কৌতুক-উদ্দীপনার ফাঁকে ফাঁকে ও তখন কোন্ কাটল খুঁজছিল? প্রতিষ্ঠার সিঁড়ির খোঁজে কাকে ছেড়ে কাকে ধরতে হবে লাবণ্য সরকার ছ মাস না যেতে বুঝে নিয়েছে—সেটাই খবর? না খবর আর কিছু? তার ছাড়াটা খবর, না অন্য কাউকে ধরাটা? এভাবে ঠেলেঠুলে চারুদি ওকে এর মধ্যে ঢোকাতে চান কেন? ব্যবসায়ের নাড়ি-নক্ষত্র খবরই বা রাখেন কেন? ধীরাপদ ভাবছে। কথা উঠলেই চারুদি নিজের বয়সের কথা বলেন কেন? বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, নিশ্চিন্ত দিন-যাপনের টাকাও বোধ হয় আছে—তবু ঘণ্টায় ঘণ্টায় চোখে-মুখে জল দিতে হয় কেন চারুদির?

চারুদি ওকে পাহারায় বসালেন? নড়েচড়ে ধীরাপদ সোজা হয়ে বসল। লাবণ্য সরকার সিঁড়ি ধরে উঠছে, না কারো সিঁড়ি দখল করেছে?

স্বভাব অনুযায়ী এবারে এই প্রগল্‌ভ বিশ্লেষণে গা ভাসানোর কথা ধীরাপদর। কিন্তু কোনো কৌতুক প্রহসন দেখে আসার পর শিথিল অবকাশে অলক্ষ্যের গভীরতর আবেদনটুকু যেমন ভিতর থেকে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ায়, তেমনি সকলকে ঠেলেঠুলে ওর মনের মুখোমুখি যে এসে দাঁড়াল সে অমিতাভ ঘোষ। পরিহাসতরল অনর্গল কথাবার্তার মধ্যে নিজের অগোচরে চারুদি এই এক-জনকে কেমন করে ভারী কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

—আমার কোনো কথা শোনে নাকি! আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করে না ছেলে, যা মুখে আসে তাই বলে। অমিতাভ প্রসঙ্গে নিরুপায় অভিযোগ চারুদির। কিন্তু চারুদির মুখে খেদ দেখেনি ধীরাপদ, তৃপ্তি দেখেছে। মা যেমন দুরন্ত অবুঝ ছেলে নিয়ে নাচায় তেমনি নিভৃত প্রশ্রয়ের তুষ্টি। ধীরাপদর ভালো লেগেছিল, মিষ্টি লেগেছিল।

—ভয়ানক রাগ সকলের উপর? এরি মধ্যে কি করে বুঝলে তুমি? চারুদির আলাপের বিস্তারও আর লঘু শোনায়নি।—ওই রকমই মেজাজ হয়েছে আজকাল। রাগ সব থেকে ওর মামার উপরেই বেশি, অথচ দু বছর বয়েস থেকেই তাঁর কাছে মানুষ, কি ভালই না বাসত মামাকে—এখনো বাসে, অথচ ধারণা, মামা ভিতরে ভিতরে ওকে আর চায় না।

সত্যি নাকি? ধীরাপদ সাগ্রহে বিবৃতিটুকু জিইয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল।

একেবারেই সত্যি নয় শুনেছে। এম এসসি অমন ভালো পাস করতে হিমাংশু মিত্রই আগ্রহ করে তাকে বিলেত থেকে ট্রেনিং দিয়ে এনেছেন, ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গ ফ্যাক্টরীতে অত বড় কাজে বসিয়ে দিয়েছেন, আর গোটা ব্যবসায়ে দু আনার অংশও তার নামে লেখা-পড়া করে দিয়েছেন।

শেষের খবরটা অবাক হবার মতই। এতখানি ভাগনে বাৎসল্য দুর্লভ। তাহলে এমন হয় কেমন করে? খুব অল্পবয়সে মা-বাপ হারানো স্নেহ-বঞ্চিত ছেলেমেয়ের অনেক রকমের জটিল অনুভূতি-বিপর্যয় দেখা দেয় নাকি। চিকিৎ-সকরা যাকে বলেন ইমোশনাল ক্রাইসিস। চারুদির কথা থেকে সেই গোছেরই কিছু মনে হল।

মামাতো ভাইটি চার পাঁচ বছরের ছোট, সে আসার পর থেকে নিজের সঙ্গে তার অনেক তফাত দেখেছে ছেলেটা। যে তফাত দেখলে এক শিশুর প্রতি আর এক শিশুর মনে শুধু বিদ্বেষই পুষ্ট হতে থাকে, সেই তফাত। তফাতটা

দেখিয়েছেন অমিতের মামী, সিতাংশুর মা। বাইরে থেকে সেই তফাতেই সে অভ্যস্ত হয়েছিল, বড় হয়েছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার প্রতিক্রিয়া ছিলই। চারুদির সেই রকমই বিশ্বাস। নইলে একজন আর একজনকে এখনো বরদাস্ত করতে পারে না কেন? সেই দশ-এগারো বছর বয়সে ছেলেটা প্রথম আসে চারুদির কাছে, তার পর থেকে একবার আসতে পেলে আর সহজে যেতে চাইত না—টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হত।

হিমাংশু মিত্র নিজের ছেলেকে কোনো দিন নিয়ে এসেছেন কিনা চারুদি উল্লেখও করেননি। চারুদির কথা শুনতে শুনতে মনে মনে ধীরাপদ ছোট একটা হিসেবে মগ্ন হয়েছিল। অমিতাভ ঘোষের বয়স এখন বড় জোর তেত্রিশ আর চারুদির চুয়াল্লিশ। এগারো বছরের ছোট। ছেলেটার দশ-এগারোর সময় চারুদির একুশ-বাইশ। অমিত ঘোষের মাসি-প্রাপ্তিটা তাহলে চারুদির শ্বশুরবাড়িতে, তাঁর স্বামী বেঁচে থাকতে।

অমিত ঘোষ মা না পাক, জ্ঞানাবধি মামাকে পেয়ে বাবা পেয়েছিল। সেই পাওয়ায় অনেককাল পর্যন্ত কোনো সংশয় ছিল না। যখন এম-এসসি পড়ে তখনো না। কিন্তু সেই সংশয় দেখা দিতেই নাকি যত সংকট। অবশ্য চারুদির মত, সবই ছেলের মনগড়া। সেই সময় মামী চোখ বুজেছেন। হিমাংশু মিত্র তখন প্রকাশ্যেই মা-হারা ছেলের দিকে বেশি ঝুঁকেছিলেন। অস্বাভাবিক নয়, ছেলে তখন স্কুলের গণ্ডী পেরোয়নি। মামাতো ভাইয়ের প্রতি এম-এস্‌সি পড়া ভাগ্নের প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের আভাস পেয়ে অনেক সময় ভাগ্নেকে রুক্ষ শাসনও করেছেন তিনি।

—সেই থেকেই ছেলে একেবারে অন্যরকম···আর কি যে এক অসুখ বাধিয়ে বসল তারপর, ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়।

চারুদি সত্যি শিউরে উঠেছিলেন।—সেই ধকলই আজ পর্যন্ত গেল না ওর। ওই অসুখেই মাথাটা গেছে।

নিজের অগোচরে সেই রোগ সংকটের দৃশ্যটা ধীরাপদ কল্পনা করছিল। মনের উপাদান দিয়ে ভাবতে গেলে মর্মান্তিকই বটে। রোগ-যন্ত্রণার থেকেও মানসিক যাতনার ছটফটানি বেশি ছেলেটার। অসুখে হাসপাতালে এনে ফেলা হয়েছে সেটাই এক মর্মচ্ছেদী বিস্ময়। হাসপাতাল নয়, অনেক ব্যয়সাপেক্ষ নামকরা নার্সিং হোম। আরামের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা, বড় বড় ডাক্তারের আনাগোনা। কিন্তু বিশ-বাইশ বছরের ছেলেটার চোখে সেটাও হাসপাতাল। আগে কখনো কোনো হাসপাতালের অভ্যন্তরে পা দেয়নি। যে ব্যবস্থা রোগী

মাত্রেরই প্রায় ঈর্ষার বস্তু, ওর চোখে তাই তখন নির্বান্ধব নিরাশ্রয় রোগ-শয্যা মাত্র। মামা পাঠিয়েছে তাকে এখানে! মামা পাঠালো! যতক্ষণ জ্ঞান ততক্ষণ আচ্ছন্ন প্রতীক্ষা। মামা আসে না কেন? মামা কই?

তখন আবার হিমাংশু মিত্রের বিদেশ যাত্রার দিন আসন্ন। অনেক আগে থেকেই সকল ব্যবস্থা সারা। শেষ সময়ে যাওয়া বন্ধ করলে সব দিকের সব আয়োজন পণ্ড। চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে তার দরকারও বোধ করেন নি—ভাগ্নেকে এত বড় নার্সিং হোমে রেখেই অনেকটা নিশ্চিন্ত তিনি।

কিন্তু ছেলেটার মনের দিকটা চারুদি উপলব্ধি করেছিলেন। নিষ্প্রভ চোখের চকিত দৃষ্টি কার জন্য প্রতীক্ষাতুর বুঝেছিলেন। আশ্বাস দিয়েছেন, আসবেন'খন···কাল বাদে পরশু বেরুবেন, ব্যস্ত তো খুব, ফাঁক পেলেই আসবেন।

আশ্বাস দিয়ে চারুদি নিজেই শঙ্কিত। মামা বেরোচ্ছেন কোথাও তা যে মনেও ছিল না, দুই চোখের বেদনা-ভরা বিস্ময়ে সেটুকু স্পষ্ট। অবুঝকে বোঝানোর চেষ্টা আবারও।—কতদিন আগে থাকতেই তো বেরুনোর সব ঠিক, তুই ভুলে গেলি? এখন কি না গেলে চলে! তাছাড়া তোর কি এমন হয়েছে, আমি তো আছি—

কিন্তু হঠাৎ সেই উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনা দেখে চারুদির ত্রাস একেবারে।—সত্যুর হলে মামা যেতে পারত? তাকে হাসপাতালে দেওয়া হত?

হিমাংশু মিত্র পরদিন ভাগ্নেকে দেখতে এসেছিলেন, আর যাবার দিনও। কিন্তু তিনি একাই দেখেছেন, ও ফিরেও তাকায়নি। সকলেরই ধারণা রোগে বেহুঁশ। কিন্তু তিনি ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে রোগী রক্তবর্ণ দু চোখ মেলে চারুদির দিকে তাকিয়েছে। বিশ্বাস আর কাউকেও করা চলে কি না তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে। তার পর ছোট্ট শিশুর মত দুই হাতে চারুদিকে আঁকড়ে ধরেছে। তারপর সত্যিই বেহুঁশ।

যমে-মানুষে টানাটানি গোটা একটা মাস। পালা করে হয় চারুদি নয় পার্বতী বসে সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত। চোখ মেলে দুজনের একজনকে না দেখলে বিষম বিপদ।·· জ্বর আর জ্বর, খই-ফোটা জ্বর—তাই থেকে মেনিন্-জাইটিস না কি বলেছে ডাক্তাররা। তারা হিমসিম, চারুদি দুর্ভাবনায় অস্থির, পার্বতী পাথর। শেষে জ্বর নামল, মাথার সেই মারাত্মক ব্যামোও ছাড়ল, অথচ ছেলেটা আর সেই ছেলেই নয় যেন। সব সময় অসহিষ্ণু সন্দেহ একটা। অবাঞ্ছিত কিনা কুরে কুরে শুধু সেই ভাবনা আর সেই সন্দেহ। ভালো

হবার পর তিন মাস চারুদির কাছেই ছিল—ফিরে এসে •হিমাংশু মিত্র চেষ্টা করেও ওকে নিতে পারেননি। দিনরাতের বেশির ভাগ তখনো হয় চারুদিকে নয় তো পার্বতীকে কাছে বসে থাকতে হত। এক ডাকে সামনে এসে না দাঁড়ালে তার জের সামলাতে তিন ঘণ্টা। চারুদি জানেন, ভিতরে ভিতরে ছেলেটা সেই রোগই পুষছে এখনো—মামার প্রতি অভিমান! যুক্তি দিয়ে বোঝালেও ভিতরে ভিতরে প্রতিকূল আবেগ একটা। কখন কোন্ কারণে যে ওতে নাড়া পড়ে বোঝা ভার। ওই থেকেই যত গণ্ডগোল, ওই থেকে অমন মেজাজ।

অমিতাভ ঘোষের জন্য চারুদির স্নেহার্দ্র দুশ্চিন্তাটুকু ধীরাপদ উপলব্ধি করেছে। ওকে বলেছেন, ভালো করে আলাপসালাপ করতে, ভালো করে মিশতে। অন্তরঙ্গ হবার রাস্তাও বাতলে দিয়েছেন।—একবার যদি ওর ধারণা হয় তুমি ভালবাসো ওকে, তুমি আপনজন—দেখবে তোমার জন্যে ও না করতে পারে এমন কাজ নেই। ব্যবহারে টের পাবে না, বরং উল্টো দেখবে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ও তোমার কেনা হয়ে থাকবে।

ধীরাপদর মনে হল চারুদি সেই কেনাই কিনেছেন। আপনজন হয়ে উঠতে খুব বেগ পেতে হবে না, সেটা লোকটির আজ বিকেলের আচরণ থেকে আশা করা যেতে পারে। সেটুকু চারুদির কল্যাণেই। যেটুকু হবার তাও চারুদির কল্যাণেই হবে। নৈশ নিরিবিলিতে আর একটা দৃশ্যও মনে পড়ছে ধীরাপদর। চারুদির ড্রইংরুমে সেদিন পার্বতীর উদ্দেশে অমিত ঘোষের সেই পাঁচদফা হাঁকডাক, শেষে চোখের নাগালে রমণীটির অবস্থানে রমণীয় নিবৃত্তি।

চারুদির কাহিনী-বিস্তার থেকে অমিত ঘোষের জীবনে পার্বতীর আবির্ভাবের একটুখানি হদিস মিলেছে।

অমিতাভ ঘোষকে চারুদি একাই কিনেছেন?

গাড়িতে ঝাঁকানি লাগতে ধীরাপদ ঝুঁকে বাইরের দিকে তাকালো। আর একটু এগোলেই সুলতান কুঠির এবড়োখেবড়ো এলাকায় ঢুকে পড়বে। তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে সেখানেই নেমে পড়ল। আগের বারের অন্যমনস্কতায় গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ার ফলটা সেদিন রমণী পণ্ডিতের চোখে-মুখে উছলে উঠতে দেখেছে।

সুলতান কুঠিতে অনেকক্ষণ ঘুম নেমেছে। পায়ে পায়ে শুকনো পাতার সামান্য শব্দও মড়মড় করে ওঠে। বাতাসে এরই মধ্যে ঝিঁঝির ডাক। আলো

জ্বলতে দুই-একটা জোনাকির দপদপানি। পা দুটো অভ্যস্ত বলেই হোঁচট খেতে হয় না। ধীরাপদ নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বারান্দাটা অন্ধকার। কতদিন ভেবেছে ছোট টর্চ কিনবে একটা। কেনা হয়নি। পকেটে একটা দিয়াশলাই রাখলেও হয়। দিনের বেলায় তাও মনে থাকে না। চাবির খোঁজে পকেটে হাত ঢুকিয়ে লক্ষ্য করল, দূরে রমণী পণ্ডিতের কোণা ঘর দুটোর একটা ঘরে আলো জ্বলছে তখনো। কারো ভবিষ্যতের ছক তৈরি করছেন, নয়তো বিয়ের কোষ্ঠী মেলাচ্ছেন। কিন্তু রাত জেগে ঘরে আলো জেলে কাজ করতে হয়, পণ্ডিতের এত কাজের চাপ কবে থেকে হল!

শুধু হাতটাই পকেটে বিচরণ করছে ধীরাপদর, চাবি উঠছে না। এ পকেটে ...না, এ পকেটেও নেই। বুক-পকেটেও নেই। আচ্ছা ফ্যাসাদ...চাবি? বন্ধ দরজার আঙটায় তালা তো দিব্বি ঝুলছে। দরজাটা ঠেলে দেখল একবার। না, তালাও বন্ধ। চাবিটা আবার কোথায় ফেলল তাহলে?

অসহায় মূর্তিতে ধীরাপদ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। তালাটা ভাঙবে? ভাঙবেই বা কি দিয়ে? এই রাতে আর এই অন্ধকারে তালা ভাঙতে গেলে লাঠিসোঁটা নিয়ে দৌড়ে আসবে সব। এ-তল্লাটে চোরের উপদ্রবে ঘুমের মধ্যেও গৃহস্থ সচেতন। আবার তালা না ভাঙলে ঘরে ঢুকবেই বা কি করে? সারারাত ঠায় দাঁড়িয়ে কাটাতে হয় তাহলে, নয় তো কদমতলার বেঞ্চি ভরসা। শীতের রাতে সে-ভরসাও মারাত্মক।

সচকিত হয়ে ধীরাপদ ফিরে তাকালো।

পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দ। কুপি হাতে সোনাবউদি। সামনে এসে চাবিটা এগিয়ে দিল। ও-চাবি যেন তার কাছেই থাকে।

অবাক হলেও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।—এটা আপনি পেলেন কি করে?

তালার সঙ্গে লাগানো ছিল।

ধীরাপদ অপ্রস্তুত। এতটাই অন্যমনস্ক ছিল নাকি! এ-রকম সংক্ষিপ্ত জবাব বা নীরবতা থেকে সোনাবউদির মেজাজ কিছুটা আঁচ করা যায়। ঘরের তালা খুলে ফিরে তাকালো। সোনাবউদির চোখে-মুখে ঘুমের চিহ্ন নেই। জেগেই ছিল বোঝা যায়। হাসতে চেষ্টা করলেও ধীরাপদর মুখে অপরাধীর ভাব একটু।—বাঁচা গেল, এমন মুশকিলেই পড়েছিলাম...

সোনাবউদি চুপচাপ চেয়ে আছে।

আপনি ঘুমোননি এখনো?

· ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালবেন, না এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকব?

ধীরাপদ শশব্যস্তে ঘরে ঢুকে গেল। কোণ থেকে হারিকেনটা মাঝখানে নিয়ে এলো। বালিশের নিচ থেকে দিয়াশলাই। সোনাবউদি দরজার বাইরে থেকেই কুপিটা একটু এদিকে বাড়িয়ে ধরেছে। ধীরাপদ বলতে পারত আলোর আর দরকার নেই। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করল না। ভরসাও পেল না বোধ হয়। চাবি-ভুলের এই বিড়ম্বনাটাও খারাপ লাগছে না খুব। এমন কি হারি-কেনটাও ইচ্ছে করলে হয়ত আর একটু তাড়াতাড়ি ধরাতে পারত।

অগ্নি-সংযোগ করে চিমনিটা ঠিক করে বসাতে বসাতে কিছু একটা বলার জন্যেই জিজ্ঞাসা করল, গণুদার নাইট-ডিউটি বুঝি? জবাব না পেয়ে ফিরে তাকালো তার দিকে।

হলে সুবিধে হয়? নিরুত্তাপ পাল্টা প্রশ্ন সোনাবউদির।

নিজেরই হাতের ঠেলা লেগে হারিকেনটা নড়ে উঠল। ফলে সোনা-বউদির মুখভাব বদলালো একটু। মনের মত টিপ্পনী কেটে বা খোঁচা দিয়ে কাউকে জব্দ করতে পারলে এর থেকে অনেক রূঢ় নিস্পৃহতাও তরল হতে দেখা গেছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিঠের কাছের দরজার আড়ালটা একবার দেখে নিয়ে সোনা-বউদি হাতের কুপি নিবিয়ে দিল। তারপর ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে নিজে থেকেই বলল, মনের অবস্থা তো চাবির ভুল দেখেই বোঝা যাচ্ছে, চোখেরও হয়ে এসেছে নাকি, গণৎকারের ঘরে আলো দেখেননি?

ধীরাপদ অবাক, গণুদা ওঁর ওখানে নাকি?

খোলা দরজার গায়ে সোনাবউদি ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, ভয় করছে?

আমার আর ভয়টা কি, কিন্তু এত রাতে গণুদার ওখানে কী?

সবই। নিস্পৃহ জবাব।—মাইনে বাড়লে কি হবে, প্রুফ রিডার প্রুফ রিডারই—এবারে সাব-এডিটার হবেন। বরাতের যেমন জোর শুনছি, কালে এডিটার হয়ে বসাও বিচিত্র নয়। ওখানে বরাতের জট ছাড়ানো হচ্ছে, বরাতে থাকলে কি না হয়?

যাবার জন্য দরজা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সোনাবউদি। নিরীক্ষণ করে দেখল একটু।—আপনারও তো দেখি একই ব্যাপার, সাত মণ তেল পুড়ছে, রাধা নাচবে তো শেষ পর্যন্ত! দাদার গলা ধরে ওই গণৎকারের কাছেই না হয় যান একবার—

সোনাবউদি চলে যাবার পরেও ধীরাপদ অনেকক্ষণ বসে কাটালো। শেষের এই ঠেসটুকু প্রাপ্য বটে। কিন্তু রাধা যে তার বেলায় সত্যি সত্যি নাচতে

চলেছে সেটা আর বলা হল না। বললে বেশ হত। সমস্ত দিনটাই ভালো কাটল আজ, সেই গোছের তৃপ্তি একটু। চারুদি ঠাট্টা করেছিলেন, এত রাতে কে আর ওর জন্যে খাবার সাজিয়ে বসে আছে? অন্তত কম লাগছে না ধীরাপদর।

কি এক বিপরীত ইশারায় ভাবনার লাগাম টেনে ধরতে চাইল। একটা চকিত অস্বস্তি মনের তলায় ঠেলে দিয়ে ধীরাপদ উঠে দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে বিছানায় এসে বসল। অনভিলষিত ইঙ্গিতটা অর্গলবদ্ধ হল না তবু, অন্ধকারে ডুবল না।

—চারুদি বলেছিলেন একটুখানি স্নেহ দিয়ে অমিতাভ ঘোষকে কিনে রাখা যায়। অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে কোথায় যেন ওর বড় রকমের মিল একটা। প্রার্থীর পক্ষে এটুকু জানা নিজের দেউলে মূর্তিটা নিজে চেয়ে চেয়ে দেখার মতই।

॥ সাত ॥

ওষুধের দোকানে ম্যানেজারের অভ্যর্থনা কি রকম হতে পারে ধীরাপদ সেটা আঁচ করেই এসেছিল। পর পর দু দিনের সঞ্চিত রাগ তাঁর। ভিতরে ভিতরে ধৈর্যচ্যুত বলেই বাইরে কিছুটা শান্ত দেখালো তাঁকে। ইস্কুল-পালানো ছেলেকে আওতার মধ্যে পেয়ে কড়া মাস্টার খানিকক্ষণ নির্বিকার থেকে যে ভাবে ছাত্রের শঙ্কাটুকু উপভোগ করেন, অনেকটা তেমনি নির্বিকার। কিন্তু অপরাধী ছাত্রের ভাব-ভঙ্গীতে উল্টে ঔদ্ধত্যের আভাস পেলে কতক্ষণ আর ধৈর্য থাকে?

দু দিন বাদে এসেও বাবু একবার মুখ কাঁচুমাচু করে সামনে এসে দাঁড়াল না। প্রথম দিন না বলে-কয়ে, ডিউটি,কখন না জেনে চলে যাওয়াটাই বেশ অপরাধ। গতকাল দুপুরের দিকে একবার ঢুঁ দিয়ে চলে গেছে। তারপর আজকের এই বেলা পাঁচটায় হাজিরা। এখানে একসঙ্গে এতগুলো অপরাধের বিচার এর আগে আর তাঁকে কখনো করতেও হয়নি বোধ হয়। তার ওপর কাউকে একটিও কথা না বলে চুপচাপ ওই বেঞ্চিতে বসে থাকা!

শুধু ম্যানেজারই ক্রুদ্ধ নয়, ধীরাপদর মনে হল তার আচরণে কর্মচারীরাও বিস্মিত। রমেন হালদারের সশঙ্ক দৃষ্টিনিক্ষেপে তার প্রতি নির্বুদ্ধিতার অভিযোগ, কাছে এসে উপদেশ দেওয়া সম্ভব নয় বলে তার চাপা অস্বাস্ত।

খদ্দের বেশি ছিল না। আর একটু হালকা হতেই স্থূল-বপু ম্যানেজার কাছে এসে দাঁড়ালেন।—এই যে বাবু, আপনি এসে গেছেন দেখছি। কাজ করবেন তা হলে?

এর পরেও উঠে না দাঁড়ানোটা ধীরাপদর ইচ্ছাকৃত নয়। মজার আভাস পেলে মজা দেখাটা বহুকালের অভ্যাস। ঘুরে বসে নিরীহ চোখ দুটো তাঁর ব্যঙ্গ-তপ্ত ভারী মুখখানির ওপর স্থাপন করল শুধু।

ম্যানেজার ফেটে পড়লেন। কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া-চুল মাথাটা শূন্যের ওপর সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে তাল ঠুকতে লাগল। গোল চোখ দুটো ড্যাবড্যাব করে উঠল।—এটা কোনো মাতুল-সম্পর্কিত বিশ্রামের জায়গা নয়, বেঞ্চিতে বসে দেখার জন্যে থিয়েটারের স্টেজও নয়, এখানে নিয়মকানুন বলে কিছু কথা আছে, এখানে ঘড়ি বলে একটা জিনিস আছে, এখানে ডিউটি বলে একটা ঝামেলা আছে, ওর মত লোক দিয়ে এখানে কাজ চলবে না সেটা আজ তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেবেন, বেঞ্চিতে বসে হাওয়া খেতে হলে গড়ের মাঠ এর থেকে ভালো জায়গা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরো চলত হয়ত কিছুক্ষণ। কিন্তু ধীরাপদ এক কাণ্ড করে বসল। এখানে ওর জোর সম্বন্ধে অমিতাভ ঘোষের গতকালের আশ্বাস বা চারুদির কথার প্রতিক্রিয়া কিনা নিজেও জানে না। প্রথম পশলার পর দম নেবার জন্য ম্যানেজার একটু থামতেই হাত দিয়ে বেঞ্চির খালি জায়গাটা দেখিয়ে নিরুদ্বেগ আপ্যায়ন জানালো, বসুন—।

ম্যানেজারের গোল চোখ দুটো মুখের ওপর থমকালো। সেই চোখে কালোর থেকে সাদার অংশ বেশি। ওদিকে কর্মচারীদেরও এক-একটা চকিত চাউনি।

সত্যিই ভদ্রলোক বসবেন আশা করে বসতে বলেনি ধীরাপদ। যে জন্যে বলেছে তা সফল। বেশ ঠাণ্ডা অথচ স্পষ্ট করেই ধীরাপদ বলল, আমার কাজের জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি এখানে বসে নাটক দেখব, কি হাওয়া খাব, কি আর কিছু করব তার দায়ও বোধ হয় আপনার ঘাড়ে পড়বে না।

বলার ধরনে উষ্মা না, বিদ্রূপ না, বরং হাল্কা প্রীতির সুরই ছিল। তবু নির্বাক প্রতিক্রিয়াটুকু উপভোগ্য। ম্যানেজারের দুই চোখের সাদা অংশ আরো একটু বিস্ফারিত, কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই বিভ্রম আর সেই বিশ্লেষণ।

হুঁশ ফিরতে ত্বরিত প্রস্থান। একেবারে ডিস্‌পেন্‌সিং রুমের ওধারে।

ব্যাপারটা ঠিকমত ভেবে দেখার জন্ত আড়াল দরকার বোধ হয়। খানিক বাদে কাজে বেরিয়ে এলেন যখন তখনো গোটা মুখে আহত গাম্ভীর্য। কর্ম-নিয়ন্ত্রণের স্বর ও সুর থমথমে মৃদু। কাজ চলছে। লোক আসছে, যাচ্ছে। তবু যেন পরিবেশ আর জমজমাট নয় তেমন। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও একটা নীরবতা থিতিয়ে আছে।

ভদ্রলোককে আদৌ অপদস্থ করার ইচ্ছে ছিল না। লোকটি কাজ জানেন, নিজের কাজ ছাড়া অন্ত সকলের কাজ আদায় করাও কাজ তাঁর। দরদ দিয়ে দায়িত্ব পালন করেন বলেই মেজাজ বিগড়েছিল। অবশ্য মেজাজ এমনিতেই একটু চড়া। কিন্তু তাঁর দিক থেকে বিচার করতে গেলে ধীরাপদর অপরাধ স্বেচ্ছাচারিতার পর্যায়েই পড়ে বই কি। অথচ ওটুকু না বলে উপায়ও ছিল না, আত্মরক্ষার তাগিদে বলা।

ম্যানেজার আপাতত এখানকার কর্ত্রীটির আগমনের প্রতীক্ষায় আছেন বোধ হয়। সে আসার আগে ধীরাপদ আজকের মত চাকরি-পর্ব শেষ করে সরে পড়বে কিনা ভাবছে। সেদিন রাতে লাবণ্য সরকার তাঁর হাতে ওকে সঁপে দিয়েছিল সে-কথা মনে হতে আবারও না বোঝাপড়ায় এগিয়ে আসেন ভদ্রলোক।

আবারও এলেন বটে, তবে বোঝাপড়া করতে নয়। মুখভাব শুকনো আর বিব্রত। জানালেন, বড় সাহেব টেলিফোনে এক্ষুনি একবার তাকে বাড়িতে দেখা করতে বলেছেন।

বড় সাহেব মানে হিমাংশু মিত্র। দোকানসুদ্ধ কর্মচারীর কাছে এ ধরনের আহ্বান অভিনব ব্যাপার। একটু আগেই ম্যানেজারের সঙ্গে যে বচন-বিনিময় হয়ে গেছে, তেমন চতুর হলে ধীরাপদর এরপর মুখে নিস্পৃহ গাম্ভীর্যের পালিশ চড়িয়ে উঠে আসার কথা। তার বদলে সে নিজেও হকচকিয়ে গেল। একটা নীরব প্রহসনের মধ্যে নীরবে গাত্রোত্থান।

বড় সাহেব ডাকলে ট্যাক্সিতে ছোটার রীতি জানে না, ধীরাপদ ট্রামে উঠল।...এই ডাকের পিছনে চারুদির তাগিদ বোধ হয়। অমিতাভ ঘোষও বলে থাকতে পারে। বলবে বলেছিল। ধীরাপদর হাসি পাচ্ছে। ভাত নাকি পেট খোঁজে না, ওর বেলায় তাই খুঁজছে যেন।

মানুকে নিচেই ছিল। একগাল হেসে জোড়-হাত কপালে ঠেকিয়ে আনত হল।—বাবু ভালো আছেন? চলুন, ওপরে চলুন, বড় সাহেব ঘরেই আছেন—আপনি এলে সটান নিয়ে যেতে বলেছেন।

ধীরাপদ সিঁড়ির দিকে এগোলো। মানুকে সবিনয়ে অনুগামী। আপ্যায়নের

বিনিময়ে একটা কুশল প্রশ্ন করা উচিত, ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, তুমি ভালো তো?

বিগলিত। ছিচরণের আশীর্বাদে ভালই বাবু। গলার স্বর নামল একটু। আপনি চলে যেতে কেয়ার-টেক বাবু সেদিন আর আমাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেনি, দোষ তো আসলে তেনারই। আপনি এ-বাড়িতে থাকতে পারেন বলে তেনাকে সেদিন ঘাবড়ে দিতে বাসনা করেছিলেন, তাই না বাবু? খুব জব্দ—

হি হি শব্দে চাপা হাসি। বড় সাহেবের সামনে উপস্থিত হতে চলেছে মনে মনে সেই প্রস্তুতির একটু অবকাশও পেল না ধীরাপদ। বাসনা করা শুনে হেসে ফেলল। মানুকের এই ফুর্তিও খুব স্বতোৎসারিত মনে হল না। যথার্থ কি 'বাসনা করেছে' এই স্বল্প সুযোগেও মানুকের সেটুকুই উপলব্ধির চেষ্টা হয়ত।

ওপরে উঠে আজ আর বাঁয়ে নয়, ডাইনের অন্দরমহলে এনে হাজির করা হল তাকে। একটা বড় ঘরের দোরগোড়ায় বিনয়-নম্র মূর্তিতে কেয়ার-টেক বাবু দাঁড়িয়ে। প্রথম তৎপর আহ্বান তারই। আসুন, সাহেব ভিতরে আছেন।

সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে এলো। অন্দরমহলের বসবার ঘর এটি। সেই ঘরের ভিতর দিয়ে আরো গোটাকতক ঘরের আভাস। এ-ঘরে দামী সোফা-সেটি, ডেক-চেয়ার, পুরু গদীর সাময়িক বিশ্রাম-শয্যা, দেয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং ছবি।

হিমাংশু মিত্র ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে খবরের কাগজ দেখছিলেন। কাগজ সরালেন।—বসো।

ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর থেকে পাইপটা নিয়ে দাঁতে চাপলেন। কেয়ার-টেক বাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে পাইপে অগ্নিসংযোগ করে দিল। পাইপ ধরতে একবার তিনি তার দিকে তাকালেন শুধু। সেটুকু নির্দেশ কিছু, সঙ্গে সঙ্গে কেয়ার-টেক বাবুর প্রস্থান।

ধীরাপদর অস্বস্তি এক ধরনের, এইটুকু থেকে মনোভাব বুঝে নিতে আর এ-রকম আনুগত্য রপ্ত হতে কতদিন লাগে?

তুমি কাজের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছ শুনলাম···

অমিতাভ নয়, চাবি তাহলে চারুদি ঘুরিয়েছেন। ধীরাপদ নিরুত্তর। নীরবতা নিরাপদ।

কাজের জন্য চিন্তা নেই—হিমাংশু মিত্র অত্যুৎসাহের রাশ টানার মত করে

বললেন, একবার কাজে লাগলে কাজের শেষ নেই। আমাদের মেডিক্যাল হোম, ফ্যাক্টরী—সব দেখেছ ?

ঘাড় নাড়ল, দেখেছে।

হিমাংশু মিত্র ভাবলেন একটু। যোগ্যতার দিকটাই স্মরণ করার চেষ্টা সম্ভবত। এতদিন কি করেছে না করেছে আবারও সেই প্রশ্ন দুই একটা। কবিরাজি ওষুধ আর বইয়ের বিজ্ঞাপন লিখেছে শুনে হেসে মন্তব্য করলেন, ওই বিদ্যে এখানেও কাজে লাগতে পারে, তবে তার জন্য কিছু অভিজ্ঞতা আর কিছু পড়াশুনা দরকার।

এটা সেটা দু-চার কথা আরো। কথা উপলক্ষ মাত্র। মোটা চশমার ওধার থেকে ঈষৎ কৌতুক-প্রচ্ছন্ন একটা যাচাইয়ের দৃষ্টি সরাসরি ধীরাপদর মুখের ওপর পড়ে আছে সেই থেকে। শেষে জানালেন, মাসের এই বাকি বারো-চৌদ্দ দিন মেডিক্যাল হোমেই বসতে হবে ওকে। সেখানে কিভাবে কাজ চলছে না চলছে সব বুঝে নেওয়া—ব্যবসা আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশান দুইই। এই ব্যাপারে মেডিক্যাল অ্যাডভাইসার লাবণ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার নির্দেশ দিলেন। ও-দিকটা মোটামুটি জানা হয়ে গেলে আগামী মাসের গোড়া থেকে তাকে ফ্যাক্টরীতে আনা হবে বলে আশ্বাস দিলেন। আসল কাজ সেখানেই, তবু ব্যবসায়ের গোটা পরিস্থিতি চোখের ওপর থাকা দরকার।

লেবার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছ কখনো ? আই মিন্, পার্টি-টার্টি করেছ ?

যেন প্রশ্ন নয় কিছু, হঠাৎ মনে এলো। ধীরাপদ মাথা নাড়ল, করেনি।

তাহলে কি আর করলে, কাজ না থাকলে ওটাই তো কাজ। পাইপ-চাপা মুখে হাসির আভাস।—সব ফ্যাক্টরীতেই কিছু না কিছু লেবার প্রবলেম লেগে থাকে…প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ?

কতবার ঘাড় নাড়বে ধীরাপদ ? প্রেসের কথায় প্রথমেই গণুদার মুখখানা মনে এলো। নতুন পুরনো বইয়ের দোকানের দে-বাবুর প্রয়োজনে গণুদাই যথেষ্ট মুরুব্বী, কিন্তু এখানে তাঁর উল্লেখও একেবারে নির্বোধের মতো হবে। জবাব দিল, যোগাযোগ করে নিতে পারি।

কি করে ? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন।

কোম্পানীর নামের জোরে আর বিজ্ঞাপনের জোরে। ক্ষণিকের দ্বিধা, তাছাড়া গোড়ার দিকে অমিতবাবু যদি একটু সাহায্য করেন, তিনি প্রেসরিলেশান মেনটেন করতেন শুনেছি…

ধীরাপদর মনে হল, জবাবের প্রথম অংশটুকু যুৎসই হয়েছিল, শেষের কথায় দৃষ্টির স্পষ্ট পরিবর্তন।—তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?

কাল ফ্যাক্টরীতে আলাপ হয়েছিল—

সে প্রেস-রিলেশান মেনটেন করত কে বলল তোমাকে?

এবারে কোণঠাসা। ধীরাপদ মনে মনে নিজেকে রজক-পালিত জীব বলে গালাগাল করে নিল প্রথমে। জবাব দিল, চারুদি গল্প করেছিলেন…

চারুদি কি গল্প করেছিলেন সেটা যেন ওর মুখে লেখা, আর হিমাংশু মিত্র নীরবে কয়েক মুহূর্ত তাই পাঠ করলেন। ধীরাপদর ফাঁড়া কাটল কি একটা ফাঁড়া তৈরী হয়ে থাকল বোঝা গেল না। পাইপটা হাতে নিয়ে হাসলেন তিনি। লঘু কৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তার সাহায্য পাবে আশা করছ?

অর্থাৎ, ভাগ্যে যদি সত্যি সাহায্য করে ওকে সেটা যথার্থ হাতযশ বলতে হবে। ধীরাপদর মুখ সেলাই এবারে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সাক্ষাৎ-পর্ব শেষ। হাতের পাইপ দাঁতে গেল আবার।—আচ্ছা, এ-সব পরে ভাবা যাবে, এ-মাসটা মেডিক্যাল হোম অ্যাটেণ্ড করো। কোনো অসুবিধে হলে বা কিছু বলার থাকলে আমাকে জানিও, কাম স্ট্রেইট—গুড বাই।

লঘু পদক্ষেপে সামনের ঘরের ভিতর দিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে গেলেন। সেদিকে চেয়ে ধীরাপদ বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তাঁর শেষের এই আন্তরিকতা চাপা বিদ্রূপের মত লাগল কানে।

মেডিক্যাল হোম।

আজ আর সেখানে না ফিরলেও চলত। কারো কাছে জবাবদিহিও করতে হত না। তবু বাইরে এসে আবার সেখানেই ফেরার তাগিদ অনুভব করছিল ধীরাপদ। খোদ বড় সাহেবের পরোয়ানা জাহির করার জন্য নয়। কিন্তু এই পরোয়ানার জোর ছিলই একটু। কাল আবার ম্যানেজার আর কর্মচারীদের নাকের ডগায় সঙের মত বসে থাকার চেয়ে আজই গিয়ে দাঁড়ানো ভালো। হিমাংশু মিত্র লাবণ্য সরকারের সঙ্গেই আলোচনা করতে বলেছেন।

রোগীর ভিড় এড়ানোর জন্যে বেশ খানিকক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরি করে কাটিয়ে একটু রাত করেই দোকানে এসে ঢুকল। দোকানের ভিড় কিছুটা

হাল্কা তখন, বেঞ্চিতে রোগীর সংখ্যাও নামমাত্র। ম্যানেজার এক নজরে যতটুকু দেখা সম্ভব দেখলেন, তার পর কাজে মন দিলেন। কর্মচারীরা কাজের ফাঁকে ফিরে ফিরে তাকালো। রমেন হালদার তার সামনের খদ্দের ভুলে হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে।

রোগী ডাকতে এসে লাবণ্য সরকারও দেখল।

সেই দেখা থেকে ধীরাপদর অনুমান, ম্যানেজার তার কাছে যতটুকু নিবেদন করার করেছেন।

শেষ রোগীটি বিদায় হবার পর আলোচনার জন্যে ধীরাপদকে এগোতে হল না, তারই ডাক পড়ল। বেয়ারা এসে মেমসাহেবের তলব জানালো। ধীরাপদর নিজে থেকে সামনে এসে দাঁড়ানোর সঙ্কোচ গেল।

লাবণ্য সরকার চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। একটু অবসন্ন। এতক্ষণের ধকলের পর একটু শ্রান্তি স্বাভাবিক। টেবিলের ওপর স্টেথোস্কোপটা সাপের মত কুণ্ডলী পাকানো। এধারে সেই মোটা ব্যাগটা।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে লাবণ্যর শিথিল দৃষ্টি ওর মুখের ওপর আটকালো। শিথিল বটে, আবার গভীরও। মুখ দেখে তার আজকের ব্যবহারের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টাটা লক্ষণ দেখে রোগ বোঝার চেষ্টার মত।

কি ব্যাপার বলুন তো? ম্যানেজারকে নাকি আপনি আজ কি সব বলেছেন শুনলাম···

সামনে দুটো খালি চেয়ার, অথচ বসতে বলেনি। আগের দিনও বলেনি। ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা না-ও হতে পারে, অধস্তনদের এখানে এসে বসাটা রীতি নয় হয়ত। কিন্তু আজ ধীরাপদ চেয়ার দুটোর এই শূন্যতার বিদ্রূপ বরদাস্ত করল না। একটা চেয়ার টেনে বসল, আর একটা চেয়ারের কাঁধে একখানা বাহু ছড়িয়ে দিল। তারপর হাসিমুখে জবাব দিল, ম্যানেজারবাবু হয়ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু আমি তাঁকে একটুও অসম্মান করতে চাইনি, আমার কাজের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে না—এই শুধু বলেছি।

লাবণ্য সরকার তার বসাটা লক্ষ্য করেছে, অন্য চেয়ারে হাত ছড়ানো লক্ষ্য করেছে, তার জবাবের অকুণ্ঠ ভঙ্গীও লক্ষ্য করেছে। এরই সামনে সেদিন ফ্যাক্টরীর কণ্ট্রোল রুমে অমিতাভ ঘোষের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে নিজের বিড়ম্বিত পরিস্থিতিটাও এরই মধ্যে ভোলেনি বোধ হয়।

আপনার কাজের দায়িত্ব কে নেবেন তাহলে?

তা তো জানি না। ধীরাপদকে যেন জব্দ করা হয়েছে, মুখে-চোখে সেই

রকমই সরল ব্যঞ্জনা।—আপনিই ।নন না ?

প্রতিক্রিয়া যাই হোক, ওজন না বোঝা পর্যন্ত কর্ত্রীস্থানীয়া মহিলাটির সংযমের ওপর দখল আছে। হিমাংশু মিত্র টেলিফোনে ওকে বাড়িতে দেখা করতে বলেছেন ম্যানেজার সেই খবরও জানিয়েছেন নিশ্চয়, কিন্তু প্রথমেই সে প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসা করলে পাছে মর্যাদা দেওয়া হয় তাই হয়ত ম্যানেজারের অভিযোগটাই প্রথম উত্থাপন করেছিল।

মিস্টার মিত্র আপনাকে ডেকেছিলেন কেন ?

প্রশ্নটা চাপা আনন্দের কারণ। জবাব দিল, এখানে কি-ভাবে কাজ চলছে সব দেখে রাখতে বললেন, আর আপনার সঙ্গেও আলোচনা করতে বললেন—

কি আলোচনা ?

কি দেখব, কি ভাবে কাজ শুরু করব সেই সম্বন্ধে—মাসের এই বাকি ক'টা দিন মাত্র সময় দিয়েছেন।

তারপর কী ?

তারপর অন্য কাজ দেবেন বোধ হয়।

হেঁয়ালির মধ্যে পড়ে লাবণ্য সরকারের মুখে বিরক্তির কুঞ্চন স্পষ্ট হয়ে উঠল এবারে। বলল, কি জানি, কি ব্যাপার আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সেটুকুই কাম্য ছিল ধীরাপদর। নিজের সহজতায় নিজেই পরিতুষ্ট। মহিলার বিরক্তির জবাবে নিরীহ কুণ্ঠা প্রকাশেও ভেজাল নেই, বুঝতে না পারার অপরাধ যেন ওরই। তারপর সাদাসিধে একটা প্রস্তাব করল, টেলিফোনে মিস্টার মিত্রের সঙ্গে একবার কথা বলে নেবেন ?

কথা এরপর বড় সাহেবের সঙ্গে বলবে কি কার সঙ্গে বলবে ধীরাপদ ভালই জানে। সে-কথা যে তার দিক থেকে খুব অনুকূল হবে না সে-সম্বন্ধেও প্রায় নিঃসংশয়। কিন্তু প্রস্তাবনার আপাত প্রতিক্রিয়া রসোত্তীর্ণ। কি করবে না করবে সেটা এখানকার কারো মুখে শুনতে অভ্যস্ত নয়, কয়েক মুহূর্তের নিষ্পলক দৃষ্টি-গাম্ভীর্যে লাবণ্য সরকার সেটুকুই ভালো করে বুঝিয়ে দিল। উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা টেনে নিয়ে তার মধ্যে স্টেথোস্কোপ রাখার ফাঁকে আবারও তাকালো।

সকলের চোখের ওপর দিয়ে সকলের আগেই ধীরাপদ দোকান ছেড়ে বাইরে চলে এলো। ফুটপাথ ঘেঁষে লাবণ্য সরকারের জন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে, কোম্পানীর সেই ছোট স্পেশাল ওয়াগন। ধীরাপদ পা চালিয়ে এগিয়ে গেল। এভাবে

বেরিয়ে আসাটা ঠিক হল না হয়ত, কিন্তু বসে থেকেই বা করত কি। লাবণ্য সরকার ছাড়াও আর যারা আছে সেখানে, এই নাটকের পর তাদের জন্য অন্তত খানিকটা রিলিফ দরকার। কাল আবার আসতে হবে সেই চিন্তাও অলক্ষ্য অস্বস্তির মত।

কালকের কথা কাল।

আজকের সমস্ত ব্যাপারটা রসিয়ে রোমন্থন করার মত। ম্যানেজারের মুখ বন্ধ করা, হিমাংশু মিত্রের ডেকে পাঠানো, লাবণ্য সরকারের কর্ত্রীত্বের মুখোমুখি দাঁড়ানো। পরে যাই হোক, আজ অন্তত সকলকে ভাবিয়ে আসতে পেরেছে—এই ক'টা দিনের অবহেলার জবাব দিয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু স্নায়ুজ প্রগল্‌ভতা ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে তুষ্টির বদলে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে কোথায়। মনে হচ্ছে, আগাগোড়াই ছেলেমানুষি করে এলো। আসলে মনের অগোচরের একটা সুপ্ত বাসনায় আঁচ লেগেছিল, সেই আঁচে পুরুষকারের রঙ ধরেছিল—তাই নিজেকে এভাবে জাহির করার তাগিদ। নইলে কেই বা তাকে অবহেলা দেখাতে গেছে, আর কার সঙ্গেই বা তার রেষারেষি!

আগে পথ চলতে প্রায় প্রতিটি লোকের মুখের রেখা চোখে পড়ত। সেই রেখা ধরে প্রবৃত্তি-বৈচিত্র্যের অনেক হিজিবিজি নক্সা আঁকত। এঁকে নিরাসক্ত দ্রষ্টার মত দেখত চেয়ে চেয়ে। চারুদির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এই দেখার আনন্দে ছেদ পড়েছে। আজ নতুন সূচনায় চতুষ্পথে এসে সকলকে ছেড়ে ধীরাপদর নিজের দিকেই চোখ গেল।

ধীরাপদ থমকালো একটু।

•

আজও একটু জ্বর উঠেছে আবার। থার্মোমিটার লাগিয়েছিলেন বুঝি? আমি একটা ভালো প্রেসক্রিপশান দিতে পারি, ফলো করবেন? থার্মোমিটারটা রাস্তায় ফেলে দিন, তারপর যেমন খুশি সেইভাবে চলুন, যা খুশি তাই খান, অসুখ বলে একটা কথা আছে তাই ভুলে যান। বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা যা বললাম করে দেখুন, খারাপ কিছু হলে দায়িত্ব আমার। ডাঃ লাবণ্য সরকার রোগী সম্বন্ধে নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্ত।

ওষুধটা নিয়মমত খাননি? কেন? ঠেলে উঠে আসতে চায়! আসেই যদি সে ভাবনা তো আমার, আপনি খাবেন না কেন? দেখি হাত। সাড়া নেই কিছুক্ষণ, হাত দেখার পরে বোধ হয় বুক দেখার নীরবতা।—ওষুধ তো

দেব, কিন্তু দিয়ে লাভ কি, গোলাপ জল আর লিমনস্কোয়াশ মিশিয়ে তো আর ওষুধ দিতে পারি না! বেল টিপে বেয়ারা তলব, একটা ইনজেক্শান এনে দেওয়ার নির্দেশ।—ওষুধ বদলে দিচ্ছি, আর একটা ইনজেক্শান দেব, লাগবে না, ভয় নেই। এই ওষুধটা ওঁকে দিনে তিনবার নিয়ম করে খাওয়াবেন, রোগিণীর স্বামীর প্রতি গম্ভীর নির্দেশ, আর দু'বেলা খাবার আগে এই টনিক দু চামচ করে—খিদেও হবে, ওজনও বাড়বে। এবারে অনিয়ম হলে ভয়ানক রাগ করব কিন্তু, দিনের পর দিন এভাবে ভুগলে আমার বদনাম না? রোগিণীর কারণে ডাঃ লাবণ্য সরকারের দুশ্চিন্তাভরা অভিযোগ।

—ঘুম হয় না? ভালই তো, অনেক সময় পাচ্ছেন দিব্বি। আমি তো নিজের জন্যে ঘুম না হওয়ার ওষুধ খুঁজছি। অনিদ্রা প্রসঙ্গে লঘু বিশ্লেষণ।—ঘুম না হওয়ার জন্য তত ক্ষতি হয় না, যত হয় ঘুম হল না সেই চিন্তা থেকে। সদয় প্রশ্ন, ঘুম হচ্ছে না কেন, খুব ভাবেন বুঝি? আপনার আবার ভাবনা-চিন্তা কি? পেট কেমন? খিদে? পিঠের সেই ক্রনিক ব্যথাটা একেবারে গেছে তাহলে? যা ভাবিয়েছিলেন···আচ্ছা, ঘুমের ওষুধও দিচ্ছি, কিন্তু আপনি চেষ্টা না করলে শুধু ওষুধে কিছু হবে না। রোজ সকালে উঠে খোলা বাতাসে বেশ খানিকক্ষণ হাঁটতে হবে। মনোযোগী রোগীর প্রতি ডাঃ লাবণ্য সরকারের মুক্ত-বাতাসে প্রাতর্ভ্রমণের উপযোগিতা বিশ্লেষণ।

—আপনি দিনকতক এখন ঘুমোন দেখি বেশ করে, সব অবসাদ কেটে যাবে, আপনার শরীর ঘুম চাইছে। প্রেসার দেখেছিলেন শিগ্গীর? আচ্ছা আমি দেখে দিচ্ছি, ওই বেডএ যান। প্রেসার তো লো, কত বয়েস? তাহলে তো খুবই লো। তা বলে ভাববেন না যেন, এই একটা রোগই সব রোগী পছন্দ করেন। ওষুধ যাই দিই আসল চিকিৎসা খাওয়া আর ঘুমোনো। ওষুধ আর ইনজেক্শানের উল্লেখসহ ডাঃ লাবণ্য সরকারের রসনা-উসকানো খাদ্য-তালিকা বিস্তার।

—কি খবর? যেতে হবে? এক্ষুনি যাব কি করে, কাল সকালে যাব'খন ···তাহলে তো মুশকিল, আচ্ছা রাত ন'টার পর যাব। কিন্তু এরই মধ্যে এত ছটফট করার মত কি হল, এই তো কাল দেখে এলাম! ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে মনে হচ্ছে? কার মনে হচ্ছে, আপনার না আপনার স্ত্রীর? ডাক্তার না দেখলে উনি সুস্থ হবেন না যখন যাব, কিন্তু ওই যন্ত্রটার অস্তিত্ব আপনার

স্ত্রীর মাথা থেকে না তাড়ালে রোগ ছাড়বে না। ওটাই ওঁকে পেয়ে বসেছে—সিসটলিক দশ-বিশ উঠতে বসতে কমে বাড়ে, ওটা গোটাগুটি মানসিক একেবারে। আপনার বা আপনার স্ত্রীর মত অত যারা লেখাপড়া জানে না তারা ব্লাডপ্রেসারও জানে না। রক্তচাপ প্রসঙ্গে ডাঃ লাবণ্য সরকারের মন্তব্য।

ক্যাস কাউন্টারের ওধারে ডাক্তারের চেম্বার-পার্টিশনের ঠিক পিছনটিতে ধীরাপদর টেবিল-চেয়ার। কান পাতলে ভিতরের প্রতিটি কথা কানে আসে। ধীরাপদ কান পেতে শোনে। শুধু তাই নয়, এই একজনের চিকিৎসা-পর্ব শোনার প্রতীক্ষায় বসে থাকে রোজই। বিকেল ছটার পরের দু-তিন ঘণ্টা কোথা দিযে কেটে যায় টেরও পায় না। যে লাবণ্য সরকার কর্মচারীদের কাছে এমন, সে-ই যে আবার নিজের পেশার ক্ষেত্রে কেমন—নিজের কানে না শুনলে ধীরাপদ ভাবতেও পারত না। এমন চিকিৎসকের পসার হবে না তো কার হবে। আর যে ক'টি চিকিৎসক আসেন তাঁরা শুধু চিকিৎসাই করেন। তাঁদের ওষুধের মতই নীরস তাঁরা। কিন্তু ডক্টরিং ইজ অ্যান আর্ট···চিকিৎসা চিকিৎসা-কলাও বটে। পেশার ক্ষেত্রে সেই কলা লাবণ্য সরকার ভালোমত রপ্ত করেছে। অবশ্য এর পিছনে প্রকৃতিগত আনুকূল্য আছে কিছু। আছে যখন তার ফলও আছেই। প্রকৃতির বশ নয় কোন্ মানুষ? লাবণ্য সরকারের ওষুধে রোগ না ছাড়লে কথায় ছাড়ে, কথায় না ছাড়লে হাসিতে ছাড়ে। ছাড়ুক না ছাড়ুক এই চিকিৎসা-কলাকুশলিনীর হাতে রোগী হতে সাধ যায়।

ওইখানে বসে বসে আর একটা আবিষ্কার করেছে ধীরাপদ। যার যার অল্পস্বল্প রোগের প্রতি রোগীর বেশ একটু মমতা আছে। শোক লালন করতে দেখেছে, এখানে এসে রোগ লালন করা দেখল। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সদয়-মর্যাদা-লাভে বঞ্চিত মনে হলে ভদ্রগোছের ছোটখাটো একটা রোগ সংগ্রহ করে দেখো, মর্যাদা পাবে। তুমি যে ঘটা করে বিরাজ করছ সেই তুষ্টি উপলব্ধি করানোর দোসর পাবে।

লাবণ্য সরকার সেদিক থেকে অন্তরঙ্গ দোসর। প্রত্যেককে সে বিভিন্ন ভাবে মর্যাদা দিতে জানে, প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন ভাবে উতলা হতে জানে। সাধারণ চিকিৎসাক্ষেত্রে এ যে কম জানা নয় সেটা ধীরাপদ এরই মধ্যে উপলব্ধি করেছে।

এই দু-তিন ঘণ্টা বাদ দিলে সারাক্ষণের ক্লান্তি। কাজ নেই বললেই চলে।

অলস সময় যাপনে অনভ্যস্ত নয় ধীরাপদ। কিন্তু ছকে-বাঁধা কর্মচঞ্চলতার মধ্যে এমন নিষ্ক্রিয় আলস্যের বোঝা আর কখনো টানেনি। না চলে চোখ, না মন। সেকেণ্ড গুনে মিনিট গুনে ঘণ্টা পার করার মত। এখন যা-ও করছে প্রথম দু দিন তাও জোটেনি। কাউণ্টারে দাঁড়ানো ছাড়া আর কি করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে যিনি হদিস দিতে পারতেন, তিনি বিমুখ। পুরো সাত ঘণ্টার মধ্যে ম্যানেজার সাত বারও ওর দিকে তাকান কিনা সন্দেহ। দুপুরের নিরি-বিলিতে সেই রমেন হালদারই শুধু কাছে আসে। কিন্তু বিস্ময়ে নিজেই ফাটো-ফাটো, সে আর কাজের হদিস কি দেবে?

দাদা আপনি যে সাংঘাতিক লোক দেখি, এমনিতে কিচ্ছুটি বোঝা যায় না!

কেন, কি হল আবার···।

কি হল! রমেন হালদারের বিস্ময় উপছে ওঠার দাখিল, ম্যানেজার কুপোকাত, টেলিফোনে বড় সাহেবের তলব, তারপর চেম্বার থেকে কাল আপনি বেরিয়ে যাবার পর মিস সরকারেরও দেখি পিসিমা-পিসিমা মুখ! বলুন না দাদা, শুনব বলে সেই থেকে হাঁসফাঁস করছি আমি—

ওর কৌতূহল জিইয়ে রেখেই ধীরাপদ কাজের কথায় আসতে চেষ্টা করছিল। —এখানকার সব কাজ-কর্ম বুঝিয়ে দেবার জন্য পাছে তোমাকে চেয়ে বসি সেই রাগে অমন মুখ করে ছিলেন বোধ হয়।

ছেলেটার বড় বড় দুই চোখ মুখের ওপর এক চক্কর ঘুরে শেষে থেমেছিল। —যাঃ, আপনি ঠাট্টা করছেন। সলজ্জ হাসি, কিন্তু এখানে কাজ-কর্ম বোঝার কি আছে আবার!

বলো তো দেখি কি আছে?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওষুধ বেচা ছাড়া আর কিছু নেই। নিজের দোকান হলে দেখিয়ে দিতাম কত রকম প্ল্যান করা যায়।

নিজের দোকান বলেই ভাবো না।

এই দোকানকে! এও ঠাট্টা কিনা বুঝে নিতে চেষ্টা করল।—হুঁঃ, এর দশ ভাগের এক ভাগের কথাই ভাবতে পারিনে। তারপরেই সমস্ত মুখে আলগা উত্তেজনা একপ্রস্থ, বড় আলো যেমন ছোট আলো ঢেকে দেয় তেমনি একটা বড় আগ্রহের ছটায় রমেনের ছোট কৌতূহল চাপা পড়ে গিয়েছিল।—একটা দোকান করবেন দাদা? আজ থেকে ভাবলে একদিন না একদিন ঠিক হবে, আসুন না আমাতে আপনাতে ভাবি—

স্ত্রীর মাথা থেকে না তাড়ালে রোগ ছাড়বে না। ওটাই ওঁকে পেয়ে বসেছে—সিস্টলিক দশ-বিশ উঠতে বসতে কমে বাড়ে, ওটা গোটাগুটি মানসিক একেবারে। আপনার বা আপনার স্ত্রীর মত অত যারা লেখাপড়া জানে না তারা ব্লাডপ্রেসারও জানে না। রক্তচাপ প্রসঙ্গে ডাঃ লাবণ্য সরকারের মন্তব্য।

ক্যাস কাউন্টারের ওধারে ডাক্তারের চেম্বার-পার্টিশনের ঠিক পিছনটিতে ধীরাপদর টেবিল-চেয়ার। কান পাতলে ভিতরের প্রতিটি কথা কানে আসে। ধীরাপদ কান পেতে শোনে। শুধু তাই নয়, এই একজনের চিকিৎসা-পর্ব শোনার প্রতীক্ষায় বসে থাকে রোজই। বিকেল ছটার পরের দু-তিন ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরও পায় না। যে লাবণ্য সরকার কর্মচারীদের কাছে এমন, সে-ই যে আবার নিজের পেশার ক্ষেত্রে কেমন—নিজের কানে না শুনলে ধীরাপদ ভাবতেও পারত না। এমন চিকিৎসকের পসার হবে না তো কার হবে। আর যে ক'টি চিকিৎসক আসেন তাঁরা শুধু চিকিৎসাই করেন। তাঁদের ওষুধের মতই নীরস তাঁরা। কিন্তু ডক্টরিং ইজ অ্যান আর্ট…চিকিৎসা চিকিৎসা-কলাও বটে। পেশার ক্ষেত্রে সেই কলা লাবণ্য সরকার ভালোমত রপ্ত করেছে। অবশ্য এর পিছনে প্রকৃতিগত আনুকূল্য আছে কিছু। আছে যখন তার ফলও আছেই। প্রকৃতির বশ নয় কোন্ মানুষ? লাবণ্য সরকারের ওষুধে রোগ না ছাড়লে কথায় ছাড়ে, কথায় না ছাড়লে হাসিতে ছাড়ে। ছাড়ুক না ছাড়ুক এই চিকিৎসা-কলাকুশলিনীর হাতে রোগী হতে সাধ যায়।

ওইখানে বসে বসে আর একটা আবিষ্কার করেছে ধীরাপদ। যার যার অল্পস্বল্প রোগের প্রতি রোগীর বেশ একটু মমতা আছে। শোক লালন করতে দেখেছে, এখানে এসে রোগ লালন করা দেখল। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সদয়-মর্যাদা-লাভে বঞ্চিত মনে হলে ভদ্রগোছের ছোটখাটো একটা রোগ সংগ্রহ করে দেখো, মর্যাদা পাবে। তুমি যে ঘটা করে বিরাজ করছ সেই তুষ্টি উপলব্ধি করানোর দোসর পাবে।

লাবণ্য সরকার সেদিক থেকে অন্তরঙ্গ দোসর। প্রত্যেককে সে বিভিন্ন ভাবে মর্যাদা দিতে জানে, প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন ভাবে উতলা হতে জানে। সাধারণ চিকিৎসাক্ষেত্রে এ যে কম জানা নয় সেটা ধীরাপদ এরই মধ্যে উপলব্ধি করেছে।

এই দু-তিন ঘণ্টা বাদ দিলে সারাক্ষণের ক্লান্তি। কাজ নেই বললেই চলে।

অলস সময় যাপনে অনভ্যস্ত নয় ধীরাপদ। কিন্তু ছকে-বাঁধা কর্মচঞ্চলতার মধ্যে এমন নিষ্ক্রিয় আলস্যের বোঝা আর কখনো টানেনি। না চলে চোখ, না মন। সেকেণ্ড গুনে মিনিট গুনে ঘণ্টা পার করার মত। এখন যা-ও করছে প্রথম দু দিন তাও জোটেনি। কাউণ্টারে দাঁড়ানো ছাড়া আর কি করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে যিনি হদিস দিতে পারতেন, তিনি বিমুখ। পুরো সাত ঘণ্টার মধ্যে ম্যানেজার সাত বারও ওর দিকে তাকান কিনা সন্দেহ। দুপুরের নিরিবিলিতে সেই রমেন হালদারই শুধু কাছে আসে। কিন্তু বিস্ময়ে নিজেই ফাটো-ফাটো, সে আর কাজের হদিস কি দেবে ?

দাদা আপনি যে সাংঘাতিক লোক দেখি, এমনিতে কিচ্ছুটি বোঝা যায় না !

কেন, কি হল আবার...।

কি হল ! রমেন হালদারের বিস্ময় উপচে ওঠার দাখিল, ম্যানেজার কুপোকাত, টেলিফোনে বড় সাহেবের তলব, তারপর চেম্বার থেকে কাল আপনি বেরিয়ে যাবার পর মিস সরকারেরও দেখি পিসিমা-পিসিমা মুখ ! বলুন না দাদা, শুনব বলে সেই থেকে হাঁসফাঁস করছি আমি—

ওর কৌতূহল জিইয়ে রেখেই ধীরাপদ কাজের কথায় আসতে চেষ্টা করছিল। —এখানকার সব কাজ-কর্ম বুঝিয়ে দেবার জন্য পাছে তোমাকে চেয়ে বসি সেই রাগে অমন মুখ করে ছিলেন বোধ হয়।

ছেলেটার বড় বড় দুই চোখ মুখের ওপর এক চক্কর ঘুরে শেষে থেমেছিল। —যাঃ, আপনি ঠাট্টা করছেন। সলজ্জ হাসি, কিন্তু এখানে কাজ-কর্ম বোঝার কি আছে আবার !

বলো তো দেখি কি আছে ?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওষুধ বেচা ছাড়া আর কিছু নেই। নিজের দোকান হলে দেখিয়ে দিতাম কত রকম প্ল্যান করা যায়।

নিজের দোকান বলেই ভাবো না।

এই দোকানকে ! এও ঠাট্টা কিনা বুঝে নিতে চেষ্টা করল।—হুঁঃ, এর দশ ভাগের এক ভাগের কথাই ভাবতে পারিনে। তারপরেই সমস্ত মুখে আলগা উত্তেজনা একপ্রস্থ, বড় আলো যেমন ছোট আলো ঢেকে দেয় তেমনি একটা বড় আগ্রহের ছটায় রমেনের ছোট কৌতূহল চাপা পড়ে গিয়েছিল।—একটা দোকান করবেন দাদা ? আজ থেকে ভাবলে একদিন না একদিন ঠিক হবে, আসুন না আমাতে আপনাতে ভাবি—

ওর নিজস্ব একটা দোকানের আকাঙ্ক্ষার কথা ধীরাপদ আগেই শুনেছিল। মাত্র এই কটা দিনের পরিচয়ে তাকেই সেই আকাঙ্ক্ষার দোসর করে নেবার চেষ্টা দেখে হাসি পেয়েছে।

ভাবা যাবে, কিন্তু এখন আপাতত—

এখনই কে বলছে, এখন টাকাই বা কোথায়! কিন্তু এখন থেকে একটা প্ল্যান তো মাথায় থাকা দরকার। আপনাতে আমাতে ভাবলে দোকান হবেই একদিন, আপনাকে প্রথম দিন দেখেই আমায় অন্যরকম মনে হয়েছে, আপনি ঠিক এখানকার সকলের মত ইয়ে—মানে চাকরি-সর্বস্ব ধরনের নন।

প্রশংসার জাল ছাড়িয়ে ধীরাপদর নিজের সমস্যায় পৌঁছনোর অবকাশ মেলেনি। ম্যানেজারের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে রমেন মুখের আশার আলো এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে কাউণ্টারের ওধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

যা-হোক কিছু কাজের হদিস শেষে লাবণ্য সরকারই দিয়েছে ধীরাপদকে। দিন দুই একটা লোককে এমন গো-বেচারার মত বসে থাকতে দেখে নিজেই আবার ডেকেছিল। ডেইলি সেলস্ রিপোর্ট স্টাডি করতে বলেছে, পুরনো রিপোর্ট দেখে এক-একটা সিজনে বিশেষ বিশেষ কয়েকটা ওষুধের গড়পড়তা চাহিদার ওঠা-নামার চার্ট তৈরির নির্দেশ দিয়েছে। এ-ছাড়া, স্টক্ না রাখার ফলে যে-সব প্রেসক্রপশান রোজ ফেরত যাচ্ছে এখান থেকে, তারও একটা খসড়া তৈরি করতে পরামর্শ দিয়েছে—এ-রকম খসড়া চোখের ওপর থাকলে স্টক্ সম্বন্ধে ভাবার অনেক সুবিধে হয় নাকি।

আগের দিনের মত সেদিন আর আত্মাভিমানী সুপ্ত তাড়নাটাকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেয়নি ধীরাপদ। লাবণ্য বসতে বলেনি, সে-ও চেয়ার টেনে বসেনি। আগের দিনের মত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছে, হাই তুলে সাত ঘণ্টা কাটানোর চক্ষুলজ্জা কিছুটা কাটল ভেবে মনে মনে একটু কৃতজ্ঞতাও বোধ করেছে, আর ফিরে এসে নির্দেশমতই কাজে মন দিতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু কাজ করলে এই বা কতক্ষণের কাজ। দু ঘণ্টাও লাগে না। ধীরাপদ এই সঙ্গে আরও একটা কাজ আবিষ্কার করেছে। ওষুধের লিটারেচার পড়া, কোন্ কোন্ অসুখে কোন্ ওষুধে অব্যর্থ সেই ফিরিস্তি। সূক্ষ্মবিচারে অম্বিকা কবিরাজের কবিরাজী ওষুধের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তফাত নেই খুব। সূক্ষ্মতাটুকুই তফাত। বেশ লাগে পড়তে, এই দেহ-যন্ত্রটি যেন অগণিত রোগ-তৈরীর কারখানা বিশেষ। এত রোগ থাকতে মানুষ আবার নীরোগ হয়

কেমন করে !

কিন্তু তবু হাই ওঠে। পাঁচটার পর থেকেই ঘড়ির দিকে ঘনঘন চোখ ছোটে,- ছটা বাজতে বাকি কত। ফুটপাত ঘেঁষে স্টেশান ওয়াগানটা এসে দাঁড়ালেই টের পায় এখন। নড়েচড়ে ঠিকঠাক হয়ে বসে। যেন এতক্ষণের শ্রান্ত প্রতীক্ষার পর দিনের কাজ শুরু। লাবণ্য সরকার চেম্বারে ঢুকে পড়লে এক-একদিন উঠে এসে বাইরে প্রতীক্ষারত রোগীর ভিড় দেখে যায়। ভিড় যত বেশি তত খুশি। যাত্রা দেখতে এসে অপরিণত মন বড় প্রোগ্রাম দেখলে যেমন খুশি হয়।

সেদিন ধীরাপদর দিনের কাজেও অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্যের সূচনা ঘটল একটা।

সবে বিকেল চারটে তখন। ম্যানেজার এসেছেন। কাউণ্টারে কর্ম-তৎপরতার আভাস জাগেনি তখনো। ঝিমুনি কাটানোর জন্য ধীরাপদ বাইরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। চুপচাপ রাস্তা দেখছিল আর ভাব-ছিল একটু চা খেয়ে আসবে কিনা।

কোথা থেকে ভুঁইফোঁড়ের মত এসে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল কোম্পানীর সেই স্টেশান-ওয়াগান, লাবণ্য সরকার যার একচ্ছত্র আরোহিণী। ড্রাইভার দরজা খুলে দিতে একটা ফাইল-সহ ব্যাগ হাতে সে-ই নামল। ধীরাপদকে দেখল একবার, তার পর সুষ্ঠু গাম্ভীর্যে পাশ কাটিয়ে দোকানে প্রবেশ করল।

গাড়িটা চলে গেল।

অসময়ে এই কর্ত্রীটির আবির্ভাবে দোকানের আর সকলে অভ্যস্ত কিনা ধীরাপদর জানা নেই। এ-সময়ে সে এই প্রথম দেখল তাকে। ম্যানেজারের কাছে গিয়ে কি বলল, অনুমান করা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার এবং আর সকলেরও মুখে চকিত ভাবান্তর একটু। লাবণ্য সরকার কয়েকটা ওষুধ চেয়ে নিয়ে ব্যাগে পুরল, তারপর ভিতরে ঢুকে গেল। ম্যানেজার কাউণ্টার থেকে বেরিয়ে এসে নিজে হাতে চেয়ার আর বেঞ্চিগুলি ঠিক করে রাখলেন। তাঁর ইঙ্গিতে বেয়ারা আর একপ্রস্থ ঝাড়ামোছা করে দিয়ে গেল সেগুলো।

এই প্রচ্ছন্ন ব্যস্ততার মধ্যে ছবির মত দাঁড়িয়ে থাকাটা বিসদৃশ। ধীরাপদ এগিয়ে এসে দেখে তার টেবিল চেয়ার লাবণ্য সরকারের দখলে। গম্ভীরমুখে ফাইল ঘাঁটছে, জায়গায় জায়গায় কাগজের নিশানা আঁটছে। এই ফাইলটাই

সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। অন্য অ্যাটেণ্ডিং ফিজিসিয়ান এসে যেতে পারেন ভেবেই হয়ত ওখানে বলেছে।

ধীরাপদ সরে এলো।

দশ মিনিটের মধ্যে ফুটপাথ ঘেঁষে আর একখানা গাড়ি এসে থামল।

হিমাংশু মিত্রের সেই গাঢ় লাল গাড়ি।

বাজনার মত হর্ন বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ণ দোকানটার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ। ব্যাগ আর ফাইল হাতে লাবণ্য সরকার বেরিয়ে এলো। হাসি হাসি মুখ, লঘু চরণে তৎপর ছন্দ। ড্রাইভার সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দিতে হিমাংশু মিত্রের পাশে উঠে বসল সে।

রীতিনীতি ভুলে ধীরাপদ সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ির দিকে এগোলো। লাবণ্য সরকারের পাশ থেকে দোকানের দিকে ঝুঁকে বড় সাহেব ইশারায় ওকেই ডাকছেন।

ইঙ্গিতে ড্রাইভারের পাশটা দেখিয়ে দিলেন। অর্থাৎ, ওঠো।

কোথায় চলেছে, কি ব্যাপার, ধীরাপদ ভাবতেও পারছে না। তাকে সঙ্গে নেওয়াটা পূর্বকল্পিত নয় নিশ্চয়, কিন্তু চলল কোথায়? পিছনের কথাবার্তা থেকে মনে হল, বড় সাহেব ব্যবসায় সংক্রান্ত কোনো কাজেই চলেছেন। একটা ওষুধ নিয়ে আলোচনা, কাগজ-পত্র কি রেডি আছে না আছে সেই কথা দু-চারটে।

ধীরাপদর কিছুই বোধগম্য হল না।

বুঝতে চেষ্টাও করল না। প্রথমে সহজ হয়ে বসতেই সময় লেগেছে, তারপর চকিতে চারুদির কথা মনে পড়েছে তার। চারুদির সেদিনের সেই প্রগল্ভ কৌতুক। ধীরাপদর ঘুরে বসে দেখতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু নিরুপায়। ড্রাই-ভারের সামনে ছোট আয়নার ওপর চোখ পড়ল, পাইপ মুখে বড় সাহেব গাড়ির কোণে গা এলিয়ে বসে আছেন। লাবণ্যর পরিপুষ্ট কণ্ঠস্বর কান পেতে শোনার মত, ধীরাপদ রোজ শোনে। কিন্তু এখন শোনার মত কিছু বলছে না, টুকরো টুকরো কথা আর সংক্ষিপ্ত জবাব দুই একটা। কিন্তু সেও কি একটু বেশী পরিপুষ্ট লাগছে কানে, একটু বেশী মিষ্টি লাগছে?

ধীরাপদ কাজ-কর্ম দেখছে কেমন?

হঠাৎ বড় সাহেবের লঘু প্রশ্ন। সেই থেকে সামনের দিকে চেয়ে মূর্তির মত বসে আছে দেখেও হতে পারে। প্রশ্ন ওকে নয়, পার্শ্ববর্তিনীকে, তবু এরপর সেই একভাবে বসে থাকা চলে না।

ধীরাপদ বিনয়-নম্র হাসি-হাসি মুখ করে ঘাড় ফেরাল। এ-রকম প্রসঙ্গ পরিবর্তন লাবণ্য সরকারও আশা করেনি, কিন্তু এ ধরনের প্রশ্নের জবাব না দিলেও চলে। ধীরাপদর মুখের ওপর দু চোখ স্থাপন করল একবার, তারপর বড় সাহেবের দিকে চেয়ে হাসল একটু। ওইটুকু থেকে যতটুক বোঝা যায়।

ধীরাপদর ভিতরে ভিতরে আঁচড় পড়ল একটা। হাসির আঁচড়। বড় সাহেব পাঠিয়েছেন বলেই সে যেন তারও অনুগৃহীত শিক্ষানবিশ।

যেখানে আগমন সেটা একটা অফিস-বাড়ি এবং যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার তিনিও একজন পদস্থ ব্যক্তিই হবেন। কোন্ অফিসে এলো বা কার কাছে এলো ধীরাপদর অজ্ঞাত। ভদ্রলোক পরিচিতি বোঝা গেল, সাদর আপ্যায়নে বসতে বললেন সকলকে। হিমাংশু মিত্র নতুন করে পাইপ ধরাতে ধরাতে মৃদু হেসে ভদ্রলোককে সতর্ক করলেন, আমার মেডিক্যাল অফিসার আজ আপনার সঙ্গে ঝগড়া করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

ঝগড়ার ত্রাসে অফিসারটিকে বেশ প্রসন্ন মনে হল ধীরাপদর। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, চকচকে চেহারা। ঝগড়া যে করবে তার দিকে ফিরে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আপনাদের কোনো খবর পাননি বুঝি এখনো?

বেশ, সে খবরও রাখেন না! লাবণ্য সরকারের কণ্ঠস্বরে আহত বিস্ময়, তিন মাস ধরে অপেক্ষা করে করে না এসে পারা গেল না, স্যাম্প্‌ল পাঠিয়েছি তারও দু মাস আগে—এভাবে আর কতকাল বসে থাকব?

ধীরাপদ রমণীমুখের কারুকার্য দেখছে চেয়ে চেয়ে। হিমাংশু মিত্রের নিজের কিছু যেন বক্তব্য নেই, যোগাযোগ ঘটিয়ে খালাস। আলোচনা থেকে এখানে আসার উদ্দেশ্য বোঝা গেছে। কোম্পানীর একটা নতুন ওষুধের সরকারী অনুমোদন মিলছে না, সরকারী পরীক্ষার রিপোর্টও কিছু আসছে না। ভদ্রলোকের মারফৎ ত্বরিত এবং অনুকূল নিষ্পত্তির সুপারিশ। অফিসারটি বিলম্বের কারণ জ্ঞাপন করলেন, ব্লাডপ্রেসারের ওষুধ বাজারে হামেশা এত বেরুচ্ছে যে সতর্ক যাচাইয়ের দরকার, সুতরাং মতামত প্রকাশে দেরি না হয়ে উপায় নেই।

জবাবে লাবণ্য সরকার হাতের ফাইল খুলেছে, মোটা ব্যাগ থেকে কতকগুলি চালু ওষুধের স্যাম্প্‌ল বার করে সেগুলির উপকরণ তালিকার সঙ্গে নিজেদের ওষুধের উপকরণের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখিয়েছে, ফাইল থেকে একে

একে নিজেদের ল্যাবরেটরীর পরীক্ষার আশাতীত সাফল্যের রিপোর্টগুলো দাখিল করেছে। প্রথমে গিনিপিগের ওপর প্রয়োগের ফলাফল, তারপর বেড়ালের ওপর, তারপর বাঁদরের ওপর, সবশেষে মানুষের ওপর।— জেনারাল বিহেভিয়ার প্রেসার কাউণ্ট ড্রাগ এফিক্যাসি বায়লজিকাল অ্যাস-পেক্ট সেরেব্রাম নারিশমেণ্ট ব্লাড-অ্যাসিমিলেশান সেনসারি সেণ্টার মেণ্টাল আরমিস্‌টিস্—

ধীরাপদর কানের পরদায় দুর্বোধ্য শব্দতরঙ্গের ঠাসাঠাসি ভিড়। কিন্তু ধীরাপদ শুনছে না কিছুই, হাঁ করে দেখছে শুধু। ভাবে ভঙ্গীতে কণ্ঠস্বরে বিশ্লেষণের আগ্রহে, বাহুর মৃদু চাঞ্চল্যে, আঙুলের সুতৎপর সংকেতে, লাবণ্য সরকারের ভেষজ-বক্তব্যটুকু এক পশলা দুর্বোধ্য কাব্যের মত লাগল ধীরাপদর। যাঁর কাছে আবেদন, তিনি কে বা কতটা পারেন জানে না, কিন্তু এই সপ্রতিভ মাধুর্যের বন্যায় ধীরাপদ নিজে ঘায়েল হয়েছে। ধীরাপদর হাতে ক্ষমতা থাকলে এই লাবণ্য-দর্শন আর ফলশ্রুতির বিনিময়ে ব্লাডপ্রেসারের ওষুধ ছেড়ে বিষের ওপর অমৃতের পরোয়ানা লিখে দিতেও বাধত না হয়ত।

বড় সাহেবের মুখে হালকা গাম্ভীর্য, নীরবে পাইপ টানছিলেন তিনি। উপসংহারে জানালেন, নিজে তিনি ক্রনিক ব্লাডপ্রেসারের রোগী, নির্দ্বিধায় নিজের ওপর এই ওষুধ যাচাই করেছেন এবং ফল পেয়েছেন।

অফিসার ভদ্রলোকটি আশ্বাস দিলেন, সরকারী বিবেচনার ফলাফল যাতে শিগগীরই বেরোয় সে-রকম আন্তরিক চেষ্টা তিনি করবেন এবার। হিমাংশু মিত্র ধীরাপদকে বললেন ভদ্রলোককে ভাল করে চিনে রাখতে, এই ব্যাপারে অতঃপর যোগাযোগ রক্ষা এবং তাগিদ দিয়ে কাজ আদায় করার দায়িত্ব তার।

বাইরে এসে ইশারায় তিনি একটা চল্‌তি ট্যাক্সি আহ্বান করলেন। ওদের ট্যাক্সিতে যেতে বলে নিজে লাল গাড়ির দিকে এগোলেন। তিনি অন্যত্র যাবেন।

ট্যাক্সি সামনে এসে দাঁড়াতে লাবণ্য উঠে বসল। ধীরাপদর দুই-এক মুহূর্তের দ্বিধা, সামনে ড্রাইভারের সঙ্গে বসবে না পিছনে মহিলার পাশে। নিজে উঠে বসার পর লাবণ্যেরই ডাকা উচিত ছিল তাকে, কিন্তু ডাকবে না জানা কথা। একসঙ্গে এক গাড়িতে গেলেও সঙ্গিনী নয়, পদমর্যাদার সচেতন গাম্ভীর্যে সে নীরব এবং নির্বিকার।

দরজা খুলে ধীরাপদ পাশে বসল।

লাবণ্য সরকার ঘাড় ফিরিয়ে অলস চোখে শুধু তাকালো একবার। তারপর

সামান্য সরে বসল। সামনেই বসবে ভেবেছিল বোধ হয়। নির্দেশ নিয়ে ড্রাইভার গাড়ি ছুটিয়েছে। ধীরাপদর এই কদিনের সংযমের মুখটা আজ আবার আল্‌গা হয়ে গেল কেন জানি। পুরুষকারের নামে সেই অদৃশ্য বিরোধের প্রতিক্রিয়া শুরু হল ভিতরে ভিতরে। আরো একটু সরে বসলে ওর সুবিধে হত, ওধারে জায়গা আছে। এও এক ধরনের অবজ্ঞাই। ধীরাপদ এ-ধারের দরজার সঙ্গে মিশে আছে। খানিক আগে এই মেয়ে সুষমার জাল বিছিয়ে বসেছিল কে বলবে। নারীর তূণে অনেক বাণ, পণ্যের তাগিদে তারই গোটাকতক অকাতরে খরচ করে এসেছে। অমিতাভ ঘোষের বেলায়ও তাই করেছিল বোধ হয়···। চারুদির ইঙ্গিতটা বিরূপতাপ্রসূ প্রেরণার মত কাজ করছে এখন। ওই দুজনের প্রতি তার যেন কর্তব্য আছে কিছু, আর সেই কর্তব্যবোধেই যেন ভিতরটা উস্‌খুস করছে ধীরাপদর।

মাঝামাঝি পথে এসে লাবণ্য সরকার ব্যাগ-সংলগ্ন ফাইলটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মৃদু-গম্ভীর নির্দেশ দিল, এটা আপনার কাছে রাখুন, সাবধানে রাখবেন—সামনের সপ্তাহে এসে একবার তাগিদ দিয়ে যাবেন।

ফাইলটা হাতে নিয়ে ধীরাপদ তক্ষুনি নিজের সম্বন্ধে দ্বিধান্বিত সংশয় জ্ঞাপন করল, আমি কি আপনার মত অমন করে বলতে পারব···

লাবণ্য সরকারের ঠাণ্ডা চোখ দুটো ওর মুখের ওপর এসে থমকালো। নিরীহ পশ্চাৎ-অপসরণের চেষ্টা ধীরাপদর।—মানে, আমার পক্ষে এ-সব টেকনিকাল ব্যাপার আপনার মত করে বোঝানো শক্ত—

আপনাকে কিছু বোঝাতে হবে না, কণ্ঠস্বর ঈষৎ রূঢ়, আপনি শুধু ফাইল নিয়ে গি য় মনে করিয়ে দিয়ে আসবেন, আর কি হল না হল খবর নেবেন।

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, দায়িত্ব লঘুকরণের ফলে প্রায় নিশ্চিন্ত যেন। মনে মনে হাসছিল, কিন্তু আর এক কথা মনে হতেই হাসি উবে গেল। তুষ্টির শুরুতেই পুরুষকার হোঁচট খেল একদফা। পকেটে চার-ছ আনাও আছে কি না সন্দেহ, ট্যাক্সির মিটার উঠবে দেড় টাকা দু টাকা। গাড়ি থেকে নেমে পুরুষের বদলে রমণীর মত সরে দাঁড়াতে হবে। পকেটে টাকা থাকলে পুরুষের মতই ভাড়াটা দিয়ে দিত সে। এ-রকম পরিস্থিতিতে টাকা না থাকার মানসিক বিড়ম্বনা কম নয়। টাকা থাকবে কোথা থেকে, টিউশন ছেড়েছে, নতুন-পুরনো বইয়ের দোকানে দে-বাবু আর অম্বিকা কবিরাজের কাছ থেকেও গা-ঢাকা দিয়ে আছে। সোনাবউদি কুকার কেনার জন্যে যে-কটা টাকা ফেরত দিয়েছিল তাই ভাঙিয়ে চলছে। কিন্তু কলসীর তোলা জল গড়িয়ে খেলে কদিন আর, ধীরাপদর

পুরুষের উত্তরে বিমর্ষ ছায়া পড়ল।

না ভাবলেও চলত। চক্ষুলজ্জা এড়ানোর রাস্তা ওপরঅলাই করে রেখেছিলেন।

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মাঝবয়সী মেদবহুল গোলাকার একটি চকচকে বাবু রমেন হালদারের সঙ্গে আলাপে মগ্ন। ট্যাক্সি থামার শব্দে তিনি ফিরে তাকালেন, তারপর চাঁচা-ছোলা ফরসা মুখখানা হাসির রসে ভিজিয়ে গাড়ির দিকে এগোলেন। কোঁচানো কাঁচি ধুতি, গিলে-পাঞ্জাবির নিচে ধপধপে জালি গেঞ্জি, পায়ে চেক্‌নাই-ছোটানো হলদে নিউকাট্, হাতে সোনার ঘড়ি, সোনার ব্যাণ্ড, বুক থেকে গলা পর্যন্ত মিনেকরা সোনার বোতাম, মাথার চুলে কলপ-ঠকানো সাদার কৌতুক। শৌখিনতার সচল বিজ্ঞাপনটি সামনে এসে দাঁড়ানোর পর ধীরাপদর গাড়ি থেকে নামার কথা মনে পড়ল।

অনেকক্ষণ নাকি? ভদ্রলোকের উদ্দেশে লাবণ্য সরকার। মুখে তারও হাসির আভাস একটু।

এই কিছুক্ষণ, কখন আবার তোমার সময় হবে না হবে, ভাবলাম ধরে নিয়ে যাই—এখনই যাবে তো?

লাবণ্য সরকার ঘড়ি দেখল, আসুন—আবার ছটার মধ্যে ফিরতে হবে।

ভদ্রলোক শশব্যস্তে উঠে গেলেন, ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল, ধীরাপদ বোকার মত দাঁড়িয়েই রইল। ফিরে দেখে রমেন তার দিকে চেয়ে দিব্বি হাসছে। হাসি গিলে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছেন দাদা?

ভদ্রলোক কে?

সর্বেশ্বরবাবু—

ধীরাপদর প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল কার সর্বেশ্বর। সামলে নিল, এমনিতেই ছেলেটার সমস্ত মুখে বাচালতা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। আর প্রশ্ন হল না দেখে রমেন নিজে থেকেই বলল, মিস সরকারের নিকট-আত্মীয়, একেবারে নিজের ভগ্নিপতি—বেশ ভালো সম্পর্ক, না দাদা?

ধীরাপদ দোকানের দিকে পা বাড়াবার উদ্যোগই করল শুধু, এগোলো না। শোনার লোভ ষোল আনা, এই ভগ্নিপতিই তাহলে লাবণ্য সরকারের ডাক্তারি পড়ার খরচ যুগিয়েছেন, আর তার বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছেন। প্রত্যাশা সফল হবে কি না জিজ্ঞাসা করতে ভ্রূ-ভঙ্গি করে চারুদি ওকে নীরেট বলেছিলেন। রমেন হালদার উপচে-ওঠা হাসিটুকুর ওপর চট করে সহানুভূতির প্রলেপ চড়িয়ে জানালো, ভদ্রলোকের একটি ছেলে আর একটি মেয়ের

অসুখ, তখন চিন্তা—বিপ সরকারের সাড়ে চারটের যাবার কথা ছিল, দেরি দেখে উনি ফ্যাক্টরীতে টেলিফোন করেছিলেন, সেখানে না পেয়ে এখানে এসেছেন। সর্বেশ্বরবাবুর প্রশংসাও করল রমেন, খুব অমায়িক ভদ্রলোক, আর ওকে বেশ স্নেহ করেন। অনেকদিনের আলাপ রমেনের সঙ্গে, মাসের মধ্যে দুই-একদিন অন্তর দোকানে আসতে হয় তাঁকে। না এসে করবেন কি, ছেলেমেয়েগুলো বড় ভোগে যে! একটি দুটি তো নয়, পাঁচটা না ছটা—মাসির হাতের ওষুধ না পড়া পর্যন্ত একটাও এমনিতে সেরে উঠবে না। মাসি-অন্ত প্রাণ সব—দুধের শিশুরা মা হারালে যা হয় আর কি। কিন্তু মাসি তো আর সব সময়ে এখানে বসে থাকবে না, যখন অপেক্ষা করতে হয় রমেনের সঙ্গেই ভদ্রলোক গল্পসল্প করেন।

আর একটু দাঁড়ালে ভদ্রলোকের গল্পস্বল্পেরও কিছু নমুনা শোনা যেত হয়ত। কিন্তু ফাজিল ছেলেটার দরদ-মাখানো মুখে দুষ্টুমি টাপুরটুপুর। অসুস্থ ছেলে-মেয়ের বাপের মুখখানা মনে পড়তে ধীরাপদর নিজেরই হাসি পাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি দোকানে ঢুকে অব্যাহতি।

কিন্তু ধীরাপদ সেদিন সত্যিই অবাক হয়েছিল।

অফিস সংক্রান্ত জরুরী কোনো কাজে না আটকালে লাবণ্য সরকারের দোকানের চেম্বারে আসতে ছটার দু-দশ মিনিটের বেশি দেরি হয় না।

সেদিন সাড়ে সাতটা হয়েছিল।

সেই থেকে ধীরাপদ মনে মনে মাসকাবারের প্রতীক্ষায় ছিল। মাসটা শেষ হলে তাকে ফ্যাক্টরীতে টেনে নেবার কথা। মাসকাবারের পরেও দু দিন কাবার। ধীরাপদ ভাবছিল, হিমাংশু মিত্রের সঙ্গে একবার দেখা করে প্রতিশ্রুতিটা তাঁকে মনে করিয়ে দেবে কিনা। কিন্তু ধীরাপদ ভাবলই শুধু, গিয়ে উঠতে পারল না। যাক আর দুটো দিন।

তার আগেই শনিবার উপস্থিত। সকলের মুখেই একটুখানি প্রসন্নতার আমেজ দেখা গেল সেদিন। মাসের প্রথম শনিবারে মেডিক্যাল হোমের কর্মচারীদের মাইনে হয়। আজ সেই শনিবার। দুটো আড়াইটের মধ্যে লাবণ্য সরকার টাকা নিয়ে আসবে—সে-ই মাইনে দিয়ে থাকে।

খবরটা শুনে একমাত্র ধীরাপদই খুশি হল না, উল্টে তাকে বিমর্ষ দেখা গেল একটু। মনে মনে আশা করতে লাগল, তার সম্বন্ধে হিমাংশু মিত্র ভুলে গিয়ে থাকলেই ভালো হয়, তার মাইনেটা না হলেই ভালো হয়। এখানকার সকলের

মাইনে কি-রকম রমেনের মুখে শুনেছে। ভাঙা মাসে তারও সামান্যই প্রাপ্য হবে হয়ত। কিন্তু ধীরাপদর আপত্তি সেই কারণে নয়, তার আপত্তি আর সকলের মত মুখ বুজে ওই সামান্য ক'টি টাকা লাবণ্য সরকারের হাত থেকে নিতে হবে ভেবে। সেটাই অবাঞ্ছিত। নইলে টাকার দরকার খুব, গোটা মাস টাকা না পেলে নতুন-পুরনো বইয়ের দোকানের দে-বাবুর কাছেই গিয়ে হয়ত ধরনা দিতে হবে আবার।

প্রত্যাশিত সময়ে লাবণ্য সরকার এলো। ভিতর দিয়ে চেম্বারে ঢোকার আগে ধীরাপদর দিকে যেন বিশেষ মনোযোগেই তাকালো একবার। সে দৃষ্টি সহানুভূতির কি অনুকম্পার কি আর কিছুর, সঠিক বোঝা গেল না। ধীরাপদ মনে মনে আশান্বিত, হয়ত তার তবিলে ওর মাইনেটা নেই বলেই এ-ভাবে দেখে গেল।

প্রথমে ম্যানেজার ঢুকলেন মাইনে নিতে। তাঁর বেরুতে সময় লাগল একটু। সকলের মাইনে-পত্র ঠিক আছে কিনা দেখছিলেন বোধ হয়। কিন্তু বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে চোখ পড়তে ধীরাপদই ভড়কে গেল। দুই চোখ ভরা নির্বাক বিস্ময় তাঁর। ধীরাপদ ভেবে পায় না, এই দিনে কারো মাইনে না হওয়াটা এমনই অবাক ব্যাপার কিছু নাকি।

একে একে সকলের মাইনে হতে সময় মন্দ লাগল না। সব ব্যাচের সব কর্মচারী হাজির। দারোয়ান বেয়ারা সুইপার পর্যন্ত। কিন্তু শুধু ম্যানেজার নয়, কর্মচারীদেরও অনেকের বিভ্রান্ত দৃষ্টির ঘা এসে পড়ল ধীরাপদর মুখের ওপর। মানুষটাকে যেন আবার নতুন করে দেখছে তারা।

সকলের মিটে যেতে লাবণ্য সরকার নিজেই উঠে এসে সুইংডোর ঠেলে ডাকল, এবারে আপনি আসুন একটু।

এ আবার কি কণ্ঠস্বর! কর্ত্রীর কণ্ঠও নয়, কর্তৃত্বের কণ্ঠও নয়। ধীরাপদ উঠে এলো।

লাবণ্য সরকার নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে তাকে বলল, বসুন—

ধীরাপদ স্বপ্ন দেখছে না দিনে-দুপুরে কল্পনার ডানা মেলে দিয়েছে? নিজে উঠে ডেকে আনা, তার ওপর প্রায় মিষ্টি করে বসতে বলা।

বসল।

লাবণ্য সরকার দুই হাত টেবিলের ওপর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকল একটু, মুখে সঙ্কোচ-তাড়ানো হাসির আভাস।—দেখুন, এখানকার কাণ্ডই আলাদা, আপনি কি পোস্টএ এসেছেন, কি ব্যাপার, কেউ কিছু বলেনি,

আপনিও কিছু বলেননি—আজ পে-অর্ডার-এ দেখলাম⋯মিঃ মিত্রের সঙ্গেও অবশ্য তারপর কথা হয়েছে।

এরই মধ্যে ফাল্গুনের গা-জুড়ানো বাতাস দিয়েছে কোথায়। দূর, এটা শীতকাল। ধীরাপদ অপেক্ষা করছে আর নিজের মুখের ওপর সহজতার রেখা বুনতে চেষ্টা করছে।

সই করার জন্য লাবণ্য সরকার অ্যাকুইট্যান্স রোল বাড়িয়ে দিল তার দিকে। একটা আলাদা শীটএ ধীরাপদর একার নাম। নাম আর পদমর্যাদা। কিন্তু লেখাগুলো যেন চোখের সামনে স্থির হয়ে বসছে না কিছুতে।

রোসো ধীরাপদ চক্রবর্তী রোসো, এত বড কোম্পানীর জেনারাল স্থপার-ভাইজার তুমি, এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে থেকো না—মাসে ছ'শ টাকা মাইনে হিসেবে যোল দিনে তিন শ কুড়ি টাকা প্রাপ্য তোমার, বুকের দাপাদাপি থামাও। এখানে নয়, এই মুহূর্তে নয়, এর সামনে নয়, সব বাইরে—বাইরে গিয়ে বিস্ময়ের ঘূর্ণিতে দিশেহারা হয়ো, হাবুডুবু খেয়ো, সাঁতার দিয়ে সিন্ধু পার হয়ো। এখানে শুধু ওই টাকার অঙ্কের পাশে, ওই রেভিনিউ স্ট্যাম্পটার ওপর বেশ সহজ শান্ত মুখে স্পষ্ট করে একটা নামের স্বাক্ষর বসিয়ে দাও।

কলমটা টেবিলেই ফেলে এসেছে। লাবণ্য নিজেব কলম এগিয়ে দিল, আর টাকার থাম। স্বাক্ষরান্তে কলম আর অ্যাকুইট্যান্স রোল ফেরত নিয়ে লাবণ্য আলাপের সুরে জিজ্ঞাসা করল, এর আগে আপনি কোথায় ছিলেন '

অভিজ্ঞতা অন্যথায় যোগ্যতা প্রসঙ্গে অম্বিকা কবিরাজের আখড়া আর দে-বাবুর নতুন পুরনো বইএর দোকানের নাম করবে? ধীরাপদ সত্যি জবাব দিল, আগে কোথাও ছিলাম না, কাজ-কর্ম বলতে গেলে এই প্রথম—

কিছু না করেও এমন পদমর্যাদা লাভের রহস্যটা লাবণ্য সরকার ওর মুখ থেকেই আবিষ্কার করে নিতে চেষ্টা করল দুই এক মুহূর্ত। কৌতূহল স্বাভাবিক, অন্যদিকের রোজগাব এখন যাই হোক, নিজে সে তিন শ টাকায় এসেছিল—তাও অমিতাভ ঘোষের খাতিরে। এতদিনে সেটা ছ শ টাকায় দাঁড়িয়েছে। মালিকদের বাদ দিলে তার সমান মাইনে আর কারো ছিল না।

এ-রকম পদ-গৌরবে অধিষ্ঠিত হবার মত কোনো প্রতিশ্রুতি আগে তো চোখে পড়েইনি, আজও পড়ল না।—আপনি সোমবার থেকে ফ্যাক্টরীতে আসুন, এখানে মাঝেসাজে সন্ধ্যের দিকে এসে দেখাশুনা করে গেলেই হবে—মিঃ মিত্রই সব বলে দেবেন আপনাকে, সোমবার ফ্যাক্টরীতে আসতে বলেছেন।

ধীরাপদ বাইরে এসে দাঁড়াতে বহুক্ষণের একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস মুক্তি পেয়ে বাঁচল।

দোকানে আর এক মুহূর্তও ভালো লাগছিল না। এমন কি বিকেলে লাবণ্য সরকারের পেসেন্ট দেখার বৈচিত্র্যে মন ডোবানোর আগ্রহও নেই আজ। সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছে। ঘড়িতে সবে চারটে তখন।

বুক-পকেটে টাকার খামটা পকেট ছাড়িয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে। স্পর্শটা জামার ভিতর দিয়ে বুকের চামড়ায় লাগছে। মাসে ছ'শ···ষোল দিনে তিন শ কুড়ি। আশ্চর্য! খুলে দেখবে একবার? একবারও তো দেখল না। থাক, ঠিকই আছে। উদ্‌বেগ গেছে, উত্তেজনা গেছে, সেটুকুই শান্তি। বড় বড় পা ফেলে সেই শান্তিটুকু উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছে। জীবন এক-একটা বৃত্তের মধ্যে আটকে থাকে এক-একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। যত ঘোরো আর যতই মাথা খোঁড়ো—ওরই মধ্যে। ধীরাপদ মাথা না খুঁড়ুক, তাই ঘুরছিল। হঠাৎই বৃত্ত-বদল হয়ে গেল। এই বৃত্তটা বড়ই বোধ হয়।

চারুদির ওখানে যাবে কি না ভাবছে। যাওয়া উচিত, কিন্তু আজ অন্তত যেতে মন সরে না। এই বৃত্ত-বদল সহজ হোক আর একটু, চারুদি মনে মনে ভাবতে পারেন প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই আনন্দে আটখানা হয়ে ছুটে এসেছে। ওর মুখের দিকে চেয়ে আশার দারিদ্র্য আবিষ্কার করবেন হয়ত। সুলতান কুঠির দিকেই পা টানছে, অনেকগুলো দিন একটা মানসিক বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে কেটেছে। সোনাবউদি ঠাট্টা করেছিল, সাত মণ তেল পুড়ছে, রাধা শেষ পর্যন্ত নাচবে কি না। ধীরাপদ হাসছে আপন মনে, এমন নাচ সেও কল্পনা করেনি। নোটভরা খামটা বড় বেশি মাথা উঁচিয়ে আছে মনে হচ্ছে। তুলে নিয়ে দু ভাঁজ করে আবার পকেটে ফেলেই থমকে দাঁড়াল।

মনের তারে ঠিক সময়ে ঠিক সুরটি এভাবে বেজে ওঠে কি করে? এতাদিন তো মনে পড়েনি।

···হাসিমুখে সোনাবউদি রণুর কাণ্ডর কথা গল্প করেছিল একদিন। রণু ষাট টাকা মাইনের কি একটা চাকরিতে ঢুকেছিল একবার। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই সোনাবউদিকে ভালো একখানা গরদের শাড়ি কিনে দেবে ঠিক করেছিল। সোনাবউদির একখানা গরদের শাড়ির শখ ছিল জানত। কিন্তু দশ দিন কাজ করার পরেই অসুখে পড়ে চাকরি শেষ। অসুখ হল চাকরি গেল সেটা কিছু না, শাড়ি কেনা হল না সেই দুঃখে রণু মনমরা। শেষে সোনাবউদির ধমক খেয়ে ঠাণ্ডা, সোনাবউদি বলেছিল, গরদের শাড়ি পরে সেজেগুজে চিতায় উঠবে তাই শাড়িটা এক্ষুনি দরকার।

ধীরাপদ মার্কেটের পথে পা চালিয়ে দিল।

কিন্তু ফেরার পথে আবারও থামতে হল। নিজের চোখ দুটোকেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। না ঠিকই দেখছে। ধীরাপদর দুই চোখে পলক পড়ে না।

ফুটপাথ ঘেঁষে আধুনিক কায়দায় খোলা রেস্তরাঁ একটা। খোলা বলতে ক্যাবিন অথবা পরদার বালাই নেই। অবাঙালী অভিজাত নারী-পুরুষের ভিড় বেশি। বাইরে দরজার দিকের টেবিলে একটি মেয়ে দুটি ছেলে। ট্রাউজারের ওপর শার্ট ঝোলানো ছেলে দুটোকে পাড়ার অনেক রকে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জটলা করতে দেখেছে ধীরাপদ। মেয়েটি রমণী পণ্ডিতের মেয়ে কুমু—বাপের জ্যোতিষী মতে হাতে যার বিদ্যাস্থান বড় শুভ। রমণী পণ্ডিতের চোদ্দ বছরের সেই প্রায়-বোবা ভোঁতা মেয়েটার এরই মধ্যে এতখানি বিদ্যালাভ! অবশ্য চোদ্দ বছর হয়ত সতেরোয় ঠেকেছে এখন, আর ঋতুরাজের বিচারে ও-বয়সটা ফেলনা নয় একটুও। তবু, সোনাবউদির জন্য ঘর খালি করার তাগিদে ধীরাপদ প্রায় মরীয়া হয়ে যে-মেয়েটাকে আকাশ বাতাস মেঘ জল গাছপালা আর মজা-পুকুরের শ্যাওলা-প্রসঙ্গে অকাতরে পাঠদান করেছে, সেই কুমুর এরই মধ্যে এমন উন্নতি চমকপ্রদ। এই দু বছর আড়াই বছর ধীরাপদ কি অন্ধ হয়ে বসে ছিল?

ছেলে দুটোর একজনকে রমণী পণ্ডিতের কোণা-ঘরের বারান্দায়ও এক-আধ দিন দেখেছে মনে পড়ল। এদের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় খুব সম্ভব। ফুটপাথে একটা লোককে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে সে-ই প্রথম তাকিয়েছিল। তারপর চট্ করে মুখ নামিয়ে নিয়ে না দেখার ভান করেছে। পরক্ষণে ওদের ছোট টেবিলে নিঃশব্দ আলোড়ন, দ্বিতীয় ছেলেটারও মুখ নীচু। আর কুমু? আচমকা আলোর ঘায়ে ভীত-ত্রস্ত শশকের যেমন বিড়ম্বনা।

ধীরাপদ এগিয়ে গেল। নিজের স্বভাবটার ওপরেই বিরক্ত। দিলে ওদের আনন্দটুকু পণ্ড করে।...সুলতান কুঠির বাসিন্দাদের চোখে এই কলকাতা অনেক দূর বলে জানত। ভাবছে, প্রকৃতি নিরপেক্ষ কর্মকুশলিনী বটে, ওরা যতই তুচ্ছ করুক আর অবহেলা করুক, তার কাজে খুঁত নেই।

দূর থেকে কদমতলার শূন্য বেঞ্চি দেখে ধীরাপদ মনে মনে খুশি একটু। হাতের বস্তুটি নিয়ে কারো দৃষ্টি-বিশ্লেষণে হোঁচট খেতে খেতে ঘরে পৌঁছুতে হবে না। শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদারের অন্তরঙ্গতায় চিড় খেল নাকি, সন্ধ্যা না হতেই বেঞ্চি ফাঁকা কেন!

উঠোন পেরিয়ে আসার আগেই কচি-গলায় তীক্ষ্ণ আর্তনাদ কানে আসছে

ধীরাপদ হকচকিয়ে গেল। গণুদার ন বছরের মেয়ে উমারাণীর গলা, মেয়েটাকে যেন মেরেই ফেলছে কেউ। ঘরে ঢোকা হল না, পাশের দরজায় এসে দাঁড়াল।

ভিতরের দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত।

মেয়ের এক হাত ধরে গণুদা টানাটানি করে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে আর শুকনো মুখে শাসাচ্ছে, ভালো হবে না—খবরদার—ছাড়ো বলছি! মেয়ের অপর হাতটি সোনাবউদির করায়ত্ত, অন্য হাতের ভাঙা-পাখার ডাঁট মেয়ের হাতে-পায়ে-গায়ে-মাথায় ফটাফট পড়ছে তো পড়ছেই। মেয়েটার সর্বাঙ্গ দাগড়া-দাগড়া হয়ে গেল বোধ হয়। তার চিৎকার আর কাকুতিতে কানে তালা লাগার উপক্রম—আর করব না মাগো, আর কক্ষনো চাইব না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর মেরো না, মরে গেলাম—

স্বামীর শাসানিতে ভ্রূক্ষেপ নেই, অস্ফুট গর্জনে মেয়ে পিটছে সোনাবউদি। আর চাইবি কি করে, যমের বাড়িই তো পাঠাবো তোকে আজ—

হাতের কাগজের বাক্সটা দরজার পাশের ছোট আলমারিটার মাথায় রেখে গায়ের জোরেই ধীরাপদ উমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সোনাবউদির হাত থেকে পাখাটা এক ঝটকায় টেনে নিয়ে দরজা দিয়ে ছুঁড়ে বারান্দায় ফেলে দিল।

সোনাবউদি নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে তাকালো তার দিকে, হাঁপাচ্ছে রীতিমতো। গণুদাও নির্বাক কয়েক মুহূর্ত, তার আহত পুরুষচিত্ত তৃতীয় ব্যক্তির ওপরেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল বুঝি। গম্ভীর মুখে বলে উঠল, এর মধ্যে তোমাকে কে আসতে বলেছে—

আমার বদলে পুলিস আসা উচিত ছিল। ঠাস করে মুখের ওপর কথা ক'টা বলে উমাকে দু হাতে আলতো করে তুলে নিয়ে ধীরাপদ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

মেয়েটার হেঁচকি থামতে আধ ঘণ্টা। অনেক তোয়াজের পর আর অনেক-গুলো লোভনীয় প্রতিশ্রুতির পর উমারাণীর মুখে কথা ফুটল। ধীরাপদ অবাক, এত বড় মারটা কেন খেল তা মেয়েটা এখনো ভালো করে জানে না। দুপুরে মা-বাবাতে কি নিয়ে একটু ঝগড়ার মত হয়েছিল। বিকেল পর্যন্ত সে কি আর কারো মনে থাকে, উমারাণীরও মনে ছিল না। বাবার কাছে রিবন চেয়ে বসেছিল, বাবা ওকে রিবন এনে দেবে কথা দিয়েছিল। সেই রিবন চেয়ে বসতে বাবা ঠাস করে ওর গালে এক চড়—মা তখন উনুনে পাখা দিয়ে বাতাস

করছিল, উঠে এসে সপাসপ ওকে পিটতে আরম্ভ করে দিল। ধীরুকা না এসে গেলে মা যে ওকে আজ মেরেই ফেলত সে-সম্বন্ধে উমারাণীর একটুও সন্দেহ নেই।

রাগটা আসলে কার ওপর ওই মায় দেখেই ধীরাপদ অনুমান করেছে। তবু ক্ষমা করা শক্ত। ছেলেমেয়েগুলোকে একটুও ভালবাসে না সোনাবউদি, ভালবাসলে এত নির্দয় হতে পারত না। কিন্তু গণুদার ওপর আজ আবার এমন চণ্ডাল রাগের হেতু কী!

উমার তাগিদে একটা গল্প শুরু করতে হয়েছিল, দরজার কাছে সোনাবউদিকে দেখে থেমে গেল। তার হাতে ওর বিকেলের আনা সেই প্যাকেটটা। দরজার ওধার থেকে মেয়েকে একবার দেখে নিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল। নরম মুখ করে বলল, একে তো পুলিসের ভয়, তার ওপর আবার এটা ঘরে ফেলে এসেছিলেন—দুই চোখে নীরবে ব্যঙ্গ ছড়ালো একটু, দেখে-টেখে রাখুন, কি থেকে আবার কি ফ্যাসাদে পড়ব কে জানে।

শাড়ি ছাড়া ওতে যে আর কিছু থাকা সম্ভব নয় শৌখিন প্যাকেটের ছাপেই সেটুকু সুস্পষ্ট। শ্লেষ গায়ে না মাখলেও ধীরাপদ অবাক একটু, ও কার জন্যে শাড়ি এনে তার ঘরে ফেলে এসেছে বলে সোনাবউদির ধারণা। অবশ্য তারই জন্য যে তাই বা ভাববে কি করে।

কি ভাবে শাড়িটা এনে হাতে দেবে বা কি বলবে, এই পরিস্থিতিতে পড়ে সেই সমস্যা গেল। খুব সাদাসিধে ভাবে বলল, আমি ওটা ফেলে আসিনি।… আপনি ইচ্ছে করলে ফেলে দিতে পারেন।

সোনাবউদির মুখে পরিবর্তনের রেখা পড়তে লাগল। থতমত খেয়ে গেল কেমন, তারপর নিজের অগোচরেই কাগজের বাক্সর ওপরকার ফিতের বাঁধন খুলে শাড়িটা হাতে তুলে নিল।

বাজারের সব থেকে সেরা গরদের শাড়িই এনেছিল ধীরাপদ।

দু চোখ ভরা নিবিড় বিস্ময় সোনাবউদির। শাড়ি থেকে সেই বিহ্বল দৃষ্টি ধীরাপদর মুখের ওপর ফিরে এলো আবার। ধীরাপদও হঠাৎ স্থান কাল ভুলেছে, কোলের কাছে ছোট মেয়েটা হাঁ করে চেয়ে আছে খেয়াল নেই। বিচারকের শেষ রায় শোনার মত তারও দুই চোখে নিষ্পলক প্রতীক্ষা।

সোনাবউদি দেখছে। দেখছে না, শুধু চেয়ে আছে। চেয়ে চেয়ে কোন্ এক স্মৃতি-দূতের পায়ের শব্দ শুনছে যেন। পরক্ষণে তার সর্বাঙ্গ-জোড়া একটা চকিত শিহরণের আভাস দেখল বুঝি ধীরাপদ—গরদের শাড়ি-ধরা দুই হাতে,

বাহুতে, মুখের রেখায় রেখায়, চোখের পাতায়… ।

কাগজের বাক্স আর গরদের শাড়ি হাতে সোনাবউদি ত্রস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গল্পের মাঝখানে অনেকক্ষণ মুখ বুজে বসেছিল উমারাণী। মা চলে যেতে নিশ্চিন্ত। তাগিদ দিল, ধীরুকা বলো—

গল্পে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টায় ধীরাপদ বার-দুই গলা খাঁকারি দিয়ে নিল।

॥ আট ॥

প্রতিবেশী বলল, তুমি জাহান্নমে যাও।

দোষ তো করিনি, এ কথা কেন ?

প্রতিবেশীর চোখ গরম, তোমার নেই কেন।

আবার এক দিন। প্রতিবেশী বলল, সেলাম সেলাম, অনেক সেলাম।

সেলাম কেন ভাই ?

প্রতিবেশীর চোখ নরম, তোমার যে অনেক আছে—তাই।

এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিবেশীতত্ত্বের এ-দিকটা দেখে ধীরাপদ ফাঁপরে পড়ে গেল। তার জীবনে যেন হঠাৎই জোরালো রকমের সৌভাগ্যের আলো জ্বলে উঠেছে একটা। সেই আলোয় সুলতান কুঠির বাসিন্দাদের চোখে ধাঁধা লেগেছে প্রথম। তারপর নড়েচড়ে সজাগ হয়ে একে একে কাছে এগিয়ে এসেছে তারা। আলো আর তাপের মহিমা।

সুলতান কুঠিতে মাসে ছ'শ টাকা অনেক টাকা।

এই নতুন প্রীতি-বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে মনে মনে ধীরাপদ সোনাবউদিকেই দায়ী করেছে। সৌভাগ্যের কথা ঢাক পিটিয়ে বলে না বেড়ালেও তার কাছ থেকেই খবরটা ছড়িয়েছে।

সোনাবউদি পরদিনই এসেছিল। পরদিন দুপুরে।

অনেকদিন বাদে এই ছুটির দুপুরে ধীরাপদ ঘরেই ছিল। মেডিক্যাল হোম রবিবারেও খোলা, কিন্তু ফ্যাক্টরী বন্ধ। সোমবারে তাকে ফ্যাক্টরীতে হাজিরা দিতে হবে। বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে এলোমেলো পাঁচ কথা ভাবছিল। একটা বড় কাজ সারা হওয়ার শ্রান্তি আর তৃপ্তি।

আধ-ভেজানো দরজা ঠেলে সোনাবউদি উপস্থিত। এক-মুখ পানে টসটসে ঠোঁট, হাতেও পানের খিলি গোটাকতক। সোনাবউদি পান বেশি খায় না,

খায় যখন অমনি একগাদা খায়। দিব্বি প্রসন্ন মূর্তি, যেন রোজই গল্পগুজব করতে এ-ঘরে এসে থাকে।

আসব, না ঘুমুচ্ছেন ?

আসবেও জানে, ঘুমুচ্ছে না তাও জানে। ধীরাপদ আগেই উঠে বসেছিল। জবাব দেওয়ার দরকার হয়নি, অভ্যর্থনায় হাসিটুকু জবাবের থেকে বেশি।

সোনাবউদি ঘুরে দাঁড়িয়ে কদমতলার ফাঁকা উঠোনটা একবার দেখে নিয়ে ঘরের দরজা ছুটো টান করে খুলে দিয়েছে। ওপাশের বন্ধ জানলা ছুটোর দিকে চোখ পড়তে ভুরু কুঁচকে তাও ঠেলে খুলে দিয়ে এসেছে। তারপর হেসে ফেলে কৃতকর্মের কৈফিয়ৎ দিয়েছে, এরপর যার যা খুশি ভাবুক—

সকাল থেকেই সোনাবউদিকে অনেকবার আশা করেছিল ধীরাপদ। সুসময়েই এসেছে। বলল, আপনার এখনো ভাবাভাবির ভয় আছে নাকি ?

থাকবে না কেন ? ছদ্মকোপে চোখ রাঙিয়েছে সোনাবউদি, এরই মধ্যে এমন কি বুড়ী হয়ে গেলাম, জিজ্ঞেস করে আসুন ওই বিটলে গণৎকারকে—

কৌতুকটুকু জিইয়ে রাখার জন্যে ধীরাপদ নিরীহ মুখে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছে।—সে কথা নয়, আমি ভেবেছিলাম সেই এক ব্রত সাঙ্গ করেই একসঙ্গে সকলকে ঘায়েল করে ফেলেছেন।

অসহায় ভ্রূ-ভঙ্গি সোনাবউদির। দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতে বসে পড়েছে। দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলেছে।—যতই করি শিব-সাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না। হাসি চাপার চেষ্টা, খবর বলুন শুনি—

কাল এই সোনাবউদি ও-ভাবে মেয়ে ঠেঙিয়েছে ভাবাও শক্ত। খবর শুনতেই আসবে এবং এসেছে তা যেন জানাই ছিল ধীরাপদর।

খবর তো আপনার···

আমার ? আমার আবার কি ?

আনন্দ করে পান খাচ্ছেন···

ও, আয়েস করে বার ছুই-তিন পান চিবিয়ে মেনেই নিয়েছেন, কাল অমন একখানা ভালো গরদ পেলাম, আনন্দ হল। তাই খেলাম। আপনিও খান ছুটো···

ছুটো পান ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে, বাকি ছুটো নিজের মুখে পুরেছে। পান হস্তগত করে ধীরাপদ বলেছে, আমি কেন, আমার তো আনন্দের কিছু হয়নি।

সোনাবউদির কৌতুকভরা ছুই চোখ মুখের ওপর পড়েছিল খানিক, বাড়তি

পালে নিচের ঠোঁট পিক্ত।—আপনারও হয়েছে, আয়নায় দেখে আসুন।

খবর শুনেছে তারপর। কোথায় চাকরি, কি চাকরি, কেমন চাকরি।—অত বুঝি না, কত মাইনে হল?

টাকা-পয়সার ব্যাপারে সোনাবউদির এ ধরনের সাদা-সাপটা কৌতূহল বা হিসেব-নিকেশ ধীরাপদ বহুদিন দেখে আসছে। এখন আর খারাপ তো লাগেই না বরং ভালো লাগে। খারাপ লাগাতে গিয়ে অনেকবার ঘা খেয়েছে। রণুর অসুখে সেই গোট-হার বিক্রি করা, বা অনটনের সময়েও মাসের বরাদ্দ থেকে ওর দেওয়া বাড়তি টাকা সরিয়ে রেখে কুকার কেনার জন্য একসঙ্গে দেড়-বছরের টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ধীরাপদ জীবনে ভুলবে না। আসক্তি আর নিস্পৃহতার এমন গায়ে গায়ে মিতালি আর দেখেনি।

ছ'শ টাকা! মাসে? সোনাবউদির পান চিবুনো থেমে গিয়েছিল, বিস্ফারিত চোখে সংশয় আর বিস্ময়।—চাল দিচ্ছেন না তো?

ধীরাপদ হেসে ফেলেছিল। সোনাবউদিও। আনন্দ ধরে না।

সোনাবউদির মুখ থেকে গণুদা শুনেছে।

গণুদা বিকেলে এসেছিল। ভদ্রলোক কথাও বেশি বলতে পারে না, উচ্ছ্বাসও তেমন প্রকাশ করতে পারে না। তবু সুখবর শুনে যতটা সম্ভব অন্তরঙ্গ আনন্দ জ্ঞাপন করেছে। আপনজনের ভালো শুনলে কত ভালো লাগে তাও বলেছে। বিনিময়ে ধীরাপদও আপনজনের মতই তারও চাকরির খোঁজখবর করেছে, সাব-এডিটার হওয়ার কতটা কি হল না হল জিজ্ঞাসা করেছে।

একেবারে মরমের কথা গণুদার। আশার উৎসে নাড়া পড়েছে।—হবে হয়ত, হওয়া উচিত, চেষ্টা-চরিত্র চলছে। কিন্তু না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। ধর-পাকড়ের জোর তো নেই বরং উল্টে মন্দ করার লোক আছে। লোকের ভালো কজন দেখতে পারে, সাব-এডিটারদের অনুবাদের বহর তো দেখছে বছরের পর বছর ধরে, গণুদা চেষ্টা করলেও অত ভুল করতে পারবে না। মালিকদের বিচার বিবেচনা থাকলে অনেক আগেই হয়ে যেত। রমণী পণ্ডিত অবশ্য বলেছেন, সময়টা ভালো এখন, একটু-আধটু ভালো নয়—যাতে হাত দেবে তাই সোনা হওয়ার কথা...। অসহিষ্ণু খেদে উদ্দীপনা ম্লান হতেও দেখেছে ধীরাপদ। ঘরে এমন দজ্জাল মেয়েমানুষ থাকলে বরাত ভালো হলেও কত আর হবে—তিন পা এগোলে দু পা পেছন টানবে। নিরুপায় ক্ষোভে গণুদার ফর্সা মুখ লাল।—নিজের চোখেই তো দেখলে কাল, নির্বোধের মত গোঁ ধরে লাভের মুখে ছাই ঢেলে ছাড়ল—করকরে আড়াই শ টাকা লোকসান, তার ওপর শুধুমুদু মেয়েটাকে

ঠেঙিয়ে আধমরা করল, রাগের মাথায় তোমাকেও কি না কি বলে ফেললাম…

রাগের মাথায় ওকে কি বলা হয়েছে না হয়েছে মনেও নেই। কিন্তু চিত্তদাহের কারণ শুনে অবাক। আড়াইশ টাকা লোকসান কেন?

সেটা আর বলেনি বুঝি? বলবে কেন, আর কেউ আড়াই টাকা লোকসান করলে ঢাক পিটিয়ে বলত। ঢোঁক গিলে গণুদা গৃহিণীর হঠকারিতা ফাঁস করে দিয়েছে। তার অফিসের এক ভদ্রলোক নিয়মিত রেস্ খেলে, অনেক সময় অনেক খবর দেয়, গণুদা কানও দেয় না কোনদিন, ঘোড়দৌড়ের মাঠও আজ পর্যন্ত ভালো করে দেখেছে কিনা সন্দেহ। সেদিন সেই ভদ্রলোক অব্যর্থ খবর পেয়ে গেছল একটা, দুয়ে দুয়ে চার কথার মত নির্ভুল খবর—একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের শুধু দিয়েছিল খবরটা। গণুদা তাও কান দিত না হয়ত, কিন্তু রমণী পণ্ডিত বলেছিলেন ধনস্থানে রাহু তুঙ্গী এখন, চন্দ্র-সূর্য গিলে বসাও অসম্ভব নয়। তাই অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে সোনাবউদির কাছ থেকে গণুদা মাত্র পঞ্চাশটি টাকা চেয়েছিল। টাকা দেওয়া দূরে থাক বুকে পা দিয়ে তার ঘরণী কালীর নাচ নেচেছে। ওদিকে সেই ঘোড়া ঠিক প্রথম এসেছে। শুধু প্রথম? টাকার আগুিল মুখে নিয়ে প্রথম—এক টাকায় পাঁচ টাকা, পঞ্চাশ টাকায় আড়াইশ হত।

ফোঁস করে বড় নিঃশ্বাস ফেলেছে গণুদা। সন্তর্পণে ধীরাপদও। যাবার আগে গণুদা ওর আশাতীত খুশির খবরে আবারও আনন্দ-জ্ঞাপন করে গেছে।

গণুদার কাছ থেকে খুশির খবরটা রমণী পণ্ডিত শুনেছেন।

কালো মুখে উদ্দীপনার জলুস বার করে সকালেই হন্তদন্ত হয়ে একেবারে ঘরে এসে হাজির। শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদারের টিপ্পনীর পরোয়া করেন নি, ধীরাপদর ছ'শ টাকার জোরে তাঁরও জোর বেড়ে গেছে।—কি, সকলের আগে কোথায় আমি খবরটা পাব, না আমাকেই ফাঁকি! বলেছিলাম কিনা আপনার অনেক হবে, আমার কথা মিলিয়ে নেবেন একদিন—বলেছিলাম কিনা বলুন?

না বললেও অস্বীকার করা শক্ত, তবে রমণী পণ্ডিত বলেছিলেন ঠিকই। সোনাবউদির ব্রতভঙ্গের নেমন্তন্নে বাদ পড়ার দুঃখের রাতে কদমতলার বেঞ্চিতে বসে আর পাঁচ কথার সঙ্গে এই কথাও বলেছিলেন। বাজার করে দিয়েও ধীরাপদ নেমন্তন্ন এড়িয়েছিল সেই আনন্দে বলেছিলেন। উদ্ভাসিত মুখে আজ জোর করেই ডান হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়েছেন, অর্থাৎ দেখবেনই তিনি হাত। দেখেছেন আর পঞ্চমুখে ভেঙে পড়েছেন। ভাগ্যের সিঁড়িতে সবে পা

পড়ল, এখনো অনেক, অনেক বাকী। একাদশে বৃহস্পতি মশাই, একাদশে বৃহস্পতি। শুধু তাই? শুক্র কড়া, রবি চড়া! শৌর্যে বীর্যে হাত ভরা। উচ্ছ্বাসের তোড়ে ধীরাপদ সরে বসতে চেষ্টা করেছে।

হাত তো সবে আজ দেখলেন তিনি, এই দিন যে আসবে তাঁর জানাই ছিল। হাত না দেখেই তো বলেছিলেন সে-কথা। চলন দেখলেই তিনি বলে দিতে পারেন কার পিছনে লক্ষ্মী ঘুরছে, কপাল দেখেই বলে দিতে পারেন কার কপালে ভাগ্য নাচছে। শেষে ওর ভাগ্য থেকে নিজের দুর্ভাগ্য প্রসঙ্গে এসে স্তিমিত হয়েছেন আর সানুনয়ে একটা আবেদন ব্যক্ত করেছেন। গত এক মাসে নতুন-পুরনো বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবু ধীরাপদর খোঁজে দু-তিন দিন নিজে এই সুলতান কুঠিতে এসেছিলেন, পণ্ডিতের সঙ্গে তখন তাঁর আলাপ হয়েছে। আর একটা ওষুধ কিনতে গিয়ে পাকেচক্রে একটু-আধটু আলাপ পরিচয় হয়েছে কবিরাজী দোকানের অম্বিকা কবিরাজের সঙ্গেও। এখন এই দুজনের কাছে তাঁর হয়ে একটু সুপারিশ করতে হবে, ধীরাপদ যে কাজ করত সে কাজ উনি স্বচ্ছন্দে করতে পারবেন। বিজ্ঞাপন লেখা ছাড়াও দে-বাবুর জন্য ভালো ভালো বইও লিখে দিতে পারবেন তিনি, তাঁর জ্যোতিষীর বইয়ের কদর কম হবে না। ঘরের অচল অবস্থা প্রায়, এটুকু সাহায্য ধীরাপদকে করতেই হবে, এই সুযোগটুকু পেলে হয়ত একদিন ঘরভাড়া নিয়ে জ্যোতিষীর দপ্তরও খুলে বসতে পারবেন তিনি।

মেডিক্যাল হোমের রমেন হালদারের স্বপ্ন ওষুধের দোকান করবে, পণ্ডিতের স্বপ্ন জ্যোতিষীর দোকান। ধীরাপদ রমণী পণ্ডিতকেও সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে হাঁপ ফেলে বেঁচেছে।

সকালে কদমতলায় হুঁকোর আসরে তাঁর কাছ থেকে শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদারও এই ভাগ্যোদয়ের সমাচার শুনবেন জানা কথাই।

সেদিন খুব সকালে ঘুম ভাঙতে ধীরাপদর মনে হয়েছিল কল-পাড়ে শকুনি ভটচাযের উষা-কাশির ঠনঠনে শব্দটা যেন আগের থেকে স্তিমিত। আর অনেক বেশি কষ্টক্লিষ্ট। অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে শেষে ধীরাপদ বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

কদমতলায় বেঞ্চির সামনে হুঁকো হাতে একাদশী শিকদার দাঁড়িয়ে। বসতে পারছিলেন না বলে দাঁড়িয়ে। জানলা বন্ধ দেখে কাগজওয়ালা বন্ধ দরজার গায়ে কাগজ ফেলে গেছে। কাউকে কিছু না বলে শিকদার মশাই দোর-গোড়া থেকে কাগজ নিয়েও যেতে পারছে না, আবার চোখের সামনে কাগজ

পড়ে আছে দেখে শান্তি-মত বসতেও পারছে না। ধীরাপদ বাইরে আসতে সতৃষ্ণ চোখ জোড়া কাগজের ওপর থেকে ওর দিকে ঘুরেছে। উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষার যাতনা।

—বেঁচে থাকো বাবা, দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হোক। বাঁ হাতে হুঁকো, শিরা-বার-করা শীর্ণ ডান হাত বাড়িয়ে ধীরাপদর হাত থেকে কাগজ নিয়েছেন। ব্যগ্র চোখ দুটো কাগজের ওপর থেকে ছিঁড়ে এনে ওর দিকে তুলেছেন—রমণীর মুখে শুনেছি বাবা, বড় আনন্দ হয়েছে শুনে—কার ভিতরে কি আছে এ কি আর বাইরে থেকে বোঝা যায়, কত সময় কত অবহেলাই না করেছি—

আশীর্বচনে নয়, আনন্দ হয়েছে শুনেও নয়, শেষের কথাটায় ধীরাপদ অস্বস্তি বোধ করেছে। বেঞ্চিতে বসেও একাদশী শিকদার কাগজ পড়া একটু স্থগিত রেখেছেন। বলীরেখায় হিজিবিজি মুখখানা ওর দিকে তুলে ধরেছেন, তা তুমি বাবা নিজের গুণেই কারো ত্রুটি ধরো না জানি, এখন তো মস্ত লোক, মস্ত আশা-ভরসা। মুখে হঠাৎই যেন আশা উঁকিঝুঁকি দিয়ে উঠেছিল একটু, আগ্রহে গলার স্বর নেমেছিল।—তুমি তো বাবা নিজেই আর একখানা কাগজ রাখতে পারো এখন, বাংলা কাগজ—পারো না?

কাগজ!

একখানা কাগজ পড়ে ঠিক সুখ হয় না, আরো তো বড় কাগজ আছে—তাছাড়া এক কাগজে সব খবর থাকেও না বোধ হয়। থাকে?

বড় খবর সবই মোটামুটি থাকে। ধীরাপদ না ভেবেই বলেছিল।

তবু সব তো থাকে না, কোন্ খবরটা কার কাছে বড় তার কি ঠিক আছে!

সত্যি কথা। জবাব নেই।

ইত্যবসরে গঙ্গাজলের বাটি হাতে শকুনি ভটচায উপস্থিত। ধীরাপদকে দেখে অবাক হলেও আগে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। উপবীত স্পর্শ করে একখানি শীর্ণ হাত তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে অস্ফুটস্বরে আশীর্বাদ করেছেন। বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত মিশিয়ে আশীর্বাদটুকু দীর্ঘতর করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হাঁপের ঠেলায় আর ফ্যাশফেশে কাশির দমকে পেরে ওঠেননি, কাশতে কাশতে বেঞ্চিতে বসে পড়েছেন।

শিকদার মশাই কাগজে ডুবেছেন। সোনাবউদির মত ধীরাপদও দুজনের পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলবে কিনা ভাবছিল। অতটা পেরে ওঠেনি। ভটচায মশাইয়ের ক্যাশির যাতনা দেখে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল, ভদ্রলোক এরই মধ্যে এত কাহিল হয়েছেন লক্ষ্য করেনি।—আপনার কাশিটা কি আগের থেকে বেড়েছে নাকি?

আর বাবা কাশি! কাশির দমকে আটকে গিয়ে হাত তুলে আকাশ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এবারে গেলেই হয়। চোখে জল এসে গিয়েছিল, সেটা দম-বন্ধ কাশির যাতনায়ও হতে পারে, আবার মাটির টান ঢিলে হয়ে আসছে বলেও হতে পারে। সামলে নিয়ে বিড়বিড় করে খেদ প্রকাশ করেছেন, সব শীতেই মনে হয় হয়ে গেল, এবারে আরো বেশি—একটু-আধটু খাঁটি চ্যবনপ্রাস পেলে হয়ত কমত, অগ্নিমূল্যের বাজারে খেয়ে-পরে প্রাণ বাঁচাতে প্রাণান্ত, ওষুধ জুটবে কোথা থেকে।

পাছে এর পর রমণী পণ্ডিত এসে হাজির হন সেই ভয়ে ধীরাপদ তাড়াতাড়ি সরে এসেছে। এই দুই বৃদ্ধের জন্য মমতা বোধ করেছিল কিনা জানে না। মানুষের এই অসহায় দিকটাও পীড়ার কারণ হতে পারে।

রমণী পণ্ডিতকে এড়ানো সম্ভব হয়নি। তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর দলিলে সই করার মধ্যে তফাত নেই খুব। তাগিদে অতিষ্ঠ হয়ে পরের শনিবারেই ফ্যাক্টরী ফেরত সোজা তাঁকে নিয়ে হাজির হয়েছে দে-বাবুর কাছে আর অম্বিকা কবিরাজের কাছে।

প্রথম দর্শনে জ্বলে উঠতে গিয়েও জ্বলে উঠতে পারেননি নতুন-পুরনো বইএর দোকানের দে-বাবু। গোল গোল চোখ দুটো ধীরাপদর পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিচরণ করেছে একদফা।—দিন বদলেছে মনে হচ্ছে যেন মশায়ের!

দিন কতটা বদলেছে তা রমণী পণ্ডিতই বলে দিয়েছেন। সেই বলার ঝোঁকে মাসে ছ'শ টাকা আটশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। দিন আরো কত বদলাবে তারও একটা নিশ্চিত ছবি এঁকে দিয়েছেন তিনি দে-বাবুর চোখের সামনে—দু-চার হাজার টাকা হামেশাই ডান-পকেট বাঁ-পকেট হবে। এই দিন বদলের শুভ-যোগগুলি যে অনেক আগেই তিনি ছকে দিয়েছিলেন সে কথাও জানাতে ভোলেননি।

রমণী পণ্ডিতের উদ্দেশ্য সফল। তাঁর অভ্রান্ত গণনার ফল চোখের সামনে দেখেও দে-বাবু অবিশ্বাস করেন কি করে। ধীরাপদ না হয়ে আর কেউ হলেও কথা ছিল। টাকার জোরে আর কাজের তাগিদে যতই চোখ রাঙান, তলায় তলায় শ্রদ্ধাও করতেন একটু। ভালো কাজ করতে, বিনিময়ে ঠকালেও বুঝে-শুনেই ঠকত—এক-এক সময় মনে হত সে-ই যেন উল্টে অনুকম্পা দেখিয়ে গেল তাঁকে। অমন মাথাওয়ালা নির্বিকার কাজের লোক দে-বাবু বেশি দেখেননি। প্রস্তাব মাত্রে কাজ হল। রমণী পণ্ডিতকে কাজ দেবেন তিনি, আর, ভূত-ভবিষ্যৎ চোখের সামনে নাচে এমন একখানা সহজ-সরল জ্যোতিষীর বই লিখতে পারলে

ছাপতেও আপত্তি নেই তাঁর। কিন্তু পুরনো বন্ধুকে একেবারে ভোলা চলবে না ধীরাপদর, দরকার হলে একটু-আধটু সাহায্য করতে হবে।

দে-বাবু এখন আর মনিব নন, বন্ধু। হাসি চেপে ধীরাপদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

অম্বিকা কবিরাজের দোকানেও সেই একই প্রহসন, একই উপসংহার। ধীরাপদ দেখিয়ে শুনিয়ে দিলে রমণী পণ্ডিতকে কাজ দিতে আপত্তি নেই তাঁরও। সেখান থেকে বেরুবার আগে কি ভেবে ধীরাপদ চ্যবনপ্রাশ কিনেছে এক কৌটো। নিজের দরকার শুনে অম্বিকা কবিরাজ ভিতর থেকে খাঁটি জিনিস বার করে দিয়েছেন নাকি, আর লাভ ছেড়ে দাম নিয়েছেন।

ফিরতি পথে বাসের ভিড়ে রমণী পণ্ডিত উচ্ছ্বাস প্রকাশের সুযোগ পাননি। বাস থেকে নেমে তাঁর খুশির অবতরণিকার মুখেই ধীরাপদ চ্যবনপ্রাসের কৌটোটা এগিয়ে দিয়েছে।—ভটচায মশাইকে দিয়ে দেবেন, ভদ্রলোক বড় কষ্ট পাচ্ছেন। কিনেছি বলবেন না।

রাতের অন্ধকারেও পণ্ডিতের বিস্ময় উপলব্ধি করা গেছে। উচ্ছ্বাস এবার অন্য খাতে গড়াতে দেখে ধীরাপদ বাধা দিয়েছে, বিজ্ঞাপন লিখতে হলে একটা ডিকশনারি যোগাড় করে ভালো ভালো বিশেষণ মুখস্থ করুন—

রমণী পণ্ডিত হেসেছেন, জ্যোতিষীর ডিকশনারি হাতড়ে অলঙ্কার খুঁজতে হয় না মশাই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তা বলে আপনার সম্বন্ধে যা বলেছি একটুও বাড়ানো নয়, ও নিশ্চিত ফলবে দেখবেন।

আর গণুদার সম্বন্ধে যা বলেছেন ?

বেখাপ্পা প্রশ্ন শুনে রমণী পণ্ডিত থতমত খেয়ে গেছেন। কোন্ জবাবে তুষ্ট হবে গলার স্বরে স্পষ্ট নয় তেমন। বললেন, তাঁরও ভালই, তবে এক-একজনের ভালো এক-একরকম। আপনার ভালোর সঙ্গে তাঁর ভালোর তুলনা হবে কেমন করে ? তাঁর স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী তাঁরও ভালো, বেশ ভালো—

ওই ভালোটা আর একটু কম ফাঁপালে ভালো হয়, ভদ্রলোক বিগড়ে যেতে পারেন।

ভদ্রলোক বিগড়োন আর না বিগড়োন, পণ্ডিত একটু বিগড়েছেন। পায়ে-চলা পথ ধরে মজাপুকুরের কাছাকাছি পর্যন্ত গুম হয়ে থেকে বলেছেন, শুধু ভালোর খবরটাই বুঝি আপনাকে সাতখানা করে শুনিয়েছেন উনি, খারাপও তো কম বলিনি, সে-কথা বলেছেন ?

ধীরাপদর প্রথম মনে হয়েছে খারাপের ইঙ্গিতটা সোনাবউদিকে নিয়ে।...

কিন্তু সম্ভব নয়। ওরই কাছে সে-রকম ইঙ্গিত করবেন রমণী পণ্ডিত অতটা নির্বোধ নন। সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে ধীরাপদ খুব শান্তমুখে আবার বলেছে, অন্যের খারাপ-ভালোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের দিকটাও একটু দেখা দরকার বোধ হয়… আপনার মেয়ে এখনো ছেলেমানুষ একেবারে, একটু নজর রাখবেন।

রমণী পণ্ডিত দাঁড়িয়ে গেছেন। সুলতান কুঠির অন্ধকার আঙিনায় কালো মুখের থমকানি ভালো করে দেখা না গেলেও অনুমান করা গেছে। আর একটি কথাও বলেননি, একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেননি। ফলে ধীরাপদর ধারণা, ভদ্রলোক সব জেনেই চোখ বুজে ছিলেন আর চোখ বুজে আছেন। মেয়ের চালচলন যে আরো কারো চোখে পড়েছে, চুপ করে থেকে সেই ধাক্কাই সামলেছেন শুধু।

নিজের ঘরে ঢুকে ধীরাপদর মনে হয়েছে, না বললেই হত। রেস্তরাঁয় যাদের সঙ্গে দেখেছিল মেয়েকে তাদের একজন তো আত্মীয়ই বটে। ছেলেমানুষদের নির্দোষ আনন্দ নিজের চোখের দোষে হলদে দেখেছে কিনা কে জানে। মন বলছে তা নয়, তবু সঙ্কোচ।

অফিসের জন্যে তৈরি হয়ে বেশ সকাল সকালই বেরুতে হয় রোজ। হোটেলের 'কিউ'তে আটকালে খাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি। কিন্তু পরদিন বেরুবার মুখে বাধা, রমণী পণ্ডিতের দশ বছরের ছেলেটা হন্তদন্ত হয়ে এসে শেখানো বুলির মত বলে গেল, বাবা আপনাকে দয়া করে এক্ষুনি একবারটি আমাদের ঘরে আসতে বলেছেন—

পায়ে পায়ে কোণা-ঘরের প্রথম ঘরটিতে ঢুকেই ধীরাপদ হতভম্ব। দরজার কাছে পাথরের মূর্তির মত রমণী পণ্ডিত দাঁড়িয়ে, অদূরের জানলায় মুখ গুঁজে কুমু কান্নায় ভেঙে পড়েছে, পাশের ঘরের দরজার নিচ দিয়ে রমণী পণ্ডিতের রমণীটির পা দেখা যাচ্ছে।

ধীরাপদ নির্বাক।

এই, এদিকে আয়!

বাপের কঠোর আদেশে মুখে আঁচল গুঁজে মেয়েটাকে জানলা থেকে সরে আসতে হয়েছে। শাসন আর নির্যাতন যতটা হবার হয়ে গেছে এক নজরেই স্পষ্ট।

ধীরাপদর হুঁশ ছিল না যেন। তারই দুই পায়ের ওপর মুখ গুঁজে মেয়েটা ফুলে ফুলে কাঁদছে। রমণী পণ্ডিতের দুই চোখে শাসনের তৃপ্তি এবং প্রতীক্ষা। যেন ধীরাপদর কাছেই মেয়ের সমস্ত অপরাধ, সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত ক্ষমা নেই।

হাত বাড়িয়ে ধীরাপদ কুমুকে তুলতে চেষ্টা করেছে, মেয়েটা ওর পা দুটো

আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে।

ওঠো—।

কণ্ঠস্বরে কাজ হয়েছে। কুমু উঠেছে।

যাও, ভিতরে যাও।

এই আদেশ পালন না করে পারেনি। চলে গেছে।

রাগে বিতৃষ্ণায় আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে ধীরাপদ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। হনহনিয়ে সুলতান কুঠিও পেরিয়ে এসেছে। হোটেলের পথে না গিয়ে ফ্যাক্টরীর বাস ধরেছে। সারা পথ অনুশোচনা আর অস্বস্তি। মেয়েটার ওই অত কান্নার ফাঁকে ফাঁকেও যা চোখে পড়েছিল সেটা কী? কুমু কাঁদছিল, কিন্তু আর কিছু যেন ব্যঙ্গ করছিল ওকে।

নীতির মুঠোয় যৌবন ধরে কোনদিন?

১

সুলতান কুঠির বাইরে ছ'শ টাকা মাইনেটা বড় ব্যাপার নয়, মর্যাদার দিকটাই বড়। সব শুনে চারুদি সাদাসিধে মন্তব্য করেছেন, মাইনে আরো কিছু বেশি হবে ভেবেছিলেন তিনি, কিন্তু মাইনের জন্যে ভাবনা নেই, মাইনে অনেক বাড়বে; দায়িত্বটাই আসল, সেটা যেন ও ভালোমত দেখে-শুনে বুঝে নিয়ে চলতে পারে।

ধীরাপদ অবাক হয়েছিল, চারুদির স্বার্থের উৎসটা আজও ঠিকমত ধরা গেল না।

মর্যাদার আসন লাভ করা আর সেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে কিছু তফাত আছে। সেই তফাতটুকু ঘোচানো তেমন সহজ হচ্ছিল না ধীরাপদর। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে অফিস করবে না আর পাঁচজনের মত কোট-প্যান্ট চড়াবে, সেই এক সমস্যা ছিল। এ নিয়ে কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। শেষে ধুতি-পাঞ্জাবিই বহাল রেখেছে। মুখে কেউ কিছু না বললেও গোড়ায় গোড়ায় সেটা লক্ষণীয় হয়েছে। অবশ্য এই ধুতি-পাঞ্জাবি আগের ধুতি-পাঞ্জাবি নয়। সোনাবউদি মুখ টিপে ঠাট্টাও করেছিল, বয়সে মাজলে চেহারাখানা খুব মন্দ নয় তো দেখি…।

ছোট সাহেবের ঘরের পাশেই আলাদা ছোট ঘর তার। ঘরের ভিতরে হাল-ফ্যাশানের অফিসি-সরঞ্জাম, বাইরে নেম-প্লেট, দোরগোড়ার টুলে সাদা কোর্তার ওপর কোম্পানীর লাল ছাপ-মারা বেয়ারা।

প্রথম দিন স্বয়ং বড় সাহেব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন তাকে। বলা বাহুল্য

ধীরাপদ শুধু শুনেছে, বোঝেনি। ছোট সাহেবের নির্দেশমতই কাজ করতে হবে তাকে। সাধারণ প্রচার-চাকচিক্য বাড়ানো, বিজ্ঞাপন দেখা, খবরের কাগজ, সরকারী দপ্তর আর ড্রাগ-হাউসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, কর্মচারীদের ছুটি-ছাটা নিয়ম-শৃঙ্খলার দায়িত্ব নেওয়া, সময়মত মেডিক্যাল হোমের বিধি-ব্যবস্থা তদারক করা—এক কথায় ছোট সাহেবের পরেই কোম্পানীর যাবতীয় তত্ত্বাবধানের ভার তার।

ভারটা ধীরাপদর বুকের ওপর অনেকদিন পর্যন্ত গুরুভারের মত চেপে বসেছিল।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের কর্ণধার সিতাংশু মিত্র, প্রোডাকশানের অমিতাভ ঘোষ। কেউ কারো থেকে কম নয়। তবু মাইনে বা প্রাধান্য বিচার করতে গেলে ফ্যাক্টরীর প্রধান ব্যক্তি অমিতাভ ঘোষ। তার মাইনে চোদ্দ শ টাকা, দাপট ফ্যাক্টরী জোড়া। সেই দাপটের কাছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশান আর প্রোডাকশানের সীমারেখা অবলুপ্ত। ফলে চীফ কেমিস্টের মেজাজের আওতায় কোনো কর্মচারীই নিরাপদ বোধ করে না খুব। ধীরাপদ এই একজনের অধীনে কাজ পেলে সব থেকে খুশি হত, নিশ্চিন্ত হত।

কিন্তু কাজের দিক থেকে তার সঙ্গে সামান্যতম যোগের সম্ভাবনাও দেখল না।

অর্গ্যানিজেশান চীফের সচেতন গাম্ভীর্যে সিতাংশু মিত্র তাকে সঙ্গে করে সমস্ত বিভাগগুলো ঘুরে দেখিয়েছে, অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তারপর একে একে ফাইল চিনিয়েছে। প্রচারের ফাইল, বিজ্ঞাপনের ফাইল, খবরের কাগজের মন্তব্য সংগ্রহের ফাইল, সরকারী দপ্তর আর ড্রাগ হাউসের ফাইল, কর্মচারীদের ফাইল, মেডিক্যাল হোমের ফাইল। এত দ্রুততালে যে ধীরাপদর চোখের সামনে সবই ঘষা-মোছা। কিন্তু ছোট সাহেবের ধারণা, সুপারভাইজারকে সব শেখানো হয়ে গেছে। সরাসরি কাজ চালান করেছে তারপর। এটা করুন, ওটা দেখুন, সেখানে যান, এই ঝামেলা মেটান, ওই রিপোর্ট দিন—

ধীরাপদর হিমসিম অবস্থা। এক ঘণ্টার কাজ তিন ঘণ্টায় হয়ে ওঠে না, এক ব্যাপার তিনবার করে জিজ্ঞাসা করে আসতে হয়। ছোট সাহেব অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু গোপনও থাকে না খুব। নিজে ব্যস্ত থাকলে লাবণ্য সরকারকে দেখিয়ে দেয়, ওর কাছে যান, বুঝিয়ে দেবেন—

সে ঘরে না থাকলে লাবণ্য নিজেই ডাকে, কি আটকালো আবার, আসুন

বলে দিচ্ছি—

বলে দেয়, বুঝিয়েও দেয়। আর ধীরাপদর মনে হয় তলায় তলায় হাসেও। সে নিজে কোনো কাজের ফাইফরমাশ করে না, ঘরে ডেকেও পাঠায় না। তেমন দরকার পড়লে নিজেই উঠে আসে, আলোচনার ছলে বক্তব্য জানিয়ে যায়। তবু ধীরাপদর মনে মনে ধারণা, এখানকার যত সব নীরস ঝামেলার কাজগুলো ছোট সাহেবের নির্দেশে ওর ঘাড়ে এসে চাপলেও তার পিছনে এই রমণীটির হাত আছে।

ধারণাটা একেবারে অহেতুক নয়। মেডিক্যাল হোমের রমেন হালদারের মুখে লাবণ্য সরকারের কর্তৃত্বের কথা শোনা ছিল। এখানে এই কয়েক সপ্তাহের অভিজ্ঞতায় মহিলাটির পরোক্ষ কর্তৃত্ব-প্রসঙ্গে কর্মচারীদের এক-ধরনের বিদ্রূপাত্মক হাব-ভাব লক্ষ্য করেছে। পুরুষ রূপরসিক বলেই হয়ত জীবিকার স্থূল-বাস্তবে নারীর প্রভাব তেমন প্রীতির চোখে দেখে না।

—ছোট সাহেবের সঙ্গে কথা বলার আগে আপনি স্যর মিস সরকারকে একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়, তিনি রাজী হলে আটকাবে না!

বিনা নোটিসে দিনকতক কামাই করার ঝামেলায় পড়ে আবেদন জানাতে এসে একজন কর্মচারী নবাগত মুরুব্বীটিকে সাহায্যের রাস্তাও দেখিয়ে দিয়েছিল। ধীরাপদ বলেছিল, ছোট সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করবে। জবাবে ওই উক্তি।

নতুন বয়লার চালানো নিয়ে অমিতাভ ঘোষের সেই টিপ্পনীও ধীরাপদ ভোলেনি।—তুমি বললে এখানে সব হবে, এভরিথিং ইজ্ পসিব্‌ল্!

কিন্তু বাহ্যত তার প্রতি লাবণ্য সরকারের ব্যবহারে কর্তৃত্বের সামান্য আভাসও দেখা যায়নি এ পর্যন্ত। বরং নিস্পৃহ গোছের প্রীতিভাবই লক্ষ্য করেছে একটু। ধীরাপদর বিশ্বাস, সেটা শুধু এই অপ্রত্যাশিত উঁচু আসনে তাকে এনে বসানো হয়েছে বলেই নয়। আরো একটা সূক্ষ্ম কারণ আছে। গত তিন সপ্তাহের মধ্যে চারুদি বারতিনেক টেলিফোনে ডেকেছেন। ধীরাপদর টেবিলে টেলিফোন আসেনি তখনো। শিগগীরই আসবে শুনছে। এ ঘরে দুজনের টেবিলে দুটো টেলিফোন। ডাকটা প্রত্যেকবার লাবণ্যর টেবিল থেকেই এসেছে। বাইরের কল্ এলে ফ্যাক্টরীর অপারেটারই হয়ত ছোট সাহেবকে বিরক্ত না করে এই টেবিলে কানেক্‌শান দিয়ে দেয়। চারুদির টেলিফোনের ফলেই ধীরাপদর সুপারিশের জোরটা লাবণ্য সরকার আঁচ করতে পেরেছিল বোধ হয়। অন্তত সেই রকমই মনে হয় ধীরাপদর।

তাছাড়া মেজাজপত্র ভালো থাকলে যখন তখন নিজের টেবিল থেকে

টেলিফোন করে অমিতাভ ঘোষও। কখনো বলে, স্ত্রী থাকলে চলে আসুন, কখনো বা টেলিফোনেই গল্প জুড়ে দেয়। ধীরাপদর ঘরেও এসে বসে মাঝে-মধ্যে। ধীরাপদর টেবিলে তার প্রিয় সিগারেট মজুত থাকে এক টিন, সেই লোভেও আসে। লাবণ্যর চোখে পদমর্যাদার সঙ্গে এই মর্যাদাটুকুও যোগ হয়েছে। মুখ ফুটে একদিন জিজ্ঞাসাও করে ফেলেছিল, মিস্টার ঘোষের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় কত কালের! ছ মাসেরও নয় শুনে মনে মনে অবাক হয়েছে।

তাকে নিয়েও যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চলে টেলিফোনে, টের পায় কিনা কে জানে। এরই মধ্যে একদিন টেলিফোন ধরে নাজেহাল অবস্থা ধীরাপদর। ওদিক থেকে চীফ কেমিস্টের হাল্‌কা প্রশ্ন, আপনার সামনে যে মহিলাটি বসে তার মুখখানা ভার-ভার কিনা দেখুন তো—

লাবণ্য সরকার মাথা নিচু করে লিখছিল কিছু, ধীরাপদ একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জবাব দিল, ঠিক বুঝছি না। কেন?

গলাটা ভার-ভার লাগল, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন। লঘু তাগিদ।

...দেখা শক্ত। না তাকিয়েও ধীরাপদ টের পেল, কলম রেখে লাবণ্য সরকার মুখ তুলেছে।

এদিকের লোকটা বিব্রত বোধ করছে অনুমান করেই যেন অমিতাভ ঘোষের ভারী আনন্দ।—শক্ত আবার কি! কি রঙের শাড়ি পরেছে, সাদা না রঙিন?

টেলিফোন রাখতে পারলে বাঁচে ধীরাপদ।—গিয়ে বলছি। কি কথা আছে বলুন।

কি-চ্ছু কথা নেই, বেজায় ফূর্তি, আপনি মশাই কোনো কাজের নন, দিন ওকেই দিন দেখি—

ধীরাপদ প্রমাদ গুনেছে। আপনা থেকেই সম্মুখবর্তিনীর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেছে একবার। লাবণ্য সরকার তার দিকেই চেয়ে ছিল।

—এখন নয়, পরে করবেন। ওদিকের হাসির ওপরেই ঝপ করে টেলিফোন নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে এসেছে, ভরসা করে সামনের দিকে তাকাতেও পারেনি আর। লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখে হাসবে না রাগ করবে ভেবে পায়নি।

চারুদির সুপারিশ আর অমিতাভ ঘোষের হৃদ্যতার জোর যত বড়ই হোক, কাজ পাবার পর ধীরাপদ কাজের জোরের ওপরেই নির্ভর করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনভ্যস্ত মনটাকে দিবারাত্র ফাইলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেও সেই জোরটা তেমন পেয়ে উঠছিল না। যার ইঙ্গিতেই কাজ আসুক, ধীরাপদ মন দিয়ে বুঝতে

চেষ্টা করেছে, মন দিয়ে করতে চেষ্টা করেছে। এখানে আসার পর একবার মেডিক্যাল হোমে হাজিরা দেবারও ফুরসৎ মেলেনি।

কিন্তু এত করেও ধীরাপদর নিজেরই এক-এক সময় মনে হত, সোনার দাঁড়ে কাক বসানো হয়েছে। মাসে ছ শ টাকা মাইনে নেবার মত এখানে কি তার করার আছে বা কি সে করতে পারে, নিজে থেকে ঠাওর পেয়ে উঠত না।

এই অস্বস্তিটা দিনে দিনে বাড়ছিল।

কোম্পানির কাজে না হোক, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিমাংশু মিত্রের ব্যক্তিগত কাজে কিছুটা যোগ্যতা দেখাবার সুযোগ ঘটল একদিন।

বড় সাহেবের তলবে সেদিন সকালে তাঁর বাড়ি আসতে হয়েছিল। সামনে কোম্পানীর ছোট স্টেশন-ওয়াগন দাঁড়িয়ে। ফলে যাকে আশা করেছিল ভিতরে ঢুকে তাকেও দেখল। অন্দরমহলের দিকের সেই বসার ঘরের গদি-আঁটা বিশ্রাম-শয্যায় হিমাংশু মিত্র অর্ধশয়ান। বাহুতে ফেটি বেঁধে কানে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে লাবণ্য সরকার গম্ভীর মুখে তাঁর ব্লাডপ্রেসার দেখছে।

হিমাংশুবাবু ইশারায় বসতে বললেন। লাবণ্যর দু চোখ যন্ত্রের দাগগুলোর ওপর। পাশেই একটা চেয়ারে ঝুঁকে বসে আছে, পাম্প করে পারা তুলছে ছেড়ে দিচ্ছে।

ধীরাপদ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল কেমন। এই বাড়ির এই ঘরে এক প্রবল পুরুষের এত কাছে ওইভাবে ঝুঁকে বসাটুকুর মধ্যে, এমন কি রক্ত-চাপ পরীক্ষার ওই নিবিষ্টতার মধ্যেও কিছু যেন আছে, যা দেখলে দু চোখে তাপ লাগে। হৃৎপিণ্ড অশান্ত হয়। স্নায়ুতে স্নায়ুতে কানাকানি হতে থাকে।

পরীক্ষা করলে এই মুহূর্তে ধীরাপদরও রক্ত-চাপ খুব কম হত না হয়ত।

প্রেসার দেখা শেষ করে লাবণ্য ওর দিকে একবার তাকালো শুধু। চেনে কি চেনে না। হিমাংশুবাবু উঠে বসে জামার গোটানো হাতাটা টেনে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কত?

লাবণ্য ধীরেসুস্থে যন্ত্র গোটাচ্ছে, সামান্য হেসে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ ঠিক আছে। ব্লাডপ্রেসার নিয়ে মেডিক্যাল হোমের পেসেন্টদের সঙ্গে তার অনেক হাল্‌কা মন্তব্য শুনেছে ধীরাপদ। যেখানে যেমন দরকার।

হিমাংশুবাবু ধীরাপদর দিকে চেয়ে হাসলেন।—ও আবার আমাকে প্রেসার সব সময় বলে না, বললেও কমিয়ে বলে হয়ত, যদি নার্ভাস হয়ে পড়ি!

ভিতর থেকে সহজ হওয়ার তাগিদ, ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, আপনার শরীর অসুস্থ নাকি?

ঝুঁকে সামনের সেন্টার টেবিল থেকে পাইপটা হাতে নিলেন হিমাংশুবাবু। বললেন, অসুস্থ হতে কতক্ষণ, পাছে অসুস্থ হয়ে পড়ি সেই ভয়ে সপ্তাহে তিন দিন প্রেসার চেক করা ওরা দরকার মনে করে। মৃদু হেসে লাবণ্যর ডাক্তারি গাম্ভীর্যটুকু লক্ষ্য করলেন। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন।—যে জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম, তোমার লেখা-টেখায় বেশ হাত আছে শুনলাম?

ধীরাপদ অবাক। বাড়িতে ডেকে পাঠানোর ফলে অনেক এলোমেলো সম্ভাবনার কথা ভেবেছে, এ প্রশ্ন কল্পনা করেনি।

যাই শুনে থাকুন, চারুদির কাছ থেকে শুনেছেন। হিমাংশুবাবুর পরের কথা থেকে তাঁর বক্তব্য বোঝা গেল। ইংরেজি বাংলা দুটো খবরের কাগজ শিল্প-বাণিজ্যের ওপর বিশেষ সংখ্যা বার করছে, এ দেশের ভেষজ-শিল্প প্রসঙ্গে লেখার জন্য তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এসেছে। সামনের টেবিলের টাইপ-করা কাগজ কটা এগিয়ে দিলেন তার দিকে—রচনার জন্য এই তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন, আরো কিছু তথ্য লাবণ্য এবং সিতাংশু তাকে দেবে। সব নিয়ে বেশ ভেবেচিন্তে লিখতে হবে কিছু, বাংলাটা লেখা হয়ে গেলে ইংরেজি কাগজের জন্য কাউকে দিয়ে সেটা অনুবাদ করিয়ে নিলেই হবে।

আলোচনা শেষ। লাবণ্যকে নির্দেশ দিলেন, তাকে নার্সিং হোমে ছেড়ে ড্রাইভার যেন ধীরাপদকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

দোতলার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কেয়ার-টেক বাবু বিনয়-নম্র বদনে নিজের চকচকে টাক-মাথায় হাত বোলাচ্ছিল। চকিত তৎপরতায় এগিয়ে এসে লাবণ্যর উদ্দেশে নিবেদন করল, অফিসঘরে ছোট সাহেব একবার দেখা করে যেতে বলেছেন।

লাবণ্যর মুখ দেখে মনে হল, ছোট সাহেব বাড়ি আছে তাই জানত না। কিছু একটা জিজ্ঞাসা করার মুখেও থেমে গেল।

আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন, আমি আসছি—। ওদিকের হলঘরে ঢুকে গেল।

নিচে সিঁড়ির ওধারে সবিনয়ে মানকে দাঁড়িয়ে। আসার সময় আধখানা ঝুঁকে ভক্তি জ্ঞাপন করেছিল, এখনও তাই করল। এই কদিনের আনাগোনায় তাকে বড় সাহেবের সুনজরের লোক ঠাউরেছে, তাই ভক্তিশ্রদ্ধাও বেড়ে গেছে। ফিস্‌ফিস্ করে আরজি পেশ করল, কারখানায় চাপরাসীর কাজের কথাটা একটু বলে-কয়ে দেবেন বাবু। সেই যে পেথম দিন আপনার সঙ্গে কথা হল—

মনে আছে। কিন্তু বলে-কয়ে দেওয়াটা সম্ভব কিনা সেটা মানকেকে বলা না

বলা সমান।

বাঁধানো উঠোনে কোম্পানীর স্টেশান ওয়াগনের পাশে হিমাংশুবাবুর লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে। বেরুবেন হয়ত। ধীরাপদ বাইরেই চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। সপ্তাহে তিন দিন লাবণ্যর এখানে ব্লাড-প্রেসার চেক করতে আসার খবরটা জানত না।…চারুদি জানে ?

মনের ওপর এই অশোভন আঁচড়টাই ফেলতে চায়নি। আপনি পড়ল। বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকালো, চারুদির চর নয় ও, হবেও না কোনকালে। ধীরাপদ সুস্থ বোধ করল অনেকটা, নিজের বশে এলো। দশ মিনিট অপেক্ষা করেছে, দু ঘণ্টা অপেক্ষা করতেও আপত্তি নেই।

লাবণ্য সরকার নয়, হিমাংশু মিত্র বেরিয়ে এলেন।

ড্রাইভার অভ্যস্ত তৎপরতায় লাল গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল।

তোমরা যাওনি এখনো ? লাবণ্য কোথায় ?

সিতাংশুবাবু ডেকেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইছেন…

ঈষৎ বিস্ময়ে হিমাংশুবাবু বাড়িটার দিকে ঘুরে তাকালেন একবার, ছেলে বাড়িতেই আছে তিনিও জানতেন না বোধ হয়। ভদ্রলোকের প্রসন্ন গাম্ভীর্যে এই প্রথম বিরক্তির ছায়া লক্ষ্য করল ধীরাপদ। নিজের গাড়ির দিকে এগোলেন তিনি, উঠতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালেন।—তুমি থাকো কোন্ দিকে ?

বলল।

এসো—

গাড়িতে উঠে বসলেন। বিব্রত মুখে ধীরাপদও। ড্রাইভার সশব্দে দরজা বন্ধ করল। গাড়িটা দু-পাঁচ হাত ব্যাক করে স্টেশান ওয়াগনের পাশ কাটাতে হবে।

নিচের দরজার ওপর পাশাপাশি থমকে দাঁড়িয়ে গেল সিতাংশু আর লাবণ্য সরকার। হকচকিয়ে গেছে দুজনেই। হিমাংশুবাবু নির্লিপ্তমুখে তাঁদের দিকে একবার ফিরে তাকালেন শুধু।

গাড়ি বেরিয়ে গেল।

বড় রাস্তায় পড়তে তিনি জানালেন, ওকে চৌরঙ্গীর কাছাকাছি ছেড়ে দেবেন, সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে সে যেন বাড়ি চলে যায়। এভাবে যখন যা ট্যাক্সিভাড়া লাগে মাসকাবারে বিল করে দেয় যেন, সকলেই তাই করে।

ধীরাপদর কেমন মনে হল, ওই দুটিকে একটু জব্দ করার জন্যেই বড় সাহেব এই ব্যাপারটা করলেন। পাইপ টানছেন, বিরক্তির ছায়াটা গেছে। আগের

মতই সুশ্রী গাম্ভীর্য।

একসময় বললেন, তোমার ওই আর্টিক্‌ল্ লেখা নিয়ে অমিতের সঙ্গেও পরামর্শ করতে পারো, দু-একটা ইন্টারেস্টিং অ্যানেকডোট হয়ত সেও বলতে পারবে।

এখানকার কাজের হদিস না পেয়ে এ পর্যন্ত ধীরাপদ অনেক দিনই অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সব সময়েই আর পাঁচটা বাজে কথায় কাজের কথা ডুবে গেছে। বেশি বলতে গেলে সে বিরক্তিতে ধমকে উঠেছে, এখানে কাজ কেউ চায় না মশাই, ডোণ্ট বদার—যা করতে বলে করে যান।

কিন্তু বড় সাহেবকে সেটা বলা যায় না। তিনি আবার বললেন, সে তোমাকে পছন্দ করে শুনলাম, তার সঙ্গে খাতির রেখো, হি রিকোয়ার্স কম্প্যানী।

খানিকক্ষণের নীরবতায় ধীরাপদর উৎকণ্ঠা গেল, জটিলতার সূচনা নয় কিছু। চুপচাপ পাইপ টানতে লাগলেন। কিন্তু পাইপ টানার ফাঁকে ফাঁকে এক-একবার দেখছেন ওকে, কিছু ভাবছেনও হয়ত। চোখোচোখি হতে ঘুরেই বসলেন একটু, পাইপ হাতে নিলেন।—অনেক কাল আগে কোথায় যেন দেখেছি তোমাকে, জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম···দেখেছি ?

হঠাৎ ফাঁপরে পড়ে গেল ধীরাপদ। এ-রকম একটা প্রশ্নের জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না। জবাব দিয়ে উঠতে পারল না, বিব্রত মুখে মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ দেখেছেন।

কোথায় ? ঈষৎ উৎসুক।

চারুদির শ্বশুরবাড়িতে।

জবাবটা নিজের কানেই বড় বেশি স্পষ্ট ঠেকল ধীরাপদর। মোটা ফ্রেম আঁটা গোটা মুখে বিস্ময় আর বিড়ম্বনার ব্যঞ্জনা। হাসিমুখে ভুরু কুঁচকে সরাসরি চেয়েই রইলেন ওর দিকে। স্মরণের প্রয়াস। স্মরণ হল বোধ হয়। চারুদির শ্বশুরবাড়িতে প্রতিদ্বন্দ্বী তরুণ প্রেমিকের আনাগোনা নিয়ে দুজনের মধ্যে তখন হাসাহাসিও হত কিনা কে জানে! হিমাংশুবাবু সামনের দিকে ঘুরে বসে নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন, শেষে পাইপ দাঁতে চেপে বললেন, তাহলে ধরে নেওয়া যাক আগে আর দেখিনি।

যতই বিব্রত ভাব দেখাক, মনে মনে খুশি ধীরাপদও। ব্যাপারটা মন্দ দাঁড়াল না। ধরে বা-ই নিন, আর যত বড় সাহেবই হোন উনি, আঠারো বছর আগের অধ্যায়টি আর একেবারে বিস্মৃত হতে পারবেন বলে মনে হয় না।

[illegible] থেকে ধীরাপদর অনেকটাই দূরত্ব লঙ্ঘন করে ফেলেছে।

নেমে যাওয়ার সময়ও তাঁর মুখের হাসির আভাসটুকু একেবারে মিলোয়নি।...

অফিসে সেদিন লাবণ্য সরকারকে বেশ একটু গম্ভীরই দেখাচ্ছিল। সকালে বড় সাহেবের বাড়িতে ওভাবে বিব্রত হওয়ার অপরাধটা যেন ধীরাপদরই। সমস্ত দিন চুপচাপ থেকে বিকেলের দিকে নিজেই ঘরে এলো। হাতে দু-তিন শিট টাইপ-করা কাগজ।

ধীরাপদ সকালের পাওয়া রচনা-সংক্রান্ত তথ্যগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল আর ভাবছিল কি-ভাবে কি লেখা যায়। লাবণ্য সরকার সামনের চেয়ারে না বসে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। হাতের কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, এগুলো আপনার কাজে লাগবে কিনা দেখুন।

আপনি দিচ্ছেন যখন কাজে লাগবে জেনেই দিচ্ছেন। সহজ বিনয়ে ত্রুটি নেই ধীরাপদর, বসুন—

লাবণ্য বসল না, দুই-এক পলক চেয়ে থেকে বলল, সকালে এগুলোই ঠিকঠাক করে আনতে গিয়ে দেরি হয়েছিল, আপনি চলে গেলেন কেন?

ডাকলে না গিয়ে করি কি, কিন্তু এরই জন্যে দেরি নাকি? কণ্ঠস্বরে সহজ বিস্ময়, এই ব্যাপারে আটকে ছিলেন কি করে জানব, জানলে এড়ানো যেত—

ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায়, আর্টিক্‌ল্ লিখব আমি, এই ব্যাপারের জন্যে হলে তোমার বদলে আমাকেই ডাকা উচিত ছিল ছোট সাহেবটির, অথচ আমিই রইলুম বাইরে দাঁড়িয়ে।

এটুকুও উপলব্ধি না করার কথা নয় লাবণ্য সরকারের। আগে সামান্য কর্মচারী ভাবত যখন তখন যে-চোখে তাকাতো দৃষ্টিটা প্রায় তেমনি। নির্লিপ্ত চোখে ধৃষ্টতার বহর দেখছে যেন। নিস্পৃহ শুভাথিনীর মত ঠাণ্ডা পরামর্শ দিল, ভালো করে লিখুন, ভালো হলে আপনারও ভালো।

বিদ্রূপ গায়ে না মেখে ধীরাপদ ফিরে আগ্রহ প্রকাশ করল, ভালোর আশা দেখি নে, বসুন না...

নিস্পৃহতায় ফাটল দেখা গেল একটু, টিপ্পনী কাটল, বসলে ভালো হবে আশা করেন?

ধীরাপদ হেসে ফেলল, খুব করি।

আসবেন তাহলে এক সময়, দেখব...। কাজ আছে।

শিথিল চরণে দরজার দিকে এগোলো। এই মূর্তিতে সহকর্মিণীর থেকেও

আর কিছুর জোরটুকুই যেন অনেক বেশি। নারীর প্রাধান্য বেশি। সেটুকুই দেখিয়ে গেল। যেতে যেতেও অনুসন্ধানরত চোখ দুটোকে সেই প্রাধান্য বুঝিয়ে দিচ্ছে যেন। চেয়ে থাকো, আমার জোরটা কোথায় চেয়ে চেয়ে দেখো।

ধীরাপদ চেয়ে ছিল, দেখছিল।

ছেলে সকালে লাবণ্য সরকারকে আটকে রেখেছে শোনার সঙ্গে সঙ্গে হিমাংশু মিত্রের মুখের চকিত বিরক্তি ধীরাপদর দৃষ্টি এড়ায়নি। গাড়ি ছাড়ার মুখে দোর-গোড়ায় এসে লাবণ্যও সেটুকু অনুভব করেছে হয়ত। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যে এমন হবে ধীরাপদ কল্পনা করেনি। ভাবছে। মহিলা হঠাৎ ওর ওপর এত বিরূপ কেন। ও কি করল?

যতটা সম্ভব ভালো করেই ভেষজ-রচনা সরবরাহ করল ধীরাপদ। শুধু বাংলা নয়, ইংরেজীটাও সে-ই করে দিল। হিমাংশুবাবু এতটা আশা করেননি। ফলে এরপর এ ধরনের ব্যাপার মাঝেসাঝেই ঘাড়ে এসে চাপতে লাগল। এক-আধটা ভাষণ লিখে দেওয়া, ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সভা-সমিতিতে বিবৃতি পাঠানো। সেই প্রথম দিন ছাড়া সামনাসামনি আর প্রশংসা করেননি হিমাংশুবাবু। ধরেই নিয়েছেন ভালো হবে।

চারুদি সেদিন প্রশংসার ছলে একটু ব্যঙ্গই করলেন যেন। এ-কথা সে-কথার পর বললেন, তোমাদের বড় সাহেব তো খুব খুশি দেখি তোমার ওপর—

খানিক আগেও আজকাল আর বেশি আসে-টাসে না বলে বক্রোক্তি শুনতে হয়েছে। অনুযোগের মুখে থেমে গিয়ে টিপ্পনী কেটেছেন চারুদি, অত সময়ই বা পাবে কি করে, কোম্পানীর কাজ, বড় সাহেবের কাজ—ছোট সাহেব আর মেম-ডাক্তারের কাজও কিছু কিছু জুটছে নাকি?

ধীরাপদ পাল্টা ঠাট্টা করেছিল, এখনো জোটেনি, তবে সে জোটাতে চেষ্টা করছে বটে। বড় সাহেবের খুশি প্রসঙ্গে হাসিমুখেই ফিরে অনুযোগ করল, ঝামেলাটি তো বাধিয়েছ—আমি লিখতে পারি এ কথা তাঁকে কে বলেছে?

আমিই বলেছি, চারুদির নিরীহ স্বীকার-উক্তি, তোমার সুবিধে-টুবিধে যদি হয়। তা ঝামেলা কিসের, বেশ তো সুনজরে এসে গেছ।

ধীরাপদ বলে ফেলল, সুনজরে আসাটা তুমি তেমন সুনজরে দেখছ বলে তো মনে হয় না।

কলে পড়ে হেসে ফেললেন চারুদি, তা কি করব, এক ধার থেকে তুমি যদি এখন বক্তৃতা আর ভাষণ লেখো বসে বসে! এই সঙ্গে সেক্রেটারীর মাইনেটাও

তাহলে তোমাকে দিতে বলো।

একটু থেমে ধীরাপদ বলল, এ-সব লেখা-টেখা আর আমার দ্বারা হবে না তাই বরং জানিয়ে দেব।

এ কথা বলবে নাকি তাঁকে? চারুদির গলায় শঙ্কার রেশ।

ধীরাপদ ঘাড় নাড়ল, বলবে। জানালো, লিখতে তো আর সত্যিই পারে না, রীতিমত পরিশ্রম হয়, আর কাজেরও ক্ষতি।

চারুদি বিব্রত বোধ করছেন বোঝা গেল। বিদ্রূপ প্রত্যাহারের চেষ্টা।—গোঁয়ারতুমি করে কাজ নেই, পরিশ্রম গোড়ায় গোড়ায় করতেই হয়। কিছু বলতে হলে অমিতের সঙ্গে কথা কয়ে নিও, সে-ই বলছিল...

অর্থাৎ আগের ওই অভিযোগ চারুদির নয়, অমিতাভর। ধীরাপদ ধাক্কা খেল একটু, কিছুদিন যাবৎ অমিতাভ ঘোষ ওর ঘরে আর আড্ডা দিতে আসছে না বা টেলিফোনে ডাকছে না মনে পড়ল। অথচ ধীরাপদ যাহোক করে তাকে ধরে বেঁধে কাজের আলোচনায় বসবে স্থির করেছিল। এই কোম্পানীতে কাজ কিছু করার ইচ্ছে থাকলে সাহায্য একমাত্র সে-ই করতে পারে।

চারুদির বাড় থেকে বেরুবার মুখে ছোট যোগাযোগ একটা। ফলটা সুবাঞ্ছিত মনে হল ধীরাপদর।

বাইরের ঘরের বইএর আলমারির পাশে ছোট টেবিলটার কাছে পার্বতী দাঁড়িয়ে। তার কানে টেলিফোন। কথা বলছে না, চুপচাপ কথা শুনছে।

এক নজরে মুখের ঋজু গাম্ভীর্যটুকু লক্ষ্য করেই ধীরাপদ অনুমান করেছে, কার কথা।

পায়ের শব্দে পার্বতী ফিরে তাকালো। রিসিভারে একটা হাত চাপা দিয়ে মৃদু অথচ স্পষ্ট অনুরোধ করল, একটু দাঁড়াবেন। রিসিভার মুখের কাছে এনে শুধু বলল, ছেড়ে দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে রাখল রিসিভারটা।

ধীরাপদর মনে হল অপর প্রান্তে যে আছে, এভাবে বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে তার প্রস্তুত থাকার কথা নয়। একেবারে গল্পাকারের সমাপ্তি। সামনাসামনি তার সঙ্গে এই প্রথম কথা বলল পার্বতী। টেলিফোন রেখে নীরবে একবার চোখ তুলে তাকালো শুধু, তারপর ভিতরে ঢুকে গেল।

দু-দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই ফিরে এলো। হাতে ক্যামেরা।

অমিতাভ ঘোষের সেই ক্যামেরা।

এটা দিয়ে দেবেন—

কাকে দিতে হবে বলল না, জানাই আছে যেন। ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, অমিতবাবু বাড়িতেই আছেন এখন?

ঘাড় নাড়ল। তারপর মৃদু গলায় জানালো, কাল অফিসে দিলেও হবে।

কাল নয়, অফিসেও নয়, চারুদির বাড়ি থেকে ধীরাপদ সরাসরি হিমাংশু মিত্রের বাড়িতে উপস্থিত। আসার উপলক্ষ যোগানোর জন্যে পার্বতীর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য ভুলে থেকে ওই মেয়েটার কথাই ভেবেছে। ওকে দেখলেই আকাশের একরাশ মেঘের কথা মনে হয় ধীরাপদর। যে-মেঘ ত্রাসের কারণ সেই মেঘ নয়, যে মেঘ আশ্বাস যোগায় সেই মেঘ। আর ভেবেছে, ক্যামেরাটা নিয়ে গিয়ে বার বার এভাবে ফেলেই বা আসে কেন অমিতাভ ঘোষ।

মানুকে জানালো, ভাগ্নেবাবু খানিক আগে গাড়ি নিয়ে বেরুলেন, বোধ হয় খেতেটেতে গেছেন, এক্ষুনি ফিরবেন মনে হয়, ঘর খোলা।

অর্থাৎ শিগ্‌গীর ফেরার সম্ভাবনা না থাকলে ঘর তালা-বন্ধ থাকত। ধীরাপদ বলল, তাঁর ঘরেই তাহলে বসি একটু—

অমিতাভ ঘোষ নিচে থাকে জানত না। সিঁড়ির ডান দিকের বড় হল পেরিয়ে তার ঘর। দরজা দুটো ভেজানো ছিল, মানুকে খুলে দিল।

অগোছালো ঘর। কোণের টেবিলে এক পাঁজা বিলিতি ডিটেক্‌টিভ বই। টেবিলের পিছনের তাকে কতকগুলো বিজ্ঞানের বই আর একটা ফোটো অ্যালবাম। ধীরাপদ চেয়ার টেনে বসল।

সামনের অবিন্যস্ত শয্যার ওপরেও আর একখানা অ্যালবাম। ঘরটা ওকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখে মানুকে নিজের দোষ-স্খালনের চেষ্টা করল তাড়াতাড়ি। বলল, ভাগ্নেবাবুর ঘর বারো মাসই এমনি থাকে—মেজাজ ভালো না থাকলে যে পরিষ্কার করতে আসবে তাকেই ঝেঁটিয়ে তাড়াবেন।

হাত বাড়িয়ে বিছানা থেকে অ্যালবামটা তুলে নিল ধীরাপদ। কিন্তু খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করতে হল আবার। না, মানুকে লক্ষ্য করেনি, ভাগ্নেবাবুর মেজাজের কথা সবে শেষ করেছে।

চাঞ্চল্য গোপন করে ধীরাপদ বলল, তোমার কাজ থাকে তো যাও না, আমি বসছি।

তার দিকে চেয়ে মানুকে বুঝে নিল গল্প জমবে না। বলল, হ্যাঁ যাই, সন্ধ্যে-নিদ্রের পর কেয়ার-টেক বাবু হাতের কাছে খাবারটি না দেখলে আবার তো আমাকেই ধরে চটকাবেন। দরকার হলে ওই বেল টিপবেন—

মানুকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালবাম খুলে বসল। পর পর লাবণ্য

সরকারের ছবি কতগুলো। লাবণ্যের এ মূর্তি ধীরাপদ দেখেনি। হাসি-খুশি-আনন্দ ভরা ছবি। এই লাবণ্য পদস্থ কর্মচারী নয়, বচন-কুশলিনী ডাক্তারও নয়। এই লাবণ্য একটি মেয়ে শুধু, ভর-ভরতি মেয়ে।

আবারও থামতে হল এক জায়গায়। চকিতে দরজার দিকে তাকালো একবার।

...লাবণ্যর ছবি শেষ হয়েছে। এবারে পার্বতীর ছবি। গোটা অ্যালবামের চার ভাগের তিন ভাগই তাই।

কানের কাছটা গরম ঠেকছে ধীরাপদর। আর দেখা উচিত নয় ভাবছে, অথচ পাতা না উল্টেও পারছে না। দেখার অনস্বভূত আকর্ষণ একটা, অজ্ঞাত তাগিদ। নানা ছাঁদে বন্দিনী ধীর গম্ভীর একখানি পার্বত্য যৌবন! কোনো কোনো ছবিতে রোদ-দাগানো মেঘের মত গাম্ভীর্যের ফাটলে ঈষৎ হাসির আভাস, প্রশ্রয়ের আভাস। কোনোটিতে নির্বিকার যৌবনের প্রসারিত দাক্ষিণ্য শুধু। বেশির ভাগ ছবির পরিচ্ছদ-স্বল্পতা চোখে বেঁধার মত, আবার গোপন তৃপ্তিতে চেয়ে চেয়ে দেখার মতও। শেষের কটা সমুদ্র-বেলায় আঁট কস্টিউম পরা—কোনোটায় স্নান সেরে উঠে আসছে, কোনোটায় স্নানে নামছে।

অ্যালবাম যথাস্থানে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ধীরাপদ। অস্বাচ্ছন্দ্য একটা, অথচ অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। বুকের কাছটা ধকধক করছে, কান দুটো গরম ঠেকছে আরো, ঠোঁট শুকনো, খরখরে জিব।

অদূরে প্যাঁ-ক্ করে একটা শব্দ হতে ধীরাপদ নিজেই চমকে উঠলো। বেল সে-ই টিপেছে। দরজার বোতাম টিপে মানুকেকে ডেকেছে। মানুকে আসার আগে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিল।

আর বসব না, যাই এখন। এলে বোলো ক্যামেরাটা রেখে গেলাম।

মানুকেকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে ধীরাপদ চোরের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় এসে থামল।

॥ নয় ॥

চোখের সামনে সেদিন নিয়তির ছোটখাটো খেলা দেখে উঠল একটা।

ধীরাপদ নিচে নেমেছিল অমিতাভ ঘোষের খোঁজে। তাকে না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তার পাশে পাশে ভ্যাট ঝোলানো ঠেলাটা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল লোকটা। পাশে পাশে ঠিক নয়, একটু আগে আগে। লোকটাকে চেনে ধীরাপদ।

তানিস সর্দার—হৈ-চৈ করে কথা বলে, হুড়বড় করে কাজ করে।

ভ্যাট ভরতি লিভার এক্‌স্‌ট্রাক্ট। আলকাতরার মত ঘন গাঢ় ফুটন্ত লিভার এক্‌স্‌ট্রাক্ট। ফারনেস থেকে নামিয়ে মেন্‌-বিল্‌ডিংএর একতলায় সিন্‌থেটিক-স্টোরেজে রাখতে চলেছে। ওয়ার্কশপ থেকে এই পথটুকু কিছুটা এবড়োখেবড়ো। অত বড এক ফুটন্ত ভ্যাট আর একটু সাবধানে ঠেলে নিয়ে যাওয়া উচিত লোকটার। ধীরাপদ অস্বস্তি বোধ করছিল। দু'দিকের কড়ায় ঝোলানো ভ্যাটটা ওর চলার ঠমকে বড বেশি নড়ছিল, দুলছিল। ধীরাপদ অঘটন ঘটবে জানত না, অথচ অঘটনের একটা ছায়া আশ্চর্যভাবে মনে আসছিল।

অঘটন ঘটল। লোকটার নিজের দোষেই ঘটল।

মেন-বিল্‌ডিংএর প্রবেশপথের এমাথা-ওমাথা জুড়ে আধ হাতের মত উঁচু একটাই মাত্র বাঁধানো ধাপ। তারপর লম্বা করিডোর। তরতর করে সেই ধাপের মুখে এসে এক মুহূর্তও না থেমে লোকটা দু হাতে ধরা রড্ দুটোতে সজোরে নিচের দিকে চাপ দিল একটা। উদ্দেশ্য, সামনের চাকা দুটো সিঁড়ির ওপর তুলে দিয়ে ঠেললেই পিছনের চাকাটা আপনি উঠে যাবে। উচিত হোক অনুচিত হোক, পরিশ্রম বাঁচানোর জন্যে হয়ত এভাবেই কাজ করে অভ্যস্ত ওরা।

চিৎকার চেঁচামেচি, গেল গেল রব।

ফ্যাক্টরী ভেঙে লোক দৌড়ে এলো।

ধীরাপদ চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে। কোথা দিয়ে কি-ভাবে কি ঘটে গেল ঠিক বোঝেনি। লোকটাকে দু হাত তুলে আর্তনাদ করে উঠতে দেখেছে, তার পরেই গড়াগাড় খেতে দেখেছে—মাটিতে ভ্যাটের ফুটন্ত পদার্থের কুটিল স্রোত।

লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় ধীরাপদ ভালো করে দেখল। নিচের অঙ্গ ঝলসে গেছে, ওপরের অঙ্গও দগদগে। মুমূর্ষু, অজ্ঞান।

গতির যুগ। শান-বাঁধানো জায়গাটা মুছে ফেলা হয়েছে। এধারের মাটিতে অনেকটা জায়গা জুড়ে মস্ত একটা কালচে ছাপ পড়ে আছে। তানিস সর্দার বাঁচবে কি না যে ভাবছে ভাবুক, তার দেহের দাগ দেখে যে শিউরে উঠছে উঠুক। এ-রকম ছোটখাটো অঘটন নতুন কিছু নয়। কিন্তু ওই কালো দাগটা কোম্পানীর সুনিশ্চিত লোকসানের দাগ। সেই দাগটা একেবারে ছোট নয়। ছোট হলেও এই অকারণ ক্ষতি নীরব সহিষ্ণুতায় বরদাস্ত করার মত ছোট নয়।

ওপরে এসে লাবণ্য সরকারের উদ্দেশে গম্ভীর মুখে সিতাংশু বলল, কম করে বারো-চোদ্দ হাজার টাকা লোকসান।

পাশাপাশি নিজেদের ঘরের দিকে যাচ্ছিল তারা। ধীরাপদ পিছনে।

নিজের ঘরে বসে ধীরাপদ চুপচাপ একটা অস্বস্তি ভোগ করল খানিকক্ষণ। কোম্পানীর ক্ষতি বটে। ক্ষতিটা কর্মচারীর অনবধানের ফলেই। কিন্তু এই ক্ষতি ছেড়ে একটা লোকের ওই ক্ষতটাই বিভীষিকার মত বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। হাসপাতালে কি ব্যবস্থা হল না হল একবার দেখে আসা উচিত কি না ভাবছে।…কেউ তো কিছু বলল না।

চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব হল না শেষ পর্যন্ত। খানিক বাদে কোম্পানীর গাড়ি নিয়ে ফ্যাক্টরী থেকে বেরিয়ে এলো সে। হাসপাতালে এসে মনে হল, না এলেই ভালো হত। ফ্রী বেড খালি নেই, সাধারণ পেইং বেডও না। এমারজেন্সি কেস বলে রোগী ফেরত দেওয়া হয়নি বটে, বাইরের বারান্দায় বাড়তি বেড ফেলে জায়গা দেওয়া হয়েছে তানিস সর্দারকে। সেখানে এরকম এক্সট্রা বেড-এর সংখ্যা এই একটিই নয়, অনেক। দেখলে অনভ্যস্ত চোখে ধাক্কা লাগে। রোগী যেখানেই থাক, হয়ত চিকিৎসায় ত্রুটি হয় না, হবার কথা নয় অন্তত, তবু বেড-গুলোর দিকে চেয়ে অনুগ্রহের রোগশয্যা ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

ফ্যাক্টরীর তুজন কর্মচারী ছিল, সেলাম জানিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তারাও দরকারমত চিকিৎসা হবে বলে ভাবতে পারছে না। অদূরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে ওদেরই শ্রেণীর একজন স্ত্রীলোক বসেছিল, সামনে পাঁচ-সাত বছরের তুটো নোংরা ছেলে। কর্মচারী তুজন কিছু ইশারা করেছে কিনা বোঝা গেল না। স্ত্রীলোকটি দিশেহারার মত উঠে এসে ধীরাপদর তু-পা জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল।

বচা দে বাবু, বচা দে!

সে হাসপাতালের নিয়ম-কানুন বোঝে না, সম্ভব-অসম্ভব বোঝে না, ভব্যতা-অভব্যতা বোঝে না। নিজের লোকসান বোঝে। তাই বুঝেছে।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে শ্রমিক-বধূর কান্না দেখল ধীরাপদ।

খোঁজ নিয়ে জানল, ক্যাবিন খালি আছে এবং দিনে তিন-চার টাকার বিনিময়ে তা পাওয়া যেতে পারে। আর ওষুধপত্রের খরচও লাগবে। সব ব্যবস্থা করে বেরিয়ে এলো যখন, শ্রমিক-রমণীর কান্নাটা কানে বাজছে তখনো। ভাবছে, এত কান্নার সবটাই কি শুধু নিরাশ্রয় হবার ভয়ে…।

ফ্যাক্টরীতে হিমাংশু মিত্র সপ্তাহে সাধারণত তু-তিন দিনের বেশি আসেন না। এসেও তু-এক ঘণ্টার বেশি থাকেন না। অঘটনের পরদিন এই প্রথম তাঁর ঘরে ডাক পড়ল ধীরাপদর।

সাজানো গোছানো মস্ত বড় ঝকঝকে তকতকে ঘর। বড় সাহেবের সামনে সিতাংশু আর লাবণ্য বসে। পাশের হেলান দেওয়া চেয়ারে অমিতাভ ঘোষ—

নির্বিকার মুখে সিগারেট টানছে। মামার সামনেও এমন সহজ মুখে সিগারেট টানে ধীরাপদ জানত না।

আলোচনা গতকালের অঘটন প্রসঙ্গে। কোম্পানীর লোকসান প্রসঙ্গেও। ধীরাপদর প্রতি নির্দেশ, তার চাক্ষুষ দেখার একটা স্টেটমেণ্ট দিতে হবে, তানিস সর্দারের গাফিলতির কথা লিখতে হবে, কোম্পানীর লোকসানের অঙ্কটাও বসাতে হবে। এদিকটা এক্ষুনি ঠিক করে না রাখলে পরে গোলযোগের সম্ভাবনা।

অতঃপর চিকিৎসার প্রশ্ন। ব্যবস্থার কথা শুনে বড সাহেব কিছু মন্তব্য করার আগেই সিতাংশু বিরক্ত মুখে বলে উঠল, আপনি কাউকে না জিজ্ঞেস করে তাড়াতাড়ি এ-ব্যবস্থা করতে গেলেন কেন? নিজের কেয়ারলেসনেস্এ অ্যাকসিডেণ্ট, এই লোকসানের ওপর আবার আমরা তার ক্যাবিন ভাড়া আর চিকিৎসার খরচা যোগাতে যাব? ফ্রী বেড পেয়েছিল যখন, আপনার ইণ্টারফিয়ার করার দরকার কি ছিল?

ধীরাপদ জবাব দিল না।

হিমাংশু মিত্র আঙুল দিয়ে টেবিলে দাগ কাটছেন, লাবণ্য সরকার গম্ভীর, অমিতাভ ঘোষ চেয়ারে মাথা এলিয়ে সিগারেট টানছে।

একটু বাদে হিমাংশুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ক্যাবিন ভাড়া কত?

কত শুনে একটু আশ্বস্ত হতে যাচ্ছিলেন বোধ হয়, সিতাংশু তেমনি অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বলে উঠল আবার, টাকার জন্যে তো কথা নয়, আমরা এভাবে আদর-যত্ন করে চিকিৎসা করালে সকলে ধরেই নেবে যে ওর কিছু গাফিলতি নেই, ক্ষতিপূরণ নিয়ে একটা ঝকাঝকি লাগবে হয়ত, এঁর তো কাউকে না জিজ্ঞাসা করে এ-সব করার দরকার ছিল না কিছু!

দরকার ছিল। বিনীত ভাবেই ধীরাপদ জবাব দিল এবার।—যে-ভাবে ছিল লোকটা সে-ভাবে থাকলে বাঁচবে বলে মনে হয়নি। হয়ত এখনো বাঁচবে না, যা করেছি নিজের দায়িত্বে করেছি, কোম্পানীর অসুবিধে হলে কোম্পানী দিতে যাবে কেন? একটু থেমে আবার বলল, লোকটার গাফিলতির কথাও সবাই জানে, তবু দরকার হলে কোম্পানী নিজে থেকেই যদি ক্ষতিপূরণ কিছু দেয়, তাহলেও যে-ক্ষতি হয়ে গেছে এর ওপর সেটুকু আর তেমন কিছু বড় ক্ষতির ব্যাপার হবে বলে আমার মনে হয় না, বরং ফলটা ভালো হবে বলেই বিশ্বাস।

হিমাংশু মিত্রের মুখে হাল্কা বিস্ময়, লাবণ্য সরকার ঘাড় ফিরিয়েছে,

অমিতাভ ঘোষ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে আর একটা সিগারেট ধরালো—কৌতুক দৃষ্টিটা ধীরাপদর মুখের ওপর।

যত নরম করেই বলুক, চুপচাপ বরদাস্ত করার কথা নয় ছোট সাহেবের। করলও না। রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে, আপনার বিশ্বাসের কথা কেউ শুনতে চায়নি। যা হয়েছে লোকটার নিজের দোষে হয়েছে, আমরা তার জন্যে এত সব করতে যাব কেন?

তার দিকে চেয়েই ধীরাপদ তেমনি শান্ত অথচ স্পষ্ট জবাব দিয়ে ফেলল আবারও একটা। বলল, নিজের দোষে কেউ মরে গেলেও তাকে কেউ ফেলে দেয় না, তারও সৎকার হয়ে থাকে।

সিতাংশু নির্বাক হঠাৎ। নির্বাক কয়েক মুহূর্ত সামনের দুজনও। চীফ কেমিস্ট ফড়ফড়িয়ে সিগারেট টানছে।

হিমাংশু মিত্রই মধ্যস্থতায় এগোলেন। ছেলেকে বললেন, অকারণ বাদানুবাদ করে লাভ নেই, চিকিৎসার সব ব্যয়ভার কোম্পানীর নেওয়া উচিত, কোম্পানীই নেবে। আর ধীরাপদকে বললেন, লোকটা সেরে উঠবে কি উঠবে না তাই যখন ঠিক নেই, পরের কথা পরে—সময় নষ্ট না করে আপাতত অফিসিয়াল স্টেট-মেণ্টটাই রেডি রাখা দরকার।

ধীরাপদ চুপচাপ উঠে এলো।

সেদিনও বিকেলে হাসপাতালে এসেছিল। শক্-পিরিয়ড না কাটা পর্যন্ত তানিস সর্দারের ভালোমন্দ কিছু বলা যায় না। তবে চিকিৎসা যে হচ্ছে সেটা বোঝা যায় এখন। ওর বউকেও দেখল। আজ আর কাঁদছে না। ধীরাপদকে দেখে কালো মুখে আশা আর কৃতজ্ঞতা উপ্‌ছে উঠছিল।

বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, ক্যাবিনে ঢুকল অমিতাভ ঘোষ। ধীরাপদ তাকে এখানে আশা করেনি, দেখে মনে মনে খুশি। অমিতাভ দাঁড়িয়ে রোগী দেখল দু-চার মিনিট।

বাইরে এসেই হাসিখুশি মুখে বলল, ফ্যাক্টরী থেকে তাড়াতাড়ি পালাতে দেখেই বুঝেছি আপনি এখানে, লোকটা আছে কেমন, বাঁচবে?

জবাব শুনল কি শুনল না। আনন্দে গোটা মুখ ডগমগ, এখানে রোগী দেখতে এসেছে কি ধীরাপদর খোঁজে এসেছে বোঝা শক্ত। নিজের পুরনো ছোট গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে। উৎফুল্ল মুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল। হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডের বাইরে এসেই বলল, আপনি মশাই এমন সাঙ্ঘাতিক লোক জানতুম না।

কেন, কি হল?

যা হল বাবুরা বুঝেছেন, ছোট সাহেবের মাথা ঘুরে গেছে, তার মুখের ওপর এ-রকম কথা কেউ কখনো বলে না।

ধীরাপদ হেসে ফেলল, চীফ কেমিস্টও না?

আমার কথা ছেড়ে দিন, ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট চেপে হাসছে অমিতাভ। এখানে এই লোকটার জন্যে আপনি যা করলেন চীফ কেমিস্ট হিসেবে সেটা আমারই করার কথা, কিন্তু আমি বললে পাগলের দরদ বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করত। এখন জোড়া পাগলের পাল্লায় পড়ল কিনা ভাবছে।

তার আনন্দ দেখে ধীরাপদর ভয় হল হাতের স্টিয়ারিং ঠিক থাকলে হয়। হেসে জিজ্ঞাসা করল, আপনি চলেছেন কোথায়?

আপনার চারুদির ওখানে। যাবেন?

চকিতে ধীরাপদ গাড়ির ভিতরটা একবার দেখে নিল। না, ক্যামেরা নেই। বলল, আমি আজ আর না, বাড়ি যাব এখন, আমাকে এদিকেই নামিয়ে দিন কোথাও।

চলুন, পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি—

মেজাজ যথার্থই প্রসন্ন আজ। কদিন ধরে এমন একটা সুযোগই খুঁজছিল ধীরাপদ। সুলতান কুঠি পাঁচ-সাত মাইল পথ এখান থেকে, এই অন্তরঙ্গতার ফাঁকে কাজের কথা তোলাটা অসম্ভব হবে না হয়ত। ঘোরানো পথে গিয়ে ফল হবে না, সমস্যাটা সোজাসুজি ব্যক্ত করে ফেলল। বলল, এদিকে আমার যে চাকরি থাকে না—

অমিতাভ শুধু ফিরে তাকালো একবার, বক্তব্য বুঝতে চেষ্টা করল।

বসে বসে শুধু ফাইলই ঘাঁটছি, আর যে-যা বলছে করছি, নিজে থেকে কিছু বুঝছিও না করছিও না—একটু-আধটু কাজ না দেখাতে পারলে চাকরি থাকবে কেন?

সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ ঘোষের টিপ্পনী, কাজও তো বেশ দেখাচ্ছেন, ওষুধের ব্যবসা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে দিচ্ছেন, ভাষণ লিখে দিচ্ছেন, বাণী লিখে দিচ্ছেন—

বক্রোক্তি গায়ে না মেখে ধীরাপদ জবাব দিল, সে কাজের জন্যে ছ'শ টাকা মাইনে দিয়ে সুপারভাইজার রাখা দরকার নেই—সেটা তাঁরা শিগ্‌গীরই বুঝবেন।

অমিতাভর মুখে স্পষ্ট বিরক্তি। সাদাসাপটা যা বলে বসল, শুনতে ভালো লাগার কথা নয়, ভালো লাগলও না। বলল, আপনার গুণ দেখে আপনাকে এখানে আনা হয়নি, কাজও কেউ আশা করে না। চারু মাসী চেয়েছেন বলেই

আপনাকে এখানে এনে বসানো হয়েছে।

ধীরাপদ জানে। শুধু চারুদির এ-রকম চাওয়ার হেতুটাই দুর্বোধ্য। খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল, চারুদির সঙ্গে ব্যবসার কি সম্পর্ক?

সম্পর্কটা সে জানে না শুনে অমিতাভ যেমন অবাক, সম্পর্কটা জানার পর ধীরাপদও অবাক তেমনি। সমস্ত ব্যবসায়ের চার আনার মালিক চারুদি। বলতে গেলে চারুদির টাকাতেই ব্যবসা শুরু, মামার জিম্মায় অমিতাভর মায়েরও কিছু টাকা ছিল। মামার নিজস্ব কত ছিল জানে না। তবে মামা মোটা টাকা ঋণ সংগ্রহ করেছিলেন আর সেই ঋণের দায়িত্বও নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। কারবারের ন আনা অংশ মামা আর মামাতো ভাইয়ের, এক আনা বাইরের লোকের। নিজের দু আনার কথা আর উল্লেখ করল না। চারুদির ডাক্তার স্বামী বেঁচে থাকতেই এই ব্যবসার জল্পনা-কল্পনা চলছিল। মামার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল খুব। তিনি মারা যেতে তাঁর জমানো টাকা, বিষয়ের অংশ, আর লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকা—সবই চারুদি মামার হাতে তুলে দিয়েছিলেন এই ব্যবসার জন্য।

অমিতাভ ঘোষ আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ধীরাপদ একেবারে চুপ। কিন্তু ভিতরটা খুব চুপ করে নেই। চারুদির বাড়ি-গাড়ি বিষয়-আশয়ের ওপর থেকে একজনের অনুগ্রহের ছায়াটা মন থেকে সরে গেল বলে খুশি হবার কথা। কিন্তু ধীরাপদ সেদিকটা ভাবছেই না। এক-রকম জোর করেই চারুদি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন তাকে। ধরেবেঁধে উপকার করা নিয়ে ধীরাপদ ঠাট্টা করতে জবাব দিয়েছিলেন, উপকারটা তাঁর একার নাও হতে পারে। পাকাপাকি ভাবে কাজে লাগার পরেও দায়িত্বের কথা বলেছেন চারুদি, বলেছেন সেটা যেন সে ঠিকমত দেখে শুনে বুঝে নিয়ে চলতে পারে।

কিন্তু ধীরাপদ কি করতে পারে? ওর কাছ থেকে কি প্রত্যাশা চারুদির?

বিশ্বাস করে একদিন যাঁর হাতে যথাসর্বস্ব তুলে দিয়েছিলেন, আজ আর তাঁকে অতটা বিশ্বাস করেন না হয়ত। সেদিন বিশ্বাস করেছিলেন কারণ আর একটা জোর ছিল সেদিন। অনেক বড় জোর। নারীর যে জোরের কাছে অতি বড় প্রবল পুরুষেরও সমর্পণ। সেই জোরটা আজ আর তেমন নেই ভাবছেন চারুদি? সেই জন্যেই কথায় কথায় বয়সের কথা তোলেন? সেই জন্যেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় চোখে-মুখে জল দিতে হয়? আর সেই জন্যেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওকে যুক্ত করার আগ্রহ?

সবই হতে পারে। কিন্তু ধীরাপদর তা মনে হয় না। এখনও চারুদির

বাড়ির দরজায় হিমাংশু মিত্রের লাল গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আর চারুদির স্নেহভাজন বলেই ওর প্রতি অমন রাশভারী বড় সাহেবের প্রচ্ছন্ন প্রীতিভাব।

থেকে থেকে ধীরাপদর কেবলই মনে হল, চারুদির মনের তলায় আরো কিছু আছে। অনেকক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আমি এখানে এসে চারুদির কোন্ কাজে লাগতে পারি ?

সামনের দিকে চোখ রেখে অমিতাভ ভুরু কুঁচকে জবাব দিল, কাজে লাগার দরকার নেই, চারুমাসির লোক এখানে একজন থাকা দরকার, আপনি আছেন।

তাঁর লোক একজন থাকা দরকার কেন ?

তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

আপনি জানেন না ?

না। হাল্কা শিস দিতে দিতে স্পীড কমালো, সামনে লরী।

ধীরাপদ হাসছে অল্প অল্প। কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প আঁটছে কিছু। হিতে বিপরীত হবে কিনা কে জানে। হবে না বোধ হয়, মেজাজপত্র অন্য রকম দেখছে আজ।

এখানে আসার আগে আমি কি করতাম আপনার জানা নেই, না ?

লরীর পাশ কাটিয়ে ঘাড় ফেরালো, ঠোঁটের ফাঁকে হালকা শিস্‌টা ধরা তখনো।

ছেলে পড়াতাম আর কবিরাজী ওষুধ আর পুরনো বইএর দোকানের বিজ্ঞাপন লিখতাম···মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতে কালঘাম ছুটে যেত। হাসতে লাগল।

সামনের ফাঁকা রাস্তাটা দেখে নিয়ে অমিতাভ আবারও ফিরে তাকালো। শিস্ থেমে গেছে।

ধীরাপদ বলল, আবারও তাহলে সেই অবস্থার মধ্যেই ফিরে যেতে বলছেন আমাকে ?

সশঙ্ক প্রতীক্ষা। কিন্তু কাজ হয়েছে মনে হচ্ছে। স্টীয়ারিং হাতে ফিরে ফিরে বারকতক দেখল।—ব্যাপারখানা কি খুলে বলুন না, কে যেতে বলেছে আপনাকে ?

আপনি যা বলছেন সেই রকমই দাঁড়ায়। কারো তাঁবেদারের লোক হয়ে বসতে রাজী নই। আপনার ভরসায় কাজের ওপর দাঁড়াব আশা করছিলাম।

রাগতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হেসেই ফেলল অমিতাভ ঘোষ—আচ্ছা, আশা

বার করছি আপনার। শীতের কাঁটা তিরিশ থেকে এক লাফে পঞ্চাশে চড়ল। উৎফুল্ল বিস্ময়ে বলে উঠল, অদ্ভুত লোক মশাই আপনি!

হাসছে ধীরাপদও। স্বস্তি।

চারুদির সঙ্গে যেদিন এসেছিল সেদিনও নাকি সুলতান কুঠির এই পরিবেশটা ভালো লেগেছিল অমিতাভ ঘোষের। পৌঁছে দিতে এসে আজ ধীরাপদর সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। অর্থাৎ এক্ষুনি যাবার বাসনা নেই। অগত্যা আমন্ত্রণ না জানিয়ে ধীরাপদ করে কি।

আসুন, বাইরেটা ভালো লাগলেও ভিতরটা লাগবে না।

সুলতান কুঠিতে গাড়ি আসা আর সেই গাড়িতে ধীরাপদর আসা এখন আর উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার মত নয় খুব। কিন্তু তার ঘরের সামনের বারান্দায় যে মানুষটি দাঁড়িয়ে তার বিস্ফারিত চোখে রাজ্যের বিস্ময়। গণুদা। গণুদার এমন চিত্রার্পিত মূর্তি ধীরাপদ আগে কখনো দেখেনি।

উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠে আসতে গণুদার দিশা ফিরল যেন। শশব্যস্তে দু হাত জুড়ে আধখানা ঝুঁকে বিনয়ে ভেঙে পড়ে অভিবাদন জ্ঞাপন করে উঠল একটা। জবাবে একখানা হাত কপালে তুলে অমিতাভ জিজ্ঞাসু নেত্রে ধীরাপদর দিকে তাকালো।

গণেশবাবু, গণুদা—এই পাশের ঘরে থাকেন। ঘরের দরজা খোলার ফাঁকে ধীরাপদ পরিচয়ের বাকি আধখানা এড়িয়ে গেল, কাকে নিয়ে এসেছে সেটা আর গণুদাকে বলল না। তার শ্রদ্ধার বহর দেখে ঘাবড়ে গেছে।

কিন্তু যে-কারণেই হোক ওটুকু পরিচয় গণুদার পছন্দ নয়। বিনয়ের আঁচে মাখন-গলানো মুখখানি করে বলল, ধীরু আমার ছোট ভাইয়ের মত···

অমিতাভর চোখে নীরব কৌতুক। ধীরাপদর কানেও বেখাপ্পা লাগল, ফিরে দেখে গণুদার দুই চোখ চাপা আনন্দে চকচকিয়ে উঠেছে। ধীরাপদ অবাক, মতলবখানা কি গণুদার।

ঘরে ঢুকে ছড়ানো বিছানায় অমিতাভ আয়েস করে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। আধ-ময়লা বালিশ, আধ-ময়লা চাদর, ঘরেও এ পর্যন্ত ঝাঁট পড়েনি। কিন্তু যে এসেছে এ-সব দিকে তার চোখ নেই। ঘুরে ফিরে দুপুরের সেই মজার ব্যাপারটাই রোমন্থনের বস্তু হল আবার। বড় সাহেবের ঘর থেকে ধীরাপদ বেরিয়ে আসার পর ছোট সাহেব নাকি গুম একেবারে। কিন্তু আসলে দেখার মত হয়েছিল লাবণ্য সরকারের মুখখানা। লাভলি···! মামার কাজেও সায় দিতে পারে না, সতুর কথায়ও না, সী ইজ্ মোস্ট্ চার্মিং হোয়েন সী ইজ অন্ টু

বোট্‌ল—আমা ছিল বলে কোনরকমে লোভ সামলে বসেছিল অমিতাভ ঘোষ, নইলে কিছু একটা করেই বসত হয়ত।

কে বলবে অত বড় কোম্পানীর দোর্দণ্ড-প্রতাপ চীফ কেমিস্ট এই মানুষ। হাসছে ধীরাপদও, আর ভাবছে দিনটা শুভ বটে। এমন অপ্রত্যাশিত অতিথিকে এক পেয়ালা চা দিয়েও অভ্যর্থনার ব্যবস্থা নেই ঘরে। সঙ্গে গাড়ি আছে যখন, নিজের অসহায় অবস্থার কথা বলে তাকে নিয়ে আবার ভালো কোনো চায়ের দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বে কিনা ভাবছিল। এরই মধ্যে আর এক কাণ্ড।

গণুদা ঘরে ঢুকল, তার হাতে ট্রে একটা। ট্রেতে দু পেয়ালা চা। পিছনে মেয়ে উমা। তার দুই হাতে দুটো খাবারের ডিশ।

অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল, আসুন—আমি তো তাই ভাবছিলাম, ধীরুবাবু এখনো চায়ের কথা বলছেন না কেন! ধীরাপদর দিকে তাকালো, চারুমাসির মুখে শুনে শুনে আপনার ধীরু নাম বেশ মিষ্টি লাগে, ধীরাপদ নামটা বিচ্ছিরি।

ট্রে রেখে গণুদা মেয়ের হাত থেকে খাবারের ডিশ দুটো নিয়ে সামনে ধরল। নাম নিয়ে মাথা ঘামানোর ইচ্ছে নেই, প্রথম কথাটার সুতো ধরে সবিনয়ে বলল, আপনি এসেছেন কত ভাগ্য, ওকে বলতে হবে কেন—ঘরের তৈরী সামান্য জিনিস, সাহস করে আনতেই পারছিলাম না।

ধীরাপদ হাঁ করে গণুদাকে দেখছে, আতিথ্যের দায় উদ্ধার হল সে-কথাটা মনেও আসছে না। অমিতাভ ঘোষ ওদিকে ডিশের সাদা দ্রব্যটি গোটাগুটি মুখে পুরে দিয়ে চিবুতে চিবুতে গণুদার বিনয় বচন শুনল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, ঘরে থাকলে নারকেলের সন্দেশ সাহস করে আরো দু-চারটে নিয়ে আসুন তো।

গণুদা হন্তদন্ত হয়ে ছুটল আবার। অমিতাভ এদিকে ফিরে চোখ রাঙালো, আপনি বেশ আছেন দেখি মশাই, অ্যাঁ? এই জন্যেই এখানে ডেরা বাঁধা হয়েছে!

গণুদার কথা ভুলে কোম্পানীর দু আনার অংশীদার, চৌদ্দশ' টাকা মাইনের বিলেত-ফেরত চীফ কেমিস্টকে দেখছিল ধীরাপদ। বিধাতা খেয়ালী বটে।

সন্ধ্যার পর কুটির আঙিনা থেকে গাড়ির শব্দটা মেলাবার আগেই গণুদা হাজির। নাইট-ডিউটি আছে বোধ হয়, পরনে পাট-ভাঙা জামা-কাপড়। অতিথি-বিদায়ের অপেক্ষায় ছিল হয়ত। আগ্রহে আর চাপা আনন্দে এই মুখের

চেহারাই অন্যরকম। গলার স্বরে অকৃত্রিম বিস্ময়।—এর সঙ্গে তোমার এত খাতির জানতুম না তো! এঁদেরই কারখানায় চাকরি বুঝি তোমার? আশ্চর্য...

ধীরাপদ চেয়ে আছে। স্বার্থের উদ্দীপনা অনেকটা গিল্টিকরা গয়নার মত, নজর করে দেখলে চোখে পড়ে। স্বার্থটা কি সেটাই এখন পর্যন্ত ঠাওর করে উঠতে পারেনি।—আপনি এঁকে চেনেন কি করে?

আমি? শুধু আমি কেন, আমাদের কাগজের অফিসে কে আর না চেনে ওঁকে! ফর্সা মুখ হাসিতে ভিজিয়ে বিছানার একধারে বসে পড়ল গণুদা।

অতঃপর কাগজের অফিসে কতখানি পরিচিত এবং সম্মানিত ব্যক্তি অমিতাভ ঘোষ, সেই বৃত্তান্ত। খাতিরটা বছরান্তে মোটা টাকার বিজ্ঞাপন আসে বলে নয়, তাদের বর্তমান ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের অন্তরঙ্গ বন্ধু এই মিস্টার ঘোষ। এক-সঙ্গে বিলেত গেছে, একসঙ্গে ফিরেছে। আগে মাসের মধ্যে দু-তিন দিন অমিতাভ ঘোষ কাগজের অফিসে আসত, এলে দেড় ঘণ্টার আগে উঠত না। এখন অবশ্য কমই আসে, যাবার সময় ম্যানেজিং ডাইরেক্টার নিজে সঙ্গে করে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। তাদের ওষুধের কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে এতটুকু ভুল-চুক হলে মালিকের তলবের ভয়ে বিজ্ঞাপন ম্যানেজারের পর্যন্ত মুখ শুকোয়। আরো আছে, শহরের সব থেকে নামজাদা বিলিতি ক্লাবের মেম্বার দুজনেই, কালচারাল অ্যাসোসিয়েশানের—

ছেদ পড়ল। গণুদার দৃষ্টি অনুসরণ করে ধীরাপদ দেখল দরজার কাছে সোনাবউদি দাঁড়িয়ে। হারিকেনের আলোয় ঠিক ঠাওর হল না, তবু মনে হল মুখখানা হাসি-হাসি।

কাগজের অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের সঙ্গে অমিতাভ ঘোষের হৃদ্যতার খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই গণুদার এত উদ্দীপনার কারণ বোঝা গেছে। শেষ অবদানের প্রতীক্ষায় ধীরাপদ সশঙ্কে মুখ বুজে বসেছিল।

প্রস্তুতির মধ্যপথে ছন্দপতন।

সোনাবউদি ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াতে গোটা মুখের প্রত্যাশার আলোটা টুপ করে নিবিয়ে দিয়ে গণুদা বলল, অফিসের সময় হয়ে গেল, কাল কথা হবে'খন।

কাল কেন, আজই হোক না—সোনাবউদির গলায় কৃত্রিম আগ্রহ, একদিন না হয় দু ঘণ্টা দেরিতেই গেলে, না হয় না-ই গেলে অফিসে এক দিন—এ-সব কথা কি ফেলে রাখার কথা নাকি!

গণুদা সরোষে তাকালো তার দিকে, কিছু একটা কটূক্তি করে ওঠার মুখে থেমে গিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এখানে বকা-ঝকা করলে যার কাছে সুপারিশের প্রত্যাশা সে-ই বিগড়াতে পারে ভেবে সামলে নিল বোধ হয়। উল্টে হাসতেই চেষ্টা করল গণুদা, বলল, অফিসটা তো আর শ্বশুরবাড়ি নয়, অফিস কি জায়গা তোমার এই দেওরটিকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো—

সামনা-সামনি তোষামোদের ব্যাপারে তেমন সুপটু নয় গণুদা, ফলে আরো বিসদৃশ শোনালো। ভদ্রলোক চলে যেতে সোনাবউদির নির্বাক দৃষ্টিবাণ সরাসরি ধীরাপদর মুখে এসে বিদ্ধ হল। দ্রষ্টব্য কিছু দেখছে যেন।

বসুন না। ধীরাপদ খুব স্বস্তি বোধ করছে না।

বলতে হবে? বিনীত প্রশ্ন। ধীরাপদর মুখে বিব্রত হাসি। সোনাবউদির মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। মুখখানা অপরাধী অপরাধী। বলল, বিছানার চাদরটা তো ময়লা দেখি, বালিশের ওয়াড়গুলোও তাই—আমার কাছে সব ধোয়া আছে একপ্রস্থ, এনে পেতে দেব?

ধীরাপদ থতমত খেয়ে গেল কেমন।

ঘরের দিকে চেয়ে সোনাবউদি আরো সঙ্কুচিতা।—ঘরটায়ও ঝাঁট পড়েনি পর্যন্ত, আপনি দয়া করে একটু উঠলে ঝেড়ে-মুছে দিতাম।

ধীরাপদ ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

কুঁজোটায় জল ভরা আছে তো? হারিকেনে তেল?

ধীরাপদই আগে হেসে ফেলল, কি ব্যাপার?

সোনাবউদির আয়ত চোখ দুটো ওর মুখের ওপর এসে থামল এবার। ঠোঁটের ফাঁকে বিদ্রূপের আভাস। দেখল একটু।—কি ব্যাপার আপনি জানেন না?

জানুক আর না-জানুক ধীরাপদ মাথা নাড়ল, জানে না।

শুনুন তাহলে, সোনাবউদি বড় নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা, পুরুষের দশ-দশা, কখনো হাতী কখনো মশা—মশার দশা গিয়ে এখন আপনার হাতীর দশা চলছে।

এক পশলা ব্যঙ্গ ছড়িয়ে গজেন্দ্রগমনে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ধীরাপদর দু চোখ দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করেছে। তার পরেও বসেই আছে তেমনি।

ধীরাপদ গণুদার কথা ভাবছে। গণুদার প্রত্যাশার কথা বা আবেদনের কথা নয়।

গণুদা ঈর্ষার পাত্র, সেই কথা।

গণুদার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়াটাই শেষে ভাগিন্দের মত হয়ে দাঁড়াল। পাশাপাশি ঘরে বাস করে ধীরাপদ তাকে এড়াবে কেমন করে? যার একটু ইঙ্গিতে গণুদার জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে, একটা মাসের মধ্যে তাকে একবার অনুরোধও করা হল না দেখে গণুদা মর্মাহত। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকবার বলেছে, সুপারিশের জোর না থাকলে আজকাল কারো কিছু হয় না ভাই, এটা সুপারিশের যুগ।

ধীরাপদ জানে। জেনেও কিছু করে উঠতে পারে না। কেন পারে না গণুদা বুঝবে না। এই একটা মাসের মধ্যে সোনাবউদির সঙ্গে কমই দেখা হয়েছে। ধীরাপদর অনুমান, তার ওপরেও একটু-আধটু গঞ্জনা চলেছে। গণুদা ভাবে, স্ত্রীটি একবার মুখ ফুটে বললে অনুরোধ করা দূরে থাক, ধীরাপদ অমিতাভ ঘোষের কাঁধে চেপে বসত।

গণুদার চাকরির উন্নতি ধীরাপদর কাম্য। গণুদার জন্যে নয়, উন্নতি হলে সোনাবউদি আর একটু ভালো থাকবে, ছেলেমেয়েগুলো ভালো থাকবে। শুধু তাদের কথা ভেবেই অমিতাভকে অনুরোধ করার ইচ্ছে আছে। ফাঁক পেলে করবেও। কিন্তু ফ্যাক্টরীর পরিবেশে অমিতাভ ঘোষ ভিন্ন মানুষ। শুধু একটা ভ্রূকুটিতে অনুরোধটা উড়িয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। অনেক ভেবেচিন্তে ধীরাপদ গণুদাকে আশ্বাস দিয়েছিল, সুবিধেমত আর একদিন তাকে সুলতান কুঠিতে ধরে নিয়ে আসবে। খামখেয়ালী লোক, একবার পারব না বলে বসলে আর তাকে দিয়ে কিছু করানো যাবে না।

কিন্তু সেই আশায়ও সম্প্রতি ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে বসেছে গণুদার।

ইতিমধ্যে ফ্যাক্টরীতে ধীরাপদর প্রতিপত্তি বেড়েছে কিছু। বাড়ছেও। তারও মূলে চীফ কেমিস্ট। তানিস সর্দার আরোগ্য-পথে। এখনো বেশ কিছুকাল হাসপাতালে থাকতে হবে বটে, কিন্তু প্রাণের আশঙ্কা নেই। তার চিকিৎসার অপ্রত্যাশিত সুব্যবস্থার ফলে কর্মচারীরা দল বেঁধে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিল চীফ কেমিস্টকে। তানিস সর্দার সর্দার গোছেরই একজন। সে হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে তাকে বসা-কাজে লাগানো হবে, এমন কথাও শোনা গেছে।

অমিতাভ ঘোষ সরাসরি ধীরাপদকে দেখিয়ে দিয়েছে। যা কিছু হয়েছে তার জন্যেই হয়েছে, আর যেটুকু হবার আশা তার জন্যেই হবে। অতএব সব কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ তারই প্রাপ্য। কর্তাদের সঙ্গে কি ভাবে ঝকাঝকি করে সুব্যবস্থাটুকু আদায় করেছে ধীরাপদ, মনের আনন্দে অমিতাভ ঘোষ তাও

ধনঃসঙ্কোচে বসে গিয়েছে।

ফলে কর্মচারীরা নতুন চোখে দেখেছে ধীরাপদকে। নিস্পৃহতার দরুন ছোট সাহেবের প্রতি, অন্যথায় লাবণ্যর প্রতিও অনেকদিনের ক্ষোভ তাদের। অভিযোগ নিয়ে অথবা সুব্যবস্থার আরজি নিয়ে এ পর্যন্ত বহুবার তারা দল বেঁধে চড়াও হয়েছে। সব অভিযোগ আর সব আরজিই যে যুক্তিসঙ্গত তা নয়। টানা-হেঁচড়ায় কখনো কিছুটা আদায় হয়েছে কখনো বা হয়নি। কিন্তু হোক না হোক, তাদের অস্তিত্বের লাগামটি যে শেষ পর্যন্ত মালিকের হাতেই, সেটা তাদের উপলব্ধি করতে হয়। এরই মধ্যে মালিকের সঙ্গে যুঝে তাদের জন্যে সুবিধে আদায় করেছে একজন, সেটা যেমন বিস্ময়ের তেমনি আনন্দের। তানিস সর্দারের এই প্রাপ্তিটুকু অসময়ে নিজেদেরও একটা প্রাপ্য নজির হিসেবে দেখেছে তারা।

তাদের সোজাসুজি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উৎসাহ দেখে ধীরাপদ অপ্রস্তুতের একশেষ। জনতার কৃতজ্ঞতায় ভেজাল নেই।

এরপর ছোট সাহেবের বিরূপতার আঁচ গায়ে লাগবে এটা ধীরাপদ ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু বিরূপতার আভাস মাত্র না পেয়ে মনে মনে অবাক হয়েছে। অবশ্য পরে এর একটা কারণ অনুমান করেছে। ছেলেটার বয়স তো মাত্র আটাশ-উনত্রিশ, তার ওপর অলস গোছের, একটু বিলাসীও। ভিতরে ভিতরে সবল নয় খুব। যা কিছু জোর আর প্রতিপত্তি সব বাপের জোরে, তাঁর প্রবল সত্তার নিরাপদ ছায়ায় বসে। সেই বাপই যখন প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তার তিক্ততা বাড়িয়ে কাজ কি? অন্যের দায়িত্বের ওপর নির্ভর করে নিজের আধিপত্যের ঠাটটুকু বজায় থাকলেই সে খুশি। বাপের সেদিনের ফয়সালার দরুন লোকটাকে উল্টে আরো একটু বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে হয়ত। ফলে ধীরাপদর খানিকটা দায়িত্ব বেড়েছে আর ছোট সাহেবের কিছুটা অবকাশ বেড়েছে।

কিন্তু বাপের প্রভাব যত বড়ই হোক, ছেলের যা কিছু উদ্দীপনার উৎস লাবণ্য সরকার। সেই লাবণ্য সরকারও বদলেছে। ছোট সাহেবের মনে বিরূপতার ইন্ধন যোগানো দূরে থাক, ধীরাপদর সঙ্গে তারও ব্যবহার ক্রমশ সহজ হয়ে উঠেছে। এক-আধ সময় খোঁচা দিয়ে কথা বলতে ছাড়ে না অবশ্য, কিন্তু যাই বলুক হৃদ্যতার ছলে-বলে, হাসিমুখে বলে।

বড় সাহেবের ঘরে তানিস সর্দারের কেস নিয়ে কথা কাটাকাটির দিন-দুই পরে লাবণ্য তার ঘরে এসে বসেছিল। কাজের কথা নিয়েই এসেছিল বটে, কিন্তু ধীরাপদর ধারণা এমনি এসেছিল। সর্দারের প্রসঙ্গ নিজেই উত্থাপন

করেছে। মন্তব্য, লোকটার বরাত ভালো, ওদের জন্তে কে আর এতটা করে।

প্রকারান্তরে সমর্থনের সুরই।

ধীরাপদ বলেছিল, হাসপাতালে ওর বউটার সেই কান্না দেখলে আপনিও না করে পারতেন না—

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ওপর ছদ্ম-বিস্ময় মেশানো কৌতুক-বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে একটা।—তাই নাকি! আপনি আসলে সেদিন ওর বউটার সেই কান্না দেখেই অমন ক্ষেপে গিয়েছিলেন তাহলে!

ধীরাপদ হালকা প্রতিবাদ করতে ছাড়েনি।—আমি ক্ষেপতে যাব কেন, আপনাদেরই বরং মেজাজ বিগড়েছিল।

আমারও? আমার বিগড়োতে যাবে কেন, আমার কী?

ভিতরে ভিতরে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল ধীরাপদ।—আমিও তাই ভাবি, আপনার সঙ্গে অন্তত আমার কোনো বিরোধ থাকার তো কথা নয়।

লাবণ্য সরাসরি চেয়েছিল মুখের দিকে, অবলার প্রতিমূর্তিটি।—অথচ বিরোধ দেখছেন!

ধীরাপদ হেসে ফেলেছিল, আমি দেখি না-দেখি আপনি যে আমাকে ভালো চোখে দেখেন না সেটা তো ঠিক।

সঙ্গে সঙ্গে নারী-মুখের এক বিচিত্র মাধুর্য-তরঙ্গ দেখেছিল ধীরাপদ। লোভ সামলে দৃষ্টি ফেরাতে পারেনি। চাপা হাসিতে দুই ঠোঁট টসটসিয়ে উঠতে দেখেছিল। মুখে কৃত্রিম সঙ্কট-রেখা। চোখের পাতায় কৌতুক কাঁপছিল।—আপনাকেও ভালো চোখে দেখতে হবে?

অসহায় দীর্ঘনিঃশ্বাস। অর্থাৎ, কত আর পারি। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে তারপর।—আচ্ছা, দেখব চেষ্টা করে।

ইচ্ছে করলে বা প্রয়োজন হলে লাবণ্য সরকার কতটা পারে সে সম্বন্ধে ধীরাপদর মোটামুটি একটা ধারণা ছিল। সিতাংশু মিত্রের মোটরে তাকে এক রকম দেখেছে, হিমাংশু মিত্রের মোটরে আর এক রকম। মেডিক্যাল হোমের নিস্পৃহ কর্ত্রীর গাম্ভীর্যে তাকে এক রকম দেখেছে, চিকিৎসার পসারে আর এক রকম। ওষুধের লাইসেন্স বার করে আনার সুপারিশে গিয়ে তাকে এক রকম দেখেছে, অমিতাভ ঘোষের ছবির অ্যালবামে আর এক-রকম।

আর, এই আরো এক রকম দেখল।

ধীরাপদর ইচ্ছে হচ্ছিল, তাকে ডেকে চেয়ারে এনে বসায় আবার। বসিয়ে বলে, চেষ্টাটা আজ থেকেই শুরু হোক।

লাবণ্য সরকারের সঙ্গে আপসের সূত্রপাত নেই। তারপর এ পর্যন্ত ওতে -বড় রকমের কোনো ঘা পড়েনি বটে, কিন্তু মাঝে-মধ্যে চিড় খেত। তার কারণ, তার লঘু ঠাট্টা বা টিপ্পনীর জবাবে ধীরাপদও একেবারে চুপ করে থাকত না। আর বলত যখন কিছু, একেবারে ইঙ্গিতশূন্যও হত না সেটা। কিন্তু তা বলে লাবণ্য সরকারের হাসিমুখের ব্যতিক্রম দেখেনি খুব। কখনো সহাস্যে হজম করেছে, কখনো বা ছদ্মরাগে চোখ রাঙিয়েছে, আপনি লোক সহজ নন অনেক দিনই জানি, লাগতে আসাই ভুল।

কিন্তু সেদিন এর স্পষ্ট ব্যতিক্রম দেখে ধীরাপদ অবাক।

উপলক্ষ অমিতাভ ঘোষ।

তারই উদ্যমে এদিককার কাজের ধারায়ও একটা স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। সেদিন মোটরে ধীরাপদর অনুযোগ আবেদন আর নিজের প্রতিশ্রুতি ভোলেনি সে। ধীরাপদ কাজ দেখতে চেয়েছিল, তাকে দিয়ে কাজ দেখিয়েই ছাড়ছিল। দুপুরের মধ্যে নিজের কাজ সেরে রাত নটা-দশটা পর্যন্তও ধীরাপদর ঘরে কাটাতে দেখা গেছে তাকে। এরপর ক্রমশ চিরাচরিত বিজ্ঞাপন-নক্সার তফাত লক্ষ্য করেছে সকলে, প্রচার-বিবৃতির উন্নতি দেখেছে, আর সব থেকে বেশি দেখেছে কার্টনিং আর লেবেলিংএর বিশেষ আকর্ষণ-বিন্যাস। নিজের হাতে কাঁচি ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক-একটা লেভেল মক্স করেছে অমিতাভ ঘোষ, কাগজের রঙ নিয়ে আর শেড নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, এমন কি কোন্ প্যাকিংএ কোন্ কাগজ দেবে তাই নিয়েও অনেক ভেবেছে। এমন সমাহিত তন্ময়তা ধীরাপদ আর বড় দেখেনি। উন্নতির জন্য কি ভাবে ভাবতে হবে আর কোন্ পথে মাথা খাটাতে হবে সেই হদিস অন্তত ধীরাপদ পেয়েছে।

এই নতুন উদ্দীপনার ফলাফল বোঝা গেছে মাস দেড়েকের মধ্যেই। মনে মনে একটু ভয় ছিল ধীরাপদর, পরিবর্তনের ফলে খরচ কিছু বাড়ছিল, সেটা উশুল হবে কি না। সেল্-গ্রাফের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত, সেটা মাথা উঁচিয়েছে। পরিচিত ডাক্তারদের মন্তব্য অনুকূল, লেবেলিং কার্টনিং সুন্দর হচ্ছে, ফোল্ডার ভালো হচ্ছে। অন্যদিকে 'জি-আর' কমেছে, অর্থাৎ প্যাকিং-সৌষ্ঠবের দরুন গুডস্ রিটারন্ড্ বা মাল ফেরত কম আসছে।

ফ্যাক্টরীতে সেদিন হিমাংশু মিত্র নিজেই ধীরাপদর ঘরে এলেন। সঙ্গে লাবণ্য। বড় সাহেব ফ্যাক্টরীতে এলে সাধারণত সে-ই সঙ্গে থাকে। ধীরাপদর পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করলেন তিনি, তার সুবিধে-অসুবিধের খোঁজ নিলেন, নতুন প্ল্যান ভাবতে বললেন, টাকার জন্যে ভাবনা নেই সে-কথাও

জানিয়ে দিলেন। এমন কি, কিছু একটা অন্তরঙ্গ রসিকতার মুখে লাবণ্যকে দেখেই যে থেমে গেলেন তাও বোঝা গেল।

দরজা পর্যন্ত গিয়েও ফিরে এলেন আবার। ভালো কথা, ওই সর্দার লোকটি কেমন আছে ?

ভালো।

শুভ। চলে গেলেন।

একটু বাদেই লাবণ্য সরকার ফিরে এসে তার সামনের চেয়ারটায় বসল। বলল, আপনার মুখখানা একবার দেখতে এলাম।

ধীরাপদ জবাব দিল, এমন অবিচার কেন, সেটা কি দেখার মত ?

আজ বেশ দেখার মত, হিংসেয় আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।

ধীরাপদ হেসে ফেলল।—সাহেব তো নতুন প্ল্যান ভাবতে বলে গেলেন, এরই কোনো ওষুধ বার করা যায় কিনা ভাবা যাক আসুন তাহলে।

গত দেড় মাসে এখানকার কাজে সুফল যা-কিছু হয়েছে অমিতাভ ঘোষের জন্যেই হয়েছে, সেটা হিমাংশু মিত্র যেমন জানেন লাবণ্যও তেমনি জানে। তাকে যে এর মধ্যে টেনে আনতে পেরেছে সেটাই ধীরাপদর সব থেকে বড় কেরামতি। লাবণ্যও সেটা মনে মনে অস্বীকার করে না। তবু একটা টিপ্পনীর লোভ সংবরণ করে উঠতে পারল না। বলল, বসে বসে বড় সাহেবের প্রশংসা তো খুব শুনলেন, আপনার গুরুর নাম তো কই করলেন না একবারও ?

যত হাল্কা করেই বলুক, কথাটা খচ করে লাগার মতই স্থূল। এই খোঁচাটা দেবার জন্যেই আবার ফিরে আসা কিনা বুঝতে চেষ্টা করল ধীরাপদ। হাসিমুখে সেও পাল্টা খোঁচা দিয়ে বসল একটা, কাজ ফুরোলে গুরুর নাম কে আর করে। আপনি করেন ?

হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল লাবণ্য সরকার। থমকালো। সাদা আলোর ওপর ঘন ছায়া পড়লে যেমন ঘোলাটে দেখায় তেমনি দেখতে হল মুখখানা। মেডিক্যাল হোমের সামান্য কর্মচারী ভ্রমে তার ধৃষ্টতা দেখে যে-চোখে তাকাতো সেই চোখে তাকালো। তারপর একটি কথাও না বলে চুপচাপ উঠে চলে গেল।

ধীরাপদ যতই অপ্রস্তুত হোক, মনে মনে অবাক হয়েছে অনেক বেশি। এতটাই লাগবে ভাবেনি। লাগলেও সেটা প্রকাশ করার মেয়ে নয় লাবণ্য সরকার। কিন্তু কতটা বিঁধেছে স্ব-চক্ষেই দেখল।

এর পর তিন-চার দিন একেবারে অন্যরকম। লাবণ্য সরকার তাকে যেন

চেনেও না ভালো করে। এভাবেই কাটত হয়ত আরো কিছুদিন। কাটল না যে-জন্যে সে-ও এক মন্দ ব্যাপার নয়।

গণুদার ধৈর্য গেছে তার আঁচ পাচ্ছিল, তা বলে বে-পরোয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত সে ফ্যাক্টরীতে হানা দেবে ভাবেনি। তাকে সঙ্গে করে ঘরে এনে হাজির অমিতাভ ঘোষ নিজেই। তার বাক্যছটা থেকে বোঝা গেল, বাইরে গেট-কিপারের জেরার মুখে পড়তে হয়েছিল গণুদাকে। তারা ধীরুবাবুও চেনে না, ধীরাপদও চেনে না। চক্রবর্তী সাহেব বা সুপারভাইজার সাহেবকে চেনে। নিরুপায় গণুদা শেষে অমিতাভ ঘোষের নাম করতে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে এখানে।

গণুদা বিব্রত মুখে হাসতে চেষ্টা করছিল, ফর্সা মুখ লাল। ধীরাপদ বড় চাকরি করে এটুকুই জানা ছিল, এমন পরিবেশে আর এমন ঘরে বসে চাকরি করে ভাবতে পারেনি।

কিছু বলতে হলে এটাই অনুকূল মুহূর্ত। ধীরাপদ সিগারেটের টিন এগিয়ে দিল তাড়াতাড়ি, বসুন. গণুদা কিন্তু আসলে আপনার কাছেই এসেছেন—

আমার কাছে! সিগারেট ধরিয়ে ফিরে তাকালো, আমার কাছে কী?

গণুদার দিকে চেয়ে হাসি পাচ্ছিল, লজ্জায় একেবারে অধোবদন। কি সেটা ধীরাপদই ব্যক্ত করল। আর করল যখন জোর দিয়েই করল। গণুদার মত এমন যোগ্য লোকের প্রতি এই দীর্ঘকালের অবিচার শুধু মাত্র তাঁর সুপারিশের জোর নেই বলে। উপসংহার, অমিত ঘোষের সঙ্গে আলাপের পর এখন আর জোর নেই বলা চলে না।

অমিতাভ সিগারেট টানল আর গম্ভীর মুখে শুনল। গাম্ভীর্যটুকু একজনের সঙ্কোচ এবং আর একজনের শঙ্কার কারণ। ধীরাপদর বক্তব্য শেষ হতেই সে বলে উঠল, আমার দ্বারা কি-স্-সু হবে না। গণুদার দিকে ফিরল, চারটে-ছটা নারকেলের সন্দেশে এত হয় না, এক কুড়ি চাই। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল, আসুন—

ধীরাপদ ইশারা না করলে গণুদা বোকার মত বসেই থাকত হয়ত। উঠে শশব্যস্তে অনুসরণ করল। তার মতি-গতি গণুদার বোঝার কথা নয়, ধীরাপদ বুঝেছে। পাশের ঘরের টেলিফোনে সুপারিশ-পর্বটি এক্ষুনি সমাধা করে ফেলতে চলল।

শেষ পর্যন্ত এত সহজে দায় উদ্ধার হবে ধীরাপদ ভাবেনি। অমিতাভ ঘোষকে ওভাবে উঠতে দেখেই ধরে নিয়েছে, তার সুপারিশও ব্যর্থ হবে না।

কিন্তু এক মিনিটও হয়নি বোধ হয়, ধীরাপদ হকচকিয়ে গেল একেবারে।

গণুদা ফিরে এসেছে। সমস্ত মুখ শুকনো আমসি।

"কি হল ?

জবাবে গণুদা পাংশু মুখে শুধু মাথা নাড়ল একটু অর্থাৎ, হল না কিছুই। তারপর চেয়ারে বসে বিড়বিড় করে বলল, কি আর হবে, কপালই মন্দ।

মন্দ কপালের বিবরণ শুনে ধীরাপদও নির্বাক। বেশ হাসিখুশি মুখেই ভদ্রলোক গণুদাকে সঙ্গে করে পাশের ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। ঘরের মধ্যে ফিটফাট সাহেবী পোশাক-পরা একজন লোক একটি মেয়ের সঙ্গে খুব গল্প করছিল। মেয়েটি চেয়ারে বসে ছিল, আর লোকটি তার টেবিলের ওপর বসে তার দিকে ঝুঁকে কথা কইছিল আর হাসছিল। মেয়েটিও হাসছিল। তারা ওভাবে ঢুকে পড়তে লোকটি বিরক্ত মুখে ফিরে তাকিয়েছিল, তারপর একটু অবাক হয়েছিল হয়ত। গণুদার মুরুব্বীটি রাগে লাল হয়ে তক্ষুনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাকে বলেছে পরে আর একদিন দেখা যাবে। তারপর গনগনে মুখে বারান্দা পেরিয়ে নিচে নেমে চলে গেছে।

ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, ঘরে মেম-টাইপিস্ট ছিল কিনা। কি ভেবে সেটা আর জিজ্ঞাসা করল না। আশ্বাস দিয়ে মন্দ-কপাল গণুদাকে বিদায় করল আগে। তারপর হাতের কাজ একদিকে সরিয়ে রেখে কলম বন্ধ করল। কাজ আর আজ হবে না।

চীফ কেমিস্টের হঠাৎ অমন মেজাজ বিগড়েছে নীতির কারণে নয়। ওদের অন্তরঙ্গতা বরদাস্ত হয়নি তাই। কিছু যেন ভাবার আছে ধীরাপদর। ভাবনাটা অমিত ঘোষকে নিয়ে। অমিত ঘোষকে নিয়ে আর লাবণ্য সরকারকে নিয়ে। অমিত ঘোষকে নিয়ে আর ফোটো অ্যালবামের পার্বতীকে নিয়ে।

ভাবনা জমে উঠতে না উঠতে সুবাঞ্ছিত বিঘ্ন আবার। অবশ্য ঘড়ির দিকে চোখ পড়লে ধীরাপদ দেখত, কোথা দিয়ে ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেছে এরই মধ্যে। দুখানা চিঠি হাতে লাবণ্য সরকার ঘরে ঢুকল ; তিন-চার দিন আগে সেই উঠে গিয়েছিল আর এই এলো। সেদিনের সেই বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নেই। লঘু, রমণীয় ছন্দে আবির্ভাব।

চিঠি দুটো তার সামনে টেবিলের ওপর ফেলে দিল।—আপনার জন্যে আমাদের চাকরি শেষ পর্যন্ত থাকলে হয়, আপনি আসার আগে এখানে যেন কাজই হত না কিছু।

ধীরাপদ চিঠি দুটোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার। মামুলী প্রশংসার চিঠি দু-পাঁচ লাইন করে। নানা জায়গা থেকে এ-রকম ভালো-মন্দ চিঠি দিনে

এক-আধ ডজন জমে থাকে। তা ছাড়া এই চিঠির প্রশংসাও আলাদা করে ধীরাপদরই প্রাপ্য নয়।···চিঠি ছুতো উপলক্ষ মাত্র, চিঠি হাতের কাছে না থাকলেও এই আমন্ত্রণ ঘটতই। ধীরাপদ হেসে তাকালো, বসুন—

বসব না, বেরুব এক্ষুনি—খুশি তো?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, তারপর মন্তব্য যোগ করল।—এই চিঠির জন্যে নয়, আপনাকে খুশি দেখে।

উৎফুল্ল বিস্ময়, আমাকে আবার অখুশি দেখলেন কবে?

ধীরাপদর মনে হল কিছু একটা আনন্দের উৎসে নাড়া পড়েছে। সেই প্রসন্নতার উঁকিঝুঁকি। বিগত ক'টা দিনের বিরূপতা সত্ত্বেও এখন এ-ঘরে একবার আসার লোভ সংবরণ করতে পারেনি। 'এসেছে দেখতে। দর্পণে দেখতে।

ওকে দেখার ভিতর দিয়ে আর কাউকে দেখার তুষ্টি।

জবাব শুনবে বলেই যেন টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু কিছু বলার আগে সিতাংশু মিত্রকে দরজার ওধারে দেখা গেল। লাবণ্য সরকার সোজা হয়ে দাঁড়াল।—রেডি? চলুন। হাসতে হাসতে বলে গেল, খুশি-তত্ত্ব নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

চেয়ার ছেড়ে পায়ে পায়ে ধীরাপদ জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। নিচেটা দেখা যায়। গাড়ি-বারান্দা থেকে সিতাংশু মিত্রের সাদা গাড়ি বেরুলো। সিতাংশু চালকের আসনে। পাশে লাবণ্য। হাসছে। ঘাড় ফিরিয়ে যেদিকে তাকিয়ে আছে সেই দিকে চীফ কেমিস্টের অবস্থান। দোতলার জানলা থেকে ও-দিকটা চোখে পড়ে না।

। দশ ।

কপাল সত্যিই মন্দ নয় গণুদার।

সেদিনের মত মেজাজ বিগড়লেও অমিত ঘোষ তার আবেদন ভোলেনি। ধীরাপদর সামনেই যথাস্থানে টেলিফোন করেছে একদিন। সুপারিশের ছলে অভিযোগ, যোগ্য লোক বছরের পর বছর ধরে হেজে-পচে মরছে সেদিকে চোখ নেই কেন কর্তাদের? গণেশবাবু প্রুফ-রিডারকে সাব-এডিটার আর কবে করা হবে?

গণুদার প্রত্যাশা মিথ্যে নয়, ওটুকুতেই কাজ হয়েছে। মহৎজন তাকালেও

কুমুরজনের কপাল মেরে। গণুদার ফিরেছে। গণুদা সাব-এডিটার হয়েছে। সেটা এত তাড়াতাড়ি যে বিস্ময়ে আর আনন্দে গণুদা নিজেই আত্মহারা।

পরিতোষণ শুধু একটা আর্ট বিশেষ। তোষামোদ যে করে আর যে তাতে তুষ্ট হয় দুজনের মনের তারে মিল হওয়া চাই। অমিলটা জলের ওপর তেলের মত চোখে লাগে। গণুদা সেই মিল বোঝে না, মেলানোর আর্ট জানে না। তার সাম্প্রতিক স্নেহের টানটা ধীরাপদর গলায় ফাঁসের মত আটকে বসার দাখিল। তাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুই-এক পশলা বচসা হয়ে গেছে তাও জানে। বিস্তৃত ভাবে না জানলেও আঁচ পেয়েছে। উমা বুঝতে শিখছে একটু-আধটু, আর ধীরুকার ওপর তার এমনই টান যে, যেটুকু বোঝে গোপনে ফাঁস না করে পারে না। অবশ্য তার বলাটা বাপের দিক টেনেই—বাবা চায় ধীরুকার আগের মতই তাদের ওখানে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হোক। উমাও তাই চায়। উমা আর তার বাবার মত মা যে ধীরুকাকে অত ভালবাসে না, মায়ের রাগ আর অবুঝপনা দেখে উমা এই গোপন সত্যটাও প্রকাশ না করে পারেনি।

মনে মনে গণুদার ওপর ভয়ানক বিরক্ত হয়েছে ধীরাপদ। সোনাবউদির ওপর খুশি হওয়ার কথা, তাও হয়েছে। কিন্তু অভিমানে মনে মনে ক্ষুব্ধও হয়েছে একটু। বাইরে চির খেলেও আর একটা অদৃশ্য যোগ পুষ্ট হয়ে উঠছিল। এটুকুর প্রতিই ধীরাপদর লোভ। কিন্তু সম্প্রতি সোনাবউদি সেটুকুই ছেঁটে দিয়েছে একেবারে। তার নির্বাক আচরণ প্রায় রূঢ়। মেয়েটা পর্যন্ত এসে দু দণ্ড বসতে পায় না, আসতে না আসতে ঝাঁজালো ডাক শুনে বা ভ্রূকুটির তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালায়।

পরিতোষ-কলার ব্যাপারে গণুদার যোগ্য দোসর রমণী পণ্ডিত। তাঁকে ঠেকানো শক্ত। পাহাড়ী জলের ধারার মত বার বার ঠোক্কর খেয়েও তিনি বক্তব্য-কেন্দ্রে এসে পৌঁছুবেনই। কুমুর সেই শাস্তির ব্যাপারের পর থেকে তাঁকে এড়িয়ে চলছিল ধীরাপদ। তাঁকে কুমুকে দুজনকেই। কিন্তু রমণী পণ্ডিত না-ছোড়। গণুদার পদোন্নতিতে তাঁর কৃতিত্ব কম নয় কারো থেকে। গণুদার হবে যে, সে ঘোষণা তিনিই করেছিলেন—করেছিলেন বলেই যা কিছু চেষ্টা-চরিত্র। নইলে হাত-পা গুটিয়ে বসেই থাকত হয়ত। অবশ্য গণুদা যে তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ সে-জন্যে, সেটা রমণী পণ্ডিত স্বীকার করেছেন। গণুদার খুব ইচ্ছে, তাঁদের দুজনকে বাড়িতে একদিন ভালো করে খাওয়ায়—তাঁকে আর ধীরাপদকে। কিন্তু তার স্ত্রীটি একেবারে বেঁকে বসেছে বলে পণ্ডিতের কাছে দুঃখ করছিল সেদিন, আর, একটা বড় রেস্তরাঁয় তাঁদের নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে বলছিল।

ধীরাপদর মনোভাব উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন রমণী পণ্ডিত, উচ্চস্তরের মন্তব্য করেছেন তারপর, কি দরকার এ-সবের, কোন প্রত্যাশা নিয়ে তো কেউ আর উপকার করতে যায়নি, ভালো হয়েছে সেই ভালো। পণ্ডিতের কালো মুখে অন্তরঙ্গ হাসি, কিন্তু তাঁর স্ত্রীটি হঠাৎ অমন বেঁকে বসলেন কেন সেটাই আশ্চর্য। —আমি না হয় বলতে গেলে বাইরের লোক, আপনি তো আর সে-রকম নন, কারো উপকার ছাড়া অপকার কোনদিন করেননি।

ধীরাপদ সবিনয়ে তাঁকে উঠতে বলবে ভাবছিল। রমণী পণ্ডিত তাও অনুমান করলেন কি না কে জানে। কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন চট করে, ভদ্রলোক দুঃখ করছিল বলেই বলা, নইলে এ-সব নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়। ঘুরে ফিরে নিজের দুরবস্থার প্রসঙ্গে এসে গেলেন তিনি, ধীরাপদর অনুগ্রহে বইয়ের বিজ্ঞাপন আর কবিরাজী ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখে সামান্য কিছু পাচ্ছেন বটে, কিন্তু তাতে কি আর হয়—এর ওপর মেয়েটা বড হয়ে গেল, তার বিয়ের ভাবনা। একটা জ্যোতিষীর ঘর নিয়ে বসতে পারলে সব দিকে সুরাহা হয়, নইলে তো দু বেলা আহার জোটানোই শক্ত, কোন দিকে যে তাকাবেন…

পণ্ডিত উঠে যাবার পর ধীরাপদ নিজের মনেই হেসেছে অনেকক্ষণ। ব্যাপার বড মন্দ হল না। এই সুলতান কুঠিতে এক সোনাবউদি ছাডা আর কেউ তাকে দেখতে পারত না। এখন সকলেই আপনজন তার। চাকরিতে উন্নতি হয়েছে বলে গণুদা খুশি তার ওপর, রমণী পণ্ডিত বিজ্ঞাপনের কাজ পেয়ে। একাদশী শিকদার আর একখানা বাংলা কাগজ পেয়ে খুশি আর শকুনি ভটচায চ্যবনপ্রাস পেয়ে। মাঝখান থেকে আপন যে ছিল সে-ই শুধু দূরে সরে আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় সুলতান কুঠির আঙিনায় একটা পুরনো গাডি দাঁডানো দেখে ধীরাপদ অবাক। কার কাছে কে এলো আবার। জামা-কাপড বদলে সুস্থ হয়ে বসার আগেই চমকে উঠতে হল। আগন্তুক একজন নয়, দুজন—তারা পাশের ঘর থেকেই বেরুলো। একজন ডাক্তার, হাতে স্টেথোসকোপ আর ডাক্তারি ব্যাগ, সঙ্গের লোকটির হাতে কি সরঞ্জাম দুই একটা, ধীরাপদ ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারল না। পিছনে গণুদা।

কার অসুখ? কি অসুখ?

ধীরাপদ দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ভদ্রলোকদের বিদায় দিয়ে গণুদা সামনে এলো। মুখে সলজ্জ হাসি।

ডাক্তার কেন?

ইয়ে, একটা ইন্‌সিওরেন্স করলাম, অফিসের ওই ভদ্রলোক ধরল খুব, তাছাডা

পণ্ডিতমশাইও পরামর্শ দিলেন—

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ধীরাপদ ঘরে চলে এলো। কিন্তু গণুদার ইনসিওরেন্স বৃত্তান্ত শেষ হয়নি, তাছাড়া একটু গল্প করার ইচ্ছেও প্রবল বোধ হয়। সময় বা সুযোগ হয়ে ওঠে না বড়। গণুদাও ভিতরে এসে দাঁড়াল।

ইন্‌সিওরেন্স গণুদা একার নামে করেনি, স্বামী-স্ত্রী দুজনের নামে করেছে। দশ হাজার টাকার। একজনের অবর্তমানে আর একজন পাবে। এই বয়সে প্রিমিয়াম একটু বেশিই হল, কিন্তু ছেলে-মেয়ের কথা ভেবে না করেও পারল না। অনুমোদনের আশায় জিজ্ঞাসা করল, ভালো করিনি ?

জয়েন্ট ইন্‌সিওরেন্স শুনে ধীরাপদ তাজ্জব, এ বুদ্ধি আবার গণুদাকে কে দিলে! বলল, ভালোই তো—

বীমা-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গণুদা অমিতাভ ঘোষের কুশল-সমাচার জিজ্ঞাসা করল, তার মহত্ত্বের কথা বলল। বিকেলে একদিন তাকে চায়ে ডাকা আর এক বাক্স নারকেলের সন্দেশ পাঠানোর অভিলাষও ব্যক্ত করল। ধীরাপদর কোনরকম আগ্রহ না দেখে দ্বিধান্বিত একটু, অসন্তুষ্ট হবেন নাকি ?

হতে পারে। এ-সবের দরকার নেই।

থাক তাহলে এখন। গণুদার ভালো-মন্দের সে-ই যেন একমাত্র পরামর্শ-দাতা।

তাকে বসতে পর্যন্ত বলেনি ধীরাপদ, আপাতত ঘর থেকে বেরুলে খুশি হয়। কিন্তু গণুদার যাবার ইচ্ছে নেই। এ-রকম অবকাশের মধ্যে পেয়ে সুপরিকল্পিত সদিচ্ছাটা চাড়িয়ে উঠতে লাগল, স্ত্রীকে দিয়ে হল না দেখে চিড়-খাওয়া আত্মীয়তাটুকু এই ফাঁকে নিজেই জুড়তে বসল সে। কিন্তু বাকপটু নয় রমণী পণ্ডিতের মত, একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলতে গেলে মুখ লাল হয়, খেই হারায়।—ইয়ে, একটা কথা তোমাকে বলব ভাবছিলাম, তোমার বউদিকে তো চেনই—নিজের দেওরের মতই দেখে তোমাকে, তুমি গরদ এনে দিয়েছিলে কত খুশি—কিন্তু ভয়ানক অবুঝ, একটু-আধটু ভুল বোঝাবুঝি হলেও আবার কি মিলেমিশে থাকে না কেউ ?

ধীরাপদর দৃষ্টিটা থরথরে হয়ে উঠছে গণুদা লক্ষ্য করল না। বলল, কিন্তু ভয়ানক জিদ, মেয়েছেলের এত জিদ—কথাটা কিছুতে আর তাকে দিয়ে—

কী কথা ?

কণ্ঠস্বরটা কানে লাগল খট করে। গণুদা সচকিত। ঢোঁক গিলে তাকালো, এই বলছিলাম, আগের মতই আবার—

কেন বলছিলেন ?

গণুদা হকচকিয়ে গেল, মুখ শুকলো। তবু সামলাতে চেষ্টা করল কোন-প্রকারে, তোমার খাওয়াদাওয়ার অসুবিধের জন্যে…

আমার অসুবিধে তাতে আপনার কী ? অস্বাভাবিক রূঢ়তায় গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল আরো, আপনারা ডাকলেই আমি যাব ভেবেছেন কেন ? কেন আমার প্রসঙ্গে এ-সব আলোচনা হয় আপনাদের ? কেন অন্য লোকের সঙ্গে পর্যন্ত আপনি আমার ব্যাপার নিয়ে কথা বলেন ?

নিস্পলক মুহূর্ত গোটাকতক। বেত্রাহতের মত পাংশু মুখে গণুদার প্রস্থান।

ধীরাপদ বিছানায় এসে বসল। খানিক বাদে নিজের এই অস্বাভাবিক উত্তেজনায় নিজেই হতভম্ব। এ আবার কি কাণ্ড করে বসল! একটা তুচ্ছ কারণে, প্রায় অকারণেই—এভাবে নিজের ওপর নিজের দখল হারিয়ে বসল কি করে ? কেন ?

কতক্ষণ বসে ছিল ঠিক নেই, এক ঘণ্টাও হতে পারে, দশ মিনিটও হতে পারে। অটুট গাম্ভীর্যে সোনাবউদিকে সরাসরি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

দু হাত কোমরে, কুঁদুলী মেয়ের মত সোনাবউদি ঝাঁজিয়ে উঠল, আপনি মশাই আমার ঘরের লোককে এভাবে অপমান করেন কোন্ সাহসে শুনি ?

ধীরাপদ বিমূঢ় খানিকক্ষণ। ওর নিজের ধৈর্যচ্যুতি যেমন অস্বাভাবিক, এই গাম্ভীর্য আর এই কটুভাষণও তেমনি বিসদৃশ। কিন্তু উষ্ণ হয়ে উঠতে গিয়েও কেমন মনে হল, ঠকবে তাহলে। জবাব দিল, ঘরের লোককে এবার থেকে ঘরে আটকে রাখবেন তাহলে।

কী ? আবার কথা টকটকিয়ে! আরো গরম হয়ে চোখ পাকালো সোনা-বউদি, আপনি না হয় আছেনই ছ শ টাকা মাইনের চাকুরে, আপনার দৌলতে না-হয় হয়েছে বড় একটা প্রমোশন, না-হয় এসেই ছিল আপনাকে একটু তোয়াজ-তোষামোদ করতে—তা বলে লোকটাকে আপনি ঘর থেকে অপমান করে তাড়াবেন ?

পাকানো-চোখের দুই তারায় চাপা কৌতুক উপচে উঠতে লাগল, ভুরুর ঘন কুঞ্চন-প্রয়াসে তরল রেখা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, আর রূঢ় গাম্ভীর্য চিরে হাসির বিজলি ঝলসে উঠতে লাগল। শেষে সমস্ত চাপা অভিব্যক্তিটা গোটা-গুটিই ভেঙে গড়ল একসঙ্গে, প্রতিরোধের চেষ্টায় বারকয়েক ফুলে ফুলে উঠে হাসির দমকে সোনাবউদি মেঝের ওপরেই লুটিয়ে বসে পড়ল।

বেদম হাসি।

ধীরাপদ দেখছে। দু চোখ ভরে দেখছে। চোখের স্নায়ুতে স্নায়ুতে আর গলার কাছে একটা অব্যক্ত অনুভূতি তরল হবে ঠেলে আসতে চাইছে তার। খুশিতে আনন্দে ধীরাপদ বিব্রত বোধ করছে।

হাসির ধকল সামলে স্থির হয়ে বসতে চেষ্টা করল সোনাবউদি। কি একটা গ্লানি ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার যেন। বলল, দু ঘণ্টাও হয়নি দশ হাজার টাকার লাইফ ইন্‌সিওর করে উঠল, মনে কত আনন্দ—আপনি দিলেন সব পণ্ড করে! আমি আর যে সে লোক নই, কোনরকমে একবারটি মরতে পারলেই করকরে দশ হাজার টাকা পাইয়ে দিতে পারি বুঝলেন?

জীবন-বীমার এই যুগ্ম ধারাটিই গণুদা বেছে নিল কেন সেটা ধীরাপদর মাথায় ঢোকেনি তখনো। ওতে কিস্তির হার বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। হয়তে ওটাই ভালো বলে বুঝিয়েছে কেউ তাকে। হতেও পারে ভালো, ধীরাপদর বীমার ব্যাপার জানা নেই। সোনাবউদির কৃত্রিম দম্ভের জবাবে সেও ঠাট্টাই করল।—আমি তো দেখছি আনন্দের বদলে ভদ্রলোকের কপালে দুঃখ আছে, আপনার ওই মরাটুকু হয়ে না উঠলেই তো সব গেল।

মরা হবে না বলেন কি! দু চোখ টান করে ফেলল সোনাবউদি, তারপরেই হেসে অস্থির আবার।—ইন্‌সিওর করার তাগিদ অবশ্য আমিই দিয়েছিলাম, কিন্তু ডবল ইন্‌সিওর হল কেন তাও বুঝছেন না? দুজনের কুষ্টি ঘাঁটাঘাটি করে গণকঠাকুরটি তো কবেই ভরসা দিয়ে রেখেছেন, দজ্জাল বউ বেশি দিন জ্বালাবে না, অনেক আগেই চোখ বুজবে! চোখ বোজার আনন্দে আবারও চোখ বড় করে ফেলল সোনাবউদি, দজ্জাল হই আর যাই হই, গেলে দুঃখ কম হবে ভাবেন নাকি! ওই দশ হাজার টাকার স্মৃতিটুকুই যা সান্ত্বনা তখন। আনন্দে আমার এক্ষুনি মরতে ইচ্ছে করছে।

ধীরাপদ হাঁ করে শুনছিল প্রথম। তারপর হেসে ফেলেছিল। কিন্তু হাসিটা থাকেনি বেশিক্ষণ। কেন জানি মনে হয়েছে, হাতে ক্ষমতা থাকলে জীবনবীমার এই যুগ্ম ধারাটা সে নাকচ করে দিত। যুক্তি থাক আর নাই থাক, মৃত্যুকে মাঝে রেখে এই বণিকের সাবধানতা ধীরাপদর ভালো লাগল না।

সোনাবউদি প্রসঙ্গ ঘোরালো, ঘরে গিয়ে মুখ কালো করে শুয়ে পড়ল একে-বারে, কি বলেছেন?

ধীরাপদ যথার্থ ই লজ্জা পেল এবারে, যা বলেছে নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য।

সোনাবউদি দেখল একটু, তারপর টিপ্পনী কাটল, আপনার আবার এত তেজ

হল কবে থেকে ?

এবারে জবাব দিল, বলল, যেদিন থেকে আপনি দুর্ব্যবহার শুরু করেছেন আমার সঙ্গে।

আমি! কি দুর্ব্যবহার ? জবাবের অপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে ছদ্ম-প্রত্যাশায় ফিসফিসিয়ে উঠল, কেমন ব্যবহার করতে হবে ?

চেষ্টা করে আহত সুরটাই বজায় রাখল ধীরাপদ, জোর দিয়ে বলল, গণুদার চাকরির উন্নতিটা তাঁর নিজের চেষ্টাতেই হয়েছে, আমি কিছুই করিনি। আমার ওপর রাগ কেন আপনার…কিছু যদি করতামও সেটা অনুগ্রহ ভাববেন আপনি ?

সোনাবউদি মুখের দিকে চেয়ে ছিল। চেয়েই রইল খানিক। এই চাউনিটুকু দিয়েই তার অভিযোগ মুছে দিল যেন। তারপর হাসল একটু, কি ভাবব ?

ধীরাপদ জবাব দিল না। জবাবের প্রত্যাশাও করল না সোনাবউদি। হঠাৎ নিজের ভিতরেই তলিয়ে গেল যেন। খানিক আগের চপলতা নিশ্চিহ্ন। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল, অন্যমনস্কের মত বলল, রাগ ঠিক নয়, কি জানি কি ভয় একটা।…অনেক লোভে শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষতি, বোধ হয় সেই ভয়। এবারে বড় করেই নিঃশ্বাস ফেলল, এত রাতে আপনি আর বাইরে খেতে বেরুবেন না, বসে থাকুন।

ধীরাপদ বসেই রইল।…

রণু হলে বলত বোধ হয়, তোমার সব ভয়-ভাবনা এবার থেকে আমার কাঁধে চাপিয়ে দাও সোনাবউদি। ধীরাপদরও ইচ্ছে করছিল তাই বলতে।

মাসের প্রথম শনিবার।

মেডিক্যাল হোমের কর্মচারীদের মাইনের দিন। বেলা চারটে নাগাদ পরিচিত স্টেশান ওয়াগনটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। ভিতরে বাইরে তিন শিফ্‌টের বেতন-প্রত্যাশীরা অপেক্ষা করছিল। ম্যানেজার থেকে ঝাড়ুদার পর্যন্ত। এই একদিন গাড়িটা দুটো-আড়াইটের মধ্যে এসে যায়। আজ আসছিল না বলে মনে মনে সকলেই উৎকণ্ঠিত ছিল একটু। এবারে শনিবার পড়েছে মাসের ছয় তারিখে। দিনগুলোকে শনিবার পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে আসতে প্রাণান্ত। তারপর যদিই বা এলো, মাইনে হবে কি হবে না সে-সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ ছিল। গাড়ি দেখে নিশ্চিন্ত তারা।

লাবণ্য সরকার নয়, টাকার ব্যাগ হাতে ধীরাপদ নামল গাড়ি থেকে।

তাকে কেউ আশা করেনি বটে, কিন্তু দেখে অবাকও হল না খুব। হবার কথাও নয়। কারণ, লাবণ্য সরকারের অনুপস্থিতিতে আর কেউ টাকা নিয়ে আসবে সেটাই আশা করছিল তারা। মহিলাকে না দেখে সকলেই বুঝে নিল সে আজও ফেরেনি।

গত চার দিন আসেনি লাবণ্য সরকার, সে কলকাতায় নেই তাও সকলেই জানে।

ক'মাসের মধ্যে মেডিক্যাল হোমে এই প্রথম পদার্পণ ধীরাপদর। ইচ্ছে করলে এক-আধবার আসতে পারত। ইচ্ছে একেবারে হয়নি কখনো তাও নয়। তাছাড়া ফাঁকমত এখানকার কাজ দেখাশুনা করাটাও চাকরির অঙ্গ। কিন্তু তেমন কোনো উপলক্ষ হয়নি বলেই আসেনি। তাকে নিয়ে এখানে যে প্রহসন ঘটে গেছে, অকারণে আসাটা চাকরির দাপট ভাববে সকলে। সেই সঙ্কোচে আসেনি। নইলে ম্যানেজারের না হোক, রমেন হালদারের মুখখানা অন্তত একবার দেখার লোভ ছিল ধীরাপদর।

আজ যে আসবে নিজেও জানত না।

এই আসার পিছনে ফ্যাক্টরীতে আজকের নীরব বৈচিত্র্যটুকু উপভোগ্য। কিন্তু বড় সাহেব হিমাংশু মিত্রের সামনে তেমন উপভোগ্য মনে হয়নি, তাঁর চাপা রাগ লক্ষ্য করে ধীরাপদ বরং হকচকিয়ে গিয়েছিল।

সকলেই জানে কোম্পানীর কাজে দু-তিন দিনের জন্য ছোট সাহেবের সঙ্গে লাবণ্য সরকারেরও বোম্বাই যাওয়া প্রয়োজন হয়েছে। কোম্পানীর কাজে বোম্বাই দূর নয় মোটেই। আকাশ-পথে ঘণ্টা কয়েকের ব্যাপার মাত্র। আর যে যাই ভাবুক, লাবণ্যর যাওয়াটা ধীরাপদ অন্তত খুব দরকার মনে করেনি। সেখান থেকে নিয়মিত কাঁচা মাল আমদানীর ব্যাপারে মাঝে মাঝে গোলযোগ হচ্ছে বলে যাওয়া। সিতাংশু মিত্র একা গেলেই হত। ওষুধের সরকারী অনুমোদন লাভের তদ্‌বিরে গিয়ে বড় সাহেব যেমন লাবণ্য সরকারকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, সিতাংশুরও হয়ত সেই একই উদ্দেশ্য। কিন্তু অন্তস্তলের আর কেউ উদ্দেশ্যের এই একমাত্র সাদাসিধে ব্যাখ্যাটাই মেনে নিতে রাজী নয়। তার ভ্রূকুটি কুটিলতা ভরা। তাছাড়া, আর একটা সাদা কথা, এই ক'টা দিন অফিস নীরস লেগেছে ধীরাপদর।

কিন্তু লাবণ্য সরকারের বোম্বাই যাওয়ার খবরটা যে হিমাংশু মিত্রও জানতেন না, ধীরাপদ একবারও কল্পনা করেনি। তিনি ফ্যাক্টরীতে এসেছেন তাও জানত না, ঘরে ডাক পড়তে অবাক হয়েছিল। গিয়ে দেখে গম্ভীর। তারপর প্রশ্ন

শুনে হতভম্ব।

সতুর সঙ্গে লাবণ্যও বম্বে গেছে ?

ধীরাপদ জবাব দিতে পারেনি, মাথা নেড়েছিল হয়ত।

কাল সকালে বাড়িতে এতক্ষণ কথা হল, একবারও বলোনি তো ?

যেন ওরই অপরাধ কিছু। কোনো স্বাস্থ্য-সাময়িকীতে ভেষজ-উৎপাদন সমস্যাগত রচনা লেখার আলোচনায় গতকাল তাঁর বাড়িতে অনেকক্ষণই কেটেছে বটে। মেজাজ বেশ প্রসন্ন ছিল বড় সাহেবের। এইসব নীরস লেখার মধ্যেও ধীরাপদর কাব্য-ভাবের ব্যঞ্জনা নিয়ে ঠাট্টা পর্যন্ত করেছেন। মন্তব্য, ও বা ওর বউ দুজনের একজন কবিতা লেখে নিশ্চয়। বউ নেই শুনে পাইপ দাঁতে চেপে লঘু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, হোয়াই ? এনি হার্ট-ব্রেকিং অ্যাফেয়ার ?

ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায়, সেই ছেলেবেলার শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারোনি নাকি হে!

এর মধ্যে লাবণ্য সরকার কলকাতায় আছে কি নেই—এটা যে একটা বলার মত খবর, একবারও মনে হয়নি। আজই বা হঠাৎ কার কাছে শুনলেন, কে জানে।

জবাব না পেয়ে ঈষৎ রুক্ষস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করেছেন, তার যাওয়ার দরকার হল কেন ? বলে গেছে কিছু ?

ধীরাপদর এবারও বাক-নিঃসরণ হয়নি, মাথা নেড়েছে। চকিতে আর এক-দিনের কথা মনে পড়েছে তার। লাবণ্য সরকার ছেলের সঙ্গে কথা কইছেন শুনে যেদিন নিজের গাড়িতে ওকে ডেকে নিয়েছিলেন। সেদিনও এমনি বিরক্তি লক্ষ্য করেছিল, তবে এতটা নয়।

হিমাংশু মিত্র বলেছেন, এভাবে গেলে তাদেরও বলে যাওয়া দরকার, তোমারও জেনে রাখা দরকার। মেডিক্যাল হোমের মাইনের দিন আজ, মাইনে যেন হয়—।

আর কিছু বলেননি। মেডিক্যাল হোমের মাইনের দিনের কথা ধীরাপদর মনেও ছিল না। উনি বলে না গেলে গণ্ডগোল কিছু হতই, মাইনে হতই না হয়ত। তবু ধীরাপদর ধারণা, বড় সাহেবের এই উষ্মা সেই ত্রুটির সম্ভাবনার দরুন নয় আদৌ। এত বিরক্তির কারণ তাঁর অগোচরে ছেলের সঙ্গে লাবণ্য সরকার গেছে বলে।

ডাক্তারের চেম্বারে বসে লাবণ্যর মত ধীরাপদও ম্যানেজারকেই ডাকল প্রথম।

দু-হাত একবার কপালে ঠেকিয়ে ম্যানেজার কলের মত সামনে এসে দাঁড়ালেন। আজকের এই বিপরীত পরিস্থিতিটি উপভোগ্য। আদেশের অপেক্ষায় প্রসারিত দুই গোল চোখ ওর মুখের ওপর স্থির।

বসুন, বসুন। হাসিমুখে অন্তরঙ্গ আপ্যায়ন জানালো ধীরাপদ, মিস সরকার আজও ফেরেনি, এদিকে কি ভাবে কি হয় আমি তো কিছুই জানি নে—আপনি একটু সাহায্য করুন।

পদস্থ ওপরঅলার এ হৃদ্যতায় খুব বিশ্বাসী মনে হল না ভদ্রলোককে। কলের মতই বসলেন, পে-শিটএর নাম আর টাকার অঙ্কগুলো দেখে নিয়ে মুখ তুললেন। অর্থাৎ ঠিক আছে।

ধীরাপদ প্রথমেই তাঁর মাইনেটা দিয়ে নিল। তারপর একে একে নাম ডেকে চলল। ম্যানেজার টাকা গুনে দিতে লাগলেন। কিন্তু ভদ্রলোক যে একটুও সহজ হতে পারছেন না তা বোঝা যায়। যারা মাইনে নিয়ে যাচ্ছে তারাও যেন চুপচাপ তাদের ম্যানেজারের নীরব বিড়ম্বনাটুকু উপলব্ধি করে যাচ্ছে।

বেশ জনাকতক বাকি তখনো। একজন মাইনে নিতে এসে জানালো, চারটের ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ এসে বসে আছেন এবং বাইরে থেকেই দু-চার জন রোগী বিদায় করেছেন।

এই সুযোগে ম্যানেজারকেই অব্যাহতি দিল ধীরাপদ।—আপনি তাঁকে একটু বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলে দিন, আর এ ক'টা পেমেণ্ট আমি নিজেই করে দিচ্ছি।

যন্ত্রচালিতের মতই ম্যানেজার উঠে গেলেন।

সব শেষে রমেন হালদারের ডাক পড়ল। দারোয়ান বেয়ারা ঝাড়ুদারেরও পরে। ধীরাপদ ইচ্ছে করেই আগে ডাকেনি।

শুকনো মুখ, চকিত চাউনি। একে একে সকলের মাইনে হয়ে যেতে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল হয়ত। কিন্তু ছেলেটা বোকা নয়, একনজর চেয়েই বুঝল সকলের পরে ডাক পড়াটা কোনরকম ভুল বা অবহেলার দরুন নয়, উল্টে পক্ষপাতিত্বসূচক।

ধরীপদ মিটিমিটি হাসছিল।—বোসো।

বিনয়ের বিঘ্ন দূর করে বসল কোনরকমে। মাইনে নিল। টাকা ক'টা গুনে নেবার বাসনা থাকলেও ক্ষণিকের দ্বিধা কাটিয়ে পকেটে রাখতে গেল।

গুনে নাও, সকলকে দিয়েথুয়ে নিচ্ছ, কম বেশি হতে পারে।

সলজ্জ হাসি। গুনল। নিশ্চিন্ত।

ভালো আছ?

হ্যাঁ। লাজুক লাজুক সঙ্কোচ, আপনি ভালো আছেন ?

ধীরাপদর মজা লাগছে।—ভালো আছি কি নেই একবার গিয়ে তো দেখে আসতে পারতে। ক'মাসের মধ্যে একবারও তো এলে না। মনেই ছিল না বুঝি ?

ছিল। ঠিক সাহস হয়নি সার···

সার ? হাসি সামলে ধীরাপদ ভুরু কোঁচকাতে চেষ্টা করল।—সার কি হে ! তুমি সার বলতে নাকি আগে ?

ওরই মুখে শোনা লাবণ্য সরকারকে দিদি ডেকে বিপাকে পড়ার গল্পটা মনে পড়ে গেল। কিন্তু ছেলে সেয়ানা। আনন্দে বিনয়ে আটখানা হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করল যেন, আগের মতই দাদা ডাকব ?

না। ঠাকুরদাদা বলবে। হেসে ফেলল, আর তাহলে আমার সঙ্গে পার্টনার-শিপের ওষুধের দোকান করবে না ঠিক করেছ তুমি ?

কি যে বলেন দাদা···। যেন কত ছেলেমানুষি স্বপ্নের জাল বুনেছে একদিন সেটা নিজেই বুঝেছে এখন।

কিন্তু সঙ্কোচ আর বেশিক্ষণ থাকল না। খুশিতে আনন্দে চাপা গলায় এরপর অনেক কথাই বলে ফেললে সে। দাদা এমন একজন পদস্থ ব্যক্তি কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি, দাদা এত সরল আর নিরহঙ্কার বলেই···। এইজন্যেই অমন গণ্ডগোলটা হয়ে গেল, মিস সরকার পর্যন্ত জানত না, অন্যের আর দোষ কি। আর কারো কথা বলতে পারে না কিন্তু ও নিজে খুব খুশি হয়েছে। কদিন তো দোকানে শুধু তাঁর কথাই আলোচনা হয়েছে। প্রথম প্রথম সকলেই ভেবেছে জেনারেল সুপারভাইজার সাহেব এবারে শোধ নিয়ে ছাড়বে, ম্যানেজার অন্তত মজাটি টের পাবেন। শুধু রমেনেরই তা মনে হয়নি একবারও, তার ঠিক বিশ্বাস ছিল দাদাটি কক্ষনো ও-রকম লোক নয়।

একসঙ্গে এত কথা বলতে পেরে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল রমেন হালদার। ধীরাপদ টিপ্পনী কাটল, এত বিশ্বাস যে দাদাকে সার বলছিলে।

কি করব, রমেন নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে প্রায়, এতদিনের মধ্যে আপনি একদিনও এলেন না, সাহস হয় কি করে। একটু থেমে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, এবার থেকে আপনিই আমাদের মাইনে দেবেন বুঝি ?

সেটা কি তোমার ভালো লাগবে খুব ?

রমেন লজ্জা পেল আবারও। লাবণ্য সরকারকে নিয়ে অনেকদিন অনেক বে-ফাঁস কথা বলেছে। কদিন নেই বলে কত নীরস লাগছে, আগে হলে তাও

রসিয়ে ব্যক্ত করত হয়ত। আজ একদিনে এতটা পেরে উঠল না। সত্যি হোক মিথ্যে হোক সামনের মুরুব্বীটিকে তোয়াজ করল, আপনি দিলে ভালো লাগবে।

আলাপে ছেদ পড়ল, ভিতরের দরজা ঠেলে ম্যানেজার গলা বাড়ালেন। ছোকরা অর্থাৎ রমেন কেমন জমিয়ে বসেছে একনজরে দেখে নিয়ে সংবাদ দিলেন, ফ্যাক্টরী থেকে চীফ কেমিস্ট টেলিফোনে জানিয়েছেন, তিনি এখানে আসছেন—তাঁর জন্যে যেন অপেক্ষা করা হয়।

গল্প আর জমল না। দু-পাঁচ মিনিট বসে থেকে রমেন হালদার উঠে গেল।

নির্দেশ শুনে ধীরাপদ অবাকই হয়েছে। কি আবার দরকার পড়ল হঠাৎ! কিছুদিন ধরে লোকটির মেজাজের হদিস পাচ্ছিল না আবার। যতদিন হাতে ধরে কাজ-কর্ম শেখাচ্ছিল, এক-রকম ছিল। ভারী কাছে পেয়েছিল অমিতাভ ঘোষকে ওই ক'টা দিন। এখন আবার কিছু একটা পরামর্শের জন্যে গেলেও রুক্ষ মূর্তি। অথচ ফ্যাক্টরীর কাজেও খুব যে ব্যস্ত তা মনে হয় না। নিজের চেয়ারে কমই দেখা যায় তাকে। বেশির ভাগ সময় হয় অ্যানালিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টএ নয়ত লাইব্রেরীতে সন্ধান মেলে তার। কিছু একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ মাথায় ঢুকেছে হয়ত। তার এ ধরনের এক-একটা ঝোঁকের গল্প ধীরাপদ জুনিয়ার কেমিস্টদের মুখে শুনেছে। তখন কাছে গেলেও বিরক্তি।

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধীরাপদ অনুভব করলে চীফ কেমিস্টের মেজাজ চড়া। কিন্তু কতটা চড়া আর কি কারণে চড়া তখনো কল্পনা করতে পারেনি। হড়বড় করে এলো, ইশারায় তাকে ডেকে দোকান ছেড়ে ফুটপাথে এসে দাঁড়াল।

দোকানের লোক তটস্থ।

শীতের শেষ হলেও সন্ধ্যা উত্তীর্ণ ততক্ষণে। কোম্পানীর স্টেশন ওয়াগনটার সামনে আর কোনো গাড়ি চোখে পড়ল না। অমিতাভ ঘোষ ট্রাম বা ট্যাক্সিতে এসেছে। নিজের পুরনো গাড়িটা তাকে কমই চালাতে দেখেছে। অত ধৈর্য নেই বলেও হতে পারে আবার চারুদির নিষেধের দরুনও হতে পারে। তাকে স্টিয়ারিংএ বসতে দেখলেই চারুদির নাকি বুক কাঁপে। যে অন্যমনস্ক, কখন কার ঘাড়ে গাড়ি তুলে দেবে ঠিক নেই। চারুদিকে বলতে শুনেছে, ছোঁড়া হাড়-কেপ্পন, চোদ্দশ টাকা মাইনে পায়, তার ওপর ব্যবসার লাভ—ব্যাঙ্কের টাকায় ছাতা পড়ছে, না কিনবে একটা নতুন গাড়ি না রাখবে একটা ড্রাইভার।

ওই গাড়িটা আপনি এনেছেন ?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, সে-ই এনেছে।

সরাসরি গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল সে, পিছনে ধীরাপদ। ড্রাইভার ঘাড় ফেরালো, সপ্রশ্ন প্রতীক্ষা, অর্থাৎ কোন্ দিকে যেতে হবে?

পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করতে করতে ইশারায় সামনের রাস্তা দেখিয়ে দিল।

সিগারেট ধরানো হল। চুপচাপ খানিকক্ষণ। অপরিচিত যাত্রীর মত গম্ভীর মুখে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে।

কোথায় যাচ্ছি?

চারুদির বাড়ি। সংক্ষিপ্ত জবাব।

রকম-সকম দেখে ধীরাপদ ঘাবড়ে যাচ্ছিল। কোনো খারাপ খবর কিনা বুঝছে না। জিজ্ঞাসা করল, সেখানে হঠাৎ?

ঘুরে বসল।—আমাকে যাবার জন্য টেলিফোন করেছিল। আপনার যাবার ইচ্ছে না থাকলে নেমে যান।

ধীরাপদ হাসি চাপল। কারণ না জানলেও মেজাজ গরম কতখানি বুঝেছে। তার হেপাজতে গাড়ি, তাকেই নেমে যেতে বলা।

কিন্তু এই রাগ সবটাই যে ওরই ওপর, ধীরাপদ স্বপ্নেও ভাবেনি। বক্রোক্তি শুনে সচকিত। নিজের অগোচরে পকেটের প্যাকেট হাতড়াচ্ছে আবার। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা ওর মুখের ওপর।—আপনি কাজটাজ আজকাল তাহলে ভালোই দেখাচ্ছেন?

এটাই প্রশ্ন নয়। নিরীহ মুখে চুপচাপ প্রতীক্ষা করাই সমীচীন মনে হল ধীরাপদর।

আর ঠিক এই কারণেই হঠাৎ একেবারে যেন ফেটে পড়ল লোকটা।—হাঁ করে দেখছেন কি, কাজ দেখাবার খুব শখ, না? কেন আপনি মাইনে নিয়ে এলেন? নিজের কাজ ফেলে কেন আপনি এ-সব কাজ করবেন?

ধীরাপদ বিমূঢ় খানিকক্ষণ। আক্রমণটা এই পথে হবে ভাবা শক্ত।—না করলে আজ এদের মাইনে হত কি করে?

ফুটন্ত তেলের ওপর জলের ছিটে পড়ল যেন।—না হলে না হত, তাতে আপনার অত মাথা-ব্যথা কিসের?

দুর্বোধ্য রাগের ঝাপ্‌টায় ধীরাপদ নাজেহাল। হঠাৎই আবার মনে হল, লাবণ্য সরকার সিতাংশুর সঙ্গে বোম্বাই গেছে, হিমাংশু মিত্র সে-খবরটা আজই পেলেন কেমন করে? অমিতাভই বা হঠাৎ এমন ক্ষেপে উঠল কেন, তার কি অভিলাষ ছিল?

ধীরাপদ আবারও বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করল তাকে, লোকগুলো এই একটা দিনের আশায় সারা মাস কাজ করে, তাদেরও ঘর-সংসার ছেলেপুলে আছে, মাসের এই ছ তারিখেও মাইনে না পেলে তাদের ভয়ানক কষ্ট হত—

থাক্ থাক্! সরোষে আধখাওয়া সিগারেটটা পায়ে করে পিষল বারকতক।—তারা কষ্টে পড়ত—পড়ত, তাতে আপনার কি?

অন্ধ রাগ যুক্তি দিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা বিড়ম্বনা। ধীরাপদ চুপ। কিন্তু এই মুহূর্তে তাও বরদাস্ত হল না, অমিতাভ সশ্লেষে বলে উঠল, ফিরে এসে ওই মেয়ে আপনাকে খুব ধন্যবাদ দেবে ভেবেছেন, কেমন?

—তাই তো। নরম হবার ফলে বার বার ঘা পড়ছে দেখে ধীরাপদ অন্য রাস্তা ধরল, আমাকে চারুদির বাড়ি ধরে নিয়ে চলেছেন কেন, বিচার-টিচার করবেন?

একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অমিতাভ পকেটে হাত ঢোকালো আবার। সিগারেট চাই। প্যাকেট আর শলাই পাশে রেখেছে খেয়াল নেই। ধীরাপদ ঝুঁকে সে দুটো তুলে তার হাতে দিল। তারপর শান্ত অথচ ঈষৎ ঝাঁজালো স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে? অবুঝের মত এভাবে মাথা গরম করছেন কেন?

জবাবে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে সরোষে জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল সে।

একটু অবকাশ দিয়ে ধীরাপদ আবারও তেমনি জোর দিয়ে বলল, কারো ধন্যবাদের ধার ধারি না, আপনার মামা বলেছেন মাইনে যেন হয়, তাই দিয়েছি। এতে অপরাধটা কোথায় হল জানলে বোঝা যেত···মুখের ওপর পারব না বলে দিলে আপনি খুশি হতেন?

জানলা থেকে মুখ ফেরালো। সিগারেটটা ধরানো হয়নি। মামার কথায় মাইনে নিয়ে এসেছে জানত না বোঝা গেল। গলার স্বরও উগ্র নয় অতটা।—মামা কখন বলেছে?

দুপুরে, ফ্যাক্টরীতে।···তাঁকেও বিরক্ত দেখলাম খুব, মিস সরকারও বম্বে গেছেন জানতেন না।

রাগের বদলে আগ্রহ দেখা গেল ঈষৎ।—কি বলেছে?

বলেননি কিছু। ধীরাপদ হাসল, তিনিও আপনার মতই অসন্তুষ্ট আমার ওপর, কেন গেল, কি বৃত্তান্ত কিছু খবর রাখি নে কেন! তবে, মনে হয় আসল রাগটা মিস সরকার গেছেন বলেই।

তপ্ত মেজাজ ঠাণ্ডা। শেষ বচনে তাপ মোচন। তবু সশ্লেষে বলে উঠল, রাগ হবে না! কত বড় মহারথীর মেয়ে পাকড়াও করবেন ছেলের জন্যে,

ভবিষ্যতের কত আশা। এই যদি মনে ছিল, ছেলেকে না সামলে এতদিন চোখ বুজে ছিল কেন ?

ধীরাপদ মেজাজের উজানে পড়েছিল এতক্ষণ। এবারে স্রোতের মুখে, খুশির মুখে। এই এক খবরেই টান-ধরা স্নায়ু সুস্থ হয়েছে বোঝা গেল। আর কিছু বলল না দেখে কৌতূহল চেপে জিজ্ঞাসা করল, তা তো হল, কিন্তু আপনার ব্যাপারখানা কী ? ও বেচারাদের আজ মাইনে হল বলে আপনি অমন রেগে গেলেন কেন ? আপনার যেন কিছু একটা উদ্দেশ্য পণ্ড হল মনে হচ্ছে ?

অনেক মানসিক রোগ আছে যা রোগী নিজে দেখতে পেলে সারে। অন্তস্তলের তেমনি একটা বক্র ইচ্ছার ওপর একঝলক আলোকপাত হল যেন। তবু গোঁয়ারের মতই অমিতাভ জোর দিয়ে বলল, হয়েছে তো, আপনি সর্দারী করতে গেলেন কেন ?

কেন গেল সে কৈফিয়ৎ ধীরাপদ আগেই দিয়েছে। ডাক্তার মেয়ের সঙ্গে ছেলের ঘনিষ্ঠতায় মামাটির আপত্তির একটা কারণ শোনা গেল। কিন্তু এই স্বার্থটাই সব মনে হয়নি। কথাপ্রসঙ্গে আরো কিছুর আঁচ পাবে ভেবেছিল। কিন্তু প্রসঙ্গের আপাতত ওখানেই ইতি। অমিতাভ বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ছিল। ড্রাইভারের উদ্দেশে হঠাৎ নির্দেশ দিল সামনের মোড়ের মাথায় গাড়িটা একটু রাখতে।

কিছু না বলেই গাড়ি থেকে নেমে গেল। অদূরে ফুটপাথ-ঘেঁষা লাইট-পোস্টের উল্টো দিকে ফোটো-স্টুডিও। সেখানেই গেল। ফোটোর কথা মনে হলেই ধীরাপদ অস্বস্তি বোধ করে কেমন। একটা অননুভূত প্রলোভন উঁকিঝুঁকি দেয়, সেটা নির্মূল করার তাড়নায় নীরব যোঝাযুঝি চলে খানিক।...ক্যামেরা নেই সঙ্গে, রাত করে ওখানে আবার কি কাজ পড়ল এখন! হয়ত ছবি ডেভেলপ করতে দিগেছে, নয়ত ফিল্ম-টিল্ম কিনবে কিছু।

অদূরের লাইট-পোস্টের ওধারে চোখ পড়তেই বিষম চমকে উঠল ধীরাপদ। সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি একটা।

বীটার রাইস।

আশ্চর্য, মেয়েটার কথা ধীরাপদর মনেও পড়েনি এতদিন!

বাস-স্টপে প্রতীক্ষারত সেই দেহ-পসারিনী মেয়ে। যৌবন বিকি-কিনির আশায় যে-কোনো আগন্তুকের প্রত্যাশায় যে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই ক্ষীণ তনু, সেই কটকটে লাল ব্লাউজ, সেই ঝকমকে ছাপা শাড়ি, সেই দগদগে প্রসাধন, সেই

সব-কিছু। মেয়েটা জায়গা বদল করেছে, এলাকা বদল করেছে। এক জায়গায় পসার বেশিদিন চলে না বলে পসারিনী জায়গা বদল করেছে।

বীটার রাইস! বীটার রাইস! বীটার রাইস!

আশ্চর্য! বার বার আউড়েও শব্দ ছুটো স্নায়ুতে স্নায়ুতে সে-ভাবে আর ঝনঝনিয়ে উঠছে না। শিরায় শিরায় সে-ভাবে আর তরল আগুন ছড়াচ্ছে না। তেতো-চাল কটু-চাল কষা-চাল? না, জুতসই বাংলা খোঁজার তাড়নায় ভিতরটা সে-ভাবে আর উদগ্র হয়ে উঠছে না। ছবিটা যে দেখাই হল না শেষ পর্যন্ত সেই খেদও তেমন করে আর উপলব্ধি করছে না।

মেয়েটা জায়গা বদল করেছে…। ধীরাপদ কী বদল করেছে?

মোড়ের মাথায় আলো কম একটু। মেয়েটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। গাড়ির দরজা খোলা, ধীরাপদ ও-ভাবে চেয়ে আছে বলেই এগিয়ে আসছে। প্রত্যাশার সম্ভাবনা কতটুকু, দেখতে এগিয়ে আসছে।

ধীরাপদ চেয়ে আছে চিত্রার্পিতের মত।

মেয়েটারও চেনা-চেনা লাগল বোধ হয়। লাগাই স্বাভাবিক। অনেকদিন দেখেছে। একেবারে কাছাকাছি মুখোমুখিও দেখেছে। গাড়িটার পাঁচ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে গেল সে। আর নড়ল না। প্রসাধনের ফাটলে ফাটলে হাসির রেখা গোটাকতক, চোখের তারায় আমন্ত্রণের প্রত্যাশা একটু, একটুখানি ইঙ্গিতের আশা।

হঠাৎই চমকে উঠে হাত দুই দূরে সরে গেল মেয়েটা। ধীরাপদরও হুঁশ ফিরল যেন। সামনেই একটা প্যাকেট হাতে অমিতাভ ঘোষ। সবিস্ময়ে ধীরাপদর দিকে তাকালো একবার, তারপর অদূরবর্তিনীর দিকে। বুঝে উঠছে না কি ব্যাপার।

মেয়েটার মুখে আশাভঙ্গের ক্ষোভ। তবু আশাটা গোটাগুটি বিসর্জন দিয়ে উঠতে পারছে না বোধ হয়। একটু একটু করে সরে যাচ্ছে বটে, কিন্তু দৃষ্টিটা এদিকেই। যাচাইয়ের দৃষ্টি। এতটুকু ইশারার আঁচ পেলে আবার দাঁড়াবে। আবার এগোবে।

উঠে আসুন।

ধীরাপদর ডাকে অমিতাভ গাড়িতে উঠে বসল। দরজা বন্ধ করল।

গাড়ি চলল।

কি ব্যাপার? মেয়েটিকে চেনেন নাকি?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল। চেনে।

ওভাবে দাঁড়িয়ে ছিল কেন? কি বলছিল?

বলছিল না কিছু, শুধু এসে দাঁড়িয়েছিল।

দৃশ্যটা বড় অদ্ভুত লেগেছিল অমিতাভর, কথা শুনে আরো অবাক।—কি জন্যে?

ধীরাপদ মুচকি হাসল একটু।—আমার জন্যে আপনার জন্যে, যে কোনো একজনের জন্যে।

অমিতাভ ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর হঠাৎই বোধগম্য হল ব্যাপারটা।—বাই জোভ! উৎফুল্ল মুখে সামনের দিকে ঝুঁকে বসল, নিচু গলায় বলল, তেমন তো দেখলাম না—কিন্তু আপনি চেনেন কি করে? ঘটনা আছে নাকি কিছু?

ধীরাপদ হাসছে অল্প অল্প। মাথা নাড়ল। আছে।

আপনি তো সাজ্যাতিক লোক মশাই, অ্যাঁ? দেখতে এমন, অথচ—বলুন না ছাই শুনি?

সবুর সয় না। চীফ কেমিস্টের ছেলেমানুষি আনন্দ লক্ষ্য করছে ধীরাপদ। আড়চোখে পাশের প্যাকেটটা দেখল একবার। কি আছে…ছবি না ফিল্ম?

তারপর বলল।

দিনের পর দিন মেয়েটার বাস-স্টপে দাঁড়ানোর গল্প আর আশার গল্প। ময়দানের গল্প আর শীতের রাতে বিনামূল্যে পসারিনীর সেই পসার লুঠ হবার গল্প। মেয়েটার সেই কান্নার গল্প আর সেই বুকভাঙা হতাশার গল্প।

অমিতাভ ঘোষ স্তব্ধ। একটু আগের প্রগল্ভতা গেছে। নির্বাক খানিকক্ষণ, তারপর তেতে উঠল হঠাৎ।—অমন হাঁ করে বসে না থেকে তখন বললেন না কেন? ড্রাইভার—

ড্রাইভার সচকিত।

ধীরাপদ বাধা দিল, ঠিক আছে, চলো।

অমিতাভ ঘোষ দুই-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অবুঝের মতই ঝাঁজিয়ে উঠল আবার, মেয়েটার এই অবস্থা আপনি আগে বললেন না কেন?

মেয়েটার এই অবস্থা তাতে আপনার কী?

খানিক আগে মেডিক্যাল হোমের কর্মচারীদের দুরবস্থা প্রসঙ্গে অমিতাভ ঘোষ ধীরাপদকে ঠিক এই কথাই বলেছিল। ধীরাপদ ঠিক তেমনি করেই বলল।

সিগারেটের খোঁজে পকেট হাতড়াচ্ছে। সিগারেট পেল। ধরালো। ওতে উত্তেজনা কমে কি বাড়ে ধীরাপদর ধারণা নেই। কিন্তু যে কোনো বিক্ষিপ্ত মুহূর্তে এই যেন একমাত্র সম্বল লোকটার। বাকবিতণ্ডার স্পৃহা নেই আর, চুপচাপ সিগারেট টানতে লাগল।

ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে ধীরাপদ। অমিতাভ ঘোষকে গল্প বলে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে, অতনু-উচ্ছলতার মুখে বরফ-গলানো জলের ঝাপ্‌টা দিয়েছে যেন। কিন্তু ধীরাপদ নিজে তেমন ঠাণ্ডা হতে পারছে না। নিজের প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিযোগ কি একটা, নিজের প্রতি নিজের বিদ্বেষ। আর কোথাও না গিয়ে বাড়ি যেতে পারলে হত।

তারপর ভেবেচিন্তে দেখা যেত, নিজের দিকে তাকানো যেত, বিচার-বিশ্লেষণে বসা যেত।

রাত মন্দ হল না, সেখানে দেরি হবে না তো?

অমিতাভ জবাব দিল না, জানলার গায়ে মাথা রেখে সিগারেট টানছিল, চিবুক নামিয়ে একবার তাকালো শুধু।

বাইরের ঘরের আলোয় বাগানের ওধারে চারুদির গাড়িটা দেখা যায়। সিঁড়ির গায়ে স্টেশান ওয়াগনটা দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে দোরগোড়ায় দেখা দিল পার্বতী। বাইরের ঘরেই ছিল, কেউ আসছে জানত হয়ত। কিন্তু আসছে বলে কোনরকম আগ্রহ নেই।

একজনের বদলে দুজন দেখে পার্বতা রমণীর অটল গাম্ভীর্যে একটু যেন চিড় খেল মনে হল ধীরাপদর। আজ পর্যন্ত পাঁচটা কথাও হয়নি, তবু তার প্রতি মেয়েটাকে বিরূপ মনে হয়নি একদিনও। আজও মনে হল না।

অমিতাভ আগে ঘরে ঢুকে ধুপ করে সোফায় বসে পড়ল। পিছনে ধীরাপদ।

কর্ত্রীকে খবর দেবার কোনরকম তাড়া দেখা গেল না পার্বতীর। চুপচাপ ঘরের মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই রইল। জোরালো আলোয় লক্ষ্য করলে মুখে একটু প্রসাধনের আভাস মেলে। মাথার চুলও চকচকে, টেনে বাঁধা। আর একদিন চারুদি যেমন করে বেঁধে দিয়েছিলেন। সেদিনও অমিত ঘোষের আসার কথা ছিল। পরনের ফরসা আঁট-শাড়ির আঁচলটা গলায় জড়ানো।

ধীরাপদর মনে হল এসে ভালো করেনি। খানিক আগের সেই অস্বাচ্ছন্দ্য-বোধটা যেন হঠাৎই মন্ত্রবলে পরিপুষ্ট হয়ে ঠেলে উঠতে চাইছে। সামনে যে

দাঁড়িয়ে তাকেই শুধু দেখছে না, ফোটো অ্যালবামের স্নায়ুবিভ্রমী ছবিগুলোও চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছে। এই আকণ্ঠ আঁট-বসনার সঙ্গে সেগুলোর মিল যেমন স্পষ্ট, অমিলটাও তীক্ষ্ণ তেমনি।

চারুমাসি কই? প্রশ্ন অমিতাভরই বটে, কিন্তু সে প্রশ্নে তাগিদ নেই কিছুমাত্র। দু চোখ পার্বতীর মুখের ওপর।

বাড়ি নেই।

পার্বতীর সংক্ষিপ্ত ঠাণ্ডা জবাব শুনে ধীরাপদ অবাক। জবাবটা অমিতাভও আশা করেনি বোঝা গেল। জোড়া ভুরু কুঁচকে গেল একটু, আমাকে টেলিফোনে আসতে বলল, বাড়ি নেই মানে? গাড়িও তো দেখলাম বাইরে?

পার্বতী নিরুত্তর। জানাবার যেটুকু জানিয়েছে।

ধীরাপদ কি ভুল দেখছে? বিরক্তির বদলে অমিতাভ ঘোষের সমস্ত মুখে একটা চাপা খুশির তরঙ্গ দেখছে—ভুল দেখছে? পকেটে হাত ঢোকালো, সিগারেটের খোঁজ। কিন্তু সচেতন মনে খুঁজছে না, হাত পকেটেই থেকে গেল।
—মামা এসেছিল? মামার সঙ্গে বেরিয়েছে?

পার্বতী এবারেও জবাব দিল না। নির্বিকার গাম্ভীর্যে হাবভাব লক্ষ্য করছে, পরিবর্তন লক্ষ্য করছে।

জবাবের প্রত্যাশাও বোধ হয় করেনি মানুষটা। আনন্দসিক্ত তরল চঞ্চল মুহূর্ত গোটাকতক। ধীরাপদর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। সহজতার আড়ালে ঢোকার অপটু প্রয়াস। পকেট থেকে হাত বেরুলো, সিগারেটও। কিন্তু ধোঁয়ার তৃষ্ণা প্রবল নয় আপাতত, প্রয়োজনে ওটা সহায়ও বটে। দেশলাই-প্যাকেট সোফার হাতলের ওপর রেখে সরাসরি বলে ফেলল, কোনো সিনেমায় গিয়ে ঢুকেছে তাহলে, শিগ্‌গীর ফেরার আশা নেই—আপনি কি করবেন?

অর্থাৎ, চারুদির ফিরতে যত দেরিই হোক, তাকে অপেক্ষা করতেই হবে, এখন সমস্যা ধীরাপদকে নিয়ে। গাড়িতে তাড়াতাড়ি ফেরার কথা ধীরাপদ বলেছিল বটে। প্রকারান্তরে তাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এখানে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে যাবার কথা আর মনেও ছিল না। সংগোপন নিভৃতে একটা লোভনীয় দেখার ভোজে মগ্ন ছিল সে। অমিতাভ-ঘোষের ভণিতা এতই স্পষ্ট যে হেসে ফেলার কথা। কিন্তু তার বদলে ধীরাপদ একটা ধাক্কা খেয়ে অপ্রতিভ একেবারে। এই দুজনের মাঝখানে সে অবাঞ্ছিত তৃতীয় লোক বসে আছে একজন।

উঠে দাঁড়াবার আগেই পার্বতীর ধৈর্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। তার দিকে ঘুরে নিরুত্তাপ গলায় বলল, তাঁরা সিনেমায় যাননি, আপনি বসুন।

প্রায় আদেশের মত শোনালো কথা ক'টা। ধীরাপদ হকচকিয়ে গেল। না পারে ফিরে বসতে, না পারে যেতে। কিন্তু অমিতাভ ঘোষের ইচ্ছার বেগে আর যাই থাক, দুর্বল ছলনা নেই। সেটা যেমন স্পষ্ট তেমনি কলাকৌশল-বর্জিত। একটা চাপা রেষারেষির আনন্দে তার গোটা মুখ উৎফুল্ল। বলে উঠল, সিনেমায় না গিয়ে থাকলে গঙ্গার ধারে গেছে, সেই তু-ঘণ্টার ধাক্কা—বসুন তাহলে।

অনাবৃত বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে ধীরাপদ নীরবে হাবুডুবু খেয়ে উঠল একপ্রস্থ। অপলক নেত্রে পার্বতী ওই লোকটার দিকেই চেয়ে রইল খানিক, তারপর ধীরাপদর দিকে।

ধীরাপদ পালাতেই চায়। আর এক মুহূর্তও থাকতে চায় না এখানে। হাসতে চেষ্টা করে মেরুদণ্ডহীনের মতই পালাবার অজুহাত খুঁজে নিল। বিড়বিড় করে বলল, না আমি যাই, কোম্পানীর গাড়ি সেই সকাল থেকে আটকে রেখেছি, ড্রাইভারটাকেও ছেড়ে দেওয়া দরকার—

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সটান গাড়িতে।

ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি ছুটেছে কিন্তু ধীরাপদ বিরক্ত, যত জোরে ছোটা দরকার তত জোরে ছুটছে না। এক আসনে মাথা রেখে আর এক আসনে পা ছড়িয়ে বসেছে। স্নায়ু শিথিল হোক, মাথাটা শূন্য হয়ে যাক, শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল সহজ হোক। তার শুধু দেখার কথা, দেখেছে। দেখে দেখে হাসার কথা। অন্তস্থলের কি একটা ঘূর্ণিপাক থেকে মুক্তির তাড়নায় ধীরাপদ হেসেই উঠল।

...কিন্তু পুরুষের কোন্ ফাঁকটা নারী ভরে তোলে? তার সান্নিধ্য ভালো লাগে—কেন লাগে? এই ভালো লাগার সংকেতটা এমন অমোঘ এমন অপরিহায কেন? ধীরাপদ আগে শুধু দেখত, হাসত। এখনও তাই করবে। লাবণ্য সরকার বোম্বাই গেছে সিতাংশু মিত্রের সঙ্গে, হিমাংশু মিত্রের সঙ্গে চারুদি বেড়াতে বেরিয়েছে—অমিতাভ আসবে জেনেও বেরিয়েছে! এলেই বা, পার্বতী আছে বাড়িতে। পার্বতীর চুল কে বেঁধে দিল আজ?

ধীরাপদ হাসতে পারছে বটে। কিন্তু হাসিটা ভিতর থেকে কে যেন টেনে নিচ্ছে, শুষে নিচ্ছে। তুজনের নিরিবিলির তুরন্ত লোভে অমিতাভ ঘোষ প্রকারান্তরে ঠেলে তাড়িয়েছে ওকে। ধীরাপদর হাসতে পারার কথা। পারেনি। উল্টে প্রলোভনের তীরে ভিক্ষুকের মত বসে ছিল, বসে থাকতে

চেয়েছিল। পার্বতী যে কারণে থাকতে বলেছিল তাকে, কিছু না বোঝার ভান করে সেই কারণটাকে প্রশ্রয় দিয়ে পালিয়ে এসেছে সে। তাকে দস্যু-মুঠোয় ফেলে রেখে এসেছে। কিন্তু সেজন্যে সুস্থ পরিতাপ দূরে থাক, তলায় তলায় কার নির্মম উল্লাস! নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল ধীরাপদ। দুই চোখ বিস্ফারিত। কাকে দেখছে? কার উল্লাস?

কি করবে? চোখ রাঙাবে তাকে? বসে বসে শুধু শুকনো রিক্ত নিঃশ্বাস কুড়োতে বলবে কতগুলো? জগৎ দেখতে বলবে? দেখে কি পাবে? সে তো কেবল বলছে ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো।

বাসনার বিবরে একটা সুপ্ত প্রতিবাদ অজগরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে থেকে থেকে। তার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কামনার কণা। তার পদসঞ্চার আগুনের মত, ঘাতকের মত। ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মত। সে আপস জানে না।

...লাবণ্য বোম্বাই গেছে সিতাংশুর সঙ্গে। হিমাংশুবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে চারুদি। ঘরে অমিতাভ ঘোষ আর পার্বতী। নারী আর পুরুষ। পুরুষ আর প্রকৃতি। বিশ্ব ছুটেছে এক সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে।

ধীরাপদর নির্দেশে স্টেশান ওয়াগন যে-পথে চলেছে সেটা সুলতান কুঠির পথ নয়।

আসার সময় যে-পথে এসেছিল সেই পথ।

মোড়টার বেশ কিছু আগে নেমে পড়ে গাড়িটা বিদায় করে দিল। চেতনার কন্দরে কন্দরে রাত যত ভবাট হয়ে উঠেছে, বাইরের রাত অত নয়। লোক চলাচল কিছু হাল্কা বটে। দোকানপাট একেবারে বন্ধ হয়নি, ফোটো স্টুডিওটা আধখানা খোলা।

লাইট-পোস্টের গায়ে ঠেস দিয়ে মেয়েটা ঠায় দাঁড়িয়ে তখনো। খদ্দের জোটেনি।

চকিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। দূর কম নয়, তবু কি করে টের পেল সে-ই জানে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। ব্যবধান কমছে, সংশয়ও কমে আসছে।

ধীরাপদ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে।

কাছাকাছি এসে থমকালো একটু। চিনেছে। কোনো ইশারার প্রয়োজন নেই, আমন্ত্রণ দরকার নেই। একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল। পাশে এসে। হাসছেও বোধ হয়। অনুরাগের ছক-বাঁধা হাসি, খদ্দের বুঝে ওজন-করা হাসি। কিন্তু ধীরাপদ একবারও তাকালো না। তাকাতে পারল না। এক পা দু পা

করে বড় রাস্তা চলতে লাগল সে।

মেয়েটা পাশে পাশে।

ট্যাক্সি। ধীরাপদ চমকে উঠেছিল।...ট্যাক্সিওলারাও জানে বোধ হয় সব, বোঝে বোধ হয়। গতি মন্থর করে ট্যাক্সিওলা গলা বাড়ালো, থামবে কিনা নির্বাক প্রশ্ন।

দরজা খুলে দিতে মেয়েটাই আগে উঠল। কলের মত উঠে ধীরাপদ দরজাটা টেনে দিল। ড্রাইভার পিছন ফিরে তাকালো একবার, কোনো নির্দেশ না পেয়ে সামনের বড রাস্তা ধরেই চলল সে।

রাস্তার থেকে ট্যাক্সির ভিতরে আলো কম অনেক। ধীরাপদ সুস্থ বোধ করল একটু, সুস্থ বোধ করতে চেষ্টা করল। মাঝখানে ফিকে অন্ধকারের ব্যবধান। সে এ-পাশের দরজা ঘেঁষে বসে আছে, মেয়েটা ওপাশেব। ফিরে ফিবে দেখছে, ও একবার তাকালেই সরে আসবে হয়ত। সঙ্গীর হাবভাব দেখে ভরসা পেযে উঠছে না।

চৌরঙ্গীতে পডে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যেতে হবে?

ধীরাপদই কি জানে কোথায় যেতে হবে! গাড়ি থামাতে বলল। নেমে ভাডা মেটালো। মেযেটাও নেমে দাঁডিয়েছে।

চৌরঙ্গীর জোরালো আলোয় ধীরাপদ এই প্রথম চোখ মেলে তাকালো তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল, আঁতকে উঠল প্রায। তার কি হয়েছিল? এক কোন প্রেতিনীব সঙ্গ নিয়েছে সে। এক আচমকা আঘাতে দিশা ফিরে পাওয়া মাত্র উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করল। কিন্তু পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে আছে যেন। ধীরাপদ দেখছে—নারী নয়, নারীর কঙ্কাল। কটকটে লাল ব্লাউজটা চোখে হুলের মত বিঁধছে, দগদগে ক্ষত-ছাপের মত লাগছে ছাপা শাড়িটা, মুখের শুকনো প্রসাধনে হিজিবিজি চিড খেয়েছে।

মুহূর্তে সমস্ত মুখ কঠিন হয়ে উঠল ধীরাপদর, ধারালো, দু চোখে মোহগ্রস্ত উষ্ণতার লেশমাত্র নেই, একটা দুঃসহ ক্ষোভ গুমরে ঠেলে উঠছে ভিতর থেকে।

মেয়েটা ঘাবড়ে গেছে। দু চোখ টান করে চেয়ে আছে তার দিকে। এই আলোর ফোয়ারার মধ্যে এসে কোথায় গোলযোগ ঘটে গেছে বুঝেছে। দুই চোখে নীরব অভিযোগ, নীরব উদ্বেগ, আর নিষ্প্রভ আশা। ও-চাউনির ভাষা মূক নয় আদৌ, আমি অন্ধকারের মেয়ে, অন্ধকারে ছিলাম, এই আলোতে তুমি আমাকে টেনে এনেছ। সেই সঙ্গে অব্যক্ত কাকুতি, তোমার মোহ ভেঙেছে সে দোষ আমার নয়, আমাকে ঠেলে দিও না, আজকের এই দিনটার মত আমাকে

বাঁচার প্রতিশ্রুতি দাও, আমি বড় ক্লান্ত, আমাকে ঘৃণা করলেও দয়া করো, এই অস্তিত্বের মিছিলে আমিও তো একজন—

মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করছে ধীরাপদর। মুখের কঠিন রেখাগুলো মিলিয়ে গিয়ে কোমলতার ছাপ পড়ছে। পণ্যা নারীকে নয়, মেয়েটাকেই দেখতে চেষ্টা করল সে। আগে যেমন দেখত, বয়স যার কুড়ি-একুশ, অপুষ্ট, বড় শুকনো আর বড করুণ ওই প্রসাধন পরিহার করলে মুখখানা যার সুশ্রীই মনে হয়। এত কাছে থেকে এভাবে অবশ্য আগে দেখেনি। পুরুষের অকরুণ বিশ্বাসঘাতকতায় ময়দানে কেঁদে ভাসিয়েছিল যেদিন সেদিনও না। এই মুখ দুর্ভিক্ষের মুখ। প্রাণের শিখাটুকু শুধু ধিকি ধিকি জ্বলছে।

সামনেই বড রেস্তরাঁ একটা। নৈশ ভোজনবিলাসীর ভিড় কম নয় একেবারে। ক্যাবিনে ঢোকার মুখে ধীরাপদ দাঁড়িয়ে পড়ল। অদূরে এক কোণে কল-বেসিন দেখিয়ে বলল, হাতমুখ ধুয়ে এসো ভালো করে।

মেয়েটা চলে গেল। ধীরাপদ চুপচাপ এসে বসল। বয় খাবারের অর্ডার নিয়ে গেল—রাতের পুরো খাবার।

হাতমুখ ধুয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে মেয়েটা ফিরে এলো।

ধীরাপদ এই রকমই কল্পনা করেছিল, চমকে উঠল তবু। প্রসাধনের রঙ ধুয়ে মুছে গেছে। সমস্ত মুখে যেন রক্ত নেই এক ফোঁটা। নিঃসাড় বিবর্ণ পাণ্ডুর।

আধ ঘণ্টা।

খাবারের ডিশে ধীরাপদর আঙুল ক'টা নড়াচড়া করছে শুধু। মুখে কিছু উঠছে না বড। মেয়েটা খাচ্ছে। ধীরাপদ তাই দেখছে চেয়ে। এমন খাওয়া আর দেখেনি। হাত দিয়ে মুখ দিয়ে চোখ দিয়ে সমস্ত সত্তা দিয়ে খাচ্ছে যেন। এক-একবার সামনের লোকটার দিকে চোখ পড়ে যাচ্ছে হঠাৎ, কুণ্ঠাও বোধ করছে হয়ত একটু। পরক্ষণে এক খাওয়া ছাড়া আর কিছুই মনে থাকছে না।

অব্যক্ত যাতনায় গলার ভিতরটা বুজে আসছে ধীরাপদর। চোখের কোণগুলো শিরশির করছে। এক-একজনের দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে যে ক্ষুধার তাড়নায়, সেটা এই ক্ষুধা।

খাওয়া হয়ে এসেছে। অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। ধীরাপদর ডিশের দিকে চোখ পড়তে লজ্জা পেল একটু, মৃদু স্বরে বলল, আপনি কিছু খেলেন না তো?

তোমাকে আর কিছু দেবে?

নীরব কৃতজ্ঞতায় শুধু মুখ তুলে তাকালো একবার। মাথা নাড়ল। আর কিছু না।

তোমার নাম কি ?

কাঞ্চন।

নাম শুনে হাসি পাচ্ছে ধীরাপদর, কাঞ্চনই বটে, নইলে পরিহাস এতদূর গড়াবে কেন ?—কোথায় থাক ?

প্লেটের ওপর আঙুল ক'টা নড়াচড়া করতে লাগল। নিরুত্তর।

ধীরাপদ আবার জিজ্ঞাসা করল, থাকো কোথায় ? গলার স্বর ঈষৎ রূঢ়।

মেয়েটা মুখ তুলল, কিন্তু তাকাতে ভরসা পেল না। চোখ নামিয়ে নিল। এমন লোকের পাল্লায় সেও আর পড়েনি বোধ হয়।

বস্তিতে।

সেটা কোথায় ?

বলল।

সেখানে আর কে থাকে তোমার ?

বাবা আর ভাইবোনেরা।

তারা কি করে ?

বাবার চোখে ছানি, চোখে দেখে না।

আর ভাইবোনেরা ?

তারা ছোট।

ফাঁক নেই কোথাও। মঞ্চে-ধরা নাটকের মত, আট-ঘাট বাঁধা। বাবার চোখে ছানি, ভাইবোনেরা ছোট। বড় যে, সে দায়িত্ব নিয়েছে। কিন্তু দায়িত্ব পালনের এই রাস্তাটা ওকে শেখালো কে ? ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও করল না। থাক, আরো কি শুনবে কে জানে !

রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে আবার ট্যাক্সি ধরল একটা। ড্রাইভারকে যে পথের নির্দেশ দিল শোনা মাত্র মেয়েটা চকিতে ঘুরে বসল আধাআধি। লোকটার মাথায় ছিট আছে কিনা সেই সন্দেহ হওয়াও বিচিত্র নয়। এবারেও সরে এসে বসতে বা কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না সে।

ধীরাপদ কোণে মাথা রেখে শরীর এলিয়ে দিয়েছে—তোমার বস্তি এলে বোলো।

কম পথ নয়। এতটা রাস্তা মেয়েটা রোজ হেঁটে আসে হেঁটে ফেরে ? না কি তার খদ্দেররা পৌঁছে দিয়ে যায় ? কিন্তু আর কিছু জেনে কাজ নেই ধীরাপদর। অনেক জেনেছে। জানার ধকলে স্নায়ু অবশ।

একটা কাঁচা গলির মুখে ট্যাক্সি দাঁড়াল। আলো নেই। একফালি সরু লম্বা

অন্ধকার যেন হাঁ করে আছে। সেই হাঁ পেরিয়ে বস্তি। টিম-টিম আলো জলছে। সেই আলোয় দূর থেকে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া অন্ধকারের মত দেখাচ্ছে বস্তির ঘরগুলোও।

মেয়েটা নেমে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট তার হাতে দিয়ে ধীরাপদ সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল আবার। ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে চালাতে নির্দেশ দিল।

নোট হাতে মেয়েটা বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে।

চলন্ত ট্যাক্সি থেকে একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। অত অবাক হবার কি আছে! সেও তো খদ্দেরই বটে। খদ্দের ছাড়া আর কি! দাঁতে করে নিজের গায়ের মাংস টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ধীরাপদর।

স্থলতান কুঠি।

ট্যাক্সি অনেকটা আগেই ছেড়ে দিয়েছে। আজকের মত নিজের অস্তিত্ব-টুকুও মুছে ফেলতে চায় ধীরাপদ। এই রাতের অস্তিত্বও। পায়ের নিচে শুকনো পাতা আর শুকনো কাঠ-কুটোর শব্দ খড়খড়ে বিদ্রূপের মত লাগছে। স্থলতান কুঠিতে নিষুতি রাত। চোরের মতই সেই সুপ্তির গহ্বরে এসে দাঁড়াল সে।

একেবারেই ঘরে না গিয়ে কদমতলার বেঞ্চিতে এসে বসল। ঘরে ঢুকলেই তো আলো জ্বালাতে হবে। থাক আরো কিছুক্ষণ। আলো নাকি জীবনেরই প্রতি-বিম্বিত মহিমা। এই মুহূর্তে অন্তত ধীরাপদ সেই মহিমার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় না।

কিন্তু না চাইলেই ছাড়ে কে? মাথার ওপর ওই তারাময়ী আকাশটাও নির্লজ্জ, বিবসনা। যৌবন-স্বপ্নে বিভোর।

কানের কাছটা গরম ঠেকছে আবার। একটু আগের অমন বাস্তব আঘাতটাও মিইয়ে আসছে। ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল চট করে। পায়ের নিচে কঠিন মাটি উপলব্ধি করতে চাইল।

দরজা খুলে ঘরে এলো। অন্ধকারে জামা-কাপড় বদলে অন্ধকার হাতড়েই গামছাটা কাঁধে নিল। পা-টিপে কুয়োতলার দিকে চলে গেল, তারপর ভীরু সতর্কতায় কয়েক বালতি জল তুলল কুয়ো থেকে। একটুও শব্দ যেন না হয়, শব্দ হলেও অপরাধ হবে যেন। স্থলতান কুঠির সুপ্ত-ঘন অন্ধকারের পরদাটা ছিঁড়ে যাবে।

শান্তি।

শরীরটা জুড়িয়ে গেল, ঠাণ্ডা হল। বেশ ধীরে-সুস্থে আরাম করে সবটা জলই মাথায় ঢালল সে। একটা বিকারের ঘোর কেটে গেছে যেন। আর ভাবনা নেই, আর সমস্যা নেই।

গা মুছে ভিজে কাপড়ে ঘরের উদ্দেশে পা বাড়াল। কাপড় আনেনি, ঘরে গিয়ে বদলাবে।

কিন্তু সোনাবউদির ঘরের পিছন দিকের জানলাটা পেরুবার আগেই মুহূর্তের জন্য দু পা আড়ষ্ট একেবারে। অন্ধকারে জানলার গরাদ ধরে সোনাবউদি দাঁড়িয়ে। চাপা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার! এত রাতে চান কেন?

গরম লাগছিল কেমন। অস্ফুট জবাব দিয়ে ধীরাপদ দ্রুত ঘরের দিকে পা চালিয়ে দিল। পালাতে চায়।

পালানো হল না।

ঘুরে এসে দেখে সোনাবউদি বারান্দায় তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। কাছে আসতে আপাদ-মস্তক দেখে নিল একবার।—কি হয়েছে?

ধীরাপদ সেই জবাব দিতে যাচ্ছিল। পারল না, সোনাবউদির দিকে চেয়েই চোখ দুটো থমকালো হঠাৎ। আদুড় গায়ে শাড়ির আঁচলটা বেশ করে জড়ানো। নিজের অগোচরে সোনাবউদির মুখের ওপর থেকে তার চোখ দুটো নেমে এসেছে। যৌবনের কোমল তরঙ্গ হৃদয়ের তীরে এসে স্তব্ধ যেখানে—সেইখানে।

কিছু না...। ধীরাপদ হঠাৎই আবার সবলে ছিঁড়ে নিয়ে এলো নিজেকে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। তারপর নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইল খানিক। এবারও আলো জ্বালল না। সোনাবউদি অবাক হয়ে খানিক অপেক্ষা করবে জানা কথা। আলো জ্বাললে আবারও হয়ত ঘরে আসবে। সর্বত্র এ কি অদ্ভুত ষড়যন্ত্র আজ! সেই ষড়যন্ত্রে সোনাবউদিও একজন।

এই না একটু আগে ঠাণ্ডা হয়েছিল, গা জুড়িয়েছিল, সব সমস্যার শেষ হয়েছিল! কাপড়টা তো এখনো জবজবে ভিজে। সোনাবউদি কি দেখল? কি বুঝল? কি ভাবল?

ধীরাপদ কি করবে এখন? নিজের এই চোখ দুটোকে খুবলে তুলবে?

অন্ধকারেই কাপড়টা বদলে নিল।

তারপর বসল। বিছানায় নয় মাটিতে। ঠাণ্ডার তাগিদ আবারও। আকূতি। মাটিতেই শুয়ে পড়ল আস্তে আস্তে।

ঠাণ্ডা মাটি।

॥ এগারো ॥

অসুখে এত ঘটা সুলতান কুঠিতে আগে আর কেউ দেখেনি।

একটু-আধটু অসুখ হলে এখানকার রোগী যায় ডাক্তারের কাছে, আর রোগিনী বিনা চিকিৎসাতেই সেরে ওঠে। বাড়াবাড়ি অসুখ হলে প্রথমে আসে এক টাকা ভিজিটের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, তারপর দু টাকা ভিজিটের অ্যালোপ্যাথ। বুড়োদের অসুখ-বিসুখে কবিরাজ ডাকা হয়, তাদের ফী বলে কিছু নেই, দরাদরি করে ওষুধের দামটা ধরে দিতে হয়।

কিন্তু বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তারের কথা কেউ কখনো দেখেছে, শুনেছে, না ভেবেছে!

রমণী পণ্ডিতের কথা গল্প-কথা মনে হয়েছিল প্রথম। তারপর যা-সব কাণ্ড-কারখানা দেখা যাচ্ছে কদিন ধরে, আর অবিশ্বাস্য মনে হয়নি কারো।

ডাক্তারি ব্যাগ আর বুক-দেখা যন্ত্র হাতে মেয়ে-ডাক্তার পর্যন্ত এসে গেল যখন, আর অবিশ্বাসের কি আছে? অমন মেয়ে-ডাক্তার রোগী দেখে কি করে আপাতত সেটাই বিস্ময় সকলের। রোগীই তো বরং ওই ডাক্তারকে হাঁ করে দেখবে চেয়ে চেয়ে।

ঘটা বলতে শুধু ডাক্তারের ঘটা নয়, অসুখ উপলক্ষে বেশ একটা সমারোহ দেখে উঠল সুলতান কুঠির বাসিন্দারা। এমন সব চিকিৎসক, এমন পরিচর্যা, আর এমন সব শুভার্থী-শুভার্থিনীর পদার্পণ ঘটলে অসুখেও সুখ।

প্রথমে এসেছেন হিমাংশু মিত্র।

তাঁর গাঢ় লাল গাড়িটা একটা লালচে বিভ্রম ছড়িয়েছে সকলের চোখে।

অসুখের দরুন ধীরাপদকে পর পর তিন দিন অফিসে অনুপস্থিত দেখে বাড়ি থেকে হিমাংশুবাবু প্রথমে কেয়ার-টেক বাবুকে পাঠিয়েছিলেন কেমন অসুখ দেখে আসতে। ঠিকানা-পত্র নিয়ে কেয়ার-টেক বাবু সাড়ম্বরে এসেছে আর ধীরাপদকে দেখে গিয়ে সবিনয় আড়ম্বরেই বড় সাহেবের কাছে অসুখের ঘোরালো অবস্থাটি ব্যক্ত করেছে। রোগী দেখে গিয়ে কেয়ার-টেক বাবু নিজে যেমন বুঝেছে, আর যতটা বলা উচিত বিবেচনা করেছে তাই বলেছে। কারণ, তখনও পর্যন্ত ধীরাপদকে দেখার জন্যে কোনো ডাক্তারের পদার্পণ ঘটেনি। এমন কি, প্রথম দিন দুই ওইটুকু অসুখ নিয়ে ধীরাপদ অফিসেও যেত নিশ্চয়। সোনাবউদির জন্যে পেরে ওঠেনি। গণুদাকে দিয়ে সোনাবউদি টেলিফোনে অসুস্থতার খবর জানিয়ে

দিয়েছিল। তারপর অম্বিকা কবিরাজের কাছ থেকে রমণী পণ্ডিত ওষুধ চেয়ে এনে দিয়েছিলেন। সোনাবউদি শুশ্রূষা করছিল, ধীরাপদ তার দরুন বিব্রত বোধ করছিল। তৃতীয় দিনে রমণী পণ্ডিত স্বয়ং কবিরাজকেই একবার ধরে নিয়ে আসবেন কিনা সেই চিন্তা করছিলেন। জিজ্ঞাসাও করেছিলেন।

শিয়রের পাশে মেঝেতে সোনাবউদি বসেছিল। রমণী পণ্ডিতকে দেখে চার আঙুল ঘোমটা টেনে দিয়েছিল। ধীরাপদ জবাব দিতে পারেনি কারণ তার মুখে তখন থার্মোমিটার। সেটাও সোনাবউদির। ছেলেপুলের অসুখ লেগে আছে বলে থার্মোমিটারও আছে একটা।

জবাব ধীরাপদর বদলে সোনাবউদি দিয়েছে—কবিরাজে হবে না, আপনি আজই একজন ডাক্তার ডাকুন। হাত বাড়িয়ে থার্মোমিটারটা তুলে নিল।

রমণী পণ্ডিতের মুখ বন্ধ। সোনাবউদির জ্বর দেখার ফাঁকে ধীরাপদ ইশারায় নিষেধ করেছে, অর্থাৎ আপাতত কাউকে ডেকে কাজ নেই। জ্বর দেখার পর আবার কি হুকুম হয় ভেবে রমণী পণ্ডিত পায়ে পায়ে প্রস্থান করেছেন।

থার্মোমিটার ধুয়ে রাখতে রাখতে সোনাবউদি জিজ্ঞাসা করলে, ওঁকে ডাক্তার ডাকতে বারণ করলেন কেন?

এই ক'দিন ধরেই সোনাবউদিকে গম্ভীর দেখছে ধীরাপদ। সেই রাতের পর ক'টা দিন এড়িয়ে চলতে পারলে বাঁচত। একেবারে উল্টো হল। অত রাতে চান, তার ওপর মাটিতে শুয়ে ঘুম—জ্বর আর মাথার যন্ত্রণায় অনেক বেলা পর্যন্ত মাথা তুলতে পারেনি। তারপর এড়ানো দূরে থাক, সর্বক্ষণ সোনাবউদির চোখে চোখে।

ধীরাপদ জবাবদিহি করল, উনি কি কাউকে চেনেন না জানেন, কাকে ধরে নিয়ে আসবেন ঠিক নেই—ওঁকে দিয়ে হবে না।

কাকে দিয়ে হবে তাহলে? আমি বেরুব?

ধীরাপদ আমতা আমতা করে বলেছে, গণুদা এলে না হয়…

কে এলে? এত নির্বুদ্ধিতাই যেন বিরক্তির কারণ সোনাবউদির।—কারণ তার প্রমোশন হয়েছে না? মস্ত চাকুরে না সে এখন? বুদ্ধির ঢেঁকি সব আপনারা—

গরগর করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

জ্বরটা কত জিজ্ঞাসা করা হয়নি, যতই হোক ধীরাপদ চিন্তিত নয়। ডাক্তার ডাকারও গরজ নেই তেমন। বুকে সর্দি বসে জ্বর, দুদিন বাদে সেরে যাবে। সোনাবউদির এই উষ্মা ঘরের কারণে বোধ হয়, খিটিরমিটির তো লেগেই আছে

…সেই রাতের অস্বাভাবিকতা হয়ত চোখে পড়েনি। সোনাবউদির রাগ দেখে ধীরাপদ স্বস্তি বোধ করেছিল একটু।

সেই প্রথম কেয়ার-টেক বাবুর আবির্ভাব।

বড় সাহেব দেখতে পাঠিয়েছেন, দায়িত্ব কম নয়। সেই দায়িত্ব-বোধে সর্দিটাকে যদি বুক-জোড়া নিউমোনিয়ার পর্যায়ে ফেলেন তিনি, আর গায়ের তাপ যদি খই-ফোটা জ্বর বলে মনে হয়—সেটা বড় রকমের অতিশয়োক্তি কিছু নয়।

দু-ঘণ্টার মধ্যেই বড় সাহেবের গাড়ি সুলতান কুঠির এলাকায় এসে ঢুকেছে।

কুঠির বাসিন্দারা হাঁ করে সেই গাঢ় লাল গাড়ি দেখেছে আর গাড়ির মালিককে দেখেছে। নিজের ঘরের দোরগোড়া থেকে সোনাবউদিও দেখেছে। বিব্রত মুখে হিমাংশু মিত্রকে কেয়ার-টেক বাবু সরাসরি ঘরে এনে ঢুকিয়েছে। খবর শুনে বড় সাহেব এতটাই উতলা হবেন ভাবেনি বোধ হয়।

হকচকিয়ে গিয়ে ধীরাপদ বিছানায় উঠে বসতে যাচ্ছিল। হিমাংশুবাবু বাধা দিলেন, উঠো না, শুয়ে থাকে।

ধীরাপদ শুয়ে পড়ল। অসহায় বোধ করছে। ঘরের এই অবস্থা, কোথায় বসতে দেবে, কি বলবে ?

হিমাংশুবাবু বসলেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখলেন একটু। ঘরের চারদিকে তাকালেন একবার। এই অবস্থায় থাকে এ যেন ভাবেননি।

কে দেখছে ?

জবাব না দিলে নয়। বলল, এমনিতেই সেরে উঠব ভেবেছিলাম, আজ কাউকে খবর দেব…

বড় সাহেবের বিস্ময় এবারে আরো স্পষ্ট। ঝুঁকে একখানা হাত ওর কপালে ঠেকালেন। জ্বরটা বেশ চেপেই এসেছে মনে হচ্ছিল ধীরাপদর।

হিমাংশুবাবুর মুখ গম্ভীর। এখানে তোমায় কে দেখাশুনো করে ?

আশেপাশের সব আছেন…

হুঁ। এখানে এভাবে থাকার দরকারটা কি তোমার ? ওখানে অত বড় বাড়িটা খালি পড়ে আছে, গিয়ে থাকলেই তো হয়। এই মুহূর্তে সেই ব্যবস্থার সময় নয় ভেবেই আর কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে এসে উঠলেন।

সেই দুপুরেই কেয়ার-টেক বাবু হন্তদন্ত হয়ে আবার এসে হাজির হয়েছে। একা নয়, সঙ্গে বড় ডাক্তার। ধীরাপদর শয্যাপাশে তখন রমণী পণ্ডিত বসে। লাল গাড়ির ধোঁকা কাটতে না কাটতে বাইরে আবার গাড়ি থামার শব্দ শুনে দু কান আগেই খাড়া হয়ে উঠেছিল তাঁর।

মনে মনে এই আশঙ্কাই করছিল ধীরাপদ। বড় সাহেব ফিরে গিয়ে চুপ করে থাকবেন না। রাশভারী এই মানুষটির প্রচ্ছন্ন স্নেহটুকু ইদানীং উপলব্ধি করতে পারে। শুধু ধীরাপদ নয়, অনেকেই পারে।

বড় ডাক্তার বিবরণ শুনে নিয়ে রোগী পরীক্ষা করলেন, তারপর স-নির্দেশ প্রেসক্রপশান লিখে দিয়ে গেলেন।

বালিশের তলা থেকে তাড়াতাড়িতে গোটা মানি-ব্যাগটাই রমণী পণ্ডিতের হাতে গুঁজে দিয়েছে ধীরাপদ—কেয়ার-টেক বাবুকে জিজ্ঞাসা করে ডাক্তারের ফী দিতে হবে। ডাক্তারের পিছনে হুমড়ি খেয়ে কেয়ার-টেক বাবুও যে-ভাবে তন্ময় হয়ে রোগী দেখছিল, ধীরাপদ চেষ্টা করেও ইশারায় ফী-টা কত জেনে নেবার সুযোগ পায়নি। প্রেসক্রপশান লেখার সময়ও না। ডাক্তার গাত্রোত্থান করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যাগ-পত্র তুলে নিয়ে সেও পিছনে পিছনে রওনা হয়েছে।

রমণী পণ্ডিত পিছন থেকে জামা ধরে টানতে কেয়ার-টেক বাবু ঘুরে দাঁড়াল। ডাক্তার ঘর ছেড়ে গাড়ির দিকে এগিয়েছেন। হাতে মানি-ব্যাগ দেখে কেয়ার-টেক বাবু রমণী পণ্ডিতের ইশারাটা বুঝে নিয়ে একটা দৃষ্টির ঘায়ে তাঁকে ছেঁকে ফেলে দিয়ে ঘুরে ধীরাপদর দিকে তাকালো। বলল, ভিজিট বত্রিশ টাকা, দরকার হলে দিনে তিনবার করে আসবেন উনি—আপনার অসুখ হলেও কি তা বলে টাকাটা আপনাকেই দিতে হবে?

নাটকীয় প্রস্থান।

পরদিন একটু বেলাবেলি এসেছে কোম্পানীর ছোট স্টেশান ওয়াগন। তার থেকে নামল লাবণ্য সরকার। একা।

আর সকলের মত বারান্দায় দাঁড়িয়ে গণুদাও হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথম। কোথায় দেখেছে তাও চট করে মনে করতে পারেনি। মনে পড়তে হন্তদন্ত হয়ে সাদর অভ্যর্থনায় ধীরাপদর ঘরে নিয়ে এসেছে তাকে।

ক'টা দিনের মধ্যে গণুদারও এই ঘরে এই প্রথম পদার্পণ।

ধীরাপদর হাতে দুধ-বার্লির গেলাস। পাশে সোনাবউদি বসে। নবাগতার সঙ্গে চোখোচোখি হল এক দফা। স্টেথোস্কোপ হাতে দোলাতে দোলাতে লাবণ্য সরকার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখখানা হাসি-হাসি।

ত্রস্তে উঠে সোনাবউদি কোণ থেকে মোড়াটা এনে সামনে রাখল। লোকজন আসছে দেখে একটা মোড়া কালই এ-ঘরে রেখে দিয়েছিল। বসার ফাঁকে লাবণ্য আবারও তাকে দেখল একবার। ধীরাপদর বিব্রত বিস্ময়টুকুও প্রচ্ছন্ন কৌতুকের কারণ। বলল, বেশ কাহিল হয়েছেন তাহলে? আমি তো কিছুই জানতাম না

—আজ শুনলাম।

কবে ফিরলেন ? ধীরাপদ আত্মস্থ হতে চেষ্টা করছে তখনো।

বক্রাভাস কি না এক পলক দেখে নিয়ে লাবণ্য বলল, কোথা থেকে ? বম্বে থেকে ? কবেই তো! ফিরে এসে আপনার অত সুখ্যাতি শুনে রেগে গেছি। বড় সাহেবেরও ধারণা দেখলাম, আপনি না থাকলে এই কদিনে গোটা ব্যবসাটা অচল হত।

পিছনে গণুদা দাঁড়িয়ে, এদিকে সোনাবউদি। হালকা ঠাট্টায় বিশেষ কিছু বোঝার কথা নয় তাদের। শুধু ধীরাপদ বুঝেছে। লোকজনের সামনে অন্তত লাবণ্য সরকার বড় সাহেব বলে না, মিস্টার মিত্র বলে। অন্যত্র বা অন্য সময়ে হলে পাল্টা ঠাট্টার ছলে ধীরাপদও বলত কিছু। কিন্তু বাড়ি বয়ে দেখতে আসার ফলে বলা গেল না।

হাতের দুধের গেলাসটার দিকে ইঙ্গিত করে লাবণ্য বলল, খেয়ে নিন আগে। সোনাবউদির দিকে তাকালো, প্রেসক্রপশানটা কই ?

আজও সকালে কেয়ার-টেক বাবু এসে বড় ডাক্তারকে খবর জানাবার জন্যে রোগীর অবস্থা খুঁটিয়ে জেনে গেছে। কিন্তু সে-কথা কেউ বলল না। সোনা-বউদি ধীরাপদর বালিশের নিচে থেকে প্রেসক্রপশানটা নিয়ে তার হাতে দিল।

সেই ফাঁকে ঘরের ভিতরটা একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েছে লাবণ্য সরকার। সেই দেখাটাও ধীরাপদ লক্ষ্য করেছে। মনে মনে নিজের ওপরেই বিরূপ একটু, আগে তো বিব্রত বোধ করত না, এখন করে কেন ?

প্রেসক্রপশান পড়ে লাবণ্য বলল, ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ হয়েছে, আজকের রিপোর্টও পেয়েছেন, ওষুধ একটু বদলাতে বললেন···আগে দেখে নিই, ভালই তো আছেন মনে হচ্ছে—

ধীরাপদ অসহায় বোধ করছিল কেমন, আজ এতদিনে লাবণ্য সরকার যেন কিছুটা হাতের মুঠোয় পেয়েছে ওকে।

লাবণ্য নিজের থার্মোমিটার বার করে জ্বর দেখল। নাড়ি দেখল, জিভ দেখল, চোখের পাতা টেনে দেখল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে বুক পিঠ পরীক্ষা করল। শেষে গম্ভীর মুখে বলল, উঠে বসবেন-টসবেন না অত, শুয়ে থাকবেন—পড়ন্ত শীতে বেশ করে ঠাণ্ডাটি লাগিয়েছেন বুঝি ?

চকিতে ধীরাপদ সোনাবউদির দিকে তাকালো একবার। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস কিনা দেখার জন্যে দ্বিতীয়বার চোখ ফেরাতে পারল না। ও-ধারে গণুদা দাঁড়িয়ে। কেন দাঁড়িয়ে বা কি দেখছে তার নিজেরও খেয়াল নেই।

কাগজ চেয়ে নিয়ে লাবণ্য সরকার প্রেসক্রপশান অদল-বদল করল একটু। সোনাবউদির হাতে সেটা দিয়ে কখন কোন্ ওষুধ দিতে হবে বুঝিয়ে দিল।

চিকিৎসকের অখণ্ড দায়িত্ব নিয়ে এখানে রোগী দেখতে আসেনি সে। প্রীতি এবং সৌজন্যবোধে সহকর্মীকে দেখতে এসেছে। তাই চিকিৎসকের মত বিদায়ও নিল না। ইঙ্গিতে সোনাবউদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইনি?

বউদি।

সোনাবউদি না বলে শুধু বউদি বলল ধীরাপদ।

সোনাবউদির উদ্দেশে লাবণ্য যুক্ত-করে মাথা নোয়াল একটু, তারপর হাসি-মুখে অনুযোগ করল, যে অনিয়ম করেন উনি, অসুখ হবে না—কড়া শাসনে রাখেন না কেন?

সোনাবউদি সবিনয়ে বলল, আমি পাতানো বউদি, কড়াকড়ি করলে পাছে সম্পর্কটা ছেঁড়ে সেই ভয়ে পারিনি।

সকৌতুকে লাবণ্য সরকার এবারে আর একটু মনোযোগ দিয়েই দেখে নিল তাকে। এই এক জবাব থেকেই যেমন গ্রাম্য বউটি ভেবেছিল তেমন মনে হল না। ওদিকে গণুদার মুখে বিরক্তির আভাস, স্ত্রীর জবাবটা মনঃপূত হয়নি।

যা বলেছেন—লাবণ্য সরকারের লঘু সমর্থন, কড়াকড়ি করার ফল আমি অন্তত হাতেনাতে পেয়েছি। ওঁকে দেখার পর থেকেই নিরীহ গোছের লোক দেখলে ভয় করে—সেই প্রথম দিন থেকে কতবার যে জব্দ হয়েছি ঠিক নেই।

ধীরাপদর সঙ্গে লাবণ্যর রেষারেষি যেমন, হৃদ্যতাও তেমনি। একটা থেকে আর একটায় পৌঁছুতে সময় লাগে না। তবু আজকের এই অন্তরঙ্গ সুরটা নতুন। ধীরাপদ হেসে ফেলেছিল। কিন্তু সোনাবউদির দিকে চোখ পড়তে শঙ্কিত একটু। তার সরল বিস্ময়ের বক্র-রীতি সে-ই জানে শুধু।

কিন্তু সোনাবউদি একটি কথাও বলল না, তার দিকে চেয়েই রইল শুধু।

অনুমান, তার এই চাউনিটা এড়ানোর জন্যেই লাবণ্য অন্যদিকে মুখ ফেরালো। যেদিকে গণুদা দাঁড়িয়ে। গণুদা স্ত্রীর উদ্দেশে তাড়াতাড়ি বলে বসল, একটু চা করে দিলে না!

লাবণ্য তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল।—রোগী দেখতে এসে চা কি, তাছাড়া তাড়াও আছে। ধীরাপদর দিকে ফিরল, আপনি ভালয় ভালয় শুয়েই থাকুন দিনকতক, তা না হলে অসুখটা আপনাকে আমাদের মত অত খাতির না-ও করতে পারে। চলি—

দরজার দিকে এগিয়ে গণুদাকে বলল, আমাকে দু-বেলাই টেলিফোনে একটা

করে খবর দেবেন, সকালে নার্সিং হোমে বিকেলে অফিসে—ফোন নম্বর ধীরুবাবুর কাছেই পাবেন।

সবিনয়ে ঘাড় নেড়ে গণুদা তাকে এগিয়ে দিতে গেল।

লাবণ্যকে ধীরুবাবু বলতে এই প্রথম শুনল ধীরাপদ। প্রথম মাঝে মাঝে মিস্টার চক্রবর্তী বলেছে। কাকে বলছে ধীরাপদরই এক-একসময় ভুল হয়ে যেত। এই নিয়ে অপ্রস্তুতও হয়েছে, বলেছে, এই পোশাকী ডাকটা এত কম শুনেছি যে সব সময় খেয়াল থাকে না। লাবণ্য এরপর একদিন ধীরাপদবাবু বলতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল। ঠাট্টা করেছে, নাম বলতেই দম শেষ, কি জন্যে এলাম ভুলে গেলাম।

সামনাসামনি আর মিস্টার চক্রবর্তীও শোনেনি, ধীরাপদবাবুও শোনেনি। আজ ধীরুবাবু শুনল। নামের এই চালু সংক্ষেপটা কারো মুখে শুনেছে হয়ত। কোথায় শুনল? অমিতাভ ঘোষের মতে ধীরাপদ নামটা বিচ্ছি'র, ধীরু নামটি মিষ্টি। এই ঘরে বসেই মন্তব্য করেছিল সে। কিন্তু তার কাছ থেকে লাবণ্য সরকার শুনবে কেমন করে। বোধ হয় বড সাহেবের মুখে শুনেছে। তিনি ধীরুই ডাকেন আজকাল। চারুদির মুখে হয়ত ওই নামই শুনে অভ্যস্ত তিনি।

কিন্তু এই একজনের মুখে নামটা আজ নিজের কানেই মিষ্টি লাগল ধীরাপদর।

সু-বচনীটি কে? সোনাবউদি হাতের প্রেসক্রুপশানটা নাড়াচাড়া করছে, আর কটাক্ষে তাকেই নিরীক্ষণ করছে।

হাসির চেষ্টায় ধীরাপদ ঢোক গিলল, লাবণ্য সরকার, কোম্পানীব মেডিক্যাল অফিসার।

ও...! পরিপূর্ণ পরিচয়টি জানা হয়ে গেল যেন। হাতের প্রেসক্রুপশানটা আর একবার উল্টেপাল্টে দেখে নিল সোনাবউদি।—এটা কি করব, এর আর দরকার আছে কিছু না ওতেই কাজ হয়েছে?

হাসি ছাড়া জবাব নেই। গণুদার পুনঃপ্রবেশে খানিকটা অব্যাহতি পেল। কিন্তু স্ত্রীর উদ্দেশে গণুদার রুক্ষ অনুশাসন কানে যেতে ভ্রু চোখ টান ধীরাপদর। ঘরে ঢুকেই বিরক্তি-বর্ষণ, তোমার কি বাক্সয় আর শাড়ি-টাড়ি নেই কিছু? দেখছ এ-ঘরে লোকজন আসছে যাচ্ছে—একটু ভদ্রলোকের মত এসে বসলেও তো পারো?

সোনাবউদির মুখে আবারও খানিক আগের সেই নিরীহ অভিব্যক্তি।

গণুদার বিরক্তির উপসংহার, বাড়ির ঝিও এর থেকে ভালো ভাবে থাকে।

ধীরাপদ ঘাড় কাত করে দেখে নিল, সোনাবউদির পরনের শাড়িটা খুব ময়লা না হলেও আধময়লাই বটে। আর কাঁধের আঁচলের কাছটা খানিকটা ছেঁড়াও।

সোনাবউদি কি হাসছে? ঠাওর করে উঠতে পারল না। মনে হল, গাম্ভীর্যের বাঁধে কৌতুকের বন্যা ঠেকিয়ে রেখেছে। মাথা নিচু করে বুকে-কাঁধে চোখ চালিয়ে সোনাবউদি বেশ রয়েসয়ে নিজের জামাকাপড়ের অবস্থাটা দেখে নিল আগে। তারপর গণুদার চোখে চোখ রাখল।—আগে খেয়াল থাকলে তোমারও বুকটা দেখে দিতে বলতাম। হল না যখন কি আর করবে, ওষুধটাই দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে খাও। প্রেসক্রপশান তার দিকে ঠেলে দিয়ে সোনা-বউদি উঠে ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল।

দরজাটাকে ভস্ম করা সম্ভব নয়, গণুদার উষ্ণ দৃষ্টি ধীরাপদর মুখের ওপর এসে থামল। ভরসা করে তাকেও কিছু বলতে পারল না। ভালো কথাতেই যে মূর্তি দেখেছে কিছুদিন আগে, ভরসা হবে কোথা থেকে। তবু তার নীরব অনুযোগের মর্ম, মেয়েছেলেকে বেশি আস্কারা দিলে কোথায় ওঠে নিজের চোখেই দেখে নাও এবার।

প্রেসক্রপশান তুলে নিয়ে গণুদা চলে গেল।

সুলতান কুঠিতে অর্গ্যানিজেশন চীফ সিতাংশু মিত্রের ধপধপে সাদা ছোট গাড়িটা লাবণ্য সরকারের স্টেশান-ওয়াগনের থেকেও বেশি অপ্রত্যাশিত। সিতাংশুও রোগী দেখতে এসেছে।

কিন্তু আসলে এসেছিল বোধ হয় পদমর্যাদার খোলস ছেড়ে ধীরাপদর সঙ্গে সম্পর্কটা আর সকলের মত সহজ করে নেবার তাগিদে। তার প্রয়োজন বোধ করেছিল কেন সে-ই জানে। অসুখের দরুন দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছে, চিকিৎসায় কোন রকম ত্রুটি না হয় সে কথা বার বার বলেছে। এই ফাঁকে সহজ হয়ে ওঠাটাও সহজ হয়েছে। আরো অনেক কথা বলেছে তারপর। এ-সময় ধীরাপদর বিছানায় পড়ে থাকলে চলবে কেন, কাজের কি শেষ আছে এখন! আসছে বছর কোম্পানী দশ বছরে পড়বে, সবাই উৎসব-উৎসব করছে বটে, কিন্তু ঝামেলার কথা ভেবে তার এখন থেকেই দুশ্চিন্তা। অছাড়া .কাম্পানীর নতুন শাখা পত্তন হচ্ছে শিগগীরই, প্রসাধন-সামগ্রী তৈরীর বিভাগ—পারফিউমারি ব্র্যাঞ্চ। এত বড় ঝুঁকিটা বাবা এখন না নিলেই পারতেন, কিন্তু মাথায় ঢুকেছে যখন করবেন—করবেনই। কোথায় করবেন, কারখানার এলাকায় আর জায়গাই বা কোথায়, সিতাংশু ভেবে পায় না। এর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা চাই, আলাদা যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম চাই, ব্যাপার কম নাকি! অথচ কাজের বেলায়

তো হাত-গুনতি ক'টি লোক। অবশ্য ধীরাপদর ওপর আস্থা আছে সকলেরই, সিতাংশুর নিজেরও আছে—বাবার লোক চিনতে ভুল হয় না।

আপনের সুর। বিনিময়ে ধীরাপদর শুধু একটি কথাই জানতে ইচ্ছে করছিল, বম্বে থেকে ফিরে আসার পরই এরা এমন সদয় কেন তার ওপর?

কেন, তার কিছুটা আঁচ ধীরাপদ পেয়েছে। সুলতান কুঠির আঙিনায় পর পর দু দিন আরো একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। চারুদির ক্রিম-কালারের চকচকে গাড়িটা। প্রথম দিনের আগন্তুক চারুদি নিজেই।

চারুদির খেদ আর অভিযোগ দুই-ই আন্তরিক। তিনি কিছু জানতেন না সেই খেদ, আর তাঁকে কিছু জানানো হয়নি সেই অভিযোগ। বড় ডাক্তার চিকিৎসা করছেন এবং তিনি অভয় দিয়েছেন জেনে কিছুটা নিশ্চিন্ত। এসে অনেকক্ষণ ছিলেন। অর্ধেকটা বিছানায় আর অর্ধেকটা মাটিতে বসেছিলেন। সোনাবউদি তাড়াতাড়ি একটা আসন এনে পেতে দিয়েছিল। হাত ধরে আপন-জনের মত চারুদি তাকেই সেই আসনে টেনে বসিয়ে দিয়েছেন।—আমি বেশ বসেছি, তুমি বোসো। গাড়ি থেকে একদিন চোখের দেখা দেখেছিলেন, আজ সামনাসামনি ভালো করে দেখে নিলেন।—তোমার কথা একদিন ধীরুর মুখে শুনেছিলাম, আমি ওর দিদি হই সম্পর্কে জানো তো?

সোনাবউদি মাথা নাড়ল, জানে।

চারুদি ধীরাপদর দিকে তাকালেন এক পলক, তারপর তরল বিড়ম্বনায় বলে উঠলেন, ও যে ন বছর বয়সেই আমাকে বিয়ে করার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল তাও জানো নাকি?

বহুদিনের এই পরিহাস-প্রসঙ্গ আজ কেন কে জানে তেমন মিষ্টি লাগল না ধীরাপদর কানে। কতটা বলা হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে, এবারের জবাব থেকে চারুদি তাই বুঝে নিতে চান হয়ত। কিন্তু বোঝা হল না।

হাসিমুখে সোনাবউদি মৃদু মন্তব্য করল, ওঠারই তো কথা—

চারুদি লজ্জা পেলেন, তুমিও তো আবার কম নও দেখি। একটু বাদে বললেন, এত বড় অসুখটার সব ধকল তোমার উপর দিয়েই গেল বুঝি?

বড অসুখ ডাক্তার বললেন? সাদামাটা পাল্টা প্রশ্ন সোনাবউদির।

স্নেহ-ভাজনের অসুখ-বিসুখ মেয়েরা সাধারণত বড করেই দেখে থাকে, সেই রীতিতে বলা। সোনাবউদির সরল চাউনিতেও বক্রাভাস ছিল না একটুও। তবু ভিতরে ভিতরে ধীরাপদ শঙ্কাবোধ করেছিল একটু। চারুদি বললেন, কি জানি বাপু, আমার তো শুনে ভয়ই ধরেছিল, সময়ে ধরা না পড়লে কোথা থেকে

কোথায় দাঁড়ায় কে জানে—এখনো তো চোখ-মুখের অবস্থা ভালো ঠেকছে না খুব।

সোনাবউদিও চারুদির উৎকণ্ঠা নিয়ে ধীরাপদকে দেখে নিল এক নজর, তার পর মাথা নেড়ে সায় দিল। অর্থাৎ ভালো ঠেকছে না ঠিকই।

সোনাবউদির সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপে মগ্ন হলেন চারুদি। বাপের বাড়ি কোথায়, কত বছর বিয়ে হয়েছে, ক'টি ছেলেপুলে ইত্যাদি।

সোনাবউদি এক ফাঁকে উঠে যেতে চারুদি ঘুরে বসলেন।—বেশ বউটি। মন্তব্যের বাইরে আর কোনো কৌতূহল দেখা গেল না। জিজ্ঞাসা করলেন, অমিত এসেছিল?

ধীরাপদ ঘাড় নাড়ল, আসেনি।

কি যে হচ্ছে দিনকে-দিন ছেলেটা! বলতে বলতে চারুদির কিছু একটা রসালো ব্যাপার মনে পড়ল বোধ হয়। দুর্ভাবনাজনিত গাম্ভীর্যের ওপর খুশির ঝলক নামল। বললেন, সেদিন তো আমার ওখানেই মামা-ভাগ্নেতে এক হাত হয়ে গেল। তোমার কথাও হল, চারুদির উৎফুল্ল প্রশস্তি, তুমিও ওস্তাদ কম নয়—দু পক্ষই দিব্বি তুষ্ট দেখি তোমার ওপর!

ধীরাপদর নীরব আগ্রহ গোপন থাকল না। ভিতরে ভিতরে উন্মুখ সে। চারুদির বাড়িতে মামা-ভাগ্নেতে এক হাত হয়ে গেল···কবে? যে-দিন চারুদি আর হিমাংশুবাবু বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, আর যে-দিন এক নগ্ন চাহিদার মুখে পার্বতীকে ফেলে ধীরাপদ পালিয়ে এসেছিল—সেই দিন? চারুদিই বা অত খুশি কেন—মামা-ভাগ্নেতে এক হাত হয়ে গেল বলে, না ধীরাপদর কথাও হল বলে, নাকি ওর দু পক্ষকে তুষ্ট রাখার কেরামতি দেখে?

কিন্তু ঘটনা যা শুনল সেটা এমন কিছু নয়।

মামাকে হাতের কাছে পেয়ে ভাগ্নে কৈফিয়ৎ তলব করেছে—যে-সব কর্মচারী ছুটিতে ছিল বা যারা সাময়িক হারে কাজ করছে, এ মাসে তাদের অনেকের মাইনের গণ্ডগোল হয়েছে, অনেকে মাইনে পায়নি—এ সব দেখাশুনোর দায়িত্ব যাদের, মাইনের মুখ জেনেও কাউকে কিছু না বলে খেয়াল-খুশিমত তারা যেখানে সেখানে চলে যাবে কেন?

হিমাংশু মিত্র হাল্‌কা টিপ্পনী কেটেছিলেন, এ বিদ্যেটা ওরা তোর কাছেই শিখেছে বোধ হয়।···পরে ভাগ্নের মেজাজের আঁচে আত্মস্থ হয়ে ভালোমানুষের মত জিজ্ঞাসা করেছেন, যাদের দায়িত্ব তারা কাজ-কর্ম দেখছে না ঠিকমত?

জবাবে বেপরোয়া আক্রমণ অমিতাভর, দেখবে না কেন, খুব দেখছে, যেমন

পড়ে যাই। হেসে ফেলে মোড়াটা টেনে বলল, ভাগনীটি বেশ, তবে বড় গম্ভীর। ধীরাপদর বিড়ম্বিত মুখখানা দেখছে চেয়ে, উৎফুল্ল মুখে বলল আবার, বাড়িতে যে কাজ করে সে-ও অমন একখানা গাড়িতে চেপে দেখতে আসে আপনাকে—আপনি এখানে এ অবস্থায় পড়ে আছেন কেন ভেবে তো অবাক আমি!

পার্বতীর আবির্ভাবের বিস্ময় এড়িয়ে ধীরাপদ লঘু জবাব দিয়ে ফেলল, আর কোথাও সোনাবউদি নেই যে।

হুঁ! সোনাবউদির সমস্ত মুখখানি সেই আগের দিনের মত পরিহাস-সজীব। ঠোঁট উল্টে মন্তব্য করল, ঘষে-মেজে রূপ আর ধরে-বেঁধে প্রেম—কোন্‌টাই বা টেঁকে? দু চোখ সরাসরি ধীরাপদর মুখখানা চড়াও করল হঠাৎ।—তা বললেনই যখন, এ সোনাবউদি তো বাইরের পাঁচজনের মত রোগী দেখতে এসে কি-হল কি-হল করে চলে যাবে না! আমি তো জিজ্ঞাসা করব, কেমন করে হল—ঠাণ্ডাটা লাগল কি করে?

হাতে কি ওটা···প্যামফ্লেট দেখে রাখতে হবে।

কিন্তু সোনাবউদি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়নি তখনো। দুই এক মুহূর্তের প্রতীক্ষা। —সেদিন সেই ঠাণ্ডা রাতেও আপনি হঠাৎ অমন গুবগুবিয়ে চান করে উঠলেন কেন, আর সারারাত এই ঠাণ্ডা মেঝেতেই বা শুয়ে কাটালেন কেন?

নিরুত্তর একটু হাসতে পারলেও জবাব এড়ানো যেত বোধ হয়। ধীরাপদ চেষ্টাও করেছিল। হাতের প্যামফ্লেট চোখের সামনে উঠে এসেছে।

ধরণী দ্বিধা হও···।

সোনাবউদি আবারও কপালে হাত রাখলে দেখতে কপাল আর ছ্যাকছ্যাক করছে না। কপাল ঘেমে ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে।

দরজার কাছে একাধিক পায়ের শব্দ। চটির চটচট আর খড়মের খটখট আওয়াজ। সোনাবউদির চোখ দুটো ওর মুখের ওপর থেকে দরজার দিকে ঘুরল এতক্ষণ। উঠে মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে দেয়ালের দিকে সরে গেল।

শকুনি ভটচায, একাদশী শিকদার আর রমণী পণ্ডিত। আপনজনেরা রোগীর খবর নিতে এসেছেন। রোজই আসেন।

দেয়াল ঘেঁষে সোনাবউদি বাইরে চলে গেল। ধীরাপদ হাঁপ ফেলে বাঁচল।

॥ বারো ॥

মানুষের দুই ভাব। জীবভাব আর বিশ্বভাব। অমিত ঘোষের বেলায় জ্ঞানের বচনটি পরিমিত ভাবে একটু বদলে নিয়ে দেখছে ধীরাপদ। তারও দুই ভাব—একটি জীব-ভাব, অন্যটি বিজ্ঞান-ভাব। কিন্তু দুটি ভাবই বড় বেশি সমভাবে উপস্থিত।

তুচ্ছতম সংঘাতেও জ্বলে উঠতে পারে মানুষটা। সেই জীব-ভাবটির সামনা-সামনি দাঁড়ানো শক্ত তখন। তার রীতিতে আপস লেখা নেই। ফ্যাক্টরীর সকলের পক্ষে অন্তত এ দাপট বরদাস্ত করা সহজ নয়। অথচ বরদাস্ত করতে হয়। হয় বলেই ক্ষোভ আর বিরক্তি। তাছাড়া ব্যবসায়ের দিক থেকে ক্ষতিও। যে-কোনো কাজই হোক বা যত বড় কাজই হোক, অশান্ত মুহূর্তে তাকে কাজের মধ্যে পাওয়া দায়। পেলেও কাজ নিয়ন্ত্রণ করা থেকে কাজ পণ্ডই করবে বেশি। নয়তো ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে এক উদগ্র তাড়নায় বেরিয়ে পড়বে কোনোদিকে। ঘরে শুয়ে-বসেও কাটিয়ে দিতে পারে দু-দশ দিন। জুনিয়র কেমিস্ট আছে আরো জনাকতক। পারতপক্ষে তারা তখন নতুন কাজে হাত দিতে চায় না, চীফ কেমিস্টের মেজাজের ঝক্কি নেবে কে? পছন্দ হল তো ভালো, না হলে যত টাকাই লোকসান হোক দেবে সব তছনছ করে।

এ-রকম লোকসান অনেকবার হয়েছে।

এই লোকসান ধীরাপদ কিছুটা নিজের চোখে দেখেছে, কিছুটা শুনেছে। চারুদি বলেছেন, কর্মচারীদের কারো কারো মুখে শুনেছে। অর্গ্যানিজেশন চীফ সিতাংশু মিত্রের অসহিষ্ণুতা থেকেও টের পায়। কিন্তু এর ফলে বরাবরই সব থেকে বড় ধকলটা যায় লাবণ্যর ওপর দিয়ে। সে-ই অপদস্থ হয় সব থেকে বেশি। কারণ এখানকার এই কাজের স্রোতে চীফ কেমিস্টের আসন দু দিনের জন্যও শূন্য পড়ে থাকার উপায় নেই। কাউকে এসে দাঁড়াতে হবে, নির্দেশ দিতে হবে, স্যাম্পল যাচাই করতে হবে, কাজ অনুমোদন করতে হবে।

অমিতাভর অনুপস্থিতিতে এই দায়িত্ব নিয়ে এসে দাঁড়াতে হয় লাবণ্য সরকারকে। সে শুধু ডাক্তারই নয়, গোড়ার দিকের অন্তরঙ্গ দিনে শিখিয়ে-পড়িয়ে তাকে কেমিস্টের কাজেও যোগ্য সহকর্মিণী করে তুলেছিল অমিতাভ। তখন একদিনের জন্যও ওই আসন শূন্য থাকলে রীতিমত দাবি নিয়েই এসে দাঁড়াত লাবণ্য সরকার।

সেই দাবিই গলার কাঁটা এখন।

লাবণ্যর বিশ্বাস, চীফ কেমিস্টের এ ধরনের অপচয়-প্রবৃত্তির আসল হেতু তার প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ। তাকে জব্দ করার জন্যে আর অপদস্থ করার জন্যেই। অবশ্য তাতে ক্ষতি কিছু হয় না। কারণ এই বিশ্বাসের ভাগীদার স্বয়ং অর্গ্যানিজেশন চীফ সিতাংশু মিত্রও। প্রয়োজনে সে বরং সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সান্ত্বনায় ক্ষতির নৈতিক দায়টা ভোলা শক্ত। ইদানীং ওই বিভাগটির সাময়িক দায়িত্ব গ্রহণে লাবণ্যর বিশেষ আপত্তি লক্ষ্য করেছে ধীরাপদ। জরুরী তাগিদেও যেতে রাজী হয় না। বলে, কি লাভ, সবই তো নতুন করে করতে হবে আবার! ও যেমন আছে থাক, এলে হবে।

অসুখের পর তিন সপ্তাহ বাদে ধীরাপদ কারখানায় এসে দেখল মাঝবয়সী সিনিয়র কেমিস্ট নিযুক্ত হয়েছেন একজন।

জীবন সোম, অভিজ্ঞ রসায়নবিদ। তাঁকে নিয়ে আসার কৃতিত্ব সিতাংশু মিত্রের।

ধীরাপদর মনে হল, এই নবাগতটিকে কেন্দ্র করে এই কর্মমুখর পরিবেশের তলায় তলায় একটা অস্বস্তি জমে উঠেছে। মনে মনে ধীরাপদর প্রতীক্ষায় ছিল যেন সকলে। ও এলে পরিস্থিতি সহজ হবার আশা।

হিমাংশু মিত্র হাসিমুখে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেছেন প্রথম।—ভালোই তো আছ মনে হচ্ছে, এভাবে অসুখ-বিসুখ বাধিয়ে বোসো না, অনেক ঝামেলা এখন।

ঝামেলা কি সেটা আর বলেননি। ধীরাপদর স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন, যে জায়গায় থাকো দেখলাম, অসুখ তো বারো মাস এমনিতেই হতে পারে। আমার ওখানেও উঠে আসতে পারো, বেশির ভাগ ঘরই খালি পড়ে আছে।

ধীরাপদ জবাব দেয়নি। আমন্ত্রণে খুশি হবার বদলে সঙ্কোচ বোধ করেছে। আর সেই সঙ্গে কেয়ার-টেক বাবু আর মানকের শ্রীবদন দুটি চোখের সামনে ভেসে উঠতে হাসও পেয়েছে। প্রথম দিনের দর্শনে ঠাট্টার ছলে তার ও-বাড়িতে বসবাসের সম্ভাবনার কথা শুনে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর একযোগে হকচকিয়ে যাওয়াটা মনে পড়েছে।

ছোট সাহেব সিতাংশু মিত্র তাকে দেখে খোলাখুলি খুশি। বুদ্ধিমানের মত পদমর্যাদার বেড়াটা নিজের হাতে আগেই ভেঙে দিয়েছিল। ফলে এই খুশির ভাবটা অকৃত্রিমই মনে হয়েছে ধীরাপদর। আপনি এসেছেন? বাঁচা গেল।

একদম সুস্থ তো এখন ?

ধীরাপদ হেসে মাথা নাড়ল। সুস্থ।

যাক, বসে বসে এখন ঝামেলা সামলান তাহলে—

কিসের ঝামেলা ?

এদিকের সব কিছুরই। আমার তো আর দেখাশুনোর ফুরসৎ নেই, বাবার কাণ্ড—

বাবার কাণ্ডর ব্যাখ্যায় ছেলের তুষ্টির অভাব লক্ষ্য করল ধীরাপদ। সেদিন সুলতান কুঠিতেও করেছিল। কোম্পানীর প্রসাধন-শাখার জমি কেনা হয়েছে কলকাতার বিপরীত প্রান্তে। সিতাংশু এঞ্জিনিয়ারও নয়, কনট্রাক্টরও নয়, অথচ বাড়ি তোলার সব দায়-দায়িত্বও এখন থেকে তারই কাঁধে। নতুন ব্যবসা দাঁড় করানোর ঝক্কি তো আছেই এরপর।

বিরস বদন। শাখা সম্প্রসারণে উৎসাহ বা উদ্দীপনার অভাব সুস্পষ্ট। ব্যবসা বাড়ানো দরকার, নতুন কিছু করা দরকার, বড় সাহেব সে-অভিপ্রায় অবশ্য আগেও ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এমন তাড়াহুড়ো করে কিছু একটা করে ফেলার এত আগ্রহ ধীরাপদরও অস্বাভাবিক লাগছে।

সিতাংশু জিজ্ঞাসা করল, এদিকের খবর শুনেছেন ? নতুন সিনিয়র কেমিস্ট এলেন একজন।

শুনেছি।

আলাপ হয়নি ? আলাপ করে নেবেন, বেশ গুণী লোক, অনেক বড় বড় ফার্মএ কাজ করেছেন। নিয়ে তো এলাম, এখন কদিন টিকে থাকতে পারেন কে জানে, এদিকে তো গোড়া থেকেই খড়্গহস্ত।

উনি চান না এঁকে ? খড়্গহস্ত কে হতে পারে সেটা যেন ধীরাপদরও জানাই আছে।

কি উনি চান আর কি চান না উনিই জানেন। বাবাও যেমন, সরাসরি একটা বোঝাপড়া করে নেবে তা না, কেবল ইয়ে—। সিতাংশুর মুখে বিরক্তির ছাপ। বাপের প্রতি ছেলের এতটা অনাস্থা ধীরাপদ আগে দেখেনি। অমিতাভর উদ্দেশেই বিরূপ মন্তব্যের ঝাঁজে সোজা হয়ে বসল সে, বলল, নিজে কিছু দেখব না, অন্যে দেখতে এলেও বরদাস্ত হবে না, আর মিস সরকারই বা বছরের পর বছর এ অপমান সহ্য করবেন কেন—তাঁর অন্য কাজ নেই না আত্মসম্মান নেই ?

ধীরাপদ চুপ। মুখ তুলে ক্ষুব্ধ মূর্তিটি দেখল একবার।

বাবার ধারণা ভাগ্নে মস্ত বিদ্বান। বিদ্যা ধুয়ে আমরা জল খাবো ? কাজ

চলে কি করে? না পার্টিকে বিদ্বান লোক দেখিয়ে দিলেই হবে৭

ধীরাপদ অল্প একটু মাথা নেড়েছে হয়ত। অর্থাৎ সমস্যা বটে। তারপর আলাপের সুরে বলেছে, ওই কেমিস্ট ভদ্রলোকটিকে নেবার আগে অমিতবাবুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নিলে মন্দ হত না বোধ হয়।

তার সঙ্গে কোনো পরামর্শ চলে, না, পরামর্শ করে কিছু করা যায়?

অর্থাৎ এতদিন ধরে তাহলে লোকটার আপনি কি দেখেছেন আর কতটুকু চিনেছেন? সিতাংশু উঠে যাবার পর ধীরাপদর মনে হয়েছে, কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। পরামর্শ ছোট সাহেব অন্তত করতে গেলে বিপরীত ফল অনিবার্য। কিন্তু তার কথা থেকে আর একটা সংশয়ও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। চীফ কেমিস্টের খামখেয়ালীর দরুন অসুবিধা মাঝেসাঝে হয় ঠিকই। তাছাড়া কাজও দিনে দিনে বাড়ছেই। অভিজ্ঞ লোক একজন দরকার বটে। কিন্তু এই সিনিয়র কেমিস্ট নিয়ে আসা শুধুই সেই দরকারে, না কি বছরের পর বছর লাবণ্য সরকার আর অপমান সহ্য করতে রাজী নয় বলেও? ধীরাপদর মনে হল, যোগ্য লোক সংগ্রহের কাজটা সিতাংশুই করেছে যখন, সেটা এই বিবেচনার ফলেও খানিকটা হতে পারে। অন্যথায় জেনেশুনে এভাবে চীফ কেমিস্টের মেজাজের ঝক্কি না নিয়ে বুদ্ধিমানের মত ধীরেসুস্থে বাবাকে দিয়েই যা-হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করাতে পারত। বেগতিক দেখলে বড় সাহেব সিনিয়র কেমিস্ট নিয়োগের ভারটা হয়ত অমিতাভর ওপরেই ছেড়ে দিতেন। বড় সাহেবের বিচক্ষণতায় ধীরাপদর আস্থা আছে।

কিন্তু যে কারণেই হোক, সম্প্রতি ছেলের যে তা নেই দেখছে। নেই কেন?

লাবণ্যর কথা মনে হতে ধীরাপদ উসখুস করতে লাগল। এসে অবধি দেখা হয়নি। তখন ছিল না, এখনো আসেনি বোধ হয়। এলে এ ঘরে একবার পদার্পণ ঘটতই। তবু উঠে দেখে আসবে কিনা ভাবছিল।

ঘরে ঢুকলেন যিনি, তিনি অপরিচিত। কিন্তু এক নজর দেখেই ধীরাপদর মনে হল ইনিই সেই নবাগত সিনিয়র কেমিস্ট—জীবন সোম। বছর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে বয়স, হৃষ্টপুষ্ট গড়ন, কালো একমাথা থড়খড়ে চুল। মনে হয় চুলের সঙ্গে একগাদা ধুলো মিশে আছে।

দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরাপদ সাদর অভ্যর্থনা জানালো, বসুন বসুন—আমিই যাব আপনার কাছে ভাবছিলাম।

অভ্যর্থনায় খুশি হলেন বোধ হয়। বসে ধীরাপদর মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।—এখানে এসেই আপনার কথা শুনেছি, আপনি অসুস্থ ছিলেন, আজ এসেছেন শুনে আলাপ করতে এলাম। এখন ভালো তো বেশ?

হ্যাঁ। ধীরাপদ আলাপের দিকে এগোলো, কেমন লাগছে বলুন, অবশ্য আপনি যে সব ফার্ম দেখেছেন তার তুলনায় আমাদের অনেক ছোট ব্যাপার।

না বললেই ভালো হত। কারণ এক মুহূর্তের আলাপে বিনা ভনিতায় ভদ্রলোক নিজের সমস্যাটা সরাসরি এভাবে মুখের ওপর ব্যক্ত করে বসবেন ভাবেনি। ডাইনে-বাঁয়ে মাথা হেলিয়ে বললেন, ছোট আর কি, তবে সুবিধের ঠেকছে না খুব। লোভে পড়ে ছেড়েছুড়ে এলাম···এ বয়সে না এলেই ভালো হত। এখানকার চীফ কেমিস্ট আমাকে চান না হয়ত।

মন্তব্যের আশায় ভদ্রলোক চেয়ে আছেন। ধীরাপদ ফাঁপরে পড়ল। দ্বিধান্বিত মুখে বলল, ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে না চাওয়ার তাঁর তো কোনো কারণ নেই।

জীবন সোম বললেন, ম্যানেজমেণ্টের সঙ্গেই বনছে না হয়ত—কিন্তু ভুগছি তো আমি। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু আমার মুখ দেখতেও তাঁর আপত্তি বোধ হয়, কিছু বলতে গেলেই সাফ জবাব, যা কিছু বক্তব্য বড় সাহেবকে বলতে হবে, তাঁর কাছে নয়।

ধীরাপদ নিরুত্তর। কি-ই বা বলার আছে। শুধু মনে হল, চীফ কেমিস্ট লোকটিকে সঠিক জানা থাকলে ভদ্রলোক হয়ত এতটা বিপন্ন বোধ করতেন না। কিন্তু জীবন সোমের পরবর্তী আরজি শুনে ধীরাপদ রীতিমত অবাক। শুধু আলাপের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি আসেননি সেটা স্পষ্টতর হল আরো।—মিস্টার ঘোষ আপনার বিশেষ বন্ধু শুনেছি, এঁরাও বলছিলেন আপনি এলে আর তেমন অসুবিধে হবে না। আমার হয়ে আপনিই একটু বুঝিয়ে বলুন না তাঁকে, আমি কোনরকম ষড়যন্ত্র করে এখানে ঢুকে পড়িনি, আমাকে কাজ ছাড়িয়ে এখানে আনা হয়েছে।···ভালোর আশা কে না করে?

যুক্তি মিথ্যে নয়, কিন্তু ভদ্রলোককে মুশকিল আসানের এই রাস্তাটা দেখিয়ে দিল কে? লাবণ্য সরকার না সিতাংশু মিত্র? এ ধরনের আলগা ভরসা বড় সাহেব দেননি নিশ্চয়। ধীরাপদ সবিনয়ে জানিয়ে দিল, নিজে থেকে বুঝতে না চাইলে চীফ কেমিস্টকে কিছু বুঝিয়ে বলাটা খুব সহজ নয়। আর সেও সামান্য কর্মচারী এখানকার—বন্ধুত্বের খবরটাও তেমন ভরসা করার মত কিছু নয়, তবে সুযোগ পেলেই সে চীফ কেমিস্টের সঙ্গে আলোচনা করবে।

জীবন সোম ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ধীরাপদ ওই বিভাগটির সমাচার মোটামুটি জেনেছে। তার কুশল খবর নিতে আর যারা এসেছে তাদের মুখেই শুনেছে। অমিত ঘোষ এ পর্যন্ত বড় রকমের বিঘ্ন কিছু ঘটায়নি। এস্টিমেট বা সাপ্লাই ফাইলে শুধু স্টেটমেন্ট জমেছে, স্বাক্ষর পড়ছে না। মাল-অনুমোদনের ছাড়পত্রের অভাবে মাঝে মাঝে মাল আটকে থাকছে। এ ধরনেব অসুবিধেও বেশিদিন থাকার কথা নয়, কারণ চীফ কেমিস্টের অনুপস্থিতিতে নতুন সিনিয়র কেমিস্ট শিগ্‌গীরই এ-সব ছোটখাটো দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা পাবেন আশা করা যায়। নইলে তাঁকে আনার সার্থকতা কী? তবু ওই কর্মপরিবেশে একটা আশঙ্কা জট পাকিয়ে আছে অন্য কারণে।

আসল দুর্যোগ থেকে অনাগত দুর্যোগের ছায়া বেশি ঘোরালো। সদ্য-বর্তমানে চীফ কেমিস্টের সমাহিত বিজ্ঞান-ভাবটা অকৃত্রিম মনে করছে না কেউ। ওর আড়ালে জীব-ভাবটাই প্রবল দেখছে। কখন কোন্ মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধিয়ে বসবে একটা ঠিক নেই যেন। এই অস্বাচ্ছন্দ্যটাই ক্রমশ ব্যাপ্তিলাভ করছে।

বাইরে এসে ধীরাপদ পাশের ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরটা একচুপি দেখে নিল। শূন্য। মহিলা এখনো আসেনি। কেন আসেনি বা কখন আসবে ইচ্ছে করলেই খবর নিয়ে জেনে নিতে পারে। অফিসের কেউ না কেউ জানে নিশ্চয়। ভিতরে ভিতরে এক ধরনের প্রতীক্ষার মত অনুভব করছে বলেই ইচ্ছেটা বাতিল করে দিল।

নিচে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল একটু। কিসের প্রস্তুতি নিজেরও অগোচর। কিন্তু দরকার ছিল না, অ্যানালিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টএ অমিতাভ ঘোষ নেই। ফিরল আবার। দোতলায় নয়, একেবারে তিনতলায় উঠল। লাইব্রেরি ঘরও শূন্য। সম্প্রতি দিনের বেশির ভাগ সময় এই দু জায়গার এক জায়গাতেই থাকে জানত। আসেইনি মোটে।

দোতলায় তার ঘরের সামনে যে মূর্তিটি দাঁড়িয়ে তাকে দেখে ধীরাপদ খুশিও, অবাকও। মেডিক্যাল হোমের রমেন হালদার। হাসি-হাসি সঙ্কোচ-বিড়ম্বিত প্রতীক্ষা। এখানে আসাটা একান্তই দুঃসাহসের কাজ হল কিনা, দৃষ্টিতে সেই সংশয়।

তুমি এখানে, কি আশ্চর্য! এসো এসো। কাঁধে হাত দিয়ে ভিতরে নিয়ে এলো, বাইরে দাঁড়িয়েছিলে কেন, ভিতরে এসে বসলেই পারতে—বোসো। নিজেও বসল,—তুমি এখানে হঠাৎ, কি খবর?

কাঁধে হাত পড়তেই রমেন হালদার নিশ্চিন্ত। আপ্যায়নে আরো বিগলিত।

মেডিক্যাল হোমের মাইনের দিনে যেমন দেখেছিল, এখানকার এত জাঁকজমকের মধ্যেও তেমনি দেখছে।

আপনার খুব অসুখ গেল শুনলাম, তাই···

তাই ভালো হয়ে যাবার পর দেখতে এলে ?

সলজ্জ বদনে রমেন ত্রুটি প্রায় স্বীকারই করে নিল। বলল, কাজের চাপ বড্ড বেশি এখন, তাছাড়া বাড়িটাও ঠিক জানা নেই। আজ আপনি জয়েন করেছেন শুনে ম্যানেজারবাবুই ছুটি দিয়ে দিলেন, বললেন, তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করে এসো।

ম্যানেজারবাবু! বলো কি ? চোখে-মুখে তরল অবিশ্বাস ধীরাপদর।

বলবে না কেন ? রমেন হালদারও উৎফুল্ল, লোক চিনতে বাকি কার ? যে-ব্যাভার করেছে আপনার সঙ্গে, আর কেউ হলে বুঝিয়ে ছাড়ত—আপনাকে চিনেছে বলেই নিশ্চিন্ত এখন।

শোনার ইচ্ছে থাকলে ধীরাপদ প্রশংসা-বচন আরো খানিকটা শুনতে পারত। সে অবকাশ না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নিজের ওষুধের দোকান করার প্ল্যান কত দূর ? আমাকে তো আর নেবেই না ঠিক করেছ···

মেডিকেল হোমের মাইনের দিনেও ধীরাপদ হাল্‌কা করে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল। উদ্দেশ্য ঠাট্টা করা নয়। পারুক না পারুক, ছেলেটার ওই ইচ্ছের উদ্দীপনা ভালো লেগেছিল। তেমনি তাজা আছে কি না ওটা সেই কৌতূহল। রমেন হালদার সেদিন লজ্জা পেয়েছিল, কিন্তু আজ এই থেকেই কিছু একটা বক্তব্যের মুখে এগোতে চেষ্টা করল। লজ্জিত মুখে ধীরাপদকে ব্যবসায় পাবার আশাটা ছেঁটে দিল প্রথম, বলল, আপনাকে তখন চিনলে ও-রকম বোকার মত বলতাম না···। তারপরে একটু থেমে হতাশার সুরে একেবারে স্থূল বাস্তবে মুখ থুবড়ে পড়ল।—আমারও আর কোনদিন কিছু হবে না, ক'টা টাকা মাইনে··· মাস গেলে একটা টাকাও বাঁচে না, উল্টে ধার হয়ে যায়, কদিন আর মনের জোর থাকে ?

সত্যি কথা। ছেলেমানুষের মুখে এই সত্যি কথাটাই ধীরাপদ আশা করেনি। কিন্তু রমেন হালদারের কথার এটুকুই শেষ নয়। তার নিবেদনের সার মর্ম, মনের জোর তা বলে তার এখনো কম নয়, শুধু দাদা একটু অনুগ্রহ করলেই কিছুটা সুরাহা হয়।

আমি কি করলে কি হয় ?

কি হয় বোঝা গেল। গোড়াতেই বলেছিল বটে কাজের চাপ সম্প্রতি বড্ড

বেশি। ধীরাপদ তখন খেয়াল করেনি। তবু মনে মনে ছেলেটার তারিফই করল সে। সেয়ানা বটে। তার আরজি, দিন পনের হল মেডিক্যাল হোমের কাজ ছেড়ে একজন অন্যত্র চলে গেছে। পনের টাকা বেশি মাইনে ছিল তার, তার কাজ ও-ই করছে আপাতত, অতএব ও-জায়গায় যদি তাকেই পাকাপাকি বহাল করা হয়!

ধীরাপদ আল্‌গা কথার মধ্যে নেই আর, জবাব দিল, আমি কি করতে পারি বলো, ও-সব মিস সরকারের ব্যাপার, তাঁকে বলে দেখো।

রমেন হালদার সবিনয়ে জানালো, সে চেষ্টা করা হয়েছিল, তাঁকে বলানো হয়েছিল। কিন্তু ফল বিপরীত হয়েছে, দেখা হলেই উনি এখন বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে তাকান ওর দিকে।

ছেলেটার কথাবার্তার এই ধরনটাই ভালো লাগে ধীরাপদর। হেসে ফেলল, কাকে দিয়ে বলিয়েছিলে, ম্যানেজারবাবু?

না, ঢোক গিলল, সর্বেশ্বরবাবুকে দিয়ে, ওঁর সেই ভগ্নীপতি...

হাল্‌কা বিস্ময়ে ধীরাপদ তাকে চেয়ে চেয়ে দেখল একপ্রস্থ। ওই নামের ভদ্রলোকটিকে এতদিনে আর মনেও পড়েনি। এখন পড়ছে। হাসির রসে ভেজা ফরসা মুখ, কোঁচানো কাঁচি ধুতি, গিলে পাঞ্জাবির নিচে ধপধপে জালি-গেঞ্জি, পায়ে চেকনাই হল্‌দে নিউকাট, হাতে সোনার ঘড়ি সোনার ব্যাণ্ড, বুক থেকে গলা পর্যন্ত মিনে-করা সোনার বোতাম, মাথার চুলে কলপ-চটা সাদার উঁকিঝুঁকি। বিপত্নীক, পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ে। প্রায়ই ভোগে যারা, আর মাসির হাতের ওষুধ না পড়া পর্যন্ত যাদের একটাও এমনিতে সেরে ওঠে না—মাসি-অন্ত প্রাণ সব। পরিচয়-অন্তে রমেনের সেই সটীক মন্তব্য আজও ভোলেনি ধীরাপদ।

আবারও হেসেই ফেলল, তুমি বড্ড দুষ্টু, এখন ফল ভোগো!

রমেনের মুখ কাঁচুমাচু, আমি তো আমার ভালোর জন্যেই চেষ্টা করেছিলাম দাদা, আপনি যে তখন অসুখে পড়েছিলেন, ম্যানেজারবাবু আমার জন্যে বলতে যাবেন কেন, আমি ভাবলাম ওঁকে দিয়ে বলালেই কাজ হবে। নিজের ভগ্নীপতি, খাতিরও করেন দেখি...।

তা উনি যে তোমার জন্যে বলেছিলেন জানলে কি করে? ভুরু কোঁচকাতে দেখে?

দায় বড়। সহজাত চপলতা দমন করে মাথা নাড়ল।—সর্বেশ্বরবাবুই জানিয়েছেন। মিস সরকার তাঁকে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, অফিসের ব্যাপারে

এভাবে বলা-কওয়াটা উনি পছন্দ করেন না। আচ্ছা, আমার কি দোষ বলুন দাদা—

শেষ করা গেল না। দরজার দিকে চেয়ে রমেন হালদার নির্বাক আড়ষ্ট একেবারে।

লাবণ্য সরকার। হাসিমুখে ঘরে ঢুকছিল। ওকে দেখে হাসির বারো আনা গাম্ভীর্যের আবরণে ঢাকা পড়ে গেল। আবির্ভাবের লঘু ছন্দ শিথিল হল।

শশব্যস্তে রমেন হালদার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে বিনয়াবনত অভিবাদন সম্পন্ন করল একটা। তারপর দাঁড়িয়ে রইল।

লাবণ্য সরকার লক্ষ্য করল কি করল না। এই-ই রীতি এখানকার। সে টেবিলের কাছে এগিয়ে আসতে ধীরাপদই ওর হয়ে কৈফিয়ৎ দিল যেন, বলল, ওকে চিনলেন তো? ভারী ভালো ছেলে, আমাকে খুব পছন্দ ওর—অসুখ করেছিল শুনে দেখতে এসেছে।

ভালো ছেলের মুখের ওপর আর একটা নিস্পৃহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লাবণ্য চেয়ার টেনে বসল। ধীরাপদ রমেনকে বিদায় দিল, তুমি তো আবার কাজে যাবে এক্ষুনি? আজ যাও তাহলে, আবার দেখা হবে।

শুধু এই নির্দেশটুকুর প্রতীক্ষাতেই ছিল যেন, আবারও বিশেষ করে কর্ত্রীটির উদ্দেশেই আনত হয়ে ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল সে। গমন-বৈচিত্র্যটুকুও উপভোগ্য। লাবণ্য সরকার হাসিমুখে তাকালো এবারে, প্রশ্রয়ের হেতু আবিষ্কারের চেষ্টা করল দুই-এক মুহূর্ত।—ভারী ভালো ছেলে বুঝলেন কি করে? আপনাকে দাদা বলে তো?

হাসছে ধীরাপদও। মাথা নাড়ল, বলে।

লাবণ্য ঠাট্টা করল, গোড়ায় গোড়ায় আমাকেও দিদি ডাকার চেষ্টায় ছিল, আমার তবু ভালো ছেলে মনে হয়নি।

দরদী সুরে ধীরাপদ বলল, সেই ব্যথা বেচারা জীবনে ভুলবে না।

আপনাকে বলেছে বুঝি? লঘু ভ্রূকুটি।

বলেছে যখন, তখন আপনার মতই ও-ও আমাকে নিজের সমব্যথী সহকর্মী বলে জানত—দাদা সম্পর্কটা তখনই পাতিয়েছিল, কোনো ফলের আশা না করেই।

তবু হাল্‌কা জোরের ওপরেই তার ধারণাটা খণ্ডন করতে চেষ্টা করল লাবণ্য, আমি বলছি ও একটুও ভালো ছেলে নয়। এসেছিল কেন, চাকরির তদ্‌বিরে?

ধীরাপদ হেসে ফেলল। সেটা কি অপরাধ ? কিন্তু বেচারার কোনো আশা-ভরসা নেই দেখছি।

নেই কেন, করে দিন। কিছু করা না করার মালিক তো এখন আপনি।

ব্যাপার তুচ্ছ, আর লাবণ্য সরকার বললও তেমনি তাচ্ছিল্য করেই। তবু উক্তিটা একেবারে শ্লেষশূন্য মনে হল না ধীরাপদর। মনের ভাব গোপন করে জবাব দিল, আমি মালিক হলে তো ওর হয়েই যেত, কিন্তু হওয়া না হওয়াটা কার হাতে সেটা ও ভালো করেই জানে। আমি অবশ্য একটু সুপারিশের আশা দিয়ে ফেলেছি, তখন কি আর জানতুম—

কি জানত না সেটা আর বলার দরকার হল না। হাসি দিয়েই তুচ্ছ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টেনে দিল। ধীরাপদর ধারণা, সুপারিশটা প্রথম ভগ্নিপতি সর্বেশ্বরের মারফৎ হয়েছিল বলেই মহিলা এত বিরূপ।

লাবণ্য সরকারও তক্ষুনি ও আলোচনা ছেঁটে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কখন এলেন আজ ?

চেয়ারে হেলান দিয়ে ধীরাপদ বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা, সেই সকালেই তো···

অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা কবলে দাঁড়ায়, সেই সকালে আসিনি শুধু, আসার পর থেকে এ পর্যন্ত মুহূর্ত গুনেছি।

সুরসিকার মতই হাসির ছোঁয়া লাগিয়ে লাবণ্য সরকার বসার ভঙ্গিটা আর একটু শিথিল করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, সকালে এসেছেন, মিস্টার মিত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাহলে। উনি তো রোজই আসছেন আজকাল।

প্রশ্ন স্পষ্ট, তাৎপর্যটুকু নয়। রোজ আসছেন, বলার মধ্যে ঈষৎ বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন মনে হল। ফিরে জিজ্ঞাসা করল, বড় মিত্র না ছোট মিত্র, কোন্ মিত্র ?

বড় মিত্রের কথাই বলছি, ছোট মিত্রকে নিয়ে কবে আর আপনি মাথা ঘামান ?

দেখা হয়েছে। তরল প্রতিবাদ, কিন্তু বড় মিত্রকে নিয়েই বা কবে আবার মাথা ঘামাতে দেখলেন আমাকে ?

আপনি মাথা না ঘামালেও উনি ঘামাচ্ছিলেন, রোজই একবার করে আপনার খোঁজ করতেন কবে আসছেন। থামল একটু।—বললেন কিছু ?

অসুস্থতার পর তিন সপ্তাহ বাদে অফিসে এসে এই প্রশ্নটাই প্রথম শুনবে, ধীরাপদ কল্পনাও করেনি। লাবণ্যর মত সরাসরি ফিরে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে সঙ্কোচ। পেরে ওঠে না, কিন্তু এখন ইচ্ছে করছে চেয়ে থাকতে। দেখতে।

এই রমণী-মুখও কি হৃদয়ের দর্পণ? হবেও বা—। লাবণ্য সরকারের হাবভাব কথাবার্তা এমন কি হাসিটুকুও সহজ স্বাচ্ছন্দ্যভরা লাগছে না খুব। দুই চোখের অতলে কিছু একটা সমস্যা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, সেই সঙ্গে ক্ষোভও একটু।

যা সহজ ধীরাপদ তাই করল। হাসতে লাগল। তারপর যথাযথ সত্যি জবাবই দিল।—বড় সাহেব বললেন, আবার যেন এভাবে অসুখবিসুখ বাধিয়ে না বসি, অনেক ঝামেলা এখন। আর বললেন, তাঁর বাড়ির বেশির ভাগ ঘরই খালি পড়ে থাকে, অনায়াসেই সেখানে এসে থাকতে পারি।

মুখের দিকে চেয়ে লাবণ্য চুপচাপ অপেক্ষা করল খানিক। আরো কিছু শুনবে আশা করেছিল হয়ত। কিন্তু ওইখানেই শেষ হতে দেখে অনেকটা নির্লিপ্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, আপনার আপত্তি কেন, বউদির আদর-যত্ন পাবেন না বলে?

এ পরিহাস অপ্রত্যাশিত। বিশেষ করে লাবণ্য সরকারের মুখে। ধীরাপদ থতমত খেয়ে গেল কেমন। সেই একদিনে কতটুকুই বা দেখেছে সোনাবউদিকে! বিস্ময়-ব্যঞ্জনা লাবণ্যর চোখে পড়ল কি না সে-ই জানে। প্রসন্ন মুখেই প্রসঙ্গ বদলে ফেলল চট করে।—যাক্‌গে, আপনি এখন কেমন আছেন বলুন দেখি?

ছদ্ম অনুযোগভরা দুই চোখ তুলে তাকালো ধীরাপদ।—আপনাকে বলব সেই আশায় সকাল থেকে নিজের স্বাস্থ্য-সমাচার নানাভাবে সাজিয়ে সাজিয়ে এতক্ষণে ভুলেই গেলাম।

লাবণ্য হাসিমুখে বলল, ভালই আছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে।

বিরস বদনে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলল ধীরাপদ, ভালো থাকা কাকে বলে আপনারাই জানেন।…মানুষ ছেড়ে অসুখবিসুখের ওপরের আর আস্থা নেই আমার।

আবার একটা পরিহাসের আঁচ পেয়ে লাবণ্য সকৌতুকে চেয়ে আছে। ধীরাপদ টেনে টেনে বলল, এই একবার বিছানা নিয়ে অনেক আশা করেছিলাম। আশা ছিল, অসুখটা একটু অন্তত ঘোরালো পথে চলবে, আর তার ফলে আরো দু-চার দিন অন্তত আপনাকে সেই দীনের কুটিরে দেখা যাবে। কিছুই হল না।

নিজের প্রগল্‌ভতায় ধীরাপদ নিজেই পরিপুষ্ট। লাবণ্য সরকারও হাসল একপ্রস্থ। ওজন-পালিশ-করা হাসি নয়, দাঁতের আভাস চিকিয়ে-ওঠা ঝকঝকে হাসি। বলল, বড় দুঃখের কথা, কিন্তু ওই আশা-রোগের ধকল সামলাতে জানেন তো? মুখ দেখে তো কিছুই বোঝার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল মুখে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল, বসুন, টেবিলে একগাদা কি জমে আছে দেখলাম—দেখে আসি। এক্ষুনি পালাচ্ছেন না তো?

ধীরাপদ মাথা নেড়েছে হয়ত। লাবণ্য ঘরের আড়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এই সবটুকুই ভূমিকা শুধু। অনুকূল আবহাওয়া রচনা করে গেল একটু। লাবণ্যর বক্তব্য আছে কিছু। সেটা শুনতে বাকি।

কিন্তু সে-কৌতূহল ঠেলে দিয়ে মনের তলায় কে যেন চোখ রাঙাচ্ছে তাকে।

আবার? আবারও?

তলায় তলায় চকিত অস্বস্তি। লাবণ্য সরকার তার প্রয়োজনে খুশির হাওয়া রচনা করে গেছে—কিন্তু সেই খুশির বাতাস ওর গায়ে এসে লাগে কেন? গা জুড়োয় কেন? সকাল থেকে কোন্ আশার দারিদ্র্যে অমন উসখুস করছিল? এই সত্ত-প্রস্থান-পরা-তনু সম্মোহন থেকে নিজের চোখ দুটো ছিঁড়ে টেবিলে এনে রাখতে হয়েছিল, তাই বা গোপন করবে কাকে?

...বলে গেল আশা-রোগ! ঠাট্টা? একবারের ওই ধকল সামলাতে পেরেছিল কি? সোনাবউদি জিজ্ঞাসা করেছিল, ঠাণ্ডাটা লাগল কেমন করে, পড়ন্ত শীতের রাতে ওভাবে চান করে আসার কারণটা কি? সদলে শকুনি ভটাচায এসে না গেলে সত্যিই হয়ত সুলতান কুঠি ছাড়তে হত ওকে। সেই থেকে সোনাবউদিকে তো এড়িয়েই চলছে এক-রকম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে ও-রোগের প্রশ্রয় আর দেবে না, প্রবৃত্তিটাকে লাগামের মুখে রাখবে।

এই লাগাম?

লাবণ্য আবারও ঘরে এলো প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে। হাতে কিসের ফাইল একটা। কাজেরও হতে পারে, সহজ পদার্পণের উপলক্ষও হতে পারে। ফাইলটা ধীরাপদর সামনে ফেলে দিয়ে চেয়ার টেনে বসল।

ধীরাপদ ওপর থেকে নামটা দেখে নিল, তানিস সর্দারের ফাইল। ফুটন্ত লিভার এক্সট্রাক্টএ আধপোড়া হয়ে হাসপাতালে ছিল যে। লাবণ্য বলল, লোকটা জয়েন করেছে, আপনার নিজস্ব বিবেচনার ব্যাপার—আমি ভয়ে হাত দিইনি ওতে। হাসতে লাগল, এমনিতেই তো লোকটা চটে আছে আমার ওপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে একেবারে বউসুদ্ধ এসে হাজির হয়েছিল আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে—অসুখ শুনে ভয়ানক মন খারাপ। ঠিকানা পেলে আপনার বাড়ি যেত, পেল না বলে অসন্তুষ্ট।

ধীরাপদ কোনো মন্তব্য করল না দেখেই ঠাট্টা করল, আপনারও বোধ হয় পছন্দ হল না, বউটার দুঃখ দেখে অস্থির হয়েছিলেন, এখন হাসিমুখ দেখতে পেতেন আর অনেক ভক্তি-শ্রদ্ধার কথাও শুনতে পেতেন।

ধীরাপদ দেখছে, হাসছেও একটু একটু। তেমনি জবাব দিল, এখনো মন্দ

হাসিমুখ দেখছি না, এবারে ছু-একটা ভক্তিশ্রদ্ধার কথা শোনালে আর খেদ থাকে না।

রাগের ব্যঞ্জনা টিকল না, জব্দ করতে পারলে জব্দ হতে আপত্তি নেই যে-মেয়ের সে সুরসিকা। লাবণ্যর বচনে আর জ্রূরেখায় নতি-স্বীকারের লক্ষণ।—ওদের মত অতটা কি পারব, বলুন কি শুনতে চান ?

ধীরাপদ হাতের খেয়ালে সামনের ফাইলটা ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরাল একপ্রস্থ। —আমার কেমন মনে হয়েছিল আপনিই কিছু বলবেন, আর সেটা ঠিক এই তানিস সর্দার আর তার বউয়ের কথাই নয়।

লাবণ্যর চোখ ছুটো এবারে তার মুখের ওপর থমকে রইল একটু। শুধু কথা-গুলো নয়, বলার ধরনটাও অন্তরকম লাগল। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে ছদ্ম-শঙ্কায় মন্তব্য করল, আপনাকে যত দেখছি তত ভয় বাড়ছে আমার।

ধীরাপদ ম্রিয়মাণ।—এটা কি প্রশংসার কথা ?

খুব নিন্দার কথা। ছু হাত টেবিলে রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে টান হয়ে বসল একটু। শাড়ির আধখানা আঁচল কাঁধ থেকে কনুইয়ে ভেঙে এলো। জোর দিয়ে বলল, এতদিন বাদে এলেন আপনি, অফিসের ব্যাপারে আলোচনা তো ছিলই কিছু, কিন্তু এদিকে তো বেলা শেষ দেখি···আপনার তাড়া আছে ?

ধীরাপদ সভয়ে বলল, অফিসের আলোচনা হলে তাড়া আছে। এতক্ষণ ছিলেন কোথায় ?

অমিতবাবুর ওখানে দেরি হয়ে গেল। আপনি আজ আসবেন জানি, আগে আসারই ইচ্ছে ছিল—

কৌতূহলের থেকেও ধীরাপদর বিস্ময় বেশি। এতদিন এই একজনের প্রসঙ্গই সন্তর্পণে পরিহার করে আসতে দেখেছে। এখনো জবাবদিহির দরকার ছিল না। অথচ লাবণ্য সরকার সাগ্রহে তাই করল।

অমিতবাবুর ওখানে মানে বাড়িতে ?

হ্যাঁ।

শরীর ভালো তো ? অফিসে এলেনই না—

শরীর ভালোই। মতি-গতি ভালো না।

অভিযোগ নয়। চিকিৎসক রোগের কারণে অভিযোগ করে না। সংশয়াতীত কোনো রোগ-নির্ণয়ের মতই নির্বিকার আর স্পষ্ট উক্তি। ধীরাপদর কৌতূহল বাড়ছে, বিস্ময়ও। ছু-চোখ টান করে তাকাবার সুযোগ হল এবারে।—সেটা ভালো করার দায়িত্বও কি আপনার ওপরেই নাকি ?

জবাবে লঘু কৌতুকের আভাস। দায়িত্বটা প্রায় স্বীকার করে নিয়েই বলল, ডাক্তারের দায় কম নাকি—সময়-বিশেষে ওটাও রোগের আওতায় পড়ে। থামল একটু, এঁদিকের ব্যবস্থাপত্রের কিছু অদলবদল হয়েছে···শুনলেন সব ?

ধীরাপদ ঘড়ে নাড়ল শুনেছে। সিতাংশু মিত্র আর জীবন সোম এসেছিলেন জানালো। বলল, কাউকে খুশি দেখছি না তেমন।

লাবণ্যর মতে নতুন কেমিস্টের অসন্তোষের হেতুটা সঙ্গত নয় হযত। জিজ্ঞাসা করল, মিঃ সোমের আবার অখুশির কারণটা কী ?

কাজ-কর্মের সুবিধে হচ্ছে না···কো-অপাবেশান পাচ্ছেন না।

মুখে বিবক্তির আঁচড পড়ল কয়েকটা—কাজ-কর্মের সুবিধের জন্যে তাঁর এখনি অত ব্যস্ত হবার দরকারটা কী ? মিঃ মিত্রকেও সেদিন ও-কথা বলে এসেছেন—

লাবণ্যর মিস্টার মিত্র বলতে বড় সাহেব।

জীবন সোমের প্রসঙ্গও আর টানা প্রয়োজন বোধ করল না, বলল, ও কথা যাক, এখন মুশকিল হযেছে অমিতবাবুকে নিয়ে, তিনি ভাবছেন সবাই তাঁর বিরুদ্ধে একটা ষডযন্ত্রে লেগেছে।

ধীরাপদর খানিক আগের অনুমান মিথ্যে নয়। লাবণ্যর সব সমস্যা আর আলোচনা এই একজনকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু সমস্যাটা যেমন জটিল, ওর সঙ্গে এই আলোচনার বাসনাটার কারণও তেমনি অস্পষ্ট।

ও দুদিনেই আবার ঠিক হয়ে যাবে। শোনার আগ্রহ প্রবল বলেই ধীরাপদর উক্তিটা নিস্পৃহ।

লাবণ্য তক্ষুনি মাথা নাডল।—ওই ভদ্রলোকের বেলায অত সহজে ঠিক হয় না কিছু। ভিতরে বড রকমের একটা নাডাচাডা পডলেই একেবারে অস্থিব কাণ্ড—ভালো হাতে অসুখ বাধানোর দাখিল। এ-রকম আমি আগেও একবার দেখেছি···ভালো করে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলা দরকার তাঁকে।

আলোচনার উদ্দেশ্য বোঝা গেল।

ধীরাপদর জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, আগেও একবার লাবণ্য কবে দেখেছিল এ রকম, বড় রকমের নাড়াচাডাটা কবে পডতে দেখেছিল এর আগে ? সেটা এই কর্ম-বাণিজ্যে লাবণ্য সরকারের বন্দর বদলের পরেই কিনা, আর সেই কারণেই কিনা—অমিতাভ ঘোষের বুকের কোনো দিক খালি হযে গিয়েছিল বলে কিনা।

জানা সম্ভব নয়। লাবণ্যর বক্তব্য শেষ হযেছে মনে হয় না. শোনাব আশায় ধীরাপদ নিরুত্তর।

এই প্রথম রমণী-মুখে দ্বিধার ভাব। নিরুপায় একটু হাসির চেষ্টাও। নিজের সমস্যার ঢাকনা সরালো তারপর, ভদ্রলোকের ধারণা কি জানেন? এই সব কিছুর মূলে আমি—সিতাংশুবাবুকে বলে-কয়ে সিনিয়র কেমিস্ট আনার ব্যবস্থাটা আমিই করেছি—

ধীরাপদর মজাই লাগছে শুনতে। রমণীর মন শুধু দূর থেকেই দুর্জ্ঞেয় বোধ হয়। নিরীহ মুখে জিজ্ঞাসা করে বসল, সেটা একেবারে ঠিক নয় বলছেন?

আচমকা ঘা খেলে আত্মস্থ হতে যেটুকু সময় লাগে সেই সময়টুকু শুধু। তারপরেই রূপান্তর। শাড়ির আধভাঙা আঁচলটা কাঁধে তুলে দিল। সোজা হয়ে বসল একটু। টেবিলের ওপরের হাত দুটো নিজের কাছাকাছি গুটিয়ে নিল। নিটোল দুই বাহুতে খয়রা-রঙা আঁটা ব্লাউজের কনুই-ঘেঁষা হাতা দুটোর দংশন স্পষ্ট হয়ে উঠল। দৃষ্টি খরখরে।

অমিতবাবু এর মধ্যে আপনার ওখানে গেছলেন?

না তো। কেন?

আপনার কথা শুনে ভাবলাম, ধারণাটা আপনিই তাঁর মাথায় এনে দিলেন কি না?

কথাটার প্রতিক্রিয়া এতটা গোলমেলে হবে ধীরাপদ ভাবেনি। সবিনয়ে জবাব দিল, তাঁর নিজের ধারণা-শক্তি আমার থেকে কম নয়।

লাবণ্যর পর্যবেক্ষণরত দৃষ্টিটা ওর মুখের ওপর স্থির তেমনি। কণ্ঠস্বর রূঢ় শোনালো, আপনি আর কতদিন এসেছেন এখানে, দায়িত্ব নেবার লোকের অভাবে ওখানে কি অসুবিধের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয় তারই বা কতটুকু জানেন? আমি সে ঝক্কি নিতে যাব কেন? আমি ভুগব কেন?

ধীরাপদ সমব্যথীর মতই সায় দিল, একটু আগে সিতাংশুবাবুও এই কথাই বলছিলেন—

সিতাংশুবাবুর কথা থাক, আপনি কি বলেন?

উষ্মার ঝাপ্টায় ধীরাপদ যথার্থই কাহিল—এসব বড় ব্যাপারে আমি কি বলব?

নীরবে দুই এক মুহূর্ত তার মুখের ওপর ব্যঙ্গ ছড়ালো লাবণ্য সরকার। সশ্লেষে তার বলার রাস্তাটাই যেন দেখিয়ে দিল তারপর।—আর কিছু না পারেন, অমিতবাবুকে গিয়েই বলুন তাহলে, তাঁকে জব্দ করার জন্যেই সিনিয়ার কেমিস্ট আনা হয়েছে এখানে। ভারী খুশি হবেন।

চেয়ার ছেড়ে ওঠার উপক্রম করতে ধীরাপদ তাড়াতাড়ি বাধা দিল, বসুন

বসুন—। এমন শ্লেষটাও একটুও বেঁধেনি যেন, হাসিমুখে বলল, অমিতবাবুকে খুশি করার জন্য আমি একটুও ব্যস্ত নই, আপনি কি করলে খুশি হবেন তাই বলুন।

লাবণ্য জবাব দিল না। দেখছে। আর, লোকটার গণ্ডারের চামড়া কিনা তাই ভাবছে হয়ত।

ধীরাপদর মুখে অকৃত্রিম গাম্ভীর্য।—আপনাদের সমস্যাটা সত্যিই আমার মাথায় ঢোকেনি এখনো পর্যন্ত।…কোম্পানীর দরকারে সিনিয়র কেমিস্ট আনা হয়েছে, সেটা না বুঝে কেউ যদি মাথা গরম করেন তা নিয়ে আপনারা ভেবে কি করবেন?

কিছু না ভেবেহ অসহিষ্ণু কণ্ঠে লাবণ্য বলে উঠল, তাঁকে চিনলে আপনিও ভাবতেন, ও-ভাবে মাথা গরম করলে শক্ত অসুখ হয়ে বসতে পারে—ভাবি এই জন্যে।

ধীরাপদর দু চোখ এবারে সম্মুখবর্তিনীর মুখের ওপর নিবদ্ধ। ভাবনার এটাই একমাত্র নিগূঢ় হেতু বলে মনে হল না। বলে বলল, ডাক্তারদের তো রোগ নিয়েই কারবার…হয়ও যদি, তার জন্যেই বা বিশেষ করে আপনার এত চিন্তা কেন?

লাবণ্যর এতক্ষণের বিরূপতা থেকে তাজা ভাবটুকুও যেন ছেঁকে সরিয়ে নেওয়া হল একেবারে। যে দুর্বলতা সংগোপনে লালনের বস্তু তাই যেন ছিঁড়েখুঁড়ে আলোয় এনে ফেলা হয়েছে। ধীরাপদ তাড়াতাড়ি সামাল দিতে চেষ্টা করল, বলল, যাক—এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি বলুন?

ভেবেছিলাম পারেন। ভাবা ভুল হয়েছে। থামল একটু, অনুচ্চ কঠিন শ্লেষে বিদ্ধ করার শেষ চেষ্টা।—বড় সাহেব আপনাকে আদর করে নিজের বাড়িতে এনে রাখতে চান আবার অমিতবাবুও আপনাকেই একমাত্র বন্ধু বলে ভাবেন। আপনি কি করতে পারেন আমি বলব?

ধীরাপদ হাসছে। রাগ করল না, প্রশস্তি খণ্ডনের চেষ্টাও করল না। ওই সৌভাগ্যবৈচিত্র্য তার নিজেরই বিস্ময়ের কারণ যেন। বলল, আশ্চর্য! অথচ দেখুন, আমি ডাক্তার নই, বড় সাহেবের ব্লাডপ্রেসারও মাপিনি কখনো বা চীফ কেমিস্টের মতিগতি ভালো করার দায়ও ঘাড়ে নিইনি, কেন যে কি হয়—

না, লাবণ্য সরকার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেনি, ঘর ছেড়ে সবেগে প্রস্থানও করেনি। আরো খানিক বসেছিল। আরো খানিক দেখেছিল। ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত মুখে তারপর অফিস সংক্রান্ত আরো দু-চার কথা বলেছিল। কোন্ ফাইলটা

আগে দেখা দরকার, কোন্ প্যামফ্লেটটা অনুমোদনের অপেক্ষায় পড়ে আছে, কোন্ লেবার ইউনিটের কি আরজি।

তারপর উঠে গেছে।

তিন সপ্তাহ বাদে এসে প্রথম দিনটার এমন সমাপ্তি অভিপ্রেত ছিল না। লাবণ্য সরকারের শ্লেষ আর বিদ্রূপ গা-সওয়া। আর, সেটা যে ভালো লাগত না বা লাগে না, এমনও নয়।

অমিত ঘোষের সামনে লাবণ্যর রূপান্তর আগেও দেখেছে। তার প্রসঙ্গে মুখের বিপরীত রেখা-বিন্যাস আগেও লক্ষ্য করেছে। অবশ্য তার দুর্বলতা এত স্পষ্ট করে আগে আর বোঝা যায়নি। কিন্তু সেটা এমন গোপন কেন? ধরা পড়ে লাবণ্য তো ওর মুখের ওপর হেসে উঠতে পারত!

গোপনতা বড় সাহেবের কারণে, না ছোট সাহেবের?

পড়ন্ত দিনের মতই ধীরাপদর ভিতরেও শিথিল শ্রান্তির ছায়া পড়ছে একটা। ভিতরে ভিতরে এক অস্পষ্ট ইশারার অস্বস্তি।···অমিত ঘোষ প্রিয়জন তোমার, এ আবিষ্কারে তোমার তো খুশি হবার কথা। কিন্তু তার বদলে ওই বিমর্ষ ছায়াটা কিসের? লাবণ্য সরকারের দুর্বলতা ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কোনো দুর্বল আশায় টান পড়ল? নিজেরও অগোচর নিভৃতের কোনো?

অনেক হয়েছে, আর অফিস করে না। ধীরাপদ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।···

অমিত ঘোষের সঙ্গে দেখা আরো দিন তিনেক পরে। বাড়ি গিয়ে দেখা করবে কিনা ভাবছিল। সেদিন অফিসে এসেই শুনল চীফ কেমিস্ট লাইব্রেরিতে।

করিডোরের দেয়াল ঘেঁষে লাবণ্য নিজের ঘরের দিকে আসছিল। ধীরাপদকে তিনতলার সিঁড়ির দিকে এগোতে দেখে গতি মন্থর করল। এর মধ্যে ফাইল অনেক পাঠিয়েছে, নিজে আসেনি। বরং ধীরাপদ দিনান্তে দু-একবার তার ঘরে গেছে। যখনই গেছে ব্যস্ত দেখেছে। নয়তো শূন্য চেয়ার দেখে ফিরে এসেছে। কথাও যা দু-চারটে হয়েছে, কাজের কথাই।

—মেডিক্যাল হোমের খালি জায়গায় আপনার ওই রমেন হালদারকেই নেওয়া হয়েছে। আজ নোট গেছে।

ব্যক্তিগত সুসমাচার শোনার মত করেই ধীরাপদ হাসল একটু।—ও জেনেছে?

মিঃ মিত্রের টেবিলে ফাইল গেছে, সই হয়ে আসুক···ইচ্ছে করলে তাঁর হয়ে আপনিও সই করে দিতে পারেন।

পারে কি পারে না সেই আলোচনা এড়িয়ে ধীরাপদ আবারও হেসে পাশ কাটানোর উপক্রম করল।

আপনি অমিতবাবুর কাছে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

লাবণ্যর নিরাসক্ত দুই চোখে আগ্রহও নেই আবেদনও নেই।—সিনিয়র কেমিস্ট এসেছেন বলে যদি আমার ওপর কোনো অভিযোগ থাকে আপনি আমাকে ডেকে পাঠাবেন, যা বলার আমি বলব।

আর দাঁড়ায়নি।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ধীরাপদর মনে হল, অমিত ঘোষের কাছে যে দূতিয়ালির আশা নিয়ে মহিলা সেদিন ওর কাছে এসেছিল, সেটাই আজ প্রত্যাহার করে নিয়ে গেল। সেদিনেব সেই কথাবার্তার পর আর ওকে একটুও বিশ্বাস করে না হয়ত।

কিন্তু যে লোকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় চলেছে, এখন এই মুহূর্তে মেজাজটি তার কোন্ তারে বাঁধা জানা থাকলে ধীরাপদ অমন সপাসপ ওপরে উঠে যেত না হয়ত। কুশনে গা ছেড়ে দিয়ে মোটা একটা বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে। ধীরাপদ দূর থেকে দেখল, তারপর এগিয়ে এসে পাশেই বসে পড়ল।

অমিতাভ মুখ তুলে তাকালো শুধু একবার। গম্ভীর তন্ময়তায় আবার বইয়ের দিকে চোখ ফেরাল। আলাপের অভিলাষ নেই।

কদিন দেখা না পেয়ে আজ ভাবছিলাম আপনার বাড়ি যাব। ধীরাপদর প্রসন্ন অবতরণিকা।

দরকার আছে কিছু ? বইয়ের পাতা ওল্টালো একটা। নিরুত্তাপ প্রশ্ন।

দরকার আর কি, কতদিন দেখা নেই বলুন তো, তিন সপ্তাহ বিছানায় পড়ে রইলাম, রোজ ভেবেছি আপনি আসবেন—একদিনও এলেন না।

আপনার আপনজনেরা তো সব গেছলেন। বই থেকে মুখ তুলল না এবারেও।

মনে মনে ঘাবড়ালেও ধীরাপদ হেসে উঠল, আপনি কম আপনজন নাকি ?

জবাব নেই। গম্ভীর বিরক্তি। পড়ছে।

আর কথা বাড়ানো নিরাপদ নয়, তবু উঠে আসা গেল না। অথচ এই অবস্থায় কথা যদি বলতেই হয়, সেই কথার পিছনে নিঃশঙ্ক জোর থাকা দরকার।

ফলাফল কি হতে পারে জেনেও ধীরাপদ নিরীহ মুখে জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার মেজাজের হঠাৎ এ অবস্থা কেন ?

বই কোলের ওপর রেখে আস্তে আস্তে ঘাড় ফেরাল। দেখল। ওপরঅলা নীরব গাম্ভীর্যে যে-চোখে নিচের কর্মচারীর ধৃষ্টতা দেখে।

আপনার কাজ নেই কিছু ?

আছে। আমার কাজটা আপাতত আপনার সঙ্গেই।

আর একটু ঘুরে বসল, পড়ার পৃষ্ঠায় একটা আঙুল ঢুকিয়ে রেখে বইটা বন্ধ করল। চোখে চোখে তাকালো তারপর।—বলুন ?

বলা মাথায় রেখে মানে মানে সরে পড়লে কেমন হয় এখন ? সম্ভব নয়। তার হাতের সোনার রঙে নাম লেখা ঝকঝকে মোটা বইটার দিকে চোখ গেল। বইখানা ভারী সুদৃশ্য লাগছে যেন। বলল, আমার এই অসুখটার আগেও দেখেছি আপনি পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত, নতুন কোনো ওষুধবিষুদের প্ল্যান ভাবছেন নাকি ? কি বই এটা ?

চোখে-মুখে চিরাচরিত উগ্র অসহিষ্ণুতা দেখলেও ধীরাপদ মনে মনে স্বস্তি বোধ করত হয়ত। কিন্তু তার বদলে পাথর-মূর্তি একেবারে। বই হাতে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে।

আয়রন্ ইন্ ইন্ট্রামাস্কুলার থেরাপি, বুঝলেন ?

ধীরাপদ বিপদগ্রস্তের মত মাথা নাড়ল। বোঝেনি।

গভীর আর গম্ভীর দৃষ্টি-শলাকায় ওকে প্রায় দুখানা করে অমিতাভ গটগটিয়ে লাইব্রেরি ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ধীরাপদই কুশনে গা ছেড়ে দিল এবার। ঘেমে উঠেছে।

। তেরো ।

গোটা কারখানায় একটা নিঃশব্দ প্রতিবাদ পুষ্ট হয়ে উঠেছে। কোনো কথা-কাটাকাটি নেই, তর্কাতর্কি নেই, কোনরকম বিরুদ্ধ-আচরণ নেই, অথচ ভিতরে ভিতরে কেউ কিছু বরদাস্ত করতে রাজি নয় যেন। সেই কিছুটা কি, ধীরাপদ সঠিক ঠাওর করে উঠতে পারে না।

কারখানায় মানসিক পরিবর্তন এসেছে একটা, তাই শুধু অনুভব করে।

হিমাংশু মিত্রের কোনো নির্দেশ কেউ অমান্য করেনি এ পর্যন্ত। এমন কি ছেলেও না। প্রসাধন বিভাগের নতুন বিল্‌ডিং উঠবে শহরের আর এক প্রান্তে,

বাপের নির্দেশে মুখ বুজে সেখানে তার তত্ত্বাবধানে লেগে আছে সে। নতুন শাখা চালু করার ব্যবস্থাপত্র নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। তবু হিমাংশুবাবু ঠিক যেন খুশি নন। তাঁর মুখের আত্মপ্রত্যয়ী হাসির ভাবটুকু কমে আসছে, প্রসন্নতায় টান ধরছে। ধীরাপদর মনে হয়, যা তিনি করাচ্ছেন তাই হচ্ছে, যা তিনি চাইছেন তা হচ্ছে না। কি চাইছেন আর কি হচ্ছে না জানে না।

সিতাংশু দিনে একবার করে আসে কারখানায়। বিকেলের দিকে, ছুটির আগে। কাজ সেরেই আসে বোঝা যায়। কারণ, হিমাংশুবাবু খোঁজখবর করেন, কাগজ-পত্র দেখেন। ইদানীং তিনি প্রায়ই দিনে দুবার করে আসছেন কারখানায়। সকালে আসেনই, বিকেলের দিকেও মাঝে মাঝে আসেন। ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। কোন একটা কাজ হয়নি শুনলে খুশি হন বোধ হয়, কিন্তু সেও বড় শোনেন না। ধীরাপদর এক-এক সময় মনে হয়, কাজ করানো আর কাজ করা নিয়ে বাপে-ছেলেতে নীরব রেষারেষি চলছে একটা।

সিতাংশুর এখানকার কাজের দায়িত্ব বেশির ভাগ ধীরাপদর ঘাড়ে এসে পড়েছে। দায়িত্ব নেবার লোক আরো ছিল, কিন্তু বড় সাহেবের এই-ই নির্দেশ। এটা ব্যক্তিগত অনুগ্রহ না তার কাজের প্রতি আস্থা সে-সম্বন্ধেও ধীরাপদ নিঃসংশয় নয়। নিজের কর্মতৎপরতার অনেক অনুকূল নজির মনে মনে খাড়া করেছে। যেমন, ও আসার পর থেকে বিজ্ঞাপনের উন্নতি হয়েছে, প্রচারের কাজ ভালো হচ্ছে, সেল্ বেড়েছে, বাইরের ডাক্তাররা সুখ্যাতি করছেন, এমন কি কর্মচারীরাও তার সদয় ব্যবহারে কিছুটা তুষ্ট। কিন্তু এর কোনোটাই ধীরাপদ একেবারে নিজ বিচক্ষণতার পর্যায়ে ফেলতে পারছে না।

লাবণ্য সরকার ঘরে আসে কম, ফাইল পাঠায় বেশি। কারখানার ফাইল, মেডিক্যাল হোমের ফাইল। বড় সাহেবের ব্যবস্থা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে, কোনো আপত্তি বা অভিযোগ নেই। অথচ তার এই নিরাসক্ত চালচলন আর ব্যবহারও নিঃশব্দ প্রতিবাদের মতই মনে হয় ধীরাপদর। লাবণ্য বিকেল পর্যন্ত কাজ করে, তার পর সিতাংশু এলে দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে যায়।

এও যেন নীরব অথচ স্পষ্ট প্রতিবাদ কিছুর।

অসুখের পরে কাজে যোগ দেবার পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে ধীরাপদ বাড়তি কাজের দায়িত্ব নিয়েছে। ঠিক সাত দিনের মাথায় বড় সাহেব প্রস্তাব করলেন, অফিসের পর সন্ধ্যার দিকে তাঁর বাড়িতে জরুরী আলোচনার বৈঠক বসবে। কারখানা প্রসঙ্গে আলোচনা, আসন্ন দশম বার্ষিকী উৎসবের বিধি-ব্যবস্থার আলোচনা, প্রসাধন-শাখার ব্যবস্থাপত্রের আলোচনা। এক কথায় যাবতীয়

সমস্যালোচনা আর পরিকল্পনার বৈঠক হবে সেটা। বড সাহেব থাকবেন, ছোট সাহেব থাকবে, ধীরাপদ থাকবে, অমিতাভ থাকে ভাল নয়ত প্রয়োজনে সিনিয়র কেমিস্ট জীবন সোমকে ডাকা হবে।

লাবণ্য সরকারের থাকা সম্ভব নয়। কারণ তার সে সময়ে মেডিক্যাল হোমের অ্যাটেণ্ডান্স। সেটা অপরিহার্য।

প্রথম দিন দুই আলোচনার নামে বসেই কেটেছে এক রকম। বড় সাহেব পরে এসেছেন, আগে উঠেছেন। কিন্তু তারা দুজন সময়মত এসেছিল কিনা খোঁজ নিয়েছেন। তারা বলতে ধীরাপদ আর সিতাংশু। অমিতাভ আসেনি, আসবে কেউ আশাও করেনি। আলোচনা কিছুই হয়নি, ব্যবসায়ের উন্নতি প্রসঙ্গে ভালো ভালো দু-পাঁচটা কথা শুধু বলেছেন। অপ্রাসঙ্গিক হাল্কা রসিকতাও করেছেন একটু-আধটু। তাঁর হয়ে বক্তৃতা লিখে লিখেই নাকি ধীরাপদর মুখখানা আজ-কাল অত বেশি গম্ভীর হযে পড়েছে, অল্প বয়সের গম্ভীর মুখ দেখলে তাঁর মত বুড়োরা কি ভাবেন, মেয়েরা কি ভাবে, ছোটরা কি ভাবে, ইত্যাদি। কেয়ার-টেক বাবুকে ডেকে চা-জলখাবারের অর্ডার দিয়েছেন। ছেলে কতদূর কি এগোল না এগোল সেই খবর করেছেন একটু। চা-জলখাবার আসতে নিজের হাতে টেবিলের কাগজ-পত্র সরিয়ে দিয়েছেন।

বিকেলের এই আলোচনা-বৈঠকে বড সাহেবকে আবার আগের মতই খুশি দেখেছে ধীরাপদ।

কিন্তু মুখ গম্ভীর ধীরাপদর নয়, মুখ সারাক্ষণ থমথমে গম্ভীর সিতাংশুর। তার দিকে না চেযেই বড সাহেব সেটা লক্ষ্য করেছেন, তারপর ধীরাপদকে ঠাট্টা করেছেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ধীরাপদর চোখের সমুখ থেকে একটা রহস্যের পরদা খণ্ড খণ্ড হযে ছিঁডে গেছে। এমন নির্বোধ তো ও ছিল না কোনো কালে, এই জানা কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে এত দেরি! আসলে লাবণ্য সরকারের কাছ থেকে ছেলেকে সরিয়ে রাখতে চান বড সাহেব, তফাতে রাখতে চান। সেটা হয়ে উঠছিল না বলেই একটা অকারণ ক্ষোভের আঁচ লাগছিল সকলের গায়ে। এদের দুজনকে একসঙ্গে দেখা বা দুজনের একসঙ্গে বসে যাওয়ার খবরে তাঁর বিরূপ ভাব ধীরাপদ নিজেই তো কতবার লক্ষ্য করেছে। প্রসাধন শাখায় হোক লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ, টাকা যার আছে ও টাকা তার কাছে কিছুই নয়—ছেলেকে সরাতে হবে, তফাতে রাখতে হবে। সেই জন্তেই প্রসাধন-শাখা-বিস্তার। আর সেই জন্তেই অসময়ের এই আলোচনা-বৈঠকের ব্যবস্থা—যে-

-সময়ে নির্বাক প্রতিবাদে লাবণ্য সরকার আর সিতাংশু মিত্র সকলের নাকের ডগা দিয়ে হনহন করে কারখানা থেকে বেরিয়ে যায়। যে-সময়টা মেডিক্যাল হোমে লাবণ্য সরকারের অপরিহার্য হাজিরার সময়।

ধাঁধার জবাব মিলে যাচ্ছে।

ধারণাটা সেদিন আরো বদ্ধমূল হয়েছে মান্‌কের কথা শুনে। অবশ্য সে শোনাতে আসেনি কিছু, বরং চাপা আগ্রহে শুনতেই এসেছিল কিছু। সুযোগ সুবিধে বুঝে ঝাড়ন হাতে টেবিল-চেয়ার ঝাড়-মোছ করতে এসেছিল মান্‌কে। বড় হলঘরে ধীরাপদ একা বসেছিল। বড় সাহেব আসেন নি তখনো। ছোট সাহেব একবার এসে ঘুরে গেছে, বাবা এলে তাকে ভিতর থেকে ডেকে আনতে হবে।

ধীরাপদর সামনের টেবিলটাই মান্‌কে আগে ঝেড়ে-মুছে দেওয়ার দরকার বোধ করল। কাছে একটা মানুষ আছে যখন একেবারে মুখ বুজে থাকা যায় কি করে, ক্ষোভ কি কম জমে আছে! ঘর-দোর একদিন না দেখলে কি অবস্থা হয় সেটা ও ছাড়া আর কে জানে? তারিফ নেবার বেলায় অন্য লোক। গোটা জীবনটা তো এই এক জায়গায় গোলামী করে কেটে গেল, তবু আশা বলতে থাকল কি? যেদিন পারবে না, দেবে দূর করে তাড়িয়ে! ব্যস, হয়ে গেল।

ধীরাপদকে শুনিয়ে আপন মনে খানিক গজগজ করে হঠাৎ কাছে ঝুঁকে এলো মান্‌কে। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, বাবু, ছোট সাহেব রাজি হলেন বুঝি?

ধীরাপদ প্রশ্নটা সঠিক বুঝে উঠল না। মান্‌কের মুখে চাপা আগ্রহ আর অনধিকার চর্চার সঙ্কোচ।

কিসে রাজি হলেন?

ওই যে বিয়ের। কেয়ার-টেক বাবু বলছিলেন আসছে ফাল্গুনেই হতে পারে। আপান জানেন না?

ধীরাপদ জানে না গোছের মাথা নাড়ল। কৌতূহল মেটাতে এসে কিছুটা কৌতূহলের খোরাক দিতে পেরেছে বলেও মান্‌কের তৃপ্তি একটু। বড় সাহেবের নেকনজরের এই ভালো-মানুষটাকে তেমন চটকদার খবর কিছু দিতে পারলে আখেরে ভালো ছাড়া খারাপ আর কি হতে পারে? অতএব যতটা জানে আর যতটা ধারণা করতে পারে প্রসন্ন উত্তেজনায় তার সবটাই বিস্তার করে ফেলল সে।

...রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা। রাজকন্যে নয়, ভুল বলল, কেয়ার-টেক বাবু বলেছিলেন 'মিনিসটারে'র কন্যে। 'মিনিসটার' মন্ত্রী না বাবু? কেয়ার-

টেক বাবু তো আবার ইন্‌রিজি বলতে পেলে বাংলা বলেন না! তাঁকে অর্থাৎ হবু শশুরকে এই বাড়িতেই ওরা বারকতক দেখেছে। মেয়ে নিয়েও বেড়াতে এসেছিলেন একদিন। পরীর মত মেয়ে। দু গালে আপেলের মত রঙ বোলানো আর ঠোঁট দুটো টুকটুক করছে লাল—'লিপটিকে'র লাল, চিত্তির-করা পটে আঁকা মুখ একেবারে। সেই রেতেই তো বড় সাহেবের কি রাগ ছোট সাহেবের ওপর—ছোট সাহেব যে বাড়ি ছিলেন না!

মনের মত শ্রোতা পেয়ে চাপা আনন্দে আরো একটু কাছে ঘেঁষে এসেছে মান্‌কে।—আসল কথা কি জানেন? ছেলে এ বিয়েতে নারাজ, তাঁর বোধ হয় মেম-ডাক্তারকেই মনে ধরেছে—কাউকে বলবেন না যেন আবার বাবু।

ধীরাপদ মাথা নাড়তে আশ্বস্ত হয়েছে। মান্‌কের আর কি, সব তো শোনা কথা, কেয়ার-টেক বাবুর বলা কথা। তাঁর তো 'সব্বকথায়' আড়ি পাতার সুবিধে -যতক্ষণ বাড়ি থাকেন সাহেবরা, আর জেগে থাকেন, দোরগোড়ায় ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তো তাঁকে—তাঁরই শোনার সুবিধে সব। তিনি বলছিলেন, এই বিয়ে নিয়েই ছেলেতে বাপেতে মন-কষাকষি। আর বলছিলেন, বড় সাহেবের ইচ্ছে যখন হয়েছে, বিয়ে হবেই, এই ফাল্গুনেও হতে পারে।

এরপরেই মান্‌কের বিরূপতা কেয়ার-টেক বাবুকে কেন্দ্র করে। কেয়ার-টেক বাবু নাকি ওকে শাসিয়েছেন, বিয়েটা হয়ে গেলে ও টেরটি পাবে। ও যেন কাজ না করেই এতকাল আছে এ বাড়িতে—খায়-দায় আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়! হাতে পায়ে খেটে খায়, ওর ভয়টা কিসের? আর বিয়ে হচ্ছে ভালই তো হচ্ছে—মেয়েছেলে না থাকলে গেরস্ত-বাড়ি তো মরুভূমির মত—কি বলেন বাবু, ভয়টা কিসের?

ধীরাপদ মাথা নেড়ে আবারও আশ্বাস দিয়েছে, ভয় নেই। নিজের অগোচরে মান্‌কে একটা সত্যি কথাই বলে ফেলেছে। বাড়িটাকে গৃহস্থ-বাড়ি বলে কখনো মনে হয়নি বটে, আর এ-বাড়ির মানুষ কটিও যেন ঘরের মানুষ নয়। এত নিরাপদ সচ্ছলতা সত্ত্বেও ছন্নছাড়ার মত এদের জীবন শুধু ভাসছেই, কোথাও নোঙর নেই।

গৃহস্থ-তত্ত্ব নিয়ে তেমন মাথা ঘামানো হয়ে ওঠেনি ধীরাপদর। বড় সাহেব বা ছোট সাহেবের হাবভাব রকম-সকমের অর্থ স্পষ্ট। কিন্তু লাবণ্য সরকারের এই পরিবর্তনের অর্থ কী? সে হঠাৎ এত গম্ভীর কেন? অমিতাভ ঘোষের প্রতি সেদিনের সেই গোপন দুর্বলতা সত্যি হলে—সত্যি বলেই বিশ্বাস ধীরাপদর—তার তো এ ব্যবস্থায় খুশি হবার কথা!

…না কি ছোট বিপদের আড়ালে ছিল, এখন বড় বিপদের সম্ভাবনা কিছু ?

যে ধাঁধাটা সেদিন অমন সুন্দর মিলে গিয়েছিল, সেটা তেমন আর মিলছে না এখন। আবারও জট বেধেছে কোথায়।

ছোট একটা ঘটনায় অমিতাভ ঘোষের নীরব অসহযোগিতা স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

প্রহসন কৌতুকাবহ।

ভাবনা সত্ত্বেও ধীরাপদর হাসিই পেয়েছে। আরো হাসি পেয়েছে লাবণ্যর দুরবস্থা দেখে। সরকারী স্বাস্থ্যনীতির দৌলতে ওষুধের কারখানায় বছরে দু-পাঁচটা বড়সড় অর্ডার আসে। শুধু এখানকার নয়, বিভিন্ন রাজ্য সরকারেরও। এবারের যে অর্ডারটা এসেছে সেটা খুব বড় না হলেও তেমন ছোটও নয়। কিন্তু ছোট হোক, বড় হোক, চুক্তি অনুযায়ী সেটা সরবরাহ করাই চাই। অন্যথায় সুনাম নষ্ট, মর্যাদা হানি।

কোনো ওষুধের দেড় লক্ষ ইন্‌জেক্‌শান অ্যামপুলের অর্ডার। বছর দুই আগে এই ইন্‌জেক্‌শানই আর একবার সরবরাহ করা হয়েছিল। আবারও চাই। আগের বারে এর প্রধান কর্মকর্ত্রী হিসেবে লাবণ্য সরকারের নাম স্বাক্ষর ছিল। অর্থাৎ, ওষুধ তার তত্ত্বাবধানে তৈরি করা হয়েছিল।

কিন্তু কাজটা আসলে করিয়েছিল অমিতাভ ঘোষ। তার প্রীতির আমেজে তখনো ঘা পড়েনি এমন করে। লাবণ্যকে মর্যাদা এবং পরিচিতি লাভের এই সুযোগটুকু দিতে চীফ কেমিস্টের দ্বিধা ছিল না তখন।

এ-সব ওষুধের ফরমুলা বা উপাদান-সমষ্টি ক্রেতা বিক্রেতা নির্মাতা সকলেরই চক্ষুগোচর। গোপন নেই কিছুই। ফরমুলা আর পরিমাণ বা পরিমাপ লিখেই দিতে হয়। তবু প্রস্তুত-প্রণালীর মধ্যে প্রত্যেক কোম্পানীরই গোপন বৈশিষ্ট্য কিছু থাকে, যা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। এই প্রস্তুত-প্রণালী বা প্রোসেসিংএর দক্ষতা যে উপেক্ষার বস্তু নয়, সেটা শুধু ধীরাপদ নয়, লাবণ্য সরকারও এই প্রথম বোধ হয় তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল।

ওষুধ এবারে তৈরি হচ্ছিল সিনিয়র কেমিস্ট জীবনবাবুর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু প্রতিবারই স্যাম্পল করে দেখা গেল ওষুধটা ঘোলাটে দেখাচ্ছে কেমন আর অ্যামপুলে তলানির মত পড়ছেও একটু। সপার্ষদ জীবন সোম অনেক কিছু করলেন। ওষুধের ঘোলাটে ভাবটা যদিই বা কাটানো গেল, তলানি থেকেই যাচ্ছে। ওদিকে হাতে সময়ও বেশি নেই।

কিন্তু সমস্তার পরোয়া আর যে করুক, অমিতাভ ঘোষ করবে না। তার সাফ জবাব, ও ওষুধ আগের বারে যে তৈরি করিয়েছে সে-ই করুক, তার দ্বারা হবে না।

অর্থাৎ লাবণ্য সরকার করুক। আগের বারে সে-ই করেছে। কাগজে কলমে তার স্বাক্ষর আছে।

লাবণ্য সরকারের ডাক পড়েছিল। তাকে যেতে হয়েছিল। কিন্তু দু বছর আগে যে কাজ সে পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছে শুধু, এতদিন মন থেকে তা ধুয়ে মুছে গেছে। তার সঙ্কট। আর সেই জন্যেই পরিস্থিতিটা সকলের উপভোগ্য যেন।

সমাধান না হলে ছোট সমস্তাও বড় হয়ে দাঁড়ায়। রাগে দুঃখে লাবণ্যই হয়ত সিতাংশুকে বলেছে ব্যাপারটা। ছেলের ক্রুদ্ধ অভিযোগ থেকে বাপেরও জানতে বাকি থাকেনি। কোম্পানীর সুনাম আর মর্যাদার প্রশ্ন যেখানে সেখানে এ-সব ছেলেমানুষি আর কতকাল বরদাস্ত করা হবে?

ছেলের মত বড় সাহেব অতটাই উগ্র হয়ে ওঠেননি। ব্যাপারটা বুঝে নেবার পর লাবণ্যর বিব্রত মুখের দিকে চেয়ে হাসি গোপন করেছেন বলে মনে হয়েছিল ধীরাপদর। বড় সাহেবের কাছে সত্যি জবাবদিহিই করে গেছে লাবণ্য সরকার। আগের বারের কাজটা সে নিজে হাতে করেনি। পাশে ছিল। তাকে সই করতে বলা হয়েছিল, সে সই করেছিল।

তারা চলে যেতে হিমাংশুবাবু সরস মন্তব্য করেছেন, এবারেও পাশে থাকলে গোল মেটে কি না সে চেষ্টাই তো আগে করা উচিত ছিল। কি বল?

কিন্তু সমস্যাটা হাল্‌কাও নয়, হাসিরও নয়। বড় সাহেব ভুরু কুঁচকে ভেবেছেন তারপর।

সকলেই একটা দ্রুত নিষ্পত্তি আশা করছে, ফয়সালার কথা ভাবছে। এ ধরনের ছোটখাটো গোলযোগে এই ব্যতিক্রম নতুন। আগে মেঘ অনেকটা এক-দিকেই ঘনাত, এক তরফাই গর্জাত। তখন সময়ের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করা হত খানিকটা।

এখন বিপরীতমুখী দুটো মেঘ দেখছে ধীরাপদ। সংঘাতের আশঙ্কা।

চুপচাপ অপেক্ষা করার মত সময় কম হাতে। এই পরিস্থিতিতে আপাতত যা করে রাখা উচিত, সে দিকটা কেউ ভাবছে না। চিঠি লিখে বা তদ্‌বির করে ইন্‌জেক্‌শান সরবরাহের নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ বাড়িয়ে রাখা দরকার। কোনো কোম্পানীর পক্ষে সেটা গৌরবের নয় বটে, কিন্তু তেমন প্রয়োজনে অস্বাভাবিকও কিছু নয়। সে-চেষ্টাটা ধীরাপদ নিজেই করে দেখতে পারে। কিন্তু করবে কি

করে, বড় সাহেবের কোনো নির্দেশ নেই। ভাগ্নেকে ডেকে হুকুম না করুন অনুরোধ করতে পারতেন। তাও করেছেন মনে হয় না।

বাপের কাছে নালিশ পেশ করেও সিতাংশুর মেজাজ জুড়োয়নি। ধীরাপদর ঘরেও এসেছিল সেই দিনই। কড়া মন্তব্য করেছে, কোম্পানীর প্রোসেসিং মেথড কারো নিজস্ব সম্পত্তি নয়—সেটা তাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া দরকার, নিজে কাজ করুক না করুক গেলবারে ও ওষুধ কি ভাবে তৈরি হয়েছিল তা সে দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দিতে বাধ্য।

স্পষ্ট করে জানিয়ে কে দেবে অথবা কে তাকে এই বাধ্যতার মধ্যে টেনে নিয়ে আসবে সেটা মুখের ওপর জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারেনি বলেই ধীরাপদ চুপ করে ছিল। সিতাংশু সমস্যাটা বড় করে দেখছে কি মনের ক্ষুব্ধ মুহূর্তে একটা ওলট-পালট গোছের বোঝাপড়াই বেশি চাইছে, সঠিক বোঝা ভার। বাড়ির সান্ধ্য-বৈঠকে আবার এই প্রসঙ্গই উত্থাপন করেছিল সে। কিন্তু হিমাংশুবাবু এক কথায় সে আলোচনা বাতিল করে দিয়েছেন। বলেছেন, তুই পারফিউমারি ডিভিশান নিয়ে আছিস সেদিকটাই ভাব না এখন, এ নিয়ে মাথা গরম করবার দরকার কি—

ধীরাপদর ধারণা, দরকার দুই কারণে। প্রথম, তার বর্তমান মনের অবস্থায় মাথা গরম করার মতই খোরাক দরকার কিছু। দ্বিতীয়, মানকের রাজকন্যের কাহিনীটা গোপন ষড়যন্ত্র নয় হিমাংশু মিত্রের। তাই ছেলের বিয়ে দিয়ে রাজ-কন্যে ঘরে আনার অভিলাষ লাবণ্যরও একেবারে না জানার কথা নয়। এ অবস্থায় নিজের অবিমিশ্র প্রীতির নজির হিসেবে লাবণ্যর সঙ্কট-মোচনের চেষ্টাটা সিতাংশুর পক্ষে স্বাভাবিক। লাবণ্যের এই হেনস্থার কারণ অমিতাভ না হয়ে আর কেউ হলে তাকে ভাল করেই শিক্ষা দিতে পারত। শিক্ষা দিয়ে নিজের এই বিড়ম্বনার মুহূর্তে লাবণ্যকে তুষ্ট করা যেত।

সেটুকুও পারা যাচ্ছে না বা করা যাচ্ছে না।

দু দিন ধরে লাবণ্য সরকারও ধীরাপদর ঘরে আগের থেকে বেশি আসছে একটু। সরকারী সাপ্লাইয়ের গোলযোগের ব্যাপারটা বড় সাহেবের কানে ওঠার পর থেকে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি কথাও উত্থাপন করেনি বা কোন রকম আগ্রহ দেখায়নি। শুধু ফাইল আনা-নেওয়া বা নোট-বিনিময়ের ব্যাপারটা আগের মত হাতে-হাতে বা মুখে-মুখে সম্পন্ন করছে।

দুটো দিন ধীরাপদও একেবারে চুপচাপ ছিল, তারপর সে-ই তুলল কথাটা। না তুলেই বা করবে কি, ওদিকে সিনিয়র কেমিস্ট জীবনবাবুও নির্লিপ্ত। তাঁর

কোন দায়-দায়িত্ব নেই যেন। তাঁকে হুকুম করলে ওই ফরমুলা নিয়ে তিনি অন্য ভাবে ওষুধ তৈরি করে দিতে পারেন। আগে কি হয়েছিল না হয়েছিল সে ভাবনা তাঁর নয়।

যে ফাইলের খোঁজে এসেছিল লাবণ্য সরকার, সেটা তার হাতে না দিয়ে ধীরাপদ বলল, বসুন। তারপর ফাইল এগিয়ে দিতে দিতে সরল ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, সরকারী অর্ডারটা সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা হল কিছু?

বসতে বলা সত্ত্বেও লাবণ্য বসত কিনা সন্দেহ। প্রশ্ন শুনে বসল। হাতের কাছে ফাইলটা টেনে নেবার ফাঁকে নিজেকে আরো একটু সংযত করে নিল হয়ত।
—ব্যবস্থা হল কি না সেটা তো আমার থেকে আপনার অনেক ভালো জানার কথা, বড় সাহেব আপনাকে বলেননি কিছু?

সেদিন বড় সাহেবের কাছে লাবণ্য জবাবদিহি করে আসার পরেও শুধু ধীরাপদই তাঁর ঘরে ছিল—সেই ইঙ্গিত। মাথা নাড়ল, কাজের কথা কিছু বলেন নি। ভাবল একটু, আমার মনে হয় লেখালেখি করে সাপ্লাইয়ের মেয়াদটা আরো কিছু বাড়িয়ে নেওয়ার দরকার।

সেই দরকারের পরামর্শটা কি বড় সাহেবকে আমি দেব?

ধীরাপদ ফিরে জিজ্ঞাসা করল, আমাকেই বলতে বলছেন?

লাবণ্য চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক, সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, না বলাই ভালো, বললে গোলমালটা মিটে যেতে পারে।

অর্থাৎ, গোলমালটা মিটলে আপনাদের মজা মাটি।

কারখানার এ পরিস্থিতি ভালো লাগছিল না, আলোচনার উদ্দেশ্যই প্রধান ছিল। কিন্তু সেটা আর হল না। টিপ্পনীটা একেবারে মুখ বুজে হজম করার মত নয়। বিশ্বাস তো করেই না, উল্টে মজা দেখার দলের একজন ভাবে তাকেও। মুখের হাসিটুকু আবরণ মাত্র, ভিতরে ভিতরে ধীরাপদও তেতে উঠল।

লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল, আর কিছু বলবেন?

না…। এই যখন ভাবেন, কি আর বলার আছে!

লাবণ্যর এরপর ওঠার কথা, উঠে চলে যাবার কথা। উঠল না। আবারও কিছু বলার ইন্ধন পেল বোধ হয়। মুখের দিকে চেয়ে থেকে হাসতে চেষ্টা করল একটু। হাসির আভাসে চাপা বিদ্বেষটুকু ঝলসে উঠল একবার। বলল, অর্ডার সাপ্লাইয়ের আর মাত্র ছ-সাত দিন বাকি, সবাই যে-রকম চুপচাপ বসে আছেন কি আর ভাবতে পারি?

ঠাণ্ডা দুই চোখ ধীরাপদর মুখের ওপর আটকে আছে তেমনি। জবাবের প্রতীক্ষা করল একটু।—রোজই তো দুবেলা বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় শুনি, তাঁর সঙ্গে এ পরামর্শটা করে ওঠার সময় আপনি এতদিনেও পেয়ে ওঠেননি বোধ হয় ?

বিদ্বেষের হেতু বোঝা গেল। এত কথার মধ্যে এই ব্যক্তিগত খোঁচাগুলি না থাকলে ধীরাপদ তার সত্য দুর্গতির দিকটাই বড় করে দেখত। সে-চেষ্টাও করল না আর, আলোচনার মেজাজ আগেই গেছে। নির্লিপ্ত জবাব দিল, বড় সাহেব সব জেনেও কিছু বলছেন না যখন, পরামর্শ আর কি করব। এই ব্যাপারে আমার থেকেও হয়ত আপনার ওপরেই তিনি বেশি নির্ভর করে আছেন।

লাবণ্যর মুখভাব বদলাল, চকিত বিস্ময়।—তিনি কিছু বলেছেন ?

ঘুরিয়ে জবাব দিল, না, ওই সেদিনের পরে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলেন নি।

সেদিন কি বলেছেন ?

বক্তব্যের জালটা মনোমত গুটিয়ে এনেছে ধীরাপদ। দ্বিধাগ্রস্ত জবাব দিল, তাঁর ধারণা আপনি ইচ্ছে করলেই এই সামান্য গণ্ডগোল মিটে যেতে পারে।

কি করে ?

পাশে থাকার কথাটা বলে উঠতে পারল না। বলল, আগের মতই অমিত-বাবুর সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করে।

সাদা পর্দায় রঙ ঠেকানো যায় না, ধীরাপদর সাদা মুখ সত্ত্বেও রঙ গোপন থাকল না। যে-ভাবেই বলুক লাবণ্যর যেটুকু বোঝবার বুঝে নিল।

একটা মানুষকে একেবারে গোটাগুটি দুই চোখের আওতার মধ্যে নিয়ে আসতে সময় মন্দ লাগে না। লাবণ্য তাই নিয়ে এসেছে, সময়ও লেগেছে। তারপর খুব ঠাণ্ডা আর খুব শান্ত মুখে বলেছে, বড় সাহেবের এই ধারণাটা আগে একবার তাহলে তাঁর মুখ থেকেই শুনে নিই, কি বলেন ?

স্ত্রীলোকের সকল তর্জন সয়, ভাতের তর্জন নয়। সেই গোছেরই হয়ে দাঁড়াল উক্তিটা। সেই রকমই কণ্ঠস্বর। ধীরাপদ মুখ তুলল। চোখে চোখ রাখল। দৃষ্টি-বিনিময় নয়, দৃষ্টি-বর্ষণ করল একপ্রস্থ। তারপর নিঃশঙ্ক জোরালো জবাব দিল, সেই ভালো। আমার কথাটাও বড় সাহেবকে বলবেন অনুগ্রহ করে, যেটুকু প্রশংসা লাভ হয়…

লাবণ্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে, বারান্দা ধরে নিজের ঘরে চলে গেছে। ধীরাপদর তখনো চোখ সরেনি, পলক পড়েনি।

তখনো যেন দেখছে চেয়ে চেয়ে।

প্রীতি নয়, দরদ নয়, সেই দেখায় অকরুণ গ্রাসের নেশা।

লাল বস্তুটির সঙ্গে স্নায়ুর বিশেষ একটা যোগ আছে। লালের মত লাল কিছুর সান্নিধ্যে উত্তেজনা বাড়ে, উত্তম বাড়ে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে হিমাংশু মিত্রের টকটকে লাল গাড়িটার সামনে এসে পড়লে ধীরাপদর স্নায়ু একটা নাড়াচাড়া খায় কেমন, কিছুক্ষণের জন্য অন্তত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

বিশেষ করে সেই গাড়িটা যখন চারুদির বাড়ির সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

আগেও দেখেছে। আগেও তাই হয়েছে।

কিন্তু ফেরা শক্ত। কারণ ড্রাইভারকে ফিরতে বলা শক্ত। লাল গাড়ির একেবারে পিছন ঘেঁষে স্টেশান ওয়াগনটা থামিয়েছে সে। ধীরাপদ অন্যমনস্ক ছিল। তাছাড়া সামনের দিকে মুখ করে না বসে হাত-পা ছড়িয়ে আড়াআড়ি হয়ে বসেছিল। গাড়িটা থামতে ঘাড় ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে অতি পরিচিত লালের ধাক্কা।

সাড়াশব্দ না পেয়ে ড্রাইভার পিছন ফিরে চেয়ে আছে। নামা দরকার। ধীরাপদ একটু ব্যস্তসমস্ত ভাবেই নেমে পড়ল। আর একবারও পায়ে হেঁটে চারুদির বাড়ির আঙিনায় ঢুকে পড়ে এই লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। দেখে নিঃশব্দে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই আসা বা যাওয়ার কোনোটাই সকলের অগোচরে ঘটেনি। পার্বতী দেখেছিল। চারুদি অনুযোগ করেছিলেন।

আজ আর পায়ে হেঁটে নয়, কোম্পানীর স্টেশান ওয়াগনে একেবারে জানান দিয়েই ভিতরে ঢুকেছে সে। এতক্ষণে শুধু পার্বতী বা চারুদি নয়, ওই লাল গাড়ির মালিকও টের পেয়েছেন নিশ্চয়, কেউ এলো। তাছাড়া চারুদির জানাই আছে কে এলো, কে আসবে। ফেরার প্রশ্ন ওঠে না।

…কিন্তু এই লাল গাড়ি এ-সময়ে এখানে থাকার কথা নয়। ঘণ্টাখানেকও হয়নি চারুদি টেলিফোন করেছিলেন তাকে। তাঁরই তাগিদে আসা। তাগিদটা জরুরী মনে হয়েছিল ধীরাপদর। এ-সময়ে লাল গাড়ি কি তাহলে চারুদিও প্রত্যাশা করেননি? ধীরাপদ অবশ্য একটু আগেই এসে পড়েছে।

বাইরের ঘরে যে অবাঙালী ভদ্রলোকটি বসে, তাঁকে আগেও কোথায় দেখেছিল হয়ত। এই বাড়িতেই কি…? মনে পড়েছে, এই বাড়িতেই। চারুদির সেই

ফুলের সমঝদার, ফুল-বিশেষজ্ঞ। অমিতাভ ঘোষকে সঙ্গে করে চারুদি নিজের মোটরে করে যেদিন ওকে সুলতান কুঠি থেকে এখানে ধরে এনেছিলেন, সেই দিন দেখেছিল। বাইরে লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে না থাকলে ধীরাপদ এ-সময় এই লোকের উপস্থিতির দরুন বিরক্ত হত। এখন খারাপ লাগল না। লোকটির কোলের ওপর একপাঁজা বিলিতী সাপ্তাহিক। দীর্ঘ প্রতীক্ষার জন্যে প্রস্তুত মনে হল। মুখ তুলে ভদ্রলোক একবার দেখে নিলেন শুধু। ধীরাপদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

—আপনি ভিতরে আসুন। অন্দরের দোরগোড়ায় পার্বতী।

ভিতরের দরজা অতিক্রম করে ধীরাপদ দাঁড়িয়ে পড়ল। দ্বিধাগ্রস্ত।

মা ও ঘরে আছেন। পার্বতীর যান্ত্রিক নির্দেশ।—ওঁরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

উনি নয়, ওঁরা। ধীরাপদ আবারও হকচকিয়ে গেল। কিন্তু পার্বতীর অভিব্যক্তিশূন্য মুখ দেখে কিছু আবিষ্কার করার উপায় নেই।

সামনের ঘরটা ছাড়িয়ে যাবার আগেই চারুদির গলা ভেসে এলো।—ধীরু এলো নাকি রে, ভেতরে আসতে বল্।

জবাব না দিয়ে পার্বতী আবার ঘুরে দাঁড়াল শুধু। পুরুষের এই দ্বিধা আর সঙ্কোচ তার কাছে একেবারে অর্থহীন যেন।

পায়ে পায়ে ধীরাপদ ঘরে এসে দাঁড়াল। পায়ের ওপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন চারুদি। পরনের বেশ-বাস আর মুখের হাল্‌কা প্রসাধন দেখে মনে হল, কোথাও বেরুবেন বা এই ফিরলেন কোথাও থেকে। হাতের কাছে বিছানার ওপর একটা ক্যাটালগের মত কি।

এসো, তাড়াতাড়িই তো এসে গেছ। খাট ছেড়ে মাটিতে নেমে দাঁড়ালেন চারুদি, গাড়িতে এলে বুঝি, বোসো।

খাটের একদিকে বসতে বসতে মুখের সপ্রতিভ ভাবটুকুই শুধু বজায় রাখতে চাইছিল ধীরাপদ। কিন্তু সেটা পারা যাচ্ছে না নিজেই বুঝছে। সকালে কারখানায় হিমাংশু মিত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তখনো তো হাত তুলে নমস্কার করেনি ধীরাপদ, অথচ এখন করে বসল। ঘরের মাঝামাঝি আরামকেদারায় গা এলিয়ে হিমাংশুবাবু পাইপ টানছেন, নমস্কারের জবাবে হাত-মাথা একটু নড়েছে কি নড়েনি। মনে হল, ওর অস্বস্তিটা টের পেয়েছেন বলেই চোখ দুটো বেশি হাসি-হাসি দেখাচ্ছে।

চারুদি আর একটু কাছে এসে দাঁড়িয়ে কিছুটা গম্ভীর মুখে টেলিফোনের অসমাপ্ত

অনুযোগটাই আগে শেষ করে নিলেন।—তোমাদের ব্যাপারখানা কি, এখানে একটা লোক পড়ে আছি কারো মনেই থাকে না? না ডাকলে বা না তাগিদ দিলে কেউ আসবে না, কেমন?

তোমাদের বা কেউ বলতে আর কে, সেটা অনুমানে বোঝা গেল। আর কেউ আসে না কেন ধীরাপদর অজ্ঞাত। আসে না তাও এই প্রথম শুনল। এই কদিনের কাজের ঝামেলায় চারুদির কথা মনেও পড়েনি ধীরাপদর। কিন্তু তার আগে যে ও অসুখে পড়েছিল সেটা চারুদিরও মনে নেই বোধ হয়।

ধীরাপদর হয়ে জবাবটা হিমাংশু মিত্র দিলেন।—হি ইজ রিয়েলি ভেরি বিজ-ই নাও…।

ফলে চারুদি আগে তাঁকেই শায়েস্তা করতে উদ্যত হলেন যেন।—এত ব্যস্ত কিসের, ওকে ভালো মানুষ পেয়ে সকলের সব কাজ ওর ঘাড়ে চাপাচ্ছ তোমরা?

জবাব না দিয়ে হিমাংশুবাবু সকৌতুকে ঠোঁটের পাইপটা দাঁতের আশ্রয়ে রাখলেন। চারুদি ধীরাপদর দিকে ফিরলেন আবার, ছদ্ম তর্জনের সুরে বললেন, আমি ও-সব শুনতে চাইনে, তোমার আসল মালিক আমি, মনে আছে তো? সেটা ভুলেছ কি চাকরি গেল—

হাসতে লাগলেন।

হিমাংশুবাবুর রসিকতা আরো পরিপুষ্ট। পাইপটা হাতে নিয়ে ধীরাপদর উদ্দেশে বললেন, তুমি ওঁর চাকরিটা নিরাপদে রিজাইন দিয়ে ফেলতে পারো, আমি তোমাকে ওর থেকে অন্তত সম্মানের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিতে রাজী আছি।

দায়ে পড়েই চারুদিকে চোখ রাঙাতে হল আবার, ত্থাখো, লোক কাড়তে যেও না বলে দিচ্ছি। হেসে ফেললেন, তোমার ওপর সেই কবে থেকে রাগ ওর জানো না তো!

ধীরাপদর মনে হল, ওর উপস্থিতিটা এঁরা যেন একটু বেশি সহজভাবে নিয়েছেন। কিন্তু ধীরাপদর সহজ হওয়া দূরে থাক, শেষের পরিহাসে অস্বস্তির একশেষ।

চারুদিও আর বাড়লেন না, ওর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি একেবারে চুপচাপ কেন, মুখও তো শুকনো দেখি—বোসো, খাবার দিতে বলি। হিমাংশুবাবুর দিকে ফিরলেন, তোমার কথা থাকে তো সেরে নাও, একটু বেরুতে হবে—বাইরে ভদ্রলোক অনেকক্ষণ বসে আছেন, একবার দেখা দিয়ে আসি।

পার্বতীকে খাবার দিতে বলে বসবার ঘরের দিকে গেলেন ফুল-বিশেষজ্ঞকে দেখা দিতে। এইখানে বসে আপাতত জলযোগের ইচ্ছে ছিল না ধীরাপদর,

কিন্তু কি জানি কেন বাধাও দিতে পারল না। এখানে তাকে ডেকে এনে কোন্ কথা সেরে নেওয়া হবে সেটা আঁচ করার তাগিদে খেয়ালও ছিল না হয়ত।

হিমাংশুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, অমিত এলো না···ফ্যাক্টরীতে ছিল না বুঝি?

ধীরাপদ অবাক আবারও। চারুদি টেলিফোনে তাকেই আসতে বলেছেন, আর কারো নামোল্লেখও করেননি। সে কথা না বলে মাথা নাড়ল শুধু, ছিল না।

কাল এসেছিল?

ধীরাপদ নিরুত্তর।

তার কি উদ্দেশ্য, কি অভিযোগ জানো কিছু? কদিন আসছে না?

প্রথম জবাবটা এড়িয়ে ধীরাপদ বলল, লাইব্রেরিতে আসেন প্রায়ই···।

নির্জলা সত্যি নয়, সেটা ওর বিব্রত মুখের দিকে চেয়েই বোঝার কথা। লাইব্রেরীতে আসার প্রসঙ্গে আর এক জিজ্ঞাসার দিকে ঘুরলেন তিনি।—অনেক দিন ধরেই কি পড়াশুনা নিয়ে আছে শুনছি, আর অ্যানালিটিক্যালএ এসে কি-সব পরীক্ষা-টরীক্ষাও করে নাকি—কি করে, কি পড়ে?

কি করে ধীরাপদ জানে না, আর কি পড়ে জানতে যাওয়ার ফলে তো সেদিন বিষম সঙ্কট নিজেরই। বইয়ের নামটাও মনে নেই।

হিমাংশুবাবুর মুখ দেখে মনে হল, ভাগ্নের সম্বন্ধে তার এই কিছু না জানাটা তিনি ঠিক আশা করেন না। মুখে অবশ্য সেটা বলেননি। বলেছেন, আবার কিছু পড়াশুনার জন্য বা দেখাশুনার জন্য বাইরে যেতে চায় তো যেতে পারে—বলে দেখতে পারো।

মন্দ প্রস্তাব কিছু নয়, তবু কি জানি কেন ধীরাপদর ভালো লাগল না খুব। ভালো বোধ হয় আর একজনেরও লাগল না। চারুদির। ঘরে ফিরে এসে খাটের দিকে এগোতে এগোতে তিনিও শুনলেন। হিমাংশুবাবুর দিকে তাকালেন একবার, তারপর ধীরাপদর পাশে বসে বললেন, গেলে তো ভালই হয়, এখানে বসে বসে শুধু শুধু শরীর নষ্ট—যায় যদি, এবারে আমিও ওর সঙ্গে যেতে রাজি আছি, তাহলে আর গেলবারের মত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে চাইবে না।

অমিত ঘোষ গেলে তিনিও দীর্ঘদিন বাইরে থাকতে প্রস্তুত। ধীরাপদর ধারণা, কথা ক'টা হিমাংশুবাবুকেই শোনালেন তিনি।

ওদিকে মুখের মোটা পাইপটা হাতে চলে এসেছে। ইজিচেয়ারের হাতলে মৃদু মৃদু ঠুকছেন ওটা। অর্থাৎ, কথা না বুঝলে তিনি নাচার। একটু বাদে

ধীরাপদর দিকে ঘুরে বসলেন, ওই সরকারী অর্ডারটার কি হল?

এসে পর্যন্ত ধীরাপদ যে ভাবে মুখ বুজে আছে, নিজেরই বিসদৃশ লাগছে। কিন্তু এও মুখ বুজে থাকার মতই প্রশ্ন। বলল, একভাবেই তো আছে, কিছু হয় নি।

অমিত কি বলে, করবে না? বিরক্তির স্বর।

কথা হয়নি···

তাকে বলোই নি কিছু এখনো পর্যন্ত? শুধু বিরক্ত নয়, এবারে বিস্মিতও একটু।—কবে আর বলবে, কিছু যদি না-ই হয় চুপ করে বসে আছ কেন, অর্ডার ক্যানসেল করে দাও। জীবনবাবু কি বলেন, পারবেন?

চেষ্টা করছেন।—

মন-রাখা উত্তর যে সেটা তিনিও বুঝলেন। চেষ্টার ওপর ভরসা না রেখে নির্দেশ দিলেন, কালকের মধ্যেই অমিতের সঙ্গে দেখা করে জেনে নাও, কি করবে, হবে কি হবে না কি বলে আমাকে জানাবে। চুপচাপ খানিক।—তোমাকে যা বলব ভেবেছিলাম···তোমারও আর সকলের মত তাকে পাশ কাটিয়ে চলার দরকার নেই, সে তোমাকে পছন্দ করে। তাকে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার, কেউ তার শত্রু নয় এখানে, সকলেই তার গুণ বোঝে। নতুন সিনিয়র কেমিস্ট নেওয়া হয়েছে কাজের সুবিধের জন্যে। তার সঙ্গেই পরামর্শ করে নেবার কথা, শুধু অপমানের ভয়েই এরা কেউ এগোতে চায় না তার কাছে। জীবন সোম এসেছেন বলে আপত্তি হয় তো দেখে শুনে অন্য লোক নিক, আমি তাঁকে পারফিউমারী ব্রাঞ্চে সরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু ব্যবসা ব্যবসার মতই চলা দরকার, এইভাবে চলে কি করে? তাছাড়া, হাসি নেই আনন্দ নেই ধৈর্য নেই—নিজেও তো অসুখে পড়ল বলে। সুযোগ সুবিধে মত কথাবার্তা কয়ে দেখো, ডোণ্ট কীপ হিম অফ!

অমিত ঘোষের সঙ্গে হৃদ্যতা বজায় রেখে চলার একটু-আধটু আভাস বড় সাহেব আগেও দিয়েছেন। এ-রকম স্পষ্ট নির্দেশ এই প্রথম। ধীরাপদ অনুগত গাম্ভীর্যে কান খাড়া করে শুনছে। এইজন্যেই আজ এখানে ডেকে আনা হয়েছে তাকে? এর পিছনে সমস্যা বড় কি চারুদির মন রাখার দায়টা বড়, চকিতে সেই সংশয়ও উঁকিঝুঁকি দিল।

শাড়ির আঁচলটা টেনে গলায় জড়াতে জড়াতে চারুদি নিস্পৃহ সুরে বললেন, ধীরু হয়ত ভাবছে ভাগ্নেকে এ-সব তুমি নিজে না বলে ওকে বলতে বলছ কেন—

হিমাংশুবাবুর বক্তব্য শেষ। আর বিশ্লেষণ প্রয়োজন বোধ করলেন না।

সহজ তৎপরতায় ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধীরাপদর গোবেচারা মুখের ওপর একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে লঘু জবাব দিলেন, ওটুকু বোঝার মত বুদ্ধি ওর আছে, আচ্ছা বোসো তোমরা—

দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়ালেন, আজ বাড়ির মিটিংএ আসছ না তো? জবাবের অপেক্ষা না করে নিজেই আবার বললেন, থাক্ আজ।

বারান্দায় তাঁর পায়ের শব্দ মেলাবার আগেই চারুদি ঘুরে বসে হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িতে কিসের মিটিং?

ধীরাপদ ফিরে তাকালো।

মেম-ডাক্তারের কাছ থেকে ছেলে আগলে রাখার মিটিং? চারুদি হাসতে লাগলেন, কি বিপদেই না পড়েছ তুমি!

নিজের স্বচ্ছ-চিন্তার গর্ব কমে আসছে ধীরাপদর। সেও হাসছে বটে, কিন্তু বিস্ময় কম নয়। বাড়ির মিটিংএর খবর মানুকে দিয়ে থাকবে, ও-বাড়ির খবর চারুদি রাখেন। কিন্তু মিটিংএর আসল তাৎপর্যও তা বলে মানুকের বোঝার কথা নয়। ধীরাপদ আলোচনার আসরে বসে যা আবিষ্কার করেছিল, চারুদি দূর থেকেই তা জেনে বসে আছেন।

গলায় জড়ানো আঁচলটা আবার কাঁধের ওপর বিন্যাস করলেন চারুদি। —সারাক্ষণ এমন মুখ করে বসেছিলে কেন, বড় সাহেবের সামনে ও-রকমই থাকো বুঝি?

ধীরাপদ বলল, না, একসঙ্গে দুদফা ঘাবড়েছি বলে—বড় সাহেবকে এখানে দেখে, আর চাকরির নতুন দায়িত্ব পেয়ে।

নতুন দায়িত্ব কিসের, আগে জানতে না? চারুদি ভ্রূকুটি করলেন, বড় সাহেব প্রশংসা করলে কি হবে, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর আমার কিন্তু ভরসা কমছে।

হেসে গাম্ভীর্য তরল করে নিলেন। গল্প করতে বসলেন যেন তারপর। ধীরাপদর শরীর কেমন আছে এখন, এত বড় অসুখটা হয়ে গেল, খুব সাবধানে থাকা দরকার। সেই বউটি কেমন আছে, তোমার সোনাবউদি? বেশ মেয়ে, অসুখের সময় আপনজনের মতই সেবা-যত্ন করেছে, চারুদি নিজের চোখেই দেখেছেন—একদিন ধীরাপদ তাকে যেন নিয়ে আসে এখানে। মেম-ডাক্তারের খবর কী? ধীরাপদর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে এখন? সিতাংশু প্রসাধন-শাখায় চলে গেল, ফলে ধীরাপদর মাইনে আর মান-মর্যাদা বাড়ল আরো—মেয়েটা সহ্য করছে মুখ বুজে? না করে করবে কি, সুবিধে বুঝলে অন্যত্র চলে যেত, নিজের সুবিধে ষোল আনা বোঝে—কিন্তু এখানকার মত এত সুবিধে আর

কোথায় পাবে ?

আলাপটা অরুচিকর হয়ে ওঠার মুখে চারুদি সামলে নিলেন। ধীরাপদর মনে হল, বাইরের ঘরে ফুল-বিশেষজ্ঞটি তাঁর অপেক্ষায় বসে, তাও ভুলে গেছেন। ওদিকে পার্বতীরও হয়ত খাবার দেবার কথা মনে নেই।

তেমনি মন্থর গতিতে আলাপ বিস্তারে মগ্ন চারুদি। অবতরণিকা থেকে অমিতাভ প্রসঙ্গে এসেছেন। ভিতরে ভিতরে ছেলেটা ভালো-রকম নাড়াচাড়া খেয়েছে আবার একটা, আগে এ-রকম হলে মাসির কাছেই বেশি আসত, এখন আসেই না বলতে গেলে, চিঠি লিখে আর টেলিফোন করে করে চারুদি হয়রান —কাজের গণ্ডগোলটাই আসল ব্যাপার নয় নিশ্চয়, ও-সব কাজ-টাজের ধার ধারে না ছেলে, কাজ করতে যেমন ওস্তাদ কাজ পণ্ড করতেও তেমনি। শুধু ওই জন্যে মেজাজ দিনকে দিন এমন হবার কথা নয়—ধীরাপদ কি কিছুই জানে না কি হয়েছে ? কিছু না ?

· অবশ্য মন-মেজাজ ভালো না থাকলে বাতাস থেকে ঝগড়া টেনে তোলা স্বভাব ছেলের, তা বলে এতটা হবে কেন—ওই মেম-ডাক্তারই আবার বিগড়ে দিলে কি না কে জানে, কি যে দেখেছে সে ওই মেয়ের মধ্যে সে-ই জানে, এত সবের পরেও হাসলে আলো কাঁদলে কালো—সেদিকেই আবার নতুন কিছু জট পাকাচ্ছে কি না···ধীরাপদ কি কিছুই লক্ষ্য করে নি ? কিছু না ?

অমিতকে বাইরে পাঠানোর প্রস্তাবটা সত্যিই যেন আবার ধীরাপদ না জানিয়ে বসে তাকে, ও ছেলে কি বুঝতে কি বুঝে বসে থাকবে ঠিক নেই। এ-দিকে যেমন একটা কিছু বলে বসে থাকলেই হল, ওদিকেও তেমনি একটা কিছু ধরে বসে থাকলেই হল—চারুদির সবদিকে জ্বালা। ভাগ্নের সব রাগই সব সময় শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ে মামার ওপর। এবারের রাগে আবার মামার সঙ্গে মাসিকে জুড়েছে। মাসি কি করল ? মাসি কারো স৷৷তে আছে না পাঁচে আছে।···অমিত বলে কিছু ? ধীরাপদ কি কোনো আভাসও পায়নি ? কিছু না ?

কিন্তু এটা চারুদি আশা করেন নি। কণ্ঠস্বরে আশাভঙ্গের সুর। ধীরাপদ যে কিছুই জানবে না, কিছুই লক্ষ্য করবে না, কোনো কিছুতে থাকবে না, তা চারুদি আদৌ আশা করেন না। বরং উল্টো আশা তাঁর। দিনকে দিন কেমন হয়ে যাচ্ছিল ছেলেটা, কাউকে আপন ভাবত না—মামার আর মামাতো ভাইয়েই আর ওই মেম-ডাক্তারের কোনো লোককেই সে আপন ভাবে না, বিশ্বাস করে না। এর মধ্যে ধীরাপদ আসাতে চারুদি ভারী নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন—ভেবেছিলেন ছেলেটা এবারে কাজের জায়গায় একজনকেও অন্তত কাছে পাবে,

মাথা ঠাণ্ডা হবে। তাই যাতে হয়, সে-জন্যে চারুদি কম করেন নি—ধীরাপদর অজস্র প্রশংসা করেছেন তার কাছে, ছেলেবেলার গল্প করেছেন—শুনে শুনে ছেলে একদিন রেগেই গেছে, তোমার ধীরু-ভাইয়ের মত লোক ভূ-ভারতে হয় না, থামো এখন। আবার নিজেই এক-একদিন এসে আনন্দে আর প্রশংসায় আটখানা, তোমার ধীরু-ভাইয়ের বুকের পাটা বটে মাসি, দিয়েছে বড় সাহেবের সামনেই ছোট সাহেবকে ঢিট করে—ওই অ্যাকসিডেন্টে কে পুড়ে গিয়েছিল, তার হয়ে তুমি কি করেছিল, তাই নিয়ে কথা—আর একদিন তো এসে রেগেই গেল আমার ওপর, মামাকে বলে ধীরুবাবুর মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছ না কেন—ওই মাইনেয় ও-রকম লোক কদিন টিকবে!...গোড়ায় গোড়ায় এতটা দেখে চারুদির ভারী আশা হয়েছিল, ছেলেটার বল-ভরসা বাড়বে এবার, মতিগতিও ফিরবে—কিন্তু আজ দেখছেন যে-ই কে সেই। ছেলেটা যে একা সেই একা—কি হল কেন এ-রকম হল ধীরাপদর জানা দূরে থাক, একটা খবর পর্যন্ত না রাখাটা কেমন কথা!

মুখ বুজে শুনছিল ধীরাপদ। একটানা খেদের মত লাগছিল। শুধু খেদ নয়, খেদের সঙ্গে অভিযোগও স্পষ্ট। ভিতরে ভিতরে ধীরাপদর চকিত বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে কি একটা। চারুদির মুখে আজ এত কথা শোনার পর মনে হয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে নিজের সংযোগ-বৈচিত্র্যের রহস্যটা আবার নতুন করে ভাবতে বসলে নতুন কিছু আলোকপাত হতে পারে।

কিন্তু চারুদির মুখে চোখ আটকালে ভাবতে পারা সম্ভব নয় কিছু। ধীরাপদ ছোটখাটো ধাক্কা খেল একটা। চারুদির বেশ-বাসে প্রাচুর্যের লাবণ্য, চারুদির প্রসাধনে পরিতৃপ্তির মায়া, কিন্তু চারুদির চোখের গভীরে ও কি? ক্ষুব্ধ হতাশা আর আশার দারিদ্র্য আর আশ্বাসের করুণ আবেদন। নিঃস্ব, রিক্ত।

দরজার কাছে পার্বতী দাঁড়িয়ে। খাবার নিয়ে আসেনি, কর্ত্রীকে বলবে কিছু। ধীরাপদর দৃষ্টি অনুসরণ করে চারুদি সচকিত হলেন।—কি রে?

বাইরের ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করছেন মা আজ আর বেরুবেন কি না।

চারুদি যথার্থই অপ্রস্তুত।—দেখেছ! একেবারে মনে ছিল না, কি লজ্জা! বসতে বল্, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন। কিন্তু পার্বতী আড়াল হবার আগেই ফিরে আবার ডাকলেন তাকে, হ্যাঁ রে পার্বতী—মামবাবুর খাবার কই? বিরক্তি আর বিস্ময়, আমার খেয়াল নেই আর তুইও ভুলে বসে আছিস?

সবটা শোনার আগে কিছু বলার রীতি নয় পার্বতীর, দরজার সামনে এসে

দাঁড়িয়েছে। ধীরাপদ তাড়াতাড়ি তার দোষটাই ঢাকতে চেষ্টা করল।—আমার এখন খাবার কোন তাড়া নেই, চলো—

তার ব্যস্ততা দেখেই যেন পার্বতী শান্ত মুখে জানান দিল, খাবার আনছি। কর্ত্রীর দিকে তাকালো, আপনি ঘুরে আসুন, মামাবাবু খেয়ে যাচ্ছেন।

পার্বতীর মুখের দিকে চেয়ে চারুদি এক মুহূর্ত থমকালেন মনে হল, তারপরে এই ব্যবস্থাটাই মনঃপূত হল যেন।—তাই দে, উনুন ধরিয়ে করতে গেলি বুঝি? ছিটারে করলেই হত। যা আর দেরি করিসনে, আমার আর বসার জো নেই—

একলা খাওয়ার জন্যে বসে থাকার কথা ভাবতেও অস্বস্তি, অথচ এর পর আপত্তি করাটা আরো বিসদৃশ। কিন্তু এই মুহূর্তে চারুদির আবার কি হল। পার্বতী প্রস্থানোদ্যত, সেদিকে চেয়ে হঠাৎ চারুদি কি দেখলেন, কি চোখে পড়ল। ভুরুর মাঝে ঘন কুঞ্চন, দৃষ্টিটা কটকটে।—এই মেয়ে, শোন্ তো?

ডাক শুনে ধীরাপদ আরো ঘাবড়ে গেল। পার্বতী আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে আয়।

কর্ত্রীর দিকে চেয়ে শান্তমুখে পার্বতী সামনে এসে দাঁড়াল।

চারুদি উষ্ণ চোখে তার আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার।—তোর শাড়ি নেই না জামা নেই না মাথার তেল-চিরুনি নেই—কি নেই? ক ডজন কি আনতে হবে বল্?

পার্বতী তেমনি নীরব, তেমনি নির্লিপ্ত। চেয়ে আছে।

চারুদি আরো রেগে গেলেন, সংয়ের মত দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ওই বাক্সবোঝাই জামা-কাপড় এনে উনুনে দিলে তবে তোর আক্কেল হবে? ঠিক দেব একদিন বলে রাখলাম—নিজেকে বাড়ির ঝি ভাবিস তুই, কেমন? ঝি-ও এর থেকে ভালো থাকে, যা দূর হ চোখের সমুখ থেকে।

আসতে বলা হয়েছিল, এসে দাঁড়িয়েছিল। যাবার হুকুম হল, চলে যাচ্ছে। মাঝখান থেকে ধীরাপদই কাঠ!

তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিরুপায় মুখে হেসেই ফেললেন চারুদি।—বলে বলে আর পারিনে, বাক্সভরতি জামা-কাপড়, অথচ যেদিন নিজে হাতে না ধরব সেদিনই ওই অবস্থা। তুমি বোসো, না খেয়ে পালিও না, এর ওপর না খেয়ে গেলে আমাকে একেবারে জ্যান্ত ভস্ম করবে, চেনো না ওকে—

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলেন

একবার। শাড়ির আঁচলটা বিন্যস্ত করলেন একটু।—আমি যাই, ভদ্রলোক এতক্ষণ বসে আছেন, লজ্জার কথা…অমিতের সঙ্গে কি কথা হয় না হয় আমাকে জানিও, আর তুমি মাঝে-মধ্যে সময় করে এসো—আসবে তো, নাকি আবার টেলিফোন করতে হবে ?

চারুদি চলে গেলেন।

গাড়িটা এখনো ফটক পেরিয়েছে কি না সন্দেহ। খাবারের থালা হাতে পার্বতী এসে দাঁড়িয়েছে। কর্ত্রীর বেরুনোর অপেক্ষায় ছিল এ-রকম মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। মেঝেতে থালা গেলাস রেখে ঘরের আলনা থেকে একটা সুদৃশ্য আসন এনে পেতে দিল, তারপর দরজার পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাড়াল।

ধীরাপদর ইচ্ছে করছিল খুব সহজ মুখে ওর সঙ্গে কথা কইতে আর দেখতে। খাবার আনতে সত্যি দেরি কেন হল জিজ্ঞাসা করতে আর দেখতে। চারুদির বকুনি খেয়ে রাগ না করার কথা বলতে আর দেখতে। কিন্তু সহজ হওয়া গেল না। তার থেকে সহজ আসনে এসে বসা। খাবারের দিকে চোখ পড়তে আঁতকে ওঠার সুযোগ পেল। দেখারও।

এত খাব কি করে ?

কিন্তু জবাবে কেউ যদি চলতি সৌজন্যের একটা কথাও না বলে চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আরো বিড়ম্বনা।

একটা প্লেট নিয়ে এসো, কিছু তুলে নাও।

আপনি খান।

ধীরাপদ যেন ছাত্রাবস্থায় ফিরে এসেছে—সামনে গুরুমশাই দাঁড়িয়ে, মুখে পরীক্ষাসূচক গাম্ভীর্য। খাবার নাড়াচাড়া শুরু করল সে। অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে প্রথম দিন এ বাড়িতে পার্বতী-দর্শনের প্রহসনটা মনে পড়ছে। হাঁকাহাঁকি করে বার বার তাঁকে ডেকে আনার পর পার্বতী মোড়া এনে সামনাসামনি বসতে তবে ঠাণ্ডা হয়েছিল। কিন্তু আজ তার এই নীরব উপস্থিতিতে ধীরাপদ ঠাণ্ডা হয়েই আসছিল, খাওয়াটা পরিশ্রমের ব্যাপার মনে হচ্ছিল। অথচ পার্বতীর রান্নার হাত দ্রৌপদীর হাত।

আমি যাই। আপনার অসুবিধে হচ্ছে।

ধীরাপদ ফাঁপরে পড়ে গেল, সে কি মুখ বুজে ভাবছিল না ? সত্য চাপা দিতে হলে ডবল সরঞ্জাম লাগে, ধীরাপদ দ্বিগুণ ব্যগ্র।—না না, আমার অসুবিধে কি ! একমাত্র অসুবিধে তুমি সামনে থাকাতে কিছুটা রুমালে তুলে পকেটে চালান করতে পারছি না—দাঁড়িয়ে কেন, বোসো না।

এমন স্তুতিতেও পার্বত্য-পালিশে ফাটল ধরানো গেল না। চোখের কালো তারার গভীরে নিমেষের কৌতুক-ব্যঞ্জনাটুকুও তেমন ঠাওর করা গেল না। বসবে ভাবেনি, কিন্তু দেয়াল ঘেঁষে পার্বতী বসে পড়ল। মূর্তির অবস্থানভঙ্গীর পরিবর্তন শুধু।

কেউ কেউ আবোল-তাবোল বকতে পারে, কথা কয়ে শূন্যতা ভরাট করতে পারে। পরিস্থিতি-বিশেষে সেটা কম গুণের নয়। ধীরাপদ শুধু এলোমেলো ভাবতে পারে, ভেবে ভেবে ছোট শূন্যকে বড় শূন্য করে তুলতে পারে। আর, দায়ে পড়লে কথার পিঠে কথা কইতে পারে। আপাতত বিষম দায়েই পড়েছে, কিন্তু কথার পিঠ নেই।

পার্বতী এত গম্ভীর কেন? অমিত ঘোষের সামনে যেমন পাথর করে রাখে মুখখানা, আজ সারাক্ষণই তেমনি। তার থেকেও বেশি।...পার্বতী কি ওকে বলবে কিছু? খাবার আনতে দেরি করল, চারুদিকেও অপেক্ষা না করে ঘুরে আসতে বলল। চারুদি থমকে তাকিয়েছিলেন ওর দিকে, পরে কি ভেবে ব্যবস্থাটা অনুমোদনই করেছিলেন যেন। তারপরেই অবশ্য পার্বতীর বেশবাসের দিকে চোখ পড়তে কড়া বকুনি লাগিয়েছেন।

খাবার চিবুতে চিবুতে ধীরাপদ তাকালো একবার। পরনের শাড়ি-ব্লাউজ সাদাসিধে বটে, কিন্তু অমন তেতে ওঠার মত অপরিচ্ছন্ন কিছু নয়। বরং এতেই ওকে মানায় ভালো। পাহাড়ে বুনো-জঙ্গল শোভা, গোলাপ-রজনীগন্ধা নয়। বকুনি খেল বলে ধীরাপদ ওকে সান্ত্বনা দেবে একটু।

হেসে বলল, চারুদির শেষ বয়সে শুচিবাইয়ে না দাঁড়ায়, ছেলেবেলা থেকেই দেখছি সব একেবারে তকতকে চাই, একটু এদিক-ওদিক হলেই রেগে আগুন।

চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে পার্বতী শুনল। তারপর জবাব দিল, আপনি আসছেন জানলেও সাজগোজ করতে হবে আগে কখনো বলেন নি।

ধীরাপদ জলের গেলাসের দিকে হাত বাড়ালো। অনেকক্ষণ জল খায় নি। কিন্তু জলও যে সব সময়েই তরল পদার্থ তাই বা কে বললে? গেলাস নামালো।

...অর্থাৎ, আর কারো আসার সম্ভাবনা থাকলে বেশবিন্যাস করতে হয়। তখন না করলে নয়। ধীরাপদর মনে পড়ল, আর একদিন নিজের হাতে পার্বতীর কেশবিন্যাস করে দিচ্ছিলেন চারুদি। সেদিনও অমিতাভ ঘোষের আসার কথা ছিল।

ধীরাপদ তাড়াতাড়ি আলাপের প্রসঙ্গ বদলে ফেলল। খাওয়ার তন্ময়তায়

পার্বতীর ওইটুকু জবাব খেয়াল না করাটা এমন কি···। বলল, চারুদির বোধ হয় ফিরতে দেরি হবে, ফুলের খোঁজে গেলেন বুঝি?

কিন্তু পার্বতী খেয়াল করাবে ওকে। তেমনি ভাবলেশশূন্য, নিষ্পলক। সামান্য মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল, টেলিফোনে খবর পেয়েই ভদ্রলোককে আসতে বলেছেন, আপনি আসছেন মনে ছিল না। বাগান করার সময় অমিত-বাবু যে ফুলের কথা বলতেন সেই ফুলের চারা এসেছে।

পার্বতী যেন ঘাটের কিনারায় বসে নির্বিকার মুখে ধীরাপদর মনের অতলে টুপটুপ করে কথার ঢিল ফেলছে একটা করে আর কৌতূহলের বৃত্তটা কত বড় হল তাই নিরীক্ষণ করছে চেয়ে চেয়ে। ধীরাপদরও আলাপ চালু রাখার বাসনা। সাদাসিধেভাবে জিজ্ঞাসা করল, অমিতবাবু ফুল ভালবাসেন বুঝি?

পার্বতী নিরুত্তর। চেয়ে আছে। জবাব দেবার মত প্রশ্ন হলে জবাব দেবে। এটা জবাব দেবার মত প্রশ্ন নয়। কিন্তু ধীরাপদ প্রশ্ন হাতড়ে খোঁজার চেষ্টা আর করছে না। এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গিয়ে খাবারের থালার দিকে মন দিয়েছে। অস্বস্তি লাঘবের চেষ্টায় নিজের অগোচরে হাত-মুখ দ্রুত চলছে আর একটু।

আপনার শরীর এখন ভালো?

মুখ ভরাট, ধীরাপদ তাড়াতাড়ি তার দিকে ফিরে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ খুব ভালো। অসুখের সময় পার্বতী তাকে দেখতে গিয়েছিল মনে পড়ল। সেও কম অপ্রত্যাশিত নয়। মুখ খালি করে বলল, অসুখের সময় তুমি এসেছিলে শুনেছি, ঘুমুচ্ছিলাম বলে ডাকতে দাও নি।

আবারও জবাব দেবার মত প্রসঙ্গ পেল বুঝি পার্বতী। পেল না, রচনা করে নিল। বলল, মা সেদিন সকালে অমিতবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা কয়ে ভেবেছিলেন উনি আপনাকে দেখতে যাবেন। মার শরীর সেদিন ভালো ছিল না। তাই আমাকে আপনার খবর নিয়ে আসতে পাঠিয়েছিলেন। উনি এলে তাঁকেও নিয়ে আসতে বলেছিলেন।

একটু আগে চারুদি এই পার্বতীর সম্বন্ধেই মন্তব্য করে গেছেন, চেনো না ওকে।···খাওয়া ভুলে সঙ্কোচ ভুলে ধীরাপদ চেয়ে আছে তার দিকে। চেনে না বটে। কেউ চেনে কি না সন্দেহ। অমিত ঘোষের ফোটো অ্যালবামের উন্মুক্ত-যৌবনা পার্বতীকে চেনা বরং সহজ। পুরুষ-তৃষ্ণার সামনে বিগত এক সন্ধ্যার সেই প্রত্যাখ্যানের বর্ম-আঁটা পার্বতীকে জানাও বরং সম্ভব। কিন্তু একে কে চিনেছে কে জেনেছে?

ধীরাপদর তখনো পাশ কাটানোর চেষ্টা। বলল, চারুদি অমিতবাবুকে ছেলের মতই ভালবাসেন।

পার্বতীর কণ্ঠস্বর আরো ঠাণ্ডা শোনালো।—ছেলের মত! ছেলে হলে মায়ের অত ভয় থাকত না।

ধীরাপদ মন দিয়ে খাচ্ছে আবারও।

আপনি এখন কি করবেন?

ধীরাপদ সচকিত। প্রশ্নটা কানে বিঁধছে বটে, স্পষ্ট হয়নি। খাবারের থালা থেকে হাত তুলে জিজ্ঞাসু চোখে ফিরে তাকালো।

পার্বতী বলল, অমিতবাবুর মন না পেলে মায়ের কাছে আপনার কোনো দাম নেই।

ধীরাপদর মুখও নড়ছে না আর। ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে শুধু। পার্বতী অপেক্ষা করল একটু। কিন্তু সে কি করবে সে জবাবের দরকার নেই, পরিস্থিতিটাই বোঝানো দরকার ছিল যেন। আরো শান্ত, আরো নিরুত্তাপ গলায় পার্বতী সরাসরি নিজের বক্তব্যটাই বলল এবারে।—আর অমিতবাবু এখানে আসা বন্ধ করলে সেটাও আমার দোষ হয়। আমার অন্য জায়গা নেই ...মা রেগে থাকলে অসুবিধে। আপনি দয়া করে মাঝে মাঝে তাঁকে মায়ের কাছে পাঠাতে চেষ্টা করবেন।

ধীরাপদ কখন উঠেছে, মুখ-হাত ধুয়ে কখন আবার সেই খাটেই এসে বসেছে, থালা-বাসন তুলে নিয়ে পার্বতী কতক্ষণ চলে গেছে—কিছুই খেয়াল নেই। অন্ধকার থেকে আলোয় আসাই রীতি। কিন্তু অন্ধকার থেকে হঠাৎ একটা জোরালো আলোর মধ্যে এসে পড়লে বিভ্রম। চোখ বসতে সময় লাগে।

...বেরুবার আগে চারুদিও তাহলে বুঝে গেছেন পার্বতী ওকে বলবে কিছু। বুঝেই প্রচ্ছন্ন আগ্রহে পুষ্প-বিশারদের সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন তিনি। আর বুঝেছিলেন বলেই সমস্ত দিন পরে পার্বতীর ওই অবিন্যস্ত রুক্ষমূর্তি হঠাৎ চক্ষুশূল হয়েছে। পুরুষ-দরবারে রমণীর রঙশূন্য আবেদনের ওপর চারুদির ভরসা কম বলেই অমন তেতে উঠেছিলেন। পাছে পার্বতীর সেই একান্তে বলাটা রমণীর একান্ত আবেদনের মত মনে না হয় ধীরাপদর, পাছে পরিচারিকার আবেদনের মত লাগে। পার্বতী যাই বলুক, চারুদির ইচ্ছার অনুকূল হবে যে তা তিনি ধরেই নিয়েছিলেন। পার্বতী এমন বলা বলবে জানবেন কেমন করে। পার্বতী এ-রকম বলতে পারে তাই জানেন কিনা সন্দেহ।

চারুদির একটানা খেদ শুনতে শুনতে যে চকিত বিশ্লেষণ মনে উঁকিঝুঁকি

দিয়েছিল, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটিতে রাতারাতি তাকে এমন সমাদরের আসনে এনে বসানোর এত আগ্রহ আর এত আন্তরিকতার পিছনে চারুদির নিভৃত প্রত্যাশা যেমন স্পষ্ট তেমনি আশ্চর্য। এতদিনের রহস্যের দরজাটা পার্বতী চোখের সমুখে সটান খুলে দিয়ে গেল।

…অমিতাভ ঘোষ ছেলের মত। ছেলে নয়। চারুদির হারানোর ভয়। এই হারানোর সঙ্গে কোনো আপস নেই চারুদির। কোনো-কিছুর না। অমিত ঘোষের মনে ধরবে বলে পার্বতীর বেশবিন্যাস আর সাজসজ্জার দিকে খরদৃষ্টি চারুদির। অমিত ঘোষ ভালবাসে বলে চারুদির ফুলের বাগান আর ফুলের খোঁজ। অমিত ঘোষকে ধরে আনার আশায় চারুদির পার্বতীকে সুলতান কুঠিতে অসুখের খবর করতে পাঠানো। চারুদির যা কিছু আর যত কিছু সব অমিতাভ ঘোষের জন্যে।

পার্বতীও। আর ধীরাপদ নিজেও।

অমিত ঘোষের মন না পেলে চারুদির চোখে তার কোনো দাম নেই। পার্বতীরও নেই। ওই অবিচল-মূর্তি রমণী-হৃদয়ের মর্মদাহ ধীরাপদ অনুভব করেছে। কিন্তু তবু পার্বতীর কিছু সান্ত্বনা আছে। তার অন্তস্তলের এই ক্ষুব্ধ অশান্ত আলোড়নের চারুদি যত বড় উপলক্ষই হোন—উপলক্ষই। তার বড় নন। পার্বতীর নিজস্ব কিছু দেবার আছে যা নেবার মত। সেইখানেই আসল যাতনা পার্বতীর। সেই যাতনা যত দুরূহ হোক, নারী-পুরুষের শাশ্বত বিনিময়ের দাক্ষিণ্যে পুষ্ট।

কিন্তু ধীরাপদর কি আছে? সে কি করবে?

…অমিতাভ ঘোষ ছেলের মত। ছেলে নয়। চারুদির হারানোর ভয়।

এই ভয়টাই সে দূর করবে বসে বসে? এইটুকুর জন্যেই যা কিছু?

কি করবে ধীরাপদ? এইটুকুই বা সে করবে কেমন করে? খানিক আগে পার্বতী জিজ্ঞাসা করেছিল, সে এখন কি করবে? জবাব চায়নি, নিজের কথা বলার জন্যে বলেছিল। কিন্তু সেই জবাবটাই এখন খুঁজছে ধীরাপদ, কি করবে সে?

টেলিফোন হাতে পার্বতী ঘরে ঢুকল। প্লাগ-পয়েন্টে প্লাগ করে দিয়ে তার সামনে খাটের ওপর রাখল টেলিফোনটা।—একজন মহিলা ডাকছেন আপনাকে, নাম বললেন না।

পার্বতীর ঘর ছেড়ে চলে যাবার অপেক্ষায় নয়, বিস্ময়ের ধাক্কায় ধীরাপদর টেলিফোনে সাড়া দিতে সময় লাগল একটু।

এখানে আবার কোন্ মহিলা টেলিফোনে ডাকতে পারে তাকে ? কার জানা সম্ভব ?

হ্যালো—

আমি ধীরাপদবাবুকে খুঁজছি। গম্ভীর অথচ পরিচিত কণ্ঠ যেন।

আমি ধীরাপদ।

আমি লাবণ্য সরকার।

অমন নিটোল ভরাট কণ্ঠস্বর কার আর ? ধীরাপদর ধরতে পারার কথা। অত গম্ভীর বলেই পারেনি। শুধু গম্ভীর নয়, কড়া রকমের গম্ভীর।

বক্তব্য, ধীরাপদকে এক্ষুনি একবার তার নার্সিং হোমে আসতে হবে। বিশেষ জরুরী। হিমাংশুবাবুর বাড়ির রাতের বৈঠকে তাকে পাওয়া যাবে ভেবে সেইখানে টেলিফোন করেছিল। হিমাংশু মিত্র এই নম্বরে ডাকতে বলেছেন। নার্সিং হোমে তার এক্ষুনি আসা দরকার একবার।

ধীরাপদ বিষম অবাক। আমি তো নার্সিং হোমটা ঠিক চিনিনে···কিন্তু কি ব্যাপার ?

ড্রাইভারকে বলবেন, সে চেনে। আপনি দয়া করে তাড়াতাড়ি আসুন।

অসহিষ্ণু তপ্ত তাগিদ। ঝপ করে টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ।

॥ চৌদ্দ ॥

কোম্পানীর সঙ্গে নার্সিং হোমের কোনো সম্পর্ক নেই, মেডিক্যাল হোমের প্রথম দিনের আলাপে রমেন হালদার বলেছিল, ওর মালিক মিস সরকার আর ছোট সাহেব—ইকোয়াল পার্টনার্স্!

লাবণ্য সরকারকে ভালো মত চেনবার উদ্দীপনায় চপল গাম্ভীর্যে বক্তব্যটা আরো খানিকটা ফাঁপিয়েছিল সে। বলেছিল, মস্ত মস্ত ঘরের ফ্ল্যাট, একটা মিস সরকারের বেডরুম, দু ঘরে চারটে বেড, আর একটা ঘরে বাদবাকি যা কিছু। মাস গেলে তিনশ' পঁচাত্তর টাকা ভাড়া—মেডিক্যাল অ্যাডভাইসারের কোয়ার্টার প্রাপ্য বলে ভাড়াটা কোম্পানী থেকেই দেওয়া হয়। আর, সেখানে আলমারি-বোঝাই যে সব দরকারী পেটেণ্ট ওষুধ-টষুধ থাকে তাও কোম্পানী থেকে নার্সিং হোমের খাতে অমনি যায়, দাম দিতে হয় না—খুব লাভের ব্যবসা দাদা, বুঝলেন ?

এতখানি বোঝাবার পর হাসি চাপতে পারেনি, হি-হি করে হেসে উঠেছিল রমেন হালদার।

এতদিনের মধ্যেও লাবণ্য সরকারের নার্সিং হোম সম্বন্ধে ধীরাপদ এর থেকে বেশি আর কিছু জানে না। জানার অবকাশও ছিল না। আজ এইভাবে সেখানে তার ডাক পড়তে রমেন হালদারের প্রথম দিনের তরল উক্তি মনে পড়ল। মনে হল, মেডিক্যাল হোম আর ফ্যাক্টরীতে লাবণ্য সরকারকে যতটা দেখেছে তা অনেকটাই বটে, কিন্তু সবটা নয়। ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থানের নির্দেশ দেবার পর ধীরাপদর এই কৌতূহলের মধ্যে তলিয়ে যাবার কথা।

তা হল না। এমন অপ্রত্যাশিত আহ্বান সত্ত্বেও নিজের অগোচরে কৌতূহল মনের পর্দায় ওধারেই ঝাপ্‌সা হয়ে থাকল। থেকে থেকে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে যে সে লাবণ্য সরকার নয়, পার্বতী। পার্বতী কি সত্যিই তার কাছে চেয়েছে কিছু? সত্যিই কি আশা করে কিছু? ধীরাপদর ওপর কর্ত্রীর নির্ভরতা দেখেছে, বড় সাহেবের আস্থা দেখেছে, আর সমস্যা যাকে নিয়ে হয়ত বা তারও প্রসন্নতার আভাস কিছু পেয়েছে—আশা করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশেষ করে মনের কথা ব্যক্ত করার মত যে মেয়ের নাগালের মধ্যে দ্বিতীয় আর কেউ কোথাও নেই। পার্বতী যা চেয়েছে বা যে আশার কথা বলেছে তার মধ্যে অস্পষ্টতা কিছু ছিল না। তবু কি জানি কেন, ধীরাপদ নিঃসংশয় নয় একেবারে। আর, কেবলই মনে হয়েছে, পার্বতী নিজেই হাল ধরতে জানে। উলের বোনা হাতে সামনে শুধু মোড়া টেনে বসে চীফ কেমিস্টের মত অসহিষ্ণু লোকটাকেও বশ করতে পারে।...আজকের এই অভিনব ব্যাপারটাও অবলার নিছক দুর্বল নির্ভরতার আশাতেই নয়। তার সমস্ত ক্ষোভের পিছনেও কোথায় যেন নিজস্ব শক্তি আছে একটা।

এই নীরব শক্তির দিকটাই আর কার সঙ্গে মেলে?...সোনাবউদির সঙ্গে?

ভাবনা এর পর কোন্ দিকে গড়াত বলা যায় না, গাড়িটা থামতে ছেদ পড়ল। ড্রাইভার বাঁয়ের বাড়িটা দেখিয়ে ইঙ্গিতে জানালো গন্তব্যস্থানে এসেছে। বার দুই হর্নও বাজিয়ে দিল সে।

ধীরাপদ নেমে দাঁড়াল। রাত করে তেমন ঠাওর না হলেও রমেন হালদারের বর্ণনার সঙ্গে মিলবে মনে হল। হর্নের শব্দ শুনে লাবণ্য দোতলার বারান্দার রেলিংয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ ভালো না দেখা গেলেও স্পষ্টই চেনা যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যেতে বলল ড্রাইভার, দোতলার ফ্ল্যাট।

দোতলায় উঠতে উঠতে দেখল লাবণ্য সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

সামান্য মাথা নাড়ল, অর্থাৎ আসুন। তারপর জিজ্ঞাসা করল, বাড়ি চিনতে কষ্ট হয়েছে?

ধীরাপদ হেসে জবাব দিল, না, ড্রাইভার চেনে মনে ছিল না।

বাড়িটা ধীরাপদর না চেনাটা ইচ্ছাকৃত যেন। কিন্তু লাবণ্য মুখে সে কথা বলল না। আসুন।

বারান্দা ধরে আগে আগে চলল। ওদিক থেকে একজন নার্স আসছিল। সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল সে। সামনেই বসার ঘর। রমেন হালদারের কথা মিলছে। বড় ঘরই। বসার পরিপাটি ব্যবস্থা। দুদিকে ঝকমকে দুটো বড় আলমারি। একটাতে বই, অন্যটাতে ওষুধ।

বসুন। গম্ভীরমুখে সে নিজেও সামনের একটা কুশনে বসল।

এই বাড়িতে প্রথম দিনের অভ্যর্থনা ঠিক এ-রকম হবার কথা নয়। কিন্তু ধীরাপদ এই রকমই আশা করেছিল। অসুখের পরে অফিস জয়েন করা থেকে এ পর্যন্ত সহকর্মিণীর বিদ্বেষের মাত্রা যে দিনে দিনে চড়ছে সেটা তার থেকে বেশি আর কে জানে। সব শেষে এই সরকারী ওষুধ সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা স্নায়ুর ওপর চেপে বসেছে একেবারে। এ নিয়ে সেদিনের সেই বাক-বিনিময়ের পরে দায়ে না পড়লে আর তার মুখ দেখত কি না সন্দেহ। আজকের দায়টা কি ধীরাপদ জানে না। দায় যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, নইলে এভাবে বাড়িতে ডাকত না। কিন্তু আগ্রহ সত্ত্বেও এসেই জিজ্ঞাসা করতে পারল না, মুখ দেখেই মনে হয়েছে সমাচার কুশল নয়।

লাবণ্য সরকার একেবারেই আপ্যায়ন ভুলল না তা বলে। নির্লিপ্ত মুখে কর্তব্য করে নিল আগে—চা খাবেন?

না, এই খেয়ে এলাম। অন্তরঙ্গ অতিথির মতই ধীরাপদ ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল একবার। পিছনের দরজা দিয়ে আর একটা প্রশস্ত ঘর দেখা যাচ্ছে।—আপনার ফ্ল্যাটটা তো বেশ।

এভাবে ডেকে পাঠানোর হেতু না জানলেও প্রথমেই অনুকূল আবহাওয়া রচনার চেষ্টা একটু।

কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। ফ্ল্যাটের স্তুতি পদ্মপাতায় জলের মত একদিকে গড়িয়ে পড়ল। আঁট হয়ে বসার ফাঁকে লাবণ্য তাকে দেখে নিল একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করল, ও-বাড়িতে তো কেউ নেই শুনলাম, চা কে খাওয়াল, পার্বতী?

লাবণ্যর গাম্ভীর্যের তলায় বিদ্রূপের আঁচ। পার্বতীকে ভালই চেনে তাহলে, ভালই জানে। ধীরাপদর কেন যেন ভালো লাগল হঠাৎ। বলল, শুধু চা?

যে খাওয়া খাইয়েছে হাঁসফাঁস অবস্থা। চমৎকার রাঁধে, ওর রান্না খেয়েছেন কখনো ?

লাবণ্য তেমনি ওজন করে জবাব দিল, খেয়েছি, তবে হাঁসফাঁস করার মত করে খাইনি। পার্বতী জুলুম করে খাওয়াতে জানে, তাও এই প্রথম জানলাম।

আরো ভালো লাগছে। এবারে লাবণ্যকে সুদ্ধ ভালো লাগছে ধীরাপদর। —আর বলেন কেন, এখানে আসতে আসতে আপনার থেকে ওষুধ চেয়ে নেব ভাবছিলাম।

ওষুধ কতটা দরকার স্থির চোখে তাই যেন দেখছে লাবণ্য সরকার। বলল, পার্বতী টেলিফোনের খবরটা আপনাকে দিতে চায়নি, আমি কে কথা বলছি, কেন ডাকছি জিজ্ঞাসা করছিল। অত খাওয়ার পরে আপনার বিশ্রামের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটানোর ইচ্ছে ছিল না হয়ত। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যেই থামল দুই এক মুহূর্ত।—ইচ্ছে আমারও ছিল না, দায়ে পড়েই আপনাকে কষ্ট দিতে হল।

এই দায়ের প্রসঙ্গ একেবারে না উঠলে ধীরাপদ খুশি হত। কিন্তু কতক্ষণ আর এড়ানো যায় ? বলল, কষ্ট আর কি। কিছু একটা বিশেষ কারণে তাকে ডেকে আনা হয়েছে সেটা যেন এতক্ষণে মনে পড়ল।—কি ব্যাপার, জরুরী তলব কেন ?

আপনাকে একজন পেসেন্ট দেখাবার জন্যে।

ধীরাপদ অবাক। এমন দায়ের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। চকিতে অমিতাভ ঘোষের কথাই মনে হল প্রথম। তার কি হয়েছে, কি হতে পারে! কিন্তু লাবণ্য আর কিছু না বলে চেয়ে চেয়ে খবরটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে শুধু।

...আমাকে পেসেন্ট দেখাবার জন্যে ? কে ?

আসুন। লাবণ্য উঠে দাঁড়াল।

তাকে অনুসরণ করে হতভম্বের মত ধীরাপদ সামনের ঘরে এলো। ঘরের একদিকের বেড খালি, অন্যদিকের বেডটায় পেসেন্ট একজন। কিন্তু অমিত ঘোষ নয়ত...একটি মেয়ে। কে ? ধীরাপদ হঠাৎ ঠাওর করে উঠতে পারল না কে, গলা পর্যন্ত চাদর ঢাকা, বিছানার সঙ্গে মিশে আছে। ঘুমিয়ে আছে। রক্তশূন্য, বিবর্ণ।

কে...! ধীরাপদ এগিয়ে এলো আরো দু পা। তার পরেই বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায়। লাবণ্য স্থির-চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। ধীরাপদ বিমূঢ়

বিস্ময়ে রোগী দেখছে। রোগী নয়, রোগিণী।

বড় রকমের ধাক্কা খাওয়ার পর অবশ স্নায়ু যেমন সক্রিয় হয়ে ওঠে একটু একটু করে, তেমনি হল। স্মৃতির অস্ত্র-তন্ত্র দগদগিয়ে উঠতে লাগল চোখের সামনে।

বীটার রাইস! বীটার রাইস! বীটার রাইস!

ধীরাপদ চক্রবর্তী, তুমি একদিন ছেলে পড়াতে আর কবিরাজি ওষুধের আর দে-বাবুর বইয়ের আশা-জাগানো আর কামনা-তাতানো বিজ্ঞাপন লিখতে, আর জল গিলে আর বাতাস গিলে কার্জন পার্কের বেঞ্চিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে, আর চোখে যা পড়ত চেয়ে চেয়ে দেখতে। শুধু দেখতে। তোমার সেই দেখার মিছিলে এই মেয়েটাও এসেছিল একদিন, তারপর আরো অনেক দিন। এই সেদিনও, যেদিন রেস্তর্াঁয় বসে তুমি ওর খাওয়া দেখছিলে আর তার প্রতি গরাসে তোমার বাসনার গালে চড় পড়েছিল একটা করে। বীটার রাইস···বাংলা হয় না। না হওয়ার জ্বালাও জুড়িয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য, এই মেয়ে এখানে এলো কেমন করে? পৃথিবীটা এত গোল?

চিনলেন? যতটা দেখবে ভেবেছিল, লাবণ্য সরকার তার থেকে বেশি কিছুই দেখেছে।

জবাব না দিয়ে ধীরাপদ মেয়েটার দিকে তাকালো আবারও, তারপর লাবণ্যর দিকে।

ও ইন্‌জেক্‌শনে ঘুমিয়েছে, এখন উঠবে না। অর্থাৎ, রোগিণীর কারণে চুপ করে থাকার দরকার নেই। তবু কি ভেবে লাবণ্য নিজেই বসার ঘরের দিকে ফিরল আবার, যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালো শুধু। তাৎপর্য, দেখা হয়ে থাকে তো আসুন এবার—

ফিরে আগের জায়গাতেই এসে বসল ধীরাপদ। কিন্তু একটু আগের সেই লোকই নয়। আক্রোশ-ভরা চোখে লাবণ্য তার এই হতচকিত অবস্থাটা মেপে নিল একপ্রস্থ। প্রবলের একটা মস্ত দুর্বল দিক অনাবৃত দেখার মত করে।

মেয়েটার নাম কী?

কি নাম মেয়েটার! জানত তো···সোনা রুপো হীরে···

কাঞ্চন।

কাঞ্চন কী? লাবণ্য যেন কোণঠাসা করছে তাকে।

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, জানে না। লাবণ্যর বিদ্রূপভরা গাম্ভীর্য আর ঈষদুষ্ণ জেরার সুরটা চোখে পড়ল, কানে লাগল। আবারও একটা নাড়াচাড়া খেয়ে

সচেতন হল সে। ওকে জড়িয়েই কিছু একটা ঘটেছে, আর সেই কারণে টেলিফোনে প্রায় চোখ রাঙিয়ে তাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে। জবাবদিহি করার জন্যে।

নিজেকে আরো একটু সংযত করে নিল আগে। সবই জানতে বাকি, বুঝতে বাকি। শান্তমুখে এবারে সে-ই জিজ্ঞাসা করল, এই মেয়েটা আপনার এখান এলো কি করে?

এই পরিবর্তনটুকুও লাবণ্য লক্ষ্য করল বোধ হয়।—ফুটপাথের কোন ল্যাম্প-পোস্টের নিচে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, আর লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। অমিতবাবু গাড়ি করে যাচ্ছিলেন, দেখতে পেয়ে দয়া করে তুলে এনে এখানে দিয়ে গেছেন। আর, হুকুম করে গেছেন সেবাযত্ন করে সারিয়ে তোলা হয় যেন। খারাপ জাতের অ্যানিমিয়া, অন্য রোগও থাকতে পারে, কিন্তু সে-সব অত ধৈর্য ধরে শোনার সময় হয়নি তাঁর।

শোনার আগ্রহ ধীরাপদরও কমে আসছিল। রোগের নাম শোনার পরেও। খাদ্যের অভাব আর পুষ্টির অভাবেই সাধারণত ওই রোগ হয় শুনেছিল। মেয়েটার ক্ষুধার সে-দৃশ্য অনেকবার মনের তলায় মোচড় দিয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে দিল না। জিজ্ঞাসা করল, আমাকে আপনি কি জন্যে ডেকে এনেছেন?

লাবণ্য সোজাসুজি চেয়ে রইল একটু। চোখে আর ঠোঁটে চাপা বিদ্রূপ। বলল, অসুখ তো কারো হুকুমে সারে না, মন্ত্রগুণেও নয়। চিকিৎসা করতে হলে পেসেন্ট সম্বন্ধে ডাক্তারের কিছু খবরাখবর জানা দরকার—সেই জন্যে। অমিতবাবু কিছু বলতে পারলেন না, শুনলাম আপনিই জানেন শোনেন…

আঁচড় যেটুকু পড়বার পড়ল।

কিন্তু ধীরাপদর মুখ দেখে বোঝা গেল না পড়ল কি না। অমিত ঘোষ কি বলেছে বা কতটা বলেছে আপাতত তাও জানার আগ্রহ নেই।

কি খবর চান?

রোগিণীর খবর সংগ্রহের জন্য তাকে ডেকে আনা হয়নি ভালই জানে। একটা নগ্ন বিড়ম্বনায় হাবুডুবু খেতে দেখবে সেই আশায় ডেকেছে। ওকে লাগামের মুখে রাখার মতই মস্ত এক অস্ত্র হাতে পেয়েছে ভেবেছে। তপ্ত শ্লেষে লাবণ্য বলে উঠল, কেমন রাঁধে, খেয়ে হাঁসফাঁস অবস্থা হয় কি না, এই সব খবর—

হাসা শক্ত তবু হাসতে চেষ্টা করল ধীরাপদ। বলল, যে অসুখের নাম করলেন রাঁধা বা রেঁধে খাওয়ানোর সুযোগ তেমন পেয়েছে মনে হয় না।

ধৈর্য ধরে লাবণ্য সরকার আরো একটু দেখে নিল।—ও-রকম একটা মেয়েকে

অমিতবাবু চিনলেন কি করে ?

ধীরাপদর মনে হল, বিদ্বেষের এ-ও হয়ত একটা বড় কারণ। এ-রকম মেয়েকে অমিত ঘোষ চেনে, শুধু চেনে না—অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলে রাস্তা থেকে তুলেও আনে। ভিতরটা হঠাৎই অকরুণ তুষ্টিতে ভরে উঠেছে ধীরাপদর। নির্লিপ্ত জবাব দিল, আমিই একদিন চিনিয়ে দিয়েছিলাম।

ও! ধৈর্যের বাঁধ টলমল তবু সংযত স্বরেই বলল, মেয়েটাকে এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থাও তাহলে আপনিই করুন, এ-রকম পেসেণ্ট এক দিনের জন্যেও এখানে থাকে সেটা আমার ইচ্ছে নয়।

বুদ্ধিমতী হয়েও এমন অবুঝের মত কথা বলবে ভাবেনি ধীরাপদ। রাগের মাত্রা টের পাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে যথার্থই তুষ্ট এবারে, কিন্তু সে তুষ্টি প্রীতিসিক্ত নয় আদৌ। খানিক আগের সেই ভালো-লাগার ওপর কালি ঢালা হয়ে গেছে। ধীরাপদর সরাসরি চেয়ে থাকতেও বাধছে না আর, নিজের অগোচরে দু চোখ ভোজের রসদ খুঁজছে।

বলল, আপনি ডাক্তার, আপনার রাখতে অসুবিধে কি, আমি তো বুঝছি না।

একেবারেই বুঝছেন না, কেমন ?

ধীরাপদ সত্যিই বুঝে উঠছে না বলে বিব্রত আর বিড়ম্বিত যেন। মাথা নাড়ল।—না। কোম্পানীর কোয়ার্টার, বেডও খালি আছে, ওষুধও বেশির ভাগ হয়ত কোম্পানী থেকেই পাওয়া যাবে…আপনার রাখতে এমন কি অসুবিধে ?

লাবণ্য স্তম্ভিত কয়েক মুহূর্ত। এই সুবিধে পায় বলেই ইঙ্গিতটা আরো অসহ্য। এতকাল এ নিয়ে ঠেস দেবার সাহস কারো হয়নি। নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব দখলের ওপর অতর্কিত স্থূল ছোবল পড়ল যেন একটা। ঘরের সাদাটে আলোয় প্রায়-ফর্সা মুখখানা রীতিমত ফর্সা দেখাচ্ছিল এতক্ষণ। বর্ণান্তর ঘটতে লাগল।

আপনি কি এটা ঠাট্টার ব্যাপার পেয়েছেন ?

তেমনি শান্ত মুখে ধীরাপদ ফিরে জিজ্ঞাসা করল, আপনি আমাকে এখানে কেন ডেকে এনেছেন ?

এখানে এ-সব নোংরা ব্যাপার কেন আমি বরদাস্ত করব ?

বরদাস্ত না করতে চাইলে যিনি এনেছেন তাঁকে বলুন, আমাকে কেন ডেকেছেন ?

যিনি এনেছেন তিনি আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছেন, আপনাকে খবর দিতে বলেছেন।

চোখে চোখ রেখে ধীরাপদ থমকালো একটু, অমিত ঘোষ কি বলতে পারে আর কতটা বলতে পারে অনুমান করা শক্ত নয়। তাকে দেখিয়ে দেওয়া বা খবর দিতে বলাও স্বাভাবিক। মেজাজে থাকলে ঠাট্টাও করে থাকতে পারে কিছু। নিস্পৃহ জবাব দিল, লোক ডেকে আবার রাস্তায়ই রেখে আসতে বলুন তাহলে—

ওই ঘরে মেয়েটার শয্যাপাশে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অমন বোবা স্তব্ধতা নিজের চোখে না দেখলে এই জবাব শুনে লাবণ্যর খটকাই লাগত হয়ত। কিন্তু যা দেখেছে ভোলবার নয়। আচমকা ঝাঁকুনি খেতে দেখেছে, তারপর বিস্ময়ে পাথর হয়ে থাকতে দেখেছে কয়েকটা মুহূর্ত। লাবণ্য চেয়ে আছে। উদ্ধত নির্লিপ্ততার আড়ালে অপরাধ-চেতন দুর্বলতার ছায়া খুঁজছে।

অর্থাৎ, ওই মেয়েটাকে আপনি জানেন স্বীকার করতেও আপত্তি, আর আপনার কোনো দায়িত্ব নেই, কেমন?

ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল।—আপনি যতটা জানি ভাবছেন ততটা স্বীকার করতে আপত্তি। আর, দায়িত্বটা আপাতত আমার থেকে আপনারই বেশি।

কোনো সম্ভাষণ না জানিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। নিচে নেমে সোজা স্টেশান ওয়াগনে উঠেছে। রাগে নয়, ভয়ে নয়—নিজের ওপর আস্থা কমে আসছিল। ঘরের অত সাদা আলোয় লোভের ইশারা ছড়ানো ছিল। লাবণ্যর বিরাগের ফাঁকে ধীরাপদর চোখে সেদিনের মত সেই গ্রাসের নেশা ঘনিয়ে আসছিল। গাড়িতে ওঠার পর নিজের ওপরেই যত আক্রোশ তার। দরদের একটুখানি সরু বুনোনির বাঁধন এত কাম্য কেন? সেটা না পেলেই প্রবৃত্তির আগুন অমন জ্বলে উঠতে চায় কেন?...লাবণ্য কোন সময় বরদাস্ত করতে চায় না ওকে, না চাওয়ারই কথা। ওকে অপদস্থ করার চেষ্টা সর্বদা ভাবলে তাও অস্বাভাবিক নয় কিছু। লাবণ্যর চোখে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, তার পাশাপাশি ওর অবস্থানটাই বড় বেশি স্থূল বাস্তবের মত। তার প্রতিষ্ঠার অভিসারে সুলতান কুঠির ধীরাপদ চক্রবর্তীর আবির্ভাব ভুঁইফোড় প্রহরীর মতই অবাঞ্ছিত।

ড্রাইভার কোনো নির্দেশ না নিয়েই গাড়ি ছুটিয়েছে। এবারের গন্তব্যস্থল সুলতান কুঠি, জানা আছে। একরকম জোর করেই ধীরাপদ ওই আলো-ধোয়া সাদা ঘরের লোলুপ তন্ময়তা থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে এলো। পাশের ঘরের রোগশয্যায় অচেতন ওই পথের মেয়ের রক্তশূন্য পাংশু মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আজও তার পরনে চোখ-তাতানো ছাপা শাড়ি আর গায়ে কটকটে লাল ব্লাউস ছিল কিনা ধীরাপদ দেখেনি। গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাক

ছিল। মুখেও কোনো প্রসাধনের চিহ্ন ছিল না, জলের ঝাপটায় উঠে গিয়ে থাকবে। নিঃসাড় কচি একটা মুখ শুধু…করুণ আবেদনের মত বিছানায় মিশে আছে।

ধীরাপদর বুকের কাছটা মোচড দিয়ে উঠল কেমন। গভীর মমতায় অন্তস্তলের সব আলোড়ন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সেই সঙ্গে আর একজনের প্রতি শ্রদ্ধায় অনুরাগে মন ভরে উঠছে। সব জেনেও মেয়েটাকে পথ থেকে নির্দ্বিধায় তুলে এনেছে, অমিত ঘোষ তুলে আনতে পেরেছে। সে-ই পারে। ধীরাপদ পারত না। শুধু তাই নয়, সেবা-শুশ্রূষায় মেয়েটাকে সারিয়ে তুলতে হুকুম করে গেছে লাবণ্যকে। ধীরাপদর কেমন মনে হচ্ছে, গ্লানির গর্ভবাস থেকে মেয়েটার মুক্তি ঘটল।

হঠাৎ কি ভেবে ড্রাইভারকে আর এক পথে যেতে নির্দেশ দিল সে। ভাবছে গলিটা চিনবে কি না। সেই কবে একদিন অন্ধকারে এসেছিল। একটা খবর দেওয়া দরকার, ছোট ছোট কতকগুলো ভাই-বোন আছে শুনেছিল, আর বাপ আছে…চোখে ছানি। খবর না পেলে সমস্ত রাত ধরে প্রতীক্ষাই করতে হবে তাদের। অন্নদাত্রীর প্রতীক্ষা, জঠরের রসদ জুটবে কি জুটবে না সেই প্রতীক্ষা।

কিন্তু যত এগোচ্ছে তত অস্বস্তি। আলো শুষে নেওয়া অন্ধকার গলিটা ঠাওর না করতে পারলেই যেন ভালো হয়। সেই ভালোটা হবে না জানা কথা, একবার দেখলে ভোলে না বড। একটা বাস্তবের ঝাপটায় যেন মোহভঙ্গ হয়ে গেল আবার। কোথায় চলেছে সে? সেখানে গিয়ে কার কাছে কি বলবে? ধীরাপদ লোকটাই বা কে? তা ছাডা দেহের বিনিময়ে পেটের অন্ন সংগ্রহ করতে হয় যাকে, সেই মেয়ে সময়মত ঘরে ফিরল কি ফিরল না সে-জন্যে কোন্ বাবা-ভাই-বোনেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকে? এক রাত দু রাত না ফিরলে বরং তাদের আশার কথা, বড়দরের শিকার লাভের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠার কথা।

গলিটা পেরিয়ে গেল। ধীরাপদ বড় করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল একটা। নিজের পাগলামি দেখে নিজেরই হাসি পাচ্ছে। চেষ্টা করে অমিত ঘোষ হওয়া যায় না।

পরদিন। ধীরাপদর অফিসঘরে অমিতাভ ঘোষ নিজেই এসে হাজির। আজ এর থেকে বেশি কাম্য আর বোধ হয় কিছু ছিল না।

ধীরাপদর আসতে একটু দেরি হয়েছিল। এসে শুনেছে, বড় সাহেব আজও সকালে এসেছিলেন। এসে তাকেই ডেকেছিলেন, তাকে না পেয়ে মিস সরকারের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে গেছেন। অন্যদিন হলে ধীরাপদ লাবণ্যর ঘরে খবর নিতে ঢুকত। আজ গেল না। সে-ই আসে কিনা দেখা যাক। তেমন জরুরী হলে আসবে।

টেবিলে অনেক কাজ জমে। গত দু দিন বলতে গেলে কিছুই করেনি। কিন্তু ফাইলে মন বসছিল না। বড় সাহেবের কথা ভাবছিল না, লাবণ্যর কথাও না। ভাবছিল অমিতাভ ঘোষের কথাই। আজকের মধ্যেই তার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। এখানে হোক বাড়িতে হোক দেখা করবে।

সিগারেট মুখে হুড়বড় করে তাকেই ঘরে ঢুকতে দেখে ধীরাপদর আনন্দের অভিব্যক্তিটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। সামলে নিল। ফাইলে চোখ আটকে নিস্পৃহ আহ্বান জানালো, আসুন—। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দেখে নিয়েছে। মুখখানা আজ আর অত থমথমে নয়।

শব্দ করে চেয়ার টেনে বসতে বসতে অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল, ব্যস্ত খুব ?

খুব না। একটা ফাইল ঠেলে দিয়ে আর একটা ফাইল হাতের কাছে টেনে নিয়ে তাকালো। এতদিনের একটানা গাম্ভীর্য একেবারে তরল নয়, মেঘের ওপর কাঁচা রোদের মত ওই গাম্ভীর্যের ওপর একটুখানি কৌতুকের আভাস চিকচিক করে উঠেছে। ধীরাপদর কাছে ওটুকুই আশ্বাসের মত।

চেয়ারের হাতলের ওপর দিয়ে এক পা ঝুলিয়ে দিয়ে অমিতাভ আরাম করে বসল। ছটফটে খুশির ভাব একটু। হাতের কাছে মনের মত কিছু পেয়ে গেলে ছোট ছেলে যেমন সাময়িক ক্ষোভ ভোলে, অনেকটা তেমনি। লঘু ভ্রূকুটি। —আমাদের এখানকার মহিলাটির সঙ্গে আপনার আজ দেখা হয়েছে ?

আজ ? না আজ হয়নি। কোন্ প্রসঙ্গের অবতারণা ধীরাপদ আন্দাজ করেছে।—কাল দেখা হয়েছিল।

কাল কখন ?

দুপুরে অফিসে, তারপর রাত্রিতে…

রাত্রিতে কখন ? চেয়ারের হাতল থেকে পা নামিয়ে অমিতাভ সকৌতুকে সামনের দিকে ঝুঁকল।

আপনি সেই মেয়েটাকে রেখে যাবার খানিক পরেই হয়ত…আমাকে টেলিফোনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

অমিতাভ হাসতে লাগল। কাউকে মনের মত জব্দ করতে পারার তুষ্টি।

কিন্তু ধীরাপদর মনে হল, স্মৃতির ভাণ্ডারে পুঁজি করে রাখার মত সেটুকু। চপল আনন্দে সে ধমকেই উঠল, আপনি অমন টিপটিপ করে বলছেন কেন? কি হল, কেপে গেছে খুব?

যাওয়ারই তো কথা—

দুই ভুরুর মাঝে কুঞ্চন-রেখা পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। কি বলে, মেয়েটাকে রাখবে না?

ঠিক তা বলেননি—

তবে?

জবাব দেওয়ার ফুরসৎ হল না। তার আগে দুজনারই দরজার দিকে চোখ গেল। লাবণ্য সরকার। ঠাণ্ডা নিরাসক্ত আবির্ভাব। এক নজর দেখেই ধীরাপদর মনে হল, ঘরে আর কে আছে জেনেই এসেছে।

কাম্ ইন্ ম্যাডাম! ছদ্ম-গাম্ভীর্যে অমিতাভর দরাজ আহ্বান, তোমার কথাই হচ্ছিল। পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করল।

জবাবে লাবণ্য নির্লিপ্ত চোখে তাকালো শুধু একবার। অর্থাৎ প্রতীক্ষার জন্যে ব্যস্ত নয় সে, শোনার জন্যেও ব্যগ্র নয়। মন্থর গতিতে টেবিলের সামনে এসে ধীরাপদর দিকে আধাআধি ফিরে দাঁড়াল।—মিস্টার মিত্র সকালে আপনার খোঁজ করছিলেন।

কেন খোঁজ করছিলেন শোনার আগে ধীরাপদ বসতে বলতে যাচ্ছিল। কি ভেবে বলল না। বললেও বসবে না, যা বলতে এসেছে তাই বলবে শুধু। নীরব, জিজ্ঞাসু।

উনি অ্যানিভারসারির প্রোগ্রাম করতে বলে গেলেন আমাদের, তারপর আলোচনায় বসবেন।

অমিতাভর সিগারেট ধরানো হল না, উৎফুল্ল মুখে বাধা দিয়ে উঠল, আমাদের বলতে আর কে? হু এল্স্?

লাবণ্য তার দিকে ঘাড় ফেরাল।—আপনি নয়।

আই নো, আই নো, বাট হু এল্স্—ধীরুবাবু? পুরু লেন্সের ওপর চপল বিস্ময় উপচে পড়ছে, ওসব প্রোগ্রাম-টোগ্রাম তো এত কাল ছোট সাহেবের সঙ্গে বসে করতে, সে আউট এখন? একেবারে বাতিল?

লাবণ্য চুপচাপ শুনল আর উচ্ছ্বাস দেখল। তারপর ধীরাপদর দিকে ফিরে ধীরে-সুস্থে বড় সাহেবের দ্বিতীয় দফা নির্দেশ পেশ করল।—মিস্টার মিত্র আজ সন্ধ্যায় বাড়ি থাকবেন না, কাল সকালেও ব্যস্ত থাকবেন, কাল অফিসের পর তাঁর

পার্সোন্যাল ফাইল নিয়ে আপনাকে বাড়িতে দেখা করতে বলে গেছেন, বিশেষ দরকার—

অমিতাভর উচ্ছ্বাসের জবাব দেয়নি বটে, কিন্তু একটু জবাবের মতই। প্রোগ্রাম তাকে যার সঙ্গে বসে করতে হবে সে মানুষ কোন্ দরের, বড় সাহেবের নির্দেশ জানিয়ে পরোক্ষে সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

হিমাংশু মিত্রের এই পার্সোন্যাল ফাইলের খবর সকলেই জানে। তাঁর বাণী, তাঁর ভাষণ, তাঁর সভা-সমিতির বিবরণ, তাঁর চ্যারিটি, তাঁর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, ব্যবসায়ের নীতি এবং আদর্শ প্রসঙ্গে তাঁর বহুবিধ মন্তব্য, তাঁর প্রসঙ্গে খবরের কাগজ আর কমার্স জার্নালের মন্তব্য, তাঁর বাণিজ্যকেন্দ্রিক নিবন্ধ—এক কথায় ছাপার অক্ষরে তাঁর কর্মশীলতার যাবতীয় খুঁটিনাটি তারিখ মিলিয়ে যে ফাইলে সাজানো সেটাই পার্সোন্যাল ফাইল। সে ফাইল এখন ধীরাপদর হেপাজতে। সেটা নিয়ে বাড়িতে যেতে বলার একটাই উদ্দেশ্য—তাঁর নতুন কোনো ভাষণ বা প্রেরণা রচনার বুনোটে বেঁধে দিতে হবে।

ধীরাপদ অমিতাভর দিকে তাকালো একবার, একটু আগের হাসিখুশির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আভাস।

লাবণ্য নির্বিকার।—জীবন সোমও আপনার খোঁজ করে গেছেন, বিশেষ কথা আছে বলছিলেন। মনে পড়ল বলে বলা গোছের খবর এটা।

ফস্ করে দেশলাই জ্বালার শব্দ। অমিতাভ সিগারেট ধরিয়ে বিরক্ত-বিচ্ছিন্ন মুখে ধোঁয়া ছড়াতে লাগল।

সময় বুঝে বড় সাহেবের নির্দেশ জানাতে আসা প্রায় সার্থক। জীবন সোমের খোঁজ করে যাওয়ার বার্তায় কোম্পানীর সমূহ সমস্যার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কাজটাও সুসম্পন্ন। পরিতুষ্ট গাম্ভীর্যে লাবণ্য ধীরে-সুস্থে এবারে অমিতাভর মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল।—কাল রাতে আপনাকে আমি দুবার টেলিফোন করেছিলাম। একবার নটায়, একবার এগারোটায়—

রাত তিনটেয় করলে পেতে। গম্ভীর প্রত্যুত্তর। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল বোধ হয়, দুবার টেলিফোনটা অফিস সংক্রান্ত কোনো তাগিদে নয়। টেলিফোন করার মত একটা জুতসই গণ্ডগোল সে-ই গত সন্ধ্যায় পাকিয়ে রেখে এসেছিল বটে। ছেলেমানুষের মতই দু চোখ উৎসুক হয়ে উঠল আবার, কেন—ওই মেয়েটি আছে কেমন?

সেরে উঠে এতক্ষণে ছুটোছুটি করছে বোধ হয়।

অমিতাভ হেসে উঠল। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বলল, রোগিণী না

হয়ে রোগী হলে করত, এতক্ষণে হার্টফেল করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করছিলাম—

ঈষৎ রূঢ় গলায় লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল, আপনার মাননীয় পেসেন্টের প্যাথলজিক্যাল টেস্টগুলো সব কে করিয়ে আনবে ? ওটা হাসপাতাল নয় যে পেসেন্ট ফেলে এলেই চিকিৎসা শুরু হয়ে যাবে—সে-সব দায়িত্ব কে নেবে ?

অম্লান বদনে অমিতাভ তৎক্ষণাৎ ধীরাপদকে দেখিয়ে দিল। বলল, উনি। মাননীয় পেসেন্টের ওপর আমার থেকে ওঁর ক্লেম বেশি, মায় চিকিৎসার খরচসুদ্ধ তুমি ওঁর নামে বিল করে দিতে পারো।

এ-রকম কিছু একটা সুযোগের প্রতীক্ষাতেই ছিল। উনি বলতে কাকে বলছে ঘাড় ফিরিয়ে লাবণ্য তাই যেন দেখে নিল একবার। তপ্ত শ্লেষে নিটোল কণ্ঠস্বর ভরাট শোনালো আরো।—আপনার কথায় বিশ্বাস করে কাল রাতে ওঁকেই ডেকে দায়িত্বের কথা বলতে গিয়েছিলাম। দায়িত্ব নেওয়া দূরে থাক, উনি ওই পেসেন্টকে চেনেন বলেও মনে হল না।

অমিত ঘোষের এবারের চাউনিটা বিস্ময়যুক্ত। এ জবাব খুব অপ্রত্যাশিত নয়। এতক্ষণ মুখ বুজেই ছিল ধীরাপদ, একটি কথাও বলেনি। কিন্তু আর চুপ করে থাকা গেল না, চুপ করে থাকাটা কাপুরুষতার সামিল। লাবণ্য সরকার প্রকারান্তরে কাপুরুষই বলেছে তাকে। লঘু সংযমের মুখোশ অটুট রেখে ধীরাপদ যে-কথাগুলো বলে বসল, তা এই অফিস-ঘরে বসে অন্তত বলার কথা নয়। লাবণ্যর চোখ দুটো নিজের দিকে ফেরাবার জন্যে প্রায় হাসিমুখেই হাতের এধারের ফাইল দুটো তুলে নিয়ে একটু শব্দ করে টেবিলের ওধারে রাখল।

লাবণ্য ফিরে তাকালো।

আমি চিনি না বলিনি, বলেছি আপনি যতটা চিনি বলে ধরে নিয়েছেন ততটা চিনি না। থামল, চোখে চোখ রেখে হাসতে লাগল।—আমার স্বভাব-চরিত্র জানার ব্যাপারে আপনার আগ্রহ আছে সেই আশা পেলে শুধু মুখে বলা নয়, একেবারে সাক্ষী-প্রমাণ এনে নিজের জন্যে খানিকটা সুপারিশ করতেও রাজি আছি।

কতক্ষণ লাগে কথাগুলো কানের পর্দায় ঝন্‌ঝনিয়ে উঠতে আর তার প্রতিক্রিয়া সর্বাঙ্গের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়তে ? কোম্পানীর মেডিক্যাল অ্যাডভাইসার, মেডিক্যাল হোমের ডাক্তার, নার্সিং হোমের হাফমালিক লাবণ্য সরকারের সময় লাগল একটু। সময় লাগছে।

দৃষ্টি-দহনে কারো মুখ ঝল্‌সে দেওয়া সম্ভব হলে ধীরাপদর মুখখানা অক্ষত থাকত

না হয়ত। লাবণ্য ঘর ছেড়ে চলে গেল। যাবার আগে সেই জলন্ত দৃষ্টি একবার অমিতাভ ঘোষের মুখের ওপরেও বুলিয়ে দিয়ে গেল।

অমিতাভ হেসে উঠেছিল। সে চলে যেতে উৎফুল্ল আনন্দে ধীরাপদর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, এইজন্যেই আপনাকে মাঝে মাঝে ভালো লাগে আমার—

কিন্তু ধীরাপদর হাসলে চলবে না এখন, এ সুযোগ গেলে অনেকটাই গেল। হাতে হাত ঠেকানোর বদলে গম্ভীর মুখে কলমটা এগিয়ে দিল সে।—লিখে দিন, আপনার সার্টিফিকেট খুব দরকার এখন। তারপর খোলা কলমটা বন্ধ করতে করতে পাল্টা ধাক্কা দিল, আপনার ব্যবহার মাঝে মাঝে আমার প্রায় অসহ্য লাগে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের সূচনা এটা অমিতাভ ভাবতে পারেনি। খুশির উদ্দীপনায় চোখ পাকিয়ে তরল প্রতিবাদ জানালো, ওই মেয়েটাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছি বলে? কি অবস্থায় পড়েছিল জানেন?

জানি। সেজন্যে নয়।

অমিতাভ থমকালো, সপ্রশ্ন চাউনি।

লোহা পিটবে তখন, গন্‌গনে গরম যখন। কিন্তু ধীরাপদ কার হয়ে হাতুড়ি হাতে নেবে প্রথম—হিমাংশু মিত্রের না চারুদির না পার্বতীর? অবকাশও একবারের বেশি দুবার পাবে বলে মনে হয় না। কোম্পানীর সমস্যাটাই গলার কাঁটা আপাতত, ওই কাঁটা নেমে গেলে মোটামুটি একটা বড় দুশ্চিন্তার অবসান। পরের কথা পরে ভাববে। শান্তমুখে বলল, আর তিন-চার দিন বাদে গভর্ণমেণ্ট অর্ডার সাপ্লাইয়ের ডেট, তাদের কোনো খবর দেওয়া হয়নি—ওই তারিখেই তারা মাল ডেলিভারি চাইবে। আপনি আমাকে এভাবে অপদস্থ করছেন কেন?

অমিতাভ যেমন বিস্মিত, তেমনি বিরক্ত।—অর্ডার সাপ্লাই হোক বা না হোক আপনার কি আসে যায়? এর মধ্যে আপনি কে? হু আর ইউ?

আমি কে আপনার মাসিকে সেটা জিজ্ঞাসা করে নেবেন। আপনার বিরাগভাজন হয়ে এখানে যে আমি এক দিনও টিকে থাকতে পারি না, সেটা আর কেউ না জানুক তিনি জানেন।

দুর্বোধ্য লাগতে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে অমিতাভ মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু। টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট হাতে উঠে এসেছে।

কোনরকম বিশ্লেষণের ধার দিয়েও গেল না ধীরাপদ। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন, সেটা হয়ে উঠেছে। কণ্ঠস্বর আরো গম্ভীর।—অসুখের পর কাজে এসে টের পেলাম, আপনার বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্র করেছি এ-রকম সন্দেহও

আপনার মনে এসেছে—

টেবিল চাপড়ে অমিতাভ ক্ষিপ্তকণ্ঠে ধমকে উঠল, বাট্ হু আর ইউ? আপনি ষড়যন্ত্র করার কে?

কেউ যে না সেটা আপনিই ভাবতে পারছেন না কেন? মিস্টার মিত্রকে একজন অভিজ্ঞ সিনিয়র কেমিস্ট আনার পরামর্শ দিয়েছিলাম কোম্পানীর সুবিধের জন্যে, আর সব থেকে বেশি আপনার সুবিধের জন্যে—সেটা আপনি একবারও ভাবলেন না কেন? আপনার সঙ্গেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করে নেওয়ার কথা, অসুখে পড়ে যেতে হয়ে উঠল না—একটা দিনের জন্যে আপনিও এলেন না। তবু আমার ধারণা ছিল আপনিই সব থেকে খুশি হবেন।

ধীরাপদ অভিনয় কখনো করেনি, কিন্তু সত্যের এমন নিখুঁত অপলাপ করতে গিয়ে মুখের একটা রেখাও বিচলিত হল না তার। অমিতাভ হতভম্ব, বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। অস্ফুট বিস্ময়, সিনিয়র কেমিস্ট আপার পরামর্শমত আনা হয়েছে?

আহত ক্ষোভেই ধীরাপদ নিরুত্তর যেন।

তপ্ত রাগে পুরু লেন্সের ওধারে চোখ দুটো ছোট দেখাচ্ছে।—আমাকে এ কথা জানান নি কেন?

জানাতে গিয়েছিলাম, আপনি এসেছেন শুনেই লাইব্রেরিতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে ছুটেছিলাম—আপনি আমাকে অপমান করে চলে গেলেন।

ইউ ডিজার্ভড্ মোর। কে আপনাকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে বলেছিল? হু টোল্ড্ ইউ? অসহিষ্ণু রাগে গলার স্বর দ্বিগুণ চড়া।—আপনার জন্যে কজনের সঙ্গে মিছিমিছি দুর্ব্যবহার করতে হয়েছে জানেন? ডু ইউ নো?

আর কার সঙ্গে করেছেন জানি না, আমার সঙ্গে করেছেন দেখতেই পাচ্ছি।

রাগে এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অমিতাভ ঘোষ, চোখের দৃষ্টিতে আর এক পশলা আগুন ছুঁড়ে ট্রাউজারের পকেটে সিগারেটের প্যাকেট গুঁজতে গুঁজতে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ, দুর্ব্যবহার আর বোঝাপড়া এর পর ভালো হাতেই করবে সে।

ধীরাপদ চেয়ারের কাঁধে ঘাড় এলিয়ে দিয়ে নিস্পন্দের মত বসে রইল খানিক। হাঁফ ধরে আসছিল। কিন্তু বসা হল না। উঠে আস্তে আস্তে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল।

না। ব্যর্থ হয়নি।

মেন বিল্ডিং থেকে নেমে সামনের আঙিনা পেরিয়ে লোকটা হনহন করে ফ্যাক্টরী-ঘরের দিকেই চলেছে।

গোটা ফ্যাক্টরীর স্নায়ুতে একটা অপ্রীতিকর টান ধরেছিল। সেটা গেল

সময় পেলে নিচে ওপরে রোজই দু-একবার টহল দেয় ধীরাপদ। পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব আছে, দেখতেও ভালো লাগে। আজকের এই নিঃশব্দ উদ্দীপনা আর নিশ্চিন্ত কর্মতৎপরতার সবটাই চোখের ভুল নয় বোধ হয়। সকলেরই সব থেকে বড় স্বার্থটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। রুটির যোগ। তাই এর অশুভ কেউ চায় না। তবু ধীরাপদর ধারণা, ওই টান-ধরা স্নায়ুর উপশমবোধের কারণ সরকারী অর্ডার সাপ্লাইয়ের ফাঁড়া কাটল বলেই নয়। হন্তদন্ত হয়ে আজ হঠাৎ অ বার যে লোকটা গিয়ে কাজে লেগেছে, সে চীফ কেমিস্ট অমিতাভ ঘোষ—এই জন্যে।

সিনিয়র কেমিস্ট জীবন সোম এক ফাঁকে ওপরে উঠে এসেছিলেন। তাঁর হাসিমুখের বিড়ম্বনাটুকু স্পষ্ট।—মিস্টার ঘোষ তো আজ ওই কাজটা টেক-আপ করলেন দেখছি।

ধীরাপদ হাল্‌কা জবাব দিয়েছে, এখানে থাকলে অমন হামেশা ছাড়তে দেখবেন আর টেক-আপ করতে দেখবেন।

...শুনেছি, তবু এবারে সবাই একটু ঘাবড়েছিল মনে হল। কিন্তু নিজে তিনি নিঃসংশয় নন একেবারে, জিজ্ঞাসা করেছেন, এ কদিনের মধ্যে কাজটা হয়ে যাবে মনে হয়?

ধীরাপদ হাসিমুখে মাথা নেড়েছে, মনে হয়।

বারান্দায় যাতায়াতের পথে আর সিঁড়ির কাছে ধীরাপদ লাবণ্যর মুখোমুখি হয়েছে বার দুই। অটল গাম্ভীর্য সত্ত্বেও সেই মুখে বিস্ময় আর কৌতূহল অপ্রচ্ছন্ন নয়। অর্ডার সাপ্লাইয়ের এই গণ্ডগোলের মানসিক ধকলটা তার ওপর দিয়েই বেশি গেছে। তত্ত্বাবধান-প্রধানা হিসেবে একবারে নাম-স্বাক্ষরের মজাটা অমিতাভ ঘোষ ভালো ভাবে বুঝিয়ে ছেড়েছে। মনে মনে আজ হাঁফ ফেলে বেঁচেছে হয়ত। কিন্তু ওই ঘর থেকে বেরিয়ে সরাসরি তার কাজে গিয়ে লাগার রহস্য অজ্ঞাত। জানা যেতে পারে যার কাছ থেকে সেই লোকের সঙ্গে বাক্যা-লাপের বাসনা চিরকালের মতই গেছে যেন। স্থির গম্ভীর ঈষৎ চকিত দৃষ্টি-নিক্ষেপে যতটা আঁচ করা যায়।

আপাত-সমস্যাটা এত সহজে মিটে যেতে ধীরাপদরই সব থেকে খুশি হওয়ার কথা। অথচ ভিতর থেকে খুশির প্রেরণা নেই কিছুমাত্র। একটা দুশ্চিন্তার অবসান এই যা। সমস্ত দিন একরকম মুখ বুজেই কাজ করে গেল সে। কাজও ঠিক নয়, এক-একটা ফাইল নিয়ে সময় কাটালো। পাঁচটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। অফিস এতক্ষণে ফাঁকা নিশ্চয়। লাবণ্যও চলে গিয়ে থাকবে। পাঁচটার

ওধারে পাঁচ মিনিটও থাকে না ইদানীং। হিমাংশুবাবু ছেলেকে বিকেলের বৈঠকে আটকানোর পর থেকে ধীরাপদ সেটা লক্ষ্য করেছে। পাঁচটার পরে দু-একদিন এসে সিতাংশু মুখ কালো করে ফিরে গেছে।

আজও সন্ধ্যার আসর নেই মনে পড়তে ধীরাপদর ওঠার তাগিদ গেল। নিচে অমিতাভর ওখান থেকে একবার ঘুরে আসবে কিনা ভাবল। পর মুহূর্তেই সে ইচ্ছে বাতিল করে দিল। আজ আর না। ওধারের পুরনো ফাইল ক'টা হাতের কাছে টেনে নিল। কিন্তু তাও ভালো লাগছে না।

ওগুলো ঠেলে সরিয়ে রাখতে গিয়ে চোখে পড়ল মেডিক্যাল হোমের রমেন হালদারের ফাইলের ওপর। ছেলেটার প্রমোশনের অর্ডার হয়ে আছে অনেকদিন, অথচ একটা খবরও দেওয়া হয়নি। ধীরাপদর ভিতরটা সক্রিয় হয়ে উঠল, একটু সেখানেই যাবে। ছেলেটার তারুণ্যের তাপ শুকোয়নি এখনো। ভালো লাগে। ভালো লাগে এমন কিছুই খুঁজছিল এতক্ষণ।

দরজা ঠেলে বাইরে আসতে সামনে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানালো যে লোকটা সে তানিস সর্দার। ফুটন্ত লিভার এক্সট্রাক্ট অ্যাকসিডেণ্টের নায়ক। ঘা শুকোলেও বীভৎস পোড়া দাগগুলো এ জীবনে মিলোবে না। থাকী হাফপ্যাণ্ট আর হাফশার্টের বাইরে যেটুকু চোখে পড়ে তাই শিউরে ওঠার মত।

ভালো আছ?

জী। লোকটা বাঙালী না হলেও পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে। ফিরে জিজ্ঞাসা করল, হুজুরের তবিয়ত কেমন এখন?

ভালো। ওর ছুটিছাটার ফয়সালা আগেই হয়ে গেছে, অপেক্ষাকৃত লঘু মেহনতের কাজে লেগেছে এখন। নিজের প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্যে ধীরাপদ খোঁজ নিল, কাজ-কর্ম করতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?

মাথা নাড়ল, অসুবিধে হচ্ছে না। নিজের সুবিধে-অসুবিধের কোন কথা বলতে যে আসেনি সেটা ধীরাপদ তার মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছিল। এসেছে অন্য তাগিদে, হৃদয়ের তাগিদে। প্রকাশের পথ না পেলে পুঞ্জীভূত কৃতজ্ঞতা বোধও বেদনার মতই টনটনিয়ে ওঠে বুঝি। এ কদিনের চেষ্টায় সামনাসামনি আসতে পেরেছে যখন, মুখ বুজে ফিরে যাবে না। গেলও না। ধীরাপদকে বরং মুখ বুজে শুনে যেতে হল। শুধু অন্তরের কৃতাঞ্জলি নয়, সেই সঙ্গে কোনো একজনের উদ্দেশে খেদও একটু। হুজুরের দয়াতে ওর প্রাণরক্ষা হয়েছে। নিজের দোষে ফুটন্ত লিভার এক্সট্রাক্টের ভ্যাট ওলটানো সত্ত্বেও কোম্পানীর খরচে তার

চিকিৎসা হয়েছে। অত টাকা লোকসানের পরেও তার চাকরিটা পর্যন্ত যায়নি, উল্টে হাল্‌কা কাজ দেওয়া হয়েছে তাকে। তানিস সর্দার অন্য কোম্পানীতেও কাজ করেছে, কিন্তু এ-রকম আর কোথাও দেখেনি। শুধু ও কেন, কেউ দেখেনি। এখানেও দেখত না, শুধু হুজুরের দয়ায় দেখল। ও দেখল, সকলে দেখল। কিন্তু সেই হুজুরের এমন শক্ত বেমার গেল অথচ ও একবার গিয়ে তাকে দেখে আসতে পেল না। মেম-ডাক্তার কিছুতে ঠিকানা দিল না। তাদের ধারণা, ওরা মেহনতী মানুষ বলে এত নির্বোধ যে জীবনদাতারও ক্ষতি করে বসতে পারে। ঠিকানা পেলে ও আর ওর বউ গিয়ে হুজুরকে দূর থেকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখে আসত, একটি কথাও বলত না। ওর বউ হুজুরের জন্য কালীমায়ীর কাছে ফুল দিয়েছে আর ও দোয়া মেঙেছে—এ ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারে ওরা ?

বিব্রত বোধ করছে ধীরাপদ। অশিক্ষিত অজ্ঞ মানুষের এই ক'টা অ'ত সাধারণ কথাতেও আবেগের কাঁটাটা অমন সর্বাঙ্গে খচখচ করে উঠতে চায় কেন ? ধীরাপদ হাসতে চেষ্টা করল একটু। কিন্তু হেসে নিরস্ত করা গেল না তাকে। এক ক্ষোভ নতুন ক্ষোভের দোসর। নতুন ক্ষোভ নয়, পুরনো ক্ষোভই নতুন করে জেগে উঠল আবার। যেমন, ছোট সাহেব আর মেম-ডাক্তারের সঙ্গে কত ঝগড়াঝাঁটি করে তার চাকরি রাখা হয়েছে—সেটা তানিস সর্দার জানে। সকলেই জানে। ওদের কেউ মানুষ বলে ভাবে না। যেটুকু সুবিধে এখন পাচ্ছে ওরা, কার দয়াতে পাচ্ছে সেও ওদের সক্কলে খুব ভালো করেই জানে। হুজুরের দিল্ এত বড় বলেই কেউ তার সঙ্গে বিবাদ করে সুবিধে করতে পারবে না—খোদ বড সাহেবের ছেলে হয়েও ছোট সাহেবকে তো অন্যত্র সরে যেতে হল। মেম-ডাক্তারও যে হুজুরের কাছে জব্দ হবে একদিন তাতে ওদের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। যারা শত্রুতা করতে চায়, চীফ কেমিস্ট ঘোষ সাহেব আর হুজুরের দিলের সামনে তারা সক্কলেই কুঁকড়ে যাবে একদিন।

কোথা থেকে কি এসে পড়ল দেখে ধীরাপদ অবাক। এই একজনের খেদ থেকে গোটা ফ্যাক্টরীর মেহনতী মানুষদের নাড়ির হদিস পেল। কি ভাবে ওরা ? কি আলোচনা করে ?...ছোট সাহেবকে সরে যেতে হয়েছে, মেম-ডাক্তারও জব্দ হবে একদিন, ওর আর অমিত ঘোষের দিলের কাছে কারো শত্রুতা টিকবে না ! ...এই ভাবে ওরা, এই আলোচনা করে, এই আশা করে ! ধীরাপদ বিমূঢ় খানিকক্ষণ। সর্দারের চিকিৎসা আর চাকরির ব্যাপারে মেম-ডাক্তার অন্তত কোনো বাধা দেয়নি বলবে ভেবেছিল। কিন্তু সব শোনার পর আলাদা করে

কিছু বলা হল না।

—এসব বাজে খবর তোমাদের কে দেয়, আর এ নিয়ে তোমরা মাথাই বা ঘামাও কেন? প্রচ্ছন্ন অনুশাসনের সুরে ধীরাপদ বলল, এখানে কারোর সঙ্গে কারো ঝগড়াও নেই, শত্রুতাও নেই,—তুমি নিজে বরং এবার থেকে নিজের সঙ্গে শত্রুতাও একটু কম করে কোরো, অমন হড়বড়িয়ে কাজ করতে যেও না, একেবারে তো শেষই হতে বসেছিলে—

আগের উক্তি বিশ্বাস করেনি। পরের অনুশাসনে কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত। মাথা নেড়ে অস্ফুট জবাব দিল, না হুজুর, আর অমন কাজ করব না।

রাস্তায় এসেও ধীরাপদ সবিস্ময়ে ভাবছিল, ওর আর অমিত ঘোষের সঙ্গে অপব হুজুর-হুজুরানীর একটা বিরোধ চলেছে—এই ধারণাটা সকলের বদ্ধমূল হল কেমন করে? হাসিই পেল। এই বঞ্চিত মানুষদের সাদা-সাপটা উপলব্ধির জগৎটা আলাদাই বটে। কিন্তু এই আলাদা জগতের নিরক্ষর একজোড়া মেয়ে-পুরুষের কাছ থেকে আজ তার প্রাপ্তি ঘটেছে কিছু। অক্লেশে দুই জগতের সমস্ত ব্যবধান ঘোচানোর মতই কিছু। সর্দারের ওই বউটার মুখখানা মনে করতে চেষ্টা করছে। ধীরাপদর অসুখ ভালো হওয়ার কামনায় ইষ্ট-পায়ে ফুল দিয়েছে, সর্দারও প্রার্থনা করেছে। ওরা যা করেছে, হৃদয়ের দিক থেকে ধীরাপদ ওদের জন্যে কি তার থেকে খুব বেশি কিছু করেছে?

কাঞ্চনের কাঁচ মুখখানা উঁকিঝুঁকি দিল মনের তলায়। রাজপথের অভি-সারিকা নয়, অস্তিত্বের সংগ্রামে ঝলসানো অসহায় এক মেয়ে রোগশয্যায় ধুঁকছে। রোগশয্যাও জুটত না। তাদের মত ওই একজন নিয়ম-শৃঙ্খলার সঙ্গে ভালবাসতে বা ঘৃণা করতে শেখেনি বলে জুটেছে। শেখেনি বলেই তাকে ফুটপাথ থেকে তুলে আনতে পেরেছে। আর ধীরাপদ কি করেছে? স্তুতি-নিন্দার বাষ্প-বুদবুদে স্নায়ু চড়িয়ে একরকম অস্বীকারই করে এসেছে।

একটু আগেই সেই আবেগ ফিরে যেন ব্যঙ্গ করে উঠল তাকে। ফলে সমূহ গন্তব্যপথটা বদলালো।

গতকাল রাত্রিতে এলেও আজ দিনের বেলায় নার্সিং হোমটা চিনে নিতে কষ্ট হল না। লাবণ্য সরকার আছে কি নেই সে চিন্তাটা মন থেকে ছেঁটে দিয়েছিল। তবু নেই শুনে স্বস্তিবোধ করল একটু। সেই নার্সটিই রোগিণীর শয্যার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল তাকে।

আগের দিনের মতই সাদা চাদরে গলা পর্যন্ত ঢাকা। রক্তশূন্য সাদাটে মুখ, শিয়রের টেবিল-ফ্যানের অল্প হাওয়ায় কপালের কাছের থরথরে চুলগুলি মুখের

ওপর নড়াচড়া করছে।

আজ জেগে আছে। ঘাড় ফেরাল।

একমজরে চিনতে পারার কথা নয়। ফ্যাল-ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তার পর চিনল। চিনে কোনো অব্যক্ত রহস্যের হদিস পেল যেন। তারপরেও চেয়েই রইল। অপরিসীম এক শূন্যতার বিবরে শুধু দুটো চোখ, শুধু নিস্পন্দ চাউনি একটা।

তারপর চাদরে ঢাকা সর্বাঙ্গে চেতনার সাড়া জাগল আচমকা, শূন্য চোখের পাতা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, ঠোঁট দুটো থরথরিয়ে উঠতে লাগল। চাদরের তলা থেকে শীর্ণ দুই হাত বার করে কপালে ঠেকাতে গিয়ে ঈষৎ কাত হয়ে সেই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

ধীরাপদ নির্বাক। মেয়েটা কি জীবনে আর কাঁদেনি? বেসাতির মাশুল না মেলায় হতাশায় গড়ের মাঠের অন্ধকারেও কাঁদতে দেখেছিল এক রাতে। কিন্তু সেটা এই কান্না নয়। এ কান্নায় শুধু কেঁদে কেঁদে নিজেকে লুপ্ত করে দেবার তাগিদ, লুপ্ত করে দিয়ে নিজেকে উদ্ধার করার তাগিদ।

ধীরাপদ বোবার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখেছে। তারপর নিজের আগোচরে এগিয়ে এসে কখন একটা হাত রেখেছে তার মাথায়, হাত-ঢাকা মুখের ওপর থেকে অবিন্যস্ত চুলগুলো সরিয়ে দিয়েছে। গভীর মমতায় অস্ফুট আশ্বাসও দিতে চেষ্টা করেছে একটু, ভয় কি···ভালো হয়ে যাবে।

কান্না বেড়েছে আরো, দুই হাতের মধ্যে আরো জোরে মুখ গুঁজে দিয়েছে আর মাথা নেড়েছে। ভালো হওয়াটাই একমাত্র আশা নয়, ওই জীবনে ওটুকু কোনো আশ্বাসই নয়। ধীরাপদ জানে। কিন্তু কি বলবে সে, কি আশ্বাস দেবে?

অনেকক্ষণ বাদে শান্ত হল। গায়ের ওই চাদরে করেই ছোট মেয়ের মত চোখ-মুখ মুছে নিল। তারপর তাকালো তার দিকে। সব কিছুর জন্যেই কৃতজ্ঞ, এইভাবে কাঁদতে পেরেও।

কিন্তু ধীরাপদর এটুকু প্রাপ্য নয়। ভুলটা ভেঙে দেবার জন্যেই সাদাসিধে ভাবে বলল, আমার এক বন্ধু তোমাকে ওভাবে দেখতে পেয়ে তুলে এনেছেন। তাঁকে একদিন তোমার কথা বলেছিলাম।

দৃষ্টির ভাবান্তর দেখা গেল না তবু। তুলে আনার থেকে বলাটাই বড় যেন, যে তুলে এনেছে তার থেকে যে দাঁড়িয়ে আছে সামনে সে-ই বড়। সেই বড়র অবিশ্বাস্য আবির্ভাব ঘটেছে তার জীবনে, বিহ্বল দৃষ্টি মেলে সে তাকেই দেখছে।

তোমার বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে ?

জবাব এলো পিছন থেকে, নার্স জানালো, কর্ত্রীর নির্দেশে সে ঠিকানা নিয়ে বাড়িতে চিঠি লিখে দিয়েছে, যদিও পেসেন্ট বলেছিল খবর দেবার কিছু দরকার নেই।

নার্স কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ধীরাপদ টের পায়নি। একটা অনুভূতির জগৎ থেকে পুরোপুরি বাহ্যজগতে ফিরে এলো। নির্লিপ্ত উপদেশ দিল কাঞ্চনকে, এঁদের কথা শুনে চলো, কান্নাকাটি করো না—। ইচ্ছে ছিল বলে, সে আবার এসে দেখে যাবে। বলল না। বলা গেল না।

কৃতজ্ঞতা কুড়োবারই দিন বটে আজ।

তানিস সর্দার আর তার বউ কৃতজ্ঞ। কাঞ্চন কৃতজ্ঞ। মেডিক্যাল হোমের রমেন হালদারও।

যদিও প্রমোশনের খবরটা সে আগেই পেয়েছে। রোগী দেখতে দেখতে ডক্টর মিস সরকার সদয় হয়ে হঠাৎ সেদিন ডেকেছিলেন তাকে। খবরটা জানিয়েছিলেন। আর ও জায়গায় কাজ তো সে করছেই। তবু দাদা আজ নিজে এসেছেন তাকে জানাতে, কম ভাগ্যের কথা নাকি ?

রমেন হালদারের মুখে খুশি ধরে না।

অনতিদূরের একটা রেস্তরাঁয় দু পেয়ালা চা নিয়ে বসেছিল দুজনে। ধীরাপদই তাকে এখানে ডেকে এনে বসেছে। দোকানের মধ্যে সকলের নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে ক'টা কথা আর বলা যায় ? অবশ্য খবরটা দিয়েই চলে আসবে ভেবেছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে রোগীর আর খদ্দেরের ভিড়ে মেডিক্যাল হোম যেমন জমজমিয়ে ওঠার কথা তেমনটি দেখল না। খদ্দেরের ভিড় অবশ্য কিছু ছিল, কিন্তু অন্য দিকটা খালি। রোগী ছিল না। আর, তাদের ডাক্তার লাবণ্য সরকারও ছিল না।

এ-রকম ব্যতিক্রমের দরুনই যে রমেনের সঙ্গে দু-দশ মিনিট গল্পগুজব করার ইচ্ছে হয়েছিল, ঠিক তাও নয়। দোকানে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ধীরাপদ সকলের মুখে-চোখে এক ধরনের গাম্ভীর্য দেখেছে। ওপরঅলার আগমনে নিয়তনদের কর্মতৎপর গাম্ভীর্য নয় ঠিক। বড়দের কোনো কাণ্ড দেখে হঠাৎ হাসি পেয়ে গেলেও ছোটরা যে ভাবে গাম্ভীর্যের প্রলেপ চড়ায় অনেকটা তেমনি। দোকানে ঢুকেই রোগী আর ডাক্তারের দিকটা শূন্য দেখে ঈষৎ বিস্ময়ে এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে ধীরাপদ কর্মচারীদের সেই নীরব অভিব্যক্তিটুকু উপলব্ধি করেছে। সকলেই ধরে

নিয়ে থাকবে, সে মহিলাটির খোঁজেই এসেছিল।

তার কথামত রমেন হালদার মিনিট দশেকের ছুটি নিয়ে এসেছে ম্যানেজারের কাছ থেকে। জেনারেল সুপারভাইজারের তলবে বাইরে আসবে খানিকক্ষণের জন্যে, কাউকে বলা-বলির ধার ধারে না। তবু দাদা বলেছে যখন বলেই এসেছে। হাল্‌কা আনন্দে রমেন হালদার স্তুতির জাল বিছালো খানিকক্ষণ ধরে। দাদার কত সুনাম কত খাতির সর্বত্র, দাদাই জানেন কিনা সন্দেহ। ফ্যাক্টরীর কেউ না কেউ তো হামেশাই আসছে দোকানে—একটা নিন্দের কথা দূরে থাক, দাদার সুখ্যাতি ধরে না। অত গুণ না থাকলে বড সাহেবকে বশ করা চাট্টিখানি কথা নয়—

স্তুতির উদ্দীপনার মুখে ধীরাপদ এখানে আসার হেতুটা ব্যক্ত করে ফেলেও রেহাই পেল না। প্রমোশনের খবর রমেন পেয়েছে, কিন্তু রোগী দেখতে দেখতে ঘরে ডেকে নিয়ে নেকনজরী চালে খবর দেওয়া আর দাদার মত একজনের নিজে এসে বলে যাওয়া কি এক ব্যাপার নাকি? দাদা এইজন্যে এসেছেন—শুধু এই জন্যে। রমেন হালদার হাওয়ায় ভাসবে না তো কি?

হাওয়ায় ভাসার ফাঁকে ধীরাপদই জিজ্ঞাসা করল, মিস সরকারকে দেখলাম না যে···তিনি আজ আসেননি?

সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বদল। নতুন হাওয়ায় নতুন ধরনের উদ্দীপনা।—এসেছিলেন। এসেই চলে গেছেন। খবর রসিয়ে ভাঙতে জানে রমেন হালদার। বলল, মিস সরকারের খোঁজে মেডিক্যাল হোমে একে একে অনেক গণ্যমান্য লোক এলেন আজ—

দোকানের কর্মচারীদের চাপা গাম্ভীর্যের কারণ বোঝা গেল। তাকেও সেই গণ্যমান্যদের শেষ একজন ধরে নিয়েছে।

রমেন হালদারের প্রগল্‌ভ গাম্ভীর্যে তরল আমেজ এখন।—না, মিস সরকারের খোঁজে সর্বপ্রথম যে এসেছিল শুনল, সেই নামটা ধীরাপদ আদৌ আশা করেনি। অমিতাভ ঘোষ। লাবণ্য সরকার নিয়মিত রোগী দেখা শুরু করার খানিকক্ষণের মধ্যেই নিজের গাড়িতে নিজে ড্রাইভ করে চীফ কেমিস্ট এসে হাজির। দোকানে ঢোকেননি, বাইরে গাড়িতে বসেই মিস সরকারকে খবর দিতে বলেছেন। মিস সরকার ধীরে-সুস্থেই গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু আধ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে সরাসরি রোগীপত্র বিদায় করে দিয়ে আবার গিয়ে গাড়িতে উঠেছেন। আজ আর ফিরবেন না, ম্যানেজারকে তাও জানিয়ে গেছেন।

রমেন হালদার হাসছে। হাসির তাৎপর্য স্পষ্ট। মিস সরকারের খোঁজে

আসা গণ্যমান্যদের হিড়িকে একমাত্র চীফ কেমিস্টেরই জিত।

তারপর?

তার পরের আগন্তুক অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। ছোট সাহেব সিতাংশু মিত্র। তিনিও গাড়িতেই এসেছিলেন, তবে গাড়ি থেকে নেমে তিনি দোকানে ঢুকেছিলেন। আর দোকানে ঢুকে মিস সরকারকে না দেখে অবাক হয়েছিলেন। প্রথমে অবাক পরে গম্ভীর। অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে বেরিয়ে গেছেন শুনে আরো গম্ভীর। এত গম্ভীর যে রমেনের ভয় ধরে গিয়েছিল। ভাবছিল, ঠাস করে তার গালে বুঝি বা চড়ই পড়ে একটা। সে-ই সামনে ছিল, তাকেই তো বলতে হয়েছে সব—মিস সরকার কখন এলেন, কখন গেলেন, কার সঙ্গে গেলেন—

ধীরাপদরও হাসি সামলানো দায় হচ্ছিল এবার। ফাজিল-অবতার একেবারে। কিন্তু এর পর কে? সিতাংশু মিত্রের পরের গণ্যমান্য আগন্তুকটি কে? ধীরাপদ নিজে?

না। সর্বেশ্বরবাবু। প্রায়-আশাহত বিপত্নীক ভগ্নীপতিটি। তাঁর গাড়ি নেই, ট্যাক্সিতে এসেছিলেন। রমেনের ধারণা গাড়ি থাকার মতই অবস্থা, নেই ইনকাম ট্যাক্সের ভয়ে। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে ওর সঙ্গে খানিক কথাবার্তা বলে বিষণ্ণ মুখে ট্যাক্সিতেই চলে গেছেন আবার। ছোট ছেলেটা সকাল থেকেই ব্যামোয় কাতরাচ্ছে, ইচ্ছে ছিল মাসিকে ট্যাক্সিতে তুলে চট করে দেখিয়ে নিয়ে আসবেন একবার—হল না, মন খারাপ হবারই কথা।...তা কার সঙ্গে বেরিয়েছেন মিস সরকার, আর তাঁর আগে কার গাড়ি অমনি ফিরে গেছে, তাও শুনেছেন। খোঁজখবর করছিলেন বলে রমেন বলেছে।

বিশ্লেষণ শেষ করে মুখখানা যতটা সম্ভব সহানুভূতিতে শুকনো করে তুলে জানালো, ভদ্রলোকের ছেলেপুলেগুলো আজকাল আগের থেকেও ঘন ঘন ভুগছে দাদা। একটু থেমে আবার বলল, অনেক দিন তাঁর বাড়িতে যাবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছেন, গেলাম না বলে আজও দুঃখ করছিলেন, গেলে ভালোমন্দ খাওয়াবেন বোধ হয়...একদিন যাব দাদা?

ধীরাপদ হেসেই ফেলল। বলল, না।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির আবেগে রমেনেরও টেবিলে মুখ থুবড়ে পড়ার দাখিল।

রমেনকে বিদায় দিয়ে অন্যমনস্কের মত ধীরাপদ কতক্ষণ ধরে শুধু হেঁটেই চলেছে খেয়াল নেই। আজকের যা কিছু ঘটনা আর যত কিছু খবর, তার মধ্যে ঘটনা আর খবর শুধু একটাই। মেডিক্যাল হোমে এসে অমিতাভ ঘোষের লাবণ্য

সরকারকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া। নিভৃত মন নিজের আগোচরে শুধু ওই একটা ঘটনা আর খবরই বিস্তার করছিল এতক্ষণ ধরে।

ধীরাপদ সচকিত। ঈর্ষা করতে ঘৃণা করে। এটা ঈর্ষা নয়। নিজের অসম্পূর্ণতার ক্লান্তির মত। ক্লান্তই লাগছে বটে। সত্তার বল্গায় তেজী ঘোড়ার মত কতগুলো প্রবৃত্তি বাঁধা যেন। কোনোটা আগে ছুটছে, কোনোটা পিছনে পড়ছে। যে এগিয়ে যাচ্ছে তাকে টেনে নিয়ে আসছে, যে পিছিয়ে পড়ছে তাকে ঠেলে দিচ্ছে। আজীবন এই সামঞ্জস্যের শাসন সম্বল আর শ্রান্তি সম্বল।

'...যখন ফিরব আমি সন্ধ্যায় আপন কুটীরে, অস্ত-রবি-রঞ্জিত, তখন যেন বক্ষে পাই এমন পত্নী, কোলে তার শিশু।'

জ্বালাতন! হেসে ফেলে ভুরু কোঁচকালো ধীরাপদ। কিন্তু ভুরু কুঁচকে জ্বালাতনের মায়া এড়ানো গেল না একেবারে। ভাবতে ভালো লাগছে, কোথা থেকে কেমন করে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সে। ভিতরে ভিতরে ঘরমুখী তাগিদ একটা, ঘরের তৃষ্ণা। কিন্তু ঘর কোথায়? সুলতান কুঠিতে? যখন ফিরব আমি সন্ধ্যায় আপন কুটীরে, অস্ত-রবি-রঞ্জিত...

ধীরাপদ হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল। তবু থেকে থেকে ওই সুলতান কুঠিই আজ কেমন টানছে তাকে। রোজই তো ফেরে সেখানে। হিমাংশু মিত্রের সান্ধ্য বৈঠকের দরুন বা অন্য যে কারণেই হোক, ফিরতে বেশ রাত হয় অবশ্য। ফিরতে হয় বলে ফেরে, ফেরার তাগিদ কখনো অনুভব করে না। আজ করছে। সেখানে ধীরাপদর ঘর নেই বটে, কিন্তু ঘর তো আছে।

আর সোনাবউদি আছে।

যখন ফিরব আমি সন্ধ্যায় আপন কুটীরে, অস্ত-রবি-রঞ্জিত—

॥ পনেরো ॥

রমণী পণ্ডিতের কোণা ঘরে নয়, তার একটু আগে শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদারের দাওয়ার মাঝামাঝি একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। সেখানে দাঁড়িয়ে জনাকতক লোক প্রায় নিঃশব্দে জটলা করছে মনে হল। শিকদার মশাই আর রমণী পণ্ডিতও আছেন।

এদিকের ঘরের দরজা দিয়ে আধখানা পিঠ আর গলা বার করে গণুদার বড় মেয়ে কিছু একটা রসাস্বাদনের চেষ্টায় সেইদিকে চেয়ে ঝুঁকে আছে। অন্ধকারে

দাঁড়িয়ে পড়ে ধীরাপদও ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল। এত দূর থেকে অনুমান করা গেল না।

ঘরের তালা খুলতে খুলতে মেয়েটার তন্ময়তা ভঙ্গ করল, উমারাণীর লুকিয়ে লুকিয়ে কি দেখা হচ্ছে?

উমা চমকে ঘাড় ফেরাল, তারপর ঘরের চৌকাট পেরিয়ে দাঁড়াল।—ও, ধীরুকা তুমি...আজ এত সকাল সকাল চলে এলে যে?

খট করে যেন সোনাবউদির গলার স্বরটাই কানে লাগল তার। ধীরাপদ মনে মনে অবাক, এই মেয়েও ওই রকমই হবে নাকি? বলল, তোর জন্যেই তো, আয়—

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। এক কোণে হারিকেনের আলোটা 'ডিম' করা। টান করে বিছানা পাতা। দেয়ালের ধারে তার রাতের খাবার ঢাকা। এরই মধ্যে সোনাবউদি খাবার ঢেকে রেখে গেছে ভাবেনি। দিনের বেলায় অফিসে লাঞ্চ খায়, রাতে এই ব্যবস্থা। অসুখের পর থেকে এই রকম চলছে। গণুদার মত সোনাবউদি কোনো প্রস্তাবও করেনি, অনুমতিও নেয়নি। ঘরের দুটো চাবির একটা চাবিও সেই থেকে তার কাছেই। খাবারটা আগে ঢেকে রাখত না, ধীরাপদর সাড়া পেলে দিয়ে যেত। কিন্তু ফিরতে আজকাল রাত হচ্ছে বলে ও নিজেই জোরজার করে এই ব্যবস্থা করেছে। ভয় দেখিয়েছে, এই ব্যবস্থা না হলে সে বাইরে থেকে খেয়ে আসবে।

সোনাবউদি রাজী হয়েছে, কিন্তু ফোড়ন দিতে ছাড়েনি। বলেছে, যে মুখ দেখে আসেন তার পর আর আমার মুখ দেখতেও ইচ্ছে করে না সেটা বেশ বুঝেছি।

এমন কি রাতের আহারের দরুন ধীরাপদ এ পর্যন্ত কিছু টাকাও তার হাতে দিয়ে উঠতে পারেনি। চেষ্টা করেছিল একদিন, একটা খামে টাকা পুরে এগিয়ে দিয়েছিল, এটা রাখুন—

হাত না বাড়িয়ে সোনাবউদি খামটা চেয়ে দেখেছে, তারপর ছদ্ম আগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছে, কি আছে ওতে, গোপন পত্রটত্র কিছু?

ধীরাপদ হেসে ফেলেছিল।

কি আছে, টাকা?

বাঃ, দিতে হবে না? ধীরাপদ জোর ফলাতে চেষ্টা করেছিল।

নিশ্চয় দিতে হবে, সোনাবউদি গম্ভীর, কত দিচ্ছেন?

বলে উঠতে পারেনি কত।

সোনাবউদি জবাবের অপেক্ষা করেনি, বলেছে, দাঁড়ান, হিসেব করি কত দিতে হবে। চারখানা রুটি ধরুন তিন আনা, আর মাছ-তরকারি যা জোটে বড় জোর সাত আনা—মোট দশ আনা, তিরিশ দিনে তিনশ আনা। কত হল?

টাকা দিতে গিয়ে মনে মনে গালে চড় খেয়ে ক্ষান্ত হয়েছে ধীরাপদ। সোনাবউদি বলেছে, হিসেব যা হল আপনার কাছেই থাক আপাতত, দরকার মত চেয়ে নেব।

দরকার যে কোনদিনই হবে না সেটা ধীরাপদর থেকে ভালো আর কে জানে? মনে মনে দুঃখ হয়েছে একটু, কিন্তু এ নিয়ে আর জোর করতে পারেনি কোনদিন। ছ' শ' টাকা মাইনে গত বছরের মুখে সাড়ে সাতশ'য়ে দাঁড়িয়েছে—সামনের দশম বার্ষিকীর উৎসবে আরো বেশ মোটামুটি বাড়বে মনে হয়। কিন্তু হাত পেতে যে টাকা নিলে সব থেকে আনন্দ হত, সে হাত গুটিয়ে আছে বলেই অত টাকা এক-এক সময় বোঝার মত লাগে ধীরাপদর। ব্যাঙ্কে কম জমল না এ পর্যন্ত...

ঘরে ঢুকে জামাটা খুলে র‍্যাকে টাঙিয়ে রাখছিল, উমারাণী বিছানার এক ধারে বসতে বসতে গম্ভীর মুখে ব্যক্ত করল, বসে গল্প করার মত সময় বিশেষ নেই তার, কাল ইস্কুলের একগাদা পড়া বাকি।

ধীরাপদ অবাক, স্কুলে ভর্তি হয়েছিস? কবে?

উমারাণী ততোধিক অবাক। বা রে! সেই কবে তো, তুমি জান না পর্যন্ত! অনুযোগ-ভরা মন্তব্য,—তুমি কি কিছু খবর রাখো আজকাল আমাদের, কেবল চাকরিই কচ্চ—

সত্যিই খবর রাখে না। এমন কি উমার দিকে চেয়েও ধীরাপদর মনে হল, ও একটু বড় হয়েছে, মাথায় বেড়েছে, আগের থেকেও পাকাপোক্ত হয়েছে।

বিছানায় বসে ধীরাপদ উমারাণীরই মন যোগাতে চেষ্টা করল প্রথম। কোন্ স্কুলে পড়ছে, কোন্ ক্লাসে পড়ছে, স্কুলটা কোথায়, কখন যায়, কখন ফেরে, কি কি বই—যাবতীয় সমাচার। তার শোনার আগ্রহ থেকে উমারাণীর বলার আগ্রহ কম নয়, কিন্তু বইয়ের প্রসঙ্গে এসে বাবার বিরুদ্ধে তপ্ত অভিযোগ উমার। বই-তো অনেক—ইংরেজি বাংলা অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল স্বাস্থ্য প্রকৃতি পাঠ অঙ্কন-প্রণালী—এর ওপর সব বিষয়ের একগাদা খাতা—কিন্তু আজ পর্যন্ত অর্ধেক বই খাতাও কেনা হয়নি তার, বাবা গত মাসে বলেছে এ মাসে কিনে দেবে, আর এ মাসে বলছে, সামনের মাসে হবে। ইস্কুলে দিদিরা ছাড়বে কেন? রোজই বকে প্রায়, এক-এক দিন ঘণ্টা ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে—কিন্তু বাবার হুঁশ নেই।

বাড়িতে এসে বললে বাবার ওপর রাগ করে মা উল্টে ওর পিঠেই দুমদাম বসিয়ে দেয় কয়েক ঘা, বলে, ঝি-গিরি করগে যা, পড়তে হবে না।

দু চোখ পাকিয়ে যে ভাবে বলল উমারাণী, হেসে ফেলার উপক্রম। এইটুকু মেয়ের দুর্দশা ভেবে রাগও হয় দুঃখও হয়। কিন্তু ধীরাপদ কিছু বলার আগে বলার মত আর একটা প্রসঙ্গ পেল উমারাণী। আর একটু কাছে ঘেঁষে ফিস-ফিসিয়ে বলল, মা আজকাল আরো কি ভীষণ রাগী হয়ে গেছে তুমি জানো না ধীরুকা—মুখের দিকে তাকালে পর্যন্ত থথরিয়ে কাঁপুনি—আর বাবার দিকে এমন করে চায় একেবারে যেন ভস্ম করে ফেলবে! এক-একদিন মনে হয় বাবাকেও বুঝি দু ঘা দেবে। আর বাবাটাও কেমন ভীতু হয়ে গেছে আজকাল, আগের মত ঝগড়া করার সাহস নেই, হয় মুখ বুজে থাকে নয় পালিয়ে যায়—

ধীরাপদ নির্বাক কয়েক মুহূর্ত। এইটুকু মেয়ে এই কথাগুলো শুধু শোনার দোসর হিসেবেই শোনাল না তাকে। বাবা-মায়ের বিবাদ-কলহ অনেক দেখেছে, কাঁচা মনে এর ছাপ পড়ার কথা নয়। কিন্তু পড়ছে, অশুভ ছায়া পড়ছে। কারণ না বুঝলেও এত বড় অসঙ্গতি ভিতরে ভিতরে ত্রাসের কারণ হয়েছে, পীড়ার কারণ হয়েছে। নইলে এই দুর্লভ অবকাশে ওই মেয়ের এতক্ষণে গল্পের বায়নায় অস্থির করে তোলার কথা তাকে।

ধীরাপদ উমারাণীর নিজস্ব সমস্যাটাই সমাধানের আশ্বাস দিল চট করে। বলল, আচ্ছা কাল সকালে তোর বুকলিস্ট আর খাতার লিস্ট আমাকে দিস—অফিস-ফেরত সব এসে যাবে, কেমন ?

উমারাণী মহাখুশি।—সত্যি বলছ ধীরুকা ?

ধীরাপদর চোখের কোণ দুটো শিরশির করে ওঠে কেন, আবারও মনে হয় কেন সে ঘর-ছাড়া হয়ে পড়েছিল। মাথা নাড়ল, সত্যি। মেয়েটার মন ফেরানোর জন্যেই তারপর জিজ্ঞাসা করল, তা উমারাণীর পড়াশুনোর এত চাপ সত্ত্বেও দরজায় দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরে গলা বাড়িয়ে কি দেখা হচ্ছিল ?

সঙ্গে সঙ্গে উমারাণী দু চোখ গোল করে তার কোল ঘেঁষে বসল প্রায়। একটা বিস্মৃত উত্তেজনা নতুন করে ফিরে এলো যেন।—ওমা, তুমি জান না বুঝি! ভচ্চায্ মশাই যে মর-মর!

ধীরাপদর ভিতরটা ছ্যাত্ করে উঠল। উমারাণীর সাদামাঠা উক্তি থেকে যা বোঝা গেল তার মর্ম, বিকেলের দিকে কুয়োপাড়ে বসে কাশতে কাশতে ভটচায মশাই হঠাৎ দু হাতে বুক চেপে শুয়ে পড়েন, তারপর অজ্ঞান, তারপর মর-মর।

ধীরাপদ তক্ষুনি উঠে গেছে খবর নিতে। দাওয়ায় হারিকেন জলছে শুধু, বাইরে কেউ নেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে দাওয়ার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আড়া-আড়ি দরজা পর্যন্ত মস্ত একটা ছায়া পড়েছে, সেই ছায়া দেখেই হয়ত ভটচায মশাইয়ের বড় ছেলে বেরিয়ে এলেন। তাঁরও বয়েস হয়েছে। ধীরাপদর সঙ্গে এতকালের মধ্যে মৌখিক দু-চারটে কথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ।

খবর শুনল। জ্ঞান ফেরেনি। আর ফিরবে তেমন আশাও দেন না ডাক্তার। বিকেলে রমণী পণ্ডিতই ডাক্তার নিয়ে এসেছেন, তাঁরা দু ভাই রোজকার মত মফঃস্বলে স্কুল করতে চলে গিয়েছিলেন, রাতে এসে শুনেছেন। খুব উপকার করেছেন পণ্ডিতমশাই, ডাক্তারের জন্যে ছুটোছুটি করেছেন। ওষুধপত্র এনে দিয়েছেন। নামকরা ডাক্তার না হলেও এম. বি. পাস ডাক্তারই—তাঁরা বাড়ি ফিরে আবারও তাকে আনিয়েছিলেন, কিন্তু সময় ঘনালে ডাক্তার আর কি কি করবে...

ফিরে এসে ধীরাপদ চুপচাপ কদমতলার বেঞ্চএর কাছে দাঁড়িয়েছিল খানিকক্ষণ। ভদ্রলোকের জীবনী-শক্তি শুকিয়ে আসছে লক্ষ্য করেছিল কিন্তু এত শীগগির শেষ ঘনাবে ভাবেনি। ইচ্ছে করেছিল ভিতরে গিয়ে দেখে একবার। বিব্রত করা হবে ভেবে বলতে পারেনি।...সে এখন আর সুলতান কুঠির একজন নয়, গণ্যমান্য একজন। সেটা এখন আর এখানে ভুলতে পারে না কেউ। আলাপ থাক না থাক, ভটচায মশাইয়ের ছেলেও অতি সম্ভ্রমভরে কথাবার্তা কইলেন—অসুখের খবর নিতে গেছে তাইতেই কৃতজ্ঞ যেন।...সুলতান কুঠির সঙ্গে ধীরাপদর নাড়ির যোগ গেছে, এখানে রমণী পণ্ডিত বরং আপনজন।

খাবারের ঢাকনা তুলে খেতে বসেও ধীরাপদ আশা করছিল সোনাবউদি আজ হয়ত আসবে একবার। মেয়ে এ ঘরে কার সঙ্গে কথা বলছিল সেটা না জানার কথা নয়। কিন্তু সোনাবউদির ছায়াও দেখা গেল না। খেতে খেতে ধীরাপদ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। সোনাবউদির এত অন্তর্দাহের হেতু প্রায় দুর্বোধ্য। মেয়েটার ওই বই ক'টাই বা এ পর্যন্ত কেনা হল না কেন? গণুদার গাফিলতি না সংসারের টানাটানি? মাইনে তো আগের দ্বিগুণেরও বেশি পায় গণুদা... মোটা টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স করেছে অবশ্য, আর দিনকালও দিনে দিনে চড়ছে—আগুন দাম সব কিছুর। মেয়েটার বই না জোটার উৎপীড়ন বিঁধছে থেকে থেকে, বিনা মাসোহারায় এই রাতের আহার গলা দিয়ে নামতে চাইছে না।

খাওয়ার রুচি গেল। ধীরাপদর ঘর নেই। সোনাবউদির ওই ঘরের সে কেউ নয়।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল যখন, কদমতলায় বেঞ্চিতে একাদশী শিকদারের দুখানা বাংলা কাগজ পড়া শেষ। কাগজ দুটো একপাশে সরিয়ে রেখে একা একা হুঁকো টানছেন। এতকালের ওই বেঞ্চির দোসর আর হুঁকোর দোসর চল্‌তি, কিন্তু যতটা ম্রিয়মাণ দেখবে ভেবেছিল ভদ্রলোককে, ততটা মনে হল না।

রোগীর সকালের অবস্থা বলতে গিয়ে অনেকগুলো কথা বলে ফেললেন তিনি। অবস্থা একরকমই, জ্ঞান হয়নি, আর হবেও না, এবারে বোধ হয় যাবার ডাকই পড়ল। কাল অত রাতেও ধীরাপদ খবর নিতে ছুটে গিয়েছিল সে কথাও শুনেছেন।···সোনার টুকরো ছেলে, কারো বিপদ শুনলে সে কি ঘরে বসে থাকবে নাকি! না, শিকদার মশাই সেটা একটুও বেশি মনে করেননি। শুধু ভেবেছেন, দাদার জ্ঞান আর হবে না হয়ত, কিন্তু হলে শান্তি পেতেন একটু···সমস্ত জীবন তো কারোরই ভালো চোখে পড়ল না কিছু, যাবার সময় সকলের মুখই ভালো দেখে যেতে পারতেন।

শিকদার মশাই বসতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু ধীরাপদ কাগজ নিয়ে ঘরে চলে এলো।

স্নান করে রোজ সকাল নটার মধ্যে অফিসে বেরিয়ে পড়ে। নইলে বাস্‌এ ভিড় হয়ে যায়। ধীরাপদ ডাক্তার আসার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু এদিকে সাড়ে নটা বাজতে চলল।

ইতিমধ্যে বার দুই ভটচায মশাইয়ের দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, ছেলেদের সঙ্গে দু-একটা কথাও হয়েছে। বড় কোনো ডাক্তার এনে দেখানোর কথাটা বলি বলি করেও বলে উঠতে পারেনি। শেষবারে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে রমণী পণ্ডিতকে ও-ধারের দাওয়ায় দেখতে পেল। ধীরাপদ ঘরের তালা বন্ধ করছিল, পাশের ঘর থেকে গণুদা বেরুলো। রাতে কখন বাড়ি ফিরেছে ধীরাপদ টের পায় নি। এখন অফিসে চলেছে মনে হল।

মুখখানা শুকনো শুকনো। ধীরাপদকে দেখে থমকালো। বেরুবে নাকি···?

দেরি হবে একটু, আপনি যান। একসঙ্গে এগোবার ইচ্ছে ছিল হয়ত, পা বাড়িয়ে গণুদা দুই একবার ফিরে ফিরে দেখল ওকে। কিন্তু ধীরাপদ একেবারে বাজে কথা বলেনি, দেরি একটু হবে।. রমণী পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলবে, ফিরে এসে উমার কাছ থেকে বুকলিস্ট চেয়ে নেবে। মেয়ে ভুলেই বসে আছে বোধ হয়।

কাছে এসে কথা বলার আগে পণ্ডিতের মুখের দিকে চেয়ে ধীরাপদ হঠাৎ চমকেই উঠল। এই সুলতান কুঠির সঙ্গে সত্যিই কতদিন যোগ নেই তার!

পণ্ডিতের কালো মুখে যেন কুড়ো উড়ছে, চোয়ালের হাড় উঁচিয়েছে, চোখ ছুটো বসা, দেহ শীর্ণ হয়েছে। রমণী পণ্ডিত হঠাৎ যেন বুড়িয়ে গেছে। রোগীর কথা বলার আগে ধীরাপদ তাঁর খবরই জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার অসুখ করেছিল নাকি ?

রমণী পণ্ডিত উঠে দাঁড়ালেন। নিষ্প্রভ চোখে আশার আমেজ।—না, অসুখ আর কি…

অসুখ না হোক, শুনলে দুঃখের কথা শোনাতে পারেন কিছু। ধীরাপদ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তার তো এখনো এলেন না দেখছি।

পণ্ডিত ঠোঁট উল্টে দিলেন।—আসবেন। রাজঘরে এলেও প্রাপ্তিযোগ তো অর্ধেক, নিজের সময়মত আসবেন।

দ্বিধা কাটিয়ে ধীরাপদ বড় ডাক্তার এনে দেখানোর কথাটা তাঁকেই বলে গেল। ছেলেদের সঙ্গে আর ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখতে বলল, যদি দরকার মনে করেন তাঁরা, রমণী পণ্ডিত যেন তাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেন—সে ব্যবস্থা করবে, আর ফীয়ের জন্যেও ভাবতে হবে না। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে থাকবে, তার মধ্যে যেন টেলিফোন করা হয়।

রমণী পণ্ডিত ঘাড় নাড়লেন। চোখে আশার আলো। যিনি যেতে বসেছেন তাঁর প্রতি মমতা হৃদয়ের পরিচয় বটে। কিন্তু বাঁচার তাগিদে আধমরা হাল যার, সে কি একটুও অনুকম্পার যোগ্য নয় ? ধীরাপদর মনে হল, সেই ব্যাকুলতাই এবারে প্রকাশ করে ফেলবেন তিনি।

অফিসের তাড়া দেখিয়ে পালিয়ে এলো।

গণুদার দরজার কাছে এসে উমাকে ডাকতে সে বেরিয়ে এলো। মুখখানা আমসি।

বুকলিস্ট কই ?

উমা কান্না চেপে মাথা নাড়ল শুধু। ধীরাপদ সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছে, কিন্তু বুঝেও তেতে উঠল হঠাৎ।—কি হল, বই চাই না ?

উমা সভয়ে ঘরের ভিতরে তাকালো একবার, তার পর মৃদু জবাব দিল, মা বলল আনতে হবে না।

ও। ধীরাপদ বড় বড় দু পা ফেলে এগিয়ে গেল। মাত্র দু পা-ই। থামল আবার, তেমনি সবেগে ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়াল। ভিতরের চিলতে বারান্দায় মোড়া পেতে বসে সোনাবউদি রাঁধছে। বাইরের একটা কথাও কানে যায়নি যেন।

ধীরাপদ ধীর গম্ভীর মুখে জানিয়ে দিল, আজ থেকে তার রাতের খাবার রাখার দরকার নেই, সে বাইরে থেকে খেয়ে আসবে।

জবাবে সোনাবউদি খুন্তি থামিয়ে একবার তাকালো শুধু। কানে গেছে এই পর্যন্ত। আদৌ না খেলেও যায় আসে না যেন। হাতের খুন্তি নড়তে লাগল আবার।

উমার বিহ্বল মূর্তির দিকে একবারও না তাকিয়ে ধীরাপদ দ্রুত সুলতান কুঠির আঙিনা পেরিয়ে গেল। ভিতরে কি রকম দপদপানি একটা, যতটা বলে এলে আক্রোশ মেটে তার কিছুই বলা হয়নি। ওই সুলতান কুঠিতেই ফিরবে না আর—বলে এলে হত।

থমকে দাঁড়াল। ঈষৎ ব্যস্তমুখে গণুদা ফিরে আসছে।

চললে? বিব্রত প্রশ্ন গণুদার।

নিরুত্তরে পাশ কাটানোর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু গণুদা সামনেই দাঁড়িয়ে গেল। বলল, এতটা পথ ভেঙে আবার ফিরতে হল, ইয়ে—আজ আবার ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম দেবার শেষ দিন। সকালে বলে রেখেছিলাম, দেয়নি—গেলেও দেবে কি না কে জানে। যে মেজাজ। গণুদা ঢোক গিলল, স্ত্রীর মেজাজের ভয়ে মুখখানা শুকনো।—তোমার সঙ্গে আছে নাকি, রাতে বাড়ি এসে দিয়ে দিতাম, এখন আবার···

কত?

গণুদা আশান্বিত, প্রিমিয়াম তো পঞ্চাশ টাকা, তোমার সঙ্গে কত আছে? অফিস থেকেও কিছু যোগাড় করে নিতে পারি—

পার্স বার করে পাঁচখানা দশ টাকার নোট গণুদার হাতে দিয়ে ধীরাপদ হনহন করে এগিয়ে চলল আবার। তার জন্যে অপেক্ষা করল না বা ফিরেও দেখল না। জ্বালা জুড়িয়েছে একটু। একবেলার জন্যে হলেও টাকাটা ওর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। সোনাবউদি জানবে।

ধীরাপদ অন্যদিকে মন ফেরাতে চেষ্টা করল। রমণী পণ্ডিতের টেলিফোন পেলে লাবণ্যকেই জিজ্ঞাসা করবে ভটচায মশাইকে কাকে দেখানো যায়। তাকেই কোনো ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতে বলবে। ব্যক্তিগত ব্যাপার কিছু নয়, বরং দাক্ষিণ্যের ব্যাপার। ফী ধীরাপদই দেবে, ওষুধপত্রের খরচ যা লাগে তাও। কিন্তু অফিসে পা দিয়ে এই সহজ ব্যাপারটাও সহজ লাগছে না একটুও। বললে লাবণ্য সাগ্রহে ব্যবস্থা করবে হয়ত, কিন্তু ধীরাপদর সে সুযোগ দিতেও

পণ্ডিতের কালো মুখে যেন কুড়ো উড়ছে, চোয়ালের হাড় উঁচিয়েছে, চোখ দুটো বসা, দেহ শীর্ণ হয়েছে। রমণী পণ্ডিত হঠাৎ যেন বুড়িয়ে গেছে। রোগীর কথা বলার আগে ধীরাপদ তাঁর খবরই জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার অসুখ করেছিল নাকি ?

রমণী পণ্ডিত উঠে দাঁড়ালেন। নিষ্প্রভ চোখে আশার আমেজ।—না, অসুখ আর কি…

অসুখ না হোক, শুনলে দুঃখের কথা শোনাতে পারেন কিছু। ধীরাপদ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তার তো এখনো এলেন না দেখছি।

পণ্ডিত ঠোঁট উল্টে দিলেন।—আসবেন। রাজঘরে এলেও প্রাপ্তিযোগ তো অর্ধেক, নিজের সময়মত আসবেন।

দ্বিধা কাটিয়ে ধীরাপদ বড় ডাক্তার এনে দেখানোর কথাটা তাঁকেই বলে গেল। ছেলেদের সঙ্গে আর ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখতে বলল, যদি দরকার মনে করেন তাঁরা, রমণী পণ্ডিত যেন তাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেন—সে ব্যবস্থা করবে, আর ফীয়ের জন্যেও ভাবতে হবে না। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে থাকবে, তার মধ্যে যেন টেলিফোন করা হয়।

রমণী পণ্ডিত ঘাড় নাড়লেন। চোখে আশাব আলো। যিনি যেতে বসেছেন তাঁর প্রতি মমতা হৃদয়ের পরিচয় বটে। কিন্তু বাঁচার তাগিদে আধমরা হাল যার, সে কি একটুও অনুকম্পার যোগ্য নয় ? ধীবাপদর মনে হল, সেই ব্যাকুলতাই এবারে প্রকাশ করে ফেলবেন তিনি।

অফিসের তাডা দেখিয়ে পালিয়ে এলো।

গণুদার দরজার কাছে এসে উমাকে ডাকতে সে বেরিয়ে এলো। মুখখানা আমসি।

বুকলিস্ট কই ?

উমা কান্না চেপে মাথা নাড়ল শুধু। ধীরাপদ সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছে, কিন্তু বুঝেও তেতে উঠল হঠাৎ।—কি হল, বই চাই না ?

উমা সভয়ে ঘরের ভিতরে তাকালো একবার, তার পর মৃদু জবাব দিল, মা বলল আনতে হবে না।

ও। ধীরাপদ বড বড দু পা ফেলে এগিয়ে গেল। মাত্র দু পা-ই। থামল আবার, তেমনি সবেগে ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়াল। ভিতরের চিলতে বারান্দায় মোড়া পেতে বসে সোনাবউদি রাঁধছে। বাইরের একটা কথাও কানে যায়নি যেন।

ধীরাপদ ধীর গম্ভীর মুখে জানিয়ে দিল, আজ থেকে তার রাতের খাবার রাখার দরকার নেই, সে বাইরে থেকে খেয়ে আসবে।

জবাবে সোনাবউদি খুন্তি থামিয়ে একবার তাকালো শুধু। কানে গেছে এই পর্যন্ত। আদৌ না খেলেও যায় আসে না যেন। হাতের খুন্তি নড়তে লাগল আবার।

উমার বিহ্বল মূর্তির দিকে একবারও না তাকিয়ে ধীরাপদ দ্রুত সুলতান কুঠির আঙিনা পেরিয়ে গেল। ভিতরে কি রকম দপদপানি একটা, যতটা বলে এলে আক্রোশ মেটে তার কিছুই বলা হয়নি। ওই সুলতান কুঠিতেই ফিরবে না আর—বলে এলে হত।

থমকে দাঁড়াল। ঈষৎ ব্যস্তমুখে গণুদা ফিরে আসছে।

চললে? বিব্রত প্রশ্ন গণুদার।

নিরুত্তরে পাশ কাটানোর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু গণুদা সামনেই দাঁড়িয়ে গেল। বলল, এতটা পথ ভেঙে আবার ফিরতে হল, ইয়ে—আজ আবার ইন্‌সিওরেন্স প্রিমিয়াম দেবার শেষ দিন। সকালে বলে রেখেছিলাম, দেয়নি—গেলেও দেবে কি না কে জানে। যে মেজাজ। গণুদা ঢোক গিলল, স্ত্রীর মেজাজের ভয়ে মুখখানা শুকনো।—তোমার সঙ্গে আছে নাকি, রাতে বাড়ি এসে দিয়ে দিতাম, এখন আবার···

কত?

গণুদা আশান্বিত, প্রিমিয়াম তো পঞ্চাশ টাকা, তোমার সঙ্গে কত আছে? অফিস থেকেও কিছু যোগাড় করে নিতে পারি—

পার্স বার করে পাঁচখানা দশ টাকার নোট গণুদার হাতে দিয়ে ধীরাপদ হনহন করে এগিয়ে চলল আবার। তার জন্যে অপেক্ষা করল না বা ফিরেও দেখল না। জ্বালা জুড়িয়েছে একটু। একবেলার জন্যে হলেও টাকাটা ওর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। সোনাবউদি জানবে।

ধীরাপদ অন্যদিকে মন ফেরাতে চেষ্টা করল। রমণী পণ্ডিতের টেলিফোন পেলে লাবণ্যকেই জিজ্ঞাসা করবে ভটচায মশাইকে কাকে দেখানো যায়। তাকেই কোনো ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতে বলবে। ব্যক্তিগত ব্যাপার কিছু নয়, বরং দাক্ষিণ্যের ব্যাপার। ফী ধীরাপদই দেবে, ওষুধপত্রের খরচ যা লাগে তাও। কিন্তু অফিসে পা দিয়ে এই সহজ ব্যাপারটাও সহজ লাগছে না একটুও। বললে লাবণ্য সাগ্রহে ব্যবস্থা করবে হয়ত, কিন্তু ধীরাপদর সে সুযোগ দিতেও

আপত্তি। রমণী পণ্ডিতকে বরং বলে দেবে যে ডাক্তার দেখছেন ভটচায মশাইকে, তিনিই কোনো বড় ডাক্তার নিয়ে আস্থন। কী দেখার জন্যে না হয় ট্যাক্সি নিয়ে ছুটবে এখান থেকে। সেটা বরং সহজ।

সোজাসুজি না দেখলেও ধীরাপদ লক্ষ্য করেছে লাবণ্য সরকারের মুখখানা লাবণ্যে চলচল আজ। দূর থেকে লক্ষ্য করেছে, অন্যের সঙ্গে যখন কথা বলছিল তখনো দেখেছে। চোখে মুখে সর্বাঙ্গে লঘু খুশির ছন্দ দেখেছে। কোনোদিকে না চেয়ে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে গেছে ধীরাপদ। কিন্তু রমণীর খুশির আমেজ লাগা আপলের নরম দৃষ্টিটা ঠিকই উপলব্ধি করেছে।

ঠাণ্ডা মাথায় নিজের টেবিলে বসে কাজে মন দিতে চেষ্টা করেছে। পেরে ওঠেনি।...আজ লাবণ্য সরকারও কৃতজ্ঞ বই কি। সরকারী অর্ডার সাপ্লাইয়ের গোল মেটেনি শুধু, সিনিয়র কেমিস্ট আনার দায়টা নিজের ঘাড়ে নিয়ে তাদের মস্ত একটা ভুল-বোঝাবুঝির অবসান করে দিয়েছে সে। গতকাল মেডিক্যাল হোম থেকে লাবণ্যকে গাড়িতে তুলে নিয়ে অমিতাভ ঘোষ হয়ত বা নিজের এতদিনের ব্যবহারের দরুন অনুশোচনাই প্রকাশ করেছে।...লাবণ্য সরকার হকচকিয়ে গিয়েছিল কি ?

মহিলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ধরন আলাদা। তানিস সর্দারের মত বলবে না কিছু, কাঞ্চনের মত নির্বাক দু চোখ উপচে উঠবে না। তার প্রসন্নতা লাভটুকুই দুর্লভ জানে, সেইটুকুই বর্ষণ করবে। ধীরাপদর অনুমান, অবকাশ মত লাবণ্য সরকার আজও তার ঘরে আসবে।

কিন্তু চায় না আসুক। সকাল থেকেই নিজের মেজাজের ওপর দখল গেছে। স্নায়ু বিক্ষিপ্ত। আশার এ দারিদ্র্য দুর্বহ। আজ সে এককোণে সরে থাকতে চায়। আজ, কাল, প্রত্যহ—সামনের যে ক'টা দিন চোখে পড়ে।

তা ছাড়া, ও যেন কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। লাবণ্যর এই চাপা খুশির ঝলক দেখে আর একখানি থমথমে মুখ মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে সেই থেকে। সে মুখ পার্বতীর।...লাবণ্যর প্রাপ্তিযোগ যত বড়, পার্বতীর হারানোর যোগও ঠিক ততো বড়ই।

আর, এই দুটো যোগেরই সে-ই নিয়ামক। আশ্চর্য!

লাবণ্য ঘরে এলো বেলা দুটোর পর। আসার উপলক্ষ বড় সাহেবই গতকাল করে রেখে গেছেন। আসন্ন দশম বার্ষিকী উৎসবের প্রোগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা। সদালাপী সহকর্মীর ঘরে হামেশা যেভাবে আসা চলে সেই ভাবেই এসেছে।

প্রথমেই কাজের কথা তোলেনি। বড় সাহেবের বাইরে থেকে ফেরার খবরটা

দিয়েছে। সকালে ফিরেছেন। ব্লাডপ্রেসার চড়েছে। লাবণ্যকে টেলিফোনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। প্রেসার কিছু বেশিই বটে। লাবণ্য কড়াকড়ি করে এসেছে, কয়েকটা দিন বেরুনো বা কোনো কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো বা বেশি কথাবার্তা বলা বন্ধ।

ধীরাপদর স্নায়ুর যুদ্ধ, এ যুদ্ধে হারলে নিজেকে ক্ষমা করবে না। তাকালো শুধু একবার, তারপর নিরাসক্ত তন্ময়তায় ফাইলে চোখ নামালো। আর একদিনের ব্লাডপ্রেসার দেখাটা চোখে ভাসছে।

বসতে বলেনি, লাবণ্য সরকার নিজেই চেয়ার টেনে বসল। হাল্‌কা তৎপরতায় ধীরাপদ নোটের নীচে খস্‌খস্‌ করে মন্তব্য লিখে চলেছে।

আজ প্রোগ্রাম নিয়ে বসবেন?

প্রোগ্রাম···না আজ থাক। এ ফাইলের কাজ শেষ, আর একটা ফাইলে টান পড়ল।

বাঁচা গেল, আমারও ভাল লাগছিল না। হাসির আড়ালে সঙ্কোচ অপসারণের চেষ্টা আর মাঝের এই অপ্রীতিকর দিন ক'টাকে মুছে দেবার চেষ্টা। কাঞ্চন-প্রসঙ্গ উত্থাপন করল।—কাল আপনি আমার ওখানে ওই মেয়েটিকে দেখতে গেছলেন শুনলাম, আমাকে বলেন নি তো যাবেন?

ধীরাপদও সহজ হতে চাইছে। অবাক করে দেবার মত সহজ, অবজ্ঞা করতে পারার মত সহজ। মুখ না তুলে জবাব দিল, আপনি আমাকে যত খারাপ ভেবেছিলেন তত খারাপ যে নই সেটা তখনো পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেন নি···বললে নার্সিং হোমের দরজা বন্ধ রাখার হুকুম হত বোধ হয়।

বিস্ময়ের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই হাসি চাপা দিয়ে লাবণ্য গতকালের অভ্যর্থনার সম্ভাবনাটা প্রায় স্বীকারই করে নিল। বলল, আজ যদি আসেন তো দেখবেন সব দরজা সটান খোলা রেখে আমি নিজে দাঁড়িয়ে আছি। আসবেন?

অন্তরঙ্গ সুরটা সুপরিচিত, হাসির জাদুও। আর এরই ওপর লাবণ্যর আস্থাও কম নয়। ধীরাপদর কানে গেল এই পর্যন্ত, প্রত্যুত্তরের তাগিদ নেই। নির্লিপ্ত নিবিষ্টতায় গোটা টেবিলটা ফাইল-মুক্ত করার ইচ্ছে।

খানিক অপেক্ষা করে সাদাসিধেভাবে লাবণ্য একটা প্রশংসার খবরই ব্যক্ত করল যেন।—মেয়েটার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে মনে হল এ পর্যন্ত মানুষ ওর জীবনে একজনই দেখেছে—

মেয়েটা বোকা। ধীরাপদর নিরুৎসুক মন্তব্য।

আমার তো ধারণা মেয়েটা বেশ চালাক, লঘু প্রতিবাদ,—নইলে এত লোকের মধ্যে শুধু একজনকে বেছে নিল কি করে ?

ফাইল ছেড়ে ধীরাপদর দৃষ্টিটা লাবণ্যর মুখের ওপর এসে থেমে রইল একটু। তেমনি ঠাণ্ডা জবাব দিল, এইজন্যেই আর পাঁচজনের তুলনায় বোকা বলছি—

অন্যদিন হলে এটুকুতেই প্রতিদ্বন্দ্বিনী তেতে উঠত, কিন্তু আজ সে রাগ-বিরাগের ধার দিয়েও গেল না। উল্টে ছদ্ম কৌতুকের ওপর আহত বিস্ময় ছড়িয়ে বলে উঠল, এই পাঁচজনের আমিও একজন বুঝি ?

ধীরাপদ স্টেটমেণ্ট পড়ছে একটা।

অতি বড় সাধ্বীরও আপন-পর সব পুরুষেরই নিস্পৃহতা চক্ষুশূল নাকি। চক্ষু-লজ্জা কাটিয়ে অন্তরঙ্গ আপসের চেষ্টায় নিজে সেধে এসেও ফিরে যাবে, তেমন মেয়ে নয় লাবণ্য সরকার। উত্তরের প্রত্যাশা না করেই বলে গেল, কি কাঁদুনে মেয়ে আপনার ওই বোকা মেয়ে, কেঁদে কেঁদে বিছানা বালিশ সব ভাসিয়ে দিলে, চিকিৎসা করব না কান্না থামাব!…অমিতবাবু আজ বিকেলে দেখতে যাবেন বলছিলেন, আপনিও আসুন না ?

আজ তাড়া আছে—

হিমাংশুবাবুর বাড়িতে তো সেই সন্ধ্যেয় যাচ্ছেন! অর্থাৎ বিকেলে তাড়া নেই।

না, অফিসের পরেই যাব, তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার—

কি দরকার ?

স্টেট্‌মেণ্ট পড়া প্রায় শেষ, এতক্ষণের সহিষ্ণুতায় চিড় খেতে দেবে না।—বাড়িতে অসুখ।

নিজের আওতায় এনে ফেলা গেল যেন এবারে। কার অসুখ ?

ও-বাড়ির একজনের।

আপনার আত্মীয়ের ?

আত্মীয়ের মত…

উত্তর থেকেই প্রশ্নের রসদ পাচ্ছে লাবণ্য সরকার। ওই বাড়িটার সকলেই আপনার আত্মীয়ের মত বুঝি ?

কপালের বিরক্তির কুঞ্চন স্টেট্‌মেণ্ট পছন্দ না হওয়ার কারণেও হতে পারে। নিরুত্তর।

ওটা কি পড়ছেন ?

টাইপ করা কাগজের গোছা একধারে সরিয়ে রাখল। জবাব দিল, ইউ. পি.

রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর স্টেট্‌মেন্ট। ফাঁকির ওপর চলেছে…

সর্বত্রই এক ব্যাপার। প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্যে লাবণ্য সমর্থনসূচক বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—তা আপনার ওই আত্মীয়ের মত ভদ্রলোকের কি অসুখ?

হাতের কাছে আর একটা ফাইল টেনে নিয়েছিল ধীরাপদ। সেটা খোলা হল না। সোজাসুজি মুখের দিকে চেয়ে তার সব প্রশ্নেরই জবাব সেরে নেবার জন্য প্রস্তুত হল।—কাল বিকেলের দিকে কুম্লোতলায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, আজ সকালে পর্যন্ত জ্ঞান হয়নি দেখে এসেছি।

লাবণ্য এতটা আশা করেনি।—ওমা! থ্রম্বসিস্ নয় তো? বয়স কত? কে দেখছেন?

ধারাপদর ধৈর্যের পরীক্ষা।—বয়েস অনেক। চার টাকা ফী-এর একজন ডাক্তারকে ধরে-পড়ে দু টাকায় আনা হয়েছে।

অনুরোধ করলে কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে লাবণ্য আজ এই মুহূর্তে তার সঙ্গে গিয়ে রোগী দেখে আসতে আপত্তি করত না। দেখে এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করত। কিন্তু না বললে আগ্রহ দেখানো সম্ভব নয়। বলবে না বুঝেই খোঁচা দিতে ছাড়ল না, তাহলে কেমন আত্মীয়ের মত আপনার?

উত্তরটা মনের মত ধারালো করে তোলার আঁচে ধীরাপদ শকুনি ভটচাযকে অনেক উঁচুস্তরে টেনে তুলতেও দ্বিধা করল না। তেমনি বক্র গাম্ভীর্যে জবাব দিল, কি আর করা যাবে, ইচ্ছা থাকলেই তো সকলকে অনুগ্রহ করা চলে না।

টিপ্পনীর দরুন হোক বা চিকিৎসকের চোখে একজনের বিপদে এ ধরনের অবহেলার কারণেই হোক, লাবণ্য সরকার সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠল এবারে। গলার স্বরও চড়ল, চলে কি চলে না সেটা অজ্ঞান অবস্থায় ভদ্রলোক এসে আপনাকে বলে গেছেন?

জবাব না দিয়ে ধীরাপদ চেয়ে রইল চুপচাপ। কিন্তু দৃষ্টিটা এবারে ফাইলে টেনে নামানো দরকার অনুভব করছে। সম্মুখবর্তিনীর এই মূর্তি আর এই সুতৎপর তীক্ষ্ণতা পুরুষের লোভনীয় নিভৃতের সামগ্রী। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে দৃষ্টি নত করাটাও যেন স্নায়ু-দ্বন্দ্বে হার স্বীকার করার সামিল।

পরিস্থিতি বদলাল লাবণ্যর বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকতে। মেম-ডাক্তারের টেলিফোন। ডাকছে চীফ কেমিস্ট ঘোষ সাহেব।

মনের স্বাভাবিক অবস্থায় লাবণ্যর চকিত বিড়ম্বনাটুকু উপভোগ করার কথা। মর্যাদাময়ীর মুখে বুঝি বা নিমেষের জন্য লালিমা-সিক্ত একটি মেয়ের মুখই উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছিল। কটাক্ষে ধীরাপদর দিকে একবার তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে

দাঁড়িয়েছে। অত বিশদ করে বলার দরুন বেয়ারাটার ওপরেই হয়ত চটেছে মনে মনে।

স্থির অবিচ্ছিন্ন একাগ্রতায় ধীরাপদর দু চোখ হাতের ফাইলে এসে নেমেছে আবার, নারী-তনু-বিশ্লেষণের রূঢ় প্রলোভনে দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করেনি আগের মত। তার পরেও একটানা কাজ করে গেছে, নিবিষ্টতায় ছেদ পড়তে দেয়নি। নিজের ভিতরে যেন একটা পাকাপোক্ত দেয়াল তুলে দিয়েছে সে, সেই দেয়ালের ওধারে কেউ যদি মাথা খোঁড়ে খুঁড়ুক। ধীরাপদ কান দেবে না, প্রশ্রয় দেবে না।

ঘড়ি ধরে পাঁচটায় উঠেছে। যথানির্দেশ পার্সোনাল ফাইল নিয়ে হিমাংশুবাবুর বাড়ি গেছে। মনিবের নির্দেশ। মানকে তাকে অন্দরের বসার ঘরের ভিতর দিয়ে শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। বড় সাহেব অত সকালে আশা করেননি তাকে, দেখে খুশি হয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি ফেরার ইচ্ছে শুনে হাল্কা অভিযোগ করেছেন, আমি ভাবলাম শরীর খারাপ শুনে এলে—

প্রেসার কত ?

খুশি মেজাজে ছিলেন। প্রেসার কত সঠিক বলতে পারলেন না, তবে অনুমান, কিছু বেশিই হবে। কারণ প্রেসার মাপতে মাপতে মেয়েটার মুখখানা একটু বেশিই গম্ভীর হয়েছিল দেখেছেন। লাবণ্য যখন প্রেসার দেখে বড় সাহেব তখন তার মুখ দেখেন—দেখে আঁচ করেন প্রেসার কম কি বেশি। লঘু গাম্ভীর্যে তার নির্দেশের কড়াকড়িও শুনিয়েছেন '—ওঠা-বসা চলা-ফেরা কাজ-কর্ম চিন্তা-ভাবনা খাওয়া-দাওয়া সব বাতিল—এভরিথিং নো! হেসেছেন। আগে তার ওই ডাক্তারি দেখার জন্যেই অনেক সময় তাকে ডেকে পাঠাতেন নাকি।

অর্থাৎ ডেকে পাঠিয়ে রোগী সাজতেন। পাইপ-চাপা মুখের সকৌতুক প্রসন্নতার ওপর ধীরাপদর দৃষ্টিটা আটকে ছিল কয়েক মুহূর্ত। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের আশায় পার্সোন্যাল ফাইলটা পালঙ্কের পাশে ছোট টেবিলটার ওপরে রেখেছিল।

কিন্তু বড় সাহেব লক্ষ্য করেননি তেমন। ভাগ্নে কাজে যোগ দিয়েছে জেনে খুশি। লাবণ্যর মুখে শুনেছেন বললেন। ধীরাপদও কিছু বলবে আশা করেছিলেন হয়ত, কিন্তু তাকে চুপ করে থাকতে দেখে এ ব্যাপারে আর কৌতূহল প্রকাশ করেননি। বলেছেন, লাবণ্যও আজ খুব প্রশংসা করছিল তোমার।

খানিক আগে নিজের মধ্যে যে দেয়াল খাড়া করেছিল, প্রশংসাটা তার এধারেই ধাক্কা খেয়ে ফিরেছে। ধীরাপদ নির্বিকার। উঠতে পারলে হত।

ঘণ্টাখানেকের আগে ছাড়া পায়নি। আসন্ন অ্যানিভার্সারির প্রসঙ্গ উঠেছে। উৎসবটা উৎসবের মতই হওয়া দরকার, এখানকার এবং ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশান সংলগ্ন বাইরের সব ইউনিটকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে, কাগজে স্পেশ্যাল বিজ্ঞাপন দিতে হবে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের উদ্বোধন-ভাষণটা এবারে যেন খুব ভেবেচিন্তে লেখা হয়, কর্মচারীদের স্পেশ্যাল বোনাস ঘোষণা আর ভবিষ্যতে আরো কিছু সুবিধে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকবে তাতে। অর্থাৎ, বিলিতি ফার্মের মতই এখানকার কর্মচারীরাও সুবিধে পাচ্ছে এবং পাবে সেই আভাস যেন থাকে। কি কি প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে অমিত আর লাবণ্যর সঙ্গে যেন ভালো করে আলোচনা করে নেওয়া হয়। না, ছেলেকে তিনি এর মধ্যে টানতে চান না, প্রসাধন-শাখা নিয়েই থাকা দরকার তার। তা ছাড়া ছেলে এর মধ্যে থাকলে ভাগ্নেকে পাওয়া যাবে না সেটা সিনিয়র কেমিস্ট আনার ব্যাপারেই বিলক্ষণ বোঝা গেছে। ধীরাপদ দায়িত্ব নিলে সে যদি ঠাণ্ডা থাকে—থাক্।

পার্সোন্যাল ফাইল কেন নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল সেটা বোঝা গেল সব শেষে। বড় সাহেবের কাছে আসন্ন উৎসবের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এবারের অল্ ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশানের সাধারণ অধিবেশন বসছে কানপুরে। তারও খুব দেরি নেই আর। অধিবেশনে প্রধান বক্তা হিসেবে যোগদান করবেন তিনি। সেই ভাষণে বৈদেশিক ব্যবসায়ের পাশাপাশি এ দেশের গোটা ভেষজ ব্যবসায়ের চিত্রটি তুলে ধরতে হবে। শুধু তাই নয়, সরকারী নীতির পরিবর্তন এবং আনুষঙ্গিক বাধা-বিঘ্ন দূর করতে পারলে দেশের এই শিল্প কোন্ আদর্শ-পর্যায়ে উঠতে পারে তারও যুক্তিসঙ্গত নজির বিশ্লেষণ করতে হবে। সেই সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশানের নিষ্ক্রিয়তার আভাসও প্রচ্ছন্ন থাকবে।

ব্লাডপ্রেসার ভুলে আর লাবণ্য সরকারের কড়াকড়ি ভুলে সাগ্রহে নিজেই উঠে গিয়ে ওধারের অফিসঘর থেকে ছোট-বড় একপাঁজা পুস্তিকা এনে হাজির করলেন তিনি···এ-রকম আরো অনেক আসছে জানালেন, ধীরাপদর তথ্যের অভাব হবে না।

এ পর্যন্ত বড় সাহেবের অনেক বক্তৃতা অনেক ভাষণ অনেক বাণী লিখেছে, কিন্তু ঠিক এতটা উদ্দীপনা আর দেখেছে বলে মনে পড়ে না। ব্লাডপ্রেসারের প্রতিক্রিয়া কিনা সেই সংশয় মনে এসেছিল। কিন্তু না, এরও কারণ গোপন থাকল না।

তাঁর লক্ষ্য, আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট ইলেকশান্। অল্ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশানের বাঙালী প্রেসিডেন্ট এ পর্যন্ত দু-একজনের বেশি হয়নি। বর্তমানের প্রাদেশিকতায় সে সম্ভাবনা ক্রমশ নিষ্প্রভ হতে বসেছে। সামনের বছরের নির্বাচনে বাঙালীর গৌরব ফিরিয়ে আনা যায় কিনা সেটাই একবার দেখবেন তিনি। বাইরের অনেক ইউনিটের বন্ধুস্থানীয় কর্মকর্তারা ক-বছর ধরেই তাঁকে এগিয়ে আসার জন্ম অনুরোধ করেছেন, আর সমর্থনের আশ্বাস দিচ্ছেন।

এবারে তাঁর এগিয়ে আসার সঙ্কল্প। আগামীবারে নির্বাচনে দাঁড়াবেন।

প্রধান বক্তার ভাষণে সেই প্রস্তুতিটি জোরালো করে তুলতে হবে ধীরাপদকে। সকলের টনক নড়ে যায় এমন কিছু শোনাতে হবে। পরের প্রচার-ব্যবস্থা ভেবেচিন্তে পরে করা যাবে।

তাঁর বক্তব্যের উপসংহার, এ-রকম দু-দুটো দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ধীরাপদর অন্যত্র থাকা চলে না, এমন এক জায়গায় থাকে যে একটা টেলিফোনের যোগাযোগ পর্যন্ত নেই, একটা লোক পাঠাতে হলেও এক ঘণ্টার ধাক্কা। অতএব অবিলম্বে সুলতান কুঠির বাস গুটিয়ে তার এখানে চলে আসা দরকার, কোনরকম অসুবিধে যাতে না হয় সে ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন।

ধীরাপদ জবাব দেয়নি, কিন্তু বিব্রত জবাবটা মুখেই লেখা ছিল বোধ হয়। হিমাংশু মিত্রের নজর এড়ালো না। ঠাট্টা করলেন, তুমি ও-রকম একটা জায়গা আঁকড়ে আছ কেন···এনি সুইট্ অ্যাফেয়ার ?

এরই বা জবাব কি ?

হিমাংশুবাবু আংশিক অব্যাহতি দিলেন তাকে। বরাবরকার মত উঠে আসতে আপত্তি হলে এই কাজের সময়টা অন্তত এখানে থাকতে নির্দেশ দিলেন।

সেখান থেকে বেরিয়ে ধীরাপদর প্রথমেই মনে পড়ল মেয়ের বুক-লিস্ট দেয়নি বলে আজই রাগের মাথায় ভাবছিল সুলতান কুঠি ছেড়ে চলে আসবে। সেই মুখের কথা শুনেই অলক্ষ্য চক্রীটির যেন জব্দ করার ইচ্ছে তাকে।

বাস-এ উঠতে গিয়ে থমকালো আবার। ঘড়ি দেখল, সাতটা বাজে। সোনাবউদিকে রাতের খাবার রাখতে নিষেধ করে এসেছে। এই সাত-সন্ধ্যায় হোটেল-রেস্তর্াঁয় গিয়ে বসার ইচ্ছে আদৌ নেই। রাত আরো বেশি হলেও সে ইচ্ছে হত না। তার থেকে বরং এক রাত না খেয়ে কাটাবে, আগে কত রাতই তো কেটেছে। ধীরে-সুস্থে গেলে ঘরে পৌঁছুতে প্রায় আটটা হবে।···খেয়ে আসেনি সেটা নাও ভাবতে পারে তখন।

ধীরাপদ বাল ধরল।

সুলতান কুঠির আঙিনায় পা দিয়ে দেখে কদমতলায় বেঞ্চিতে হুঁকো হাতে একাদশী শিকদার বসে। এ সময়টা তাকে বাইরে দেখা যায় না বড়। দূরে শকুনি ভটচাযের দাওয়ায় টিমটিম লণ্ঠন জ্বলছে গতরাতের মতো। সেখানেও দাঁড়িয়ে কারা। বোধ হয় ছেলেরা আর রমণী পণ্ডিত।

ভটচায মশাই কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করতে আগে ব্যস্ত হয়ে একটু সরে বসে বেঞ্চি চাপড়ালেন একাদশী শিকদার, বোসো বাবা বোসো, সারাদিন খেটে-খুটে এলে—

খবরাখবর নেবার জন্যেই ধীরাপদ বসল।

হুঁকোর মায়া ভুলে শিকদার মশাই বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন একটা, তার পর সমাচার শোনালেন।...অবস্থা একরকমই ছিল, বিকেলের দিকে শ্বাসকষ্ট বাড়তে ধীরাপদর অফিসে খবর দেওয়া হয়—খবর পেয়ে যে মেয়ে ডাক্তারটি এসেছিলেন তিনি খুব যত্ন করেই রোগী দেখে গেছেন—মা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—কিন্তু কালে টেনেছে যাকে তাকে আর ধরে রাখা যাবে কেমন করে? রোগীর নাকে শুধু বাতাসের নল লাগানোর ব্যবস্থা দিয়ে তিনি চলে গেছেন, যাবার আগে মেয়েটি গণুদার বউটির সঙ্গেও একটু বাক্যালাপ করে গেছেন। সঙ্গে আর একটি সাহেবপানা অল্পবয়সী ভদ্রলোক ছিলেন, কিন্তু তিনি আর ঘরে ঢোকেননি।

ধীরাপদ হতভম্ব একেবারে। পাঁচটার পরে টেলিফোন করা হয়েছিল, টেলিফোন পেয়ে লাবণ্য এসেছিল আর অমিতাভ ঘোষ এসেছিল। ইচ্ছে থাকলে অনুগ্রহ যে করা চলে তাই দেখিয়ে গেল। নিমেষে সমস্ত ভিতরটা তিক্ত হয়ে গেল। কি দরকার ছিল অত ভাবপ্রবণ হয়ে সাত-তাড়াতাড়ি রমণী পণ্ডিতকে ফোন করতে বলার—শকুনি ভটচাযের জন্যে কতটুকু দরদ তার? রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠল, আমি তো পাঁচটার আগে ফোন করতে বলে গিয়েছিলাম, পাঁচটার পরে কে করতে বলেছে?

হুঁকো হাতে নড়েচড়ে বসলেন শিকদার মশাই, আবছা অন্ধকারের অলক্ষ্যে হয়ত একটু সরেও। মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মেজাজী গলা কানের পরদায় খটখট করে উঠল। বলেছিলে বুঝি! ওই রকমই আজকাল কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে পণ্ডিতের, দুপুরে বেরুবার মুখে ফোন-ফোন কি বলে গেল আমার কাছে—আমি সাতজন্মে কখনো ওসব হাতে করেছি না কানে লাগিয়েছি! আবার বিকেলে এসে একবার খোঁজখবর করেই বেরিয়ে গেল—আধ ঘণ্টা না যেতে দেখি

মেয়ে ডাক্তার এসে হাজির। আমরা তো ধরে বসে আছি তুমি পাঠালে!

ধীরাপদ তার পরেও বসেছিল খানিকক্ষণ। আর কিছু শোনার জন্যে নয়, এমনিই। কিন্তু সেই অবকাশে মোলায়েম খেদে একাদশী শিকদার শুনিয়েছেন কিছু। অতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে অভাবে পড়েই হয়ত পণ্ডিতের মতিগতি কেমন বদলে গেছে আজকাল। ধীরাপদ নিশ্চয় কিছুই লক্ষ্য করেনি, কিছুই জানে না—কাজের লোক সে, জানার কথাও নয়। কিন্তু চোখের ওপর তাঁদের তো দেখতেই হচ্ছে আর সুনাম-দুর্নামটাও ভাবতে হচ্ছে।…পণ্ডিতের মেয়েটার চালচলন দিনকে দিনই কেমন হচ্ছে, কাউকে কেয়ারও করে না। তাঁদের মত বুড়োদের চোখে পড়ে বলে লাগে, কিন্তু বাপ আজকাল ওসব দেখেও দেখে না, অভাবের তাড়নায় উল্টে প্রশ্রয়ই দেয় হয়ত। এদিকে কুঠিবাড়ির যা অবস্থা, আজ এদিক খসে তো কাল ওদিক, এর মধ্যে কাবুলিওয়ালা এসে এসে লাঠি ঠুকে ওদিকটার ভিতসুদ্ধ নাড়িয়ে দিল—গত পনের দিনের মধ্যে কম করে তিন দিন পণ্ডিতের দাওয়ায় কাবুলিওয়ালা হানা দিয়েছে—আরো কদিন দেবে কে জানে!

নিজের অগোচরে বসে শুনছিল ধীরাপদ। নির্বাক…উঠে পড়ল। ইচ্ছে না থাকলেও ওদিকটায় একবার গিয়ে দাঁড়ানো দরকার, রোগীর খোঁজ নেওয়া দরকার। লাবণ্য সরকার কি বলে গেছে তাও ভালো করে জানা দরকার।

তাকে উঠতে দেখে হুঁকো হাতে শিকদার মশাইও উঠলেন।

লাবণ্য সরকার শুধু অক্সিজেন টিউব লাগানো ছাড়া নতুন আর কিছুই ব্যবস্থা দিয়ে যায়নি বটে। রমণী পণ্ডিতকে বলে গেছে, ধীরুবাবু ছিলেন না বলেই সে এসে দেখে গেল, তবে করার কিছু নেই আপাতত, দরকার বুঝলে কাল যেন ধীরু-বাবু বড় ডাক্তার নিয়ে আসেন।

রমণী পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে ধীরাপদ নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল। অন্ধকারে শ্রোতার ভাবলেশহীন মুখখানা চোখে পড়েনি। কদমতলার কাছাকাছি এসে মেয়ে ডাক্তারটির সহৃদয়তার প্রশংসা শুরু করেছিলেন তিনিও। মেয়েটিই টেলিফোন ধরেছিলেন, সুলতান কুঠি থেকে টেলিফোনে কথা বলা হচ্ছে শুনে নিজে থেকে বাড়ির অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন…

আমি আপনাকে পাঁচটার মধ্যে ফোন করতে বলেছিলাম, সমস্ত দিন পার করে তারপর উপকার করতে দৌড়নোর দরকার ছিল কী?

রমণী পণ্ডিত থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু ধীরাপদ দাঁড়িয়ে আর কিছু শুনতে রাজি নয় দেখে আত্মস্থ হতে সময় লাগল না। ফুটন্ত তেলে জলের ছিটে—ওই শিকদার এইসব বলেছে আপনাকে সাতখানা করে, না? বলবেই

তো, আমি জানি বলবে। সমস্ত দিন আমি সংসারের ধান্দায় ঘুরি, তার পরেও যেটুকু পারি করি—কিন্তু ওনারা কুৎসা করে বেড়ানো ছাড়া আর কি করেন?

ঘরের কাছাকাছি এসে ধীরাপদ বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়ে গেছে। এই উদ্‌গিরণের মুখে ঘর খুললে উনিও ঘরে ঢুকবেন। ধীরাপদ নিরিবিলি চাইছে।

রমণী পণ্ডিতের গলায় উত্তাপ সত্ত্বেও সুবিচারের আবেদন ছিল। তাঁর বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত অব্যাহতি নেই। তাঁর সওয়ালে কান পাততে হয়েছে।...বেলা দেড়টা পর্যন্ত হাফ-ফীয়ের ডাক্তার আসেননি, রমণী পণ্ডিত দু-দুবার তাঁকে তাগিদ দিতে গিয়ে দেখা পাননি। তারপর আর অপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে, না বেরুলে রাতে হাঁড়ি চড়ে না। তাই একাদশী শিকদারকেই এইটুকু ব্যবস্থার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন, ডাক্তারের মত হলে ছেলেরা কেউ একজন গিয়ে যেন ধীরুবাবুকে ফোন করে আসে সেই কথাও বলে গিয়েছিলেন। ধীরুবাবুর দেওয়া টেলিফোন নম্বর লেখা কাগজটা পর্যন্ত তাঁর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন—কিন্তু এসে দেখেন কোনো ব্যবস্থাই হয়নি, রোগীর এদিকে শ্বাসকষ্ট, বাড়িতে কান্নাকাটি। তখন পাঁচটা বেজে গেছে কি বাজেনি রমণী পণ্ডিত জানেন না, তক্ষুনি আবার ছুটেছেন টেলিফোন করতে।

নিজের রূঢ়তার দরুন ধীরাপদ নিজেই লজ্জিত একটু, একজনের মৃত্যুর সামনে এ রকম মর্যাদাবোধ টনটনিয়ে না উঠলেই হত। ভদ্রলোক করছেনই তো, ভটচায মশাইয়ের ছেলেরাও কৃতজ্ঞ সেজন্য। তাছাড়া, লাবণ্য সরকার কাকে জব্দ করার জন্যে এমন সহৃদয়তার পরিচয় দিয়ে গেল সেটা আর উনি জানবেন কি করে।

কিন্তু রমণী পণ্ডিতের রাগ আর আবেদন মেশানো খেদ-উক্তির সবে শুরু। তিনি ঠিক জানেন, একাদশী শিকদার ইচ্ছে করেই কোন ব্যবস্থা করেননি, ছেলেদেরও বলেননি। কেন বলবেন? দরদ থাকলে তো বলবেন, মনে মনে এখন হয়ত হিসেব করছেন, এ ক-বছর তাঁর ক-মণ তামাকের ধোঁয়া ভটচায মশায়ের পেটে গেছে—রমণী পণ্ডিত হলপ করে বলতে পারেন শকুনি ভটচায চোখ বুজতে চলেছেন বলে তাঁর একটুও দুঃখ হয়নি, উল্‌টে কোনো ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কি ব্যাপার তিনি জানেন না অবশ্য, কিন্তু কিছু একটা আছেই। ওই জন্যেই এতকাল তাঁকে তোয়াজ করে এসেছেন। গোপনে গোপনে অনেকবার শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়েছেন ভটচায মশাইকে দিয়ে, হয়ত সেই কারণে উনি শিকদার মশাইয়ের অনেক দুর্বলতার কথাও জানতেন। এখন নিশ্চিন্ত, এখন আর কিছু ফাঁস হবার ভয় নেই।

ধীরাপদ অবাক, ঘরে ঢোকার তাগিদ ভুলে গেল, নিরিবিলির তাগিদ ভুলে গেল।

রমণী পণ্ডিতের অসহিষ্ণু জ্বালাটা ঠাণ্ডা হল একটু, সুর নরম হল।···বুড়ো ভদ্রলোক যেতে বসেছেন, এ অবস্থায় তাঁর মিথ্যে নিন্দে করলে পণ্ডিতের জিভ খসে যায় যেন, কিন্তু এত বয়স পর্যন্ত ওই দুই বুড়ো ভদ্রলোক নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে কালি ঢেলেছেন শুধু, একটুও দয়ামায়া যদি থাকত ওঁদের বুকে। ওইটুকু একটা মেয়েকে নিয়ে আবার তাঁরা গঞ্জনা দিতে শুরু করেছিলেন পণ্ডিতকে। ধীরাবাবু দয়া করে একটু পড়াত, তাতেও তাঁদের চোখ টাটিয়েছিল, এখন প্রায় বাপের বয়সী গণুবাবু একটু-আধটু সাহায্যের চেষ্টা করেছেন, চেনা-জানা মেয়েদের দু-একটা হাতের কাজ শেখানোর জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন—এতেও ওঁদের গাত্রদাহের শেষ নেই। রমণী পণ্ডিত শাপমন্যি করেন না কাউকে, কিন্তু এতে কি ওঁদেরই ভালো হচ্ছে, না হবে?···

নিজের ঘরে বসেও ধীরাপদর মাথাটা ঝিমঝিম করেছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ঘর-দোর অন্য দিনের মতই পরিচ্ছন্ন দেখেছে, বিছানাটাও রোজকার মত পরিপাটি করে পাতা, সামনের দেওয়ালের কাছে খাবারটা ঢাকা দেওয়া নেই শুধু। তার সময়ও হয়নি। কিন্তু ধীরাপদ এসব নিয়ে ভাবছে না। একাদশী শিকদারের খেদ আর রমণী পণ্ডিতের মর্মদাহে মাথা ঠাসা।

···এতকালের একমাত্র সঙ্গীর বিয়োগ-সম্ভাবনায় একাদশী শিকদার তেমন যে কাতর হননি, সেটা ধীরাপদ নিজেই লক্ষ্য করেছে। অন্যদিকে পণ্ডিতের মেয়ে কুমুর চালচলনের কটাক্ষটা যে সম্প্রতি গণুদা পর্যন্ত গড়িয়েছে সেটা বিশ্বাস না হলেও ধীরাপদ অস্বস্তিবোধ করছে কেমন। মায়ের মেজাজ প্রসঙ্গে উমারাণীর গতকালের গোপন ত্রাসের কথাগুলো নতুন করে কানের কাছে ভিড় করে আসছে। বলেছিল, মায়ের মুখের দিকে আজকাল তাকালে পর্যন্ত থরথরিয়ে কাঁপুনি, আর, তার বাবারও আর আগের মত ঝগড়া করার সাহস নেই, হয় মুখ বুজে থাকে নয়তো পালিয়ে যায়।

'মা আজকাল আরো কি ভীষণ রাগী হয়ে গেছে তুমি জান না ধীরুকা···'

ধীরাপদর আবার মনে হল, খুব বেশি রকমের অসঙ্গতি না দেখলে ওইটুকু মেয়ের এমন কথা বলার কথা নয়।

ভাবনায় ছেদ পড়ল, খাবারের থালা আর গ্লাস হাতে সোনাবউদি ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু উমারাণীর অমন ত্রাসের টাটকা নজির কিছু চোখে পড়ল না, বরং বিপরীত দেখল। দুই-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সোনাবউদি সুপরিচিত চাপা

বিদ্রূপে অনুমতি প্রার্থনা করল যেন, রাখব—না নিয়ে যাব?

কিন্তু ধীরাপদ যথার্থই গম্ভীর, সকালের অপমান সমস্ত দিন ধরে ভিতরটা কুরেছে। মেজাজের ওপর মেজাজ চড়ালে বরং এই একজনকে অনেক সময় নরম হতে দেখেছে। সকালে চড়িয়েছিল। এখনো আগে কৈফিয়ৎই নেবে।

সকালে মেয়েকে বুকলিস্ট দিতে দেননি কেন?

থালা গেলাস যথাস্থানে রাখল সোনাবউদি, ঘরের কোণ থেকে আসনখানা এনে পেতে দিল। তারপর ধীরেসুস্থে বলল, ঘরের মানুষটার মতিগতি যাতে একটু ফেরে সেই জন্যে। আপনার কি ইচ্ছে, সে চেষ্টা করব না?

তাকে অমন বিষম থতমত খেতে দেখেই হয়ত সোনাবউদি হেসে ফেলল। সামলে নেবার একটু অবকাশ দিয়ে আবার টিপ্পনী কাটল, রাগ গেছে, নাকি কাল আবার বলবেন এই বাড়িমুখোই হবেন না আর?

জোরালো আলোর ঘায়ে একঘর চাপ অন্ধকার যেমন নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কৈফিয়ৎটা শোনামাত্র ধীরাপদর সমস্ত দিনের থমথমে গুরুভারও তেমনি মিলিয়ে গেল কোথায়। হাল্‌কা লাগছে, গতকালের ঘরে ফেরার তৃষ্ণাটা এই মিটল বুঝি। নিজের ঘর না হোক, নিজের কারো ঘর…।

সোনাবউদির শেষের টিপ্পনীটুকুও আশ্রয়ের মত, খানিকটা আড়াল পাবার মত। খাবারের থালার দিকে চোখ রেখে বলল, কাল না হোক, দু-চার দিনের মধ্যেই এখান থেকে নড়তে হবে দিনকতকের জন্য।

নীরব প্রতীক্ষা একটু।—কোথায়?

বড় সাহেবের বাড়িতে, অনেকগুলো কাজের চাপ পড়েছে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকার হুকুম।

যেন এই কারণেই এত বিষণ্ণতা আর এত মেজাজ খারাপ। চোখ তুলে সোজাসুজি তাকাতে পারেনি, কিন্তু ধীরাপদর অনুমান, সোনাবউদির মুখখানা পরিহাস-সিক্ত হয়ে উঠেছে।

তা আপনার নড়তে বাধাটা কোথায়?

কোথায় বলা গেল না, কিন্তু ভারী ইচ্ছে হচ্ছিল বলে।

রয়েসয়ে এবারে বিকেলের খবরটা দিল সোনাবউদি, আপনাদের লাবণ্য ডাক্তার ভটচায মশাইকে দেখে ফেরার মুখে আমাকেও দেখে গেছেন।… ভটচায মশায়ের রাত কাটবে কিনা সন্দেহ বললেন, আমার সম্বন্ধে অবশ্য কিছু বলেননি।

ধীরাপদ হেসে ফেলল।

সোনাবউদি গম্ভীর।—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দু-চার মিনিট আলাপ-সালাপ করলেন, আর আপনার নামে কিছু নালিশ করলেন। আমাকে আপনার গার্জেন ভেবেছেন বোধ হয়।…আপনাদের বড় সাহেবের বাড়ি থেকে তাঁর বাড়িটা কত দূর?

অনেক দূর।

তাই তো, তাহলে এখান থেকে নড়ে আপনার কি-বা সুবিধে। আর, যে লোককে তাঁর সঙ্গে দেখলাম, আপনার কতটুকু আশা তাও বুঝি নে।

আশা নেই। ধীরাপদ হাসছে, হেসেই সায় দিতে পারছে।—কিন্তু আমার নামে আবার কি নালিশ করে গেলেন?

সোনাবউদির গম্ভীর মুখের মধ্যে শুধু চোখ দুটোতে খানিকটা করে তরল কৌতুক জমাট বেঁধে আছে।—কি নালিশ খেতে খেতে মনের আনন্দে ভাবতে থাকুন, রুটি আজ আর দু-চারখানা বেশি লাগবে বোধ হয়—লাগলে ডাকবেন। আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই, মেয়েটা খায়নি এখনো পর্যন্ত—

সত্যিই চলে গেল। ধীরাপদ তক্ষুনি উঠে খেতে বসল। খিদের তাগিদে নয়, সোনাবউদির ওপর সমস্ত দিনের ক্ষোভের অপরাধ তাতে কিছুটা লাঘব হবে যেন।

কিন্তু উমারাণীর গতরাতের উক্তিতে অতিশয়োক্তি ছিল না।

খাওয়া প্রায় শেষ। মুখ-হাত ধুয়ে ভটচায মশায়ের আর একবার খবর নিয়ে আসবে ভাবছিল। বাইরে থেকে যে মুখখানা উঁকি দিল সেটি গণুদার। ঘরে আর দ্বিতীয় কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

—তোমার সকালের টাকাটা দিতে এলাম। গলার মৃদু স্বর সোনাবউদির ভয়েই আরো মৃদু বোধ হয়, কিন্তু ফর্সা মুখখানা খুশিতে টসটসে। হাসল,—টাকাটা তখন পেয়ে খুব উপকার হয়েছে। বিকেলে অবশ্য অফিসের ওভারটাইম বিলটা পেয়ে গেলাম—

গণুদা পান খাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে পান চিবুচ্ছে বোধ হয়, একটা দুটো পানে দাঁত অত লাল হয় না, ঠোঁটের এধারে পর্যন্ত শুকনো লালের ছোপ। কিন্তু সাধারণ দু পয়সার পান খাচ্ছে না গণুদা, আতর-মুশকি দেওয়া বিলাসী পান হবে—ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটা আমেজী গন্ধ ছড়িয়েছে।

ধীরাপদ ইশারায় বিছানাটা দেখিয়ে দিল, অর্থাৎ টাকাটা ওখানে রেখে যেতে পারে। কিন্তু টাকা রাখার বদলে গণুদা নিজেই বিছানায় এসে বসে পড়ল।—তুমি খাও, আমি বসি একটু।

এই পান-বিলাসের মুখে সহধর্মিণীর সামনে পড়তে চায় না। খাওয়া হয়ে গেছে। হাসি চেপে ধীরাপদ বারান্দার উঠোনে মুখ ধুতে গেল, মুখ ধুয়ে এসে দেখে, গণুদা গায়ের জামাটা খুলে ফেলেছে। বলল, গরম লাগছে—

মুখ মুছে বিছানায় বসে ধীরাপদ একটু হেসে মন্তব্য করল, নবাবী আমলের 'রইস'রা পান খেয়ে গরমে তিন দিন বরফ-জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাকতো শুনেছি।

আনন্দে সব ক'টা লাল দাঁত দেখা গেল গণুদার। কাছাকাছি বসতে গন্ধটা উগ্র লাগছে এখন। বলল, তোমার জন্যেও নিয়ে আসব একদিন, এক-একটার দাম আট আনা করে, একদিন খেলে তিন দিন স্বাদ লেগে থাকে।

ধীরাপদকে গম্ভীর দেখে তাড়াতাড়ি জামাটা টেনে বুক পকেট থেকে পাঁচখানা দশ টাকার নোট তার দিকে এগিয়ে দিল।

হাত বাড়িয়ে সবে টাকাটা নিয়েছে, ঘরের মধ্যে যেন শূন্য থেকেই আবির্ভাব সোনাবউদির।—কিসের টাকা ওটা ?

কানের মধ্যে একঝলক করে গলানো আগুন ঢুকল দুজনারই। গণুদার পান-মুখ সঙ্গে সঙ্গে কাগজের মত সাদা। ধীরাপদও হঠাৎ হকচকিয়ে গেল কেমন।

ও টাকা কিসের ?

গণুদার বিবর্ণ মুখে আর এক ঝলক আগুনের ঝাপ্‌টা। অস্ফুট জবাব দিতে চেষ্টা করল, ধী-ধীরুর—

ধীরুর টাকা তোমার কাছে কেন ?

গণুদার মুখ নিচু। ধীরাপদ হতভম্ব। জবাব দিচ্ছে না কেন, কি এমন অপরাধ করেছে গণুদা !

এগিয়ে এসে হঠাৎ ছোঁ মেরে গণুদার হাত থেকে জামাটা টেনে নিল সোনা-বউদি। ভাঁজ লণ্ডভণ্ড করে নাকের কাছে ধরে শুঁকল একটু। ক্ষিপ্ত জ্বালায় হিসহিসিয়ে উঠল আবার।—পান খেয়ে ও ছাইপাঁশের গন্ধ ঢাকবে ভেবেছ তুমি ?

জামাটাই ফালা ফালা করবে বোধ হয়, কিন্তু না, জামার নিচের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোট বার করল এক তাড়া—শ আড়াই-তিন হবে। নোট আর জামা হাতে সোনাবউদি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দু হাতে জামাসুদ্ধ নোটগুলো দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে সজোরে গণুদার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল। ধীরাপদ নিস্পন্দ কাঠ, সোনাবউদির দু চোখে ধকধক করছে সাদা আগুন।

নোট-দুমড়ানো জামাটা তুলে নিয়ে গণুদা ঘর ছেড়ে পালালো তক্ষুনি।

আপনি ওকে টাকা দিয়েছেন কেন ?

এবারে ধীরাপদর পিঠের ওপরে যেন আচমকা চাবুক পড়ল একটা। কিন্তু ধীরাপদ বিমূঢ় তখনো।

আমি জানতে চাই আপনি কেন ওর হাতে টাকা দিয়েছেন ? তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণুতায় ঘরের বাতাস সুদ্ধ দুখানা হয়ে গেল যেন।

লাইফ ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম দেবার জন্যে চেয়েছিলেন।

সোনাবউদির শোনার ধৈর্য নেই, দ্বিগুণ ক্ষিপ্ততায় গলা চড়ল আরো।—ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম শুকলাল দারোয়ান দেয়, আপনি কেন আমাকে না জিজ্ঞাসা করে ওর হাতে টাকা দেবেন ? কেন ? কেন ?

ধীরাপদ কি ভুল দেখছে ? ভুল শুনছে ? প্রিমিয়াম শুকলাল দারোয়ান দেয় ? আজ কি বার ? শনিবার নয়, রেস্-এর দিন নয়। কিন্তু গণুদার পকেটে অত টাকা! জুয়ার আসর ? জুয়ার আসরের দিনক্ষণ নেই।

ধীরাপদ নির্বাক, স্তব্ধ। কিন্তু সোনাবউদি থামেনি। তার কঠিন শাণিত কণ্ঠস্বর দু কান বিদীর্ণ করে বুকের মধ্যে গিয়ে কেটে বসছে।—আপনার মস্ত চাকরি, অনেক টাকা মাইনে—কেমন ? কেউ চাইলে টাকা দিয়ে অনুগ্রহ করার লোভ কিছুতে আর সামলে উঠতে পারেন না, না ? কেন আপনার এত টাকার দেমাক ? কেন আপনি—

বাইরে থেকে একটা কান্নার রোল ভেসে আসতে আচমকা থেমে গেল।

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকালো সোনাবউদি। স্তব্ধ মুহূর্ত গোটাকতক। শ্লথ, অবসন্ন পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শকুনি ভটচায মারা গেলেন।

ধীরাপদ স্থাণুর মত বসে।

। বোল ।

এ জগৎ কেন ? আমি আছি বলে।

সমস্ত প্রতিষ্ঠানটিতে অস্তিত্ব-উপলব্ধির হাওয়া লেগেছে। আসন্ন উৎসবে অস্তিত্বের এই সাড়ম্বর উপলব্ধিটুকুই আসল। আমি আছি—আমিই আছি। কিন্তু এই বৃহৎ আমিটার সঙ্গে ছোট বড় বহু বিচ্ছিন্ন আমির প্রত্যক্ষ যোগ। সেখানেই যত গণ্ডগোল।

ধীরাপদর মনে হয়, নিচের দিকের দক্ষ এবং সাধারণ কর্মচারী থেকে শুরু করে

ওপরের দিকের কলাকুশলী বা সাধারণ বিভাগীয় কর্মীদের কারো মনেই খুশির নয় খুব। তাদের মনের বিশ্রাম নেই, অস্তিত্বের ঘোষণায় নিজেদের হিস্যা বুঝে নেবার জন্য সকলেই পেয়াদা বসিয়ে রেখেছে। ফাঁক মত অনেকেই চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করে গেছে তাকে, কি হবে—কি পাবে তারা। সেদিন টিফিনে নিজেদের আওতার মধ্যে পেয়ে বহু মাসমাইনে আর সাপ্তাহিক হারের কারিগর ছেঁকে ধরেছিল তাকে—আকাঙ্ক্ষার শূন্য ঝুলি কতটা ভরবে আর কতটা শূন্য থেকে যাবে বুঝে নিতে চায়। কিছু যে পাবে এ তারা জেনেছে, কেমন করে জেনেছে ধীরাপদ জানে না। তাদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের আসল লাগামটা এবার ধীরাপদর হাতে—সেই রকমই ধারণা তাদের। সঙ্গে চীফ কেমিস্ট ঘোষ সাহেব আছে, আর আছে মেডিক্যাল অ্যাডভাইসার লাবণ্য সরকার। এর মধ্যে মহিলাটির অবস্থান তাদের বাঞ্ছিত নয়, কিন্তু তার অসি-ধারণের মানুষটা অর্থাৎ ছোট সাহেব এতে নেই—সেটা মস্ত ভরসার কথা। তবু, আশার সরোবরে সংশয়ের ছায়া কাঁপছে একটা।

অন্যান্য প্রতিশ্রুতির সঙ্গে স্পেশাল বোনাস ঘোষণার সংবাদটা পর্যন্ত ছড়িয়েছে। ধীরাপদর বিশ্বাস, ভবিষ্যতে অবিমিশ্র আনুগত্য লাভের আশায় বড় সাহেব কোম্পানীর ইউনিয়নের কোনো পাণ্ডার কাছে সে-রকম আভাস কিছু দিয়ে থাকবেন। তার ওপর ধীরাপদ নিজেও ভুল করেছে একটু। মন বোঝার জন্য সেও অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ফলে, আবেদনের চিনি ছড়িয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটা দাবির খসড়া নিয়ে হাজির তারা। মর্ম, প্রতিষ্ঠানের আজকের এই সোনার দিনটির সঙ্গে তাদের দীর্ঘ দশ বছরের রক্ত-জল-করা পরিশ্রম যুক্ত। তখন তারা প্রাপ্তির দিকে তাকায়নি, স্বার্থ নিয়ে জুলুমবাজি করেনি। প্রতিষ্ঠানের কাছে সুস্থ জীবনযাত্রার রসদটুকুই শুধু প্রত্যাশা এখন। আবেদনে রসদের ন্যূনতম তালিকাও পেশ করেছে একটা। সেই তালিকা দেখে ধীরাপদর দুই চক্ষু স্থির। এর আংশিক মেটাতে হলেও যে টাকার দরকার সেই অঙ্ক কল্পনার বাইরে।

ভুলের একমাত্র সার্থক ফসল অভিজ্ঞতা। স্বেচ্ছাকৃত এই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে ধীরাপদর আর একদিকে চোখ গেল। সে দিকটা খুব তুচ্ছ নয়। বড় সাহেবের নির্দেশ, সকল দিক ভেবেচিন্তে আর বিবেচনা করে প্রতিশ্রুতির সোনার জলে মুড়ে উদ্‌বোধনী ভাষণটি তৈরী করতে হবে। এদের প্রত্যাশার সঙ্গে সেই নির্দেশের সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হলে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গতির দিকটাই আগে যথাযথ জানা দরকার।

এদিকটা জানতে গিয়ে ধীরাপদর চক্ষুস্থির। অ্যাকাউন্‌টেণ্টকে ডেকে পাঠিয়েছে, হিসাবের খাতাপত্র তলব করেছে। তারপর মোটামুটি হিসাব থেকে যে আয়ের অঙ্কটা বৃদ্ধ অ্যাকাউন্‌টেণ্ট ভদ্রলোক তুলে ধরেছেন তার সামনে, সে-ও কল্পনার বাইরে। ধীরাপদর নিখাদ বিস্ময়, এত টাকাও আবার লাভ হয় কেমন করে? আর হয় যদি, সে টাকা দিয়ে মানুষ করে কি?

লাবণ্যর অনুপস্থিতিতে আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্ময়টা সেদিন অমিতাভর কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিল। এই আয়ের ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতির খসড়াটা করবে কিনা সেই পরামর্শ চেয়েছিল। জবাবে ছদ্মগাম্ভীর্যে ভুরু কুঁচকে পাল্টা হুমকি দিয়েছে সে, মামাকে বলে এইবার আপনার চাকরিটি খাবার সময় হয়েছে। পরে হেসে বলেছে, জানবেন—চোখ খুলে থাকুন আরো জানবেন। কত ভাবে কল ঘুরিয়ে কত তেল আসছে সেটা ঠিক ঠিক মামাও জানে কিনা সন্দেহ।

তাহলে কে জানে?

ছোট সাহেব জানে, তার চেলা-চামুণ্ডারা জানে, তার এতদিনের সহকর্মিণী জানে। আবার অনেক সময় কেউ জানেও না। এই বেলোয়ারী কল আপনি ঘোরে।...তবে এবারে আপনারও জানার পালা আসছে। সহকর্মিণী সহ-শূন্য হতে চলেছেন, তাঁর সঙ্গে প্যাক্ট করুন।

হা-হা করে হেসে উঠেছিল। ধীরাপদর ঠোঁটের ডগায় জবাব এসেছিল, প্যাক্ট তো সম্প্রতি আপনি করেছেন দেখছি। বলেনি। বলবে না। ঠাট্টার ছলেও প্রলোভনের পরদা তুলবে না আর।

তোলেনি। কদিন ধরে তিনজনে মিলেই আলোচনায় বসছে। ধীরাপদর ঘরেই। অমিত ঘোষ, লাবণ্য আর ধীরাপদ। অমিত ঘোষের মেজাজপত্র ভালই এ পর্যন্ত। টেলিফোনে ডাকলেই আসে। আর ঘরে ঢোকার আগে ও-ঘর থেকে লাবণ্যকেও ডেকে নিয়ে আসে। তার বেপরোয়া ঠাট্টা আর ফষ্টিনষ্টিতে আলোচনা বেশিদূর গড়ায় না। সব থেকে বেশি আনন্দ, যে কোনো ছুতোয় লাবণ্যকে কোণঠাসা করতে পারলে। বিপরীত মত আর বিপরীত মন্তব্য ব্যক্ত করে সে পথ লাবণ্যই করে দেয়। শেষে তর্ক করে। রাগ দেখায়। বলে কাল থেকে আর আসবে না। বলা বাহুল্য, রাগ-বিরাগের সবটাই লঘু-প্রশ্রয়পুষ্ট। অমিত ঘোষের বেপরোয়া আক্রমণও বেশির ভাগ তেমনি স্থূল, কলাকৌশল বর্জিত। তার তাপ নিভৃতে ছড়াবার মত। তবু প্রলোভনের পরদা তুলে মনটাকে সেই নিভৃতে উঁকিঝুঁকি দিতে দেয়নি ধীরাপদ। সেখানে বসে যে লোলুপ তাপ খোঁজে আর রূপ খোঁজে আর ইশারা খোঁজে, ভঙ্গি খোঁজে আর সুর খোঁজে আর

অলক্ষ্য সুরভি খোঁজে, তার এধারে পাকাপোক্ত দেয়াল তুলেছে সে।

এই নিরাসক্ত ব্যতিক্রমটা লাবণ্য অন্তত লক্ষ্য করেছে। অমিতাভকে আড়ালে কিছু বলেছে কিনা জানে না। তার সেদিনের বিদ্রূপের লক্ষ্য ধীরাপদ। আলোচনা কতটা কানে গেছে সে-ই জানে, একের পর এক সিগারেট টেনেছে আর চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখেছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। তারপর হঠাৎ-ই পার্শ্ববর্তিনীর উদ্দেশে বলে বসেছে, ধীরুবাবুর একখানা ফোটো তুলে দিচ্ছি। প্ল্যানিং কমিশনে পাঠিয়ে দাও, তাদের সিরিয়াস লোকের খুব অভাব শুনেছি।

ধীরাপদ প্ল্যানের ফাইল বন্ধ করে ফেলেছে।—আজ আর হবে না, আজ থাক।

চাপা আনন্দে আর ছদ্মকোপে লাবণ্য তাকেই সমর্থন করেছে তক্ষুনি।—কি করে হবে, কাজে এগোতে চান তো এঁকে বাতিল করুন।

সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ মুখোমুখি ঘুরে বসে চোখ পাকিয়েছে, আমাকে বাতিল করে দুজনে কাজে এগোতে খুব সুবিধে, কেমন? দাঁড়াও, মামার কাছে নালিশ করছি।

হাসির চোটে অমিতাভ ঘর কাঁপিয়েছিল। লাবণ্যর মুখ লাল হয়েছিল। ধীরাপদ শুনেছিল। ধীরাপদ দেখেছিল। যতটুকু হাসা দরকার হেসেও ছিল হয়ত। কিন্তু ধীরাপদ কান দেয়নি। চোখ দেয়নি।

বড় সাহেবের ভাষণে আশার প্রতিশ্রুতি আর ঘোষণা কিভাবে কতটা প্রকাশ করবে সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব সে। কোম্পানীর বাৎসরিক আয়ের হিসেবটা একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের মত মনের তলায় থিতিয়ে আছে। কর্মচারীদের প্রত্যাশার প্রসঙ্গগুলি শুধু উত্থাপন করেছে। কাজেই আলোচনায় বিতর্ক উপস্থিত হয়নি একদিনের জন্যেও। অমিতাভ মন দিয়ে শোনেও নি, মন দিয়ে ভাবেও নি কিছু। লাবণ্যও তর্ক করে কোন জটিলতার মধ্যে ঢুকতে চায়নি। হেতু স্পষ্ট। সে জানে, বড় সাহেবের কলমের খোঁচায় শেষ পর্যন্ত প্ল্যানের অনেকটাই বাতিল হয়ে যাবে। মাঝখান থেকে তার তিক্ততা সৃষ্টি করে কাজ কি? কর্মচারীরা তিন মাসের বোনাস চায় শুনে মুখ টিপে হেসেছে। ধীরাপদর দেড় মাসের প্রস্তাবনাতেও। তাতেও অবশ্য ভাগাভাগি আছে—নিম্নতম বেতন-হারে দেড় মাস থেকে ঊর্ধ্বতন বেতন-হারে পনেরো দিন পর্যন্ত।

—করুন। কিন্তু মিস্টার মিত্র না ভাবেন সবাই মিলে আমরা শূন্যে ভাসছি। লাবণ্যর মিষ্টি ব্যঞ্জনা।

অর্থাৎ, যা করার তিনি তো করবেনই, মাঝখান থেকে একজনের অবিবেচনায়

দরুন সকলের নাম খারাপ।

আপনি কি করতে বলেন? কতটা শূন্যে ভাসছে ধীরাপদর আঁচ করার চেষ্টা।

আমরা এক মাসের সাজেস্ট করলে হয়, মিস্টার মিত্র হয়ত কেটেকুটে পনেরো দিনে টেনে নামাবেন।

এই প্ল্যানে মিস্টার মিত্র নেই। তাছাড়া কাটাকাটি টানাটানি কিছু তিনি না-ও করতে পারেন।

অমিতাভ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। লাবণ্যর উদ্দেশে এবারে তরল ভ্রূকুটি করে উঠল, জোরখানা দেখেছ? এ কি তোমার ব্লাডপ্রেসার মাপা যে বড় সাহেবের মেজাজ বুঝে ওঠাবে নামাবে?

তাই তো···। সবিদ্রূপ গাম্ভীর্যে লাবণ্যেরও নতিস্বীকারে কার্পণ্য নেই।

কিন্তু কদিন ধরে ধীরাপদ নিজের এই জোরের দিকটাই নতুন করে অনুভব করছে আবার। করছে বলেই বিদ্যুৎ-চমকের মত একটা সঙ্কল্প মনের তলায় ঝলসে উঠছে থেকে থেকে। বাণী বিবৃতি ভাষণ আর মন্তব্য লিখে অন্ধের যষ্টির মত এ ব্যাপারে অন্তত বড় সাহেবের বিশ্বাসের যষ্টিটা যে গোটাগুটি তার হাতে এসে গেছে সেটা এরা কেউ জানে না। সব বিবৃতি আর সব ভাষণ বড় সাহেব আগে পড়েও দেখেন না আজকাল। বক্তৃতার আগে হয়ত চোখ বুলিয়ে নেন একবার। গোড়ায় গোড়ায় দুটো চারটে লাইন অদলবদল করতে চেষ্টা করেও পেরে ওঠেন নি। মনে হয়েছে, একটা ভাবতরঙ্গের ওপর বেখাপ্পা আঁচড় পড়ল, ঠিক মিশ খেল না। এখন আর সে চেষ্টাও করেন না। তথ্য পেলে সে যা লিখে দেবে, নীরস তথ্যগুলো মুচড়ে যে আবেদনের সুর নিঙড়ে নিয়ে আসবে— সেই বৈচিত্র্য তিনি বহুবার দেখেছেন, বহুবার আস্বাদন করেছেন। এখন বক্তব্য বলেই খালাস তিনি, আর কিছু ভাবেন না।

···এই জোরটার সঙ্গে নিজের একটুখানি সক্রিয় অভিসন্ধি মেশালে কি হয়? কেমন হয়? কিন্তু সবুর, এখন না। তার আগে অনেক ভাবার আছে। কোম্পানীর বাৎসরিক আয়ের হিসেবটা দিক-দিশারিণীর মত ইশারায় মায়া ছড়াচ্ছে। কিন্তু রোসো, এখন না। তার আগে অনেক কিছু বিশ্লেষণ করার আছে। এখনো অনেক ভাবতে বাকি, অনেক জটিলতার জট ছাড়ানো বাকি।

আরো একটা ব্যাপার লাবণ্য বা অমিতাভ কেউ জানে না। এখানকার উৎসবের কয়েকদিনের মধ্যেই কানপুরে অল ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক অধিবেশন। সেই অধিবেশনের বড় সাহেবই

প্রধান হোতা এবারে। নিজের প্রাধান্য সেখানে উনি যত বড় করে তুলতে পারবেন, আগামী বছরের লক্ষ্যের নিশানা তত কাছে এগিয়ে আসবে। এখানকার এই হাতের পাঁচ নিয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তার অবকাশ বা প্রেরণা কম। তিনজন যোগ্য লোক মাথা ঘামাচ্ছে তাই যথেষ্ট।

তাঁর ব্লাডপ্রেশার এখনো বাড়তির দিকে শুনেছে। ধীরাপদর অনুমান, যে কারণেই হোক ছেলের সঙ্গে সেই নির্বাক বিরোধটা ক্রমশ পুষ্ট হয়ে উঠছে আবার। পর পর ক'টা সন্ধ্যায় সিতাংশুকে অনুপস্থিত দেখল। হিমাংশু মিত্র কিছু বলেন নি বা খোঁজ করেন নি। ধীরাপদ গোড়ায় ভেবেছিল, রাতের আলোচনায় বিষয়-বস্তু বদলেছে বলে ছেলে আসছে না। কিন্তু তা যেন নয়। বড় সাহেবের মানসিক সমাচার কুশল মনে হয় না। আর সিতাংশুর মুখ দেখলে মনে হয়, এই ছনিয়ার কোনো কিছুর মধ্যেই নেই সে।

আসন্ন উৎসবের প্রসঙ্গ তুললে হিমাংশুবাবু শুরুতেই ছেঁটে দেন সেটা। বলেন, তোমরা করো, দেখব'খন। হঠাৎ সেদিন জিজ্ঞাসা করে বসলেন, আলোচনায় লাবণ্য আর অমিত ছজনেই আসছে তো?

প্রশ্নের তাৎপর্য না বুঝেও ধীরাপদ ঘাড় নাড়ল। পাইপ-চাপা মুখের মৃদু-গম্ভীর হাসিটা বরাবরই কমনীয় লাগে। সেদিনও লাগল।

—মেয়েটা পাশে আছে বলে ছোকরার মেজাজ তাহলে ঠাণ্ডাই এখন?

জবাবের প্রত্যাশা ছিল না, বলার কৌতুকটুকুই সব। সরকারী অর্ডার সাপ্লাইয়ের গোলযোগে লাবণ্য সরকারের পাশে থাকা নিয়ে সেদিন যে ঠাট্টা করেছিলেন তারই উপসংহার এটা। কিন্তু হিমাংশু মিত্র সেখানেই থামলেন না, আরো হাল্কা জেরার সুরে বললেন, কতটা পাশে আছে টের পাও?

প্রসন্ন নিরিবিলিতে বড় সাহেবের এ ধরনের পরিহাস-রীতি একেবারে নতুন নয়। চারুদির সহোদর নয় ধীরাপদ, সহোদরতুল্য। তিনজনের সম্পর্কের যোগটা বিচিত্র। কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে হোঁচট খেয়েছে একটা, সুশোভন এক টুকরো হাসিও ঠোঁটের কোণে টেনে আনতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। মনে হয়েছে, সকলের সব প্ল্যানের ওপর দিয়ে উনিও কিছু একটা প্ল্যান ছকে বসে আছেন। ওই হাসি-মাখা গাম্ভীর্য বিদীর্ণ করে তার হদিস পাওয়া শক্ত।

কিন্তু হাসির ওপর আত্মবিস্মৃত চিন্তার ছায়াও পড়তে দেখেছে। সব কিছুই মর্মস্থলের ছুরধিগম্য গহ্বরে ঠেলে দিয়েছেন তারপর।—আসল কাজের কতদূর কি করলে।

অর্থাৎ কানপুর অধিবেশনের ভাষণ রচনার কাজ। মর্যাদা-লক্ষ্মীর অন্তঃপুর

পর্যন্ত নিরঙ্কুশ একখানা গালচে বিছানোর কাজ। বরমাল্য লাভ হলে মর্যাদাটুকুই শেষ পাওনা নয়, নিজের প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎও দিগন্ত ছুঁয়ে আসতে পারে। মনোবল থাকলে ওই বরাসন থেকে সংশ্লিষ্ট শিল্পে ভারত সরকারের বাণিজ্য-নীতি নিয়ন্ত্রণে পর্যন্ত তর্জনী-নির্দেশ চলে।

অতএব এ কাজটাই কাজ আপাতত।

চড়া প্রেসারের দরুন কড়া রকমের বিশ্রাম নির্দেশ, কিন্তু বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে বই ঘেঁটে জার্নাল ঘেঁটে প্যামফ্লেট ঘেঁটে তিনি ধীরাপদর জন্যে তথ্য সংগ্রহ করে রাখেন। রাত্রিতে তাই নিয়ে কথা হয়, আলোচনা হয়। নীরস তথ্যগুলোও এক ধরনের মানসিক প্রবণতার তলায় তলায় বুনে যেতে হবে তাকে —সেই রকমই পছন্দ বড় সাহেবের। লোক শোনে, কান-মন টানে। সেই রকম করেই লিখতে বলেন—সেই রকম করে, আর আরো জোরালো করে।

কিন্তু শিল্পীর মত ফুল-ফলের বীজ ছড়াবে যে লোকটা, সোনার তারে রুপোর তারে সম্ভাবনার পাকাপোক্ত জাল বুনবে—তার উৎসাহ আর উদ্দীপনার অভাব দেখে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ, ঈষৎ অসহিষ্ণু তিনি। অপর কোনো প্রসঙ্গ বরদাস্ত করতে চান না। বলেন, ওদিকের ভাবনা-চিন্তা সব অফিসে সেরে আসবে, এই ব্যাপারটা অনেক বেশি দরকারী বুঝছ না কেন?

বুঝেছে বলেই ধীরাপদর জেগে ঘুমানো দরকার।

বুঝেছে বলেই অন্যদিকের ভাবনা-চিন্তাটা মাঝে মধ্যে এখানেও বড় করে তোলা দরকার।

কারণ অন্যদিকের ওই ভাবনা-চিন্তা থেকে বড় সাহেবের ভাবনা-চিন্তাটা আপাতত বিচ্ছিন্ন রাখাই উদ্দেশ্য তার। কানপুরের অধিবেশনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারলে এদিকের ব্যাপারে কিছুটা অন্তত মন দিতেন তিনি, চোখ দিতেন। ধীরাপদর কাম্য নয় তা। অন্ধের নিষ্প্রাণ জড়-যষ্টি নয় সে। তার জুটো করে হাত-পা চোখ-কান আছে। দেহ আছে। সেই দেহে নিজস্ব মন বলে বস্তু আছে একটা। সেই অলক্ষ্য থেকে অনুক্ষণ তেজস্কর বাষ্প নির্গত হচ্ছে কিসের। মনটা প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক উপস্বত্বের ভিতটার ওপর দাপাদাপি লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে আর দেখছে। দেখছে, ভিতের কোথাও বসে যায় কিনা। দেখছে, অনাগতকালে সংস্কারের কোন্ কাঠামোটা দাঁড়াতে পার এর ওপর।

কিন্তু রোসো, রোসো। সবুর। এখনো অনেক হিসেব বাকি, এখনো অনেক ভাবতে বাকি।

হিসেব করছে আর ভাবছে। অফিসে নয়, এখানেই—এই বাড়িতেই। বড় সাহেবের সামনে বসেও নয়। রাত্রি যখন গভীর তখন। অ্যাসবেস্টস্ পার্টিশনের ওধারে মানুকের নাকের ঘড়ঘড়ানিতেই চড়াই-উৎরাইয়ের অবিরাম কসরত চলতে থাকে। ধীরাপদর একটুও অসুবিধে হয় না তাতে। বরং সুপ্তিময় নির্জনতায় উদ্দীপনা বাড়ে আরো। কোণের টেবিলের ঢাকা-আলোয় ঘাড় গুঁজে পাতার পর পাতা লেখে আর হিসেব করে। হলের আবছা আলোয় পায়চারি করে আর ভাবে।

এ যেন একটা নেশার মত হয়ে উঠেছে। হোক নিরর্থক, নেশার আবার কে কবে অর্থ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে?

কিছুদিন হল ধীরাপদ ঠাঁইবদল করেছে। খুব স্বেচ্ছায় করেনি, কিন্তু করলেই ভালো হত। হিমাংশু মিত্রের ঠাট্টাটা তাহলে এভাবে ছড়াত না।

সুলতান কুঠি ছেড়ে আসার কোনো আগ্রহ না দেখে বড় সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। সে অমন একটা জায়গা আঁকড়ে পড়ে আছে কেন? এনি সুইট অ্যাফেয়ার?

এর তিন-চার দিনের মধ্যে হিমাংশুবাবুর ওখান থেকে বেরুবার সময় অমিতাভর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। সেও সবে ফিরছে। দেখা মাত্র চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, কি ব্যাপার মশাই, মামা কি বলছে?

রাত তখন সাড়ে নটা। ধীরাপদর ফেরার তাড়া ছিল। গত কদিন ধরেই এই তাড়াটা বিশেষভাবে অনুভব করছে। গিয়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া কাজ নেই, তবু মনে হচ্ছিল দেরি হয়ে গেল। কিন্তু এই লোক সামনে দাঁড়ালে পাশ কাটানো শক্ত। গুরুতর কিছু নয় যে বোঝাই যাচ্ছে, তাছাড়া এইমাত্র ওই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই নেমে আসছে। তবু ছদ্ম-অনুশাসন কৌতূহলোদ্দীপক।

কি বলেছেন?

কি বলেছেন! অভিভাবকসুলভ ভ্রূকুটি, ঘরে আসুন, বলছি—

ধীরাপদ বাধা দেবার অবকাশ পেল না। ডানদিকের বড় হলের ভিতর দিয়ে লঘু পদক্ষেপে নিজের ঘরের দিকে এগোলো সে। কোটের পকেট থেকে চাবি বার করে ঘরের দরজা খুলল। বাড়ির মধ্যে মালিকের অনুপস্থিতিতে এই ঘরটাই শুধু তালাবন্ধ থাকে।

তেমনি অগোছালো ঘর। বহুদিন আগে যেমন দেখেছিল তেমনি। ধীরাপদর

অবাধ্য দৃষ্টিটা টেবিলের তাকের দিকে গেল প্রথমেই। না, কোনো অ্যালবাম-ট্যালবাম নেই। বিছানায় বসে পড়ে অমিতাভ গায়ের কোট আর জুতো-মোজা খুলতে ব্যস্ত।

বসুন—

ধীরাপদ চেয়ারটা টেনে বসল।—এক্ষুনি উঠব, রাত হয়ে গেল।

ট্রাউজারসুদ্ধ বিছানায় পা গুটিয়ে আঁটসাঁট হয়ে বসে অমিতাভ ঘটা করে ভুরু কোঁচকালো আবারও।—তা তো গেল, তা বলে আপনার জন্যে কে অপেক্ষা করে বসে আছে সেখানে?

কেউ না। মামা কি বলেছেন?

ওই কথাই। এখানে এসে থাকার জন্য অত সাধ্য-সাধনা করেও আপনাকে আনা যাচ্ছে না কেন? খোঁজ নিতে হচ্ছে, সন্দেহ যখন হয়েছে কিছু একটা আছে—এসব ব্যাপারে মামা রীতিমত এক্সপার্ট! হাসতে লাগল।

ধীরাপদ চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক। এই তামাসা আশা করেনি। বলল, ভাগ্নেও কম যায় না। তাকে দ্বিতীয়বার চোখ পাকাবার অবকাশ না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তা এ সুখবরটা মামার মুখ থেকেই পেলেন?

না, চারুমাসি বলছিল। মামা তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, অত টান কিসের, আসতে চায় না কেন? সঙ্গে সঙ্গে আবার কি মনে হতে চশমার ওধারে আর এক প্রস্থ কৌতুক উপচে উঠল।—লাবণ্যর ধারণা, ব্লাডপ্রেসারের সুযোগে মামাকে ভালো ভাবে বিছানায় আটকে ফেলেছে, নট নড়ন-চড়ন। দুপুরে কোন্ দিকে অফিস করতে যায় খবরটা দিতে হবে তাকে—

জোরেই হেসে উঠল এবারে। এরকম অকৃত্রিম হাসির মুখে মামা ছেড়ে আরো পদস্থ কাউকে ধরে টান দিলেও অশোভন লাগে না। কিন্তু ধীরাপদর ভিতরটা বিরক্তিতে ছেয়ে উঠছে। কেন নিজেও সঠিক জানে না। তবু একটা খবর জানার আছে। চারুদির খবর। আর পার্বতীর খবর। যাই যাই করেও ধীরাপদ দ্বিধা কাটিয়ে এর মধ্যে একদিনও সেখানে গিয়ে উঠতে পারেনি। সেদিন চারুদি বার বার করে বলে দিয়েছিল আসতে, অমিতের সঙ্গে কি কথা হয় না হয় তাকে জানাতে। কথা অনেক হয়েছে, সরকারী অর্ডার সংক্রান্ত বিড়ম্বনা গেছে, নতুন কেমিস্ট আনার উত্তাপ গেছে—সমস্ত ক্ষোভের বিপরীত প্রবাহ চলেছে এখন। তবু চারুদিকে জানাবার মত কিছু আছে একবারও মনে হয়নি। কিন্তু তার দ্বিধা চারুদির জন্যেও অত নয়, যত আর একজনের জন্যে।

কিন্তু এই একজনের মুখ দেখে সেই বাড়ির মানসিক সমাচার কুশলই মনে

হয়।

চারুদির ওখান থেকে এলেন ?

হুঁ। মজাটা জমবে ভেবেছিল অথচ জমল না কেন তাই সম্ভবত লক্ষ্য করছে।

ভালো আছেন তাঁরা ?

দ্বিবচনের প্রশ্নটা খেয়াল করল কিনা বোঝা গেল না। ঈষৎ বিরক্তির সুরে জবাব দিল, এমনিতে ভালই, তবে মুখ ভার আর উঠতে বসতে ঠেস। সব কাজ-কর্ম ছেড়ে দিনরাত তার আঁচলের তলায় বসে থাকলে বোধ হয় মন ভরে।

কার ? নির্লিপ্ত জিজ্ঞাসু।

খুব স্বাভাবিক লাগল না প্রশ্নটা।—কার আবার, আপনার দিদির।

আর পার্বতী ?

চকিতে দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর এসে স্থির হল—পার্বতী কি ?

দুই এক নিমেষ তেমনি চেয়ে থেকে মনের প্রশ্নটা চোখে বোঝালো ধীরাপদ। মুখের জিজ্ঞাসা ভিন্ন।—সে কেমন আছে ?

অমিতাভ হাসল বটে কিন্তু খানিক আগের হাসির মত প্রাঞ্জল নয়। বলল, ভালই আছে, তবে মেজাজ তারও খুব ভালো নয় বোধ হয়। মাসি কয়েকবার ডেকেও সাড়া পায় নি, ঘরেও আসে নি।

একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলে ধীরাপদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আরো নিরুত্তাপ শোনালো মন্তব্যটা। বলল, এলো না কেন·· আপনি চলে আসার পর ওই জন্যেই হয়ত বকুনি খেতে হয়েছে।

তার মানে ?

এতক্ষণে ধীরাপদ হাসল একটু, তার মানে আপনার আঁচলের ভাগ্য, তা এখন আপনি ছিঁড়ুন খুঁড়ুন যাই করুন—

হেঁয়ালির ধার ধারে না অমিতাভ ঘোষ, স্বভাব অনুযায়ী ধমকে ওঠার কথা। কিন্তু খুব হেঁয়ালির মত লাগছিল না হয়ত, মনোযন্ত্রের একটা বিকৃত তারের ওপর আঙুল পড়েছে যেন। অসহিষ্ণুতা সত্ত্বেও ফিরে বিদ্রূপই করে উঠল সে।—আপনার ভাগ্যে আঁচল জুটলে কি করেন, ধরে বসে থাকেন ?

আঁচল জুটলে থাকি। জোটে না। চলি—

বাস ধরার জন্য বেশ তাড়াতাড়ি পা চালিয়েছে ধীরাপদ। একটু বাদেই গতি শিথিল হল, ভিতর থেকে কে বুঝি ওকে টানলে। তাড়া কিসের ? তাগিদ কিসের ? হিমাংশুবাবুর ঠাট্টাটা ফিরে আবার কানে আসতে ভিতরটা অত তিক্ত হয়ে উঠেছিল কেন ? নিজেকে একটা রূঢ় বিশ্লেষণের মুখে ঠেলে দিল

সে। কাজের এত চাপ সত্ত্বেও আর বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কিছুদিনের জন্যেও সুলতান কুঠি ছেড়ে আসতে মন চায় না। এতকাল ধরে আছে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু পুরুষমানুষের কাজের থেকেও সেই দুর্বলতার প্রশ্রয়টা বড় হয়ে উঠবে – সেটা অস্বাভাবিক নয় তো কি। সেদিন সোনাবউদি পর্যন্ত বলেছিল, আপনার নড়তে বাধাটা কোথায় ?

আরো ভিতরে ঢুকবে ধীরাপদ ? আরো তলিয়ে দেখবে ? গণুদার ওই সংসারটি ওখানে না থাকলে সাড়ে সাতশ টাকা মাইনের জেনারেল সুপারভাইজার ধীরাপদ চক্রবর্তী এতকাল থাকা সত্ত্বেও সুলতান কুঠির ওই ঘরটা এভাবে আঁকড়ে থাকত কিনা ভাববে ? আরো ? পড়ন্ত শীতের রাতে কুয়োতলায় গুবগুব করে জল ঢেলেছিল গায়ে···আদুড় গায়ে শাড়ি জড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে সোনাবউদি এসে দাঁড়িয়েছিল খবর নিতে···ভাববে ?

আবারও জোরে হাঁটতে লাগল। জোরে হেঁটে নিজেরই অন্তস্তল দু পায়ে মাড়িয়ে যেতে লাগল।

একাদশী শিকদারের চোখে সরাসরি জল দেখবে ভাবেনি ধীরাপদ। মাত্র মাসখানেকের জন্য যাচ্ছে শুনে আর দ্বিতীয় বাংলা খবরের কাগজখানা যেমন পাচ্ছিলেন তেমনি পাবেন জেনে একটু আশ্বস্ত হয়েছেন তিনি।

শকুনি ভটচাযের শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যেতে ছেলেরা গোটা সংসারটি তাঁদের কর্মস্থলে তুলে নিয়ে গেছেন। তাঁদের পরিত্যক্ত ঘর ক'টা রমণী পণ্ডিত দখল করতে আসছেন। যে জায়গায় ছিলেন এতকাল, রাজপ্রাসাদ মাথার ওপর ভেঙে পড়েনি তাই আশ্চর্য। যদিও গোটা বাড়িটারই এক অবস্থা, তবু যতটুকু নিরাপদ হওয়া যায়। কিন্তু একটু-আধটু চুনজলের আস্তর না করালে উঠে আসেন কি করে, বিশেষ করে যেখানে একজন দেহরক্ষা করেছেন। সমস্যাটা রমণী পণ্ডিত ধীরাপদর কাছে ব্যক্ত করতে সে টাকা বার করে দিয়েছে। তাঁকে একদিন কোণের ঘরে সে-ই ঠেলেছিল, এটুকু খেসারত তারই দেয়। ফলে রমণী পণ্ডিতও ঠাঁইবদলের তোড়জোড়ে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু এরই মধ্যে মুখ শুকিয়ে অনেকবার তার কাছে এসেছেন। বলেছেন, আপনি যে কত বড় বলভরসা ছিলেন আমাদের আমরাই জানি, মানুষ তো কতই দেখলাম···।

এই বক্রচিত্ত লোকটার ওপর যত বিরূপই হোক এক-এক সময়, তাঁর অক্লান্ত সংগ্রামী দিকটার প্রতি ধীরাপদর ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন দরদ লুকানো একটু। জুয়ার আসরে গণুদার মদ খেয়ে আসার ব্যাপারটা জানার পর পণ্ডিতের

মেয়ে কুমুর সঙ্গে তার যোগটা চেষ্টা করেও একেবারে মন থেকে ছেঁটে দিতে পারে নি। একাদশী শিকদারের ইঙ্গিত ভুলতে পারেনি। ফলে তার সব রাগ গিয়ে পড়েছে মেয়ের এই বাপের ওপর। তবু। মুখের দিকে তাকালে ব্যর্থতার সমুদ্র থেকে ডাঙায় ওঠার অক্লান্ত চেষ্টাটাই আগে চোখে পড়ে। নতুন পুরানো বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবুকে লোভনীয় জ্যোতিষের বই এবং তাঁর ইঙ্গিতমত আরো দু-তিনখানা সস্তা আকর্ষণের বই তিনি লিখে দিয়েছেন। তবু অনটনের মরু বালু দিনে দিনে তেতে উঠছে।

রমণী পণ্ডিতকেও আশ্বাস দিয়েছে ধীরাপদ, ফিরে এসে ভাববে কি করা যায়। কিন্তু কিছুদিন বাদে সে যে এখানেই ফিরে আসবে আবার তা যেন কেউ মন থেকে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। একাদশী শিকদার না, রমণী পণ্ডিত না, এমন কি গণুদার মেয়ে উমারাণীও না।

সকালে বারকতক এসে উমারাণী কান্না সামলে পালিয়েছে। শেষে স্যুটকেস গোছাতে দেখে একেবারে ফুঁপিয়ে কান্না। ছেলে দুটো হাঁ করে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দিদির কান্না দেখছে। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে গিয়ে ধীরাপদ নাজেহাল।

কান্না থামল তাদের মা এসে ঘরে ঢুকতে। থমকে দাঁড়িয়ে মেয়েকে দেখল দুই এক মুহূর্ত, তারপরেই ধমকে উঠল।—এই মুখপুড়ি, সকাল থেকে তোর অত কান্নার কি হয়েছে, অ্যাঁ? যা ভাগ এখান থেকে, ধাড়ী কোথাকার—

ফ্রকে চোখ মুছতে মুছতে উমা ছুটে পালালো। ধীরাপদ মৃদুগম্ভীর ঠেস দিয়েই কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগে সোনাবউদি ভ্রূকুটি করে উঠল, আপনারও তো মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে ওব গলা ধরে কাঁদতে পারলে বাঁচেন।...শুধু স্যুটকেস দেখছি, আর কিছু নিচ্ছেন না?

চোখে চোখ পড়তে ঠেস দেওয়া দূরে থাক, সামান্য জবাবটাও দিয়ে উঠতে পারল না। মাথা নাড়ল। বুকের ভিতরটা টন্‌টন্ করে উঠছে কেমন।...দুই চোখের গভীরে অত স্নেহ কবে কোন্ হারিয়ে যাওয়া দিনে আর একজনকার চোখে দেখেছিল যেন। বোধ হয় মায়ের।

শনি-রবিবারে সত্যিই আসছেন তাহলে?

গত রাতে উমাকে আশ্বাস দিয়েছিল, প্রত্যেক শনি-রবিবারে আসবে। বলল, দেখি—

সোনাবউদির মুখখানা গম্ভীরই বটে, কিন্তু দৃষ্টিটা অত গম্ভীর নয়। দেখল একটু, মনোভাব আঁচ করতে চেষ্টা করল হয়ত। আপনাকে ভালমানুষ পেয়ে

কত কটু কথা বলেছি, কত হেনস্থা করেছি ঠিক নেই। জালা-পোড়ায় মাথা ঠিক থাকে না সব সময়, কিছু মনে রাখবেন না।

মনোযোগ দিয়ে রিং থেকে স্যুটকেসের চাবিটা খুলে নিচ্ছিল ধীরাপদ। একটা নাটকীয় অভিব্যক্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করছিল। কিন্তু একেবারে রক্ষা করা গেল না। বলল, মনে রাখার মত অন্য অনেক কিছু আছে।...তাছাড়া, আমি ভালমানুষ নই, আমার মধ্যে কত গলদ জানলে—

থাক্। বাধা পড়ল। গাম্ভীর্যের ওপর হাসির আভাস স্পষ্টতর হল আরো। —অল্পস্বল্প গলদ থাকা ভালো, সকল নোড়া শালগ্রাম হলে আমরা হলুদ বাটি কিসে? শরীরের অযত্ন করবেন না, সময়মত খাওয়া-দাওয়া করবেন। অত অনিয়ম করেন কেন? আর দিনরাত অত ভাবেন কি? ওই মেয়েটিকে যদি খুব মনে ধরে থাকে চোখ-কান বুজে একবার কথাটা পেড়েই দেখুন না। ওতে অনেক সময় কাজ হয়।

এতদিন ধরে এত নিষ্ঠায় মনের এধারে যে উদাসীনতার দেয়াল গাঁথল, সেটা কি ভেঙে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? শকুনি ভটচাযের মৃত্যুর রাতে গণুদাকে টাকা দিয়েছিল বলে এই সোনাবউদি তাকে ভস্ম করতে চেয়েছিল একেবারে। যাকগে, ধীরাপদ ভাববে না। এই ক-বছরে ধীরাপদ অনেক দেখল। ধীরাপদ হাসছিল। বলল, নিজের চোখ-কানের ওপর আমার যথেষ্ট মায়া আছে। চাবির রিংটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল, এটা আপনার কাছে রাখুন, আমার কাছে থাকলে হারাবে। কদিন চেষ্টা করেও গণুদাকে ফাঁকমত ধরা গেল না, সামনের শনি-রবিবারে ওই জন্যেই একবার আসতে চেষ্টা করব। তাঁর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

চাবির রিং হাতে সোনাবউদি ভু চোখ কপালে তুলে ফেলল, কি বোঝাপড়া? ধরে মারধর করবেন নাকি?

ধীরাপদ কান দিল না, স্যুটকেস হাতে উঠে দাঁড়াল। আরো দুটো কথা এই মুহূর্তেই বলে ফেলতে হবে। সোনাবউদিকে সব কথা সব সময় বলা যায় না। বলার সুযোগ মেলে না।—চলি। যে-কোনো দরকারে খবর দেবেন।...আর, একটু-আধটু আপনজন ভাবতে চেষ্টা করবেন।

এবারে সোনাবউদির মুখে হাসি কিন্তু দৃষ্টিটা গভীর।

•

মানুকে আর কেয়ার-টেক্ বাবুর আদর-যত্ন সত্ত্বেও প্রথম কয়েকটা দিন বাড়িটাকে প্রবাস-আবাসের মত লাগছিল ধীরাপদর। কাজে এসেছে, কাজ

মুয়োলে চলে যাবে। ছোট সাহেবের বিয়ের সম্ভাবনা আঁচ করে কিছুদিন আগে মান্‌কে বলেছিল, বিয়ে হচ্ছে ভালোই তো হচ্ছে, মেয়েছেলে না থাকলে গৃহস্থ-বাড়ি মরুভূমির মত। মেয়েছেলের আবির্ভাবে আবার এটা গৃহস্থবাড়ি হয়ে উঠলে ফলাফল মরুভূমির তুল্য হয়ে উঠবে কিনা মানকে আর কেয়ার-টেক্‌ বাবুর অবশ্য সেটাই আসল দুর্ভাবনা। কিন্তু তবু কথাটা ধীরাপদর আবার নতুন করে মনে পড়েছে। এ বাড়ির সবাই নিঃসঙ্গ। এখানে বাসের চিহ্ন আছে, স্থিতির মায়া জড়ানো নেই কোথাও।

এখানে এসে থাকা নিয়ে গোড়ার দিনের ঠাট্টাটা সত্যি হল দেখে মান্‌কে আর কেয়ার-টেক্‌ বাবু দুজনেই সচকিত একটু। পাল্লা দিয়ে দুজনেই তারা মনোরঞ্জনে ব্যস্ত। বড় সাহেব কিছু বলে থাকবেন হয়ত। দোতলার একটা ঘরে তার থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ধীরাপদ নিচে সিঁড়ির বাঁয়ের এই হলঘরটাই বেছে নিয়েছে। মান্‌কে পার্টিশনের এধারে থাকত এতদিন, ওধারে সরল। লোকটা একেবারে তারই নাকের ডগায় এসে ঘাঁটি নিল দেখে অস্বস্তিতে মুখভার হয়েছিল। কিন্তু কেয়ার-টেক্‌ বাবু মনে মনে খুশি হয়েছে। মান্‌কেকে শাসিয়েছে, এবারে একটু বুঝে-সুঝে নাক ডাকিও, বাবুর কোনরকম অসুবিধে হলে বুঝবে।

সে চলে যেতে বিষণ্ণ মুখে তারই সহৃদয়তা আশা করেছে মান্‌কে।—দেখলেন বাবু। ঘুমের মধ্যে নাক কি কারো ইচ্ছে করে ডাকে, না নাকের ওপর কারো হাত থাকে ?

ধীরাপদ আশ্বাস দিয়েছে, সেজন্যে তোমার কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু তোমার অসুবিধে হবে না তো ?

এক কথায় মান্‌কের সমস্ত অস্বস্তি জল। আর দু দিন না যেতে এই নিরুপদ্রব লোকটা পাশে থাকায় সে বরং কিছুটা নিরাপদ বোধ করেছে।

ঘর গোছগাছ করে নেওয়ার খানিক বাদেই দু বেলার আহারের কি ব্যবস্থা হবে জানতে এসেছিল কেয়ার-টেক্‌ বাবু। যেমন আদেশ হবে তেমন ব্যবস্থাই হবে। তবে কোন্ রকম আদেশ হলে ভালো হয় প্রকারান্তরে তাও বুঝিয়ে দিয়েছে। এযাবৎ এখানে নিয়মিত আহারের পাট তো নেই কিছু, সাহেবরা কচিৎ কখনো 'নোটিস' দিলে ব্যবস্থা হয়। নয়তো বাইরে খাওয়ারই রেওয়াজ। তাছাড়া যা হাতের রান্না ওই মূর্তিমান মান্‌কের, তার মত ছাপোষা লোকেরই ওই খেয়ে নাড়ি শুকিয়ে গেল—বাবুর কি রুচবে ?

ধীরাপদ এ ব্যাপারেও তাকে নিশ্চিন্ত করেছিল, বাইরেই খেয়ে আসবে।

কিন্তু আধ ঘন্টার মধ্যেই আবার হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসেছে কেয়ার-টেক্ বাবু। পিছনে মান্‌কেও। সে গুরুগম্ভীর।

কেয়ার-টেক্ বাবুর রিপোর্ট, আহারের ব্যাপারে বড় সাহেবের ভিন্ন আদেশ হয়েছে। দুপুরে ধীরুবাবুর অফিসে লাঞ্চ খাওয়া চলতে পারে, কিন্তু রাতে বাড়িতেই ডিনারের ব্যবস্থা থাকবে। হুকুম যখন হয়েছে সুব্যবস্থার, কোন-রকম কার্পণ্য করবে না কেয়ার-টেক্ বাবু। ধীরুবাবুরও সে ব্যবস্থা পছন্দ হবে নিশ্চয়। ধীরুবাবুর কি পছন্দ অপছন্দ মান্‌কে যেন ঠিক ঠিক বুঝে নেয়। আর রান্না কোনদিন ভালো না লাগলে ধীরুবাবু যেন দয়া করে তাকে বলেন।

ধীরাপদ হাসি চেপে শুনছিল। গম্ভীর ব্যস্ততায় কেয়ার-টেক্ বাবু চোখের আড়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে চাপা আনন্দে মান্‌কে ফিস-ফিস করে বলল, বড় সাহেব আমাকে সামনে ডেকে সমঝে দিয়েছেন, কোনো ত্রুটি না ঘটে—বুঝলেন বাবু! মাল পেলে এই মান্‌কে খারাপ রাঁধে না, ভাগ্নেবাবু পর্যন্ত কতদিন খেয়ে সুখ্যাতি করেছেন। তারও আবেদন, যখন যে রকম খেতে ইচ্ছে হবে ধীরুবাবু যেন মুখ ফুটে বলেন, নইলে এ বাবদ যে টাকা বরাদ্দ হবে তারও অর্ধেক কেয়ার-টেক্ বাবুর পেটে ঢুকবে। বললে সে ঠিক আদায় করে নেবে, কিন্তু না বললে কি আর করতে পারে সে? ভাগ্নেবাবু অনেককাল খেতে চাননি, সেই থেকে তারও ভালো-মন্দ মুখে দেওয়া বন্ধ।

এ জগৎ কেন?...আমি আছি বলে।

॥ সতের ॥

সমস্ত প্রেরণার তলায় তলায় তবু দ্বিধার টান একটু।

ধীরাপদ কি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছে? মন বলছে, না। সুযোগ পেয়েও এই বৃহত্তর স্বার্থের দিকে না তাকালেই বিশ্বাসঘাতকতা হত। মন বলছে, সকলের এই মিলিত স্বার্থের জোয়ার সংহত হলে গোটা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ। মন বলছে, সংকীর্ণতার বদ্ধমুষ্টিটা তুমি খুলে দাও, তোমার কাজ তুমি করে যাও—প্রেরণা দ্বিধার সহচরী নয় কোনোদিন।

মন যা বলছে ধীরাপদ তাই করেছে। এই কদিনের একটানা ভাবনা-চিন্তা আর হিসেব শেষ। সাদা কাগজগুলো কালির আঁচড়ে ভরে উঠল। ধীরাপদর হাতের লেখা ভালো না। পড়তে বেগ পেতে হয়, ফলে মর্মোদ্ধারেও। টাইপের সারিতে বাঁধা পড়লে এরই ভিন্ন রূপ, ভিন্ন মূর্তি।

টেবিলের টাইমপীস ঘড়িতে রাত একটার কাছাকাছি। এমন কিছু নয়, গেল ক-রাত ছোট কাঁটাটা তিন ছুঁয়েছে। খানিকক্ষণ কান পেতে শুনলে পার্টিশনের ওধারে মানুকের নাকের ডাকের ওঠানামাটা একেবারে ছন্দশূন্য মনে হয় না। তবে গোড়ার রাতে তার সুপ্তি-সাধনায় দুবার অন্তত ছেদ পড়ে। একবার ছোট সাহেবের গাড়ির হর্ন শুনে আর একবার ভাগ্নেবাবুর। নাকের ওপব হাত থাক না থাক, এই আগমনবার্তা শুনে অভ্যস্ত সে। দুবারই শয্যা ছেড়ে উঠে আসতে হয় তাকে। বড় সাহেব সুস্থ থাকলে হয়ত তিনবার উঠতে হত।

ঘরের মধ্যে বারকতক পায়চারি করল ধীরাপদ। মনের তলায় অজ্ঞাত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধটা একেবারে যাচ্ছে না। নিজের ওপরেই বিরক্ত তাই।...বড় সাহেব একা কিছু করতে বলেননি তাকে। কিন্তু একলার চাপটাই মনের ওপর বড় হয়ে উঠছে। অমিতাভ ঘোষের বিশদ করে শোনার ধৈর্য নেই অত। খসড়ার মোটামুটি কাঠামোটা তাকে জানিয়ে রাখবে? মনে ধরলে তার জোরের সঙ্গে ওর জোরটা মিলতে পারে। আর গোপনই বা কিসের, যা করেছে সবই তো খোলাখুলি বড় সাহেবের টেবিলের ওপর ফেলে দিতে হবে। ধীরাপদ শুধু সময়ের ওপর দখল চাইছে একটু।

কি ভেবে দরজার বাইরে দোতলার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। ওধারে হলঘরটার অন্ধকার অন্যদিনের মতই তরল লাগছে। অর্থাৎ আজও এই রাতে অমিত ঘোষের ঘরে আলো জ্বলছে। খোলা দরজা দিয়ে সেই আলোর মিশেলে হলের অন্ধকার ফিকে দেখায়। সিঁড় পেরিয়ে ধীরাপদ তিন-চার দিন ওই হলঘরটায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকে দরজা দুটোই দেখা যায় শুধু, অ'মতাভর ঘর ভিতরের দিকে।

রোজই প্রায অত রাত পর্যন্ত ঘরে আলো জ্বেলে কি করে? ফোটো অ্যালবাম দেখে বসে বসে? দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে? কৌতুহল সত্ত্বেও একদিনও দরজা পর্যন্ত এগোয়নি।

আজ এগোলো। হলঘরের ভিতর দিয়ে পায়ে পায়ে খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। যা দেখল, তা অন্তত দেখবে ভাবেনি।

অমিতাভর খাটখানা মস্ত চওড়া। খাটময় ছড়ানো মোটা মোটা বহু খাতা জার্নাল। একধারে অর্ধেক বিছানাজোড়া খোলা চার্ট একটা, মাটিতেও ওরকম হাতের তৈরি আর একটা চার্ট পড়ে। কোলের ওপর একটা মোটা বই খুলে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে।

ধীরাপদ নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। অমিতাভ আড়াআড়ি বসে, মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে। কেউ যে এসেছে তার টের পাবার কথা নয়, দু ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও এ তন্ময়তা ভাঙবে ভাবেনি। কিন্তু দু মিনিট না যেতে ভারী গলার বিরক্তি-প্রচ্ছন্ন উক্তি। বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, এই রাতেই তো আর কোনো ফয়সালা কিছু হতে পারে না, মামার সঙ্গে আমার কথা হবে—তারপর এসো।

ধীরাপদ হতভম্ব। এ আবার কোথা থেকে কিসের মধ্যে এসে পড়ল সে! আগন্তুকের ছায়াটা তবু নড়ল না দেখেই হয়ত গম্ভীর অসহিষ্ণুতায় ঘাড় ফেরালো সে। তারপরেই অবাক। খুশিও।—আপনি। কি আশ্চর্য, বসুন বসুন—তাই তো, কোথায়ই বা বসবেন—

খাটের পাশের চেয়ারটাতেও স্তূপীকৃত বই। ধীরাপদ দু পা এগিয়ে টেবিলটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।—ধ্যানভঙ্গ করলাম। আপনি কে ভেবেছিলেন?

অমিতাভ হাসতে লাগল, কিন্তু কে ভেবেছিল সেটা ব্যক্ত করল না।—কেউ না। আপনি এত রাত পর্যন্ত ঘুমুন নি যে, কি ব্যাপার?

জবাব না দিয়ে ধীরাপদ ফিরে বলল, আমিও দেখতে এসেছিলাম কি ব্যাপার। এ সব কী?

অমিতাভ আজ আর সেদিনের মত দুর্বোধ্য কিছু বলে বসল না, অর্থাৎ এসব বোঝা যে তার আওতার বাইরে সেরকম কিছু মন্তব্য করল না। উল্টে তার আগ্রহ দেখে মনে হবে, এ নৈশ সাধনায় মরমী সমঝদার কেউ এসে হাজির হয়েছে। ছড়ানো বইপত্র-চার্টের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোৎসাহে বলল, এসব একটা রিসার্চের প্ল্যান···হলে অনেক কিছু হতে পারে, আপনাকে বলব'খন সব একদিন। আজ ক-বছর ধরে আমি এই এক ব্যাপার নিয়ে ভাবছি—

মন-মেজাজ যেমনই থাক, আর ফ্যাক্টরীর কাজে এক-এক সময় যত বিঘ্নই সৃষ্টি করুক, তার লাইব্রেরীর পড়াশুনা অথবা অ্যানালিটিক্যালের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কখনো ছেদ পড়তে দেখেনি কেউ। বরং এক দিকের ক্ষোভ আর এক দিকের রূঢ় নিবিষ্টতায় ভরে উঠতে দেখা গেছে। চারুদির বাড়িতে সেদিন হিমাংশুবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি করে বা কি পড়ে ধীরাপদ জানে কি না। আজও না জানুক, একটা কিছুর হদিস পেল।

কিন্তু স্বস্থানে ফিরে আসার পর ধীরাপদর গোড়ার বিস্ময়টাই আগে হানা দিল। সে যাবার আগে অত রাতে কে আবার ওই ঘরে ঢুকেছিল? কার

পুনর্পদার্পণ ভেবে অমিতাভ অমন উক্তি করল? মানুকে তো সেই থেকে ঘুমের কসরৎ দেখিয়ে চলেছে। কেয়ার-টেক্ বাবু? এই রাতে তারই বা কি এমন ফয়সালার তাগিদ?

তাগিদটা কার অনুমান করা গেল দু দিন না যেতেই।

রাত তখন এগারোটার কাছাকাছি। ধীরাপদ বড় সাহেবের বড় কাজ অর্থাৎ কানপুরের কাজ নিয়ে বসেছিল। এ কাজটাও হয়ে এসেছে। পার্টিশনের ওধারে মানুকের নাকের ডাক জমে ওঠেনি তখনো। পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে মনে হতে ঘাড় ফেরাল।

সিতাংশু।

সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে কে যেন তাকে বলে দিল, সেদিন অত রাতে তার আগে যে লোক অমিত ঘোষের ঘরে ঢুকেছিল, সে মানুকের কেয়ার-টেক্ বাবু নয়—সিতাংশু। কেয়ার-টেক্ বাবুর অত সাহস হবার কথা নয়, বা তার উদ্দেশে অমিতাভর অমন গুরুভম্ভীর উক্তিও প্রযোজ্য নয়।

সিতাংশু হাসল একটু, সঙ্কোচ-তাড়ানো গোছের ছেলেমানুষি হাসি। উত্তরাধিকারচক্রে কর্তা-ব্যক্তি হয়ে বসেছে, নইলে কতই বা বয়স। শুকনো মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টায় আরো ছেলেমানুষ লাগছে। বলল, আপনারা তো সবাই খুব ব্যস্ত এখন—

বসুন—

ধীরাপদ চেয়ার ছেড়ে বিছানায় বসতে যাচ্ছিল, তার আগে সিতাংশুই খাটের ধার ঘেঁষে বসে পড়ল।—কি করছেন?

মিস্টার মিত্র কানপুরের ফাংশানে যাবেন, সেই ব্যাপার।

ও…। প্রেসার তো রোজই বাড়ছে শুনছি, যাবেন কি করে?

প্রশ্ন কিছু নয়। ক্ষোভের অভিব্যক্তি মাত্র। ধীরাপদ অপেক্ষা করছে।

এদিকের অ্যানিভার্সারির ব্যবস্থা সব শেষ?

প্রায়—।

কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি কিছুই জানিনে। চাপা অসহিষ্ণুতায় উপেক্ষার যাতনাটাই বেশি স্পষ্ট।

ধীরাপদর মুশকিল কম নয়। নরম গলায় আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করল, আপনাকেও বলবেন নিশ্চয়, এখনো তো আছে ক'টা দিন।…তাছাড়া আপনার কাঁধেও তো বিরাট দায়িত্ব এখন।

কিসের বিরাট দায়িত্ব, পারফিউমারি ব্র্যাঞ্চের? সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তার

জোরের জায়গাটাই যেন খুঁচিয়ে দিয়েছে ধীরাপদ। ফ্যাক্টরীর সব দিকের সব উন্নতি শেষ, না এ সময় এই নতুন ব্র্যাঞ্চ খোলাটা ভয়ানক দরকার হয়ে পড়েছিল?

ধীরাপদ নিরুত্তর। মনে মনে বলছে, তোমাকেই সরানো দরকার হয়েছিল। সেটা শক্ত বলেই তোড়জোড়টা এত বড়।

কোনরকম বোঝাপড়া করতে আসেনি, উদ্‌গত উষ্মার মুখে সেটাই মনে পড়ে গেল বোধ হয়। গলার সুর শমে নামল, শুকনো মুখে আবারও সেই ছেলেমানুষি বিড়ম্বনা। এবারে আগের থেকেও বেশি। বলল, যাকগে, আপনার সঙ্গে আমার একটু ব্যক্তিগত কথা ছিল।

ধীরাপদর নীরব প্রতীক্ষা সহৃদয় প্রতিশ্রুতির মতই।

কিন্তু শুনল যা, তা নয়, নির্জলা আবেদন। দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর কাঁচা মুখের বর্ণব্যঞ্জনা সত্ত্বেও বক্তব্য স্পষ্ট।...বাবা এক জায়গায় তার বিয়ের ব্যবস্থায় এগিয়েছেন। বলতে গেলে স্থিরই করে ফেলেছেন। কিন্তু ছেলের আপাতত বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। তাছাড়া বিয়ের ব্যাপারে সকলেরই ব্যক্তিগত মতামত কিছু থাকতে পারে। সেটা বাবার জানা দরকার। বোঝা দরকার। প্রকারান্তরে সেটা তাঁকে জানানো হয়েছে, কিন্তু বোঝানো হয়নি। এসব ব্যাপারে বাবার সঙ্গে সামনাসামনি আলোচনায় অভ্যস্ত নয় সে। কাজেই বোঝানোটা তার দ্বারা সম্ভব নয়। একমাত্র দাদা পারে। অর্থাৎ অমিতাভ পারে। ভিতরে ভিতরে এখনো বাবার সব থেকে বেশি টান দাদার ওপর। আর সিতাংশুর ধারণা, দাদা ছাড়া এখন এসব ব্যাপারে আর যে কথাবার্তা কইতে পারে বাবার সঙ্গে—সে ধীরাপদ। বাবা যে শুধু পছন্দ করেন তাকে তাই নয়, বাবার এত আস্থা এক দাদা ছাড়া আর কারো ওপর দেখেনি।

অতএব—

অতএব-এর আবর্তের মধ্যে পড়ে ধীরাপদ নির্বাক কিছুক্ষণ। সঙ্কোচ কাটিয়ে ওঠার পর অরগ্যানিজেশন চীফ সিতাংশুর প্রত্যাশার দৃষ্টিটা কলেজে পড়া ছাত্রের মতই তার মুখের ওপর আশা আর সংশয়ে দোদুল্যমান। কিন্তু ধীরাপদ কি করবে? আশা দেবে? বড় সাহেবের বদলে তারই হাতে মীমাংসার চাবি থাকলে সে কি করে? কোন্ দিকে ঘোরায় সেটা? ধীরাপদর হাসি পাচ্ছে।

—কথা না উঠলে এ ব্যাপারে আমার কথা কইতে যাওয়া কি ঠিক হবে?

সিতাংশু ভাবল একটু।—আমিই আপনাকে বলার জন্যে অনুরোধ করেছি বলবেন।

তাহলে হয়ত তিনি আপনার আপত্তি কেন জানতে চাইবেন।

সেটা তিনি জানেন। আগ্রহের আভাস দেখছে না বলে ঈষৎ অসহিষ্ণু।

তবু ধীরাপদ চুপচাপ কিছুক্ষণ। তারপর বাবার বদলে ছেলেকেই বোঝানোর মত করে বলল, দু-দুটো ব্যাপার সামনে, তার ওপর ওঁর শরীরও সুস্থ নয়, ক'টা দিন যাক না—পরে হয়ত এ নিয়ে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে।

সিতাংশু আর অনুরোধ করল না। পদস্থ ওপরওয়ালা একটা গোপন দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলে যেভাবে সচেতন হয়, তেমনি সচেতন গাম্ভীর্যে খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। মানুকের নাকের ডাকের সংগ্রামোত্তীর্ণ একটা পরিপুষ্ট লয় কানে আসতে ভুরু কুঁচকে পার্টিশনটার দিকে তাকালো—আপনার অসুবিধে হয় না?

হয় বললে তক্ষুনি চুলের মুঠি ধরে মানুককে টেনে তুলত বোধ হয়। ধীরাপদ হাসল, ক্ষণপূর্বের আলোচনাটা মনে করে রাখার মত গুরুতর কিছু নয় সে-ও তাই বোঝাতে চায়। ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল, না, শুনতে শুনতে বরং তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি এক-এক দিন।

সিতাংশু চলে যাবার পর ঘুমের চেষ্টা করা দূরে থাক, মানুকের সুপ্তিসহায়ক নাকের ডাকও অনেক রাত পর্যন্ত কানে ঢোকেনি।

পরে নয়, এই বিশেষ প্রসঙ্গে হিমাংশুবাবুর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ধীরাপদ পরদিনই পেয়েছে। আর সেই সুযোগ আচমকা এসে তাঁর ছেলেই করে দিয়ে গেছে। টানধরা স্নায়ুর সঙ্গে ধৈর্যের আপস নেই কোনকালে। সেরকম বিড়ম্বনার এক-একটা দিন ছেড়ে এক-একটা মুহূর্তও দুর্বহ। একটা রাত আর একটা বিকেলের মধ্যেই সিতাংশুর মনের গতি বদলেছে।

সন্ধ্যার পরে ধীরাপদ মুখহাত ধুয়ে সবে হিমাংশুবাবুর শোবার ঘরে এসে বসেছিল। কর্তার নির্দেশে মানুকে দু পেয়ালা চা দিয়ে গেছে। মেজাজ প্রসন্নই ছিল। সন্ধ্যের মধ্যে দু পেয়ালা হয়ে গেল শুনে লাবণ্য যদি রাগ করে দোষটা তাহলে তিনি ধীরাপদর ঘাড়ে চাপাবেন, শুনিয়ে রেখেছেন। হাতের পাইপটাকে অনেকক্ষণ বিশ্রাম দিয়েছেন মনে হয়। শয্যার পাশে ছোট টেবিলের কাগজপত্রের ওপর পাইপের শূন্য গহ্বর ঘরের কড়িকাঠের দিকে হাঁ করে আছে।

সিতাংশুর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে আজ আর কাজ নিয়ে বসার অবকাশ হল না। সান্ধ্যবৈঠকে যেমন আসত সে রকম আসা নয়। মুখ গতরাতের থেকেও শুকনো। শুকনো মুখেও সঙ্কল্পের ছাপ। ধীরাপদর থেকে হাত দুই তফাতে একটা কুশনে এসে বসল চুপচাপ।

চায়ের পেয়ালা রেখে হিমাংশুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, কি খবর ?

কি হচ্ছে না হচ্ছে শুনতে এলাম।

জবাবটা কানে অন্য রকম লাগল বোধ হয়, ঈষৎ কৌতুকে তিনি ছেলের মুখখানা পর্যবেক্ষণ করলেন একটু।—তোর দিকের কতটা কি এগোলো বল্ শুনি।

আগমনের হেতু জানে বলেই ধীরাপদ মনে মনে শঙ্কিত। উঠে যাওয়া সম্ভব হলে উঠে পড়ত। কিন্তু ছেলের জবাব শুনে অবাক।

এগোচ্ছে না। আমি ও কাজ পারব না।

হাত-পা ছড়িয়ে খাটে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন হিমাংশুবাবু। আস্তে আস্তে সোজা হলেন। অবাক তিনিও।—কি পারবি না, নতুন ব্র্যাঞ্চ চালাতে ?

নিরুত্তর। অর্থাৎ, তাই।

বড় সাহেবের দিকে চেয়ে ধীরাপদর একবারও মনে হল না চড়া ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন তিনি। রাগ ভুলে বিস্ময় আর কৌতুকে ছেলের মুখখানা চেয়ে চেয়ে দেখলেন খানিক। হাত বাড়িয়ে পাইপটা তুলে নিলেন, তারপর টোবাকো পাউচটা। কিন্তু সে দুটো হাতেই থাকল। ধীরাপদর দিকেও হাল্কা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন একবার।

মনে মনে কি একটু হিসেব করে নিলেন মনে হল। বললেন, সাড়ে তিন হাজার করে চৌদ্দ কাঠা জমির দাম পড়েছে উনপঞ্চাশ হাজার টাকা, একতলা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের জন্য কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে রফা হয়েছে ছেচল্লিশ হাজার টাকায়…হল পঁচানব্বই হাজার। তার ওপর ইকুইপমেন্ট। সব মিলিয়ে সোয়া লাখ টাকার ধাক্কা। এ টাকাটার কি হবে ?

জবাব নেই।

স্পীক ! কি হবে, বেচে দিবি ?

তা না চাও তো আর কেউ দায়িত্ব নিক, আমি পেরে উঠব না।

পাউচ খুলে পাইপের মুখে আস্তে ধীরে টোবাকো পুরতে লাগলেন। পাইপ ধরালেন। ধীরাপদর দিকে তাকালেন আবার। বিব্রত মুখে তাকে উসখুস করতে দেখে ইঙ্গিতে বসে থাকতেই নির্দেশ দিলেন। ছেলের দিকে মুখ ফেরালেন তার পর। এবারে গম্ভীর বটে, কিন্তু উষ্মার চিহ্ন নেই। বললেন, টাকা লোকসান হয় হোক, পারা যে গেল না সেটাই আমি দেখতে চাই।

কণ্ঠস্বর মৃদু শান্ত, কিন্তু সমস্ত বক্তব্যের ওপর পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেবার মত। সিতাংশু চুপচাপ উঠে গেছে। তার পরেও হিমাংশুবাবু নীরব খানিকক্ষণ। পাইপ টানছেন। অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল তাঁকে, কি রকম নিঃসঙ্গও। খাটে হেলান

দিয়ে ধীরাপদর দিকে চোখ ফেরালেন।—রাগের কারণ বুঝলে? চোখে চোখ পড়তে একেবারে বোঝেনি মনে হল না। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে বলেছে কিছু?

সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না দিক, কথা উঠলে কথা বলবে সে রকম আশ্বাস দিয়েছিল সিতাংশুকে। দ্বিধান্বিত জবাব দিল, এ ব্যাপারে কিছু বলেননি···

এটা কোনো ব্যাপার নয় বললাম তো, এটা রাগ। কি বলেছে?

বিয়ের প্রসঙ্গে তাঁর নিজের কিছু মতামত আছে বোধ হয়।

থাকতে পারে। কিন্তু যা সে চায় তার সঙ্গে আমার মতটা কোনদিন মিলবে না এটা তাকে জানিয়ে দিও। সোজা হয়ে বসলেন, পাইপ টেবিলে রাখলেন। —হি ইজ্ নো ম্যাচ ফর হার, ওখানে বিয়ে করলে আজীবন ওই মেয়ের হাতের খেলনা হয়ে থাকতে হবে তাকে। আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ছাট্। অ্যাণ্ড্ দেয়ার আর আদার কমপ্লিকেশন্‌স্ ট্যু···আমি তা চাই না। ওকে আমি সে আভাস অনেকবার দিয়েছি, ওর সেটা বোঝা উচিত ছিল।

কণ্ঠস্বর তেমন না চড়লেও ছেলের উদ্দেশ্যে ভৎর্সনাটুকু অনমনীয়। 'অ্যাণ্ড দেয়ার আর আদার কমপ্লিকেশন্‌স্ ট্যু'—কথা কটা ধীরাপদর কানের পর্দায় আটকে থাকল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। আর কি সমস্যা? কোন্ জটিলতার ইঙ্গিত? ধীরাপদর নীরব দুই চোখ তাঁর মুখের ওপর বিচরণ করছে। বিরক্তি আর ঈষৎ উত্তেজনায় মুখখানা লালচে দেখাচ্ছে।

খানিক বাদে ঠাণ্ডা হলেন। তবু রক্তচাপ বেশি কিনা ধীরাপদর সেই সংশয় গেল না। এরপর যা বলে গেলেন তাও প্রত্যাশিত নয়। ওই মুখে এ ধরনের আত্মগত চিন্তার ছায়াও আর দেখেনি কখনো। পাইপ আবারও হাতে উঠে এসেছে, খাটের উঁচু ধারটায় পিঠ রেখে গা ছেড়ে দিয়েছেন।

—লাবণ্য বুদ্ধিমতী মেয়ে, অনেক গুণও আছে, আই লাইক হার। কিন্তু এ ব্যাপারটায় সে প্রশ্রয় দেবে আশা করিনি। সেও এ-ই চায় আমি বিশ্বাস করি না। এখানেই থামলেন না। বললেন, তোমার দিদি একটু বুঝে চললে কবেই সব মিটে যেত···কিন্তু তাঁর তো আবার উল্টো রাস্তায় চলতে হবে সর্বদা।

চারুদি! ধীরাপদ ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়েই রইল শুধু।

নিচের ঘরে নেমে এসে ভিতরে ভিতরে উন্মুখ অনেকক্ষণ পর্যন্ত। কতই বা রাত, চারুদির ওখান থেকে ঘুরে আসবে নাকি আজই একবার?

সম্ভব হলে পরদিন যাবে ভেবেছিল, কিন্তু সকাল থেকেই দিনের গতি অন্যদিকে

গড়ানো। আসন্ন অনুষ্ঠানের আর দিনসাতেক বাকি মাত্র। হাতের কাজ যেভাবে ছড়িয়েছে, আস্তে ধীরে এবারে গোটানো দরকার সেগুলো। খবরের কাগজগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, বিজ্ঞাপন দিয়ে আসতে হবে—এটাই সমূহ কাজ আপাতত।

বিজ্ঞাপনের কথা মনে হতে আরো কি মনে পড়ল। চুপচাপ বসে ভাবল খানিক, তারপর দোতলার অফিসঘরে উঠে এলো। হিমাংশুবাবুর বাড়ির সিঁড়ির বাঁয়ের অফিসঘরে।

টেলিফোন ডায়াল করল। ওধারে লাবণ্য সরকারই ধরেছে।

বিজ্ঞাপন নিয়ে আজ আপনার দাদার ওখানে যেতে পারি। যাবেন?

লাবণ্য ধন্যবাদ জানালো। যাবে।

কথা বাড়ালে লাবণ্যও ওধার থেকে খুশি হয়েই কথা বলত হয়ত। ধীরাপদ টেলিফোন রেখে দিল।

দিনকতক আগে দাদার সপ্তাহের খবরে বিজ্ঞাপন দেবার জন্যে লাবণ্য প্রকারান্তরে অনুরোধই করেছিল তাকে। দাদার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার জন্যে একদিন তাকে নিয়ে যেতেও চেয়েছিল। ধীরাপদ বিজ্ঞাপনের প্ল্যান ঠিক করে তারপর যাবে বলেছিল।

বিভূতি সরকার আর বিভূতি সরকারের সপ্তাহের খবরের অনেক খবরই বহুদিন আগে ধীরাপদ চারুদির মুখে শুনেছিল। সেখান থেকে লাবণ্যর এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের সমাচার পর্যন্ত। ধীরাপদ আসার পর বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে বহু গেছে, হামেশা যাচ্ছেও, কিন্তু তার হাত দিয়ে সপ্তাহের খবরে বিজ্ঞাপন একবারও গেছে বলে মনে পড়ে না। সিতাংশু মিত্রের হাত দিয়ে যেত জানে, অথচ এ ভুলটা ধীরাপদর ঠিক ইচ্ছাকৃত নয়। কাজ নিয়ে যখন মাথা ঘামিয়েছে, এই কাগজটার কথা মনেই পড়েনি তার। লাবণ্যও মনে করিয়ে দেয়নি।

নিজের ঘরে বসে লাবণ্য লিখছিল কি। অফিসেরই কোনো কাজ হবে।

ধীরাপদ ঘরে ঢুকতে মুখ তুলল, এখন যাবেন?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল।

লেখা কাগজগুলোর ওপর পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে কলম বন্ধ করতে করতে লাবণ্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।—চলুন, সেরেই আসি।

সেরে আসতে একটু দেরি হবে হয়ত, অন্য কাগজের অফিস ক'টাও ঘুরে আসব।

আমাকেও সেসব জায়গায় যেতে হবে ?

গেলে ভালো হয়।

লাবণ্যর মুখে চকিত হাসির আভাস। আজকাল এরকম একটু-আধটু অনুগ্রহ করতে তার আপত্তি নেই ধীরাপদ জানে। তার ওপর আজ বিশেষ করে তার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যেই বেরুনো। টেবিল থেকে বড় পোর্ট-ফোলিও ব্যাগটা হাতে তুলে নিল। মেয়েদের স্বাভাবিক নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদের মত ওটা। আত্মনির্ভরশীলতার বিজ্ঞাপনের মত। হাতে থাকলে মর্যাদা বাড়ে। কিন্তু ধীরাপদ অবিচার করেছিল, নিছক এই কারণেই ওটা হাতে নেয়নি। লাবণ্য বলল, চলুন, আমিও কিন্তু মাঝখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে একটু নামব, একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখে যেতে হবে—বেশি সময় লাগবে না।

শোনা মাত্র তার ভগ্নিপতির কথা মনে হল ধীরাপদর, আর রমেন হালদারের কথা। রোগী যখন বাচ্চা মেয়ে আর বাড়িটা যখন আত্মীয়ের, গন্তব্যস্থলটি তখন কোথায় সটীক মন্তব্যসহ চোখ-কান বুজে বলে দিতে পারত রমেন হালদার।

একতলার সিঁড়ির গোড়ায় বড় সাহেবের লাল গাড়িটা দেখে লাবণ্য থমকে দাঁড়াল।—মিস্টার মিত্র অফিসে এসেছেন নাকি।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখল তকমা-পরা ড্রাইভার সেলাম ঠুকে তাদের উদ্দেশেই পিছনের দরজা খুলে দিল। ধীরাপদ জানালো এসব কাজ নিয়ে ঘোরা স্টেশন ওয়াগনে সুবিধে হয় না বলে গাড়িটা সে-ই পাঠাতে বলে এসেছিল।

গাড়ি ফ্যাক্টরী এলাকা ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়তে লাবণ্য প্রথমে কোথায় যাবে ড্রাইভারকে সেই নির্দেশ দিয়ে নিল। তারপর অনেকদিন আগের এক-দিনের মতই অন্তরঙ্গ খেদ প্রকাশ করল, দিনকে-দিন আপনার প্রতিপত্তি দেখে হিংসা হচ্ছে।

ধীরাপদ জবাব দিল না। বড় গাড়ি, দুজনের মাঝখানে অনেকটা ফাঁক। এধারের একেবারে কোণ ঘেঁষে বসেছে সে। আরো একদিন এমনি এক গাড়িতে পাশাপাশি বসেছিল মনে পড়ে। হিমাংশুবাবু আর লাবণ্যর সঙ্গে ওষুধের ত্বরিত সরকারী অনুমোদন লাভের সুপারিশে সেদিন সে-ও উপস্থিত ছিল। বাক্য-বিন্যাসের ছটায় রমণীর সেই সপ্রতিভ সবল মাধুর্য দেখে সেদিন শুধু সংশ্লিষ্ট অফিসার নয় ধীরাপদ নিজেও ঘায়েল হয়েছিল। ফেরার পথে লাবণ্য আর সে ট্যাক্সিতে ফিরেছিল। সেদিনও দুজনের মাঝে যতটা সম্ভব ফাঁক ছিল। কারণ ধীরাপদর নিজের মধ্যেই তখন অনেক দ্বন্দ্ব। লাবণ্য সরকার তাকে অধীনস্থ সামান্য কর্মচারী বলে জানত সেদিন। ধীরাপদ নিজেও তাই জানত।

কিন্তু দ্বন্দ্ব আজও। সেদিনের মত আত্মবোধের দ্বন্দ্ব নয়, স্নায়ু-তাতানো লাল গাড়িতে পাশাপাশি বসার দ্বন্দ্ব। সান্নিধ্যের আলেয়া থেকে আত্মরক্ষার দ্বন্দ্ব। ধীরাপদ জেনেছে, স্নায়ু যত বিভ্রান্ত হয়, আত্মরক্ষা ততো কঠিন হয়ে পড়ে। আজ সে বিশেষ একটা সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়েছে এটাই সত্যি, আর কিছুই সত্যি নয়। লাল গাড়িতে পাশাপাশি বসাও নয়, আর রমণী-মুখের এই অন্তরঙ্গতাও নয়।

গাড়ির ওধারের কোণ ঘেঁষে বসাটা লাবণ্য লক্ষ্য করেছে। সাদাসিধে-ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, বড় সাহেবের বাড়িতে আদর-যত্ন কেমন পাচ্ছেন বলুন—

ভালই।

আপনি আসছিলেন না দেখে উনি তো হতাশই হয়ে পড়েছিলেন শুনলাম, সুলতান কুঠির ওপরে আপনার এত কিসের টান ভেবে পাচ্ছিলেন না।...আপনার ভালই লাগছে তাহলে?

ঠাট্টাটা অমিত ঘোষের মারফৎ এখানেও পৌঁচেছে বোঝা গেল। ধীরাপদ নির্লিপ্ত উত্তর দিল, কাজের জন্যে ক'টা দিন এসে থাকা, এর মধ্যে লাগালাগির কি আছে—

কাজ শেষ হলে ওই বাড়িতেই ফিরে যাবেন আবার?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, যাবে।

লাবণ্য ঘুরে বসেছে একটু।—ওই বাড়িটার ওপর আপনার সত্যিই যে ভয়ানক মায়া! কেন বলুন তো?

ধীরাপদ শান্তমুখেই ফিরে তাকালো এবার, পার্শ্ববর্তিনীর মুখের চাপা কৌতুক-ছটা নিরীক্ষণ করল দুই-এক মুহূর্ত। খুব সহজ সরল করে উত্তরটা দিল তারপর। বলল, সেখানে আমার সোনাবউদি আছে বলে।

এতটা অকপট উক্তি আশা করেনি হয়ত, লাবণ্যর কৌতুক-কটাক্ষ তার মুখের ওপর থমকালো একটু।—ও। আপনার পাশের ঘরের সেই বউদি সোনা-বউদি!

হ্যাঁ। সহজতার নিজস্ব ভারী অদ্ভুত একটা শক্তি আছে। হৃষ্টচিত্তে ধীরাপদ তাই উপলব্ধি করছে।

লাবণ্য হেসে ফেলেও চট করে সামলে নিল।—তাহলে তাঁদের সুদ্ধ তুলে নিয়ে ভালো একটা বাড়ি দেখে উঠে আসুন না, ও-রকম জায়গায় পড়ে আছেন কেন?

ধীরাপদর মজাই লাগছে এখন। বলল, সোনাবউদিকে ইচ্ছেমত তুলে নিয়ে

আসা যায় না।

লাবণ্য এখানেই থামত কিনা সন্দেহ। কিন্তু বাড়িটা এসে পড়ল, দোরগোড়ায় ভগ্নিপতি সর্বেশ্বরবাবু দাঁড়িয়ে। লাল গাড়ি দেখে একটু বিস্মিত হয়েছিলেন, কিন্তু ভিতরে লাবণ্যর সঙ্গে তেমন আশঙ্কাজনক কাউকে না দেখে ফর্সা ভারী মুখখানা আনন্দ-রসে ভরে উঠল। রোগীর কারণে চিকিৎসকের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন ভাবা কঠিন। একগাল হেসে গাড়ির দিকে এগিয়ে এলেন তিনি।

গাড়ি থেকে লাবণ্য ধীরাপদকে বলল, আমার বেশি দেরি হবে না, বসুন একটু—

সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নিপতি সর্বেশ্বরবাবু এমন অবিবেচনার কথা শুনে হাঁসফাঁস করে উঠলেন একেবারে।—কি আশ্চর্য, উনি গাড়িতে বসে থাকবেন কেন? দু হাত জুড়ে ধীরাপদর উদ্দেশে বিগলিত হলেন, নমস্কার, আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি, আপনি তো ধীরাপদবাবু, এসেছেন যখন পায়ের ধুলো দিয়ে যেতে হবে, এমন ভাগ্য কি রোজ হয়—

অনুরোধ এড়ানো গেল না, নামতে হল। অগত্যা লাবণ্য ভগ্নিপতির পরিচয় দিতে গেল, কিন্তু তার আগেই ধীরাপদ বাধা দিল, আমিও ওঁকে চিনি, উনি সর্বেশ্বরবাবু—আপনার ভগ্নিপতি।

সর্বেশ্বরবাবুর মুখ দেখে মনে হবে তিনি ধন্য হয়ে গেলেন। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে লাবণ্য হঠাৎ ঈষৎ গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করল, আপনি ওঁকে চিনলেন কি করে?

মেডিক্যাল হোমে দেখেছি, অসুখ-বিসুখের খবর নিয়ে মাঝে মাঝে যেতেন—

সর্বেশ্বরবাবু সবিনয়ে জবাবদিহি করলেন, ছেলেপুলের বাড়ি একটা না একটা লেগেই আছে, ও-ই তো ভরসা—

ভরসার পাত্রটি ব্যাগ হাতে আগে আগে ঘরে ঢুকল। কোণের দিকের একটা টেবিলে বছর পনেরোর একটি রোগা মেয়ে পড়াশুনা করছিল। মুখ তুলে সকলকে দেখল একবার, তারপর বইয়ের দিকে মুখ নামালো।

কি রে খুব পড়ছিস? সামনের দরজা দিয়ে ভিতরে যেতে যেতে লাবণ্য বলে গেল।

মেয়েটি চুপচাপ আবার মুখ তুলল। দেখল। তারপর নিরাসক্ত দুই চোখ বইয়ের ওপর নামিয়ে আনল। ধীরাপদর অনুমান, মেয়েটি সর্বেশ্বরবাবুরই। আর অনুমান মাসির আগমনে আর যে-ই খুশি হোক, এই মেয়েটি অন্তত হয়নি।

সর্বেশ্বরবাবু পাশের ঘরটিতে এনে বসালেন তাকে। বসুন, আমি একটু ওদিকটা দেখে আসি কি হল—ছেলেটা দু দিন দাঁতে কাটেনি কিছু—

অনুমতি লাভ করে হন্তদন্ত হয়ে ভিতরে চলে গেলেন। ধীরাপদ হাসছে মৃদু মৃদু। ঘরের চারদিকে দেখল একবার, দেয়ালের ছোট খোপে লাল গণেশমূর্তি, সামনে ছোট রেকাবির বাতাসা কটা পিঁপড়েয় ছেঁকে আছে। পাশেই দেয়ালে কড়ি-গাঁথা গোবরছাপ। এধারের একটা বড় তাকে অনেকগুলো বই ঠাসা—মাঝে মাঝে দুই একটা নতুন বইও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কি বই দেখার জন্য ধীরাপদ উঠে এলো।

শরৎবাবুর উপন্যাস গোটাকতক, কাগজের পুরু মলাট দেওয়া কয়েক বছরের পুরনো পঞ্জিকা, ছোটদের আধছেঁড়া কতকগুলো রোমাঞ্চকর বই, আর ধর্মগ্রন্থ কয়েকটা। এরই ভিতর থেকে একখানা চেনা বই ধীরাপদর হাতে উঠে এলো। রমণী পণ্ডিতের লেখা দে-বাবুর দোকানের সেই জ্যোতিষের বই, যা পড়লে অতি অজ্ঞজনেরও ব্যক্তিগত ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হতে পারে।

ব্যস্তসমস্ত ভাবে সর্বেশ্বরবাবু এদিকে অতিথি সম্বর্ধনায় এলেন আবার। ছেলে মাসির সামনে বসে দিব্বি খাচ্ছে এখন, উৎফুল্ল মুখে সেই সমাচার ব্যক্ত করলেন। অতিথির হাতে জ্যোতিষের বই দেখে লজ্জাও পেলেন একটু। বললেন, ওই একটু-আধটু নেড়েচেড়ে দেখি আর কি, বল-ভরসা পাওয়া যায়···বইটা বড় ভালো, জানতে বুঝতে কষ্ট হয় না, খুব গুণী লোকের লেখা মনে হয়। ওই বইটাই বার করেছেন, আপনারও এসবে বিশ্বাস আছে নাকি?

আছে বললে খুশি হবার কথা, মানুষ সব সময়েই দুর্বলতার দোসর খোঁজে। বলল, বিশ্বাস না থাকার কি আছে, এক রকমের বিজ্ঞানই তো—

সমর্থন পেয়ে সাগ্রহে কাছে এগিয়ে এলেন তিনি, আপনি চর্চা করেছেন? কিছু জানেন নিশ্চয়?

জানে বললে তক্ষুনি কোষ্ঠী আনতে ছুটতেন হয়ত, হাতখানা অন্তত বাড়িয়ে দিতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দশ মিনিটের মধ্যে বার তিন-চার এ ঘরে আর ভিতরের ঘরে ছোটাছুটি করলেন সর্বেশ্বরবাবু। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও অতিথিকে একটু মিষ্টিমুখ করানো গেল না বলে গভীর মনস্তাপ। মাঝে চিকিৎসার ব্যাপারে শালিকার হাতযশের প্রশংসায়ও পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। ডাক্তার তো কলকাতার পথে-ঘাটে কতই দেখা যায়, কিন্তু সামনে এসে দাঁড়ালে রোগ পালায় এমন ডাক্তার ক'টা মেলে? কতবার যে বলেছেন আর এখনো বলছেন, বিলেত চলে যাও, আরো জেনে এসো

আরো শিখে এলো, খরচপত্রের জন্যে ভাবনা নেই—কিন্তু কি যে এক চাকরির মোহে পেয়ে বসেছে উনি ভেবে পান না।—ডাক্তারী কাজ স্বাধীন কাজ, কি বলেন? গোলামী করতে যাব কেন? তাছাড়া বড়লোকের, ইয়ে—

খেদের মুখে সামলে নিয়ে তাকেই সালিশ মেনেছেন, আপনিই বলুন, এত-খানি উঠে থেমে থাকতে আছে?

হাসি চেপে ধীরাপদ সায় দিয়েছে। না দিয়ে উপায় কি, ধীরাপদর মত মহাশয় ব্যক্তিও আর হয় না নাকি। তার সম্বন্ধেও যে অনেক প্রশংসা শুনেছেন সর্বেশ্বরবাবু, আজ স্বচক্ষে দেখলেন। মহা সৌভাগ্য তাঁর। এমন মাননীয় অতিথি শুধুমুখে ফিরে যাচ্ছেন, আর একদিন কি পায়ের ধুলোর সৌভাগ্য হবে তাঁর? ধীরাপদ আশ্বাস দিয়েছে, হবে। গাড়িতে বসে ভাবছিল, তার সম্বন্ধে কি এত প্রশংসা শুনলেন…কোন্ ব্যাপারে তাঁকে ভরসা দেবার জন্যে অত প্রশংসা করা দরকার হল রমেন হালদারের?

লাবণ্যর মুখখানা আগের মত অত হালকা সরস লাগছে না আর, ভগ্নিপতি তাকেও এভাবে গাড়ি থেকে টেনে নামাবেন ভাবেনি হয়ত। তাঁর সঙ্গে ধীরাপদর কথা কি হয়েছে লাবণ্য জানে না, কিন্তু ভগ্নিপতির কথার ধাঁচ জানে নিশ্চয়।

ধীরাপদও এবারে বলার মত পেয়েছে কিছু। বলল, বেশ অমায়িক ভদ্রলোক …আর, আপনার ভারী গুণমুগ্ধ দেখলাম।

লাবণ্য ফিরে তাকালো, কতটা দেখেছে অনুমানের চেষ্টা। পরিহাসের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্যে ঈষৎ গম্ভীর কৃতজ্ঞতার সুরে জবাব দিল, উনি না থাকলে আমার ডাক্তার হওয়া হত না।

ধীরাপদ জানে। আরো কিছু শোনা যেতে পারে ভেবে না জানার ভান করল। কিন্তু পার্শ্ববর্তিনী এ প্রসঙ্গে আর বেশি এগোতে রাজি নয় দেখে মন্তব্য করল, বেচারার বড় দুর্ভোগ হত তাহলে, কলকাতা শহরে আপনি ছাড়া আর দ্বিতীয় ডাক্তার আছে ভাবতে পারেন না। সবটা প্রশংসা শোনার সময় হল না আজ, আর একদিন আসব বলে এসেছি।

ভ্রূকুটি করে লাবণ্য একরকম ঘুরেই বসল তার দিকে। মাঝের ফাঁকটুকু অনেকটা ঘুচে গেল। হাসিমুখে তর্জন করল, না, আপনাকে আর আসতে হবে না।

ধীরাপদ এটুকুতেই সচেতন। আর সরে বসার জায়গা নেই। ঘাড় ফিরিয়ে রাস্তা দেখতে লাগল সে।

কিন্তু এই লঘু ভ্রূভঙ্গির ফাঁকে মনের মত আর এক প্রসঙ্গে পাড়ি দেবার সুযোগ পেল লাবণ্য সরকার। ছদ্মকোপে অনুযোগ করল, সেদিন আপনাদের কুঠির সেই বুড়ো ভদ্রলোককে দেখতে গিয়ে আপনার বউদির···সরি, আপনার সোনাবউদির কাছে আপনার নিন্দা করেছিলাম, আপনি লোক ভালো নন, ফাঁক পেলেই খোঁচা দিয়ে কথা বলেন। শুনে তিনি আপনার পক্ষ নিলেন। সাধ করে খোঁচা খেতে না গেলে আপনি নাকি নির্বিলিক ভালো মানুষ। আসলে আপনার স্বভাবটি আপনার সোনাবউদিও জানেন না।

সোনাবউদি বলেছিলেন নালিশ করতে এসেছিল। ফিরে যে জব্দ করেছেন তা বলেননি। ধীরাপদ সহজভাবেই হাসতে চেষ্টা করল একটু, তারপর রাস্তার দিকে চোখ ফেরালো।

···আজ সে বিশেষ একটা সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়েছে এটাই সত্যি আর কিছু সত্যি নয়। লাল গাড়িতে পাশাপাশি বসাও নয়, আর রমণী-মুখের এই অন্তরঙ্গতাও নয়।

এই পথে আলাপ এগোলো না দেখেও লাবণ্য চুপচাপ বসে থাকল না। তাছাড়া মুখ বুজে বসে থাকাটা কেমন অস্বস্তিকরও। খানিক বাদে জিজ্ঞাসা করল, কই আপনি তো আমার ওখানে আর একদিনও এলেন না, মেয়েটা মুখে না বললেও সেই থেকে আপনার আশায় দিন গুনছে।

এই কদিনের মধ্যে কাঞ্চনকে আর একদিনও মনে পড়েনি সত্য কথাই। অথচ মনে পড়া উচিত ছিল। জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছে এখন?

ভালই আছে - তবে ভালো থাকতে চায় না বোধ হয়। বিশদ করে কিছু আর না বললেও চলত, তবু লাবণ্য আরো একটু খোলাখুলি ব্যক্ত করল সমস্যাটা। —ভালো হয়ে ছাড়া পেলেই তো আবার সেই একই ভাবনা, কোথায় যাবে, কি করবে। নইলে এ কদিনে আরো অনেকটাই সেরে ওঠার কথা। অমিতবাবুর কাছে ভরসা পেয়ে ইদানীং কিছুটা অবশ্য ঠাণ্ডা হয়েছে, তাহলেও আসল ভরসাটা আপনার কাছ থেকেই চায় বোধ হয়।

আমি আর কি আশা দিতে পারি?

আপনিই পারেন। অমিতবাবুকে কি কিছু বিশ্বাস আছে, দরদে মোচড় পড়লে এমন আশাই দিয়ে বসে থাকবেন যে দায় সামলানো মুশকিল। সত্যিই আসুন একদিন, এলে মেয়েটার মনের দিক থেকে কাজ হবে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে আবার উচ্ছল দেখালো তাকে, বলল, আর আমার মুখদর্শনে যদি খুব আপত্তি থাকে আপনার, যেদিন যাবেন আগে থাকতে বলবেন, আমি না হয় থাকব না।

গাড়িটা যেন ধীরাপদর মনের মত চলছে না।

...আজ সে বিশেষ একটা সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়েছে সেটাই সত্যি, আর কিছু সত্যি নয়। লাল গাড়িতে পাশাপাশি বসাও নয়, রমণী-মুখের এই অন্তরঙ্গতাও নয়।

অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব কামাবসায়িতা—যোগলব্ধ এই আট ঐশ্বর্যের নাম বিভূতি।

সপ্তাহের খবরের কর্ণধার লাবণ্যর দাদা বিভূতি সরকারের মধ্যে এর সব ক'টা না হোক, গোটাকতক ঐশ্বর্য অন্তত একদিনের আলাপেই ধীরাপদ আবিষ্কার করেছে। লম্বা রোগা ফর্সা—পাশাপাশি দেখলেও এই বোনের অগ্রজ কেউ বলবে না। যোগলব্ধ আট ঐশ্বর্যের অনেকগুলি খাঁজ তার ফর্সা মুখে দাগ কেটে বসেছে। দেখা এবং খানিকক্ষণ আলাপের পরেই মনে হয়, এই লোককে এড়ানো ভালো।

অতি অমায়িক, মিষ্টভাষী। তাঁর কাগজের মত এমন একটা তুচ্ছ কাগজকে মনে রাখা অনুগ্রহেরই নামান্তর নাকি। বললেন, সকলের এই সহৃদয়তাটুকুই ভরসা তাঁর—সর্বত্র এই ভরসা পাচ্ছেন তাই টিকে আছেন। তাঁকে ভালবাসেন বলেই বড় বড় রথী-মহারথীরা আর বড় বড় প্রতিষ্ঠানের হোমরাচোমরা ব্যক্তিরা মাঝেসাঝে আসেন তাঁর কাছে, নইলে এ রকম একটা ছোট কাগজের কেই বা পরোয়া করে।

আলাপের দ্বিতীয় পর্যায়ে চীফ কেমিস্ট অমিতাভ ঘোষের টানা প্রশংসার ফাঁকে নিজের ঈশিত্ব আর বশিত্বের প্রভাব আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। অমিতাভ ঘোষের মত অমন খাঁটি অথচ অত দরাজ অন্তঃকরণের মানুষ তিনি বেশি দেখেননি। এক-একবার এসে পাতা-ভর বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছেন, দু-চার-ছ মাসের পর্যন্ত টানা কনট্রাক্ট করে গেছেন।...প্রীতির টানেই হামেশা আসতেন তিনি, সাহায্য করতেন, নইলে মিস্টার ঘোষের মত মানুষের এই নগণ্য কাগজকে সমীহ করার তো কিছু নেই।

তাঁর মত মানুষও যে সমীহ করতেন প্রকারান্তরে সেটাই জানিয়ে দিলেন।

আলাপের তৃতীয় পর্যায়ে চাপা খেদ এবং অনুযোগ।...অমিতাভ ঘোষের পরে স্মরণ কিছুটা সিতাংশু মিত্রও রেখেছিলেন। বোনের সঙ্গে তিনিও আসতেন মাঝেসাঝে, এটা-সেটা পাঠাতেন। কিন্তু ইদানীং কিছুকাল ধরে কেন যে অনুগ্রহ থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়ে আছেন জানেন না। অন্য সব কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোয়, নোটিশ বেরোয়—তিনি দেখেন শুধু, কি আর করবেন। তবে আজ

জেনারেল সুপারভাইজার ধীরাপদবাবু স্বয়ং এসেছেন তাঁর ভাগ্য—মহা ভাগ্য।

দাদাটি বয়সে অনেক বড় হলেও লাবণ্যর সহজভাবে কিছু বলে বসতে খুব বাধে না দেখল। দাদার আলাপের ধরন-ধারণ কানে তারও খুব সরল ঠেকছিল না হয়ত। লঘু গাম্ভীর্যে বলল, দেখো দাদা, ধীরুবাবু ভালো মানুষ হলেও ভয়ানক রগচটা লোক কিন্তু। ওঁর যদি একবার মনে হয় আজকাল বিজ্ঞাপন পাচ্ছ না বলে ওঁকে ঠেস দিচ্ছ, তাহলে আর কোনোদিন উনি এমুখো হবেন না বলে দিলাম। ওসব সাংবাদিক বিনয়ের প্যাঁচ রেখে সোজাসুজি বলো, তাতে বরং কাজ হবে।

বোনের ওপর মনে মনে চটলেও বিভূতি সরকার আকাশ থেকে পড়লেন একেবারে।—সে কি! আপনি অসন্তুষ্ট হলেন নাকি? আমি সত্যিই কিছু মনে করে বলিনি, অনেকদিনের যোগাযোগ আপনাদের সঙ্গে, তাই বলছিলাম—আপনি কিছু মনে করেননি তো?

ধীরাপদ হাসিমুখে আশ্বস্ত করল তাঁকে।—না আমি কিছু মনে করিনি, তাছাড়া আমি রগচটা লোকও নই—মাঝে আপনার বিজ্ঞাপন বন্ধ ছিল তার জন্যে ইনিই দায়ী। একসঙ্গে অনেকগুলো ঝামেলা নিয়ে পড়েছি, তার মধ্যে ইনিও আপনার কথা কোনদিন বলেননি আমাকে—সেদিন বলেছেন, আজ এসেছি।

বোনের মুখের ওপর দৃষ্টিটা একবার বুলিয়ে নিলেন বিভূতি সরকার। সে দৃষ্টি মিষ্টি নয় খুব। নিজের স্বার্থের ব্যাপারে বোনের নিস্পৃহতা খুব অবিশ্বাস্য নয়। বললেন, আপনার মত ও-ও অনেক ঝামেলায় ব্যস্ত হয়ত, ছাপোষা দাদার কথা ভাবার সময় হয় না।

কিন্তু বিজ্ঞাপন পেয়ে ক্ষোভ গেছে বোঝা গেল। যতটা দেবে ধীরাপদ মনস্থ করে এসেছিল তার তিনগুণ দিল। এক দিন অন্তর অন্তর তিন দিনের ভরা-পাতা স্পেস বুক করল। উৎসবে স্বয়ং যোগদানের জন্য এবং উৎসব-অন্তে ছবিসহ সহৃদয় বিবৃতি ছাপানোর জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করল। পকেট থেকে চেকবই বার করে খসখস করে অগ্রিম টাকার মোটা অঙ্ক বসিয়ে দিল।

লাবণ্য সরকার চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করল একটা, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার হিমাংশু মিত্রের সই করা চেক। শূন্য চেক সই করে দিয়েছেন বড় সাহেব একটা নয়, কয়েকটাই।

সপ্তাহের খবরের অফিস থেকে বেরিয়ে লাবণ্য সানন্দে মন্তব্য করল, দাদা এবারে আপনার হাতের মুঠোয়। সুর বদলালো তারপরেই, আপনি তখন

ভালোমানুষের মত সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপাতে গেলেন কেন? দাদা ঠিক ভেবেছেন আমার সত্যিই কোনো গরজ নেই।

গরজ আছে?

না থাকলে আপনাকে নিয়ে এলাম কেন?

আমি ভেবেছিলাম, ভয়ে—।

লাবণ্য প্রায় অবাক।—ভয় কিসের?

পাছে রেগে গিয়ে কাগজে বেফাঁস কিছু লিখে বসে আপনাকে অপ্রস্তুত করেন—

লাবণ্য হাসতে লাগল।—মিথ্যে বলেননি। দাদাটি লোক খুব সহজ নন। কিন্তু আপনিও তো কম নন দেখি, জেনে-শুনে ও কথা বলে এলেন! এমনিতেই তাঁর ধারণা আমি কিছু ভাবি না তাঁর জন্যে, এরপর হাতের কাছে না পেলেও দশবার করে টেলিফোনে অনুযোগ করবেন।

দুজনের মাঝের ব্যবধান আরো একটু কমেছে, সেটা লাবণ্য খেয়াল না করলেও ধীরাপদ করেছে। পশ্চিমা ড্রাইভারকে এবারের গন্তব্যস্থানের নির্দেশ দিয়ে রাস্তার দিকে চোখ ফেরালো সে।

যে বিশেষ সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়েছে আজ, সেই উদ্দেশ্যেই চলল এখন। সেটাই আসল। সেটাই সত্যি। আর কিছু সত্যি নয়। লাল গাড়িতে পাশাপাশি বসাও নয়, আর রমণী-মুখের এই অন্তরঙ্গতাও নয়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খ্যাতনামা ইংরেজি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধারের ঘর থেকে কাজ সেরে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্যর মনে যে খটকা লেগেছে ধীরাপদ সেটা অনুমান করতে পারে। গাড়িতে বসেও সে ফিরে ফিরে দেখছে ওকে। শুধুই সঙ্গলাভের আকর্ষণে বড় সাহেবের লাল গাড়িতে টেনে আনেনি তাকে এ রকম একটা সন্দেহ মনে এসেছে বোধ হয়। পকেট থেকে নোটবই বার করে ধীরাপদ গভীর মনোনিবেশে হিসেব দেখছে কি একটা। আসলে কিছুই দেখছ না, পার্শ্ববর্তিনীর নীরব অস্বস্তি উপলব্ধি করছে।

এই কাগজের অফিসটায় অন্তত তার সঙ্কল্পমত কাজ হয়েছে। বিদেশী সাংবাদিক অফিসারটির কাছে কোম্পানীর মেডিক্যাল অ্যাডভাইসার মিস লাবণ্য সরকারকে সামনে এগিয়ে দিয়েছে ধীরাপদ। সে শুধু বিজ্ঞাপন বুক করে টাকার অঙ্ক বসিয়ে চেকটা পেশ করে দিয়েছে। তার নীরবতার ফলে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা, কার্ড দিয়ে সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ জানানো, উৎসবের বিবৃতি নেবার জন্য রিপোর্টার পাঠানোর আবেদন, আর সবশেষে তাদের আদর্শ শিল্প প্রতিষ্ঠানটির

প্রতি সংবাদপত্রের দরদী সহযোগিতা প্রার্থনা—এই সব কিছুই লাবণ্য করেছে। মনে মনে যেমন আশা করেছিল ধীরাপদ, সেই রকম করেই করেছে। ইচ্ছে করে বা চেষ্টা করে কিছুই করতে হয়নি। এসব কাজে এই মুখে পরিপুষ্ট মাধুর্য আপনি ঝরে।

সাংবাদিক অফিসার খাতির করেছেন এবং প্রত্যাশিত আনুকূল্যের আশ্বাসও দিয়েছেন।

লাবণ্যর প্রথমে হয়ত মনে হয়েছিল, বিদেশী অফিসারের সঙ্গে ইংরেজি বাকপটুতার প্রয়োজনে তাকে সামনে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গাড়িতে বসে সে রকম লাগছে না। লাগছে না যে ধীরাপদ সেটা তার দিকে না তাকিয়ে অনুভব করতে পারছে।

দ্বিতীয় নামকরা খবরের কাগজের অফিসে এসে লাবণ্যর খটকা একেবারে গেল। তাকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝেছে। এটি বাঙালীর প্রতিষ্ঠান, কর্তা-ব্যক্তিটিও আধবয়সী বাঙালী। গণুদাদের অফিসের মত ইংরেজি বাংলা দুটো নামকরা কাগজ বেরোয় এখান থেকেও। ধীরাপদ স্লিপ পাঠালো শুধু মেডিক্যাল অ্যাডভাইসার মিস লাবণ্য সরকারের নামে। লাবণ্য লক্ষ্য করল সেটা, কিন্তু কিছু বলার আগেই বেয়ারা সেলাম ঠুকে ভিতরে যেতে বলল। কর্তা-ব্যক্তিটি সাদর আপ্যায়নে বসালেন তাদের। তাদের ঠিক নয়, যার নামে স্লিপ বিশেষ করে তাকেই। এখানেও ধীরাপদর ভূমিকা সামান্য কর্মচারীর মতই। অধীনস্থ অনুচরের মত। যেন বিজ্ঞাপনের ডামি বহন করা আর টাকার অঙ্ক লিখে সই করা চেক ছিঁড়ে দেওয়ার নগণ্য কাজ দুটোর জন্যেই কর্ত্রীর সঙ্গে এসেছে। এই দুটো কাজের পর স্বয়ং মেডিক্যাল অ্যাডভাইসারের আগমনের উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করে মুখ বুজেছে সে।

কর্তাস্থানীয় ভদ্রলোকটি লাবণ্যর দিকে রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে সবিনয় আন্তরিকতায় জিজ্ঞাসা করেছেন, আমরা কি করতে পারি বলুন—

অগত্যা লাবণ্য বলেছে তাঁরা কি করতে পারেন। ভদ্রলোক সাগ্রহে শুনেছেন। মাঝে বেল টিপে বেয়ারাকে তিন পেয়ালা চা দিয়ে যেতে বলেছেন। আর সবশেষে সর্বাঙ্গীন সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নিজে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যাবেন, রিপোর্টার পাঠাবেন। তাঁদের দুটো কাগজের দ্বারা যতটা প্রচার সম্ভব সেটা তিনি নিজে দেখবেন সেই নিশ্চিত আশ্বাসও মিলেছে।

এবারে লাল গাড়ি ছুটেছে গণুদার কাগজ দুটোর অফিসের দিকে। লাবণ্য সরকার গম্ভীর। দুজনের মাঝের ফাঁক এবারে বিস্তৃত হয়েছে। ধীরাপদর

অস্বাভাবিক লাগছে না কিছু। মুখ ফুটে অনুরোধ করতে ওকে খুশি করার জন্য খুশি হয়েই লাবণ্য সঙ্গিনী হয়েছিল। এই বিনিময়টুকুই অনুগ্রহের মত ভেবেছিল। কিন্তু তার বদলে কেউ যদি তাকে টোপের মত ব্যবহার করেছে মনে হয়, তার প্রতিক্রিয়াও স্বাভাবিক।

আপনি এসব কাজে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন কেন?

এ রকম একটা বোঝাপড়ার জন্যে ধীরাপদ মনে মনে হয়ত প্রস্তুতই ছিল। তেমন বিস্মিত বা বিচলিত দেখা গেল না তাকে। সহজভাবেই ঘাড় ফেরালো, কেন, কি হল...

লাবণ্যর তপ্ত দুই চোখ তার মুখের ওপর বিঁধে আছে—আমি জানতে চাই কি উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে সঙ্গে এনেছেন?

নরম কৈফিয়তের আড়ালে আত্মগোপন করার অভিলাষ নেই ধীরাপদরও। আর এই স্পষ্টতার মুখোমুখি সে চেষ্টাও নিরর্থক। তেমনি নির্বিকার মুখেই উল্টে প্রশ্ন করল, আপনার কি মনে হয়?

রাগে অপমানে লাবণ্যর মুখে কথা সরল না কয়েক মুহূর্ত।—আপনি জবাব দেবেন কি না?

ধীরাপদ জবাব দিল। বলল, কাজের খানিকটা সুবিধে হয় বলে—

কি সুবিধে?

যে সুবিধেটা কোম্পানির আপাতত দরকার। কাগজের অফিসের ভদ্র-লোকেরা আমাদের মত লোকের আরজি হামেশা শোনেন বলে অতটা আমল দেন না, সে তুলনায় ভদ্রমহিলাদের বরং কিছুটা মান্যগণ্য করেন এই সুবিধে।

লাবণ্য চেয়ে চেয়ে দেখছে। দেখার তাপে সমস্ত মুখটা ঝলসে দিতে চাইছে। —নিজের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে এ রকম সুবিধে নেবার পরামর্শটাও বড় সাহেবই আপনাকে দিয়েছেন বোধ হয়?

না। সুবিধে যে হয় সেটা আমি নিজেই দেখেছি। ধীরাপদ রয়েসয়ে কিছু একটা তথ্য বিশ্লেষণ করেছে যেন।—অনেক দিন আগে বড় সাহেবের সঙ্গে আপনি একবার একটা ওষুধের ড্রাগ-লাইসেন্সের তাগিদে এসেছিলেন। সুবিধে হয়েছিল। দু মাসের মধ্যে যার স্যাম্পল টেস্ট হয়নি সেটা সাত দিনে বেরিয়ে এসেছিল।

লাবণ্য চেয়ে আছে। দেখছে। ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলুন, আমি নেমে যাব।

অবাঙালী ড্রাইভার এতক্ষণের গরম হাওয়া টের পাচ্ছিল কিনা সে-ই জানে।

এবার যে টের পেয়েছে স্পষ্টই বোঝা গেল। ঈষৎ উচ্চ-কঠিন কণ্ঠস্বর কানে আসতে কিছু একটা নির্দেশের সম্ভাবনায় ঘাড় ফেরাল।

ইঙ্গিতে ধীরাপদ চালাতেই বলল তাকে।

তারপর শান্তমুখে অগ্নিমূর্তির সম্মুখীন হল।—বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, আপনার সেই ড্রাগ-লাইসেন্স বার করার থেকেও সম্প্রতি এই প্রচারের ব্যবস্থা করাটা বেশি জরুরী। সামনের বারে অল ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটি-ক্যাল অ্যাসোসিয়েশানের প্রেসিডেণ্ট ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। কোম্পানীর সুনাম আর যশ এখন থেকে সব কাগজে কাগজে ছড়ানো দরকার।...এ ব্যাপারটা আপান একটু সহজভাবে দেখলে আর কোনো গণ্ডগোল থাকে না।

উপদেশমত কতটা সহজভাবে দেখল, ধীরাপদ সেটা আর ফিরে দেখল না। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল।—আসুন।

আবারও লাবণ্য সরকার নীরবে তার মুখের ওপর আগুন ছড়ালো একপ্রস্থ। কিন্তু না নেমে পথ নেই, লোকটা দাঁড়িয়েই থাকবে, আর ড্রাইভার ঘাড় না ফিরিয়েও বসে বসে অবাক হবে।

এবারের কর্তা-ব্যক্তিটির কাছে ধীরাপদ ঠিক আর আগের মত এগিয়ে দিল না তাকে। যা বলার নিজেই বলল। তাছাড়া অমিতাভ ঘোষের পরিচয় দিল। এই ভদ্রলোকই তার সেই বন্ধু—গণুদাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। পরিচয়ের ফলে, মোটা বিজ্ঞাপন-প্রাপ্তির ফলে—আর ধীরাপদ নিঃসংশয়—লাবণ্য সরকারের প্রায় নির্বাক উপস্থিতির ফলেও, আগের ক-জায়গার মতই এখানকারও অনুকূল সহযোগিতার নিশ্চিত আশ্বাস মিলল।

ধীরাপদর নির্দেশে লাল গাড়ি অফিসের দিকে ছুটেছে এবারে।

লাবণ্য বাঁয়ের রাস্তা দেখছে।

ধীরাপদ ডাইনের।

॥ আঠারো ॥

দু-পাঁচজনের কথা যখন দু-পাঁচশ'র কানে ছড়ায়, কথা তখন রটনার পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। প্রিয় হোক, অপ্রিয় হোক জনতা রটনার উত্তেজনা ভালবাসে।

ফ্যাক্টরীর ছোট পরিসরে এমনি এক ভিত্তিহীন চাপা ক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অমিতাভ ঘোষকে কিছু বলা আর ঢাকের কাঠি উসকে দেওয়া সমান কথা। কিন্তু এমন অদ্ভুত রটনার জন্যে তাকেও ঠিক দায়ী করা চলে না।

প্রতিষ্ঠান সংগঠনের আদর্শ চিত্রটা ধীরাপদ তার সামনে তুলে ধরেছিল। বড় সাহেবের ভাষণে সেই প্রস্তুতির প্রতিশ্রুতি যে থাকবে সে আভাসও দিয়েছিল। এদিকে সদ্য-বর্তমানের প্রাপ্তিযোগটা কোথায় এসে ঠেকল না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই কারো। এ ব্যাপারে তোড়জোড়টা চাপা বলে সকলের আশাও বেশি আশঙ্কাও বেশি। কাজের লোকদের চীফ কেমিস্ট মাঝে-মধ্যে প্রশ্রয়ও কম দেয় না। ফাঁক বুঝে একদিন এমনি জনাকয়েক কর্মচারী তাকে ধরে পাওনাটা বুঝে নিতে চেষ্টা করেছিল।

ধীরাপদও উপস্থিত ছিল সেখানে। ঠাট্টা করে অমিতাভ তাকেই দেখিয়ে দিয়েছে।—ওঁর কাছে যাও। গোটা কোম্পানীটাই উনি তোমাদের দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন।

ধীরাপদর উদারতায় তাদের কোনো সংশয় নেই। কিন্তু সে আর যাই হোক মালিক নয়। সেই কারণে চীফ কেমিস্টের আশ্বাসের মূল্য বেশি। তার মুখ থেকেই শুনতে চায় তারা।

অমিতাভ ঘোষ শুনিয়েছে। বলেছে, পাওনার লিস্ট-এ তো অনেক কিছুই আছে, কোন্ পর্যন্ত টেকে এখন দেখো।

ধীরাপদর ধারণা, এই সংশয়ের সূত্রো ধরেই তারা নিজেদের মধ্যে কিছু একটা গবেষণা করেছে। তারপর বৃহত্তর জটলার মুখে পড়ে তার রূপ আর আকার দুই বদলেছে। যথা, ভবিষ্যতে ভাগ্যের সিকে ছেঁড়ার মতই মস্ত কিছু প্ল্যান করা হয়েছিল তাদের জন্য, কিন্তু কারো প্রতিকূলতায় এখন সেটার কাট-ছাঁট চলেছে। সেরকম প্রতিকূলতা করতে এক লাবণ্য সরকার ছাড়া আর কে? তার চলন কবে আর সোজা দেখেছে তারা? তাদের সিদ্ধান্ত, ছোট সাহেবের সঙ্গে যোগসাজসে সে-ই বড় সাহেবকে বুঝিয়ে তাদের পাওনার অনেকটাই বরবাদ করে দিয়েছে বা দিচ্ছে।

উৎসবের আর দিন তিনেক বাকি। ফ্যাক্টরীর আঙিনায় সোৎসাহে একদল কর্মচারী মঞ্চ বাঁধছে, প্যাণ্ডেল সাজাচ্ছে। সভায় বক্তৃতা অনুষ্ঠানের পর গান-বাজনা আর যাত্রা হবে। বেলা তিনটে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত প্রোগ্রাম। তত্ত্বাবধান করার জন্য ধীরাপদ নেমে এসেছিল একবার। ফেরার মুখে সিঁড়ির কাছে ইউনিয়নের পাণ্ডাগোছের আট-দশজন কর্মচারী ঘিরে ধরল তাকে। তারা জানতে চায় যা শুনছে সেটা সত্যি কিনা। অর্থাৎ মেম-ডাক্তার ঠিক ওইভাবেই শত্রুতা করছে কি না।

দলের মধ্যে তানিস সর্দারও ছিল, কিন্তু সে সামনে এগোয়নি, চুপচাপ পিছনে

দাঁড়িয়েছিল। ধীরাপদ প্রায় ধমকেই বিদায় করেছে সকলকে। বলেছে, এক বর্ণও সত্যি নয়, বড় সাহেব অসুস্থ, তাই কিছুই এখনো ঠিক হয়নি। আর এ রকম বাজে জটলায় মাথা গলালে তাদেরই ক্ষতির সম্ভাবনা।

তবু সকলে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে মনে হয়নি। এ ধরনের বৃহৎ ব্যাপারে কাউকে অবিশ্বাস করতে না পেলে তেমন জমেও না হয়ত। ওপরে উঠতে উঠতে ধীরাপদর হাসি পাচ্ছিল। মহিলার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর রূপটাই সর্বত্র প্রধান যেন। গুজবটা তার কানেও গেছে কিনা জানে না। সেদিনের পরে কোন কাজের কথা নিয়েও লাবণ্য সরকার তার সামনে আসেনি।

কি ভেবে ধীরাপদ সেই দিনই প্রতিশ্রুতির খসড়াটা বড় সাহেবের কাছে পেশ করবে স্থির করল। এখানকার এই প্রত্যাশার উত্তেজনা দেখে হোক বা আর যে কারণেই হোক—একটা নিষ্পত্তির তাগিদ সেও অনুভব করছে। হিমাংশু মিত্রের মানসিক সমাচার সম্প্রতি কুশল নয় খুব। ব্লাডপ্রেসার কমেনি, ছেলের ব্যাপারেও ভাবেন হয়ত। তবু ধীরাপদর দিক থেকে সময়টা অনুকূল। বড় সাহেবের বড় কাজটা মনের মত হয়েছে। অল ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশানের উদ্বোধনী ভাষণে লক্ষ্যের নিশানা জোরালো ভাবেই উঁচিয়ে উঠবে মনে হয়। কাজটা যথার্থই খুব সহজ ছিল না—বিশেষ করে ভাষাও যেখানে বাংলা নয়, ইংরেজি। বড় সাহেবের ঠাট্টা থেকেও তাঁর খুশির পরিমাণ অনুমান করা গেছে। বলেছেন, এসব নীরস কাজে না এসে নাটক-নভেল লিখলে ভালো জমাতে পারতে—

নাটক না লিখুক, নাটক একটা ধীরাপদ ফেঁদে বসেছে। এখানকার উৎসবের বাংলা ভাষণ পড়ে বড় সাহেব কি বলবেন ?···সেখানে উদ্দেশ্যের চারধারে অনাবিল একটা স্বপ্নের মায়া ছড়িয়েছে ধীরাপদ। আদর্শ বাণিজ্য-স্বপ্ন।

পাঁচটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। টেলিফোনে অমিতাভর একটা খবর নেবে কিনা ভাবছিল। বড় সাহেবের সামনে আজ তাকেও উপস্থিত থাকার জন্যে অনুরোধ করেছিল। হাতের কাজ সেরে সে আসবে জানিয়েছিল। দরকারী ফাইল দুটো হাতের কাছে গুছিয়ে নিয়ে ধীরাপদ চুপচাপ অপেক্ষা করছিল। তার মধ্যে একটা ফাইলের কলেবর নেহাত কম নয়।

সিগারেট হাতে হড়বড় করে ঘরে ঢুকল অমিতাভ ঘোষ। চেয়ারের একটা হাতলে পিঠ ঠেকিয়ে আর এক হাতলের ওধার দিয়ে দু পা ঝুলিয়ে দিয়ে চোখ পাকিয়ে ধীরাপদরই বিষম কোনো অপরাধের কৈফিয়ৎ তলব করল যেন।—হ্যাঁ মশাই, মহিলাটিকে পাশের ঘরে পেয়ে দিব্বি অত্যাচার চালিয়েছেন বুঝি, অ্যাঁ ?

ভাষাশৈলীর ধাক্কায় ধীরাপদর হেসে ফেলার কথা। কিন্তু সেরকম হাসা গেল না। বলল, কি করলাম…?

কি করলেন তাই তো জিজ্ঞাসা করছি। হঠাৎ এমন মারাত্মক গম্ভীর কেন? দেখা নেই, কথা নেই, টেলিফোনেও হাঁ-না ছাড়া জবাব নেই—আজ লাঞ্চের সময় আসতে বলে বিনয়ের খোঁচায় হাঁ আমি। বলল হুকুম হলে আসতেই হবে, যে কাজে লাগাব সেই কাজেই লাগতে হবে—তবে ফুরসৎ কম, না এলে চলে কি না। …কি ব্যাপার?

ব্যাপার একমাত্র ধীরাপদই জানে। কিন্তু সে জানাটা ব্যক্ত না করে ছোট-খাটো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা। ফিরে হাল্‌কা অভিযোগ করল, আপনার ওপরেই রাগ হয়ত, আপনার জন্যেই লোকে যা-তা বলে বেড়াচ্ছে।

যথার্থই অবাক অমিতাভ, লোকে কি যা-তা বলে বেড়াচ্ছে? প্রাপ্তির ব্যাপারে এখানকার সন্দেহের গুজবটা শুনে হেসে উঠল হা-হা করে। সিগারেটে একসঙ্গে ক'টা টান দিয়ে অ্যাশপটে গুঁজে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

দাঁড়ান, ডাকি—

বসুন—তিনি নেই। খানিক আগে সিতাংশুবাবুর সঙ্গে বেরুলেন দেখলাম।

অমিতাভ চেয়ার নিল আবার। প্রত্যাশিত ছন্দপতন। সে আবার হঠাৎ যে?

সিনিয়র কেমিস্ট সংশ্লিষ্ট মনান্তরের অবসান ঘটিয়ে ধীরাপদই ভরা গুমটের ওপর একটা উত্তুরে বাতাস টেনে এনেছিল। সেই থেকে চীফ কেমিস্টের মেজাজের পালে খুশির হাওয়া লেগে আছে। আজ নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরের মত ধীরাপদ নিজেই আবার ওতে বড় একটা ছিদ্র করে বসল। বলল, হঠাৎ নয়, তিন-চার দিন ধরেই আসছেন দেখছি—একসঙ্গে বেরুচ্ছেনও।

ঘরের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ভারী হয়ে উঠছে। এই নির্বাক অসহিষ্ণুতা ধীরাপদ চেনে। ভাবছে কিছু। ভাবনাটা ক্ষোভশূন্য নয়। পকেট হাতড়ে সিগারেট খুঁজছে। এক সময় তার সঙ্গেই উঠে গাড়িতে এসে বসেছে। একে একে তিন-চারটে সিগারেট ছাই হয়েছে।

ধীরাপদ সত্যের অপলাপ করেনি। মিথ্যে বলেনি। কিন্তু যা বলেছে না বললেও চলত। এই সত্যটা আজ অন্তত মুখের উপর ছুঁড়ে না দিলেও পারত। দিয়ে গ্লানি বোধ করছে এখন। আর ভাবছে, বড় সাহেবের কাছে আজ এই লোককে টেনে না নিয়ে আসাই ভালো ছিল।

ভালো যে ছিল খানিক বাদেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল।

একে এই দ্বিতীয়াবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না হিমাংশু মিত্র, তার ওপর ধীরাপদর হাতে ওই অতিকায় ফাইল। লঘু শঙ্কায় বড় বড় চোখ করে তাকালেন তিনি, প্ল্যান্‌ড অ্যাটাক্‌ মনে হচ্ছে? ভাগ্নের দিকে ফিরলেন, তোকে সুদ্ধু ধরে এনেছে, কি ব্যাপার? বোস্—

পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই বার করে সামনের ছোট টিপয়ে রেখে অমিতাভ বসল। দৃষ্টিটা মামার মুখের ওপর। জিজ্ঞাসা করল, তোমার প্রেসারের খবর কী?

খুব খারাপ, হিমাংশুবাবু গম্ভীর, কোন রকম ঝকাঝকি সইবে না—একটা ঝগড়ার কথা বলেছিস কি লাবণ্যর কাছে রিপোর্ট চলে যাবে।

কোলের ওপর ফাইল দুটো রেখে চুপচাপ বসে ধীরাপদ আড়ে আড়ে অমিতাভকেই লক্ষ্য করছে। মেজাজ এখন কোন্ তারে বাঁধা জানে। বড় সাহেবের লঘু উক্তির জবাবে মুখের অসহিষ্ণু অভিব্যক্তি স্পষ্টতর হল শুধু। সিগারেটের প্যাকেট হাতে উঠে এলো।

হিমাংশুবাবু এর ওপরেই খোঁচা দিয়ে বসলেন একটু। বললেন, আমা' শরীরটা ভালো যাচ্ছে না তুই জানিস তা হলে?

মুখের ওপরেই ফিরে ব্যঙ্গ করে উঠল অমিতাভ, বড় সাহেবের শরীর খারাপ, না জানলে চাকরি থাকবে কেন? তিক্ত কণ্ঠস্বর আর এক পরদা চড়ল, শরীর ভালো যাচ্ছে না তো তুমি এভাবে বসে আছ কোন্ আনন্দে—কলকাতা শহরে লাবণ্য সরকার ছাড়া আর ডাক্তার নেই?

ধীরাপদ আড়ে আড়ে দেখছে না আর, সোজাসুজি ঘাড় ফিরিয়েছে। বড় সাহেব মৃদু মৃদু হাসছেন। পাইপ ধরানোর ফাঁকে ভাগ্নের মুখখানা দেখছেন। ধীরাপদর কেমন মনে হল, পাইপ মুখে দিয়ে একটা খুশির আলোড়ন আড়াল করছেন তিনি। মনে হল, সাফল্যের তিলক পরা এই মানুষটা শুধু এটুকু থেকেই বঞ্চিত। নিজের ছেলের কাছ থেকেও। সিতাংশুর সেদিনের কথা মনে পড়ল। বলেছিল, ভিতরে ভিতরে বাবার এখনো সব থেকে বেশি টান দাদার ওপর।

পাইপ ধরিয়ে বড় সাহেব জোরেই হাসলেন। বললেন, লাবণ্য এলে তাকে বলব সে এভাবে রোগী দখল করে বসে আছে কেন—আজ রাতেই আসবে হয়ত।

কিন্তু ঘরের বাতাস হাল্‌কা হল না একটুও। হিমাংশুবাবু ধীরাপদর দিকে ফিরলেন এবারে।—তোমার হাতে এত সব কী?

তাঁকে খানিকটা নিশ্চিন্ত করার জন্যেই ধীরাপদ ছোট ফাইলটা এগিয়ে দিল।

বলল, তিন দিন বাদে ফাংশান, এটা এবারে দেখে দিন—

কিন্তু তার হাতের মোটা ফাইলটার ভয়েই উতলা তিনি। এটার কাজ শেষ হলেই ওটা এগিয়ে দেবে ভাবছেন। তাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কী ?

মোটা ফাইলটাও এবার তাঁর সামনের ছোট টেবিলে রাখল ধীরাপদ। কি এটা এক কথায় জবাব দেওয়া সহজ নয়। প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থায় যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে আর যত কিছু হিসেব-নিকেশ করেছে তার যাবতীয় খুঁটিনাটি ওতে আছে। বড সাহেবের ঘোষণা রচনায় আদর্শের স্বপ্নটা যে অলীক নয় তার কৈফিয়ৎ বা সমর্থন এর থেকে মিলবে। সে যে শূন্য থেকে সংগঠনের সৌধ রচনা করেনি এটা তার নজির। বড সাহেব সব নাকচ করে দিলেও এটাকে অস্বীকার করতে পারবেন না।

দুই এক কথায় জানালো কি ওটা। মেটিরিয়াল ফাইল। এর ওপর নির্ভর করে ঘোষণার খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

বড সাহেব হাসলেন, তোমার খাটুনি ঠেকাবে কে ? ছোট ফাইলের ওপর চোখ বোলালেন একটু। ধীরাপদর প্রায়-দুর্ভেদ্য হাতের লেখা নিয়ে অনেকদিন ঠাট্টা করেছেন। আজও ভুরু কোঁচকালেন। ফাইল হাতেই থাকল। জিজ্ঞাসা করলেন, কি করলে শুনি, বোনাস কি দিলে ?

বলল। নিচের দিকের দেড মাস থেকে ওপরের দিকে পনের দিনের সুপারিশ করেছে তারা।

বড সাহেব ভাবলেন একটু, তারপর দেড় মাসটা এক মাস করে দিতে বললেন।

ধীরাপদ ঘাড নাডল, তাই করবে। অমিতাভ কুশনে মাথা এলিয়ে সিগারেট টানছে। তার কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ নেই। বিরক্তিকর লাগছে হয়ত। বেশিক্ষণ এ আলোচনা চললে ধৈর্য ধরে বসে থাকবে কিনা সন্দেহ।

বোনাস-প্রসঙ্গ শেষ করে বড সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর—আর কি ?

আর কি সেটা বোনাসের অঙ্কের মত দু কথায় বলা সম্ভব নয়। আর যা, সেটা সরল করে আনার তাগিদেই যা কিছু জটিলতার আশ্রয়। খসড়ার ভাব আর আবেগ থেকে লক্ষ্যের তালিকাটা ছেঁকে তুললে যতিশূন্য শোনাবে। বিচ্ছিন্ন-ভাবে দেখলে তালিকাটা ছোট নয়। পাকা চাকরির গ্রেড বাঁধা, স্বেচ্ছা-প্রদত্ত বাড়তি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড স্কীম, গ্র্যাচুইটি ঘোষণা, কোম্পানীর চিকিৎসকের নির্দেশ-সাপেক্ষ অসুস্থ কর্মচারীদের নিখরচায় যাবতীয় ওষুধ বিতরণ, চীপ-রেটে ক্যান্টিন স্থাপন, বেতনমূলক ছুটিছাটার আনুকূল্য—ইত্যাদি কোনোটা সদ্য-ঘোষণার আকারে, কোনোটা বা ভবিষ্যৎ-প্রতিশ্রুতির মত করে সাজিয়েছে। ধীরাপদ

কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলবে ?

বেশি বলার দরকার হল না। ঘোষণায় মূল দু-তিনটে দফা শুনেই তিনি বাধা দিলেন, বছরে খরচ কত বাড়বে শুনি আগে।

বড় ফাইলটা খুলে ধীরাপদ তৎক্ষণাৎ হিসেব দাখিল করল। বাড়তি খরচ শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে বাডতি আয়ের দিকটাও দেখালো। নতুন সংগঠন অপরিহার্য, দু-চার কথায় তাও জানাতে দ্বিধা করল না। কিন্তু বড় সাহেব সেদিকে কান দিলেন না তেমন, খরচের অঙ্কটাই কানে বিঁধেছে। চিন্তিত মুখে বললেন, একবারে হঠাৎ এত খরচ বাড়িয়ে ফেললে সামলাবে কি করে বুঝছি না।

বাডতি ব্যয়ের সমূহ অঙ্কটাই দেখিয়েছে ধীরাপদ। সব ক'টা প্রতিশ্রুতি ধরে দেখালে ওটা দ্বিগুণ হবার সম্ভাবনা। ছোটখাটো একটা বক্তৃতার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল ধীরাপদ, আর বড় ফাইলটা খুলে কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে কি করা হয়েছে সেটা দেখাতে যাচ্ছিল।

বাধা পড়ল। সিগারেট ফেলে অমিতাভ হঠাৎ সোজা হয়ে বসেছে। খরখরে দৃষ্টিটাও শঙ্কার কারণ। ধীরাপদর হয়ে বোঝাপড়া করার দায়টা যেন তারই। সেইজন্যেই প্রস্তুত। কিন্তু তার প্রস্তুতির ধরন আলাদা।

বলল, কোম্পানীর ভালোর জন্যে দরকার হলে সামলাতে হবে। অন্য বাজে খরচ বাদ দিয়ে দাও।

এমন বেপরোয়া সমর্থন ধীরাপদও আশা করেনি। বড় সাহেব ফিরে ভাগ্নের মুখখানা দেখলেন একটু।—কোন্ বাজে খরচটা বাদ দেব ?

সবার আগে পারফিউমারি ব্রাঞ্চের প্ল্যান বাতিল করো। অনেক টাকা বাঁচবে।

তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?

সম্পর্ক টাকার। মিছিমিছি লোকসান দেবে কেন ?

লোকসান হবেই বলছিস ?

অমিতাভ তেতে উঠল, হবে কি হবে না আমার থেকে তুমি ভালো জানো।

এ রকম একটা আলোচনায় গাম্ভীর্য দরকার বলেই গম্ভীর যেন বড় সাহেব। ধীরেসুস্থে বললেন, তা হলেও পারে কি না দেখা যাক—

মামার সামনে ভাগ্নের ঠিক এই মূর্তি ধীরাপদ আর কখনো দেখেনি। একজন যেমন ঠাণ্ডা আর একজন তেমনি গরম। অমিতাভ বলে উঠল, কিন্তু কোম্পানীর দেখতে যাওয়ার কি দায় পড়েছে, কোম্পানী এভাবে টাকা রিস্ক্ করবে কেন ?

এই উক্তিও গায়ে মাখলেন না বড় সাহেব। হাতের ফাইলটা ধীরাপদর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, টাইপে দিয়ে দাও। তাগ্নের দিকে ফিরে নির্লিপ্ত জবাব দিলেন, কোম্পানী টাকা রিস্ক্ করবে না—আমি ঠিক করেছি ওটা আলাদা সতুর নামেই হবে।

ধীরাপদ নির্বাক দ্রষ্টা এবং শ্রোতা। ঘোষণার খসড়াটা টাইপ করতে দেওয়া পরোক্ষ অনুমোদনের সামিল। যদিও টাইপ করানো আর সঙ্কল্পে পৌঁছানোর মধ্যে অনেক ফারাক এখনো। তবু শুরুতে একটা বড় তিক্ততার সম্ভাবনা এড়ানো গেল বলে ধীরাপদর খুশি হবার কথা, স্বস্তি বোধ করার কথা। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে আসা, এই মুহূর্তে সেটা যেন সেও ভুলে গেছে।

জবাব শুনে অমিতাভ থমকালো একটু। কোম্পানীর টাকা লোকসানের সম্ভাবনাটাই একমাত্র ক্ষোভের কারণ হলে এর ওপর আর কথা থাকার কথা নয়। কিন্তু অমিতাভর ফরসা মুখখানা ক্ষণিকের স্তব্ধতায় আরক্ত হতে দেখল ধীরাপদ।

তুমি কি ঠিক করেছ না করেছ সেটা সে জানে?

জানবে।

জানিয়ে দাও তা হলে। তপ্ত বিদ্রূপ ঝরল এক পশলা, সে জানে আমার জন্যেই তুমি কোম্পানী থেকে সরিয়েছ তাকে—সেই রাগে আর দুঃখে চোখে ঘুম নেই তার, রাতদুপুরে আসে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রের কথা মনে পড়ল ধীরাপদর। যে রাত্রে তার ঘরে গিয়ে দাঁড়াতে রিসার্চের প্ল্যান-মগ্ন লোকটা আর কারো পুনর্পদার্পণ ভেবেছিল। বই থেকে মুখ না তুলে বলেছিল, অত রাতে ফয়সালা কিছু হতে পারে না, মামার সঙ্গে কথা হবে—তারপর যেন আসে।

...এই কথা তাহলে!

পাইপ মুখে বড় সাহেবকে আর তত নিরাসক্ত মনে হল না।—কি বলেছে?

কি বলেছে তাকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করো।

তবু একটু অপেক্ষা করলেন তিনি, তারপর বললেন, করব। কিন্তু ও নির্বোধের মত ভাবছে বলে তোর মাথা গরম কেন? কোম্পানীর মেজর শেয়ার ওর আর আমার নামে—তাকে সরাবার কথা ওঠে কোথা থেকে?

ছেলেকে নির্বোধ বলা সত্ত্বেও উক্তিটা ধীরাপদর কানে বিসদৃশ লাগল কেমন। ছেলে ভাবছে বলে ভাগনেও যেন তাই ভেবে বসে না থাকে, সেই ইঙ্গিত কিনা বুঝল না। বোঝাবুঝির অবকাশও নেই আপাতত। অমিতাভ উঠে দাঁড়িয়েছে, চোখের তাপ চশমার পুরু কাচের ভিতর দিয়ে ঠিকরে আসছে।

কথা ওঠে না, সে জ্ঞান তোমার থেকেও তার অনেক বেশি টনটনে। তবু ও-রকম নির্বোধের মত ভাবছে কেন সেটাই বরং তুমি এখন ভাবতে চেষ্টা করো বসে। পারো তো তোমাদের ওই মেডিক্যাল অ্যাডভাইসারকে ওর ওখানে পারফিউমারি অ্যাডভাইসার করে পাঠাও—মাথা ঠাণ্ডা হবে।

সবেগে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সকল সংস্রব থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবার মত করে গেল। সিতাংশু বা লাবণ্য সরকারের ওপর নয়, এই মুহূর্তের যত ক্ষোভ মামার উপরে। ধীরাপদ নির্বাক বসে। বড় সাহেব পাইপ টানছেন। তেমন বিচলিত বা বিড়ম্বিত মনে হল না তাঁকে। অন্তত ধীরাপদ যতটা আশঙ্কা করেছিল ততটা নয়। ছেলের ব্যাপারে ভাগ্নে নতুন কিছু হদিস দিয়ে যায়নি। সবই জানা।

তবে গম্ভীর। কি ভাবছেন ঠাওর করা শক্ত। ছেলের মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য লাবণ্য সরকারকে পারফিউমারি অ্যাডভাইসার করে পাঠানোর কথা নিশ্চয় না। তার বিপরীত কিছুই হয়ত। ছেলে সেদিন প্রসাধন-শাখা নিয়ে বাপের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসে ফিরে যাবার পর এই ব্যাপারে নিজের মনোভাব খুব স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। আজ আর তার পুনরুক্তি করলেন না। ধীরাপদ ওঠার জন্য উসখুস করছে টের পেয়ে ঘাড় নেড়ে ইশারা করলেন। অর্থাৎ কাজ নেই কিছু, যেতে পারে।

ফাইল হাতে বাইরে এসে আর একবার থমকে দাঁড়াতে হল। সিঁড়ির মুখে সিতাংশু দাঁড়িয়ে। চোখোচোখি হতেই নিঃসংশয়ে বুঝে নিল একটু আগে অমিতাভকে সে ওই মূর্তিতে নেমে যেতে দেখেছে। ধীরাপদ হয়ত বলত কিছু। এই মুহূর্তে বাবার সঙ্গে আবার কিছু বোঝাপড়া করতে যাওয়া খুব বিবেচনার কাজ হবে না, সে রকম আভাসও দিতে পারত। কিন্তু কিছুই বলল না। কারণ, সিতাংশুর দুই চোখের চকিত দৃষ্টি অবিশ্বাসে ভরা। পাশ কাটিয়ে ধীরাপদ নিচে নেমে এলো।

ছেলে বাপের ঘরে অনেকক্ষণ ছিল সে খবরটা মানুকের মুখে শুনেছে। কি কথা হয়েছে ধীরাপদ জানে না। মানুকের ধারণা বিয়ের কথা। বিয়ের কথা নিয়ে কথা কাটাকাটি। ছোট সাহেবের বিয়ের প্রসঙ্গে মানুকে বা কেয়ার-টেক্ বাবু কারো থেকে কম ভাবছে না।

রাত্রে লাবণ্য সরকারের আসার কথা ছিল। অসুখ না সারার ব্যাপারে ভাগ্নের রাগ দেখে বড় সাহেব ঠাট্টা করেছিলেন, সে এলে রোগী দখল করে বসে

থাকার কৈফিয়ৎ নেবে। সে এসেছিল টের পেয়েছে। রাত মন্দ নয় তখন, মেডিক্যাল হোমের ডিউটি সেরে এসেছিল হয়ত। কিছুক্ষণ ছিল। কি কথা হয়েছে জানে না। রোগী আগলে থাকার পরিহাসটা আর করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

নিচে নেমে লাবণ্য সরকার অমিতাভ ঘোষের ঘরে গেছে। ধীরাপদর অনুমান, পাঁচ মিনিটের বেশি ছিল না। অনুমান, অমিতাভর আজকের এই উত্তাপের সবটাই ভাইয়ের কারণে নয়। তাই হলে সিতাংশুর রাতদুপুরে ঘরে বোঝাপড়া করতে আসা নিয়ে মামার সঙ্গে আজকের এই প্রহসনটা সে দিনকতক আগেই সেরে ফেলত। অনুমান, এতদিন বাদে মহিলাটির আবার সেই দু নৌকোয় পা দেওয়ার চেষ্টা আবিষ্কার করেছে সে। বড় সাহেবেরও সেই কারণেই মনে মনে ক্ষোভ লাবণ্যর ওপর। ছেলেকে সে প্রশ্রয় দেয়। ধীরাপদকে স্পষ্টই বলেছেন সেদিন। বড় সাহেবের ঘর থেকে লাবণ্য নিচে নেমে সরাসরি ওঘরে গিয়ে ঢুকল কেন? তাপ দূর করতে? প্রলেপ দিতে? বোধ হয় না। পাঁচ মিনিটে ও প্রলেপ হয় না। কেন গেছে বা কি কথা হয়েছে ধীরাপদ জানে না।

পরদিন সকাল সকাল অফিসে এসেছিল। অনেক কাজ। অনেক ভাবনা। উৎসবের দিন তো এসেই গেল। কিন্তু কাজ এগোচ্ছে না, ভাবনাগুলোও জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এবারে বেশ বড়দরের একটা নাটক গড়ে উঠছে মনে হয়। আবহাওয়া সেই রকমই। এ নাটক থেকে ধীরাপদ বাহ্যত বিচ্ছিন্ন। কিন্তু মন বস্তুটা বিচিত্র। তার যোগ-বিয়োগ অঙ্কের ধার ধারে না। কাজ করছেও বটে, ভাবছেও বটে, কিন্তু মনটা কালকের ওই অতগুলো না-জানা পরদার আনাচ-কানাচে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। খুব সগোচরে নয়। মনের ওপর খানিকটা লাগাম কষার হাত থাকত তাহলে। হাত নেই। ফলে সবেতে অকারণ বিরক্তি।

ওটা কী? নোট্‌টা টেনে নিল। পুরুষালি ছাঁদের রমণী-হস্তাক্ষর বড় বেশি চেনা। দেখে কপালের কুঞ্চন-রেখা মিলিয়েছিল। নোট্‌টা পড়তে পড়তে সেগুলো আবার দেখা দিল। লাবণ্য সরকার পাশের ঘর থেকে নোট্ পাঠিয়েছে। বাক্যালাপের রীতি না থাকলে এই রীতি তার। অফিসিয়াল নোট্। কাঞ্চন নামে যে মেয়েটি তার আবাসিক নার্সিং হোমে আছে, চীফ কেমিস্ট শ্রীঘোষের প্রস্তাব, তাকে মেডিকেল হোমের শিশি-বোতল ধোয়া, লেবেল কাটা, লেবেল আঁটা, ট্যাবলেট বিক্রির ছোট খাম তৈরি করা প্রভৃতির কাজে নেওয়া হোক। মেডিক্যাল হোমে এ ধরনের কাজের জন্য বাড়তি কর্মচারীর প্রয়োজন। মাইনে

আশি টাকা। প্রস্তাবটি জেনারেল সুপারভাইজারের বিবেচনার্থে পাঠানো।

ধীরাপদর প্রথম প্রতিক্রিয়া অনুকূল নয় খুব। মাথাটা আর কত দিকে ভাগ করে ভাবতে পারে সে? নোটটা পড়তে পড়তে প্রথমেই চোখ-তাতানো ছাপা শাড়ি আর কটকটে লাল ব্লাউজ পরনে ক্ষীণাঙ্গী মূর্তিটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। ফ্যাকাশে মুখে উগ্র প্রসাধনের চটক আর চোখের বুভুক্ষু আমন্ত্রণ। কিন্তু একটু বাদে নিজেরই ভিতর থেকে কার যেন ভ্রূকুটি। আসল বিরক্তির কারণ, দায়টা তার ঘাড়ে পড়েছে বলে। নইলে ওই স্থূল বেশবাস আর প্রসাধনের আড়ালে থেকেও একখানি প্রায়-সুশ্রী শুকনো কচি মুখ আবিষ্কার করতে পেরেছিল সে। রেস্তরাঁয় আর লাবণ্যর ঘরের রুগ্নশয্যায় যে মূর্তি আর যে কান্না দেখেছিল ভোলবার নয়।

কিন্তু মাইনে আশি টাকা। এ বাজারে আশি টাকায় ক'টা জঠরের জ্বালা জুড়বে? ফলে যে রাস্তা মেয়েটার জানা আছে সেই রাস্তায় বিচরণ কি তার বন্ধ হবে, না চাকুরি পেলে সেটাই আর একটু ভদ্রস্থ, আরো একটু লোভনীয় করে নেবে? ধীরাপদ সমস্যায় পড়ল। দরদ আর অনুকম্পা সত্ত্বেও ও-রকম পরিস্থিতির এক মেয়েকে কোম্পানীর ঘাড়ে চাপানোর ব্যাপারে মন সায় দিচ্ছে না।

নোট হাতে পাশের ঘরের উদ্দেশে উঠে এলো। সেদিন মোটর থেকে নেমে যাওয়ার পর সামনাসামনি বাক্যালাপ এ কদিনের মধ্যে আর হয়নি। লাবণ্য সরকার টেবিলে একগাদা প্যামফ্লেট ছড়িয়ে বসেছিল। মুখ তুলল।

এটার কি করা যায়? সহজ পরামর্শের সুর।

লাবণ্য জবাব দিল না। বসতেও বলল না। চুপচাপ চেয়ে রইল।

ধীরাপদ সামনের চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল একটু। স্বাভাবিক হৃদ্যতায় কখনো কোনো ছেদ পড়েনি যেন। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি বলেন?

লাবণ্য চোখ ফেরায়নি।—ওটা আপনার মতামতের জন্যে পাঠানো হয়েছে।

আমি ঠিক ভালো বুঝছি না, ও ধরনের কোনো মেয়েকে একেবারে কোম্পানীতে এনে ঢোকানো—

কথাটা শেষ হল না। লাবণ্য সরকারের হাতে টেলিফোনের রিসিভার উঠে এসেছে।—চীফ কেমিস্ট।

ধীরাপদ চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে

অপারেটার চীফ কেমিস্টের টেবিলে কানেকশান দিল।

মিস্টার চক্রবর্তী ও রকম কোনো মেয়েকে কোম্পানীতে নিয়ে আসাটা ভালো বিবেচনা করছেন না।

ধীরাপদ নয়, ধীরাপদবাবু নয়—মিস্টার চক্রবর্তী। দুই-একটা মুহূর্ত। রিসিভারটা লাবণ্য তার দিকে বাড়িয়ে দিল। অর্থাৎ চীফ কেমিস্ট তার সঙ্গে কথা বলবে।

সাড়া দেবার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভর গম্ভীর গলা কানের পরদায় গোঁ গোঁ করে উঠল, আপনি ভালো বিবেচনা করছেন না কেন, লাবণ্য সরকারের সেরকম ইচ্ছে নয় বলে?

ধীরাপদ আড়চোখে সামনের দিকে তাকালো একবার। জবাব দিল, তাঁর ইচ্ছে নয় আমি জানতুম না।

আমারও জানা ছিল না, কাল সন্ধ্যেয় মনে হয়েছে। দু-চার দিন আগেও ইচ্ছে দেখেছিলাম। ওই মেয়েটির কোথায় জায়গা হতে পারে সেটা সে-ই আমাকে দেখিয়েছিল। টেলিফোনের ওধারে গলা চড়ছে। যাক আপনার বিবেচনাটা তা হলে ওই মেয়েটাকে গিয়ে জানিয়ে আসুন, রাস্তায় রাস্তায় আবার লোক ধরে বেড়াতে বলুন—

সজোরে টেলিফোন নামিয়ে রাখার শব্দ। এত জোরে যে কান থেকে ধীরাপদর হাতের রিসিভার আপনি সরে গেল। হাত বাড়িয়ে লাবণ্য রিসিভারটা নিয়ে যথাস্থানে রাখল। টেলিফোনটা তারই হাতের পাশে। খরখরে দৃষ্টি, ফোনের বাক্যালাপের মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা।

ধীরাপদ বলল, উনি বলেছেন ওই মেয়েটিকে নেবার জায়গা আপনিই তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—

শুধু চাউনি নয়, হয়ত কণ্ঠস্বরও সংযত করার চেষ্টায় লাবণ্য কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর জবাব দিল, উনি জায়গার খোঁজ করেছিলেন তাই জায়গা দেখানো হয়েছে, জায়গা যে আছে ওই নোটেও লেখা আছে। সে জায়গা ভরাট করার দায়িত্ব আমি নিতে রাজি নই—সেটা আপনি দেখুন।

সেখানে দাঁড়িয়েই ধীরাপদ নোট অনুমোদন করে নাম সই করে দিল। তারপর ওটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, নিয়ে নিন—

দরজা ঠেলে বাইরে চলে এলো। নিজের ঘরে নিজের চেয়ারে এসে বসল। অনেক কাজ, অনেক ভাবনা। বড় সাহেবের ভাষণ টাইপে দিতে হবে, ওরা কতদূর কি করল না করল নিচে গিয়ে একবার দেখে আসতে হবে। এই ফাঁকেই

টেবিলে আরো গোটাকতক ফাইল চালান করেছে কে আবার। জরুরী কিনা দেখার জন্য হাতের কাছে টেনে নিল।

তারপরেই থমকে গেল হঠাৎ।

ভালো লাগছে কেন? এতক্ষণ তো লাগছিল না। এই কদিনের মধ্যেও লাগেনি। কদিনের জং-ধরা মনোযন্ত্রটা সদ্য তেল-পড়া-গোছের সচল সজীব লাগছে কেন? একটু চোখের দেখা, একটু কাছের দেখা, দুটো কথা বলা—শুধু এইটুকুতেই জীর্ণ হলদে পাতায় নতুন সবুজের রঙ ধরতে চায় কেন? কেন ভালো লাগে? কেন ভালো লাগছে? সে না দেয়াল তুলে দিয়েছিল? বুকের এধারে শক্ত দেয়াল খাড়া করেছিল না একটা?

ফাইলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ধীরাপদ।

॥ উনিশ ॥

পরের দিন উৎসব।

আগের দিন সকাল থেকেই উৎসবের হাওয়া লেগেছে। কর্মচারীদের উদ্দীপনা প্রায় উত্তেজনার মতই। ধীরাপদর যতখানি মানসিক যোগ থাকার কথা আগামী দিনটার সঙ্গে ততটা নেই। বেলা তিনটে থেকে উশখুশ করছিল সে। পাঁচটা বাজলেই উঠবে। সোজা চারুদির বাড়ি যাবে। কদিনই যাবে যাবে করে গিয়ে উঠতে পারেনি। আজ পাঁচটা বাজলেই পালাবে। কিন্তু তার আগেই না বাড়ি থেকে বড় সাহেবের তলব আসে! কাল ভাষণ পাঠ করবেন তিনি। কাগজপত্র সব তাঁর টেবিলে গুছিয়ে রেখে এসেছে। শরীর ভালো থাকলে ভালো করে একবার পড়ে দেখবেন হয়ত। পড়লে নতুন করে আবার টনক নড়তে পারে। তখন ডাক পড়তে পারে।...আবার না-ও হতে পারে। ধীরাপদকে বড় বেশি বিশ্বাস করেন। দেখবেন না ভাবতেও অস্বস্তি, ধীরাপদ চায় দেখুন, পড়ুন। পড়ে যা করার তিনি নিজে করুন। সে আর ডাকাডাকি কাটাকুটি বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে মাথা গলাতে চায় না।

টেলিফোনে তলব একটা এলো। বড় সাহেবের ওখান থেকেও নয়, চারুদির বাড়ি থেকেও নয়। টেলিফোন রমণী পণ্ডিতের।

এক্ষুনি একবার সুলতান কুঠিতে আসতে হবে ধীরাপদকে। দিনেদুপুরে তার ঘরের তালা খুলে চোর ঢুকেছিল। চোর ধরা পড়েছে। একাদশী শিকদার দেখতে পেয়ে চেঁচামেচি করে উঠেছিলেন। চোরটা শুকলাল দারোয়ানের ঘরের পাশ

দিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। থানা অফিসার এখন ঘরের মালিকের এজাহার চান একটা, সব ঠিক আছে না কিছু খোয়া গেছে—তাঁকে জানিয়ে আসতে হবে।

কি ভেবে ধীরাপদ অমিতাভকে টেলিফোনে খবরটা দিল। সুলতান কুঠিতে তার ঘরে চোর ঢুকেছিল, ধরা পড়েছে, এখন পুলিসের টানা-হেঁচড়া—তাকে এক্ষুনি যেতে হচ্ছে। ধীরাপদর নিজের বিবেচনার ওপর আস্থা আছে। খবরটা জানিয়ে ভালো করেছিল। পরে নিজেই নিজের বুদ্ধির তারিফ করেছে।

চোর ঘরের তালা ভেঙেছিল বলে একটুও উতলা হয়নি সে। নেবার মত কি-ই বা ছিল! নেহাত বোকা চোর বলে তার ঘরে ঢুকেছে আর দুর্ভাগ্য বলে ধরা পড়েছে।

কদমতলার বেঞ্চিতে পাড়ার গুটিকয়েক মুখ চেনা ছেলে-ছোকরার সঙ্গে রমণী পণ্ডিত বসে। চুরি নিয়েই জটলা বোধ হয়। ওদিকে ঘরের সামনের বারান্দায় উমা দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে চট্ করে ঘরে ঢুকে গেল।

রমণী পণ্ডিতের উত্তেজনা কমেনি তখনো। তারই অপেক্ষায় ছিলেন হয়ত। তাড়াতাড়ি উঠে এসে চুরির বৃত্তান্ত ফেঁদে বসলেন। খুব রক্ষা হয়েছে। যোগাযোগ ছাড়া আর কি! নইলে একাদশী শিকদারের সেই মাসে একদিন সেজেগুজে বেরুবার দিনটা পড়বি তো পড় আজই গিয়ে পড়ল কেন? ফেরার মুখে ঘরে তালা না দেখে তিনি দরজা ঠেলেছিলেন। চোর তখন বাক্স ভেঙে কি কি নেওয়া যেতে পারে গোছগাছ করছে। শিকদার মশাই চোর চোর বলে আর্তনাদ করতে করতে ছুট। গণুবাবুও বাড়ি ছিলেন—তিনিও চেঁচামেচি করে চোরের পিছু ধাওয়া করেছেন। শুকলাল দারোয়ান চোরটাকে দু হাতে জাপটে ধরে ঘায়েল করেছে। গায়ে জোর আছে বটে লোকটার।···ছিঁচকে চোর! মোটেই না। গাঁট্টা-গোট্টা অবাঙালী চোর, নিশ্চয় আগেভাগে সব জেনে তৈরি হয়ে এসেছিল, নইলে ঘরের তালা খুলল কি করে?

ঘরে এখন পেল্লায় তালা ঝুলছে একটা। উমা চাবি হাতে দাঁড়িয়ে। সোনাবউদির তালা, তিনিই চাবি দিয়ে মেয়েকে পাঠিয়েছেন বোঝা গেল।

কি রে, কেমন আছিস?

কিন্তু উমা তার আপ্যায়নে ভুলল না। চাবি দিয়ে মুখ গোঁজ করে চলে গেল। তার রাগের হেতু আছে। প্রত্যেক শনিবারে আসার কথা, ক'টা শনিবার গেল ঠিক নেই।

চুরি কিছু যায়নি জানাই ছিল। তোরঙ্গটা ভাঙা, লণ্ডভণ্ড অবস্থা, এই যা।

ঘর বন্ধ করে পাশের ঘরে ঢোকার ইচ্ছে ছিল ধীরাপদর। কিন্তু রমণী পণ্ডিত তাকে থানায় টেনে নিয়ে চললেন। থানা অফিসার অপেক্ষা করছেন।

আসলে চুরি-পর্বের ফিরিস্তি দেওয়া শেষ হয়নি তাঁর। মজা পুকুরের ধার দিয়ে যেতে যেতে বললেন, চুরি তো চুরি, এদিকে কি কাণ্ড জানেন? একেবারে অবাক কাণ্ড—

ধীরাপদ উদ্‌গ্রীব। এদিক বলতে সোনাবউদির দিক ছাড়া আর কোন্ দিক? কিন্তু না, অন্যদিকই বটে। একাদশী শিকদারের দিক।

শুনল। সত্যি হলে অবাক কাণ্ডই বটে। চোর ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে কত লোক জুটে গিয়েছিল ঠিক নেই। তারপর কি মার—কি মার! সেই মার দেখলে গা ঘুলোয়। নাকমুখ দিয়ে গলগলিয়ে রক্ত বার হচ্ছিল লোকটার। একেবারে আধমরা না করে কেউ ছাড়ত না বোধ হয়। মার বন্ধ হল একাদশী শিকদারের জন্য। তার দিকে চোখ পড়তে সকলে অবাক। দু হাত মাথার ওপর তুলে নাচছিলেন তিনি। সত্যি নাচছিলেন না, কাঁপছিলেন। আর সকলকে মারতে নিষেধ করছিলেন। কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছিল না। রাগে ত্রাসে আতঙ্কে গোঁ-গোঁ শব্দ করছিলেন আর শূন্যের মধ্যে হাত ছুঁড়ছিলেন। সে মূর্তি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না নাকি।

সে মূর্তি না দেখুক, যতটা ধীরাপদ দেখেছে তাতেও অবাক। থানায় এজাহার দিয়ে ধীরাপদ ফিরে এসে দেখে কদমতলার বেঞ্চ-এ একা বসে একাদশী শিকদার তামাক খাচ্ছেন। ওকে দেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

রমণী পণ্ডিত কাজের অছিলায় নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। এখন আর এঁদের মধ্যে বাহ্যিক অন্তরঙ্গতাটুকুও আছে বলে মনে হল না। ফেরার পথেও রমণী পণ্ডিতের কালো মুখখানা অনেকবার কৌতূহলে চকচকিয়ে উঠতে দেখা গেছে। ধীরাপদকে জিজ্ঞাসা করেছেন, একটা অবাঙালী চোরের জন্যে এত দরদ ভদ্রলোকের···কি ব্যাপার বলুন তো?

চোখের সামনে আসুরিক মারধর দেখাটা সহ্য হয় না অনেকের। কিন্তু শিকদার মশাইকে দেখে কেমন যেন লাগল। ভদ্রলোকের সমস্ত শিথিল স্নায়ুর ওপর দিয়ে বড় রকমের ঝড় গেছে একটা। এখনো তার জের চলছে। শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারছেন না, শুকনো হাড় বার করা মুখের মধ্যে চোখের দৃষ্টিটা এখনো অস্বাভাবিক।

থানায় গেছলে?

হ্যাঁ, আপনার জন্যেই কিছু খোয়া যায়নি শুনলাম।

কানে গেল না বোধ হয়। জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটাকে দেখলে? একেবারে গেছে না বেঁচে আছে?

ধীরাপদকে দেখতে হয়েছে। থানা অফিসার দেখিয়েছেন। যদিই চেনা মুখ হয়। কুৎসিত-দর্শন মূর্তি, নাম ছোট্টু না কি—লোকটা গরাদের ওধারে মেঝেতে শুয়ে ধুঁকছিল। তার সামনেই থানা অফিসার আর একদফা জেরা করেছেন। ভাঙা বাংলা বলে। চাবি সারাইয়ের পেশা ছিল, ওতে পেট চলে না তাই এ রাস্তা ধরেছে।

...ওই লোকের জন্য ও-রকম দরদ খুব স্বাভাবিক নয় বটে। ধীরাপদ আশ্বস্ত করল, না, বেঁচেই আছে।

শিকদার মশাইয়ের ত্রাসের ঘোর কাটেনি। বিড়বিড় করে বললেন, কি মার মারলে ওরা লোকটাকে, দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যেত। মারের চোটে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, মাটিতে গড়াগড়ি করেছে—তবু মারছে। লোকে মেরে যে কি সুখ পায় এত বুঝিনে। আনন্দে কাড়াকাড়ি করে মারা...

দু চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল শিকদার মশাইয়ের, পরক্ষণে সেই ঘোলাটে চোখেই ক্রোধের আভাস দেখা গেছে।—আমিই তো চেঁচামেচি করে চোর ধরিয়েছি, তা বলে মারের বেলায় এত বীভৎস আনন্দ তোদের? এভাবে যারা মারতে পারে তারা কি খুব সাধু পুরুষ? বলো তো বাবা? তোরাই এমন মার মারবি যদি থানা পুলিস আছে কি করতে?

ধীরাপদ অবাক হচ্ছিল আর ভাবছিল, মানুষের ভিতর চিনতে তার অনেক বাকি এখনো।

সেই অমানুষিক মার দেখে শিকদার মশাইয়ের ভিতরটা ভালো ভাবেই নাড়াচাড়া খেয়ে থাকবে। বললেন, আমি থামাতে চেষ্টা করেছিলাম বলে ওই ওঁরা আবার আমার ওপরেই মারমুখী—ওই ঘরের গণুবাবু আর রমণী পণ্ডিত। গণুবাবুর কথা ছেড়েই দিলুম, তিনি চাকরি-বাকরি করছেন—কিন্তু রমণী অত সাধুগিরি ফলায় কি করে? তার কি করে দিন চলে কে না জানে? ওই গণুবাবুকেও তো ভালোমানুষ পেয়ে ভাঁওতা দিয়ে বশ করেছিস তুই!

শিকদার মশাইয়ের এ ধরনের কথাবার্তাই বেশি চেনা। রমণী পণ্ডিতের কি করে দিন চলে ধীরাপদর অন্তত জানা নেই—জানার বাসনাও নেই। আর, গণুদাকেও নিশ্চয় তেমন ভালোমানুষ মনে করেন না শিকদার মশাই—শুধু ধীরাপদর খাতিরে ওটুকু সতর্কতা অবলম্বন।

উমা আবার বাইরে এসে দাঁড়াতে ধীরাপদ তাড়াতাড়ি প্রস্থান করে বাঁচল।

উমার হাত ধরে ঘরে ঢুকে গেল।

ওধারের ছোট ঢাকা বারান্দায় বসে সোনাবউদি কেটলি থেকে চা ছাঁকছিল। এক নজর দেখে নিয়ে বলল, ওখানকার বাসিন্দেদের আদর-আপ্যায়ন শেষ হলে পাছে ধুলোপায়েই চলে যান সেইজন্তে মেয়েটাকে আবার পাঠালাম ডাকতে—

ধীরাপদর ইচ্ছা হল বলে, আজ রাতটার মতই এখানকার বাসিন্দা হয়ে থাকার বাসনা। বলা গেল না। সোনাবউদিকে অনেক সময় অনেক কথাই বলা যায় না। এদিকে উমারাণী মান-অভিমানের পালাটা তাড়াতাড়ি সেরে নেবার জন্ত ব্যস্ত। মা এসে বসলে তাকে উঠতে হবে জানে। বড়দের কথার মাঝে ছোটদের বসে থাকা নিষেধ। উমা মুখ মচকে বলল, এই তোমার প্রত্যেক শনি-রবিবারে আসা ?

তার ভাই দুটোও দুদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে। ধীরাপদ আগে তাদের আদর করল। তারপর গলা নীচু করে উমারাণীকে কৈফিয়ৎ দিতে বসল, কি ভয়ানক বিচ্ছিরি কাজের ঝামেলা চলেছে তার। সোনাবউদি চা আর খাবার দিয়ে গেল। খাবারের পরিমাণ প্রায় আপত্তি করার মতই। কিন্তু ভরসা করে আপত্তি করল না। সোনাবউদি দাঁড়াল একটু, তারপর ঢাকা বারান্দায় ফিরে গিয়ে ছেলেমেয়ের খাবার গোছাতে লাগল। হয়ত বা মেয়েটাকেই আর একটু গল্প করার অবকাশ দিল।

ধীরাপদ গল্প করছে। যেখানে থাকে সেটা বিচ্ছিরি জায়গা, আর লোকগুলোও দিনরাত কত খাটায় তাকে। গল্পের মাঝে ওদের মুখেও খাবার চালান করছে, নিজেও খাচ্ছে। নিজের দুঃখের ফিরিস্তি শেষ করে উমারাণীর পড়াশুনার খোঁজখবর নিতে লাগল। চোখ দুটো মাঝেমাঝেই ঢাকা বারান্দার দিকে ঘুরে আসছিল। সোনাবউদি ওদিক ফিরে হাতের কাজ সেরে রাখছে মনে হতে গলা খাটো করে উমাকে জিজ্ঞাসা করল, তোর বাবা কোথায় রে ?

উমা ঘাড় বাঁকিয়ে চট্ করে তার মাকে একবার দেখে নিল, তারপর প্রায় কানে কানে বলল, মায়ের ওপর রাগ করে অফিসে চলে গেছে…ভশ্চায মশায়ের চোরের ওপর মায়া দেখে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বাবা আর পণ্ডিতমশায় খুব হাসাহাসি কচ্ছিল আর কি বলাবলি কচ্ছিল, তাই শুনে মা বাবাকে ঘরে ডেকে যাচ্ছেতাই বকল আর বাবাও রাগ করে চলে গেল।

ধীরাপদ তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাতে চেষ্টা করল। জিজ্ঞাসা করল, তুই মারধর কেমন খাচ্ছিস আজকাল ?

জবাব দেওয়া হল না। সোনাবউদি ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়ের দিকে

চেয়ে ভুরু কোঁচকালো একটু, নালিশ হচ্ছে বুঝি ?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল।—না, আপনি আদর কেমন করেন আজকাল জিজ্ঞাসা করছিলাম।

কাকে ? সোনাবউদির দু চোখ তাকেই চড়াও করল।

ধীরাপদ থতমত খেয়ে হেসে ফেলল।

সোনাবউদির মুখে হাসির আভাস দেখা গেল কি গেল না। মেঝেতে বসল। মেয়েকে বলল, খেয়ে নিগে যা, ওদের নিয়ে যা—

এক কথা দুবার বলার দরকার হয় না। ছেলে দুটো পর্যন্ত দিদির সঙ্গ ধরে ঢাকা বারান্দার দিকে চলল। সোনাবউদি বলল, বাড়িতে চোর ঢোকাতে এই একটা মেয়েই খুশি হয়েছিল, ধীরুকা আসবে শুনেছে—

আর কোন অভিযোগ না, এতদিন না আসার দরুন কোনো ঠেসও না। তবু ধীরাপদ কৈফিয়ৎ নিয়ে প্রস্তুত মনে মনে।

সোনাবউদি ভালো করে চেয়ে দেখল এবারে।—তারপর, আছেন কেমন ?

একটুও ভালো না। কাজের চাপে—

সেসব তো মেয়েকে একদফা বললেন শুনলাম। ভালো না কেন, এতদিনেও সুবিধে-টুবিধে হল না একটু ?

ধীরাপদ হাসিমুখেই মাথা নাড়ল। হল না।

আপনার আর সুবিধে হবেও না কোনো কালে, ঠাণ্ডা মাটিতে গড়াগড়ি করেই কাটবে—আরো দু-চার দিন রাতদুপুরে চান-টান করেছেন নাকি ?

ধীরাপদর আচমকা দম বন্ধ হবার দাখিল। এ পর্যায়ের আক্রমণ হবে জানলে চুরি ছেড়ে ডাকাতি হয়েছে জানলেও আসত না। ওকে কথার বঁড়শীতে আটকে সোনাবউদি এতক্ষণে মুখ টিপে হাসল। রাতদুপুরে চান করে মাটিতে গড়াগড়ি করাটাই শুধু দেখেছে, না সেই এক দুর্বহ রাতে আরো কিছু তার চোখে পড়েছে, মনে হলে আজও মাটিরে সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে ধীরাপদর।

যাক, আর কি খবর বলুন ? সোনাবউদি জিজ্ঞাসা করল।

খবর নেই। আপনি কেমন আছেন ?

খুব ভালো।

কিন্তু ভালো মনে হচ্ছে না ধীরাপদর। হাল্কা কথাবার্তা সত্ত্বেও মুখখানা শুকনো লাগছে সোনাবউদির। শরীর বিশেষ করে মনের ওপর দিয়ে একটানা কোনো ধকল গেলে যেমন দেখতে হয়। এখন তেমন গম্ভীর না হোক, হাসি-খুশিও না। এক-এক সময় যেমন দেখত তেমনটি নয়। সে-ও এবারে সোজা-

স্থূজি নিরীক্ষণের ফাঁকে মন্তব্য করল, খুব ভালো লাগছে না।

সোনাবউদি নিজের প্রসঙ্গ এড়াতে চায়। চকিত অসহিষ্ণুতার অভিব্যক্তি একটু। ঠাট্টার সুরেই বলল, খুব ভালো না লাগাই ভালো।

কিন্তু ধীরাপদ জানতেই চায়। এতদিন বাদে এলেও সে বাইরের লোকের মত আসেনি, বাইরের লোকের মত চলেও যাবে না। সমাচার বুঝতে হলে গণুদাকে টানা দরকার। একটু আগে উমার ফিসফিসিনিও কানে গেছে কিনা কে জানে। সোনাবউদির কতদিকে ক'টা করে চোখ কান ধীরাপদ আজও হদিস পেল না। জিজ্ঞাসা করল, গণুদা কোথায়? তখন ছিলেন শুনলাম—

ছিলেন। আপনি আসছেন শুনে বেরিয়ে গেলেন। জবাবটায় আরো একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন বোধ করল হয়ত। বলল, যাবার আগে আপনি সেই বলে গিয়েছিলেন, একটা শনি-রবিবারে এসে ধরবেন, সে কথা বলে আমিও শাসিয়ে রেখেছিলাম।...তাই।

জবাব এড়ানো গেল, চোখের বার হলে মনের বার—সেই ঠেসও দেওয়া হল। অবতরণিকার উদ্দেশ্যটাই ভুল হয়ে গেল ধীরাপদর। সেই পুরনো বিস্ময়।...ঠোঁটের ডগায় এভাবে জবাব মজুত থাকে কি করে। আজও মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তা-ও নিরাপদ নয়। একটু আগে ভাইদের নিয়ে উমা বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ধীরাপদর ইচ্ছে হল তাকেই ডাকে। ডেকে সোনাবউদিকে বুঝিয়ে দেয়, সে হার মানল।

সোনাবউদির কাজের কথা মনে পড়ল যেন। বলল, এবারে আমাকে রেহাই দিন তো, আপনার ঘরে কি আছে নিয়ে-টিয়ে যান, আর ঘরটার কি ব্যবস্থা করবেন করুন—এর পর আবার কখন কি হয় ভয়ে বাঁচি নে।

মাথা নেড়ে ধীরাপদ সায় দিল। বলল, ভয়ে ভয়ে আপনাকে আধখানা দেখাচ্ছে—

মুখের চাপা শুকনো ভাবটা মিলোবার উপক্রম এতক্ষণে। হাসিটাও তাজা লাগছে। বলল, না আমার ভালো লাগে না, যা হয় ব্যবস্থা করুন।

ব্যবস্থা ঠিকই আছে, রমণী পণ্ডিতকে ও-ঘরে এসে থাকতে বলব ভেবেছি, পাশাপাশি থাকলে গণুদার সুবিধে হবে।

সোনাবউদি হেসেই ফেলল, বলল, আপনার যেমন বুদ্ধি, এতখানি চোখের ওপর থাকতে হলে সুবিধের বদলে চোখে অন্ধকার দেখবে দুজনেই।

মাথা নেড়ে ধীরাপদ সেই অসুবিধেটাও স্বীকারই করে নিল।—তাহলে গণুদাকেই থাকতে বলি।...সপ্তাহে আজকাল ঠিক কদিন করে ঘর থেকে

তাড়াচ্ছেন ভদ্রলোককে ?

আশা, এমনি লঘু কথাবার্তার ভিতর দিয়েই যদি নিভৃতের সমাচার কিছু বোঝা যায়। তার বোঝার অধিকার আছে, দাবি আছে। প্রায় আগের মতই লাগছে সোনাবউদিকে, চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছে তার দিকে।—আপনার সাহস তো কম নয় দেখি !

হবে না···কত বড় চাকরি করি ?

সোনাবউদি হাসতে লাগল। উন্নতি হয়েছে দেখছি। আপনি বড় চাকরি করেন তাতে আমার কী ?

হাসছে ধীরাপদও। এই হাওয়াটা আরো খানিকক্ষণ জিইয়ে রাখতে পারলে হয়ত সরাসরি খোঁজ নিতে পারত, গণুদা এখনো মদ খায় কিনা, গাঁজা খায় কিনা, জুয়া খেলে কিনা, রেসএ যায় কিনা। ওর দাবির দিকটা উপলব্ধি করানো গেলে সোনাবউদি নির্দ্বিধায় বলত সব, বলে হাল্কা বোধ করত।

কিন্তু তা হল না। তার আগেই সোনাবউদির মুখের হাসি গেল। ঝুঁকে হঠাৎ দরজার দিকে তাকালো। দরজার ওধারে কেউ সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে। ধীরাপদও ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করল।···শাড়ির আভাস।

ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে সোনাবউদি ডাকল, কে ওখানে—এদিকে আয় !

রমণী পণ্ডিতের মেয়ে কুমু। দরজায় এসে দাঁড়াল।

ধীরাপদ অবাক। সেই কুমু···! পণ্ডিতের দিন চলে না, ভালোমত খেতে পায় না, কিন্তু মেয়ের চেহারায় তো দাক্ষিণ্যের ঘাটতি দেখছে না কিছু। এরই মধ্যে বয়সই বা কত হল সেই কুমুর ? শেষ কবে দেখেছিল ?···বাপের শাসনের তাড়নায় যেদিন ওর পায়ে মুখ গুঁজে কেঁদেছিল—সেই দিন। অনেক দিনই বটে। তারপর থেকে কুমু উবে গিয়েছিল তার চোখের সামনে থেকে। আজ আবির্ভাব। এই আবির্ভাবে জোরালো ঘোষণা আছে কিছুর। একদিন বাবার কাছে নালিশ করে বোকার মত যে হেনস্থা করা হয়েছিল তার, এটা যেন তারই জবাব।

কিন্তু আপাতত কুমুর মুখখানা শুকনো। সেটা কার ভয়ে ধীরাপদ অনুমান করতে পারে। সোনাবউদির দৃষ্টিটা সদয় নয় খুব।—ওখানে চোরের মত দাঁড়িয়ে কেন ? কি বলবি ?

শুকনো ঠোঁটের ওপর জিব বুলিয়ে কুমু আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল কোন প্রকারে।···ধীরুদা আজ থাকবেন কিনা বাবা জানতে পাঠালেন, তাদের ঘরে যদি একবারটি আসেন···বাবার কথা ছিল।

সোনাবউদির গলার স্বর একটুও নরম হল না, বরং আরো একটু কঠিন, ঝাঁজালো শোনালো।—বাবা জানতে পাঠালেন তো তোর এই কাঁদির মুখ কেন? কি জানার আছে জেনে যা—

নিরুপায় দু চোখ মেলে কুমু ধীরাপদর দিকে তাকালো শুধু। ধীরাপদরও হঠাৎ কি জানি কি হল। বিরস গম্ভীর জবাব দিল, আজ সময় হবে না, তাড়া আছে। আর একদিন শুনব।

কুমুর প্রস্থান। নিজের মেজাজের পরিবর্তনটা সোনাবউদি নিজেও টের পাচ্ছিল বোধ হয়। অসহিষ্ণু হাসিটুকুও ক্ষোভের মত। কিন্তু সে মাত্র মুহূর্তের জন্য। চোখ দুটো ধীরাপদর মুখে এসে থেমেছে আবার।—মেয়েটাকে অনেক দিন পরে দেখলেন বুঝি?

অর্থাৎ, কুমুর আবির্ভাবে ধীরাপদর নীরব অভিব্যক্তিটুকুও চোখ এড়ায়নি। ঘাড় নাড়ল। তাই।

কেমন দেখলেন? আলতো প্রশ্ন।

ভালই তো…। হাসি ঠিক নয়, হাসার চেষ্টা।

কিন্তু সোনাবউদি হাসছে না আর। গম্ভীর। মাথা নেড়ে সায় দিল আগে। তারপর বলল, মেয়েদের এ বয়েসটা ভালো লাগার বয়েস…ভালো লাগলে লোকে সেধে উপকার করতে এগোয়। আপনার দাদাও উপকার করছে, কোথায় কি বেতের ঝুড়ি আর বড় বড় কাগজের বাক্স বানিয়ে অভাবের সংসারে মেয়েটা মন্দ রোজগার করছে না শুনলাম। বাবা-মেয়ে সেজন্যে ভারী কৃতজ্ঞ আমাদের ওপর—

সটীক ভূমিকা শেষ হল। ধীরাপদর দৃষ্টিটা নিস্পৃহ, কান দুটো উৎকর্ণ।

তা এটুকুতে কি আর এমন উপকার, উপসংহারে এসে পৌঁছুল সোনা-বউদি, আপনি ইচ্ছে করলে এর থেকে অনেক বেশী উপকার করতে পারেন। …সেই আশাতেই হয়ত ভদ্রলোক নিজে না এসে মেয়ে পাঠিয়েছেন। কি বলেন শুনেই আসুন না হয়।

পরিহাস-ছোঁয়া কথাগুলিতে কৌতুকের ছিটে-ফোঁটাও নেই। ধীরাপদ চুপচাপ বসে। শকুনি ভটচায সে রাতে মারা গেলেন সেই সন্ধ্যায় পণ্ডিতের এই মেয়ের সম্বন্ধে একটা স্থূল আভাস ব্যক্ত করে ফেলেছিলেন একাদশী শিকদার। রমণী পণ্ডিতের খেদও ভোলেনি ধীরাপদ। বলেছিলেন, বাপের বয়সী গণুবাবু মেয়েটাকে একটু-আধটু সাহায্যের চেষ্টা করছেন, এতেও ওদের গাত্রদাহের শেষ নেই। ওই দুই বৃদ্ধের সন্দেহের বাস্তিক জানা ছিল, ধীরাপদ নিজেই ভুক্ত-

ভোগী। তবু, শোনার পর থেকে অস্বস্তি বোধ করেছিল। নিজের অগোচরে সেটা থিতিয়ে ছিল টের পেল। সেখানেই নাড়াচাড়া পড়ল।...মনে যা উঁকি-ঝুঁকি দেয় প্রথমেই, সেটা বিশ্বাস্য নয় নিশ্চয়। রমণী পণ্ডিত অতটা নির্বোধ নন। আর গণুদাও অতটা বেপরোয়া নয়। নিজের স্ত্রীটিকে বিলক্ষণ ভয়ই করে সে।

তবু সোনাবউদির এই উক্তিতে বিশ্বাস্য কিছু একটা আছেই। সোনাবউদির কথা একাদশী শিকদারের কথা নয়।

ওই ভালো-লাগা-বয়সের মেয়েকে গণুদা মাথা উঁচিয়ে সাহায্যের চেষ্টায় এগোলে সোনাবউদি হয়ত একটা কথাও বলত না। কিন্তু ভবিতব্যের সোনায় জাল বিছিয়ে লোকটাকে বশ করেছে রমণী পণ্ডিত, তাকে লোভাতুর কাপুরুষ বানিয়েছে—সোনাবউদির এখানেই ভয়, এখানেই যাতনা।

আপনার তাড়া আছে বলছিলেন, কোথায় যাবেন? উঠে ঘরের কোণ থেকে হারিকেন নিয়ে মুছতে মুছতে সোনাবউদিই সচেতন করল তাকে। উমা আর ছেলে দুটো দোরগোড়ায় উঁকি দিচ্ছে। বাইরে দিনের আলোয় টান ধরেছে। ঘরের ভিতরটা আরো আবছা।

ধীরাপদ আর একবার চেষ্টা করে দেখবে ঘরের এই বাতাস ফেরানো যায় কিনা? খানিক আগে তো পেরেছিল, সোনাবউদির মুখে হাসি দেখেছিল। বলল, চারুদির ওখানে যাব একবার...চারুদির কিন্তু ভয়ানক ভালো লেগেছে আপনাকে, খুব প্রশংসা করেন।

চিমনি টেনে সোনাবউদি হারিকেন জ্বালল। তারপর চিমনিটা ঠিকমত বসাতে বসাতে নিরুৎসুক জবাব দিল, প্রশংসা করলে আপনি খুশি হবেন ভেবেছেন বোধ হয়, নইলে প্রশংসার আছে কি।

না, আজ আর কিছু হবে না। ধীরাপদ উঠে পড়ল। দরজার দিকে চেয়ে উমাকে ডাকল, তোরা বাইরে কি করছিস, ভেতরে আয়। আজ আর ঘরের বাতাস ফিরবে না। ওরা ভিতরে এলেও না। ঘরে একটা ছেড়ে দশটা লণ্ঠন জ্বাললেও সেটা দিনের আলো হবে না। কিন্তু এভাবেও চলতে পারে না। ধীরাপদ আর একদিন আসবে। আর একদিন চেষ্টা করবে। খুব শিগগীরই আর একদিন।

চারুদির বাড়ির দিকেই চলেছে। কিন্তু সুলতান কুঠি থেকে মনটাকে ফেরানো সহজ হচ্ছিল না। ফেরানো দরকার। ওখানে যেতে হলে এখন কিছুটা মানসিক

প্রস্তুতি দরকার।

বড় সাহেব আর চারুদির কথামত ধীরাপদ অমিত ঘোষের মতি-গতি খানিকটা ফেরাতে চেষ্টা করেছিল। মাঝখানে ফিরেও ছিল অনেকটা। ভাগ্নের সেই পরিবর্তনের আভাস পেয়ে বড় সাহেব খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু চারুদির খুশি হবার কথা নয়। পার্বতীরও নয়।

ধীরাপদ নিজেই কি খুশি হয়েছিল?

বিশ্লেষণের এই বাঁকা অনুভূতিটা তাড়াতাড়ি ঠেলে সরিয়ে দিল। চারুদির ওখানে যাচ্ছে সে, এর মধ্যে পার্বতীর কথাও ভাবতে রাজি নয়। ভাবলে অস্বস্তি। কিন্তু চারুদির ওখানেই বা যাচ্ছে কেন? কি শুনতে, কি বুঝতে? কদিন ধরে চারুদির সঙ্গে দেখা করার তাগিদের উদ্দেশ্যটাও এখন অস্পষ্ট হয়ে আসছে কেমন।

অমিতাভ ঘোষের এ কদিনের মেজাজের খবর জানলে চারুদি একটু খুশি হতেন হয়ত।...পার্বতী? পার্বতীর কথা থাক্।

'শি ইজ মোস্ট্ চার্মিং হোয়েন শি ইজ্ অন্ ট্যু বোট্‌স'—লাবণ্য সরকার প্রসঙ্গে অমিত ঘোষের কৌতুকোচ্ছল মন্তব্য একদিনের। তানিস সর্দারকে হাসপাতালে দেখে আসার পর যেদিন সুলতান কুঠিতে সে ধীরাপদর ঘরে এসে বসেছিল, সেইদিন বলেছিল। অবচেতন মনের সঙ্গে যোগ থাকলে কথা হারায় না। অনেক দিন আগের উক্তিটা মনে পড়ে গেল।

—কিন্তু দু নৌকো না তিন নৌকো? বড সাহেবকে গোটাগুটি বাদ দেবে? বিচার বিবেচনা করলে বাদ দেওয়াই উচিত। ছেলেকে আগলে রেখে প্রশ্রয়টা তিনি ভাগ্নেকেই দিতে চান, সে আভাস ধীরাপদ খুব ভালো করেই পেয়েছে। তবু জটিলতার অবসান হয় না কেন? মনের তলায় ঠিক কি পুষছেন বড় সাহেব?

চারুদির মুখখানা ভিজে ভিজে। একটু আগে জল দিয়ে এসেছেন বোধ হয়। সামনের দিকের কয়েক গোছা লালচে চুল এখনো কপালের সঙ্গে লেপটে আছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল না দিলে চারুদির মাথা গরম হয়ে যায়।...নিজেই বলেছিলেন। কিন্তু মুখ দেখে মনে হয়, মাথা গরম হবার মত সত্য কিছু কারণ ঘটেছে। চারুদির লালচে মুখে বিরক্তি-ঘেঁষা গাম্ভীর্যের ছাপ পড়লে এখনো দেখায় বেশ। হাসি ভাঙলে অত ভালো দেখায় না।

খাটে পা ছড়িয়ে আধাআধি শুয়েছিলেন, উঠে বসলেন। আজ এ সময়ে ওকে আদৌ আশা করেন নি। তবু অন্য দিনের মত খুশি বা অভিযোগের উচ্ছ্বাস

নেই। ডাকলেন, এসো—

ঘরের কোণ থেকে ইজিচেয়ারটা খাটের মুখোমুখি টেনে নিয়ে ধীরাপদ বসল। —এ সময়ে শুয়ে যে?

বললেন, মাথাটা ধরে আছে সেই থেকে।

খাবারের তাগিদ এড়ানোর জন্তে হোক বা যে কারণেই হোক দোকান থেকে ছুটো পান কিনে চিবুতে চিবুতে এসেছে ধীরাপদ। মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে চারুদি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সেই কুঠি-বাড়ি থেকে আসছ বুঝি··· সেখানে কি চুরি হয়েছে তোমার?

ধীরাপদ থমকালো।—চুরি হয়নি, চোর ধরা পড়েছে। তোমাকে কে বললে?

জবাব না দিয়ে চারুদি এবারে ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করলেন, কাল তোমাদের সেই ব্যাপার অথচ তুমি এদিকে ঘোরাঘুরি করছ···পালিয়ে বেড়াচ্ছ নাকি?

পান গলায় আটকানোর দাখিল। দৃষ্টিটা ধাক্কা খেয়ে সজাগ হল। বিকেল পর্যন্ত তো সেখানেই ছিলাম, পালাবো কেন?

বিশদ বাক্যালাপের মেজাজ নয় আজ চারুদির, খানিক চুপ করে থেকে শুধু কথা জিইয়ে রাখার মত করে বললেন, কর্মচারীদের এবারে অনেক কিছু দিয়েছ আর ভবিষ্যতে আরো অনেক কিছু দিচ্ছ শুনলাম?

সহজতায় চিড় খেয়েছে, পান চিবুনো থেমেছে ধীরাপদর। চারুদি এত সব শুনলেন কোথায়? হিমাংশু মিত্র এসেছিলেন? সেদিন অমিতাভ ঘোষ বলেছিল, লাবণ্যর কড়াকড়িতে মামার অফিস বন্ধ হলেও একেবারে ঘরে বসে থাকেন না তিনি। আজও এসেছিলেন? ধীরাপদর ভিতরটা তিক্ত হয়ে উঠল, বলল, আমি দেবার কে? আমি শুধু লিখেছি—ইচ্ছে হলে দেবেন, ইচ্ছে না হলে ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। অপেক্ষা করল একটু, তারপর হাল্‌কা সুরে বলে বসল, তোমাকে এমন ভার ভার দেখছি কেন—অনেক দেওয়া হয়ে গেল সেই চিন্তায়?

চারুদি চুপচাপ বসে। এ আলোচনায় আর তাঁর কোনো আগ্রহ আছে বলেও মনে হল না। একটু বাদে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বড় সাহেবের শরীর কেমন এখন?

আবারও হেঁয়ালির মধ্যে পড়ে গেল ধীরাপদ। বড় সাহেব সশরীরে এখানে আসেন নি তাহলে। এলে চারুদি শরীরের খোঁজ নিতেন না। কিছু বলার আগে তাঁর কথা থেকেই দুর্বোধ্যতার হদিস মিলল। বললেন, বাড়ি থেকে আজ বেরিয়েছেন শুনে কারখানায় অমিতকে টেলিফোন করেছিলাম—ও ছেলের কথা

থেকে কি কিছু বোঝার উপায় আছে ?

অনেকক্ষণের একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস মুক্তি পেয়ে বাঁচল। কিন্তু অফিস থেকে ওর পালিয়ে বেড়ানোর কথাটা কেন বললেন চারুদি বোঝা গেল না। অমিতাভই কিছু বলে থাকবে। বাড়ির চুরির খবরও।

প্রেসার তো চড়েই আছে সেই থেকে, চিকিৎসার কি হচ্ছে ? ভালো ডাক্তার এনে দেখাচ্ছ না কেন ?

চারুদির মুখখানা বিরস দেখাচ্ছে আরো। জলের দাগ গেছে, কিন্তু মাথা খুব ঠাণ্ডা মনে হয় না। আর সেটা এই অসুখের দুশ্চিন্তার দরুনই নয় বোধ হয়। ঠোঁটের ডগায় একটা রূঢ় জবাব এসে গিয়েছিল ধীরাপদর। পার্বতী বলেছিল, অমিতবাবুর মন না পেলে মায়ের কাছে আপনার কোনো দাম নেই। কথাটা ভোলবার নয়। বলতে যাচ্ছিল, এটাও আমার ডিউটির মধ্যে নাকি ?

বলল না। তার বদলে নির্লিপ্ত মন্তব্য করল, প্রেসারের আর দোষ কি, বাড়িতে যে ব্যাপার চলেছে, ডাক্তার কি করবে।...

চারুদি সোজা হয়ে বসলেন আস্তে আস্তে। গাম্ভীর্যের সঙ্গে আগ্রহের এই সুচারু মিশেল ন বছরের ছোট ধীরাপদর চোখেও প্রায় চিত্তাকর্ষক।—বাড়িতে কি ব্যাপার চলেছে ?

একদিকে ছেলে আর একদিকে ভাগ্নে—কোন্ দিক সামলাবেন ভদ্রলোক ?

কি হয়েছে ? অসহিষ্ণু তাড়া চারুদির।

কি হয়েছে রয়ে-সয়ে অতঃপর তাই ব্যক্ত করল ধীরাপদ। চারুদিকে জেরা করার অবকাশ দিয়ে দিয়ে কর্তার সঙ্গে ছেলে আর ভাগ্নের কদিনের বোঝা-পড়ার চিত্রটা সবিস্তারেই সম্পূর্ণ করল সে। ছেলের প্রসঙ্গেই বেশি বলল। রাত-দুপুরে তার অমিতাভর ঘরে মীমাংসা করতে আসা বা ওর ঘরে সুপারিশের আশায় আসাটাও অনুক্ত থাকল না।

হঠাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল যেন চারুদির। সরোষে বলে উঠলেন, এতটা বিগড়েছে দেখেও ওদিকে বসে আছে কোন্ ভরসায় ? বিয়েটা দিয়ে দিলেই তো হয়—ছেলে তো খোকা নয় যে কথামত উঠবে বসবে ?

লালচে মুখে লালের কারুকার্য দেখছে ধীরাপদ। দেখা শেষ করে নিরুৎসুক মন্তব্য করল, খোকা ভাগ্নেও নয়।...তাঁর বিশ্বাস বিয়েটা দিলে গণ্ডগোল বাড়বে আরো।

কিসের গণ্ডগোল ? বেখাপ্পা রাগ চারুদির, বিয়ের পরেও ভাইয়ের বউকে ধরে টানাটানি করবে ভেবেছে ?

ধীরাপদ হাসেনি। তেমনি সাদা মুখ করেই বলল, তার থেকেও খারাপ কিছু হতে পারে। তাছাড়া, এমনিতেও ছেলের বিয়ে এখানে দেবার ইচ্ছে তাঁর নেই।...আর ছেলের জন্তে উনি তেমন উতলাও নন বোধ হয়, তাঁর ভাবনা ভাগ্নেকে নিয়ে। আর তোমাকে নিয়ে।

রাগের মুখেই চারুদি থতমত খেয়ে উঠলেন একদফা। জোড়া ভুরু কুঁচকে গেল। সপ্রশ্ন প্রতীক্ষা।

সেদিন বলছিলেন, তোমার দিদি একটু বুঝে চললে কবে সব গণ্ডগোল মিটে যেত। তুমিই নাকি উল্টো রাস্তায় চলেছ।

চারুদির দৃষ্টিটা একটু একটু করে স্থির হয়ে বসছে ধীরাপদর মুখের ওপর।—কবে বলেছেন?

এই তো সেদিন—ধীরাপদর নিরীহ বিস্ময়, কিন্তু কি ব্যাপার বলো তো—তুমি কি করতে পারো?

খানিক গুম হয়ে থেকে অস্ফুট ঝাঁজালো জবাব দিলেন, ওই মেম-ডাক্তারের সঙ্গে ভাগ্নের বিয়ে দিয়ে তাঁকে ষোল আনা নিশ্চিন্ত করতে পারি, আর কি পারি! দিলেই তো পারে বিয়ে, কে আটকে রেখেছে?

আটকে কে রেখেছে সেটা এত স্পষ্ট করে ধীরাপদ আর কখনো বোঝেনি। আজ এই চারুদিকে দেখে লাবণ্য সরকারের নৌকো থেকে হিমাংশু মিত্রকে নিঃসংশয়েই বাদ দেওয়া যেতে পারে।

সমস্ত ক্ষোভের একেবারে গোড়ায় নাড়া পড়েছে যেন চারুদির। এর পরেও চট্ করে থামেন নি তিনি। ধীরাপদই দেয়নি থামতে। তার একটুখানি সংশয় বা একটুখানি বিস্ময় অথবা এক-আধটা অসংলগ্ন প্রশ্ন সেই ক্ষোভের মুখে অনুপানের কাজ করেছে।

ধীরাপদর চোখের সমুখ থেকে সব অস্পষ্টতা ঘুচে গেছে। যেটুকু জানতে বাকি ছিল জানা হয়েছে, যেটুকু বুঝতে বাকি ছিল বুঝে নিয়েছে।

যে কারণে চারুদির এত বিদ্বেষ লাবণ্য সরকারের প্রতি, ঠিক সেই কারণেই হিমাংশু মিত্রের এত সুনজর তার ওপর। যে কারণে চারুদি তাকে চান না, ঠিক সেই কারণেই হিমাংশু মিত্র চান তাকে। যে কারণে চারুদি অমিতাভ ঘোষের সমুখ থেকে লাবণ্য সরকারকে মুছে দিতে চান, ঠিক সেই কারণেই ওই মেয়ের কাছ থেকে নিজের ছেলেকে সরিয়ে রাখার সঙ্কল্প হিমাংশু মিত্রের। যে উদ্দেশ্যে চারুদি পার্বতীকে এগিয়ে দিয়েছেন, সেই একই উদ্দেশ্যে বড় সাহেব লাবণ্য সরকারকে এগিয়ে দিতে চান। ছেলে আছে বড় সাহেবের,

আর তার সঙ্গে নাড়ির যোগও আছেই। প্রাকৃতিক বিধানে সেই যোগ বুক-জোড়াও বটে। কিন্তু এই ভাগ্নেও কম নয় তাঁর কাছে। সে চোখের মণি। এত আস্থা, এত প্রত্যয় বড় সাহেবের আর বোধ হয় কারো ওপরে নয়। ছেলের ওপরে তো নয়ই। কারো কথায় নয়, ধীরাপদ নিজেই সেটুকু অনেকদিন অনুভব করেছে।

এই ভাগ্নেটিকে হারাতে চান না বড় সাহেব। কিন্তু হারাবার লক্ষণ দেখছেন। লাবণ্য সরকার তাঁর হাতের মুঠোয়। সেই মেয়ে যার ওপর দখল নেবে, সে কত আর দূরে সরবে? বুদ্ধিমতী জোরালো মেয়ে লাবণ্য সরকার। ওই অসহিষ্ণু, অস্থির-চিত্ত ভাগ্নের সঙ্গে জুড়ে দেবার মতই বুদ্ধিমতী আর জোরালো ভাবেন তিনি। সেটা সম্ভব হলে বিচ্ছেদের আশঙ্কা ঘোচে তাঁর, ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সুনির্বিঘ্ন হবে মনে করেন।

···পার্বতী টোপ। লাবণ্য সরকার শেকল। চারুদির এই খর-মূর্তির সন্নিধানে বসেও হাসি পাচ্ছে ধীরাপদর। অমিতাভ ঘোষ টোপ গিলবে, না শেকল পরবে?

একটানা বকেছেন চারুদি। এখন একটানা চুপ। ধীরাপদ উঠবে কিনা ভাবছিল। চমক ভাঙার মতই তপ্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন চারুদি, তুমি এই মেয়েটার একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারো? কত জায়গায় তো ঘোরো-টোরো—

এই মেয়েটার অর্থাৎ পার্বতীর। ধীরাপদ বুঝেছে। বুঝেও বিমূঢ় হয়ে চেয়ে আছে। এতক্ষণের মধ্যে এই একজনকে নিভৃত মন থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও সরাতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। আসার সময়ে দেখেনি তাকে। না দেখে স্বস্তি বোধ করেছে। আর এ পর্যন্তও সাক্ষাৎ মেলেনি। কিন্তু এই বাড়িতে পার্বতীর অগোচর অবস্থানও ভোলবার নয়। কোনো একটা ঘরে আছে। চুপচাপ বসে আছে, নয়তো নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে কাজ করছে কিছু। কিন্তু তার দৃষ্টি-দর্পণ থেকে নিজেকে ধীরাপদর খুব বেশি দূরে মনে হয়নি।

পার্বতীর কথা বলছ?

আর কার? আর কার কাছে এত অপরাধ করেছি? আসল বক্তব্যটাই ভুলে গেলেন যেন চারুদি, ঈষৎ আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকলেন একটু। গলার স্বর নামিয়ে বললেন, আচ্ছা, তুমি তো এতদিন দেখছ, তোমার কখনো পথের মেয়ে বলে মনে হয়েছে ওকে? কোনদিন মনে হয়েছে?

ধীরাপদ ফাঁপরে পড়ে গেল। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালো একবার। চারুদি জবাবের আশায় উদ্‌গ্রীব, যেন এই জবাবের ওপর অনেক

কিছু নির্ভর করছে।

মাথা নাড়ল, না। তা মনে হতে যাবে কেন?

এটুকুতেই উৎসাহ বোধ করলেন চারুদি, কেন হবে বলো তো? এইটুকু থেকে আমার কাছে আছে, ওর গায়ে এখনো সেই দাগ লেগে আছে, না ও এখন যা তাই? ক্ষোভের মুখে ঢালা প্রশংসা শুরু করে দিলেন পার্বতীর, লেখাপড়াই শেখেনি খুব একটা, নইলে অমন স্বাস্থ্য, অমন স্বভাব, অমন বুদ্ধিমতী কাজের মেয়ে ক'টা দেখেছ? হাঁ করলে কি চাও বুঝে নেয়। ও একাই কতটা তোমার ধারণা নেই। অমিতের ভরসায় বসে থাকলে এই এত বড বাড়িটাও শেষ পর্যন্ত উঠত কিনা সন্দেহ—ও কোমর বেঁধে দাঁড়াতে তবে উঠল।

ধারণা না থাকুক, ধীরাপদ ধারণা করে নিতে পারে। আর চারুদির থেকেও বেশি ছাড়া কম পারে না হয়ত। চুপচাপ খানিক অপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কি হয়েছে, পার্বতীর কি ব্যবস্থা চাও?

ব্যবস্থার প্রসঙ্গটা রোষের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয় বোঝা গেল। বিরক্তির আঁচ লাগল আবার, বললেন, কি ব্যবস্থা জানলে তো আমি নিজেই করতাম, তোমাকে বলতে যাব কেন? উম্মার ঝাপটা এবারে আবার পার্বতীর ওপরেই এসে পড়ল।—নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে না ওর? নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে না? আমার ওপর ভরসা কতটুকু? আমাকে বিশ্বাস কী?

ধীরাপদর মুখে কথা নেই। চুপচাপ বসে দেখছে। এই কি সেই পদ্মাপারের আগুনপানা মেয়ে চারুদি? এই অসহায় চারুদি যে কাঁদতে পেলে বাঁচে!

কি যে বলছেন নিজেরই হুঁশ নেই বোধ হয়, কার ওপর রাগ ঠাওর করা শক্ত। পরক্ষণে এই তপ্তমুখেই উল্টো কথা। বললেন, ওরই বা দোষ কি, কি নিয়ে থাকে—। সেই কবে নার্সিং-ফার্সিং পাস করা হয়ে যেত এতদিনে, কদিন আমার সঙ্গে ঝকাঝকি করে শখ করে তো ঢুকেছিল গিয়ে—ছেলে তাকে ছাড়িয়ে-ছুড়িয়ে এনে তবে নিশ্চিন্ত। লেখাপড়া শেখাবে, পরীক্ষায় পাস করাবে—একেবারে ডাক্তার বানিয়ে তবে ছাড়বে। সব করেছে!

বড় করে দম ফেললেন একটা। কিন্তু দাহ নিঃশেষ হল না তাতেও। ক্ষুব্ধ মন্তব্যের মত শোনালো শেষটুকু।—যমের মুখ থেকে টেনে হিঁচড়ে ফিরিয়ে এনেছিল, চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। একটু কৃতজ্ঞতাবোধ যদি থাকত!

উপসংহারটুকু অমিতাভ ঘোষের সেই বিগত অসুখ প্রসঙ্গে। সবটা জুড়লে চারুদির মর্মদাহের একটা চিত্র এবারে দাঁড় করানো যায় বোধ হয়।

সে অবকাশ পেল না।

চারুদির রুক্ষ দৃষ্টি অনুসরণ করে চকিতে দরজার দিকে ঘাড় ফেরাল ধীরাপদ। ...পার্বতী। তার হাতে খল-নুড়ি। খলে কিছু একটা ঘষতে ঘষতে মন্থর পায়ে ঘরে ঢুকল।

নিষ্পলক কয়েকটা মুহূর্ত, চারুদি যেন জ্যান্ত ভস্ম করলেন তাকে। তারপর রাগে ফেটে পড়লেন একেবারে।—কি ওটা? কে তোকে আনতে বলেছে? রোজ আমি এ সময়ে স্বর্ণসিন্দুর খাই যে বলা নেই কওয়া নেই আমার জন্যে স্বর্ণসিন্দুর মেড়ে নিয়ে এলি? আমার মাথা গরম হয়েছে মামাবাবুকে তাই বোঝাতে চাস—কেমন?

পার্বতী খাটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে খলের ওপর নুড়িটা ঘষছে—ঘষাটুকু শেষ হলে হাতে দেবে।

চারুদির দিকে চেয়ে প্রমাদ গুনছে ধীরাপদ। উঠে দু ঘা বসিয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয় বুঝি। কিন্তু হঠাৎ সুর বদলালো একটু চারুদির, যে প্রস্তাব করলেন শুনে ধীরাপদও বিমূঢ়।

এত মেজাজের কি হয়েছে তোদের? সারাক্ষণ এত মেজাজে ফুটছিস কেন? কি দোষ করা হয়েছে তোর কাছে মামাবাবুকে বল্—যা তোর মনে আছে সব বল্—ও কারো দিকে টেনে বলার লোক নয়, শুনে বলুক কি অপরাধ করেছি আমি। মুখ বুজে আছিস কেন, বল্?

মুখ বুজে থাকল না পার্বতী। খলের ওপর নুড়িটা থামল। ধীরাপদর দিকে তাকালো। বলল, আপনাকে চা দেব?

ধীরাপদ ব্যতিব্যস্ত। না না, এই একটু আগে চা খেয়েছি—

খলের ওপর নুড়ি নড়ল। চারুদি অগ্নিমূর্তি আবারও।—ওটা এখানে রাখবি তো আছড়ে ভাঙব আমি বলে দিলাম! যা, দূর হ এখান থেকে!

ঘষা শেষ হয়েছে। মুখ তুলে পার্বতী শিথিল দৃষ্টিটা চারুদির মুখের উপর একবার বুলিয়ে নিল। পাশের ছোট টেবিল থেকে একটা চকচকে বিলিতি সাপ্তাহিক তুলে তাঁর সামনে বিছানায় রাখল। তার ওপর খল-নুড়িটা। ঘরের কোণের কুঁজো থেকে আধ গ্লাস জল গড়িয়ে সেখানে রেখে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

ধীরাপদ চিত্রার্পিতের মত বসে।

চারুদির ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করল, তারপর ওর দিকে ফিরল। অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, দেখলে আস্পর্ধাটা?

ধীরাপদ দেখেছে। আর কিছু বুঝেওছে। বর্ণসিন্দুর দিয়ে চারুদির মাথা গরম হয়েছে তাই শুধু বলে গেল না। ওকেও নিষেধ করে গেল কিছু। সচেতন করে দিয়ে গেল। বসে বসে কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার শোনার কৌতূহলের ওপর একটা নীরব ভ্রূকুটি ছড়িয়ে গেল।

চারুদির লালচে মুখ কাঁদ-কাঁদ দেখাচ্ছে এখন। ভগ্ন বিকৃতকণ্ঠে বলে উঠলেন. ভালো কারো করতে নেই, বুঝলে? ভালো করার এই ফল—সেই দশ বছর বয়েস থেকে মেয়ের মত এত বড় করেছি আর আজ আমিই ওর শত্রু—আমাকেও শত্রু ভাবে, মা ভাবে না।

চারুদির ওপর ধীরাপদর মনটাও অনেকদিন ধরেই প্রসন্ন ছিল না। কিন্তু এই অসহায় স্নায়ু-তপ্ত-মূর্তির দিকে তাকিয়ে আঘাত দিতে মায়া হয়। তবু চুপ করে থাকা গেল না একেবারে। বলল, ও হয়ত মা-ই ভাবে…তুমি ওকে মেয়ে ভাবো কিনা সেখানেই হয়ত সন্দেহ ওর।

বিষম থতমত খেয়ে থমকে চেয়ে রইলেন চারুদি। সন্দিগ্ধ দুই চক্ষু ধীরাপদর মুখের ওপর আটকে থাকল খানিকক্ষণ।—তোমাকে ও বলেছে কিছু?

পার্বতীকে এ প্রসঙ্গ থেকে তফাতে রাখতেই চেষ্টা করল ধীরাপদ। আরো শান্তমুখে জবাব দিল, ও কতটা কি বলার মত মেয়ে তুমি ভালই জানো।…শুধু ওকে দেখছি না, তোমাকেও তো এই ক-বছর দেখছি, খুব ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেই দেখ না এ রকম হচ্ছে কেন, তোমার যত কিছু ভাবনা-চিন্তা ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব কাকে নিয়ে, কার জন্যে। এতকাল ধরে আছে তোমার কাছে, তোমার এত টাকা পয়সা বাড়ি-গাড়ি—এর মধ্যে বড় রকমের কোথাও ঘা না খেলে ও নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে কেন?

চারুদির মুখখানা আর লালচে দেখাচ্ছে না একটুও। ফ্যাকাশে পাংশু দেখাচ্ছে। চেয়ে আছেন তার দিকেই, কিন্তু ও চোখে আর তাপ নেই একটুও। একটু আগের ওই উষ্ণ মূর্তি থেকে জীবনের নির্যাসটুকু যেন ছেঁকে নেওয়া হয়েছে।

কতক্ষণ কেটেছে ধীরাপদরও খেয়াল নেই। চারুদি সচকিত হলেন হঠাৎ। ভুরুর মাঝে কুঞ্চনরেখা পড়ল দু-একটা। কি ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বড় সাহেব সেই কানপুরের মিটিংয়ে কবে যাচ্ছেন?

প্রশ্নের তাৎপর্য বোঝা গেল না।—চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই যাওয়ার কথা।

এই শরীরে যেতে পারবেন?

ধীরাপদ হাসতে চেষ্টা করল। বলল, না পারলে শরীর আরো বেশি খারাপ হবে।

চারুদি আবার নীরব কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর বললেন, আচ্ছা আজ এসো তুমি, ক্লান্ত লাগছে—

এ রকম কথাও ধীরাপদ এই প্রথম শুনল। যখনই এসেছে, চারুদি ধরে রাখতেই চেয়েছেন।

কিন্তু সে-ও ওঠার তাগিদ উপলব্ধি করছিল। বাইরের ঘরের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। ঘুরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকালো একবার। আসার সময় পার্বতীকে না দেখে স্বস্তি বোধ করেছিল। কিন্তু ফেরার সময় উৎসুক দৃষ্টিটা তাকেই খুঁজছিল। দেখা হলে ধীরাপদ কি বলত, জানে না। কিছু বলত কিনা তাও না—তবু মন চাইছিল দেখা হোক। বাইরের ঘরে এসে আর এক-বার দাঁড়াল। এখানেও নেই। থাকবে না জানা কথাই। কোনো একটা ঘরে আছে। চুপচাপ বসে আছে, নয়তো নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে কাজ করছে কিছু। কিন্তু এবারে তার দৃষ্টি-দর্পণ থেকে নিজেকে অনেকটাই দূরে মনে হচ্ছে ধীরাপদর।

॥ কুড়ি ॥

ভাষণে আদর্শ বাণিজ্য-স্বপ্নটি বিস্তার করছেন হিমাংশু মিত্র। সভা উন্মুখ শান্ত। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অনাগত আশার ভিত রচনায় মগ্ন বড় সাহেব। সকলের সব আগ্রহ আর উদ্দীপনা বুকের কাছটিতে এসে থেমে আছে। এখন শুধু শোনার পালা। শোনা শেষ হলে গোনা শুরু হবে। বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হবে। এখন গুনছে না কেউ, শুধু শুনছে।

একমাত্র ধীরাপদ গুনছে। দূরে এক কোণে দাঁড়িয়ে একটা একটা করে শব্দ গুনছে, প্রতিশ্রুতি গুনছে। স্তব্ধ, উন্মুখ বোধ করি সে-ই সব থেকে বেশি।

ভাষণ আর বিবৃতি আজ পর্যন্ত অনেক লিখে দিয়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে শোনা এই প্রথম। ঈষৎ ক্লান্ত দেখাচ্ছে বড় সাহেবকে, রেশমের মত অবিন্যস্ত সাদা চুলের গোছা থেকে থেকে সামনে এসে পড়ছে, আর আপনিই সরে যাচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেও সুন্দর আর সবল লাগছে তাঁকে। ধীরাপদর অন্তত লাগছে। বেশ মৃদু অথচ গম্ভীর, স্পষ্ট পরিপুষ্ট গলা। কান পেতে শোনার মত। ধীরাপদ কান পেতেই শুনছে। শুনছে আর শুনছে। শুনছে, শুনছে, আর বিস্মিত হচ্ছে।

এই বয়স পর্যন্ত কোনো একটা গোটা বক্তৃতা ধীরাপদ শোনেনি বোধ হয়।

সকৌতুকে বরং শ্রোতাদের দেখেছে চেয়ে চেয়ে। যারা আসে শুনতে অথচ আসলে চায় অবাক হতে, মুগ্ধ হতে। কিন্তু আজ ধীরাপদর সমস্ত চেতনা বুঝি তার শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে। আর কে কি ভাবে শুনছে, কে কেমন অবাক হচ্ছে বা মুগ্ধ হচ্ছে, জানে না। আজ ধীরাপদ নিজেই শুনছে আর অবাক হচ্ছে আর মুগ্ধ হচ্ছে। যে বিবৃতির প্রতিটি অক্ষর প্রতিটি শব্দ প্রতিটি ব্যঞ্জনা প্রতিটি যতি তার চেনা, তার জানা। নিজের রচিত স্বপ্নজালে তার অন্তত আচ্ছন্ন হবার কথা নয়। তবু।

যা সে শুনছে, তা সে শুনবে বলে আশা করেনি। কারণ এই সকালেই আরো কিছু শুনেছিল সে।

অমিতাভ বলেছিল। আর কারখানার বুড়ো পুরনো অ্যাকাউনটেন্টও কিছু বলেছিলেন। গতকাল চারুদির ওকে পালিয়ে বেড়ানোর কথাটা বলার তাৎপর্যও আজ স্পষ্ট হয়েছিল।

…বিকেলের দিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গতকাল বড় সাহেব কারখানাতেই এসেছিলেন। শুধু মূল ভাষণলিপিটি নয়, ধীরাপদর যুক্তি-নির্ভর সেই মোটা মেটিরিয়াল ফাইলটাও সঙ্গে এনেছিলেন। কোম্পানীর বর্তমান অবস্থার যাবতীয় হিসেব-নিকেশ আর তথ্য সন্নিবদ্ধ যে ফাইলে—সেটা। আসার আগে ছেলেকে টেলিফোনে খবর দিয়েছিলেন বোধ হয়, কারণ সে-ও এসেছিল। প্রথমেই ধীরাপদর খোঁজ পড়েছিল। তাকে না পেয়ে ভাগ্নে আর লাবণ্য সরকারকে ডেকেছেন তিনি। অনেক দিনের অভিজ্ঞ অ্যাকাউনটেন্ট্‌কেও।

খুব স্পীচ লিখে দিয়েছিলেন যে, লালে লাল করে দিয়েছে, কার কি জোটে এখন দেখুন। অমিতাভ ঘোষ এর বেশি আর কিছু বলেনি।

অর্থাৎ ভাষণের প্রতিশ্রুতিগুলির ওপর লাল পেন্সিলের আঁচড় পড়েছে। বাতিল করা হয়েছে কোন্‌গুলো অ্যাকাউনটেন্টও তা সঠিক বলতে পারেননি। তাঁর কাছ থেকে গতকালের পরিস্থিতির মোটামুটি আভাস পাওয়া গিয়েছিল। মেডিক্যাল অ্যাডভাইসার লাবণ্য সরকার সামনে ছিল, স্পীচটা বড় সাহেব প্রথমে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন, ঘোষণার ব্যাপারে সকলে একমত হয়ে এই সিদ্ধান্ত করেছে কিনা। লাল দাগ দেখে দেখে বিষয়গুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিতে সময় লাগেনি লাবণ্য সরকারের। সে জবাব দিয়েছে, এর দুই-একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল শুধু, এটা আগে দেখেনি সে—জানেও না কিছু। ওটা তারপর ভাগ্নের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন বড় সাহেব। ভাগ্নে দেখেনি, বলেছে, কি আছে ওতে সে জানে। আর বলেছে, কেন

কি করা হয়েছে সবই তো তাঁর টেবিলে ফেলে রাখা হয়েছে কদিন ধরে—যেখানে সময় না হলে কে কি করতে পারে।

ছোট সাহেব একটা কথাও বলেনি, একটা মন্তব্যও করেনি। চুপচাপ স্পীচটা পড়েছে শুধু।

বড় সাহেব সেই মোটা মেটিরিয়াল ফাইল খুলেছেন। বসে বসে একটানা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক দেখেছেন সেটা। অ্যাকাউন্‌টেণ্টকে জিজ্ঞাসা করে করে অনেকগুলো হিসেব আর তথ্যের বিশ্লেষণ বুঝে নিতে চেষ্টা করেছেন। অ্যাকাউন্‌টেণ্টের ধারণা, খুব ভালো বোঝেননি তিনি।

…কিন্তু আজ ধীরাপদ শুনছে আর শুনছে আর অবাক হচ্ছে আর মুগ্ধ হচ্ছে। কারণ যা সে লিখেছিল তাই হুবহু পাঠ করেছেন বড় সাহেব। একটি শব্দের অদল-বদল করেননি।…ওই বোনাস্‌ ঘোষণা হয়ে গেল। বোনাস্‌ কথাটার উৎপত্তি ব্যুৎপত্তি নিয়ে রসালো মন্তব্য একটু। পাকা চাকরির গ্রেড, স্বেচ্ছাপ্রদত্ত বাড়তি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড স্কীম, গ্র্যাচুইটি, বেতনমূলক ছুটিছাটা, নিখরচায় অসুস্থ কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণের আশ্বাস, এমন কি চীপ-রেট ক্যাণ্টিন প্রসঙ্গও বাদ গেল না। কোনোটা ঘোষণা কোনোটা বা প্রতিশ্রুতি ঠিক যেমন সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল তেমনি বলেছেন। না, বলেছেন আরো অনেক সুন্দর করে।

আদর্শ-বাণিজ্যের ওই স্বপ্নজালে নিজেই জড়িয়েছে যেন ধীরাপদ। ভাষণ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকক্ষণের একটা অবরুদ্ধ সম্মিলিত প্রতীক্ষা সরবে মুক্তি পেয়ে বাঁচল। গতানুগতিক হাততালি পড়ল, সোরগোল উঠল, শব্দজটিলতা থেকে প্রতিশ্রুতি আর ঘোষণার ইতিবৃত্ত ছেঁকে তোলবার আগ্রহ মুখর হয়ে উঠল। প্রাপ্তির পরিমাণটা টাকা-আনায় বুঝে নেবার বাসনা, ভবিষ্যতের আশ্বাসগুলো ক্যালেণ্ডারের পাতায় স্পষ্ট করে নেবার বাসনা।

ধীরাপদর চমক ভাঙল একটু বাদেই। সামনের মঞ্চটা শূন্যে। বড় সাহেব নেমে গেছেন। সকলের অলক্ষ্যে দোতলায় নিজের অফিসঘরে চলে এলো সে। দেরাজ থেকে ফাইল বার করল একটা—বড় সাহেবের পার্সোন্যাল ফাইল। ভাষণের গোটাকতক প্রতিলিপি ওতে রাখাই আছে। ওটা হাতে করে নিচে নেমে এলো আবার। সকলের অগোচরে প্রায় নিঃশব্দে কারখানার চত্বর থেকে বেরিয়ে এলো সে।

বিমল সন্ধ্যার পরে।

উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে গেছে। এই পর্বে বহিরাগত সভাপতি আর

প্রধান অতিথির আমদানি ঘটেছে। তাঁরা গণ্যমান্ত ব্যক্তি, সারাক্ষণ থাকা সম্ভব নয় বলে গোড়াতেই নিজেদের ভাষণ-সূচী শেষ করে নিয়েছেন। বড় সাহেবের অসুস্থতার দরুন ছোট সাহেব তাঁর হয়ে সভার উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে। সম্ভ্রান্ত অতিথি অভ্যাগতরা অনেকেই একে একে বিদায় নিয়েছেন। সংবাদপত্রের মালিকরাও অনেকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে গেছেন। এখনো রিপোর্টার উপস্থিত আছেন দু-চারজন।

এরপর মনোরঞ্জনের সূচী। আমন্ত্রিত শিল্পীদের অনেকে এসে গেছেন, অনেকে আসছেন, আরো অনেকে আসবেন। এ সূচী কত রাত পর্যন্ত চলবে ঠিক নেই। এ পর্বে উৎসব-কমিটির ভলান্টিয়াররা ব্যস্ত বেশি। এখনকার অনুষ্ঠান তাদের দখলে।

কারখানা এলাকার মাঝখানের বিশাল প্রাঙ্গণ জুড়ে মস্ত প্যাণ্ডেল। আলোয় আলোয় ভিতরটা দিনের মত সাদাটে লাগছে। সেই আলো বাইরেও অনেকটা ছড়িয়েছে। বাইরের একদিক জুড়ে পয়সাঅলা অভ্যাগতদের সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে। কোনো পরিচিত সম্ভ্রান্ত অতিথিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরছিল সিতাংশু মিত্র। ধীরাপদর সঙ্গে দেখা।

আপনি সেই দুপুর থেকে ছিলেন কোথায়? বিস্ময় থেকেও বিরক্তি বেশি।

কাজ ছিল।

জবাবদিহি করার জন্য না দাঁড়িয়ে ধীরাপদ প্যাণ্ডেলের দিকে এগিয়ে গেল। এত দেরি হবে সে-ও ভাবেনি। কিন্তু আগে ফেরারও তাড়া ছিল না খুব। এমন কি, আজ আর এখানে না এলেও চলত যেন।

প্যাণ্ডেলের বাইরে সামনেই যে ভদ্রলোক বিগলিত খুশির আতিশয্যে হাত-মুখ নেড়ে অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে আলাপে মগ্ন তিনি লাবণ্য সরকারের দাদা, সপ্তাহের খবরের কর্ণধার বিভূতি সরকার। হাত তিনেক তফাতে লাবণ্য দাঁড়িয়ে। অনুমান, লাবণ্য দাদাকে এগিয়ে দিতে আসছিল, বিদায়ের মুখে চীফ কেমিস্টের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে বিভূতি সরকার তাকে চড়াও করেছেন। তাঁর এক হাতে চীফ কেমিস্টের একখানি হাত ধরা। এক নজরে বোঝা গেল লোকটি অন্তরঙ্গ জনই হবেন, অন্যথায় হাতে হাত মিলিয়ে এতটা হাসিমুখে অতিথি আপ্যায়নের ধাত নয় অমিতাভ ঘোষের।

লাবণ্য আগেই দেখেছিল ধীরাপদকে, কাছাকাছি হতে আর একবার দেখল। ভাষণ নিয়ে গতকাল ওই আলোচনার পর আজ হুবহু সেটাই পাঠ করবেন বড় সাহেব, এ ধীরাপদর মতই তার কাছেও কম বিস্ময় নয়।...কিন্তু চাপা আনন্দের

বদলে ওর এই উসকো-খুসকো শুকনো মূর্তি দেখবে ভাবেনি হয়ত। আগে হলে এর পরেও কাছে এসে জিজ্ঞাসা করত, কি ব্যাপার—ছিলেন কোথায় সমস্ত দিন ?

কিন্তু কথাবার্তায় বা আচার-আচরণে সংগতি বজায় রেখে চলার মেজাজে চিড় খেয়ে গেছে তার। লোকটার আজকের এই অনুপস্থিতিও উদ্দেশ্যমূলক ধরে নিয়েছে। আজও সেই খবরের কাগজের মালিকদের অভ্যর্থনায় তাকেই এগিয়ে আসতে হয়েছে। হাসিমুখেই আপ্যায়ন জানিয়েছে তাঁদের, আলাপ করেছে। কিন্তু কেউ যদি তার এই হাসি আর আপ্যায়ন পণ্যের মত ব্যবহার করা যেতে পারে বুঝিয়ে দিয়ে এই দায়িত্বে ঠেলে দেয়—সেটা বরদাস্ত করা সহজ নয়। লাবণ্য সরকার তাই ধরে নিয়েছে। আজকের দিনেও এতক্ষণের অনুপস্থিতির আর কোনো কারণ দেখেনি সে।

দাদাকে বিদায়সূচক একটা কথাও না বলে লাবণ্য গম্ভীরমুখে ভিতরে চলে গেল। ধীরাপদ একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়াল। বিভূতি সরকার বা অমিতাভ ঘোষের এখনো তার দিকে চোখ পড়েনি। এত লোকের আনাগোনা, বিশেষ করে কে আর কাকে দেখছে! একটু বাদে হাত ঝাঁকাঝাঁকি আর কাঁধ ঝাঁকা-ঝাঁকি করে বিদায় নিলেন বিভূতি সরকার। যাবার আগে বার বার তাঁর দপ্তরে চীফ কেমিস্টের পদধূলির প্রত্যাশা করে গেলেন হয়ত। কথা শুনতে পাচ্ছে না ধীরাপদ, অন্তরঙ্গ অনুরোধ আর প্রতিশ্রুতি বিনিময়ের হাবভাব থেকে সেই রকমই মনে হচ্ছে। অমিতাভ ঘোষ প্যাণ্ডেলের দিকে ফিরল, বিভূতি সরকার বোনের উদ্দেশেই একবার এদিক-ওদিক চোখ চালিয়ে সামনের রাস্তা ধরলেন।

নমস্কার, চললেন ?

বিভূতি সরকার ঘুরে দাঁড়ালেন। বহু বাঞ্ছিত কারো সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেলে যেমন হয়, তেমনি দেখতে হল মুখখানা। ফর্সা খাঁজকাটা মুখের ভাঁজে ভাঁজে আলগা আনন্দের ছোঁয়া লাগল। কেউ বলবে না, এর আগে মাত্র একদিনের দেখাসাক্ষাৎ, একদিনের আলাপ।

কি আশ্চর্য! আপনি! আপনাকে তো শুনছি সেই দুপুর থেকে খোঁজা-খুঁজি করছেন সকলে। মোস্ট্ ইম্পরট্যাণ্ট পারসন্ অফ দি ডে—মিসিং! একটু আগে আমাকে নিখোঁজের বিজ্ঞাপন দিতে বলেছিলেন মিস্টার ঘোষ। হাসলেন, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ? আপনার সঙ্গে দেখা হল না ভেবে বড় আপসোস হচ্ছিল।

ধীরাপদ সবিনয়ে বলল, আপনাদের দরজায় দরজায়ই ঘুরছিলাম সেই থেকে। সকালের একটা ডিটেল্‌ড্‌ রিপোর্ট রেখে এসেছি আর দু-একটা ছবি, দেখবেন একটু…

নিশ্চয় নিশ্চয়, কি আশ্চর্য! পারলে বিভূতি সরকার তক্ষুনি দেখে ফেলেন। —আপনি আবার কষ্ট করলেন কেন, আমি তো আসতুমই, আর এটা তো কাগজেরই কাজ। সপ্তাহের খবর খুলে পাতা-ভর কভারেজ পাবেন—আমি গিয়েই দেখছি সব।

আগাম টাকা দিয়ে তিন দিনের বিজ্ঞাপন বুক করে আসার এই ফলটুকু আশা করাই যায়।

ধীরাপদ কৃতজ্ঞতাসূলভ অভিবাদন জ্ঞাপন করার আগেই বিভূতি সরকার আবার বললেন, কাল পরশু সময় করে আসুন না একদিন, পছন্দমত হল কিনা নিজের চোখেই দেখে নেবেন। সময় তো আছে, আর যদি কিছু জানাবার থাকে জানিয়ে দেবেন—আসুন, কেমন?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, যাবে।

নিজের নগণ্য কাগজের প্রতি সুনজরের সুপারিশ তারপর। একই প্রসঙ্গের এটুকু দ্বিতীয় অংশ যেন। যেমন মিস্টার ঘোষের সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্তা হল কিছু, তিনি বললেন সব কিছুর আসল চাবি এখন ধীরুবাবুর হাতে। শুনে বিভূতিবাবু আগের মতই নিশ্চিন্ত হয়েছেন। অনুগ্রহ করে চাবিটা মাঝে মাঝে ধীরুবাবু তাঁর দিকেও ঘোরাবেন একটু-আধটু, সেটা আদৌ দুরাশা নয় তাঁর… ধীরুবাবুর সহৃদয়তার পরিচয় তিনি প্রথম দিনেই পেয়েছেন।

চাবির কথা সবিনয়ে অস্বীকার করলেও স্মরণ রাখার আশ্বাস দিয়েই বিদায় করতে হয়েছে তাঁকে। প্যাণ্ডেল থেকে একটু নিরিবিলি তফাতেই দাঁড়িয়ে রইল ধীরাপদ। দেখার তাগিদ নেই, ইচ্ছে করলে এখানে দাঁড়িয়েও গান-বাজনা শুনতে পারে। কানে আসছে বটে, কিন্তু শোনার তাগিদও নেই। চাবির কথাটা অস্বস্তিকর। আর সকালের সমস্ত ব্যাপারটাও। এই প্যাণ্ডেল, এই উৎসব, এই সব কিছু ছেড়ে সারাক্ষণ তার চোখ জুড়ে আর মন জুড়ে দাঁড়িয়ে যে মানুষটি তিনি বড় সাহেব হিমাংশু মিত্র। মোটা ফাইলে সে যত হিসেব-নিকেশ আর যুক্তি দাখিল করুক, আর সেই ভাষণ যত খোলাখুলি তাঁর সামনে ফেলে রেখে নিজের সততা দেখাক, ভিতরে ভিতরে সে যে তাঁকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল, সেটা অস্বীকার করবে কেমন করে?

ধীরাপদ নিজেই খানিকটা বিভ্রান্ত হয়েছে।…এই চাবির কথা অমিতাভ

ঘোষ কেন, আজ অন্তত অনেকেই বলবে। লাবণ্য সরকার বলবে, সিতাংশু মিত্র বলবে, বুড়ো অ্যাকাউনটেণ্ট্ বলবেন। অস্বস্তি বাড়ছে ধীরাপদর। নিজেরই নিভৃতের কোনো একান্তজনের কাছে আবেদন, আমি চাবি চাই নে।···সত্যিই মাথা নাড়ছিল খেয়াল নেই। চাবি সে চায় না।

দাদা, আপনি এখানে?

সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাল ধীরাপদ। মেডিক্যাল হোমের রমেন হালদার। ফিটফাট চকচকে হয়ে উৎসবে এসেছে। ধীরাপদও খুশি একটু। ছেলেটা খুশির দূত।—এই এলে?

এই! চোখ টান করল, এসেছি সেই বিকেলে—সেই থেকে তো আপনাকেই খুঁজছি আমরা। এখনো তো আপনার দেখা মেলে কিনা দেখার জন্য ও-ই আমাকে ঠেলে পাঠালে।

আমরা···ও-ই ঠেলে পাঠালে! ধীরাপদ অবাক, কে পাঠালে?

ওই ইয়ে—কাঞ্চন। একেবারে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিল রমেন হালদার, তুষ্টির ব্যঞ্জনা চোখে না পড়ার কথা নয়। ধীরাপদ হাঁ করেই চেয়ে আছে। লাউড-স্পীকারে আসরের গানের শব্দও ডুবে গিয়ে রমেনের হড়বড়ানি কানে আসছে।—আজ চার দিন হল ও আমাদের ওখানে কাজে লেগেছে, আপনাকে আর বলছি কি, আপনিই তো করলেন—খুব ভালো মেয়ে দাদা, আপনার প্রশংসা ধরে না, আজ সকালে আপনার কথা বলতে বলতে তো কেঁদেই ফেলল। হি-হি হাসি,—বলছিল আপনি নাকি দেবতার মতন; আমি বলেছি, মতন নয় —আমার দাদা দেবতাই। আপনি দাঁড়ান দাদা একটু, যাবেন না যেন—আমি এক্ষুনি আসছি।

শশব্যস্তে ভিতরে ঢুকে গেল। দেবতার মত দাদা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। ···চার দিন আগেই লাবণ্যর সঙ্গে কাঞ্চনের চাকরির ফয়সালা হয়েছিল বটে। কিন্তু মাত্র চার দিনের ফসল দেখে দুই চক্ষু স্থির ধীরাপদর।

রমেন ফিরল একটু বাদেই। সঙ্গে সঙ্গিনী। সামনে এসে দাঁড়াল। ভীরু; লজ্জাবনত। রমেন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে বলে উঠল, এই দেখো, ভিড়ের মধ্যে হাঁক-ডাক হম্বিতম্বি করার লোক নন্ দাদা, এইখানে একলাটি দাঁড়িয়ে—

কাঞ্চনের মুখ তুলতে সঙ্কোচ। দেবতুল্য ব্যক্তির এই নীরব পর্যবেক্ষণের দরুন ঈষৎ শঙ্কিতও হয়ত। মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করল একবার, তারপর কি করবে বা কি বলবে ভেবে না পেয়ে পায়ের কাছে ঢিপ করে প্রণাম করে উঠল একটা।

এবার ওধারে দু-একজন ঘাড় ফেরাল। নড়েচড়ে আগ্রহ হল ধীরাপদর।
—ভালো আছে?

মাথা নাড়ল। ভালো আছে। কতটা ভালো আছে তাই একটু দেখে নিল ধীরাপদ, সেই নিঃসাড় শীর্ণ মুখ খুব তাজা দেখাচ্ছে না এখনো, কিন্তু এই মুখে আশার কাঁচা রঙ লেগেছে। আর দু-চার দিন বা দু-চার মাস গেলে তাজাও দেখাবে হয়ত।

কোথায় আছ এখন?

জানালো, মিস সরকারের ওখানেই আছে এখনো, দু-তিন দিনের মধ্যেই বাড়ি যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে রমেনের সেই প্রগল্ভ হাসি আর চাপা মন্তব্য।—ও-ও আমার মতই ওঁকে দিদি ডাকতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে দাদা, একদিন দিদি বলে আর বলেনি।

ধীরাপদর কেন কে জানে ধমকে উঠতে ইচ্ছে করছিল রমেনকে। কিছু বলল না বটে, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাও বাড়ালো না। গম্ভীর মুখে আবার গান শুনতে পাঠিয়ে দিল তাদের। পরে পায়ে পায়ে নিজেও প্যাণ্ডেলের কাছে এসে দাঁড়াল। ভিতরের বহু মাথার মধ্যেও ওই দুজনকে আবিষ্কার করা গেল। তিন-চার সারি ওধারে দুটি চেয়ারে পাশাপাশি বসে। এক বয়সীই হবে, কিন্তু তারুণ্যের জোয়ারে ছেলেটাকে ছেলেমানুষ লাগছে। কাঞ্চনের পরনে চোখ-তাতানো ছাপা শাড়ি নেই, কটকটে লাল সিল্কের ব্লাউজ নেই, মুখের প্রসাধনও অনেক কম। কিন্তু ওই দিকে চেয়ে চেয়ে এই মুহূর্তে ফুটপাথের সেই কদর্য মূর্তিই কেমন যেন বড় বেশি চোখে ভাসছে ধীরাপদর।

আবারও ফাঁকায় এসে দাঁড়াল সে। ভিতরে ভিতরে নতুন ভ্রূকুটি জমে উঠেছিল একটা, বিরক্ত হয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে হালকা বোধ করতে চেষ্টা করল। কেউ কিছু করে না, কেউ কিছু ঘটায় না। যা হবার আপনি হয়, যা ঘটার আপনি ঘটে। নইলে কার্জন পার্কের লোহার বেঞ্চির সেই ধীরাপদ চক্রবর্তী আজ এত বড় প্রতিষ্ঠানের এমন এক হোমরাচোমরা ব্যক্তি হয়ে বসল কি করে? আর বিকৃত রিপুদগ্ধ পথচারীর ক্ষণসঙ্গিনী এই পথের অভিসারিকাই বা এত বড় দুনিয়ায় ঘুরে ফিরে মেডিক্যাল হোমের ওষুধ-বেচা রমেন হালদারের পাশে এসে বসে কেমন করে?

ভালো লাগছে না, মাথাটা টলছে একটু একটু, পা দুটো অবশ লাগছে। ধীরাপদর খেয়াল হল, পেয়ালা-কতক চা ছাড়া সমস্ত দিনে আর খাওয়া হয়নি

কিছু। সময় হয়নি, মনেও পড়েনি। চুপচাপ গা-ঢাকা দিলে কেমন হয়…। বাড়ি গিয়ে চান, খাওয়া—ঘুম। কিন্তু হিমাংশু মিত্র জেগে থাকলে আর টের পেলে অসুবিধে। ডাক পড়তে পারে। আজ আর তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ানোর ইচ্ছে নেই। কাল। আজকের এই রাতের থেকে কালকের সকালটা অনেক অন্যরকম হতে পারে। রাত আর দিনের মতই তফাত হতে পারে। হয় যাতে ধীরাপদ সমস্ত দিন ধরে নাওয়া-খাওয়া ভুলে সেই চেষ্টাই করেছে।

প্যাণ্ডেলের পিছনের দিকে প্রথম সোরগোল উঠল একটু, তারপর হুড়মুড় করে সেদিকের দর্শক-শ্রোতারা সরে আসতে লাগল। গণ্ডগোল বাড়ছে, গান-বাজনা থেমে গেছে, ওদিকে ভলান্টিয়াররা ছোটাছুটি করছে। ধীরাপদ এগিয়ে গেল দেখতে।

প্যাণ্ডেলের একদিকে আগুন লেগেছে। তেমন কিছু নয়। কিন্তু আগুনটা বাড়ার আগে নেভানো দরকার। কারেন্ট লিক্ করছিল হয়ত, কাপড়ে-তারে-বাঁশে জড়িয়ে ধরে গেছে। এত উঁচুতে যে কিছু করা শক্ত। মেন্ অফ্ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের সমুদ্র। আগুন নেভানোর ব্যবস্থা সব কারখানাতেই থাকে, এখানেও আছে—কিন্তু সব সরঞ্জাম বাইরে এনে কাজে লাগানো সময়সাপেক্ষ। এই ছোটাছুটির মধ্যেই বেপরোয়া গোছের একটা লোক ছালা কাঁধে মোটা থাম বেয়ে তরতরিয়ে ওপরে উঠে গেল। লোকটা কারখানারই শ্রমিক। উদ্দেশ্য, ওখানকার তার ছিঁড়ে আগুন ছালা-চাপা দেবে।

বাহাদুরি আছে লোকটার, আগুন নেভালো ঠিকই। সাত-আট মিনিটের ব্যাপার সবসুদ্ধ। একটু বাদে আলো জ্বলল। দেখা গেল লোকটার একটা হাত অনেকটা ঝলসে গেছে, কাঁধের কাছটা পুড়ে গেছে, হাতে বাহুতে গলায় মস্ত মস্ত ফোস্কা। অনেকেই দৌড়ে এলো। সিতাংশু অমিতাভ লাবণ্য সিনিয়র কেমিস্ট আরো অনেক। ধীরাপদও। ব্যাপারটা দেখেই লাবণ্য সরকার দ্রুত অফিস-বিলডিংয়ের দিকে চলে গেল। খানিকক্ষণের মধ্যেই একেবারে ইন্‌জেক্‌শান রেডি করে ফিরে এলো।

কিন্তু যে লোক ঝোঁকের মাথায় এমন কাণ্ড করে আগুন নিভিয়ে এলো সে ইন্‌জেক্‌শান নিতে নারাজ। ছুঁই নেবে না। বার বার বলতে লাগল, সে ঠিক আছে, তার কিছু হয়নি।

লাবণ্য ধমকে উঠল, তোমার যা হয়েছে তুমি টেরও পাবে না, বসো চুপ করে!

কিন্তু চুপ করে বসবে কি, একে এতখানি পোড়ার যন্ত্রণা, তার ওপর যাবড়েছে

লোকটা। ফলে ছোট সাহেবের ধমক খেতে হল এবারে। সিনিয়র কেমিস্ট জীবন সোমও চোখ রাঙিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলেন। অন্ত বাবুরা দু-একজন চেপেচুপে ধরল তাকে।

লাবণ্য সরকার ইন্‌জেক্‌শান দিল।

লোকজনের সাহায্যে তানিস সর্দার লোকটাকে তুলে নিয়ে গেল। নির্বুদ্ধিতার জন্ত সে এরই মধ্যে কয়েক দফা বকাবকি করেছে তাকে। পোড়া ঘায়ের জ্বালা জানে সে।

আসরের গান-বাজনা বেসুরো লাগছে এরপর। নীরস আর বিরক্তিকর লাগছে। ধীরাপদর আবারও মনে হল, যা হবার তাই হয়, যা ঘটবার তাই ঘটে। ওই লোকটাই কি জানত, এমন উৎসবের রাতেও এই মাশুল দিতে হবে তাকে?

জানলে অনেক কিছুই হত না। লোকটা ওভাবে পোড়া-পোড়া হত না। হলেও লাবণ্য সরকার সাত-তাড়াতাড়ি ইন্‌জেক্‌শান দিতে ছুটে আসত না। এলেও ধীরাপদই হয়ত বাধা দিত।...ওই লোকটার জন্তে নয়, লাবণ্যর কথা ভেবেই বাধা দিত।

কিন্তু কি থেকে কি যে হয় আগে আর কে জানছে।

পরদিন। মানুকে এসে খবর দিল, বড় সাহেব ডাকছেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে প্রস্তুত হয়ে বসেছিল ধীরাপদ। এতক্ষণ কোনো খবর না পেয়ে বরং অবাক হচ্ছিল। এই দিনের সূচনা অন্তরকম হবে জানত। কিন্তু সে যে রকম আশা করছে সে রকম নাও হতে পারে। না হলে ধীরাপদ কি করবে? বিশ্বাসভঙ্গের অনুযোগ ভ্রূকুটি বা বিরাগের আভাস দেখলে কি করবে? বড় সাহেব কি বলতে পারেন জানা থাকলে জবাব নিয়ে প্রস্তুত হয়েই যেত সে। অনিশ্চয়তার মধ্যে বসে প্রত্যেকটা মুহূর্ত ভারী লাগছিল।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওপর থেকে অমিতাভ নেমে আসছে। মুখ দেখে মনে হয় মামার কাছ থেকে আসছে।...এই জন্তেই তার ডাক পড়তে দেরি বোধ হয়।

কি ব্যাপার? কাঁধের ওপর মাথাটা থাকবে তো? ধীরাপদর মুখে কৃত্রিম ভীতির বিন্তাস।

থাকবে।...যান, মাথা আর একটা বেশিও গজাতে পারে। সিঁড়ির মুখ আগলে না দাঁড়ালে অমিতাভ এক মুহূর্তও দাঁড়াত না হয়ত। এই মুখ সর্বদাই

ভিতরের মেজাজের দর্পণ। এ দর্পণে কদিন ধরে ঘোরালো ছায়া পড়ে আছে। কিন্তু এই সব্ভ বিরূপতা যেন তারই ওপরে। বিদ্রূপের আঁচে চশমার পুরু কাচ দুটোও চকচকে দেখাচ্ছে। বলল, দু'শ টাকা কেন, যা করেছেন, মাইনে ডবল হওয়া উচিত আপনার।

প্রায় গা ঠেলেই নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। ধীরাপদ বোকার মত চেয়ে ঘরে ঢুকে যেতে দেখল তাকে।...দু'শ টাকা মাইনে বাড়ানো হচ্ছে নাকি তার! একেবারে ওপরের দিকের কজনের মাইনে কত বাড়বে না বাড়বে সেটা বড় সাহেবের নিজস্ব বিবেচনাসাপেক্ষ। এ নিয়ে ধীরাপদ এক মুহূর্তও মাথা ঘামায়নি। অমিতাভও ঘামায়নি নিশ্চয়। তাছাড়া ওর মাইনে যে অনেক বেশি হওয়া উচিত এ কথা সে-ই চারদিকে বলে এসেছিল একদিন। এই শ্লেষের আর উষ্মার ভিন্ন কারণ। ভোরের খবরের কাগজ দেখেছে। ক'টা দেখেছে কে জানে। দেখে ওর চাটুবৃত্তি আবিষ্কার করেছে। হাল ছেড়ে ধীরাপদ ওপরে উঠতে লাগল, এমন অবুঝকে সে সামলাবে কেমন করে? সকালেই আবার কোন্ ফয়সালা নিয়ে মামার ঘরে হাজির হয়েছিল তাই বা কে জানে?

বড় সাহেব বললেন, বসো—

ধীরাপদ আগেই খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। মুখ দেখে আরো একটু স্বস্তি। খাটের ওপর ছড়ানো একরাশ খবরের কাগজ। ছোট বড় যত আছে সব ক'টাই বোধ হয়। ওর কোন্টাতে কি আছে ধীরাপদর প্রায় মুখস্থ। নিজেই বসে বসে বিবৃতি লিখে দিয়ে এসেছে। এক-একটা কাগজের জন্য এক-একরকম করে লিখেছে। কিন্তু মূল কথায় অর্থাৎ ঢালা প্রশংসায় খুব তফাত নেই। এই প্রশংসার আড়ালে তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলির ওপরেও পাকা ছাপ পড়েছে। সব কাগজেই প্রতিষ্ঠান-কর্ণধারের ছবি বেরিয়েছে। রিপোর্টারদের সৌজন্যে কোনো কোনো কাগজে এর ওপর ভাষণরত সভাপতির ছবিও ছাপা হয়েছে। দু-একটা কাগজে সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যলাভও ঘটেছে।

ধীরাপদ জেনেছে টাকায় অনেক হয়। আর তার সঙ্গে সুদর্শনা রমণীর বলিষ্ঠ আর সুচারু আবেদনের যোগ থাকলে আরো অনেক কিছু হয়। মনে মনে ধীরাপদ আজ লাবণ্যর প্রতিও কৃতজ্ঞ।

ইজিচেয়ারে শরীর ছেড়ে দিয়ে বড় সাহেব পাইপ টানছিলেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একবার। দৃষ্টিটা কৌতুক-প্রচ্ছন্ন। খবরের কাগজগুলোও হয়ত ইচ্ছে করেই খোলা—ছড়িয়ে রেখেছেন।

এইসব কাগজে কত টাকার বিজ্ঞাপন ঢেলেছ এ পর্যন্ত?

মনে মনে অনেক কথার জবাব সাজিয়েছে সে, কিন্তু এ-প্রশ্নটা অতর্কিত।
তবু ধীরাপদ বিব্রত বোধ করছে না। সহজ জবাব দিল, এখনো হিসেব করে দেখা হয়নি।...পরের ব্যাপারটার জন্যে আরো তো অনেক গুণ বেশি লাগবে, নইলে এদের ব্যাকিং পাব কেন?

পরের ব্যাপারটার জন্ত অর্থাৎ আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের দরুন। বড় সাহেবকে সেটা বিশ্লেষণ করে বলা নিষ্প্রয়োজন। এই এক দিনের প্রচারের আড়ম্বরেই যে লক্ষ্যপথে বেশ খানিকটা এগোনো গেছে সেটুকু তিনি অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারেন। সামনের কানপুরের অধিবেশনেই অনেকটা বাড়তি মর্যাদা নিয়ে দাঁড়াতে পারবেন তিনি।

পাইপ মুখে সকৌতুক গাম্ভীর্যে নিরীক্ষণ করছেন ওকে।—একটু আগে টেলিফোনে তোমার দিদিকে তোমার কথাই বলছিলাম। তুমি লোক সুবিধের নও, রাদার ডেঞ্জারাস্...

ধীরাপদও হাসছে অল্প অল্প। চুপ করে থেকে অভিযোগ মেনেই নিল।

বড় সাহেব তাকে প্রশ্রয় দিতে রাজী আছেন, সমর্থন করতেও, কিন্তু একটু-আধটু সচেতন না করে দিয়ে নয়। স্নেহভাজন একজন বিশ্বস্ত কর্মীর সঙ্গে কোম্পানীর অতীত-ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে গল্প করছেন যেন। কোন্ অবস্থা থেকে প্রতিষ্ঠান আজ এই পর্যায়ে এসেছে আর কতবার তাঁদের বিলুপ্তির সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে সেই গল্প ধীরাপদ আগেও শুনেছে। এমন কি ওরই লেখা বড় সাহেবের গতকালের ভাষণেও এই আবেগের দিকটায় ছাড় পড়ে নি। সেইটুকুরই পুনরুক্তি। বললেন, কোম্পানীর সংস্রবে যারা আছে তাদের আরো অনেক ভালো হোক, অনেক পাক তারা, তাঁর একটুও আপত্তি নেই। কিন্তু যা থেকে ভালো হবে আর পাবে তাতে যেন টান না ধরে।—ডোণ্ট্ কীল্ দি বার্ড ছাট্ গিভস্ ইউ গোল্ডেন এগ্স্!

একটু বাদে ভাগ্নের প্রসঙ্গও তুললেন তিনি। অবিলম্বে গোটাগুটি একটা রিসার্চ ডিপার্টমেণ্ট চাই তার। প্রস্তাবটা নতুন নয় শুনল, আগে এজন্যে প্রায়ই তাগিদ দিত। বছর কয়েক আগে একবার এ নিয়ে ক্ষেপে গিয়েছিল নাকি। মাঝে চুপচাপ ছিল, এখন আবার নতুন কিছু মাথায় ঢুকেছে হয়ত।

বড় সাহেবের মুখ চিন্তাচ্ছন্ন। ভাগ্নের এবারের চাওয়াটা ছেঁটে দিতে পারছেন না বোধ হয়। এসব সমস্যা ধীরাপদ আজকাল ভালই বোঝে, শুধু গবেষণা চালানোর জন্ত আলাদা একটা বিভাগ পত্তন করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এতে ধরাবাঁধা সময়ের মিয়াদ কিছু নেই, খরচেরও ঠিক-ঠিকানা নেই। ভাগ্নের

প্র্তিভার অনাস্থা নেই বড় সাহেবের, অনাস্থা তার মেজাজের ওপর। আজকের ঝোঁক কাল কেটে যেতে পারে। এ প্রোডাকশন ইউনিট নয় যে একজনের কাজ আর একজনকে দিয়ে হবে।

বড় সাহেব আর কিছু বলবেন মনে হয় না। ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল, তারপর ইতস্তত করে জানালো, আজ বিকেলে সে সুলতান কুঠিতে ফিরে যাচ্ছে।

যেজন্য তার এই বাড়িতে এসে থাকা সেই কাজ শেষ। আপত্তি করার কথা নয়, এই রকমই কথা ছিল। কিন্তু বড় সাহেবের আর তা মনেও ছিল না হয়ত। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একটু, এখানে তোমার কি অসুবিধে?

আপত্তির এই সুর ধীরাপদ আগেই আঁচ করেছিল। বলল, অসুবিধে কিছু না, এমনিই যাব ভাবছি।

না গেলে ক্ষতি হচ্ছে খুব?

জবাব পেলেন না, জবাব আশাও করেননি। ধীরাপদর মনে হল, এবারে রসালো মন্তব্যই কিছু করে বসবেন হয়ত। শেষ পর্যন্ত তা না করে রায় দিলেন, আচ্ছা আমি কানপুর থেকে ঘুরে আসি, তারপর কথা হবে।

আসার সময় ধীরাপদ খুব মাথা উঁচু করে ঘরে ঢোকেনি। কালকের ভাষণ আর প্রতিশ্রুতি রচনা নিয়ে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। রূঢ় বোঝাপড়াও কিছু হয়ে যেতে পারত। বেরুবার সময় সে বেরিয়ে এলো মাথা উঁচু করেই। এত দিনের একটা মানসিক দ্বন্দ্বের অনুকূল নিষ্পত্তির দরুন নয়। মাথা-উঁচু এই মানুষটিকে আজ তার অনেক উঁচু মনে হয়েছে বলে।

এই একটা দিনে আরো কিছু বিস্ময় সঞ্চিত ছিল ধীরাপদ জানত না। ধীরাপদ কেন, কেউ জানত না। কারখানার আঙিনা থেকে গতকালের উৎ-সবের আয়োজন এখনো গোটানো হয়নি। তাঁবু ওঠেনি, মঞ্চ বাঁধা, চেয়ারগুলো শুধু ভাঁজ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে কারখানার হাওয়া উগ্র, বিপরীত।

ওদের হাবভাব ঘোরালো, চাউনি বাঁকা, কথাবার্তা ধারালো। বিশেষ করে স্বল্প বেতনের অদক্ষ কর্মচারীদের। কাজে হাত পড়েনি তখনো, জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে। গত রাতের উৎসবে গলা-কাঁধ-হাত পোড়া সেই লোকটার সমাচার শুনে ধীরাপদ বিমূঢ় একেবারে। ইন্‌জেক্‌শন দেবার দশ মিনিটের মধ্যে ভানিস সর্দার গাড়ি করে তাকে ঘরে তোলার আগেই মারাত্মক অবস্থা নাকি। লোকটা কেঁপে কেঁপে হাত-পা ছুঁড়ে অস্থির। পাগলের মত

অবস্থা সেই থেকে এ পর্যন্ত। ঘন ঘন গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, কথা বলতে পারছে না, তোতলামি হচ্ছে, সর্বাঙ্গ জ্বলে জ্বলে যাচ্ছে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, দেয়ালে মাথা ঠুকছে—হাসছে কাঁদছে লাফাচ্ছে, অনেক কাণ্ড করছে।

দোতলায় উঠেই ধীরাপদ আর এক নাটকীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন। সামনের করিডোরে লাবণ্য সরকারকে ঘিরে জনাকয়েক পদস্থ অফিসারের আর একটা জটলা। জটলা ঠিক নয়, নির্বাক নারীমূর্তির চারদিকে ভদ্রলোকেরা মৌন বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে শুধু। একটু তফাতে জনাতিনেক সাধারণ কর্মচারী হাত-মুখ নেড়ে চীফ কেমিস্ট অমিতাভ ঘোষকে বোঝাচ্ছে কি। ইউনিয়নের পাণ্ডা গোছের লোক তারা, বক্তব্য থাকলে যাদের বলতে কইতে দ্বিধা নেই।

ধীরাপদর মনে হল, তাকে দেখেই লাবণ্যর চোখে প্রথম পলক পড়ল। চাপা স্বস্তির আভাস একটু। কিন্তু সে সামনে এসে দাঁড়ানোর আগে অমিতাভ ঘোষ এগিয়ে এলো। লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করল, কি ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হয়েছিল—অ্যাট্রোপিন অ্যাণ্ড মরফিন?

লাবণ্য নির্বাক এখনো, কিন্তু সাড় ফিরেছে। তাকালো তার দিকে। জবাব দিত না হয়ত, পিছনে ইউনিয়নের অর্ধশিক্ষিত লোক ক'টাকে দেখেই মাথা নাড়ল বোধ হয়। অর্থাৎ তাই।

ডোজ্?

রমণীর কঠিন দৃষ্টি তার মুখের ওপর বিঁধে থাকল খানিক।—অ্যাট্রোপিন ওয়ান-হান্‌ড্রেথ্ গ্রেন, মরফিন ওয়ান-ফোর্থ।

মাথা ঝাঁকিয়ে অমিতাভ ঘোষ অসহিষ্ণু প্রশ্ন ছুঁড়ল একটা, অ্যাট্রোপিন একটা ট্যাবলেট দিয়েছিলে কি দুটো?

এবারেও ধৈর্য সম্বরণ করল লাবণ্য সরকার। কিন্তু সে চেষ্টায় মুখের রঙ বদলাচ্ছে। নিষ্পলক কঠিন দুই চোখ তার মুখের ওপর স্থির।

একটা।

আর ইউ সিওর?

আর জবাব দিল না, কয়েক নিমেষ দাঁড়িয়ে মর্মান্তিক দেখাটুকুই শেষ করে নিল শুধু। তারপর ধীর পদক্ষেপে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

নালিশ নিয়ে যারা এসেছিল তাদেরই সামনে এ ধরনের বাক-বিনিময়ের ফলে বিড়ম্বনা বাড়ল বই কমল না। ধীরাপদর কাজে মন বসছিল না। লাবণ্য সরকার লোকটার ভালো করতেই গিয়েছিল, কিন্তু এ আবার কি কাণ্ড? সে কি দোষ করল? খানিক বাদে আবারও নিচে নেমে আসতে একসঙ্গে অনেকে

ছেঁকে ধরেছে তাকে। তাদের বক্তব্য, কোম্পানির ডাক্তার, রোগী দেখে এসে বলেছেন, অসুখটা সহ্য হয়নি হয়ত। ডাক্তার সাহেব যেটুকু বলার ভদ্রতা করে বলেছেন, সহ্য যে হয়নি সে তো তারা নিজের চোখেই দেখছে। সহ্য হবে কেমন করে? চীফ কেমিস্ট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, একটা টেবুলেট দেওয়া হয়েছে কি দুটো—কিন্তু কটা দিয়েছেন ঠাকুরোন ঠিক কি! মানুষকে তো আর মানুষ বলে গণ্য করেন না, হয়ত বা চারটে-পাঁচটাই ফুঁড়ে দিয়ে বসে আছেন।

ওদের সামনেই কোম্পানীর ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলল ধীরাপদ। তারপর তাদের বোঝাতে চেষ্টা করল, ডাক্তার সাহেব ওষুধ ভুল এ কথা একবারও বলেন নি—পুড়ে গেলে সকলেই ওই ইন্‌জেক্‌শনই দিত। তবে কোনো বিশেষ কারণে কারো কারো শরীরে অনেক ওষুধ সয় না, এও সেই রকমই কিছু ব্যাপার হয়েছে—

কিন্তু কেন কি হয়েছে তা ওরা শুনতে চায় না। ওদের বিশ্বাস লোকটার জীবন বরবাদ হয়ে যেতে বসেছে, আর সেটা হয়েছে মেম-ডাক্তারের দোষে। তারা কৈফিয়ৎ চায়, বিহিত চায়। তারা কানুন জানে—শ্রমিকদের কিছু হলে কোম্পানীর কোন্ ডাক্তার দেখবে তাদের, সেটা কানুনে ঠিক করে দেওয়া আছে, মেম-ডাক্তার কানুনের ডাক্তার না হয়েও সুই ফুঁড়তে গেলেন কেন? তা ছাড়া লোকটা তো বার বার আপত্তি করেছিল, বার বার বলেছিল, সে ঠিক আছে, তার কিছু হয়নি—তবু ধরে বেঁধে তাকে সুই দেওয়া হল কেন?

আইনের দিকটা মিথ্যে নয়, ওদের চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট চিকিৎসক আছে কোম্পানীর। কিন্তু এরই মধ্যে ওদের আইন বোঝাতে গেল কে? ধীরাপদর ধারণা, এই উত্তেজনার পিছনে মাথাওয়ালাদেরও সক্রিয় ইন্ধন আছে। লোকটার অবস্থা বা তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ, আগে বিহিতের কথা তুলছে। অন্যান্য কর্মচারীরাও ছদ্মগাম্ভীর্যের আড়ালে কাউকে জব্দ করতে পারার মজা দেখছে যেন। অথচ গতকাল বড় সাহেবের ঘোষণার আর উৎসবের পরে মন-মেজাজ সকলেরই ভালো থাকার কথা।

ক্ষোভের হেতু স্পষ্ট হল ক্রমশ। বিকেলের দিকে বুড়ো অ্যাকাউন্‌টেন্ট্‌ই ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। ভাষণের আগের দিন বিকেলে বড় সাহেবের হঠাৎ কারখানায় পদার্পণের খবর কে আর না রাখে? ধীরাপদর অনুপস্থিতিতে অন্য কর্তাদের নিয়ে দু ঘণ্টা ধরে মিটিং করা হয়েছে, প্রাপ্তির খসড়ায় অনেক লাল দাগ পড়েছে, মিস সরকার আর ছোট সাহেব তাদের পাওনার ব্যাপারে সায় দেয়নি—এই সবই তাদের কানে পৌঁচেছে হয়ত। একটুখানি পৌঁছলেও বাকিটা অনুমান

করে নিতে কতক্ষণ ? এত সবের পরেও বড় সাহেব মূল ঘোষণাপত্রটিই হুবহু পাঠ করেছেন, এ তারা বিশ্বাস করবে কেন ? কি পেয়েছে বা পাবে নিচের দিকের কর্মচারীদের স্পষ্ট ধারণা নেই এখনো পর্যন্ত, কিন্তু তাদের বিশ্বাস মোটা প্রাপ্তির যোগটা শেষ মুহূর্তে কেটেছেঁটে অনেক ছোট করা হয়েছে।

বুড়ো অ্যাকাউনটেণ্ট এত সব বলেননি অবশ্য, হাসিমুখে একটু মজার আভাসই দিয়ে গেছেন শুধু। বলেছেন, ওরা এখনো ভাবছে আপনি আরো অনেক কিছুর সুপারিশ করেছিলেন, আর সেই দিন এসে এনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে বড় সাহেব তার অনেক কিছু নাকচ করেছেন। কেউ বলছে হিসেবপত্র করে ধীরুবাবু তিন মাসের বোনাসের কথা লিখেছিলেন, কেউ বলছে পেনশনের কথা লেখা ছিল, কেউ বা ভাবছে এখনই যা দেবার কথা সেসব পরের জন্য ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

ধীরাপদ একটু থেকেই বুঝে নিয়েছে। ছোট সাহেব নাগালের বাইরে, মেম-ডাক্তারকে জব্দ করার এ সুযোগ ওরা ছাড়বে না। আর কিছু না হোক, নাজেহাল করতে পারাটাই লাভ।...কিন্তু কাল রাতের সেই আধপোড়া দস্যি লোকটার সত্যিই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা নাকি ?

জনতার মেজাজ চড়লে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই। বিশেষ করে কড়া প্রতিবাদ নেই যেখানে। আগের দিন যারা চুপচাপ ছিল, পরের দিন তাদেরও গলা শোনা যেতে লাগল। জটলার জোর বাড়ছে, হুমকি বাড়ছে, বিহিতের দাবিটা আন্দোলনের আকার নিচ্ছে। নির্দয় মেম-ডাক্তারের অপরাধ প্রতিপন্ন হয়ে গেছে যেন। চিকিৎসার নামে কানুন ডিঙিয়ে শ্রমিকদের ওপর দিয়ে বাহাদুরি নেবার চেষ্টা বরদাস্ত করবে না তারা। কি সুঁই দিয়েছে কে জানে ? কি ওষুধ দিয়েছে কে জানে ? কতটা দিয়েছে তাই বা কে জানে ? বাবুদেরই তো সন্দেহ হচ্ছে, তাছাড়া গড়বড় না হলে অতবড় জোয়ান লোকটা অমন ধড়ফড় করবে কেন ? নিষেধ করা সত্ত্বেও চোখ রাঙিয়ে সুঁই দেবার দরকার কি ছিল ? বড় সাহেবের কাছে মিলিত দরখাস্ত পাঠাবে তারা, কোর্ট করবে, ট্রাইবুন্যালে যাবে—বিহিত না হলে অনেক কিছু করবার রাস্তা আছে তাদের।

কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে পরদিনও এই গণ্ডগোল সেই লোকটা আছে কেমন সেই খবরটাই সঠিক সংগ্রহ করে উঠতে পারল না ধীরাপদ। যাকে জিজ্ঞাসা করে সে-ই মাথা নাড়ে। অর্থাৎ লোকটা আর নেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। ওদের ওই গরম জটলার মধ্যে ভানিস সর্দারকে একাধিকবার লক্ষ্য করেছে ধীরাপদ। সেও মন্ত্রণাদাতাদের একজন। কিন্তু ধীরাপদ ফাঁকমত সামনাসামনি

গেল না তাকে। মাতব্বরদের সঙ্গে শলা-পরামর্শে ব্যস্ত বোধ হয়। তাকে পেলে সঠিক খবরটা জানা যেত, ওই লোকটার কাছাকাছি ভেরাতে থাকে সে।

লাবণ্য সরকার অফিসে আছে কি নেই বোঝা যায় না। আছে—ধীরাপদ জানে। কিন্তু যেভাবে আছে কোনো জনমানবের মুখ দেখতেও রাজী নয় মনে হয়। মর্যাদার ওপর এমন আচমকা ঘা পড়লে এ রকম হওয়া বিচিত্র নয়। তবু সে এগিয়ে এসে দু কথা বললে বা বোঝাতে চেষ্টা করলে পরিস্থিতি এতটা জটিল নাও হতে পারত। এগিয়ে আসা দূরে থাক, এক রূঢ় স্তব্ধতার পাল্টা ব্যূহ রচনা করে তার মধ্যে বসে আছে যেন। দেখছে কতদূর গড়ায়। কর্মচারীদের এই উদ্ধত উত্তেজনার পিছনে পদস্থ ব্যক্তিরও উস্কানি আছে ভাবছে হয়ত। ধীরাপদকে তাদের ব্যতিক্রম মনে করার কারণ নেই।

খানিক আগে হন্তদন্ত হয়ে সিতাংশু মিত্র এসে হাজির তার ঘরে। রীতিমত তেতেই এসেছিল, গলার স্বর তেমন চড়া না হোক কড়া বটেই।—কি ব্যাপার?

কী? প্রায় অকারণে রক্তকণাগুলো আজকাল উষ্ণ হয়ে উঠতে চায় কেন ধীরাপদ নিজেও জানে না।

কি সব গণ্ডগোল শুনছি এখানে?

আর বলেন কেন, যতদূর সম্ভব নির্লিপ্ত ধীরাপদ, যেমন কাণ্ড এদের সব—

তা আপনি কিছু করছেন, না বসে বসে শুধু কাণ্ডই দেখছেন?

ধীরাপদ বসে ছিল, সিতাংশু দাঁড়িয়ে। ধীরাপদ বসতে বলেনি, এ কথার পর ঘরের দরজা দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু দরজা দেখানোর অন্য রীতিও জানা আছে। মোলায়েম করেই বলল, আপনি এসে গেছেন ভালই হয়েছে, দেখুন না কিছু করা যায় কিনা, আমিও কর্মচারী বই তো নয়···

সিতাংশু আর দাঁড়ায়নি। সম্প্রতি এই একজনের ওপর সব থেকে বেশি রাগ তার।

কিছু করা যায় কিনা সে চেষ্টা সিতাংশু করে গেছে। মাতব্বরদের ডেকে পাঠিয়েছিল। তারা আসেনি, ছুতোনাতায় এড়িয়ে গেছে। কিছুকাল আগেও এ ধরনের অবাধ্যতা ভাবা যেত না। নিচে নেমে ছোট সাহেব হম্বিতম্বি করেছে, চোখ রাঙিয়েছে। কিন্তু এইসব মেহনতী মানুষদের ধাত আর ধাতু চিনতে এখনো অনেক বাকি তার। একবার তারা কোনো জোরের ওপর দাঁড়াতে পারলে পরোয়া কমই করে। তাদের ক্ষুব্ধ চেঁচামেচিতে ছোট সাহেবের কণ্ঠস্বর ডুবে গেছে। ক্ষোভ তাদের শুধু মেম-ডাক্তারের ওপরেই নয়।

বিকেলের দিকে ধীরাপদ কোম্পানীর ডাক্তারকে নিজের ঘরে ডেকে

পাঠালো। কিন্তু এই ভদ্রলোকও ব্যাপার ঠিক বুঝে উঠছেন না যেন। অ্যাট্রোপিন অ্যালার্জির কেস, প্রতিষেধক ওষুধ দিয়েছেন—রোগীর লক্ষণ খানিকটা অন্তত স্বাভাবিক হবার কথা, সুস্থ বোধ করার কথা— কিন্তু কিছুই হচ্ছে না, এক ভাবেই আছে। এ রকমটা ঠিক হবার কথা নয় জানালেন—অবশ্য পোড়া ঘায়ের জ্বালা-যন্ত্রণা আছেই।

রোগীর সম্বন্ধে আরো কিছুক্ষণ আলোচনা করে ডাক্তার ভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে ধীরাপদ নিজেও উঠে পড়ল। পাঁচটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। বাইরে এসে লাবণ্যর ঘরের সামনে দাঁড়াল একটু, তারপর আস্তে আস্তে দরজার একটা পাট ঠেলে খুলল। চেয়ার টেবিল ফাঁকা, ঘরে কেউ নেই।

ধীরাপদ কি আশা করেছিল, সঙ্কোচ ঠেলে লাবণ্য সরকার তার কাছে না এলেও তারই প্রতীক্ষায় নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছে? কেউ নেই দেখেও ঘরে ঢুকল। টেবিলটায় হাত ছোঁয়ালো, গোছানো ফাইলপত্রগুলিতেও। একটা অননুভূত দরদের ছোঁয়া লাগছে যেন। মায়া লাগছে। এভাবে সম্মানের হানি ঘটলে ধীরাপদ নিজে কি করে বসত বলা যায় না।

অফিসে রেজিস্ট্রি বই থেকে তানিস সর্দারের ঠিকানা টুকে এনেছিল ধীরাপদ। ডেরা খুঁজে পেতে দেরি হল না। ঘরের মেঝেতে বসে তানিস সর্দার খাচ্ছিল, ডাক শুনে তার বউ বেরিয়ে এলো।

বউটা মুখের দিকে হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে আচমকা তার পায়ের ওপর উবুড় হয়ে পড়ল একেবারে। দুই পায়ের ওপর ঘন ঘন মাথা ঠুকল কয়েক-বার। ধীরাপদ সরে দাঁড়াবারও ফুরসুৎ পেল না। মাথা ঠোকা শেষ করে তার জুতোর ধুলো জিভে ঠেকালো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভাষায় চেঁচামেচি করে উঠল, ওরে কে এসেছে শিগ্‌গির দেখবি আয়!

তানিস সর্দার ভিতর থেকে দৌড়ে এলো। খালি গা, পরনে খাকী হাফ প্যান্ট। সর্বাঙ্গের শুকনো পোড়া দাগগুলো চোখে বেঁধে। আগন্তুক দেখে সেও হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত।—হুজুর আপনি!

বউটা দৌড়ে ভিতরে ঢুকল, আর তক্ষুনি বেরিয়ে এসে দাওয়ায় একটা আধা-ছেঁড়া চাটাই পেতে দিল।—বৈঠিয়ে বাবুজী।

না বসব না, সর্দারকে বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে—

কথা যে আছে তানিস সর্দার বুঝেছে এবং কি কথা তাও। কিন্তু এই বাবুটির মনের সত্যিকারের হদিস সে আজও পেল না যেন। চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে। শিক্ষা-দীক্ষা থাকলে তানিস সর্দারের বউ সরে যেত, কিন্তু

সেও দাঁড়িয়ে রইল।

ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের সেই লোকটি এখন আছে কেমন?

খুব খারাপ। সর্দার গম্ভীর।

খারাপ তো তাকে ঘরে আটকে রেখেছ কেন, ডাক্তার সাহেব তো তাকে হাসপাতালে পাঠাতে বলেছেন।

সর্দার জানালো, ওই সুঁই নেবার পর হাসপাতালে আর যেতে চায় না, তার বহুও যেতে দিতে রাজি নয়—মরে তো ঘরেই মরবে।

মরবে না। ধীরাপদর কণ্ঠস্বর অনুচ্চ কঠিন, ডাক্তার সাহেবের ধারণা সে ভালো আছে, তোমরা তাকে ভালো থাকতে দিচ্ছ না—

অন্য কেউ হলে লোকটা অন্যরকম উত্তর দিত বোধ হয়। একটু থেমে বিনীত জবাব দিল, কি রকম কষ্ট পাচ্ছে হুজুর নিজের চোখেই দেখবেন চলুন।

ধীরাপদর দুই চোখ তার আদুড় গায়ের ক্ষতচিহ্নগুলির ওপর বিচরণ করে নিল একবার।—পোড়া ঘায়ে কি রকম কষ্ট পায় তুমি জানো না?

সর্দার চুপ। পাশ থেকে তার বউয়ের অস্ফুট কটূক্তি শোনা গেল একটা। কি বলল বা কার উদ্দেশ্যে বলল না বুঝে ধীরাপদ তার দিকে তাকালো একবার—তানিস সর্দারও।

গলার সুর পাল্টে নরম করে ধীরাপদ একটা অবান্তর প্রসঙ্গে ঘুরে গেল। বলল, তোমরা কি পেয়েছ কেউ জানো না, আস্তে আস্তে জানবে। আমরা যে সুপারিশ করেছি বড় সাহেব তার একটা অক্ষরও কাটছাঁট করেননি, কেউ বাধা দেয়নি, কেউ কোনো আপত্তি তোলেনি। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো। মেমসাহেব আপত্তি করলে তোমাদের ক্ষতি হত, কিন্তু তিনি তা করেননি। তা ছাড়া লোকটার ওই বিপদে সবার আগে যিনি সাহায্যের জন্যে ছুটে এলেন, তাঁকেই জব্দ করার জন্য ক্ষেপে উঠেছ তোমরা? তোমাদের কি কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই?

আর একদিনও এই মেমসাহেবের দিক টেনেই কথা বলতে শুনেছিল হুজুরকে, সেদিন তানিস সর্দার সেটা ভদ্রলোকের রীতি বলে ধরে নিয়েছিল—বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আজ সে অবাক হল। কারণ তাদের এই হৈ-চৈয়ের পিছনে ভদ্রলোক বাবুদেরও তলায় তলায় একটু সমর্থন আছে—এ তারাও ধরেই নিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছোট সাহেবকে যতটা না হোক, ওই মেমসাহেবটিকে একটু-আধটু জব্দ করতে ভদ্দরলোক বাবুরাও সকলেই চায়। হুজুর কতটা মনের কথা বলছে মুখের দিকে চেয়ে সর্দার সেটা আঁচ করতে চেষ্টা করল। তারপর

মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। বলগত কারণে তার পক্ষে কিছু বলা বা নিজেদের দোষ স্বীকার করে নেওয়াও শক্ত।

ধীরাপদ গম্ভীর আবারও, গলার স্বরও চড়ল একটু।—এভাবে মিছিমিছি গণ্ডগোল করলে কেউ সহ্য করবে না, ওই লোকটাকে হাসপাতালে যেতে হবে—তোমরা কি জন্যে কি করছ সবই বোঝা যাবে তখন। ওই লোকটার চাকরি যাবে, তোমাদেরও ফল ভালো হবে না। কালকের মধ্যেই গণ্ডগোল থামা দরকার সেটা তোমাদের দলের লোককে ভালো করে বুঝিয়ে দিও। আমি বলেছি বলো—

এই হুঁশিয়ারিতেও ফল কিছু হত কিনা বলা শক্ত, কারণ উভয় সঙ্কটে পড়ে তানিস সর্দার মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়েই ছিল। কিন্তু তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বউটা এগিয়ে এসে হ্যাঁচকা টানে লোকটাকে হাত ধরে আর এক ধারে টেনে নিয়ে গেল। অসহিষ্ণু বিরক্তিতে ফিসফিস করে যা বলতে চাইল তার প্রতি বর্ণ ধীরাপদর কানে এসেছে। প্রথমে মরদগুলোর বুদ্ধি-সুদ্ধির ওপর কটাক্ষ। ওদের ঘরোয়া ভাষা ধীরাপদ বলতে না পারুক, বুঝতে না পারার কথা নয়। সে শুনছে কি শুনছে না সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই বউটার। তার চাপা তর্জনের মর্ম, তোরা কি শেষে এই বাবুজীর সঙ্গে লড়বি নাকি নেমকহারাম বেইমান। তোরা না বলেছিলি মেমসাহেবকে কেউ দেখতে পারে না—এই বুদ্ধি তোদের, অ্যাঁ? চোখ কানা তোদের। বাবুজী দেখতে পারে কিনা দেখছিস না? নইলে তোর ঘরে আসে? ফিসফিসিনি আর এক পরদা নামল, কিন্তু বউটার কালো মুখে যেন আবিষ্কারের আলো ঝলসাচ্ছে।—তোদের এই মেমসাহেব বাবুজীর দিল কেড়েছে এখনো বুঝছিস না বুদ্ধু কোথাকারের!

ধীরাপদ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। তার পায়ের নিচে মাটি দুলছে। তানিস সর্দার হতভম্ব মুখেই পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল আবার। এক নজর চেয়ে বউয়ের বচন পরখ করে নিল। বোকা বোকা মুখখানা কমনীয় দেখাচ্ছে। তার পিছনে তার কালো বউ চাপা খুশিতে ঝলমল করছে।

তানিস সর্দার বলল, আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গিয়ে আরাম করুন বাবুজী, আর কেউ টুঁ শব্দ করবে না, আমার জান কবুল।

ধীরাপদ নিঃশব্দে চলে এলো। ভালো-মন্দ একটা কথাও বলেনি আর। এরপর কথা অচল।...তানিস সর্দারের ওই মিশকালো বউটা ঢিপ ঢিপ করে তার পায়ের ওপর কপাল ঠুকেছে, পথের আবর্জনাময় জুতোর ধুলো জিভে ঠেকিয়েছে—সশরীরে হঠাৎ কোনো দেবতারই পদার্পণ ঘটেছিল যেন ওদের দাওয়ায়।

কিন্তু আজকে আসতে ধীরাপদ শিক্ষাদীক্ষা-স্বাস্থ্যজ্ঞানহীনা ওই গ্রাম্যিক রমণীর উদ্দেশে মাথা না নুইয়ে পারেনি। সমস্ত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে সে নারী, সেখানে সে শক্তিরূপিণী পুরুষের দোসরই বটে। সেখানে সে সহজ সুন্দর, সেখানে কোনো কালোকুলোর লেশমাত্র নেই।

ওদের এই নতুন আবিষ্কারের কোনরকম প্রতিবাদ করেনি ধীরাপদ, একটু বিরূপ আভাসও ব্যক্ত করেনি। খবরটা ওদের মহলে এবারে ভালো করেই রটবে বোধ হয়। কিন্তু সেজন্য একটুও বিড়ম্বনা বোধ করছে না ধীরাপদ, এতটুকু অস্বস্তিও না।

মাঝে আর একটা দিন গেছে। তানিস সর্দার কি ভাবে সকলের মুখ বন্ধ করেছে আর উত্তেজনা চাপা দিয়েছে সে-ই জানে। যারা মজা দেখার আশায় ছিল তারা নিরাশ হয়েছে।...শোরগোলটা হঠাৎ এমন মিইয়ে গেল কি করে ভেবে না পেয়ে অনেকে অবাকও হয়েছে। কোম্পানীর সেই ডাক্তারটি পরদিনই এসে ধীরাপদকে খবর দিয়েছেন, তাঁর রোগী আপাতত অনেকটাই সুস্থ, পোড়া ঘায়ের জ্বালা-যন্ত্রণা সত্ত্বেও অতটা আর লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করছে না— অস্থিরতা কমেছে।

তার পরদিন বিকেলের দিকে ধীরাপদকে প্রতিষ্ঠানের এক পার্টির কাছে যেতে হয়েছিল। ফিরতে বিকেল গড়িয়েছে। এসেই টেবিলের ওপর ছোট চিরকুট চোখে পড়েছে একটা। ধীরাপদ ঘড়ি দেখেছে—সাড়ে ছটার এক ঘণ্টার ওপর বাকি তখনো। চিরকুট পকেটে ফেলে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়েছে। ট্রামে-বাসে গেলেও আধ ঘণ্টা আগেই পৌছত, কিন্তু ট্যাক্সি নিল।

লাবণ্য সরকার নার্সিং হোমের বারান্দায় রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্যাক্সি থামতে দেখল, ধীরাপদকে নামতে দেখল, কিন্তু আর এক দিনের মত সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এলো না।

চিরকুট তারই। খুব সংক্ষিপ্ত অনুরোধ। অনুগ্রহ করে বিকেলে একবার নার্সিং হোমে এলে ভালো হয়, বিশেষ কথা ছিল। সে সাড়ে ছটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কি কথা থাকতে পারে ট্যাক্সিতে বসে ধীরাপদ তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। শুধু মনে হয়েছে, অনুরোধটা লাবণ্য অফিসে নিজের মুখেই করতে পারত। ইচ্ছে করেই তা করেনি। ধীরাপদ অফিস থেকে বেরিয়েছিল সাড়ে তিনটেরও পরে। লাবণ্য তখন নিজের ঘরেই ছিল। বেরুবার আগে ধীরাপদ তার ঘরে এসেছিল। বলে গেছে, অমুক জায়গায় যাচ্ছে, কেউ খোঁজ করলে যেন বলে

দেয়। পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আবার অফিসে ফিরবে তাও জানিয়েছে। বড় সাহেব সেই দিনই কানপুর রওনা হচ্ছেন, কাজেই খোঁজ করার সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু লাবণ্য তখনো কিছু বলেনি। দরকারী কথার আভাসও দেয়নি। হাতের কলম থামিয়ে চুপচাপ শুনেছে, তারপর আবার মুখ নামিয়ে লেখায় মন দিয়েছে।

আসুন। রেলিং থেকে সরে বসবার ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল লাবণ্য সরকার। অস্ফুট ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলে সে ভিতরে চলে গেল। দুই এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে অদূরের সোফায় বসল।

কোন্ পর্যায়ের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হবে মুখ দেখে ধীরাপদ ঠিক করতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল, কাঞ্চন চলে গেছে না এখানেই ?

চলে গেছে। একটু থেমে সংযত অথচ খুব সহজভাবে লাবণ্য বলল, ওকে ওখানে ঢোকানোর জন্যে ম্যানেজার খুব খুশি নন দেখলাম, ওর আর রমেন হালদারের সম্বন্ধে কালই কি সব বলছিলেন।

ম্যানেজার কি বলেছেন বা বলতে পারেন ধীরাপদ অনুমান করতে পারে। সে নিজে এক সন্ধ্যায় যেটুকু লক্ষ্য করেছে তাইতেই অস্বস্তি বোধ করেছিল। ম্যানেজার মাত্র আট ঘণ্টার প্রহরী। তাঁর ওইটুকু কড়া অনুশাসনের গণ্ডির মধ্যেই যদি ওদের আচরণ অসঙ্গত লেগে থাকে, দিনের বাকি ষোল ঘণ্টার হিসেব কে রাখে ? ছেলেটাকে ভালই বাসে ধীরাপদ, ওর মত ছেলেকে ভাল না বেসে কেউ পারে না। দুই-একদিনের মধ্যেই তাকে ডেকে পাঠাবে, সম্ভব হলে কালই।

পরিচারিকা দু পেয়ালা চা রেখে গেল। চায়ের কথা বলতেই লাবণ্য ভিতরে গিয়েছিল বোঝা গেল। সঙ্গে আনুষঙ্গিক কিছু নেই দেখে স্বস্তি বোধ করছে। থাকলে একটা কৃত্রিমতাই বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে পড়ত। তার বিশেষ কথাটা কাঞ্চনের কথাই কিনা ধীরাপদ বুঝে উঠছে না। কারণ আর তেমন কিছু বলার তাড়া বা প্রস্তুতি দেখছে না।

না, তা নয়, কাঞ্চন প্রসঙ্গ ওখানেই শেষ। ঝুঁকে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে লাবণ্য আবার সোফায় ঠেস দিল। নিরুত্তাপ প্রশ্ন, মিস্টার মিত্র আজ চলে গেলেন ?

যাবার তো কথা, গেছেন বোধ হয়।

কবে ফিরবেন ?

দিন তিন-চারের মধ্যেই হয়ত, বেশি দিন লাগার কথা নয়।

ধীরাপদর পেয়ালাটা তার হাতে, ধীরে-সুস্থে চুমুক দিচ্ছে। নিজের পেয়ালাটা খালি করে লাবণ্য সামনের ছোট টেবিলে রাখল, তারপর সোফায় আর ঠেস না দিয়ে সোজাসুজি তাকাল তার দিকে। সমস্ত মুখ, এমন কি চাউনিটাও শান্ত।
—অনেক রকম গণ্ডগোল নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে হচ্ছে আপনাকে, এ সময়ে ডেকে অসুবিধে করলাম বোধ হয়?

সূচনা সুবিধের ঠেকছে না ধীরাপদর। হাতের পেয়ালা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, না অসুবিধে কি, আর ওই গণ্ডগোলও তো মিটে গেছে শুনেছি।

লাবণ্যর শিথিল দৃষ্টিটা আরো কয়েকটা মুহূর্ত তার মুখের ওপর পড়ে রইল তেমনি। তারপর প্রসঙ্গের উপসংহারে পৌঁছানোর মত করে সাদাসিধে ভাবেই বলল, আপনি শোনেননি, আপনি মিটিয়েছেন। আপনি ওই সর্দার লোকটার ওখানে পরশু গিয়েছিলেন, আমি কাল গিয়েছিলাম—

উঠে পেয়ালা দুটো ওধারের একটা ছোট টেবিলে রেখে আবার এসে বসল। ধীরাপদর পক্ষে এই সুচারু বিরতিও উপভোগ্য নয় খুব। একনজর চেয়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল লাবণ্য সরকার, তেমনি স্পষ্ট ধীরস্বরেই বলে গেল, আমি রোগী দেখার জন্য গিয়েছিলাম, রোগী না দেখিয়ে আমাকে সেই সর্দার লোকটার ঘরে নিয়ে আসা হয়েছিল। সে ঘরে ছিল না, তার বউ ছিল। আমাকে আদর করে ঘরে ডেকে নিয়ে বউটা অন্তরঙ্গজনের মতই কথাবার্তা কইতে চেষ্টা করেছে। আমার সেটা খুব ভালো লাগেনি।

কোথায় কোন্ মুহূর্তে থামা দরকার লাবণ্য জানে। থেমেছে। দেখেছে। পরের প্রশ্নটা আরো ঠাণ্ডা, মোলায়েম।—ওরা যা বুঝেছে, গণ্ডগোল মেটানোর জন্যে ওদের সেই রকমই বোঝানো দরকার হয়েছিল বোধ হয় আপনার?

ধীরাপদ কি করবে? অস্বীকার করবে, না জবাবদিহি করবে, না একটা বেপরোয়া স্বীকৃতি ছুঁড়ে দেবে মুখের ওপর? অফিসে সেদিন পার্শ্ববর্তিনীর শূন্য ঘরের শূন্য টেবিল আর শূন্য আসবাবপত্রের সামনে দাঁড়িয়ে যে মমতার ছোঁয়ায় ভিতরটা ভরে উঠেছিল, খানিক আগে পর্যন্তও ধীরাপদ নিজের অগোচরে সেই অনুভূতির মধ্যে ডুবে ছিল হয়ত। তারই ওপর বিপরীত ব্যঙ্গ-বর্ষণ ঘটল যেন একপ্রস্থ। বশ-না-মানা নারী একদিন পুরুষের দুই বাহুর সবল অধিকারের সামগ্রী ছিল নাকি…। ঘরে আয়না থাকলে ধীরাপদ নিজের দুই চোখে সেই কাল-হারানোর ক্রুর খেদ দেখতে পেত।

বলল, ওদের ও-রকম বোঝার মধ্যে আমার হাত ছিল না···তবে, আমাকে দেখে ওরা যা বুঝেছিল আপনাকে দেখার পর ওদের সে ভুল ভেঙে গেছে নিশ্চয়।

আপনাকে দেখে ওরা তাহলে কিছু বুঝেছিল বলছেন?

ধীরাপদ চেষ্টা করে হাসতেও পারল।—আমি না, আপনি বলছেন।···বাড়ি পর্যন্ত ছুটতে দেখে ওরা কিছু একটা সহজ কারণই খুঁজেছে।

আপনি ছুটেছিলেন কেন?

সিতাংশুবাবুর জন্যে। ভদ্রলোক ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ধীরাপদর ঠোঁটের ডগায় জবাব মজুত।

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ সত্ত্বেও চিরাচরিত রাগ-বিরাগের এতটুকু আঁচ চোখে পড়ল না। লাবণ্য জবাবটা শুনেও শুনল না যেন। একটু চুপ করে থেকে শান্ত মন্তব্য করল, আপনার অত ব্যস্ত হওয়ার দরকার ছিল না, এটুকুর দায় আমি নিজেই নিতে পারতুম। যাক, এ নিয়ে কথা কাটাকাটির জন্য আপনাকে আমি কষ্ট করে আসতে বলিনি, যা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ।

হঠাৎ ধন্যবাদ লাভ করে স্নায়ুর চড়া প্রস্তুতির মুখে থমকাতে হল ধীরাপদকে। চকিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

পরের কথাটা কি ভাবে বলবে লাবণ্য তাই হয়ত ভেবে নিল। অটুট গাম্ভীর্য সত্ত্বেও আলগা উত্তাপের চিহ্নমাত্র নেই।—আপনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কয়েকটা কথা আছে।···এখানকার যে রকম ব্যাপার দেখছি তাতে নিজের সম্বন্ধে একটু ভাবা দরকার হয়ে পড়েছে মনে হয়। কি বলেন?

প্রশ্ন স্পষ্ট নয় একটুও, তবু ধীরাপদ অস্বস্তি বোধ করল। ঈষৎ বিস্ময়ের আড়ালেই গুটিয়ে রাখতে চেষ্টা করল নিজেকে।

আর একটু খোলাখুলি বলুন—

কতটা খোলাখুলি বলা দরকার লাবণ্য তাই যেন দেখে নিল। তারপর খুব স্পষ্ট করেই বলল, বাড়িতে অমিতবাবু আর সিতাংশুবাবুর সঙ্গে মিস্টার মিত্রের কিছু একটা মনোমালিন্যের ব্যাপার চলেছে, যার ফলে আমার প্রতিও এঁদের সকলের ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।···গোলযোগটা কি নিয়ে?

ধীরাপদর মুখের দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা কৃত্রিম নয় খুব।—এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

কারণ এসব কথার মধ্যে আপনিও উপস্থিত ছিলেন শুনেছি। ওঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে জিজ্ঞাসা করতাম না, এর সঙ্গে আমি কতটা জড়িত জানা দরকার।

ধীরাপদর বলতে ইচ্ছে করছিল, সবটাই—। বিব্রত মুখে এবারও জবাব এড়াতেই চেষ্টা করল। বলল, কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি সে তো ব্যক্তিগত ব্যাপারই। সিতাংশুবাবু পারফিউমারি ব্র্যাঞ্চে লেগে থাকতে চান না—বড় সাহেব তাই চান। আর অমিতবাবু কখন কি যে বরদাস্ত করেন আর কখন করেন না বোঝা ভার—

এ পর্যন্ত আমার জানা আছে। লাবণ্যর বিশ্লেষণরত দৃষ্টি ঈষৎ নড়েচড়ে আবার তার মুখের ওপর স্থির হল।—সিতাংশুবাবু বা অমিতবাবুর ব্যবহারের জন্য তাঁরাই দায়ী, কিন্তু আমার প্রসঙ্গে বড় সাহেব আপনাকে কখনো কিছু বলেছেন কিনা, আর বলে থাকলে কি বলেছেন আমাকে জানাতে আপনার খুব আপত্তি আছে? জানতে পেলে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিতে সুবিধে হত—

তড়িত গতিতে মস্তিষ্ক চালনা করেও ধীরাপদ সঠিক বুঝে উঠল না, বড় সাহেব তাকে কিছু বলতে পারেন এ সন্দেহ হল কেমন করে? ছেলে বা ভাগ্নের সঙ্গে মনোমালিন্য চলেছে জানে বলে এই অনুমান, নাকি ছেলে সেদিন বাপের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসে ঘা খেয়ে চলে যাবার পরেও ধীরাপদ ঘরে ছিল শুনেছে বলে? জবাবের প্রতীক্ষায় লাবণ্য সরকার অপলক নেত্রে চেয়ে আছে তার দিকে।

হঠাৎ সমস্ত হৃৎপিণ্ডটা ধকধকিয়ে উঠল বুঝি ধীরাপদর। পতঙ্গের মত লোভের শিখার দিকে কে তাকে এমন করে ঠেলছে জানে না। ধীরাপদ চাইছে নিজেকে প্রতিরোধ করতে, চাইছে সে যা বলতে যাচ্ছে তা না বলতে। কান দুটো গরম লাগছে, কপালের কাছটা ঘেমে উঠেছে, ঠোঁট দুটো শুকনো, জিভের ডগা থরথরে। কিন্তু নীতির ভ্রূকুটিতে আর সংযমের কথায় পতঙ্গ ফেরে না। ফিরল না। নাগালের মধ্যে সে শিখা দেখেছে।

প্রশ্নের গুরুত্ব অনুযায়ী স্থিরভাবেই জবাব দিল, আপনাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, অফিসের কাজে-কর্মে আপনাকে তিনি বিশেষ সহায় ভাবেন।···কিন্তু নিজের পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব কিছু প্ল্যান আছে হয়ত, সেখানে আর কোনো সম্ভাবনার কারণ ঘটে সেটা তিনি চান না মনে হয়।

সেটা তিনি কবে থেকে চান না? এতক্ষণের সংযমে চিড় খেল, হঠাৎ তীক্ষ্ণ শোনালো কণ্ঠস্বর।

ধীরাপদ নীরব।

ছেলেকে নিয়ে প্ল্যান আছে জানি, কিন্তু ভাগ্নের সম্বন্ধে প্ল্যানটা তাঁর নিজের না চারু দেবীর?

ধীরাপদ নির্বাক।

দাহ শুরু হলে পতঙ্গ কি তার জ্বালা অনুভব করে? ধীরাপদ করছে। লাবণ্যকে যা বলেছে তার মধ্যে মিথ্যে নেই। কিন্তু সত্যটাও খোলস মাত্র। গোটাগুটি খোলস। ছেলের দিক থেকে তার উক্তি যেমন সত্যি, ভাগ্নের দিক থেকে সেটা ঠিক ততো বড়ই মিথ্যে। ধীরাপদ ভাগ্নের নাম করেনি, কারোরই নাম করেনি। পারিবারিক ব্যাপারে বড় সাহেবের অনভিপ্রেত কি সেই ইঙ্গিত করেছে। করে একটা অযুক্ত মিথ্যেকে অবিমিশ্র সত্যের খোলসের মধ্যে পুরে দিয়েছে। ওই থেকে অমিতাভ ঘোষকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কথা নয় লাবণ্য সরকারের, হিমাংশু মিত্রের পরিবার থেকে অমিত ঘোষকে বিচ্ছিন্ন ভাবার কথা নয়। দেখবে না, ভাববে না—ধীরাপদ জানত।

সত্যের খোলস আঁটা বড় লোভনীয় মিথ্যের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে পতঙ্গ।

মাত্র কিছুক্ষণের জন্য স্নায়ুর ওপর দখল হারিয়েছিল লাবণ্য সরকার, সংযমের বাঁধনে সেটুকু কষে বেঁধে নিতে সময় লাগল না। কিন্তু অপমানে মুখের রঙ বদলেছে। প্রায় আগের মতই ঠাণ্ডা চোখ মেলে তাকালো আবার।—এই কথা তিনি আপনাকে বলেছেন?

বলেছেন। সংক্ষিপ্ত, প্রায়-রূঢ় জবাব।

হিমাংশু মিত্র না হোক তাঁরই কোনো প্রতিনিধি সামনে বসে যেন, লাবণ্য তাকেই দেখছে চেয়ে চেয়ে। ধীর, অনুচ্চ কঠিন স্বরে আবারও বলল, কিন্তু সে রকম সম্ভাবনার কারণ ঘটে যদি—তিনি আটকাবেন কি করে? সকলেই তাঁর প্ল্যান মত চলবে ভাবেন?

ধীরাপদ মোলায়েম জবাব দিল, সেই রকমই ভেবে অভ্যস্ত তিনি।

গোটাকতক মৌন মুহূর্তের স্তব্ধতা ঠেলে লাবণ্য সোফা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তার বিশেষ কথা শেষ হয়েছে। ঘড়ি দেখল। বলল, আমার মেডিক্যাল হোমের সময় হয়ে গেছে—

ধীরাপদও উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘরের দিকে পা বাড়াবার আগে লাবণ্য আর একবার ফিরল তার দিকে। অপলক দৃষ্টি বিনিময়। বলল, এরপর আমার কর্তব্য আমি ভেবে নিতে পারব আশা করি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

পায়ের নিচে নিরেট মাটি, মাথার ওপর তারার ঘা-ভরা নীরন্ধ্র আকাশ। দুই-ই অসহ্য লাগছে ধীরাপদর। রাস্তার আলোগুলো পর্যন্ত তাপ ছড়ানোর মত জোরালো লাগছে। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ধার ধরে চলেছে সে। কবে যেন অন্ধকার থেকে আলোয় আসার তাগিদে সে সত্রাসে ছুটেছিল একদিন। গন্ধের

মাঠে সেই একদিন, যেদিন কাঞ্চন এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল···বিনামূল্যে যেদিন পসারিনীর পসার লুঠ হয়েছিল। আজ বিপরীত তাগিদ, আলো থেকে অন্ধকারে যাবার তাগিদ। কিন্তু মনের মত অন্ধকারও জোটা দায়, নিজের বুকের তলাতেই কোথায় যেন ধিকি ধিকি আলো জলছে। আলো না আগুন ?

না, আজ আর ধীরাপদ ভাববে না কিছু। সে ভাবছে বলেই, নইলে কোনো কিছু দংশাচ্ছে না তাকে। দংশাবে কেন, সে তো আর ত্যাগের নামাবলী পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে না। নতুন সুরাপায়ীর মত বিবেক বস্তুটা ছিঁড়েখুঁড়ে উপড়ে ফেলে সাময়িক বিস্মৃতিটুকুই আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইল সে। যে বিস্মৃতির সামনে এতক্ষণ বসেছিল সেই বিস্মৃতির উৎস চোখের আওতায় নতুন করে বেঁধে নিয়ে পথ চলল। মনে হল, লাবণ্যকে এত স্পষ্ট এত পরিপূর্ণ করে আগে আর কখনো দেখেনি। নারী-তনুর প্রতিটি রেখা প্রতিটি কমনীয় ইঙ্গিতের মধ্যে বিচরণ করতে পারার মতই স্পষ্ট আর পরিপূর্ণ করে দেখে এসেছে। দেখছে···। লাবণ্য কর্তব্য ভাববে বলছিল। কর্তব্যটা কী। কি আবার ভাববে ? চাকরি ছাড়বে নাকি ? চাকরি ছেড়ে কি করবে, শুধু প্র্যাক্‌টিস ? করলেও করতে পারে, পসার এখনই মন্দ নয়। সামনে এসে দাঁড়ালে ছ আনা রোগ সারে, কথাবার্তা কইতে শুরু করলে দশ আনা, আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হলে চোদ্দ আনা—এমন ডাক্তারের পসার হবে না তো কার হবে ? কিন্তু মন বলছে, শুধু প্র্যাক্‌টিস করবে না—একেবারে অতখানি গোড়া থেকে শুরু করার ধৈর্য নেই। তাহলে আর কি করতে পারে ? বিলেতে চলে যেতে পারে। এতগুলো বছর ধরে টাকা কম জমায়নি। তাছাড়া নিজের টাকার দরকারই বা কি, বিলেত যাবে শুনলেই ভগ্নিপতি টাকার থলে উঁচিয়ে ছুটে আসবে।

ধীরাপদ ভাবতে চেষ্টা করল, এই এত বড় প্রতিষ্ঠানে একজন মাত্র নেই। বড় সাহেব আছেন, ছোট সাহেব আছে, অমিত ঘোষ আছে, ও নিজেও আছে, এমন কি পরোক্ষ ভাবে চারুদিও আছে,—শুধু লাবণ্য সরকার নেই। ধান কেটে নেওয়া ক্ষেতের মত সব কিছুই শূন্য তাহলে। কার্জন পার্কের সেই লোহার বেঞ্চএর কালের থেকেও শূন্য।

শূন্যতার চিন্তাটা সমূলে নাকচ করতে করতে পথ ভাঙছে আজকের ধীরাপদ চক্রবর্তী।

। একুশ ।

পর পর ক'টা রাত ধীরাপদর ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে। পার্টিশনের ওধারে মানুকের নাকের ঘড়ঘড়ানি বিরক্তিকর লেগেছে। সকাল হলেই ওকে অন্যত্র সরতে বলবে ভেবেছে। কিন্তু সকালের আলোয় নিজের দুর্বলতা চোখে পড়ে। হঠাৎ ঘুমের ওপর এমন দাবি কেন? সকাল হলে নিজেকেই পাশ কাটিয়ে চলে সে। থাক, ক'টা দিন আর, বড় সাহেব এলে তো চলেই যাবে এখান থেকে। এখনো ফিরছে না কেন আশ্চর্য। ফেরার সময় হয়ে গেছে।

মাঝরাতে সিঁড়ির ওধারে দাঁড়িয়ে অমিতাভ ঘোষের ঘরে আলোর আভাস দেখেছে। ও-ঘরে যে আলো জ্বলে এখন, সেটা ভোগের আলো নয়। ওই তন্ময়-তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে বেখাপ্পা লাগে নিজেকে, ভিতরটা কুঁকড়ে যায়। পা এগোয় না, নিজের ঘরে ফিরে আসে আবার। নিজেকে ভোলায়, ভাবে, কি দরকার একজনের নিবিষ্টতা পণ্ড করে? কিন্তু কদিন ভোলাবে? অনাবৃত সত্যের মুখ কদিন চাপা দেবে সে? আসলে ধীরাপদ চক্রবর্তী তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ। ওই মানুষকে তোমার মুখ দেখাতে সংকোচ। ওই জন্যেই তোমার ঘুমের দাবি, ওই জন্যেই তোমার মানুকের নাকের ডাক শুনে বিরক্তি, ওই জন্যেই এখন সুলতান কুঠিতে পালানোর বাসনা। সুলতান কুঠির অত নিঃসঙ্গতার মধ্যেও তোমার একটা আশ্রয় আছে ভাবো। গ্লানি আড়াল করতে পারার মত আশ্রয়।

নাড়াচাড়া খেয়ে সজাগ হয়ে ওঠে ধীরাপদ। এই অনুভূতিটাকেই বিধ্বস্ত করে ফেলতে চায় সে, নির্মূল করে দিতে চায়। কিসের আবার সংকোচ? কিসের গ্লানি? হিমাংশুবাবুর মনোভাব বলতে গিয়ে পরোক্ষে অমিতাভ ঘোষের সম্পর্কেও লাবণ্যকে ভুল বুঝিয়ে এসেছে সেই গ্লানি? বেশ করেছে। মন যা চেয়েছে তাই করেছে। শুনলে চারুদি এই প্রথম ওর কাজে খুশি হবেন বোধ হয়।...আর শুনলে তাঁর থেকেও বেশি খুশি হওয়ার কথা পার্বতীর।

ফ্যাক্টরী আঙিনায় ঢুকে সদর্পে সেদিন প্রথমেই ওয়ার্কশপের দিকে চলল। অমিতাভ ঘোষ নেই। সেখানে জীবন সোম ইতিমধ্যে মোটামুটি দখল নিয়েছেন। কর্মচারীরাও অখুশি নয় তাঁর ওপর। এই লোকের সঙ্গে তাঁদের স্বার্থের ফারাক কম, নিজেদের মত করেই এঁকে তারা অনেকটা বুঝতে পারে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জায়গায় আধ ঘণ্টা মিটার দেখলে বা দু ঘণ্টার জায়গায় দেড় ঘণ্টা 'হিট'

দিয়ে আধ ঘণ্টায় ফুরসৎ লাভের চেষ্টা করলে ঘাড় থেকে মাথা ওড়ার দাখিল হয় না।

জীবন সোমের আপ্যায়ন এড়িয়ে ধীরাপদ যেন্ বিলডিংয়ের দিকে চলল। অমিত ঘোষকে মুখ দেখানোর তাগদ। হয় অ্যানালিটিক্যালে নয়ত লাইব্রেরীতে আছে। আর না হলে খরগোশ নিয়ে পড়েছে। এই ক'টা দিনে গোটা তিনেক খরগোশের প্রাণান্ত হয়েছে। চীফ কেমিস্টের এই নতুন তন্ময়তা ধীরাপদ দূর থেকে লক্ষ্য করেছে।

অনুমান মিথ্যে নয়। ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় একটা খরগোশ টেবিলের ওপর একতাল জড়স্তূপের মত পড়ে আছে। তার কান থেকে রক্ত টেনে রক্তের হিমো-গ্লোবিন পরীক্ষা চলছে। ধীরাপদ পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল। সমঝদারের মতই চেয়ে চেয়ে দেখল খানিক।

আপনার আগের রোগী কেমন ?

অমিতাভ মুখ তুলে তাকালো। দৃষ্টিটা ওর মুখের ওপর এক চক্কর ঘুরে আবার কাজের দিকে ফিরল। এটুকু অসহিষ্ণুতা থেকেই বোঝা গেল আগের রোগী অর্থাৎ আগের জীবটিরও ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। ধীরাপদ শোকের মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের কতদূর কি হল ?

ধীরাপদর নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা, সে আমি কি জানি, কথাবার্তা তো মামার সঙ্গে হয়েছে আপনার—

উষ্ণ ব্যঙ্গ ঝরল এক পশলা, আপনি তো মামার ঘড়ির চেন এখন, জানতে চেষ্টা করুন। ওটা তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার।

কদিন বাদে সামনাসামনি এসে দাঁড়ানোর ফলে ধীরাপদর ভালো লাগছে। গম্ভীর মুখে তার দরকার আর নিজের কদর দুই-ই স্বীকার করে নিল যেন। বলল, তাহলে আপনি এসব কি করছেন না করছেন সব ভালো করে বোঝান আমাকে, আবেদন করুন, তদবির করুন, তারপর বিবেচনা করব।

জবাবে হ্যাঁচকা টানে নিশ্চেতন খরগোশটার কান ধরে সামনে নিয়ে এলো সে। ধীরাপদ আর দাঁড়ালে এটারও পরমায়ু এক্ষুনি শেষ হবে বোধ হয়। সহজ মুখ করেই বলল, চলি, এখনো ঘরে ঢুকিনি—আপনার হাতের কাজ শেষ হলে আসবেন, নয়তো ডেকে পাঠাবেন। আপনার তো দেখা পাওয়াই দায়।

ভুরু কুঁচকে খরগোশ পর্যবেক্ষণে রত। ধীরাপদ হলের ভিতর দিয়ে অদূরের দরজার দিকে এগোলো। কাছে এসে দাঁড়ানো গেছে, মুখ দেখানো হয়েছে।

নিজের ওপর দখল বেড়েছে।

শুনুন—

ধীরাপদ ফিরে দাঁড়াল। কাছে আসার আগেই ঈষৎ তিক্ত-গাম্ভীর্যে অমিতাভ বলল, আপনাদের ওই গণুবাবু না গণেশবাবুকে আমার কাছে ঘোরাঘুরি করতে বারণ করে দেবেন, আমার দ্বারা কিছু হবে না।

ধীরাপদ অবাক। অতর্কিত প্রসঙ্গের তলকূল পেল না হঠাৎ। গণুবাবু মানে গণুদা তার অগোচরে এর কাছে ঘোরাঘুরি করছে! কিন্তু কেন? আরো কি আশা? গণুদা আত্মীয় নয়, কিন্তু তাঁরই মারফৎ যোগাযোগ বলে সম্মানে লাগলও একটু।

তিনি আবার আপনার কাছে ঘোরাঘুরি করছেন কেন?

অমিতাভ ঘোষ কাজে মন দিতে যাচ্ছিল, বিরক্ত হয়ে মুখ তুলল। কিন্তু ধীরাপদর মুখের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি গেল। কিছু জানে না বলেই মনে হল হয়ত। বলল, তার চাকরি গেছে। পুরনো কর্মচারী বলে বরখাস্ত করার আগে অফিস তাকে তিন-চারটে ওয়ার্নিং দিয়েছে, চুরি-জোচ্চুরি কিছু বাকি রাখেনি সে—খোঁজ নিতে গিয়ে আমি অপ্রস্তুত।

পায়ের নিচে সত্যিই কি মাটি দুলছে ধীরাপদর? কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল আরো খেয়াল নেই। কখন নিজের ঘরে এসে বসেছে তাও না। মূর্তির মত বসেই আছে।...গণুদার চাকরি গেছে! কিন্তু গণুদার কথা একবারও ভাবছে না ধীরাপদ। সোনাবউদির সংসার-চিত্রটা চোখে ভাসছে। সোনাবউদির মুখ, উমার মুখ, ছোট ছোট ছেলে দুটোর মুখ। শেষে সকলকে ছাড়িয়ে শুধু সোনা-বউদির মুখ। যে সোনাবউদি সংসারের অনটন সত্ত্বেও অন্যের দেওয়া বাড়তি টাকা সরিয়ে রেখে কুকার কেনার নাম করে ফিরিয়ে দেয়। যে সোনাবউদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপোস দেখবে তবু হাত পাতবে না।

এই মুহূর্তে ধীরাপদর সুলতান কুঠিতে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। গিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, সোনাবউদি তুমি কিছু ভেবো না, আমি তো আছি। রণু হলে তাই করত, তাই বলত। কিন্তু এই এক ব্যাপারে সোনাবউদি রণুর থেকে অনেক তফাত করে দেখবে ওকে, অনেক নির্মম তফাতে ঠেলে দেবে।

তবু নিশ্চেষ্ট বসে থাকা গেল না। বিকেলের দিকে গণুদার কাগজের অফিসে এলো খোঁজখবর নিতে। কি হয়েছে, কেন হয়েছে, কবে হয়েছে জানা দরকার। কিন্তু খবর করতে এসে ধীরাপদ পালাতে পারলে বাঁচে। হেন সহকর্মী নেই যার কাছে গণুদা দু-দশ-বিশ টাকা ধারে না। এমন কি দীর্ঘদিনের চেনা

ওপরঅলাদের অনেকের কাছ থেকেও ভাঁওতা দিয়ে টাকা ধার করেছে নাকি। সে টাকায় জুয়া খেলেছে, রেস খেলেছে। কাজ-কর্মও ফাঁকির ওপর চলছিল। কিন্তু একটু অপরাধে কাগজের অফিসের চাকরি যায় না। লেখা ছাপা খবর ছাপার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রত্যাশী লোকের কাছ থেকে টাকা খেতে শুরু করেছিল গণুদা। পুরনো লোক, তাই ওপরঅলারা ডেকে অনেকবার সাবধান করেছেন। কিন্তু এমন মতিচ্ছন্ন হলে কে আর তাকে বাঁচাবে? শুধু চাকরি খুইয়ে বেঁচেছে এই ঢের। চাকরি গেছে তাও দশ-বারো দিন হয়ে গেল।

গণুদা কেন তাকে ডিঙিয়ে সোজা অমিতাভ ঘোষকে ধরেছিল বোঝা গেল। সেখান থেকে নিরাশ হয়ে এবারে হয়ত তার কাছে আসবে। এলে শুধু নিরাশ হওয়া নয়, কপালে আরো কিছু দুর্ভোগ আছে। এর থেকে গণুদার মৃত্যু-সংবাদ পেলেও ধীরাপদ এত অসহায় পঙ্গু বোধ করত না। কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে সুলতান কুঠির দিকেই এসেছে। কিন্তু সুলতান কুঠি পর্যন্ত পা চলেনি। দূরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে। কি করতে যাবে সে, কি বলতে, কি দেখতে···। কিছু করা যাবে না, কিছু বলা যাবে না। দেখার যা সেটা না গিয়েও দেখতে পাচ্ছে। এক পরিবারের অনশনের পরিপূর্ণ চিত্রের ওপর সোনাবউদির স্তব্ধকঠিন মুখখানা সারাক্ষণই দেখতে পাচ্ছে। তার সামনে গিয়ে দাড়াতে আজ কেন জানি ভয়ই করছে ধীরাপদর। সে ফিরে গেছে।

একে একে তিন-চারটে দিন গেল, গণুদা আসেনি। এসে ফল হবে না বুঝেছে বোধ হয়। কিংবা রমণী পণ্ডিত হয়ত আর কোনো লোভের রাস্তা দেখিয়েছেন তাকে। মানুষের কাঁধে শনি ভর করে শুনেছে। গণুদার কাঁধে রমণী পণ্ডিত শনি। কিছুকাল আগের সোনাবউদির একটা কথা বুকের তলায় খচখচ করে উঠল, বাতাস শুষে নিতে লাগল। যেদিন জয়েন্ট লাইফ ইন্‌সিওরেন্স হয়েছিল দুজনার আর তারপরে আগের মত একসঙ্গে খাওয়ার কথা বলতে এসে গণুদা ওর তাড়া খেয়ে পালিয়েছিল—কথাটা সেইদিন বলেছিল সোনাবউদি। ধীরাপদ কৈফিয়ৎ চেয়েছিল, গণুদার চাকরির উন্নতি হয়েছে বলে তার ওপর রাগ কেন? সোনাবউদি প্রথমে ঠাট্টা করেছিল, পরে অন্যমনস্কের মত বলেছিল, রাগ নয়, কি জানি কি ভয় একটা···অনেক লোভে শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষতি, বোধ হয় সেই ভয়।

অনেক লোভে সেই অনেক ক্ষতিই হয়ে গেল শেষে।

বড় সাহেবের ফেরার অপেক্ষা। ধীরাপদ উদগ্রীব হয়েই প্রতীক্ষা করছে। তিনি এলে ওর সুলতান কুঠিতে ফিরে যাওয়া কিছুটা সহজ হবে। কাজের

তাগিদে ঘর ছাড়তে হয়েছিল, কাজ শেষ হলে ঘরে ফিরেছে। কারো কিছু বলারও নেই, ভাববারও নেই। দু-চার ঘণ্টার জন্য গিয়ে ফিরে আসার থেকে সেটাই অনেক ভালো। কিন্তু সাত-আট দিন হয়ে গেল, বড় সাহেবের ফেরার লক্ষণ নেই। সেখানকার অনুষ্ঠান কবে শেষ হয়েছে। কাগজে তার বিবরণও বেরিয়েছে। এক শিল্প-বাণিজ্য সাপ্তাহিকে সপ্রশংস মন্তব্যসহ বড় সাহেবের পাঁচ গোটাগুটি ছাপা হয়েছে। একটা মেডিক্যাল জার্নালে ভেষজ-শিল্পে মিস্টার মিত্রের আশা-সঞ্চারী আলোকপাত প্রতিফলিত হয়েছে। বড় সাহেবের চিঠি না পেলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে ভাবত ধীরাপদ। তিনি লিখেছেন, খুব ভালো আছেন, ফিরতে দিনকতক দেরি হতে পারে। যতটা সম্ভব আগামী নির্বাচনের জমি নিড়িয়ে আসছেন হয়ত, নইলে দেরি হওয়ার কারণ নেই।

কিন্তু আছে কারণ। সেটা ধীরাপদকে কেউ চোখে খোঁচা দিয়ে দেখিয়ে না দিলে জানা হত না। দেখিয়ে দিল পার্বতী।

টেলিফোনে হঠাৎ গলার স্বর ঠাওর করতে পারেনি ধীরাপদ, অনেকটা সোনা-বউদির মত ঠাণ্ডা গলা···মামাবাবু সুবিধেমত একবার এলে ভালো হয়, তার দু একটা কথা ছিল।

ধীরাপদ বিকেলে যাবে বলেছে। টেলিফোন নামিয়ে রেখে অবাক হয়েছে। কৌতূহল সত্ত্বেও টেলিফোনে কি জানি কেন কিছুই জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারে নি। টেলিফোনটা চারুদিই করালেন কিনা বুঝতে পারছে না, নইলে পার্বতীর কি কথা থাকতে পারে তার সঙ্গে?

পার্বতী বাইরের ঘরেই বসে ছিল। তার অপেক্ষাতেই ছিল হয়ত। পায়ের শব্দে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল না, বলল, বসুন—

এই মেয়ের মুখ দেখে কোনদিনই কিছু বোঝার উপায় নেই। ধীরাপদ বসল।—কি ব্যাপার, চারুদির শরীর ভালো তো?

পার্বতী কথা খরচ না করে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ ভালো। শান্ত মন্থর গতিতে ভিতরের দরজার দিকে এগোলো।

শোনো—। ধীরাপদর খটকা লাগল কেমন, বলল, আমি চা-টা কিছু খাব না কিন্তু, খেয়ে এসেছি।···চারুদি বাড়ি নেই?

পার্বতী দরজার কাছেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। চোখ দুটো তার মুখের ওপর স্থির হল একটু। মাথা নাড়ল আবারও। বাড়ি নেই। পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল আবার।

কর্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাকে ডেকে আনার দরুন ধীরাপদ বিরূপ না হলেও

অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে।—বোসো, কি কথা আছে বলছিলে?

পার্বতী বসল। সোফায় ঠেস দিয়ে নয়, দাঁড়িয়ে থাকার মত স্থির ঋজু। দ্বিধাশূন্য দৃষ্টিটা ধীরাপদর মুখের ওপরে এসে থামল। বলল, সেদিন আমাকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে আপনার কিছু কথা হয়ে থাকবে।···কি কথা, আমার জানার একটু দরকার হয়েছে।

ধীরাপদর অস্বস্তি বাড়লো আরো।—তিনি কোনরকম দুর্ব্যবহার করেছেন তোমার সঙ্গে?

না। মাথা নাড়ল, ভালো ব্যবহার করেছেন। আমার সেটা আরো খারাপ লেগেছে।

হয়ত বলতে চায় মায়ের ব্যবহার এরপরে আরো কৃত্রিম লেগেছে। বিব্রত ভাবটা হাসি-চাপা দিতে চেষ্টা করল ধীরাপদ, বলল, তোমার খারাপ লাগার মত আমি তাঁকে কিছু বলতে পারি মনে করো নাকি?

এও কৃত্রিম কথাই যেন কিছু। পার্বতী চুপচাপ অপেক্ষা করল একটু, তারপর আবার বলল, আপনার সঙ্গে মায়ের কি কথা হয়েছে জানতে পেলে ভালো হত।

সেদিনও আর একজন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বড় সাহেবের সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে জানতে পেলে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিতে সুবিধে হত। লাবণ্যর সঙ্গে পার্বতীর এই জানতে চাওয়ার সুরে তফাৎ নেই খুব, কিন্তু তবু কোথায় যেন অনেক তফাত। জেনে সেই একজন বুঝে চলবে, আর এই একজন যেন সব বোঝাবুঝির অবসান করে দেবে। কি হয়েছে ধীরাপদ জানে না, কিন্তু এই নিরুত্তাপ মুখের দিকে চেয়ে অন্তস্তলের দাহ অনুভব করতে পারে। কিছু না জেনেও ধীরাপদ সেটুকু মুছে দেবার জন্যে ব্যগ্র। হাসিমুখেই বলল, তাহলে চারুদি আসুক, আমি অপেক্ষা করছি—তাঁর সামনেই শুনো কি কথা হয়েছে।

পার্বতী বলল, মা এখানে নেই। কানপুরে গেছেন।

ধীরাপদর বোকার মতই বিস্ময়, সে কি! বড় সাহেবের সঙ্গে? প্রশ্নটা করে ফেলে নিজেই অপ্রস্তুত একটু। সেদিন অমন ধাক্কা খাওয়ার পর চারুদি অনেকক্ষণ চুপচাপ কি ভেবেছিলেন মনে পড়ল, তারপর বড় সাহেব কবে যাচ্ছেন খোঁজ নিয়েছিলেন।

মুখের দিকে চেয়ে থেকে পার্বতী তেমনি নির্লিপ্ত গলায় আবার বলল, যাবার আগে তিনি বাড়ির দলিল আর ব্যাঙ্কের বইগুলো সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। আর টেলিফোনে বড় সাহেবকে তাঁর নামের ব্যবসায়ের কি সব কাগজপত্র সঙ্গে নিতে

বলেছেন শুনেছি। আমাকে শাসিয়ে গেছেন, আমি মরলেও তোর কোনো ভাবনা নেই।

কথাবার্তায় পার্বতীর এই যান্ত্রিক মিতব্যয়িতার নিগূঢ় তাৎপর্য ধীরাপদ আর এক দিনও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে গিয়েছিল। আজও কি বলবে ভেবে না পেয়ে শেষে হাসতেই চেষ্টা করল।—তাহলে ভাবছ কেন ?

মা অন্যায় কিছু প্রস্তাব করবেন আর বড় সাহেবকে দিয়ে অন্যায় কিছু স্বীকার করিয়ে নেবেন। নইলে বাড়ির দলিল নিতেন না। ব্যবসায়ের কাগজপত্রও সঙ্গে নিতে বলতেন না।

ধীরাপদই যেন কানাগলির দেয়ালে পিঠ দিয়েছে। বলল, অন্যায় মনে হলে বড় সাহেব তা করবেন কেন ?

মা কাছে থাকলে করবেন। মা করাতে পারেন।

কানের কাছটা হঠাৎ গরম ঠেকতে ধীরাপদ বিব্রত বোধ করতে লাগল। রমণীর জোরের এই অনাবৃত দিকটার দিকে নিভৃতের দু চোখ ধাওয়া করতে চাইছে। সেই চোখ দুটো জোর করেই সামনের দিকে ফেরালো সে। পার্বতী নির্বিকার তেমনি। যেন যন্ত্রের মুখ দিয়ে দুটো নির্ভুল যান্ত্রিক কথা নির্গত হয়েছে শুধু, তার বেশি কিছু নয়।

স্বল্পক্ষণের নীরবতাও ভারী ঠেকছে। ধীরাপদ আস্তে আস্তে বলল, সেদিন চারুদির সঙ্গে আমার এ প্রসঙ্গে একটি কথাও হয়নি। নিজের ভুল শুধরে তিনি তোমাকে কাছে পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন হয়ত। তুমি সেটা অন্যায় ভাবছ কেন ?

আমি কাছেই আছি, তিনি আমাকে তাড়াবার রাস্তা করছেন। আপনি দয়া করে এসব বন্ধ করুন। সম্পত্তি দিয়ে আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করলে আরো ভুল হবে। তাঁর আমাকে কিছু দেবার নেই আমি জানি। সেজন্যে আমি তাঁকে কখনো দুষিনি।

এতগুলি কথা একসঙ্গে বলেনি পার্বতী। একটা একটা করে বলেছে। একটা ছেড়ে আর একটা বলেছে। ধীরাপদ অনেকক্ষণ ধরে শুনেছে যেন। অনেকক্ষণ ধরে কানে লেগে আছে। পার্বতীকে আর কিছু বোঝাতে চেষ্টা করেনি সে, কোনরকম আশ্বাসও দিয়ে আসেনি। এতখানি স্পষ্টতার মধ্যে কথা শুধু শব্দ হয়ে কানে বাজবে। চারুদি ওকে টোপের মত একজনের সামনে ঠেলে দিতে চেয়েছেন, সেইখানেই ওর আপত্তি, সেইজন্যেই বিরোধ। নইলে চারুদি কোথায় রিক্ত সে জানে। তাঁকে পার্বতী দুষবে কেন ?

না, ধীরাপদ ঠিক এভাবে ভাবেনি বটে কখনো। অভিযোগ পার্বতীর একজনের ওপরেই থাকা সম্ভব। সে অমিতাভ ঘোষ। যে মানুষটা তার জীবনের আঙিনায় বার বার এগিয়ে এসেও আর এক দুর্বল পিছুটানে ফিরে ফিরে যাচ্ছে। আর সকলের অস্তি তুচ্ছ পার্বতীর কাছে।

দায়ে পড়ে চারুদি সেদিন বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, অতীতের কোনো দাগ লেগে নেই ওর গায়ে—পার্বতীর আজকের পরিচয়টাই সব। কথাটা যে কত যথার্থ, ধীরাপদ আজ উপলব্ধি করছে। অনেক বিস্ময় সত্ত্বেও আর চারুদির নিরুপায় সুপারিশ সত্ত্বেও স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে এই পাহাড়ী মেয়েকে সেদিন অমিতাভ ঘোষের যোগ্য দোসর ভাবতে পারেনি সে। দোসর আজও ভাবছে কিনা জানে না। কিন্তু যোগ্যতার প্রশ্নটা মন থেকে নিঃশেষেই মুছে গেছে।

পথ চলতে চলতে ধীরাপদর কেমন মনে হল, অমিতাভ ঘোষের পিছুটানের ওই দুর্বল সুতোটাও ইচ্ছে করলে পার্বতী অনায়াসে ছিঁড়ে দিতে পারে। তা না দিয়ে সে শুধু দেখছে। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের টানাপোড়েন দেখছে। এই দেখাটা নির্লিপ্ত বিদ্রূপের মত। পুরুষচিত্ত বিচলিত করে তোলার মত। হয়ত বা ঈষৎ উগ্র করে তোলার মতও।

সবে সন্ধ্যে তখন। এরই মধ্যে বাড়ি ফিরলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা বা মানুকের কচকচি শোনা ছাড়া আর কাজ নেই। দু-দুটো কাজের তাড়া মিটে যেতে অফিস ছুটির পরে অখণ্ড অবকাশ। কিন্তু আজ এক্ষুনি বাড়ি ফিরে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেও সময় ভালো কাটবে, সময় কাটানোর কিছু রসদ পার্বতী দিয়েছে। তবু এক্ষুনি ফেরার ইচ্ছে নেই ধীরাপদর, কারণ ও রসদ ঠুকরে ঠুকরে শেষে এক দুর্বল আসক্তির বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছে নেই। তার অন্দরমহলের নিরাসক্ত দর্শকটি কবে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে। যখন-তখন সেই নিভৃতে হানা দিতে দ্বিধা এখন।

ধীরাপদ মেডিক্যাল হোমে এসে উপস্থিত। রমেন হালদারকে বাইরে ডেকে নেবে, তারপর বসবে কোথাও। তার কথা শোনা দরকার, শুনতে শুনতে তার মুখখানা বেশ ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার, আর সব শেষে তাকে কিছু বলাও দরকার। এলো বটে, কিন্তু আসার তাগিদটা তেমন আর অনুভব করছিল না। বলার আছে কি, কাঞ্চন যাকে ভাবছে সে কাচ ছাড়া আর কিছু নয়—তাই বোঝাবে বসে বসে?

দোকানে শাস্ত্য-ভিড় লেগেছে। খদ্দেরের ভিড় আর লাবণ্যর রোগীর ভিড়। কিন্তু দোকানে ঢুকে একনজর তাকিয়েই বুঝল পার্টিশন-ঘরের ওধারে লাবণ্য অনুপস্থিত। অবশ্য তার আসার সময় উত্তরে যায়নি এখনো। মনে মনে ধীরাপদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, তার সঙ্গে এখানে দেখা না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় ছিল কেন কে জানে।

কাউণ্টারে রমেন হালদারকেও দেখা গেল না। এদিক-ওদিক কোথাও না। ভিতরে থাকতে পারে। ধীরাপদ ভিতরে ঢুকে পড়বে কিনা ভাবল, কাঞ্চন কেমন কাজ করছে দেখে গেলে হয়। কিন্তু তার আগে ভিড়ের ফাঁকে ম্যানেজারের চোখ পড়েছে তার ওপর। ঈষৎ ব্যস্ততায় কাউণ্টারের ওপাশ ঘুরে বেরিয়ে আসছেন তিনি। আজও ওকে দেখলে ভদ্রলোক বিব্রত বোধ করেন বেশ।

মিনিট পাঁচ-সাত দোকানে ছিল, তারপর বাড়ির দিকে পা বাড়াতে হয়েছে। রমেন আসেনি। ম্যানেজারের দ্বিধাগ্রস্ত দুই গোল চোখে ছেলেটার প্রতি অভিযোগের আভাস ছিল। ধীরাপদর নরম আচরণে ভরসা পেয়ে ভদ্রলোক সেটুকু ব্যক্ত করেছেন। প্রযোজনে ওদের ডিউটি উল্‌টে পাল্‌টে দিয়েছেন তিনি, রমেনের আর ওই কাঞ্চন মেয়েটির। মেয়েটির দশটা-পাঁচটা ডিউটি করেছেন। সে-ও আজ বাড়িতে জরুরী কাজের কথা জানিয়ে ছুটোর সময় ছুটি নিয়ে চলে গেছে। রমেনের তিনটে থেকে দশটা ডিউটি, এখনো আসেনি যখন আর আসবেও না। কোনো খবরও দেয়নি। আগে দু-দশ মিনিটের ছুটি দরকার হলেও বলে রাখত, বলে যেত। এখন দু ঘণ্টা এদিক-ওদিক হলেও বলা দরকার মনে করে না। জিজ্ঞাসা করলে চুপ করে থাকে। শুধু জেনারেল সুপারভাইজার নয়, এখানকারও অনেকে ছেলেটাকে ভালবাসে। কিন্তু কিছুদিন হল ছেলেটার মতিগতি বদলাচ্ছে, বিশেষ করে ওই মেয়েটি এখানে চাকরিতে ঢোকার পর থেকে।

ধীরাপদ তেতে উঠেছিল, ওপরতলার উঁচু মেজাজে বলেছিল, আপনি রিপোর্ট করেন না কেন? বলেই মনে পড়ল রিপোর্ট উনি করেছেন, লাবণ্য সরকার ম্যানেজারের নাম করে এ প্রসঙ্গে তাকে দু-এক কথা বলেও ছিল।

ভদ্রলোকও সেই কথাই জানালেন—রিপোর্ট করা হয়েছিল, শুনে মিস সরকার চুপ করে ছিলেন।

ম্যানেজার মুখে না বলুন, মনে মনে তিনি শুধু ওই মেয়েটিকেই দায়ী করেন নি নিশ্চয়। একজনের প্রশ্রয় না থাকলে ছেলেটার চালচলন এভাবে বদলায় কি করে?...খুব মিথ্যেও নয় বোধ হয়। না, আর প্রশ্রয় দেবে না ধীরাপদ,

এর বিহিত করবে, কড়া কৈফিয়ৎ নেবে। কিন্তু বাড়ি পৌঁছবার আগেই রূঢ় সঙ্কল্পটা কখন এক বিপরীত বিশ্লেষণের মধ্যে নিরর্থক হয়ে গেল, নিজেও ভালো করে টের পায়নি। কৈফিয়ৎই বা কি নেবে, বিহিতই বা কি করবে? প্রবৃত্তির এ অমোঘ সম্মোহন থেকে কে কবে অব্যাহতি পেল? ও বস্তুটিকে লাগামের মুখে রাখার জন্যে মহাপুরুষদেরও কি কম চাবুক চালাতে হয়, কম ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়? ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরও সত্তার কণায় কণায় কামনার কাঁপন লাগে কেন? চোখ কে কাকে রাঙাবে, নিয়মের রাস্তা খোলা না থাকলে অনিয়মের রাস্তায় না হেঁটে করবে কি রমেন হালদার?

ধীরাপদর হাসি পাচ্ছে, রমণী নাকি অবলা, দুর্বল। কিন্তু ওইটুকুই বোধ হয় বিধাতার দেওয়া আত্মরক্ষার সেরা অস্ত্র তার। চরাচরের কোন্ জীবকে অস্ত্র না দিয়ে পাঠিয়েছে বিধাতা? কাউকে খোলস দিয়েছে, কাউকে নখদন্ত দিয়েছে, কাউকে বাহুবল দিয়েছে। রমণীকে অবলার খোলস দিয়েছে—ওটা খোলস। ওর আড়ালে সৃষ্টির আর বিপর্যয়ের শক্তি। খানিক আগে চারুদির অন্যায় কিছু প্রস্তাব করা বা বড সাহেবকে দিয়ে অন্যায় কিছু স্বীকার করিয়ে নেওয়ার কথা বলছিল পার্বতী, আর ধীরাপদ বলেছিল, অন্যায় মনে হলে বড সাহেব তা করবেন কেন? পার্বতী জবাব দিয়েছে, মা কাছে থাকলে করবেন। মা করাতে পারেন।

ধীরাপদর মনে হল, শুধু চারুদি নয়, পারে সকলেই—নারী মাত্রেই। চারুদি পারে, পার্বতী পারে, লাবণ্য সবকার পারে, সোনাবউদি পারে, রমণী পণ্ডিতের মেয়ে কুমু পারে, কারখানার শ্রমিক তানিস সর্দারের বউটা পারে, আর পথের অপুষ্টযৌবন পসারিনী কাঞ্চনও পারে। আওতার মধ্যে পেলে সকলেই পারে।

কানের কাছটা গরম ঠেকতে ধীরাপদ আত্মস্থ হল। যে কারণে নিজের অন্দরমহলে হানা দিতে দ্বিধা আজকাল, নিঃশব্দে সেদিকেই পদসঞ্চার ঘটছে অনুভব করা মাত্র চিন্তা-বিস্মৃতির ঝোঁক কাটল।

ঘরে ঢুকে জামার বোতাম খোলা হয়নি তখনো, মানকের আগমন ঘটল। তার দিকে একনজর চেয়েই ধীরাপদর মনে হল সংবাদ আছে। অন্যথায় তার সদা-ক্ষুব্ধ মুখে নিস্পৃহ অভিব্যক্তি বড় দেখা যায় না। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, বাবু খাবেন নাকি কিছু?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, এ সময়ে কিছু খাবে না।

এই জবাব মানকের জানাই ছিল, কর্তব্য-বোধে খোঁজ নেওয়া, এবারে ফিরলেই হয়। যাবার জন্য পা বাড়িয়েও ঘুরল আবার, এই রকমই রীতি তার।

কথায় কথায় বলল, ছোট সাহেবের বেশ শরীর খারাপ হয়েছে বোধ হয় বাবু, সেই বিকেল থেকে শুয়ে আছেন। কেয়ার-টেক্-বাবু শুধোতে বললেন, শরীর ভালো না। এখনো শুয়ে আছেন, ঘরে বড় আলোটাও জ্বালেননি, সবুজ আলো জ্বলছে।

চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে ধীরাপদ অপেক্ষা করল একটু। মানকের ভীরু হাবভাব আর ঢোক গেলা দেখেই বোঝা যায় তার সমাচার শোনানো শেষ হয়নি। বলবে কি বলবে না সেই দ্বিধা, তারপর বলেই ফেলল, মেম-ডাক্তারও খবর পেয়েই দেখতে এয়েছেন বোধ হয়—

জামার বোতাম খোলা হল না ধীরাপদর, হাতটা আপনি নেমে এলো। জিজ্ঞাসা করল, কখন এসেছেন ?

এই তিন-পো ঘণ্টা হবে।

বাইরে কোনো গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই মনে হতে আবারও জিজ্ঞাসা করল, চলে গেছেন ?

না, এখনো আছেন। যাই, ভাত চড়িয়ে এসেছি অনেকক্ষণ—

মানকের চকিত প্রস্থান। ধীরাপদ বিছানায় বসল, ভিতরে ওটা কিসের প্রতিক্রিয়া বোঝা দরকার। কিন্তু বোঝা হল না, কি একটা তাগিদ আবার তাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিতে চাইছে।...ছোট সাহেবের অসুস্থ হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়, মেম-ডাক্তারের দেখতে আসাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়।...কিন্তু মাঝে তিন-পো ঘণ্টা সময় ডুবেছে...ছোট সাহেবের ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে।

না, যে তাগিদটা অন্ধের মত ভিতর থেকে ঠেলছে, তাকে সে প্রশ্রয় দেবে না, কোনো ভদ্রলোকের তা দেওয়া উচিত নয়। তবু উঠে পায়ে পায়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল সে। ধীরাপদ আসেনি, তার আসার ইচ্ছেও নেই—যে পতঙ্গ একদিন শিখা দেখেছিল, সে-ই ঠেলে নিয়ে এলো তাকে। আবার ওটা শিখার আঁচ পেয়েছে।

ধীরাপদ নিজেকে চোখ রাঙাল, ঘরের দিকে গলা ধাক্কা দিতে চেষ্টা করল বারকতক, তারপর সিঁড়ি ধরে উঠতে লাগল। ঘরে এসে রবারের স্লিপার পরেছিল। শব্দ নেই। নিজের পায়ের শব্দ কানে এলেও হয়ত সচেতন হতে পারত, থামতে পারত। সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে আরো দ্রুত উঠতে লাগল, পাছে দহন-লোভী পতঙ্গটা ওর চোখরাঙানি দেখে ভয় পায়, হার মানে। কি হবে ? মানকের মুখে অসুস্থতার খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি দেখতে এসেছে, বড় সাহেবের অনুপস্থিতিতে দেখতে আসাটা কর্তব্য ভেবেছে। মানকের চাকরি

যাবে ? চাকরি এখন কে কত নিতে পারে তার জানা আছে।

সিঁড়ির ডাইনের ঘরটায় শাদা আলো জলছে। তারপর বড় সাহেবের ঘরটা অন্ধকার। তার ওধারে ছোট সাহেবের ঘর। বড় সাহেবের ঘরের মাঝামাঝি এসে পা দুটো স্থাণুর মত মাটির সঙ্গে আটকে থাকল খানিক, ছোট সাহেবের ঘরে সবুজ আলোই জলছে এখনো, পুরু পরদার ফাঁকে সবুজ আলোর রেশ।

ধীরাপদ কখন এগিয়ে এলেছে জানে না, পরদাটা ক' আঙুল সরাতে পেরেছিল তাও না। আড়ষ্ট আঙুলের ফাঁক দিয়ে পরদাটা খসে গিয়ে আবার স্থির হয়েছে। ...ঘরের দুজন পরদা নড়েছিল দেখেনি, পরদা দুলেছিল দেখেনি। দেখার কথাও নয়।

ধীরাপদ যা দেখেছে, তাও দেখবে ভাবেনি।

একটা চারপায়া কুশনে স্থিরমূর্তির মত বসে আছে লাবণ্য সরকার—কোন-দিকে দৃষ্টি নেই তার। আর মেঝেতে জানু পেতে বসে ছোট ছেলের মত দু হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে কোলে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ছোট সাহেব সিতাংশু মিত্র। আহত ভূলুণ্ঠিতের মত সমর্পণের ব্যাকুলতায় দু হাতে সবলে তার কটি বেষ্টন করে কোলে মুখ গুঁজে আছে। মনে হয়, যা তাকে বোঝানো হয়েছে তা সে বুঝছে না বা বুঝতে চাইছে না। লাবণ্যর হাত দুটো তার মাথার ওপর...বিরূপ নয় হয়ত, কিন্তু সঙ্কল্পবদ্ধ।

সম্বিৎ ফিরতে ধীরাপদ চোরের মত নিঃশব্দে পালিয়ে এলো। নিচের ঘরে —একেবারে বিছানায়। নিজের বুকের ধকধকানি শুনতে পাচ্ছে। আড়ষ্ট নিস্পন্দের মত কতক্ষণ বসে ছিল ঠিক নেই।

শয্যা ছেড়ে নেমে এলো আবার হলঘরের বাইরে, অত দূরের সিঁড়ি ধরে কারো পায়ের শব্দ কানে আসেনি নিশ্চয়। কিন্তু আশ্চর্য, মন বলল নেমে আসছে কেউ, লাবণ্য সরকার ফিরে চলল। ধীরাপদ বাইরের দিকের জানালাটার কাছে এসে দাঁড়াল। মিথ্যে নয়, লাবণ্য সরকারই। আব্ছা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না, ধীর মন্থর পায়ে হেঁটে চলেছে। কিন্তু ধীরাপদর চোখে অস্পষ্ট নয় কিছু। নিজের অগোচরে দু চোখ ধকধকিয়ে উঠেছে—ওই নারী যেন নিজেকে নিয়েই সম্পূর্ণ।

ফিরে এসে এতক্ষণে ঘরের আলো জালল ধীরাপদ। টেবিলের সামনের চেয়ারটায় এসে বসল, টেবিল ল্যাম্পটাও খট্ করে জেলে দিল। টেবিলে পড়ার মত বই নেই একটাও—নেই বলে বিরক্তি। মাসিকপত্র আছে দু-একটা, হাতের কাছে টেনে নিয়েও ওগুলোকে জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু মনে হল না। আফিসের

ফাইলও আছে একটা, জরুরী নয়, সময় কাটানোর জন্যেই আনা—দেখে রাখতে ক্ষতি কি।

তাও বেশিক্ষণ পারা গেল না. অনুপস্থিত দৃষ্টি যে নিভৃতে বিচরণ করছে আর যে চিত্র লেহন করছে—সেখানে এই আলো নেই, এই টেবিল-চেয়ার নেই, ফাইল নেই—কিছু নেই। সেই ঘরে সবুজ আলো, কুশনে মূর্তিমতী যৌবন, মেঝেতে হাঁটু মুড়ে সেই যৌবনের কোলে মাথা খুঁড়ছে এক পুরুষ। ধীরাপদ দেখছে··· রমণীর দেহতটে দুই বাহুর নিবিড় বেষ্টন দেখছে···দুই হাতের দশ আঙুলের আকৃতি চোখে লেগে আছে।

চকিতে ধীরাপদ আর এক দফা টেনে তুলল নিজেকে, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। মানকেটা সেই থেকে কি করছে, তাকে পেলেও হত—ছুটো বাজে কথা বলা যেত আর দু'শ বাজে কথা শোনা যেত। একবার কেয়ার-টেক্-বাবুর নামটা কানে তুলে দিলে আধ ঘণ্টা নিশ্চিন্তি।

মান্‌কের খোঁজে বাইরে আসতে সিঁড়ির ওধারে চোখ গেল। অমিতাভ ঘোষ ফিরেছে, সামনের বড় ঘরটায় আলোর আভাস। কখন ফিরল আবার? ওই বিস্মৃতির মধ্যে ধীরাপদ কতক্ষণ তলিয়েছিল? মানকেকে বাতিল করে তাড়াতাড়ি ওদিকেই পা বাড়াল, একেবারে বিপরীত কিছুর মধ্যেই গিয়ে পড়া দরকার। মানকের থেকেও এই লোকের সঙ্গে লেগে সহজ হওয়া সহজ। অমিতাভ তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেও একটুও আপত্তি হবে না, একটুও ক্ষুব্ধ হবে না সে।

যা ভেবেছিল তাই—গবেষণা-চর্চায় বসে গেছে। বিছানার চতুর্দিকে ছড়ানো সেই বই আর চার্ট আর রেকর্ড। কিন্তু মেজাজ অপ্রসন্ন মনে হল না, হৃষ্টচিত্তে সিগারেট টানছে আর একটা গ্রাফের বাঁকাচোরা নক্সা দেখছে। সবে শুরু হয়ত, এখনো ভালো করে মন বসেনি—মন বসলে ভিন্ন মূর্তি।

কতক্ষণ এসেছেন? প্রথমেই এ প্রশ্নটা কেন বেরুল মুখ দিয়ে তা শুধু ধীরাপদই জানে।

এই তো। বসুন, কি খবর···

এক মুহূর্ত থমকালো ধীরাপদ, খবরটা দেবে নাকি? সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূকুটিশাসনে সংযত করল নিজেকে, সামনের চেয়ারটার বইয়ের স্তূপ খানিকটা সরিয়ে বাকি আধখানায় বসল। তারপর গম্ভীর মুখে জবাব দিল, খবর ভালো। আজকের খরগোশটা প্রাণে বেঁচেছে, হিমোগ্লোবিন আশাপ্রদ, ব্লাডপ্রেসার উঠতির দিকে, বিহেভিয়ারও ভালো, পাগলামো কম করছে—

অমিতাভ ঘোষ হা-হা শব্দে হেসে উঠল। জবাবটা এত হাসির খোরাক হবে ভাবেনি, তেমনি গম্ভীর মুখে ধীরাপদ আবারও বলল, আচ্ছা, মরে গেলে ভদ্রলোকে কি করেন, ফেলে দেন? খাওয়া যায় না? টাটকাই তো—

সিগারেট মুখে অমিতাভ ঘোষ তার দিকে ঘুরে বলল।—পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে, এরপর ইঁদুর গিনিপিগ বেড়াল বাঁদর অনেক কিছু লাগবে, সেগুলোও পাঠিয়ে দেব'খন। তরল ভ্রূকুটি গিয়ে কণ্ঠস্বর চড়ল, খাওয়াচ্ছি ভালো করে, ভালো চান তো মামাকে বলে আমার সব ব্যবস্থা চট্ করে করে দিন।

মামাকে দিয়ে হবে না—। ব্যবস্থাটা একটা চট্ করেই করা দরকার সেটা সেও অনুমোদন করল যেন, বলল, কালই 'সি-এস-পি-সি-এ'কে একটা খবর দেব ভাবছি।

এবারেও রাগতে দেখা গেল না, হাসিমুখেই অমিতাভ বড় করে চোখ পাকালো, বলল, ওদের ছেড়ে আপনার ওপর হাত পাকাতে ইচ্ছে করছে। লঘু টিপ্পনী, কি হচ্ছে বুঝলে আপনি হয়ত সেধেই আত্মোৎসর্গ করতে আসবেন।

ধীরাপদর ভালো লাগছে, সুস্থ বোধ করছে। কিন্তু অপর দিকে পুঞ্জীভূত উদ্দীপনার উৎসটাতেই হঠাৎ নাড়া পড়ল যেন। সাগ্রহ বিপরীত উক্তি শোনা গেল মুখে, বোঝার ইচ্ছে থাকলে না বোঝারই বা কি আছে, আসলে কোনো ব্যাপারে ফ্যাক্টরীর কারো কোনো কৌতূহলই নেই—সেই ছকে-বাঁধা সব কিছুতে গা ঢেলে বসে আছে, আর যেন কিছু করারও নেই ভাবারও নেই। আজই নাকি ধীরাপদর কথা ভাবছিল সে, আলোচনা করার কথা ভাবছিল— অনেক রকম রিসার্চের প্ল্যান মাথায় আছে তার, একটাও অসম্ভব কিছু নয়, তার মধ্যে সব প্রথম যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে সেটা হল চিলেটেড আয়রন—

এবারে ধীরাপদ ভিতরে ভিতরে ঘাবড়েছে একটু। জলের মত সহজ বস্তুটা লোহার মতই তার গলায় আটকানোর দাখিল। ওদিকে উৎসাহের আতিশয্যে মোটা মোটা দু-তিনটে বই খোলা হয়ে গেল, খানিকটা করে পড়া হয়ে গেল, জার্নালে টান পড়ল, রেকর্ড আর চার্ট আর তথ্যের ফাইলে টান পড়ল। একাগ্র মনোযোগে বুঝতে না হোক শুনতে চেষ্টা করছে ধীরাপদ, আর মোটা কথাটা একেবারে যে না বুঝছে তাও না। আসল বক্তব্য, ওই ভেষজ পদার্থটি দেহগত নানা সমস্যার একটা বড় সমাধান, বিশেষ করে রক্তাল্পতার ব্যাপারে। দেশে-বিদেশে সর্বত্র খুব চালু ওটা এখন, কিন্তু এ পর্যন্ত ওটা মুখে খেতে দেওয়া হচ্ছে— চীফ কেমিস্টের ধারণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওই দিয়ে ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন্ বার করতে পারলে তাতে অনেক বেশি সুফল হবে, আর কোম্পানীর দিক থেকে

একটা মস্ত কাজও করা হবে।

—একবার লেগে গেলে কি ব্যাপার আপনি জানেন না। আশা-জমজমে উপসংহার।

ধীরাপদ না জানুক শুনতে ভালো লাগছে, আর আশাটা দুরাশা নয়, উদ্দীপনা দেখে তাও ভাবতে ভাল লাগছে। সানন্দে সিগারেটের প্যাকেট খুলল অমিতাভ ঘোষ। সব বোঝাতে পারার তুষ্টি, সেই সঙ্গে পরিকল্পনায় মনের মত একজন দোসর লাভেরও তুষ্টি বোধ হয়। বলল, ভাবলে এ রকম আরো কত কি করার আছে, কিন্তু একটা রিসার্চ ডিপার্টমেণ্ট না হলে কি করে কি হবে? শুধু মুছু দেরি হয়ে যাচ্ছে, কেউ তো আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকছে না—মামা এতদিন ধরে বাইরে কি করছে? কবে ফিরবে?

যে গ্রহের বক্র প্রভাব, চেষ্টা করে তাকে সোজা রাস্তায় চালানো সহজ নয়। কস্ করে ধীরাপদ যা বলে বসল, এই আলোচনা আর এই উদ্দীপনার মুখে তা না বললেও চলত।

বলল, চারুদির পাল্লায় পড়েছেন, ফিরতে দেরি হতে পারে।

পুরু কাচের ওধারে অমিতাভর দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর থমকালো একটু। —চারুমাসি কি করেছে?

না···ধীরাপদ ঢোক গিলল, তিনিও সঙ্গে গেছেন তো।

মামার সঙ্গে? কানপুরে?

বিস্ময়ের ধাক্কায় ধীরাপদ বিব্রত বোধ করছে, মুখের কথা খসলে ফেরে না, তবু আগের আলোচনার সুতো ধরে ফেরাতে চেষ্টা করল। জবাবে মাথা নাড়ল কি নাড়ল না। বলল, তা আপনার কি প্ল্যান কি স্কীম একটু খুলে বলুন না শুনি—

লোকটার সমস্ত আগ্রহে যেন আচমকা ছেদ পড়ে গেছে। সেই উদ্দীপনার মধ্যে ফেরার চেষ্টাও ব্যর্থ। জানালো, অনেকবার অনেক রকম প্ল্যান আর স্কীম ছকা হয়ে গেছে তার। কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে তারই দু-একটা খুঁজল। কিন্তু মুখের দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায়, খুঁজছে শুধু হাত দুটো—আসল মানুষটা আর কোথাও উধাও।

চারুমাসি একা গেছে?

প্রশ্ন এটা নয়, চারুদির সঙ্গে পার্বতীও গেছে কিনা আসল প্রশ্ন সেটা। এই মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ একটু উতলা বোধ করছে কেন ধীরাপদর নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় খুব। কবে যেন দেখেছিল···এই মুখ আর এই বেপরোয়া প্রত্যাশাভরা

চোখ। নিরুপায়ের মত মাথা নাড়ল একটু, অর্থাৎ একাই—।

মনে পড়ল কবে দেখেছিল। মনে পড়ছে। এই মুখের দিকে আরো খানিক চেয়ে থাকলে আরো অনেক কিছু মনে পড়বে। কিন্তু ধীরাপদ মনে করতে চায় না।···অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে যেদিন চারুদির বাড়ি গিয়েছিল···সেদিনও চারুদি বাড়ি ছিল না, শুধু পার্বতী ছিল···এই মুখ আর এই চোখ সেদিন দেখেছিল। পার্বতী বিপন্নের মত সেদিন তাকে ধরে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকটা প্রকারান্তরে তাকে বিদায় করতে চেয়েছিল। বিদায় করেও ছিল।···কিন্তু না, ধীরাপদ এসব কিছু মনে রাখতে চায় না।

অমিতাভর হাতে বিজ্ঞানের বই উঠে এলো। অর্থাৎ আজও প্রকারান্তরে তাকে যেতেই বলছে, বিদেয় হতে বলছে। কিন্তু এই বলাটুকুও যথেষ্ট নয়। মুখেই বলল, আচ্ছা, পরে একদিন আপনার সঙ্গে আলোচনা করব'খন, আজ থাক্।

ব্যস, আর বসে থাকা চলে না। ধীরাপদ সেদিন যেভাবে চারুদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল আজও তেমনি করেই অমিতাভর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত। কিন্তু সেদিন তারপর কি হয়েছিল ধীরাপদ ভাববে না। ঠাণ্ডার মধ্যে সুলতান কুঠির কুয়োতলায় গুবগুবিয়ে জল ঢেলে উঠে-ছিল, ঠাণ্ডা মাটিতে রাত কাটিয়েছিল, ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখ বাধিয়েছিল—কিন্তু এসব ধীরাপদ কিছুই করেনি, আর কেউ তার কাঁধে চেপে বসেছিল, আর কেউ তাকে দিয়ে করিয়েছিল। তার ওপর ধীরাপদর দখল ছিল না।

দখল আজও নেই। দখল ছাড়িয়ে ভ্রূকুটি ছাড়িয়ে শাসন ছাড়িয়ে সেই আর কেউ তার ওপর অধিকার বিস্তারে উদ্যত। এধারের ঘরে এসে ধীরাপদ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল।

দশ মিনিট না যেতেই বিষম চমক আবার। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে সেই আর কেউ যেন ব্যঙ্গ করে উঠল তাকে। অত চমকাবার কি আছে, তুমি তো এরই প্রতীক্ষায় ছিলে, এই শব্দটার জন্যেই উৎকর্ণ হয়ে কান পেতে ছিলে।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করার শব্দ। অমিতাভ ঘোষের পুরনো গাড়ির পরিচিত ঘড়ঘড় শব্দ। কারো হাতের চাবুক খেয়ে যেন গোঁ গোঁ করতে করতে সবেগে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। ধীরাপদ জানালার কাছে এসে দাঁড়াল একটু, শব্দটা দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। জানালা ছেড়ে দরজার কাছে এলো—সিঁড়ির ওধারের ঘরটা অন্ধকার।

সেদিন পার্বতীর প্রচ্ছন্ন নিষেধ সত্ত্বেও অমিতাভ ঘোষকে রেখে উঠে আসার মুহূর্তে ধীরাপদ তার চোখে নীরব ভর্ৎসনা দেখেছিল। আজ পার্বতী কি ভাববে?

কার কাছ থেকে তার একলা থাকার খবর পেয়ে দুরন্ত দস্যুর মত লোকটা ছুটে গেল ? কে ইন্ধন যোগালো ?

কিন্তু পার্বতী কি ভাববে না ভাববে ধীরাপদ আর ভাবতে রাজি নয়। গায়ের জামাটা এখন পর্যন্ত খোলা হয়ে ওঠেনি, আর হলও না। আলোটা সহ্য হচ্ছে না, ভালো লাগছে না—খট্ করে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সটান বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। এমন হাস্যকর যোঝা ধীরাপদ নিজের সঙ্গে আর একটুও যুঝবে না। ওর ওপর আজও কেউ অধিকার বিস্তার করতে আসছে। আসুক। সেদিনের থেকেও অনেক জোরালো অনেক অবুঝ কেউ। আসুক, সে বাধা দেবে না।

এই বিকেল থেকে যা শুনেছে আর যা দেখেছে—প্রায় স্বেচ্ছায় সেই আবর্তের মধ্যেই তলিয়ে গেল কখন। পার্বতী বলছিল, চারুদি কাছে থাকলে অনেক অন্যায়ও বড় সাহেব করতে পারেন, চারুদি তা করাতে পারে। কোন্ জোরে পারে ? ম্যানেজার বলছিল, ওই কাঞ্চন মেয়েটা চাকরিতে ঢোকার পর থেকে রমেন ছেলেটার মতিগতি বদলেছে। কেন বদলালো ?···ঘরের আলো নিবিয়ে অন্ধকার দেখছে না ধীরাপদ, একটা পরদা সরিয়ে সবুজ আলো দেখছে। দু হাতে আঁকড়ে ধরে লাবণ্যের কোলে মুখ গুঁজে আছে সিতাংশু মিত্র—এক মুহূর্তের দেখায় একটা অনন্তকালের দেখা বাঁধা পড়ে গেছে। ভুলতে চাইলেই ভোলা যায় ? সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা অদেখা দৃশ্যের পরদা সরানোর তাগিদ, যেখানে এক রমণীর একার নিভৃতে আর এক দুরন্ত দুর্বার পুরুষের পদার্পণ। সেই দৃশ্যটাই বা কেমন ?

শুয়ে থাকা গেল না, একটা অশান্ত শূন্যতার যাতনা যেন হাড় পাঁজর-মজ্জার মধ্যে গিয়ে গিয়ে ঢুকছে। শুধু যাতনা নয়, জ্বালাও। শিখার চারধারের অবরোধে পতঙ্গের মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে আসার জ্বালা—নিঃশেষে জ্বলতে না পারার জ্বালা।

উঠল। একটু বাদেই মানুকে খাবার তাগিদ দিতে আসবে। ভাবতেও বিরক্তি। এত বড় ঘরের সব বাতাস যেন টেনে নিয়েছে কে, বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছে। অন্ধকারে জুতোটা পায়ে গলিয়ে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল সে। বাইরে থেকে একেবারে রাস্তায়।

কিন্তু যতটা বাতাস ধীরাপদর দরকার ততটা যেন এখানেও নেই—একটা ছোট গুমট ছেড়ে অনেক বড় গুমটের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে শুধু। হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা ট্যাক্সি ধেয়ে আসছে···খালি ট্যাক্সিই। ধীরাপদ যন্ত্রচালিতের মতই হাত দেখিয়েছে, তারপর সেই হাত বুকপকেটটা ছুঁয়ে দেখেছে। মানিব্যাগটা

আছে। জেগেছিল যখন, অলক্ষ্যে বিছানায় পড়ে থাকতেও পারত। পড়েনি, ষড়যন্ত্রে ফাঁক নেই। কিসের ষড়যন্ত্র ধীরাপদ জানে না, কিন্তু অমোঘ কিছু একটা বটেই। আগে পকেটে কিছুই থাকত না প্রায়, থাকলেও দু-চার আনা থাকত। এখন দু-চার শও থাকে ওটাতে, কেন থাকে কে জানে। খরচ করার দরকার হয় না, শুধু থাকে, না থাকলে ভালো লাগে না।

ট্যাক্সিটা থামল। ধীরাপদ উঠল। কোনো নির্দেশ না পেয়ে ট্যাক্সিটা যেদিকে যাচ্ছিল সেই পথেই ছুটল আবার। কিন্তু না, বাতাস আজ আর নেই-ই।

কতক্ষণ বাদে কোথায় নামল ধীরাপদর সঠিক হুঁশ নেই। কিন্তু নেমেছে ঠিকই। চেতনার অন্তস্তলে ষড়যন্ত্রে যারা মেতেছে তারা ওকে ঠিক জায়গাটিতেই নামিয়েছে। ট্যাক্সি বিদায় করে ধীরাপদ এগিয়ে চলল, সামনের অপরিসর রাস্তাগুলো এঁকেবেঁকে কোন্‌টা কোন্ দিকে মিশেছে ঠাওর করা শক্ত। সে চেষ্টাও করেনি। অদৃশ্য কারো হাত ধরে যেন একটা গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়াল খানিকক্ষণ। প্রায় নিয়তির মতই কারো।

এখানকার রাত যত না স্পষ্ট তার থেকে অনেক বেশি রহস্যে ভরা, গোপন ইশারায় ভরা। দূরে দূরে এক-একটা পানের দোকান, পানওয়ালারা সোজাসুজি দেখছে না তাকে, বক্রদৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে। এদিক-ওদিকে রাতের বুকে প্রেতের মত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে একজন দুজন—পরনে আধ-ময়লা পায়জামা, গায়ে শার্ট। তাদের চাউনিগুলোই বিশেষ করে বিঁধছে ধীরাপদর গায়ে পিঠে।

বাবু—

ধীরাপদ চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, পিছনে চাপা গলায় ডাকছে কেউ। তাকেই ডাকছে। লোকটা আরো কাছে এসে তেমনি নিচু গলায় বলল, ভালো জায়গা আছে, যাবেন?

ধীরাপদ জবাব দেয়নি, জবাব দিতে পারেনি। হন হন করে হেঁটে এগিয়ে গেছে খানিকটা। আর একটা রাস্তার মোড় ঘুরে তারপর দাঁড়িয়েছে। ঘোর কেটেছে খানিকটা, চারদিকে তাকালো একবার। এসব রাস্তায় কখনো এসেছে কিনা মনে পড়ে না। কিন্তু অবচেতন মনের কেউ এসেছে, দেখেছে, চিনেছে। নইলে এলো কেমন করে? না, ঘর ছেড়ে কেউ দরজায় এসে দাঁড়িয়ে নেই। তারা কোথাও না কোথাও আত্মগোপন করে আছে। দেশের আইন বদলেছে, প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিলে আইনের কলে পড়তে হবে। তাদের

হয়ে লোক ঘুরছে—তাদের জন্তে কান্না ঘুরছে দেখলেই যারা বুঝতে পারে, সেই লোক।

আগের মূর্তির মতই আর একজন গুটিগুটি এগিয়ে আসছে তার দিকে। ধীরাপদ আবার দ্রুত পা চালালো। কিসের ভয় জানে না, জানে না বলে ভয়। অপেক্ষাকৃত একটা বড রাস্তায় পা দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অদূরে মোড়ের মাথায় দুটো লোক চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। দুজন নয়, চেঁচামেচি একজনই করছে, আর একজন অশ্লীল কটূক্তি করতে করতে তাকে ঠেলে একটা রিকশয় তুলে দিতে চেষ্টা করছে। লোকটা বদ্ধ মাতাল, হাত ছাড়িয়ে ঘাড়-মুখ গুঁজে মাটি আঁকড়ে ধরতে চাইছে। এই রাতের মত হয়ত তার ফুটপাথেই কাটানোর ইচ্ছে, কিন্তু অন্য লোকটার তাতে আপত্তি। ফুটপাথে লোক পড়ে থাকলে বা চেঁচামেচি হলে পুলিসের ভয়, শিকার ফসকানোর

কোনদিকে না তাকিয়ে ধীরাপদ রিকশটার ওধার দিয়ে দ্রুত পাশ কাটাতে গেল।

অ ধীরু—ধীরুভাই—।

তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল। ধীরাপদ স্বপ্ন দেখছে না নিশির ডাক শুনছে? উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে না কাছে এসে দেখবে?

দেখলে দূর থেকেও না চেনার কথা নয়। এ রকম আর্তনাদ না শুনুক, কণ্ঠ-স্বর অতি পরিচিত।

গণুদা। স্বপ্ন নয়, বিভ্রম নয়, নিশির ডাক নয়—গণুদা। গণুদা ডাকছে তাকে।

ধীরাপদ স্তব্ধ, স্তম্ভিত। গণুদার গায়ে আধময়লা গলাবন্ধ ছিটের কোট, পরনের ধুতিটা ফুটপাথের ধুলোমাটিতে বিবর্ণ। সমস্ত মুখ অস্বাভাবিক লাল, দু চোখ ঘোলাটে সাদা।

কাঁদ কাঁদ গলায় গণুদা বলে উঠল, ধীরুভাই আমাকে বাঁচাও, এরা আমাকে গুমখুন করতে নিয়ে যাচ্ছে—আমার ছেলেমেয়ে আছে, বউ আছে, ওরা বড কাঁদবে, তোমার বউদি কাঁদবে।

নিজের অগোচরে ধীরাপদ দুই-এক পা সরে দাঁড়িয়েছে, নাকে একটা উগ্র গন্ধের ঝাঁজ লেগেছে। অস্পষ্ট জড়ানো কান্নার সুরে কথাগুলো বলতে বলতে গণুদা ফুটপাথে সটান শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। নিজের লোক পেয়ে নিশ্চিন্ত।

যে লোকটা তাকে রিকশয় তোলার জন্ত ধস্তাধস্তি করছিল সে হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে ধীরাপদকেই দেখছিল। চোখোচোখি হতে অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বলল, একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে, রিকশয় তুলে দিচ্ছিলাম।

রিকশওয়ালাটা এখানে এ ধরনের সওয়ারি টেনে অভ্যস্ত বোধ হয়, নির্লিপ্ত দর্শকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। ধীরাপদ ইশারায় কাছে ডাকল তাকে। ঘোর এতক্ষণে সম্পূর্ণই কেটেছে তার। অদৃশ্য ষড়যন্ত্রকারীরা কে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে মিশে গেছে যেন। কেবল একটু শ্রান্তির মত লাগছে, অবসন্ন লাগছে, তা ছাড়া অফিসের ঠাণ্ডা-মাথা ধীরাপদ চক্রবর্তীর সঙ্গে খুব তফাত নেই।

রিকশওয়ালার সাহায্যে গণুদাকে টেনে তোলা হল। অন্য লোকটা সরে গেছে। গণুদা চোখ টান করে তাকাতে চেষ্টা করল একবার, ধীরাপদকে দেখেই হয়ত রিকশয় উঠতে আপত্তি করল না। বিড়বিড় করে দু-এক কথা কি বলল, তারপর রিকশয় আর ধীরাপদর কাঁধে গা এলিয়ে ছিল।

রিকশ চলল। কিন্তু ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে ধীরাপদ, গা-টা ঘুলোচ্ছে কেমন। গণুদার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধটা যেন তার নাকের ভিতর দিয়ে পেটের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। কম করে আধ ঘণ্টার পথ হবে এখান থেকে সুলতান কুঠি। আধ ঘণ্টা এভাবে এই লোকের সঙ্গে লেপটে চলা প্রায় আধ বছর ধরে চলার মতই। ভাবতেও অসহ্য লাগছে।

খানিকটা এগিয়ে সামনে আর একটা রিকশ দেখে, এটা থামিয়ে সেটাকে ডাকল। নেমে গণুদার অবশ দেহ আর মাথাটা ঠেলে-ঠুলে ঠিক করে দিল। তারপর নিজে অন্য রিকশয় উঠল। গণুদার রিকশ আগে আগে চলল, তারটা পিছনে। ধীরাপদ সুস্থবোধ করছে একটু।

ঠুনঠুন শব্দে রিকশ চলেছে, পথে লোক চলাচল নেই বললেই হয়। একজন দুজন যারা আসছে যাচ্ছে, তারা এক-আধবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। তাকে দেখছে, গণুদাকে দেখছে। গোপনতার রহস্যে ভরা এই রাতটাও যেন তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। রাত কত এখন? ঘড়ি দেখল, মোটে সাড়ে দশটা। মনে হয় মাঝরাত। প্রায় এগারটা হবে সুলতান কুঠিতে পৌঁছুতে—সেটা সেখানকার মাঝরাতই।

সে সুলতান কুঠিতে যাচ্ছে এই গণুদাকে নিয়ে, যেখানে সোনাবউদি আছে। সোনাবউদির কাছেই যাচ্ছে। ভাবতে শুরু করলে আর যাওয়া হবে না বোধ হয়। অথচ যা ভাবতে চাইছে এখন—ভাবা যাচ্ছে, যা চাইছে না—তাও সব

ভাবনা-চিন্তা থেকে মাথাটাকে ইচ্ছেমত ছুটি দেওয়া যায় না?

ধীরাপদ সেই চেষ্টাই করছে।

সুলতান কুঠি এসে গেল এক সময়। আমুক, ধীরাপদ অনেকটা নির্লিপ্ত হতে পেরেছে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধরে মজা-দীঘির পাশ দিয়ে রিকশ সুলতান কুঠির নিস্তব্ধ আঙিনায় এসে ঢুকল। সোনাবউদির দাওয়ার সামনে থামল। ধীরাপদ আগে নেমে এসে বন্ধ দরজায় মৃদু টোকা দিল গোটাকয়েক।

ভিতরে কেউ জেগেই আছে। তক্ষুনি দরজা খোলার শব্দ হল।

দরজা খুলে আবছা অন্ধকারে প্রথমে ধীরাপদকে দেখেই সোনাবউদি বিষম চমকে উঠল।…আপনি!

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে রিকশ দুটোর দিকে চোখ গেল। তারপরেই নির্বাক, পাথর একেবারে।

ধীরাপদ ফিরে এলো। রিকশ থেকে গণুদাকে নামালো। গণুদার হুঁশ নেই একটুও, প্রায় আল্‌গা করেই টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে আসতে হল তাকে। সোনাবউদি ইতিমধ্যে ঘরের ডীম্‌-করা হারিকেনটা উসকে দিয়েছে। ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের বিছানার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে শক্ত কাঠ হয়ে।

মেঝেটা পরিষ্কারই, ধীরাপদ মেঝেতেই বসিয়ে দিল গণুদাকে। গণুদা বসল না, সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল। ধীরাপদর হাঁপ ধরে গেছে, মদের গন্ধটা সেই ফুটপাথে বা তারপরে খানিকক্ষণ এক রিকশয় বসেও যেন এখনকার মত এতটা উগ্র লাগেনি। ধীরাপদ সোজা হয়ে দাঁড়াল, মুখ তুলল, কিন্তু সোনাবউদির চোখে চোখ রাখা যাচ্ছে না—পাথরের মূর্তির মধ্যে শুধু দুটো চোখ ধক ধক করে জ্বলছে। জ্বলছে না, সেই চোখে অজ্ঞাত আশঙ্কাও কি একটা।

রিকশভাড়া দিতে হবে, ধীরাপদ তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। নিঃশব্দেই ভাড়া মেটাতে গেল, দেড় টাকা করে তিনটে টাকা গুঁজে দিল একজনের হাতে। কিন্তু কোন্ দুর্বলতায় কাজে লেগেছে সেটা ওরা ভালই জানে। তিন টাকা পেয়ে তিন পয়সা পাওয়া মুখের মত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে মিলিত গলায় প্রতিবাদের সূচনা। তাড়াতাড়ি টাকা তিনটে ফেরত নিয়ে ধীরাপদর ওদের একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বাঁচল। সুলতান কুঠির এই রাত্রিও যেন গোপনতার রাত্রি—বচসা দূরে থাক, ধীরাপদ একটু শব্দও চায় না।

টাকা নিয়ে রিকশ সহ লোক দুটো চলে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল তাদের চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল। তারপরেও সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল মিনিট তিন-চার। রাস্তার সেই ল্যাম্পপোস্টের আলো ভালো লাগছিল না, বারবনিতার চোখের

মত লাগছিল। কিন্তু এখানে দ্বিগুণ অস্বস্তি, এখানে যেন ঠিক তেমনি বিপরীত অন্ধকারের উষ্ণি পরানো।

ঘরে যেতে হবে। সোনাবউদির সামনে। পায়ে পায়ে ঘরে এসে ঢুকল। সোনাবউদি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। গণুদা বেহুঁশ, অবস্থার একটু তারতম্য হয়েছে বোধ হয়, হাত-পা ছুঁড়ছে আর বিড়বিড় করে বকছে কি। পেটে যা আছে তা উদ্গীর্ণ হবার লক্ষণ কিনা ধীরাপদ সঠিক বুঝছে না।

সোনাবউদির আগুন-ঢালা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ কানে বিঁধতে ফিরে তাকালো। ঠিকই দেখছে, সোনাবউদি তাকেই যেন ভস্ম করবে।—এখানে এনেছেন কেন? আপনার কি দরকার পড়েছিল এখানে তুলে আনার? আপনার কেন এত আস্পর্ধা? এক্ষুনি নিয়ে যান আমার চোখের সুমুখ থেকে, রাস্তায় রেখে আসুন —যেখানে খুশি রেখে আসুন। নিয়ে যান, যান যান যান বলছি—

ধীরাপদ নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে আছে, চেয়ে আছে। নিয়ে না গেলে, আর একটুও দেরি হলে, যে বলছে সে-ই এক্ষুনি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবে বুঝি— বাইরের ওই অন্ধকারের মধ্যে বরাবরকার মতই মিশে যাবে। গণুদার নেশাও ধাক্কা খেয়েছে একটু, সখেদে কি বলছে, মাটি আঁকড়ে উঠে বসতে চাইছে।

ধীরাপদ হঠাৎ ভয় পেল। অস্ফুটস্বরে বলল, যাচ্ছি—। চকিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পকেটে চাবির রিংটা আছে, ওতে পাশের ঘরের দ্বিতীয় চাবিটাও আছে। ঘর খুলল, একটা বন্ধ গুমট বাতাসের ঝাপটা লাগল গায়ে। একটা জানলা খুলে দিল। ফিরতে গিয়ে যথাস্থানে হারিকেনটা আছে মনে হল। আছে। তেলও আছে, দেয়াল-তাকে দেশলাইও। আলো জ্বালল, বিছানাটার দিকে চোখ গেল একবার। অপরিচ্ছন্ন নয়, একটা বেডকভার দিয়ে ঢাকা। সোনাবউদির তদারকে ত্রুটি নেই।

গণুদা উঠে বসেছে কোনরকমে, কিন্তু দাঁড়ানোর শক্তি নেই। ধীরাপদকে দেখেই হাউ-মাউ কান্না, জড়িয়ে জড়িয়ে বলে উঠল, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল্ ধীরুভাই—নিজের পরিবারও পায়ে ধরতে দিলে না—ক্ষমা চাইতে দিলে না —সরে গেল—আমি আত্মহত্যা করব—আমাকে নিয়ে চল্ ধীরুভাই—

গণুদাকে টেনে তুলল; একটানা খেদ আর বিলাপ শুনতে শুনতেই তাকে নিয়ে চলল। সোনাবউদির জ্বলন্ত চোখ ধীরাপদর মুখ পিঠ এখনো ঝলসে দিচ্ছে। নিজের ঘরের বিছানায় এনে বসালো গণুদাকে, তার পর জোর করেই শুইয়ে দিল। গায়ের গলাবন্ধ কোটটা খুলে দিলে ভালো হত, কিন্তু গণুদা শুয়ে পড়তে আর সে চেষ্টা করল না।

গণুদার খেদ আর বিলাপ চট্ করে থামল না। পরিবার যাকে ঘৃণা করে তার বেঁচে সুখ নেই, এ জীবন আর রাখবেই না গণুদা, আত্মহত্যা করবে, এত-কালের চাকরিটা গেল তবু একটু দয়ামায়া নেই। না, মদ আর গণুদা জীবনে ছোঁবে না, মদ এই ছাড়ল—আর সকাল হলেই আত্মহত্যা করবে। পরক্ষণেই আবার বিপরীত ভয়, ধীরু যেন তাকে ছেড়ে না যায়, তাকে ফেলে না যায়, নিজের পরিবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এখন ধীরু ছাড়া তার আর কে আছে? একটা ভাই ছিল নিজের, দাদার থেকে সে যদিও বউদিকে বেশি ভালবাসত, তবু বেঁচে থাকলে দাদাকে কখনো ত্যাগ করে যেত না—ধীরাপদ ধীরু ধীরুভাই—যেন তাকে ছেড়ে না যায়।

চুপচাপ বসে মদের শক্তি দেখছিল ধীরাপদ, লোকটাকে একসঙ্গে দশটা কথা কখনো গুছিয়ে বলতে শোনেনি। অস্ফুট গলায় ধমকে উঠল, আপনি ঘুমোন চুপ করে!

ধমক খেয়ে গণুদা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল একটু, তারপর চুপ খানিকক্ষণ, তার-পরেই তার নাকের ডাক শোনা যেতে লাগল। তারও কিছুক্ষণ পরে ধীরাপদ উঠল, হারিকেনটা নিবিয়ে ফেলল প্রথম, কি ভেবে দরজার গায়ে ছিটকিনি তুলে দিল। মাঝরাতে জেগে উঠে আবার ও-ঘরে গিয়ে হামলা করবে কিনা কে জানে। মেঝেয় বসে ট্রাঙ্কটায় ঠেস দিল, শেষে মাথাটাও রাখল ট্রাঙ্কের ওপর। শরীর ভেঙে পড়ছে। কিন্তু চোখে ঘুম নেই।

তন্দ্রার মত এসেছিল কখন। পিঠটা ব্যথা করতে তন্দ্রা ছুটল। উঠে বসল। বাইরের অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে, খোলা জানলা দিয়ে বাইরের একফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে—ভোরের আলোর আভাস জেগেছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, গণুদা তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। তারও এই মাত্রই ঘুম ছুটেছে বোধ হয়, দুই চোখে দুর্বোধ্য বিস্ময়। চোখোচোখি হতেই চোখ বুজে ফেলল, ঘাড় ফিরিয়ে কাত হয়ে শুলো।

ধীরাপদ উঠল, দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশে তখনো গোটাকতক তারা রয়েছে, একটা দুটো পাখির প্রথম কাকলি কানে আসছে। ওপাশে সোনাবউদির ঘরের দরজা বন্ধ। আর না দাঁড়িয়ে ধীরাপদ সুলতান কুঠির আঙিনা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল।

ট্যাক্সিটা বাড়ি পর্যন্ত না ঢুকিয়ে রাস্তায়ই নামল। ভাড়া মিটিয়ে ভিতরের দিকে এগোলো। বাইরের দরজাটা খোলা। খোলা কেন অনুমান করা শক্ত নয়। মানুকে তার জন্যে অপেক্ষা করেছে, শেষে দরজা খোলা রেখেই এক সময়

ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘরে ঢুকল। পার্টিশনের ওধারে মানকের নাকের ডাক অতো চড়া নয় এখন। আর খানিক বাদেই ঘুম ভেঙে উঠে বসবে। ধীরাপদ পা টিপে ঘরে ঢুকেছে, জুতো ছেড়ে গায়ের জামাটাও খুলে ফেলেছে। তারপর বিছানায় গা ছেড়ে দিয়েছে। শান্তি।

মানকের ডাকাডাকিতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে হল।—বাবু উঠুন, উঠুন, আর কত ঘুমুবেন? রাতে কোথায় যে উবে গেলেন, আমি অপেক্ষা করে করে শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম। কখন এয়েছেন? রাতে খাওয়াও তো হয়নি, আমাকে ডাকলেন না কেন?

একটা কথারও জবাব না পেয়ে মানকে তার ঘুম ভাঙানোর কারণটা বলল। বাইরে সেই থেকে একজন লোক তার সঙ্গে দেখা করার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, মানকে তাঁকে দোতলার অফিসঘরে বসতে বলেছিল, তা তিনি সেই থেকে দাঁড়িয়েই আছেন আর বলছেন জরুরী দরকার, একটু ডেকে দিলে ভালো হত।

ধীরাপদ ভেবে পেল না কে হতে পারে। সেখানেই তাকে পাঠিয়ে দিতে বলে ঘড়ি দেখল, নটা বাজে। খুব কম সময় ঘুমোয়নি, কিন্তু মাথাটা ভার ভার এখনো।

মানকে সঙ্গে করে নিয়ে এল যাকে তাকে ধীরাপদ আশা করেনি। গণুদা। গায়ে সেই গলাবন্ধ কোট, পরনের কাপড়টা অবশ্য বদলেছে। রাতের ধকল এখনো মুছে যায়নি, শুকনো মূর্তি। ধীরাপদ বিছানায় বসেছিল, বসেই রইল— কোনো সম্ভাষণই বার হল না মুখ দিয়ে।

মানকে টেবিলের সামনে চেয়ারটা টেনে দিতে গণুদা বসল। মানকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইল, তারপর ঢোক গিলে বলল, ইয়ে—ওটা কোথায় রেখেছ? তোমার বউদির কাছেও দাওনি শুনলাম—

ধীরাপদ দ্বিগুণ অবাক, এখনো লোকটার নেশার ঘোর কাটেনি কিনা বুঝছে না।—কোন্‌টা?

গণুদা হাসতে চেষ্টা করল, বলল, টাকাটা—। আমি সাবধানেই রেখে ছিলাম, মিছিমিছি ব্যস্ত হবার দরকার ছিল না।

সমস্ত স্নায়ুগুলো একসঙ্গে নাড়াচাড়া খেল, ধীরাপদ ধমকেই উঠল, কি বকছেন আবোল-তাবোল?

গণুদা ঈষৎ অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠল, এতগুলো টাকার ব্যাপার, ঠাট্টা ভালো

লাগে না, দিয়ে দাও—

কিসের টাকা? হঠাৎ ধীর শান্ত ধীরাপদ।

অতগুলো টাকা কিসের সে কৈফিয়ৎ দিতে গণুদার আপত্তি নেই। ওর পাই-পয়সা অবধি হকের টাকা তার। গতকাল অফিস থেকে তার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর অন্যান্য পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে—চার হাজার পাঁচ শ সাতানব্বই টাকা। সাতানব্বই টাকা আলাদা রেখে বাকি সাড়ে চার হাজার টাকা গণুদা গলাবন্ধ কোটের ভিতরের পকেটে রেখেছিল—একটা খামে ছিল, পঁয়তাল্লিশখানা একশ টাকার নোট—ধীরাপদর সন্দেহের কোনো কারণ নেই, সবই নিজস্ব টাকা—নিজস্ব রোজগারের টাকা।

সততার টাকা যে সেটা প্রমাণ করতে পারলেই যেন আর যন্ত্রণা না দিয়ে ধীরাপদ টাকাটা বার করে দেবে। কিন্তু ধীরাপদর স্তব্ধতা দেখে গণুদার ফর্সা মুখের কালচে ছাপটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

আপনার টাকা আমি নিইনি।

গণুদা সানুনয়ে বলল, তুমি নিয়েছ কে বলছে, ভালোর জন্যেই সরিয়ে রেখেছ, টাকাটা পেলেই আমি তোমার বউদির হাতে দিয়ে দেব।

আপনার টাকা আমি সরাইনি! ক্ষিপ্তকণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে উঠল সে। দূরে গণুদার পিছনের দরজার কাছে মানুকেকে অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজেকে সংযত করল। তার হাতে দু পেয়ালা চা, কাছে এগোতে ভরসা পাচ্ছে না।

গলা নামিয়ে ধীরাপদ বলল, কাল রাতে যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে যান, দরকার হলে পুলিসের ভয় দেখান, যে লোকটা আপনাকে রিক্‌শয় তোলার জন্য ঠেলাঠেলি করছিল তাকেও ধরতে পারেন কিনা দেখুন, যান—আর বসে থাকবেন না এখানে।

কিন্তু গণুদা বসেই রইল। বলল, টাকা আমার কোটের ভিতরের পকেটেই ছিল—কেউ টের পায়নি। ওই লোকটাকে সেই ভয়েই কাল আমি কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছিলাম না—তখনো ছিল। হঠাৎ ভেঙে পড়ল গণুদা, ধীরু, ওই ক'টা টাকাই শেষ সম্বল আমার, আর ঠাট্টা করো না—তুমি নিজেই না হয় তোমার বউদিকে টাকাটা দেবে চলো—

ধীরাপদ কি করবে? মারবে ধরে?—আপনি যাবেন কি না এখান থেকে! যা বললাম শিগ্‌গীর তাই করুন, ও টাকা আপনার গেছে, যান এক্ষুনি।

গণুদাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।—টাকা আমার পকেটেই ছিল, তুমি দেবে না তা

হলে ?

গেট আউট্ ! যান এখান থেকে, গিয়ে খোঁজ করুন। বিছানা ছেড়ে মাটিতে নেমে দাঁড়ান, যান শিগ্‌গীর, নয়তো আপনাকে আমি—

রাগে উত্তেজনায় একরকম ঠেলতে ঠেলতেই তাকে দরজার দিকে এগিয়ে দিল। বেগতিক দেখে চায়ের কাপ হাতে মানুকে প্রস্থান করেছে।

ধীরাপদ একসময় উঠে চান করেছে, খেয়েছে, অফিসে এসেছে। কিন্তু কখন কি করেছে হুঁশ নেই। অফিসেও মন বসল না, এক মুহূর্তও ভালো লাগল না। যে সম্বল খোয়া গেছে সেটা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ওই অপদার্থ লোকটার বলে ভাবতে পারছে না বলেই এমন মর্মান্তিক লাগছে। ওইটুকুও হারিয়ে সোনাবউদি কি করবে এখন ? থেকে থেকে বলতে ইচ্ছে করছে, সোনাবউদি আর আমাকে ঠেলে সরিয়ে রেখো না, এবারে আমাকে বন্ধু বলে ভাবো।

বলবে। বলবার জন্যেই বিকেল না হতে অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা সুলতান কুঠিতে চলে এলো। কিন্তু ততক্ষণে তার সঙ্কল্পের জোর শেষ।

উমা তাকে দেখেও আগের মত লাফিয়ে উঠল না। তার শুকনো মুখে কি একটা ভয়ের ছাপ। ছেলে দুটোকেও শুকনো শুকনো লাগছে। ওদের পুষ্টির রসদে হয়ত ইতিমধ্যেই টান পড়েছে।

সোনাবউদি পাশের খুপরি ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলো। মায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা সরে গেছে। ওদের যেন কেউ তাড়া করেছে। সোনাবউদি চুপচাপ সামনে এসে দাঁড়াল। ধীরাপদর মুখ দেখলে কেউ বলবে না, অত বড় এক কোম্পানীর হাজার টাকা মাইনের এই সেই ধীরাপদ চক্রবর্তী।

সহজ হবার চেষ্টায় দেয়ালের কাছ থেকে নিজেই মোড়াটা নিয়ে এসে বসতে বসতে বলল, গণুদার পকেট থেকে অতগুলো টাকা গেছে শুনলাম, উনি ভেবেছিলেন আমিই সাবধান করে সরিয়ে রেখেছি।

সোনাবউদি নীরবে চেয়ে আছে মুখের দিকে।

...পুলিসে একটা খবর দেওয়া উচিত কিনা বুঝছি না, গণুদা একটু খোঁজ-টোঁজ করেছিলেন ?

সোনাবউদি তেমনি নির্বাক, নিষ্পলক, কঠিন।

আর কি জিজ্ঞাসা করবে ধীরাপদ ? মনে হল সব জিজ্ঞাসা আর সব কথা শেষ হয়েছে, এবারে উঠলে হয়।

কিন্তু সোনাবউদি জবাব দিল, গলার স্বর মৃদু হলেও ভয়ানক স্পষ্ট—প্রায় চমকে ওঠার মতই স্পষ্ট। পাল্টা প্রশ্ন করল, কোথায় খোঁজ করবে ?

ধীরাপদ তাকালো শুধু একবার, কোথায় খোঁজ করবে বা করা উচিত বলতে পারল না।

খানিক অপেক্ষা করে সোনাবউদি আরো মৃদু অথচ আরো স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কাল তাকে কোথা থেকে তুলে এনেছেন?

রাস্তা থেকে।

কোন্ রাস্তা থেকে? সেটা কেমন এলাকা?

ধীরাপদ নিরুত্তর। এবারে আর তাকাতেও পারল না। ধমনীর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে যেন।

জবাবের প্রতীক্ষায় সোনাবউদি নীরব কিছুক্ষণ। তারপর নিজে থেকেই আবার বলল, কোন্ রাস্তা কেমন এলাকা সেটা তার টাকার শোক থেকে বোঝা গেছে—টাকার শোকে মাথা এত গরম না হলে বোঝা যেত না।…অত রাতে আপনার ওখানে কি কাজ পড়েছিল?

না, ধীরাপদ এবারেও জবাব দিতে পারেনি, এবারেও মুখ তুলে তাকাতে পারেনি। সোনাবউদি আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, আরো কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখেছিল, তারপর কঠিন ব্যবধান রচনা করেই নিঃশব্দে সামনে থেকে সরে গিয়েছিল।

ধীরাপদ দুনিয়ার অলক্ষ্যে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল এখান থেকে। কিন্তু বাইরে তখনো দিনের আলো। দূরে, পিছন থেকে কে বুঝি তাকে ডেকেও ছিল, বোধ হয় রমণী পণ্ডিত। ধীরাপদ শোনেনি, ধীরাপদর শোনার উপায় নেই। এখান থেকে পালিয়ে কোনো অন্ধকারের গহ্বরে বিলীন হয়ে যাওয়ার তাড়া তার। ভদ্রলোক ছুটলেও তাকে ধরতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

বড় সাহেব পাটনা থেকে ফিরলেন পরদিন খুব সকালে। ধীরাপদ বিছানায় শুয়ে শুয়েই টের পেয়েছে। মানুকে আর কেয়ার-টেক্ বাবুর ব্যস্ততা অনুভব করেছে। কিন্তু ধীরাপদ উঠে আসেনি, তেমন উৎসাহও বোধ করেনি। দুদিন আগেও যেজন্যে তাঁর ফেরার অপেক্ষায় উৎসুক হয়ে ছিল, সেই কারণটার আর অস্তিত্ব নেই।

একটু বেলায় ডাক পড়ল তার। বড় সাহেব প্রথমে ঠাট্টা করলেন, খুব বিশ্রাম করছ বুঝি, এত বেলা পর্যন্ত ঘুম? কুশল প্রশ্ন করলেন, অফিসের খবর-বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কি সদ্য-বর্তমানে ভাগ্নেটির মেজাজ কেমন—তাও। তারপর খুশি মেজাজে নিজের সংবাদ আর কনফারেন্সের সংবাদ দিতে বসলেন।

ব্লাডপ্রেসার-টেমার পালিয়েছে, খুব ভালো আছেন এখন, আর ওদিকে কনফারেন্সও মাত। কতটা মাত ধীরাপদ তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারছে, তবু বিবরণ শুনতে হল। তাঁর বক্তৃতার পর সকলের প্রতিক্রিয়ার কথাই বললেন বিশেষ করে।

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে বড় সাহেব খেয়াল করে তাকালেন তার দিকে। —মুখ বুজে বসে আছ, শরীর ভালো তো তোমার?

ধীরাপদ হাসতে চেষ্টা করল, তাড়াতাড়ি মাথাও নাড়ল। ভালো।

তবু লক্ষ্য করে দেখছেন। ভুরু কোঁচকালেন, মাথা নাড়লেন, বললেন, ভালো দেখছি না।

ভালো অফিসেরও অন্তরঙ্গ দুই-একজন দেখল না। শরীর অসুস্থ কিনা জিজ্ঞাসা করল। ধীরাপদ কাউকে জবাব দিয়েছে, কাউকে বা না দিয়ে পাশ কাটিয়েছে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রয়োজনেও কাউকে ডাকেনি। ওপাশের ঘরে লাবণ্য সরকার কখন এসেছে টের পেয়েছে, কখন চলে গেছে তাও।

পাঁচটার ওধারে এক মিনিটও অফিসে টিকতে পারল না। কিন্তু এবারে করবে কি? বাড়ি ফিরলেই হিমাংশুবাবু ডাকবেন, সেটা আরও বিরক্তিকর। চারুদির কথা মনে হল, কিন্তু সে বাড়ির দরজাটা বন্ধ হলে ধীরাপদ নিজেই বাঁচত।...চারুদি টেলিফোনে ডেকে পাঠালে কি করবে? যাবে?

না, ধীরাপদ ও নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না, মাথা আর কোন কিছু নিয়েই ঘামাবে না সে। ডাকলে দেখা যাবে।...কিন্তু চারুদি কি পার্বতীকে সম্পত্তি দেবার ব্যবস্থা করে আসতে পেরেছে? থাক, ভাববে না।

সামনে সিনেমা হল একটা। কোন্ হল কি ছবি জানে না। কিন্তু ধীরাপদ যেন তৃষ্ণার জল হাতের কাছে পেল। টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল। বাড়ি ফিরল রাত সাড়ে নটারও পরে। ছবিটা শেষ পর্যন্ত দেখা হয়নি—বিলিতি প্রেমের ছবি একটা। নারী-পুরুষের বাঁধ-ভাঙা এক উষ্ণ নিবিড় মুহূর্তে উঠে এসেছে। তারপর এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হেঁটেই ফিরছে। রাতে ঘুম দরকার।

মানুকে এগিয়ে এলো। সে যেন তার প্রতীক্ষাতেই ছিল। বাবু সেই লোকটা আজও এসেছিল—

কোন্ লোকটা?

সেই কাল সকালবেলায় যে এসেছিল, আপনি যাকে ধমকে তাড়ালেন ঘর থেকে। ভাগ্নেবাবুর সঙ্গে দেখা করে গেল—

অর্থাৎ গণুদা এসেছিল। গণুদা অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে দেখা করে গেছে।

ভাগ্নেবাবুর দোরে দাঁড়িয়ে মানকের স্বকর্ণে সব কিছু শোনার সাহস হয়নি, কিন্তু তার বিশ্বাস লোকটা ভয়ানক খারাপ, ধীরুবাবুর নামে কি সব বলছিল—

একটিও কথা না বলে ধীরাপদ অমিতাভর ঘরের দিকে চলল। কিন্তু হল পেরিয়ে তার ঘর পর্যন্ত গেল না, দাঁড়িয়ে ভাবল একটু, তারপর আবার ফিরে এলো। ভিতরটা বড় বেশি উগ্র হয়ে আছে নিজেই উপলব্ধি করছে। এতটুকু কৌতুকও বরদাস্ত হবে না, অকারণে একটা বচসা হয়ে যাবার সম্ভাবনা। শাস্তু অত ভেতে না থাকলে মানকের মুখে আরও কিছু শোনা যেত, গণুদা অনেক [illegible]ক বলছিল তার কিছু আভাস পেতে পারত।

পেল পরদিন, আর পেল এমন একজনের মুখ থেকে যার ওপর [illegible] কদিন ধরে ধীরাপদ মনে মনে শাসনের ছড়ি উঁচিয়ে আছে। বিকেল [illegible] পর্যন্ত অফিসে নিঃশব্দে নিজের ঘরে কাটিয়ে ফটকের বাইরে আসতেই রমেন হালদারের সঙ্গে দেখা। তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, চোখে চোখ পড়তে হাসতে চেষ্টা করল। জানালো, দাদার সঙ্গে একটু গোপনীয় কথা ছিল তাই ভিতরে না গিয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে।

গোপনীয় কথা শোনার জন্য ধীরাপদ দাঁড়ায়নি—মুখ শুধু গম্ভীর নয়, কঠিনও।...মেডিক্যাল হোম থেকে কারো মুখে কিছু শুনে নিজের সততার কৈফিয়ৎ নিয়ে ছুটে এসেছে, আর ফাঁক পেলে ম্যানেজারের নামেও উল্টে কিছু লাগিয়ে যাবে নিশ্চয়। কিন্তু সে ফাঁক ধীরাপদ আজ আর ওকে দেবে না।

তুমি এ সময়ে এখানে এলে কি করে, কাজে যাওনি ?

রমেন মাথা চুলকে জবাব দিল, ইয়ে—এখান থেকে যাব।

দেরি হবে, ম্যানেজারকে বলে এসেছ ?

ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল, গিয়েই বলবে। তারপরেই এভাবে ছুটে আসার তাগিদটা কেন বোঝাবার জন্যে হড়বড়িয়ে যা সে বলে গেল শুনে ধীরাপদ বিমূঢ়। নিজের কানে কাল যা শুনল তারপর না এসে রমেন হালদার করবে কি, দাদা রাগ করলেও ছুটি-টুটি নেবার কথা তার মনে হয়নি, দাদার বিরুদ্ধে নোংরা একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে ভেবে কাল প্রায় সমস্ত রাত সে ঘুমুতেও পারেনি—আজ কাঞ্চনই তাকে একরকম ঠেলে পাঠিয়েছে এখানে, সব খুলে বলতে পরামর্শ দিয়েছে—বলেছে, দাদা এমন আপনার লোক, তাকে জানাতে ভয়ই বা কি সঙ্কোচই বা কি, না জানালে দাদার যদি বিপদ হয়, তখন ?

ধীরাপদ দাঁড়িয়ে পড়েছিল, চেয়েছিল মুখের দিকে।—কি হয়েছে ?

কি হয়েছে সরাসরি বলতে তবু মুখে আটকেছে রমেনের, ভণিতার মধ্যেই

দুর্বপাক খেয়েছে আর এক দফা।—কতগুলো বিচ্ছিরি কথা কাল তার কানে এসেছে, দাদার কাছে মুখ ফুটে কি করে যে বলবে—অথচ, কাল একজন ওই ছাইপাঁশ বলে গেল, আর, আর একজন দিব্বি বলে বসে তাই শুনল।

ভিতরটা হঠাৎ অতিরিক্ত দাপাদাপি শুরু করেছে ধীরাপদর, নিজেকে সংযত করার জন্য পায়ে পায়ে আবার এগিয়ে চলল। অস্ফুট বিরক্তি, কথা না বাড়িয়ে কি হয়েছে বলো।

রমেন বলেছে। ধীরাপদ শুনেছে। মানুকের বলার সঙ্গে তার বলার অনেক তফাত, কথার বুনোট ছাড়ালে সবই স্পষ্ট, নয়।—মেডিক্যাল হোমে কাল বিকেলে খুব কর্সা অথচ রস-ছড়ানো ছিবড়ের মত একজন শুকনো মূর্তি লোক এসে লাবণ্য সরকারের খোঁজ করেছিল। একটু পরেই বোঝা গেছে সে খদ্দেরও নয়, মিস সরকারের রোগীও নয়। তার শুকনো দিশেহারা হাবভাব রমেনের কেমন যেন লেগেছে। খানিক বাদে বাইরে এসে দেখে লোকটা যায়নি, বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। রমেনকে দেখে ইশারায় ডেকেছে, তারপর এমন সব কথা বলেছে যে সে অবাক। বলেছে, খুব বিপদে পড়ে মিস সরকারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। রোগীর ভিড় কখন কম থাকে, কখন এলে তাঁকে নিরিবিলিতে পাওয়া যায়, মিস সরকার লোক কেমন, রাগী না আলাপী—বার বার নিজের বিপদের কথা বলে এই সবও শুধিয়েছে। তারপর হঠাৎ দাদার কথা তুলেছে সে, দাদা কোম্পানীর কি, কত বড় চাকরি করে, দাদার চাকরিটা বড় না মিস সরকারের, দাদার সঙ্গে মিস সরকারের ভাব কেমন, উনি কিছু বললে দাদা শোনেন কি না—এই সব।

তখনকার মত লোকটা চলে গিয়েছিল, তারপর সময় বুঝে আবার এসেছিল। মিস সরকারের তখন দু-তিনজন মাত্র রোগী বসে। প্রথমে দুই একটা কি কথা হয়েছে তার সঙ্গে রমেন ঠিক জানে না, কিন্তু উনিও যে বেশ অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন সেটা ঠিক লক্ষ্য করেছে। মিস সরকার শেষ রোগী বিদায় করে তাকে ঘরে ডেকেছেন। দাদা ভালো বলুন আর মন্দ বলুন, রমেন তখন পার্টিশনের পিছনে গিয়ে না দাঁড়িয়ে পারেনি।

এরপর কি শুনবে ধীরাপদ জানে। তবু বাধা দিল না। লাবণ্য সরকারের মন্তব্য শোনার প্রতীক্ষা, নির্বাক একাগ্রতায় কান পেতে আছে আর নিজের অগোচরে পথ ভাঙছে। গণুদা বলেছে, ধীরাপদ সর্বস্বান্ত করেছে তাকে, পরশু রাতে শরীরটা হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, সে তাকে রাস্তা থেকে তুলে রিক্শ করে বাড়ি নিয়ে এসেছে, তারপর তার সঙ্গে এক ঘরে কাটিয়েছে সমস্ত

রাত, আর সকাল না হতে উঠে চলে গেছে। সেই সঙ্গে তার গলাবন্ধ কোটের ভিতরের পকেট থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা উধাও—অথচ, অসুস্থ অবস্থায় রিক্শয় ওঠার সময়ও টাকাটা কোটের ভিতরের পকেটে ছিল তার ঠিক মনে আছে। টাকাটা ফিরিয়ে দিতে বলার জন্য লাবণ্য সরকারের কাছে কাকুতি-মিনতি করেছে গণুদা, বলেছে তার চাকরি গেছে, অফিস থেকে পাওয়া ওই পুঁজিটুকুই শেষ সম্বল, ঘরে ছোট ছোট ছেলেপুলে, টাকাটা না পেলে তার আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ নেই।

রমেনের চাপা উত্তেজিত মুখে তপ্ত বিস্ময়, এতখানি শোনার পরেও ভদ্র-মহিলার মুখে কটু কথা নেই একটাও, উল্টে টুকটাক কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে উনি যেন সাহায্যই করবেন তাকে।

ধীরাপদ উৎকর্ণ, চলার গতি শিথিল হয়ে আসছে।

লাবণ্য সরকার সদয় ভাবেই এটা ওটা জিজ্ঞাসা করেছে গণুদাকে, কোথায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, কি হয়েছিল, রাত কত তখন, বাড়ি ফিরেও ধীরুবাবুর ঘরে রাত কাটানো হল কেন, এই সব। রমেনের মতে গণুদার এলোমেলো জবাব থেকেই বোঝা গেছে লোকটা কেমন, আর লাবণ্য সরকার তা বুঝেও ভাল-মানুষের মত জিজ্ঞাসা করেছে, পরদিন টাকা নেই শুনে তার স্ত্রী কি বললেন?

ধীরাপদ দাঁড়িয়েই পড়ল।

নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে বাইরের একজনের কানে কেউ এত বিষ ঢালতে পারে রমেনের ধারণা ছিল না। যেন ওই রকম করে বলতে পারলেই নিজের সততার সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না, আর যে সাহায্যের আশায় আসা তাও পেয়ে যাবে। বলেছে, অমন মন্দ স্বভাবের স্ত্রীলোক আর দুটি হয় না, শুধু তার জন্যেই সব গেছে। এমন কি চাকরিটাও বলতে গেলে তার জন্যেই খুইয়েছে—ঘরে যার এই স্ত্রী আর এমন অশান্তি, সুস্থ হয়ে অফিসে বসে সে চাকরি করে কেমন করে?...টাকা গেছে শুনে ওই স্ত্রী আর কি বলবে, গুম হয়ে বসে আছে শুধু। বাইরের একটা লোককে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছে, বলবে কোন্ মুখে? তারপর স্ত্রীর সঙ্গে দাদাকে জড়িয়ে এমন সব ইঙ্গিত করেছে যে রমেনের ইচ্ছে করছিল তাকে ঘর থেকে টেনে এনে গলা ধাক্কাদিয়ে বার করে দেয়।

এতখানি শোনার পর লাবণ্য সরকার আর তেমন আগ্রহ দেখায়নি, উল্টে একটু ঠাণ্ডা ভাব দেখিয়েই বিদায় করেছে গণুদাকে। এ ব্যাপারে তার কিছু করার বা বলার নেই জানিয়েছে। আর মুখ ফুটে এ কথাও বলেছে, ধীরুবাবু তার টাকা নিয়েছে সেটা বিশ্বাস্য নয়। বলেছে, যদি নিয়েই থাকেন সে টাকা

আপনার স্ত্রীর কাছেই আছে দেখুন গে যান।

মুখ বুজে হাঁটতে হাঁটতে ধীরাপদর খেয়াল হল রমেন আছে পাশে। আত্মস্থ হওয়া দরকার, ঠাণ্ডা মাথায় আগে ওকে বিদায় করা দরকার। ছেলেটা বোকা নয়, এই অশান্ত স্তব্ধতা উপলব্ধি করছে হয়ত। নইলে এত কথা বলার পর চুপ করে থাকত না, কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করত। গোড়ায় সেই অনুশাসনের মেজাজ ধীরাপদর আর নেই, তবু ওকে যেতে বলার আগে দাদার গাম্ভীর্যে একটু সমঝে দিতে হবে, দু-চার কথা বলতে হবে। না বললে ওর চোখে দুর্বলতার দিকটাই বড় হয়ে উঠবে।

নৈতিক উক্তি নিজের কানেই বিদ্রূপ বর্ষাবে, ধীরাপদ মাঝামাঝি রাস্তা নিল। —এসব বাজে কথায় তুমি একটু মাথা কম ঘামিও এবার থেকে। এখন তোমার ব্যাপারটা কি বলো, সেদিন আমি মেডিক্যাল হোমে গেছলাম শুনেছ ?

কৌতূহল আর বিস্ময়ের আবর্ত থেকে বঁড়শী-বেঁধা মাছের মত হ্যাঁচকা টানে শুকনো ডাঙায় টেনে তোলা হল তাকে। মিটমিট করে তাকিয়ে ঢোক গিলল, ম্যানেজার লাগিয়েছে বুঝি…

ম্যানেজার মিছিমিছি কারো নামে লাগাতে আসে কি না সে কথা তোমার মুখ থেকে আমার শোনার দরকার নেই।—চুপচাপ কয়েক পা এগিয়ে আবার বলল, ওই মেয়েটা কোথাকার মেয়ে, কি ছিল, সব জানো ?

রমেনের চকিত চাউনি এবার অতটা ভীতত্রস্ত নয়। হাতেনাতে ধরা পড়া অপরাধীর মুখ অন্তত নয়। জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল শুধু, অর্থাৎ জানে। কিন্তু শুধু মাথা নেড়েই সব জানার পর্ব শেষ করল না। একটু বাদে দ্বিধা জলাঞ্জলি দিয়ে দাদার একটুখানি সুবিবেচনাই দাবি করল যেন। বলল, কাঞ্চনই সব বলেছে দাদা, কি ছিল, কিভাবে মরতে বসেছিল, আপনি কত দয়া করে ওকে বাঁচিয়ে এই ভালোর দিকে এগিয়ে দিয়েছেন—সব বলেছে। বলেছে আর কেঁদেছে। সব জেনেও আপনি এতখানি করেছেন বলেই একটা দিনের জন্যেও আমি ওকে খারাপ চোখে দেখিনি দাদা।

ব্যস, এর পরে তর্ক অচল, যুক্তি অচল। দাদার ভালোর দিকে এগিয়ে দেওয়াটাই তার প্রীতির চোখে দেখার পরোয়ানা। নিজের উদারতার প্রশংসা শুনে হোক বা ছেলেটার মতিগতি দেখেই হোক, ধীরাপদর ভিতরটা তিক্ত হয়ে উঠল হঠাৎ। রুক্ষ শাসনের সুরেই বলল, ওই মেয়েটার নামে এরপর যদি কোন রকম নালিশ আসে তাহলে তুমিই তার সব থেকে বড় ক্ষতি করবে, ম্যানেজার একটি কথাও বললে তার চাকরি থাকবে না—এখন কি চোখে দেখবে ভাবো গে যাও।

মুখ কালো করে রমেন চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে যা সেই মেয়ে ধীরাপদর মন থেকে মুছে গেল। টাকার শোকে উন্মাদ গণুদা যে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে, ধীরাপদ সেজন্যে উতলা নয়। কিন্তু ভিতরটা তবু জ্বলছে। টাকা কোন্ চুলোয় গেছে তা নিয়ে লাবণ্য সরকার এক মুহূর্তও মাথা ঘামায়নি, ওর নাম জড়িয়ে গণুদা নিজের স্ত্রীর মুখে যে কালি মাখিয়েছে সেইটুকুই শোনার মত তার—হৃষ্টচিত্তে তাই হয়ত শুনেছে বসে বসে। আর একটা ভাবনাও মনে আসছে, যা সে এ কদিনের মধ্যে একবারও ভাবেনি। লাবণ্য সরকার গণুদাকে জিজ্ঞাসা করেছে, টাকা চুরি গেছে শুনে তার স্ত্রী কি বলেন···। কি বলে? মুখে না হোক, মনে মনে কি বলছে সোনাবউদি? কি ভাবছে? যে টাকা হারিয়ে গণুদা এমন ক্ষিপ্ত, সেই ক'টা টাকা তো শেষ সম্বল সোনাবউদিরও—এই মানসিক সঙ্কটে তার ভাবনা কোন্ পর্যায়ে গড়িয়েছে? সোনাবউদির চোখে সে তো অনেক নেমেছে। কত নেমেছে ঠিক নেই। সর্বস্ব খুইয়ে সেই সোনাবউদি শুধু টাকার ব্যাপারেই এখনো পরম সাধু ভাবছে তাকে? টাকা যে পকেটেই ছিল সেটা গণুদা তাকে কতভাবে বুঝিয়েছে ঠিক কি? ধীরাপদর মনে হল, গণুদা এই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে সোনাবউদির কাছ থেকে কোন বাধা আসেনি বলে। সোনাবউদি বাধা দিলে গণুদা এমন বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারত না।

পরদিন দুপুরে কারখানায় বড় সাহেবের ঘরে ডাক পড়তে ধীরাপদ গিয়ে দেখে সেখানে সেই উদ্‌ভ্রান্ত-মূর্তি গণুদা বসে। লাবণ্য সরকারও আছে, নিস্পৃহ মুখে অফিসের ফাইল দেখছে একটা। মুহূর্তে আত্মস্থ হল ধীরাপদ, সব ক'টা স্নায়ু সজাগ কঠিন হয়ে উঠল। লাবণ্য সরকার এখানে কেন, বড় সাহেবই তাকে অফিসের কাজে ডেকেছেন কিনা সে কথা মনে হল না। এই পরিস্থিতিতে লাবণ্য সরকার উপস্থিত এইটুকুই যথেষ্ট, কাজ থাক আর নাই থাক, এই গাম্ভীর্যের আড়ালে বসে মজাই দেখবে।

শুধু তাকে নয়, এবারে ধীরাপদ সকলকেই মজা দেখাবার জন্য প্রস্তুত।

বড় সাহেব বললেন, এ কি সব বলছে সেই থেকে আমি কিছু বুঝছি না, একে চেনো?

জবাব না দিয়ে ধীরাপদ গণুদার দিকে তাকালো, সেই দৃষ্টির ঘায়ে হোক বা টাকার তাড়নায় হোক গণুদা বসে থাকিতে পারল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর শুকনো ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে বলতে চেষ্টা করল, ধীরুভাই, তোমার বউদির মুখ চেয়েও অন্তত—

শেষটুকু মুখেই থেকে গেল। ধীরাপদ দরজার কাছে এসে বেয়ারা তলব

করেছে, বেয়ারা শশব্যস্তে ঘরে ঢুকতে গণুদাকে দেখিয়ে আদেশ করেছে বাইরে নিয়ে যেতে। একেবারে ফটকের বাইরে। আর তারই মারফৎ গেটের দারোয়ানের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে, এই লোক আবার কারখানা এলাকায় ঢুকতে পেলে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

নালিশ যার নামে করতে এসেছিল তারই এমন প্রতাপ দেখে গণুদা হকচকিয়ে গেল। কাউকে কিছু বলতে হল না, পাংশু বিবর্ণ মুখে নিজে থেকেই প্রস্থান করল।

লাবণ্যর হাতের ফাইল টেবিলে নেমেছে। বড় সাহেবও প্রায় বিস্ফারিত নেত্রেই চেয়ে আছেন, গণুদার পিছনে বেয়ারা অদৃশ্য হতে ধীরাপদ চুপচাপ ফিরে তাকালো তাঁর দিকে। হিমাংশুবাবুর হাতের পাইপ মুখে উঠল, পাইপ ধরানোটা কৌতুক গোপনের চেষ্টার মত লাগল।

বসো। আরো একবার দেখে নিলেন। লোকটার না হয় টাকা গিয়ে মাথার ঠিক নেই। তোমার কি হয়েছে?

ধীরাপদ বসল না। ঘাড় ফেরালে লাবণ্যর মুখেও প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস দেখবে মনে হল, কিন্তু ফেরানো গেল না। এবারে হাল্‌কা জবাবই দিতে হবে, তাই দিল।

কিছু হয়নি। টেবিলে কাজ ফেলে উঠে এসেছি। আর বলবেন কিছু?

বড় সাহেব সভয়েই তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন যেন। ধীরাপদ বেরিয়ে এলো। কিন্তু জ্বালা জুড়োয়নি একটুও। যে জবাব জিভের ডগায় করকর করে উঠেছিল সেটা বলে আসা গেল না। বলা গেল না, তার কিছু হয়নি, তার মাথা খুব সুস্থ খুব ঠাণ্ডা আছে। তারপর বড় সাহেবকে সচকিত করে লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করা গেল না, ঘরের নীল আলোয় কোলের মধ্যে সেদিন মাথা গুঁজে পড়েছিল যে সেই মাথাটা এখন সুস্থ কিনা, ঠাণ্ডা কিনা—ছোট সাহেব কেমন আছে। বলতে পারলে একসঙ্গে দুজনকে ঠাণ্ডা করে দেবার মত জবাব হত। জ্বালা জুড়োত।

পাঁচটার বেশ আগেই ধীরাপদ অফিস থেকে বেরিয়েছে। সঙ্গে পোর্টফোলিও ব্যাগটা আছে। দরকার হতে পারে, দরকার যাতে হয় ধীরাপদ সেই সঙ্কল্প নিয়েই চলেছে। দু দিন আগে যে চিন্তা মনে রেখাপাতও করেনি সেটাই এখন দগদগে ক্ষত সৃষ্টি করেছে একটা। সোনাবউদি কি ভাবছে জানা দরকার, তার গোচরেই গণুদা এমন বেপরোয়া হয়ে উঠল কিনা বোঝা দরকার। এই চিন্তা তার ঘুম কেড়েছে। শান্তি কেড়েছে। যদিও এক-একবার মন বলছে, সোনা-

বউদির নয়, ভাবনাটা তারই একটা ভ্রান্তির আবর্তে পড়ে সঙ্গতিভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু ওই মনের ওপর আর আস্থা নেই, দখল নেই। সেই মন এখন উত্তেজনা খুঁজছে, উল্টো রাস্তা খুঁজছে।

সুলতান কুঠিতে আসতে হলে আজকাল আর এখানকার বাসিন্দাদের চোখ এড়ানোর উপায় নেই। কারো না কারো সঙ্গে হবেই দেখা। এবড়ো-খেবড়ো পথের মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখে বিগলিত অভ্যর্থনায় ঘুরে দাঁড়ালেন যিনি তিনি একাদশী শিকদার। ভিতরটা অকারণে উগ্র হয়ে উঠেছে, ধীরাপদ নিজেই টের পাচ্ছে।

শিকদার মশাইও বাইরে থেকে ঘরে ফিরছিলেন। কুশল প্রশ্ন করে সখেদে সমাচার শোনালেন। এই বয়সে পা আর চলে না, তবু বিকেলের দিকে একবার অন্তত না বেবিয়ে পারেন না। দুখানা কাগজ পড়ে পড়ে এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে যে ওর একখানা না দেখলে সেই দিনটাই যেন আব্ছা আব্ছা লাগে। বিশেষ করে গণুবাবুর ঘরের যে কাগজটা এতকাল ধরে পড়ে এসেছেন, সেটা একবার হাতে না পেলে ভালো লাগে না। চাকরি গিয়ে কাগজওয়ালার ঘরে এখন কাগজ আসা বন্ধ হয়েছে, ফলে তাঁরই দুর্ভোগ। ধীরাপদর অনুগ্রহে একখানা কাগজ ঘরে বসেই পডতে পাচ্ছেন, কিন্তু ঐ কাগজখানাও একটু নেড়েচেড়ে দেখার জন্যে বেরুতেই হয়।

মুখ ফুটে বলার পর ওই আর একখানা কাগজও ঘরে বসেই পড়তে পাবেন আশা করেছিলেন কিনা তিনিই জানেন। কিন্তু অনুগ্রহ যে করতে পারে তার মুখের দিকে চেয়ে শিকদার মশাই কাগজ-প্রসঙ্গ সেখানেই চাপা দিলেন। ধীরাপদ কবে সুলতান কুঠিতে ফিরে আসছে খোঁজ নিলেন, তার অবর্তমানে দিনকে দিন বাড়িটা যে বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে সে কথা একবাক্যে ঘোষণা করলেন, তারপর আর একটা সংসারের কথা তুলে আক্ষেপ করতে করতে কদমতলা পর্যন্ত এসে গেলেন। সোনাবউদির সংসারের কথা। সেটাই মনঃপূত হবে ভেবেছেন হয়ত। বউটি ভালো, এ বাজারে চাকরিটা গেল, ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে কি করবে, ধীরাপদ আছে আপনার লোক, সেটা অবশ্য কম ভরসার কথা নয়।...কিন্তু বউটি বড় অশান্তির মধ্যে আছে, পণ্ডিত বলছিল, প্রায়ই অনেক রাত পর্যন্ত বাইরের দাওয়ায় বসে থাকে চুপচাপ, রাত্রে ঘুম হয় না বলে মাঝে মাঝে ওই শুককাল দারোয়ানকে দিয়ে ঘুমের ওষুধ আনিয়ে খায়—পণ্ডিতের তো আবার সবই দেখা চাই, সকলের নাড়ির খবর টেনে বার করা চাই।

ধীরাপদ আর খোঁজেনি, আর শুনতে চায়নি। আর শুনলে কদমতলা পর্যন্ত

এরোও হয়ত তাকে কিয়ে যেতে হবে। এখনই পায়ের ওপর আর তেমন জোর পাচ্ছে না। দাঁড়াল, শিকদার মশাইকে বলল, আর একখানা কাগজও কাল থেকে তিনি রাখতে পারেন।

অপেক্ষা না করে সোনাবউদির ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। আগের দিনও সাড়া না দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, আজ পর্দার এধারে দাঁড়িয়েই উমাকে ডাকল। উমা দৌড়ে এসেও থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

তোর মাকে এ ঘরে একবার আসতে বল্।

নিজের ঘরের দরজা খুলল। ভিতরটা আজো অগোছালো বা অপরিচ্ছন্ন নয়। জুতো খুলে ধীরাপদ ভূমিশয্যায় এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে অস্বস্তি। বসল।

অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, অস্থিরতা বাড়ছে। কেউ আসছে না। হয়ত না এসেই অপমান করবে তাকে। কিন্তু না, প্রায় মিনিট দশেক প্রতীক্ষার পর সোনাবউদি এলো। ঘরের ভিতর থেকে ধীরাপদর দু চোখ সোজা তার মুখের ওপর গিয়ে আটকালো। কতখানি অশান্তির মধ্যে আছে, ক'টা বিনিদ্র রাতের দাগ পড়েছে চোখের কোলে বোঝা গেল না। দশ মিনিট বাদে এই মন্থর আবির্ভাবে একটা অবজ্ঞাভরা রূঢ়তাই স্পষ্ট শুধু।

গোটাকতক কথা ছিল, বসলে ভালো হত।

বসলে মাটিতেই বসে সোনাবউদি, বেশিক্ষণ থাকলে সরে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দেয়। বসল না, দাঁড়িয়েই রইল। পলকের রুক্ষ অভিব্যক্তি একটু, বলুন শুনছি—

অর্থাৎ বসার প্রবৃত্তি নেই, বেশিক্ষণ দাঁড়ানোরও না।

নিজেকে শান্ত সংযত করার চেষ্টায় আরো কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কাটল, তারপর ধীরাপদ বলল, গণুদা সকলের কাছে বলছেন, আমি তাঁর টাকা নিয়েছি, টাকাটা তাঁকে ফেরত দিতে বলার জন্যে তাদের কাছে হাতজোড় করে বেড়াচ্ছেন।

সোনাবউদি চুপচাপ চেয়ে আছে, আরো কিছু বলবে কিনা সেই প্রতীক্ষা। তারপর নিরুত্তাপ প্রশ্ন করল, আমি তার কি করব?

উনি এই করছেন আপনি জানেন?

এবারের জবাবটা আরো নির্লিপ্ত, বীতস্পৃহ। জানি। খবরটা কাগজে তোলা যায় কিনা এখন সেই চেষ্টায় আছে।

জবাবটা নয়, গণুদা কি করেছে বা করছে তাও নয়, এই প্রীতিশূন্য অবজ্ঞার আঘাত মর্মান্তিক। ধীরাপদ যেভাবে তাকালো, এই একজনের দিকে এমন করে আর কখনো তাকায়নি। কিন্তু না, আশা করার মত একটুখানি মরীচিকার

সম্ভবত ওই মুখে খুঁজে পেল না।

আপনি তাঁকে বাধা দেওয়ার দরকার মনে করছেন না বোধ হয়?

না। কথা বাড়ানো হচ্ছে বলে বিরাগের আভাস, সে এখন নিজের মতই একজন ভাবছে আপনাকে, দোষ দিই কি করে?

ও…। আপনারও তাহলে সন্দেহ টাকাটা আমিই নিয়ে থাকতে পারি?

সোনাবউদির দু চোখ স্থির হয়ে তার মুখের ওপর বিঁধে থাকল কয়েক নিমেষ, তার পরে আবার তেমনি নির্লিপ্ত। ঠিক তেমনি নয়, অতুচ্ছ কথা ক'টা হৃৎপিণ্ড খুবলে দেওয়ার মতই তাচ্ছিল্যে ভরা। বলল, ভেবে দেখিনি। তবে মানুষকে আর বিশ্বাসই বা কি…।

ধীরাপদ আর কথা বাড়াবে না, কথার শেষ হয়েছে। আর যেটুকু বাকি সেটুকু করে ওঠার মতই ধৈর্য দরকার, সংযম দরকার। সংযমের আবরণটা প্রায় দুর্ভেদ্য করে পোর্টফোলিও ব্যাগ খুলল। চেকবই বার করল, পকেট থেকে কলম নিল।…স্বর্ণময়ী না স্বর্ণবালা? অনেককাল আগে রণুর মুখে একদিন শুনেছিল নামটা…স্বর্ণবালাই। নাম লিখল, টাকার অঙ্ক বসাল, নিচে নিজের নাম সই করে ধীরে-সুস্থে চেকটা ছিঁড়ল। চেকবই ব্যাগে ঢুকল, কলম পকেটে উঠল। মুখের দিকে তাকাবে না ভেবেছিল, একটুখানি প্রশ্রয়ের আভাস পেলে যথাসর্বস্ব তুলে এনে পায়ের কাছে রাখতে পারত যার, সাড়ে চার হাজারের এই সর্বগ্রাসী কাগজটা তার হাতে তুলে দেবার সময় মুখের দিকে তাকানো যাবে না ভেবেছিল। কিন্তু চেকটা বাড়িয়ে দেবার সময় চোখ দুটো শাসন মানল না, আর মানল না যখন সে চোখ ফেরানোও গেল না।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্নায়ুতে স্নায়ুতে খুশির তরঙ্গ একটা—এতক্ষণের এই দাহ বিস্মৃত হবার মতই। ধীরাপদ ওই মূর্তি চেনে, ওই আগ্নেয়-স্তব্ধতা চেনে। কাজ হয়েছে। দৃষ্টি বদলেছে, নিস্পৃহতার আবরণ খসেছে, অবজ্ঞার বদলে মুখে অপমানের আঁচ ঝলসে উঠেছে।

কিন্তু এও কিছুক্ষণ মাত্র। একটু বাদে ছাইচাপা আগুনের মত নিরুত্তাপ দেখালো সোনাবউদির গনগনে মুখখানা। চেকটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে নিল।

টাকাটা দিয়েই ফেলছেন?

হ্যাঁ। ব্যাগ হাতে ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল, দু চোখে শ্লেষ উপচে উঠতে চাইছে, সাড়ে চার হাজার টাকা যে এত টাকা জানত না। বলল, গণুদাকেও জানাবেন দিয়ে গেলাম—

জানাবই যদি তাহলে আর আমার নামে লিখলেন কেন…। অন্ন মাথা নাড়ল, জানানো ঠিক হবে না—

ধীরাপদ কথা শেষ করেছে, অনেক কিছুই শেষ করেছে। বিছানা থেকে উঠে জুতো পায়ে গলালো।

টাকাটা হাতে পেয়েই যেন সোনাবউদির গলার স্বরও একেবারে শমে নেমেছে। বলল, সাড়ে চার হাজার টাকা তো এমনি কেউ দেয় না, এর পর কি করতে হবে বলুন—

ধীরাপদর পা থেমে গেল, কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভিতরটা সচকিত হয়ে উঠল।

সোনাবউদি প্রতীক্ষা করল একটু। ধীর সবিনয় প্রতীক্ষার মতই। বলল, যে দুর্যোগের মধ্যে পড়েছি কোন্ দিকে যাব ঠিক নেই।…এ রাস্তাটাই নিই যদি আপনাকেই না হয় সবার আগে ডাকব, আপনার অনেক টাকা।

ধীরাপদর দিকেই চেয়ে আছে, তার দিকে চেয়েই বলছে কথাগুলো। কিন্তু হাতের চেকটা ততক্ষণে চার টুকরো হয়ে গেছে। আরো কয়েকটা টুকরো করে মেঝেতে ফেলে দিল সেগুলো। বলল, কিন্তু তা যতদিন না ঠিক করে উঠতে পারছি, টাকা পকেটে করে যে জায়গায় ঘোরাঘুরি করছেন আজকাল সেখানেই যান।

আর দাঁড়ায়নি, আর একবারও ফিরে তাকায়নি, সোনাবউদি ঘর ছেড়ে চলে গেছে। ধীরাপদর চোখ দুটো কি দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল তাকে? তার পরেও কি দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল আর? মনে নেই। ট্যাক্সিতে ওঠার পর একবার শুধু মনে হয়েছে ঘরটা খোলা ফেলেই চলে এলো। মনে হতে না হতেই ভুলে গেছে। সব ক'টা স্নায়ু একাগ্র হয়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে কি। অনন্মুভূত এক অন্ধ আক্রোশে আত্মবিনাশের রাস্তা খুঁড়ে চলেছে সেই থেকে। যেখানে যেতে বলল সোনাবউদি সদম্ভে এবার সেখানেই যাবে? সেদিনের মত যাওয়া নয়, সেদিন সে যায়নি, একটা বিস্মৃতির ঘোর তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেই যাওয়ার পিছনে একটা গোটা দিনের ষড়যন্ত্র ছিল। আজ নিজে গিয়ে প্রতিশোধ নেবে? সমস্ত আদিম রিপুর উল্লাস একত্র করে সেই পিচ্ছিল মৃত্যুর গহ্বরে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারাটাই হয়ত সব থেকে বড় প্রতিশোধ নেওয়া হবে সোনাবউদির ওপর। নিজের ওপরেও।

কিন্তু ড্রাইভারটাকে হয়ত কিছু একটা নির্দেশ দিয়েছে সে-ই। ট্যাক্সি মিত্তির বাড়ির রাস্তায় ছুটেছে। ধীরাপদ গা এলিয়ে দিল।…চেকটা সোনাবউদির হাতে

তুলে দেবার সময় যে শেষের যবনিকা দেখছিল চোখের সামনে, সেটাই নিবিড় কালো দ্বিগুণ অনড় হয়ে সামনে ঝুলছে এখন। এইখানেই শেষ যেন সব। এর ওধারে চোখ চলে না।

। বাইশ ।

সিতাংশুর বিয়ে হয়ে গেল।

বড় সাহেবের বুক থেকে চিন্তার পাহাড় সরল। আত্মতুষ্টিতে ভরপুর তিনি, এর পরের যা কিছু সবই একটা নিশ্চিন্ত প্রতিশ্রুতির সুতোয় গাঁথা।

অনিশ্চয়তার ছায়া সত্যিই কোথাও পড়েনি। আর পাঁচটা বড়লোকের বাড়ির বিয়ে যেমন হয় তেমনি হয়েছে। তেমনি সমারোহ হয়েছে, উৎসব হয়েছে। এই বিয়ে নিয়ে কোনদিন কোনো সমস্যা ছিল, কোনো বিঘ্ন রেখাপাত করেছিল, একবারও তা মনে হয়নি। বরং ভারী সহজে শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এত সহজে যে ধীরাপদর চোখে সেটুকুই রহস্যের মত। তার কেবলই মনে হয়েছে এমন সুনির্বিঘ্নে বিয়েটা ঘটে যাওয়ার পিছনে শুধু বড় সাহেব নয়, আরো একজনের ইচ্ছা অমোঘ নির্দেশের মতই কাজ করেছে।

সেই একজন লাবণ্য সরকার। উৎসব বাড়িতে তার নির্লিপ্ত সহজতার মধ্যেও ধীরাপদ শুধু এইটুকুই আবিষ্কার করতে পেরেছিল।

বিয়ে বড় সাহেবের মনোনীত পাত্রী অর্থাৎ মান্‌কের সেই 'মিনিসটারের কন্যে'র সঙ্গেই হয়েছে। যে মেয়ে বিয়ের আগে বাপের সঙ্গে হবু-শ্বশুরবাড়ি এসে বেড়িয়ে গেছে একদিন। মান্‌কের সেই 'পরীর মত মেয়ে—দু গালে আপেলের মত রঙ বোলানো আর ঠোঁট দুটো টুকটুক করছে লাল—লিপটিকের লাল। চিত্তির-করা পটে আঁকা মুখ একেবারে।' মান্‌কের প্রথম দেখার সঙ্গে উৎসব-রাতে ধীরাপদর প্রথম দেখার অমিল হয়নি খুব। কিন্তু তারপর মান্‌কে ধাক্কা খেয়েছে হয়ত, রঙশূন্য ঘরোয়া সাজে মেয়েটিকে অন্যরকম লেগেছে ধীরাপদর। ভালই লেগেছে। মোটামুটি সুশ্রী, চাউনিটা সপ্রতিভ, মুখখানা হাসি হাসি।

দাম্পত্য রাগের সুর তাল লয় মানের হদিস মেলেনি এখনো। বিয়ের দায় সেরেই সিতাংশু কাজে অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে উঠেছে। আপাতদৃষ্টিতে নিরাপত্তার ভিত যদি কারো নড়ে থাকে, সে মান্‌কের আর কেয়ারটেক্ বাবুর। বিয়ের সাত-আট দিনের মধ্যেই ওদের রেষারেষির শেষ দেখেছে ধীরাপদ। নিরিবিলিতে মুখোমুখি বসে আলাপচারি পর্যন্ত করতে দেখেছে। ধীরাপদ

হেলেছে, তার পরস্পরকে যত কাছে টানে তত আর কিছুতে নয়।

কিন্তু দিনকতকের মধ্যেই ধীরাপদকে আবারও হাসতে হয়েছে। নিভৃতের আশঙ্কা বস্তুটা বড় বিচিত্র। কাজ ফেলে বউরাণীর সঙ্গে মানুকের অত গল্প করা পছন্দ নয় কেয়ারটেক্ বাবুর। ফাঁক পেলেই বিনয়ের অবতারটি হয়ে পায়ের কাছে গিয়ে বসা চাই।

—সারাক্ষণ গুজুর গুজুর, লাগানো ভাঙানো দেয় কিনা কে জানে, সম্ভব হলে ওর চরিত্তিরটা বউরাণীকে একটু বুঝিয়ে দেবেন বাবু, অত আস্কারা পেলে মাথায় উঠবে।

নতুন বউ এরই মধ্যে প্রশ্রয় ওকে কতটা দিয়েছে ধীরাপদর জানা নেই। তবে মানুকের ভয় অনেকটাই ঘুচেছে বোঝা যায়। বউরাণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সে—পা দিতে না দিতে বাড়িটায় যেন লক্ষ্মীর পা পড়েছে, বাড়িটা এতদিনে বাড়ি বলে মনে হচ্ছে তার। এই মনে হওয়াটা অকপটে সে নববধূর কাছেও ব্যক্ত করেছে সন্দেহ নেই।

—অত বড়লোকের মেয়ে, কতই বা বয়স, বেশি হলে তেইশ-চব্বিশ—এরই মধ্যে সকলকে আপন করে নেবার বাসনা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকলের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন বউরাণী, বড় সাহেবের কথা, বাবুদের কথা—ধীরুবাবুর কথাও। এদিক-ওদিক চেয়ে মানুকে গলা খাটো করেছে, সবদিকে চোখ বউরাণীর, দু দিন ধরে দু বেলাই অন্যরকম খাচ্ছেন না বাবু? মানুকের সব থেকে বেশি আনন্দ বোধ হয় এই কারণেই, হি-হি করে হেসেছে আর রহস্য উদ্ঘাটন করেছে।—সব বউরাণীর ব্যবস্থা, বুঝলেন? চুপচাপ এতদিন দেখেছেন তারপর এই ব্যবস্থা করেছেন। ওনার বাপের বাড়ির ঝি সঙ্গে আসতেই কেয়ারটেক্ বাবুর চোখ কপালে উঠেছিল, এখন আবার রাঁধুনী এলো—কেয়ারটেক্ বাবুর মুখে আর রা নেই!

—নিজের হাতে দু বেলা শ্বশুরের চা-জলখাবার এনে দেন, খাবেন না বললেও দুধের গেলাস হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন খেতে হয়—খবরের কাগজ পড়ে শোনান আর দিনে দু-একখানা চিঠিও লিখে দেন। বউরাণীর টুকিটাকি এরকম আরো অনেক কাজের ফিরিস্তি দিয়েছে মানুকে। তারপর হৃষ্ট-গাম্ভীর্যে মন্তব্য করেছে, বিয়েটা হয়ে ছোট সাহেবের থেকেও বড় সাহেবের বেশি সুবিধে হয়েছে বাবু...

ধীরাপদর চাউনিটা একেবারে সোজাসুজি মুখের ওপর এসে পড়তে কাজের তাগে মুখের ভোল বদলে মানুকে দ্রুত প্রস্থান করেছে।

বউরাণীর নাম আরতি। সকালের দিকে ওপরে উঠলে শ্বশুরের কাছেই তাকে দেখা যায় বটে। ধীরাপদর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ এখনো হয়নি, প্রাথমিক পরিচয়টা অবশ্য বড় সাহেব গোড়ার দিকেই করিয়ে দিয়েছেন।—ইনি ধীরুবাবু, ভালো করে চিনে রাখো। এ বাড়ির গার্জেন বলতে গেলে ও-ই, আর আমাদের কারখানারও মস্ত কর্তা-ব্যক্তি, দরকার হলে আমার ওপর দিয়ে লাঠি ঘোরায়।

হাসিমুখে মেয়েটি চিনে রাখতেই চেষ্টা করেছে।

নিছক কৌতুকবশতই বড় সাহেব ওর পরিচয়টা এভাবে ফাঁপিয়ে তোলেননি হয়ত। এখানে আছে বলে কেয়ারটেক্ বাবুর মতই একজন না ভেবে বসে থাকে বউ, সেই ভয় বোধ হয় তাঁর।

ধীরাপদর এ বাড়িতেই থাকা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। যাবার তাড়া আর ছিল না, তবু হিমাংশুবাবু কানপুর থেকে ফেরার পর যাবার কথাটা সে-ই তুলেছিল। হিমাংশুবাবুর তখনো ধারণা, একরকম জোর করেই আটকে রাখা হয়েছে তাকে, আর আপত্তি করার কথাও ভাবেননি তিনি। তবু ভ্রূকুটি করেছেন—কোথায় যাবে? তোমার সেই সুলতান কুঠিতে?

জবাব না দিলে এর পরের কৌতুক আরো ঘোরালো হবে জানত। তাই চুপ করে থাকেনি।—না, কাছাকাছি একটা বাসা দেখে নেব।

যেখানে থাকতে সেখানে যাচ্ছ না? বড় সাহেব অবাক।

না, যাতায়াতের বড় অসুবিধে, তা ছাড়া একটা মাত্র ঘর···

বড় সাহেব সোজা হয়ে বসেছেন, মুখের পাইপ নামিয়েছেন, তারপর ছদ্ম-গাম্ভীর্যে মুখখানা ভরাট করেছেন।—ক'টা ঘর দরকার তোমার? এই গোটা বাড়িটা ছেড়ে দিলে চলতে পারে?

ধীরাপদ আগের মত বিব্রত বোধ করেনি আর। প্রশ্ন শুনে হেসেও ফেলেছিল।

আমি ভেবেছিলাম কি-না-কি গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছ সেখানে, তা না তুমি বাসা খুঁজছ!

অতঃপর সানন্দে তার যাওয়ার ইচ্ছেটা বাতিল করে দিয়েছেন বড় সাহেব, ফের যাওয়ার কথা তুললে রাগ করবেন বলে শাসিয়েছেন।

ধীরাপদ আর আপত্তি করেনি, আপত্তি করার ফুরসৎও মেলেনি। কত কারণে ওর ওখানে থাকাটা জরুরী এখন, মনের আনন্দে বড় সাহেব সেই ফিরিস্তি দিয়েছেন। এক ছেলের বিয়ে। খুব ছোট ব্যাপার হবে না সেটা, ও কাছে না থাকলে সবদিক দেখবে শুনবে কে? দ্বিতীয়, ছেলের বিয়ে চুকলেই মাস ছয়েকের

জন্য আর একবার য়ুরোপের দিকে পা বাড়াবেন তিনি। ও-দেশের কারবার-গুলোর আধুনিক ব্যবস্থাপত্র হালচাল পর্যবেক্ষণে যাবেন। ভারতীয় ভেষজ সংস্থার সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগসূত্রটা চোখে পড়ার মত করে পুষ্ট করে আসা যায় কিনা সেই চেষ্টা করবেন। এর ফলে সংস্থার আগামী প্রেসিডেন্ট ইলেকৃশনের ব্যাপারে তাঁর দাবি দ্বিগুণ হবে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে হয়ত বা কেউ আর মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবেই না। কানপুরের অধিবেশনে এ নিয়ে অনেকের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে। অমন জোরালো বক্তৃতার পরে নিজের খরচে সংস্থার এই উন্নয়ন পরিকল্পনা শুনে তাঁরা একবাক্যে প্রশংসা করেছেন। সেখানে বসেই বাইরে অনেকগুলি চিঠিপত্র লিখে ফেলেছেন তিনি। জবাবের প্রত্যাশায় আছেন। ধীরাপদর সঙ্গে বসে এরপর ভ্রমণ-সূচী ঠিক করবেন। অতএব এখান থেকে নড়ার চিন্তা ধীরাপদর একেবারে ছাড়া দরকার।

চিন্তা ছেড়েছে। কিন্তু খবর দুটো শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনের তলায় যে দুটো প্রশ্ন আঁচড় কাটছে, জানলে বড় সাহেব রেগে যেতেন কি হেসে ফেলতেন বলা যায় না। মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করার মত নয় একটাও। প্রথম, ছেলের বিয়ে ছেলে নিজে তা জানে কি না। দ্বিতীয়, তিনি একা যাচ্ছেন, না এবারও চারুদি সঙ্গিনী হবেন? চারুদি সঙ্গে গেলে পার্বতীকে নিয়ে সমস্যাটা যেন ধীরাপদরই।

চারুদির বাড়ি গিয়েছিল সিতাংশুর বিয়ের দিন কয়েক পরে। চারুদির ডাক আসার প্রতীক্ষায় একটানা অনেকগুলো দিন কাটিয়ে শেষে নিজেই গেল একদিন। যেতে দ্বিধা বলেই যাবার ঝোঁক বেশি। তাড়না বেশি। কিন্তু এসে শঙ্কা বোধ করল। যে চারুদির দিকে তাকালে বয়সের কথা মনে হত না, শুধু ভালো লাগত —তাঁর দ্রুত পরিবর্তনটা বড় বেশি রুক্ষ লাগছে। বয়সটাই আগে চোখে পড়ে এখন। তাঁকে দেখামাত্র পার্বতীর সেদিনের উক্তিতে সংশয় জাগল। বড় সাহেবের সঙ্গে তাঁর কানপুরে যাওয়া ব্যর্থই হয়েছে বোধ হয়…কাছে থেকেও এবারে চারুদি কিছু করাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

বসো—। খুশিও না, বিরক্তিও না। শুকনো অভ্যর্থনা। আগে হলে এতদিন না আসার দরুন অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হত, অনেক সরস আর উষ্ণ টিপ্পনী শুনতে হত।

বিয়ের ঝামেলা মিটল?

হ্যাঁ, কবেই তো। বড় সাহেবের ছেলের বিয়েতে চারুদি কেউ না, একেবারে অস্তিত্বশূন্য।

বউ কেমন হল?

ভালই।

ছেলের মাথা ঠাণ্ডা থাকবে মনে হয়?

ধীরাপদ নিজেই জানে না থাকবে কিনা। মাথা নাড়ল, মনে হয়।

চারুদির আর কিছু শোনায় আগ্রহ নেই, কথা বলায় আগ্রহও না। 'মনে হয় না' বললে বিরস মুখে একটুখানি উদ্দীপনা দেখা যেত হয়ত। পিছনে সরে খাটে ঠেস দিলেন, ধীরাপদ উঠলে হয়ত শুয়ে পড়বেন।

ওদিকে পার্বতীও হয়ত তার আসাটা টের পেয়ে আড়াল নিয়েছে কোথাও। এক পেয়ালা চা খেতে চাইলে কেমন হয়? পার্বতীর ডাক পড়বে, কতখানি ঘৃণা আর বিদ্বেষ জমেছে মুখে দেখা যাবে। চা চাওয়া হল না, এমনিতেই তেতে উঠছে। এতকাল ধরে অমিত ঘোষের অমন দস্যুবৃত্তির প্রশ্রয় কে দিয়ে এসেছে? তখন ধীরাপদ কোথায় ছিল? লোকটার সেই ফোটো অ্যালবামের পার্বতী কি আর কেউ নাকি?

চারুদির সঙ্গে সহজ আলাপে মগ্ন হতে চেষ্টা করল, বড় সাহেব য়ুরোপ যাচ্ছেন শিগগীরই শুনেছ?

শুনেছেন জানে, কারণ যাত্রার সঙ্কল্প কানপুর থেকেই পাকা হয়ে এসেছে। চারুদি আধ-শোয়া, মাথাটা খাটের রেলিংয়ের ওপর। ফিরে তাকালেন একবার, তারপর দৃষ্টিটা ঘরের পাখার ওপর রাখলেন।—দিন ঠিক হয়ে গেছে?

না, ছেলের বিয়ের জন্যে আটকে ছিলেন, এবারে যাবেন। কি মনে হতে পরামর্শ দিল, বলে-কয়ে অমিতবাবুকেও সঙ্গে পাঠাও না, বাইরে কাছাকাছি থাকলে অন্য রকম হতে পারে…

বিরক্তিভরা দুই চোখ পাখা থেকে তার মুখের ওপর নেমে এলো আবার। বললেন, তোমার অত ভেবে কাজ নেই, নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও।

হঠাৎ এই উষ্মার কারণ ঠাওর করা গেল না। চারুদির রাগ দেখেছে, হতাশা দেখেছে, কিন্তু এ ধরনের বচন আগে আর শোনেনি। কর্কশ লাগল কানে, ভিতরটা চিনচিন করে উঠল।

কিন্তু ভিতরে বাইরে এক হতে নেই এ যুগে, ধীরাপদ হাসতে পেরেছে। রয়ে-সয়ে বলল, কানপুর থেকে ঘুরে এসে তোমার মেজাজের আরো উন্নতি হয়েছে দেখছি, অমিতবাবুর মাসি বলে চেনা যায়…

চারুদি আস্তে আস্তে উঠে বসলেন, তারপর মুখোমুখি ঘুরে বসলেন। এই প্রতিক্রিয়ার কারণও দুর্বোধ্য।—আমি কানপুরে গিয়েছিলাম তোমাকে কে বলল?

ধীরাপদর একবার ইচ্ছে হল চোখ কান বুজে বলে দেয়, বড় সাহেব। পার্বতী বাড়িতে ডেকে এনে বলেছে বললেই বা কোন্ ভাব দেখবে মুখের ?

এখানেই শুনেছি। একদিন এসেছিলাম।

কবে এসেছিলে ?

তোমরা যাওয়ার দিনকয়েকের মধ্যে। তুমি যাবে জানতুম না।

তুমি একা এসেছিলে ?

আর কে আসবে ? জেরার ধরনে স্বস্তি বোধ করছে না খুব।

চারুদির সন্ধানী দৃষ্টিটা যা খুঁজছিল তা যেন পেল না। তবু খুঁজছেন কিছু। —পার্বতী আর কি বলেছে তোমাকে ? চাপা ঝাঁজ, এদিকে সরে এসো, দেয়াল ফুঁড়ে কথা কানে যায় বেইমান মেয়ের। কি বলেছে ?

চকিতে ধীরাপদ দরজার দিকে ঘাড় ফেরাল একবার, তারপর বিস্ময়ের আড়ালে একটুখানি অবকাশ হাতড়ে বেড়াল।—কি বলবে ?

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, সমস্ত মুখ লাল। সামনে যে বসে তার ওপরই রাগ।— নিজেকে খুব আপন ভাবো ওর, কেমন ? কি বলেছে ?

যেটুকু ভাবা দরকার ছিল ভেবে নেওয়া গেছে। পার্বতী কি বলেছিল স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে। চারুদির কানপুরে যাওয়ার উদ্দেশ্য জানিয়ে পার্বতী অনুরোধ করেছিল, আপনি এসব বন্ধ করুন। পার্বতী শুধু তাকে শোনাবার জন্যে বলেনি, শুনে মুখ বুজে বসে থাকতেও বলেনি।

ধীরাপদ আগে তবু চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক, চারুদির হাবভাব সুস্থ লাগছে না তাই বুঝিয়ে দিল। তারপর পার্বতী কি বলেছে স্মরণ করতেও যেন সময় লাগল একটু।

···পার্বতী বলছিল তুমি ওকে সম্পত্তি দান করার মতলব নিয়ে কানপুরে গেছ। ব্যাঙ্কের পাস-বইটই আর কারবারের কাগজপত্রও সঙ্গে নিয়েছিলে শুনলাম।

চারুদির নিষ্পলক প্রতীক্ষা, মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় বুকের মধ্যে জ্বলছে কিছু।

একেবারে উপসংহারে পৌঁছল ধীরাপদ, ওর তাতে বিশেষ আপত্তি দেখলাম—

ছাই দেখেছ তুমি! ছাই বুঝেছ! শুধু আমার হাড়-মাস চিবিয়ে খাওয়া ছাড়া আর সবেতে আপত্তি ওর সে কথা বলেছে তোমাকে ?

ধীরাপদ হকচকিয়ে গেল, একপশলা তরল আগুনের ঝাপ্‌টা লাগল মুখে।

একটু আগে যে কারণে তাকে কাছে সরে আসতে বলেছিলেন, চারুদি নিজেই তা ভুলে গেলেন। রাগে উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর চড়তে লাগল।

আমাকে আক্কেল দেবার জন্যে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতেও আপত্তি নেই ওর, বুঝলে? নিজের মুখে কালি লেপে আমাকে খুব জব্দ করবে ভেবেছে। কেটে কুচি কুচি করে ওকে ওই বাগানে পুঁতে রেখে আসব তবে আমার নাম—করাচ্ছি আপত্তি!

প্রবল উত্তেজনায় মুখেই চারুদি ভেঙে পড়লেন আবার। অবসন্ন ক্ষোভে খাটের রেলিংয়ে মাথা রেখে বাহুতে মুখ ঢেকে ফেললেন। ধীরাপদ বিমূঢ়, দরজার দিকে চোখ গেল, মনে হল পার্বতী বুঝি মূর্তির মত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। নেই কেউ। আর একদিন স্বর্ণসিন্দুর হাতে ঘরে ঢুকেছিল, আজও সেই রকমই একটা আশঙ্কা ধীরাপদর।

উঠে চারুদির সামনে এসে দাঁড়াল। তাঁর হাতখানা আস্তে আস্তে মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। চমকে উঠে চারুদি নিজেই হাত সরালেন।

পার্বতী কি করেছে?

কিছু না। চারুদি এবারে বিদায় করতে চান ওকে, আজ যাও তুমি, আর একদিন এসো, কথা আছে—

কি হয়েছে বলো না?

আঃ! আজ যাও বলছি, আর একদিন এসো—

চারুদি তাড়িয়েই দিলেন যেন। ঘর ছেড়ে ধীরাপদ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকালো, কান পাতল। পার্বতী এই বাড়িতেই নেই যেন। অথচ মনে হচ্ছে সমস্ত বাড়িটা জুড়ে শুধু পার্বতীই আছে, আর কেউ নেই।

ধীরাপদ বেরিয়ে এলো।

অবাঞ্ছিত লাগে নিজেকে, পরিত্যক্ত মনে হয়। কার্জন পার্কের লোহার বেঞ্চির ধীরাপদ আজ অনেক উঠেছে, অনেক পেয়েছে। কিন্তু অঙ্কের বাইরেও অনেক রকমের হিসেব আছে। তেমনি কোনো একটা হিসেবে সে যেন অনেক নেমেছে, অনেক হারিয়েছে। সেই ওঠা-নামা আর পাওয়া-হারানোর একটা শূন্য ফল অষ্টপ্রহর হাউইয়ের মত জ্বলে জ্বলে উঠতে চায়।

যে অলক্ষ্য তাড়না তাকে চারুদির বাড়িতে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল সেটাই তাকে সুলতান কুঠির দিকেও ঠেলে পাঠাতে চেয়েছে বার বার। সেখানে যাওয়ার

পথ বন্ধ ভাবছে কেন, গেলে কে বাধা দেবে? তার ঘর আছে সেখানে, যাবার অধিকারও আছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে শূন্য ঘরে ঘণ্টা দু-চার মুখ বুজে বসে থেকে অধিকার দেখিয়ে আসবে?

যাবার মত একটা উপলক্ষ হাতড়ে পেল। পেল যখন, সেটাকে একেবারে তুচ্ছ ভাবা গেল না। একাদশী শিকদারকে কাগজের দামটা দিয়ে আসা দরকার। একখানা কাগজের গোটা বছরের টাকা আগাম দেওয়া আছে। গণুদার অফিস থেকে যে কাগজ আসত সেটাও রাখার পরোয়ানা দিয়ে এসেছিল তাঁকে, কিন্তু দাম দেওয়া হয়নি। দিয়ে আসা দরকার।

বাস থেকে নেমেই ধাক্কা খেল একটা। কুঠি এলাকা খুব কাছে নয় সেখান থেকে। সামনের অপরিসর চার রাস্তা পেরিয়ে সাত-আট মিনিটের হাঁটাপথ। রাস্তাটা পেরুতে গিয়ে পা থেমে গেল। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে গণুদা কথা কইছে কার সঙ্গে। লোকটা গণুদার মুখোমুখি অর্থাৎ এদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বলে গোটাগুটি দেখা যাচ্ছে তাকে।...চকচকে চেহারা, পরনে ঝকঝকে স্যুট, হাতে ঘাস-রঙা সিগারেটের টিন, চঞ্চল হাবভাব, কথা কইছে আর কোটের হাতা টেনে ঘড়ি দেখছে। দেখা মাত্র একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি ছেঁকে ধরার উপক্রম। এ রকম একজন লোককে ধীরাপদ কোথায় দেখেছিল? কবে দেখেছিল? এ রকম একজনকে নয়, এই লোককেই। কিন্তু কোথায়? কবে? চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না কোথায় দেখেছে, কবে দেখেছে। যেখানেই দেখুক, সেই দেখার সঙ্গে কোনো শুভ স্মৃতি জড়িত নয়—চেতনার দরজায় শুধু এই বার্তাটাই ঘা দিয়ে গেল বারকতক।

একটা লোককে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতে দেখলে সেদিকে চোখ যাবেই। লোকটাও দেখল, দেখে ভুরু কোঁচকালো। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে গণুদা ঘাড় ফেরাল। এবারে গণুদাকেই দেখল ধীরাপদ। পরনের জামা-কাপড় আধময়লা, শুকনো মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ফর্সা রঙ তেতে-পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

এক মুহূর্তে যতখানি ঘৃণা আর বিদ্বেষ বর্ষণ করা যায় গণুদা তা করল। তারপর একেবারে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল।

ধীরাপদ পাশ কাটিয়ে গেল। সঙ্গের ওই ঘাস-রঙা সিগারেটের টিন হাতে লোকটাকে কোথায় দেখল? কবে দেখল?

সুলতান কুঠি যত কাছে আসছে পা দুটো ততো ভারী লাগছে। মজা পুকুরের অনেকটা এধারেই পা দুটো অচল হয়ে থেমেই গেল শেষে। কোথায়

যাচ্ছে সে? কি দেখতে যাচ্ছে? গণুদার ওই মূর্তি, যাচ্ছে যেখানে সেখানকার চেহারা কেমন দেখবে? দুটো মাস কেটে গেল এরই মধ্যে, কিন্তু এখানে এই দুটো মাসের প্রত্যেকটা দিন কিভাবে কেটেছে? ওকে দেখেই হয়ত উমা বেরিয়ে আসবে, তার পিছনে হয়ত ছেলে দুটোও বেরিয়ে আসবে—এলে ধীরাপদ কি দেখবে ঠিক কি!

দম বন্ধ হয়ে আসছে, একটা অব্যক্ত যাতনা শুধু দুই চোখের কোণ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ধীরাপদ হন হন করে ফিরে চলল। একাদশী শিকদারের খবরের কাগজের টাকা মনি অর্ডার করে পাঠালেই হবে। তারপর আর একদিন প্রস্তুত হয়ে আসবে সে। সব দেখার মত, সব সহ্য করার মত, আর সব কিছুর চূড়ান্ত বোঝাপড়া করে নেবার মত প্রস্তুত হয়ে।

চার রাস্তার মোড়ে গণুদা বা সেই লোকটা নেই। আরো একবার মনের তলায় ডুব দিয়ে লোকটাকে আঁতিপাতি করে খুঁজল। পেল না। লোকটাকে দেখেছিল কোথাও ভুল নেই। অশুভ দেখা, অশুভ স্মৃতি কিছুর…এই লোক গণুদার সঙ্গে কেন? কিন্তু কে লোকটা?

রাজ্যের ক্লান্তি। থাক, মনে পড়বে'খন যখন হয়।…

ক'টা দিন না যেতে মনটা আবার যে স্রোতের মুখে গিয়ে পড়ল তার বেগ যত না, আবর্ত চতুর্গুণ। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সেটা প্রবল নয় খুব, প্রত্যক্ষ-গোচরও নয় তেমন।

অমিতাভ ঘোষের রিসার্চের প্ল্যান নাকচ হয়ে গেল।

বিয়েটা করে ফেলার পর ছোট সাহেব সিতাংশু মিত্র হৃতক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। শুধু ফিরে পাওয়া নয়, ওই এক কারণে তার আধিপত্যের দাবি আগের থেকেও বেড়েছে যেন। বড় সাহেব বিদেশযাত্রা করলে ব্যবসায়ের সর্বময় কর্তৃত্বের দখলও সে-ই নেবে এও প্রায় প্রকাশ্যেই স্পষ্ট। তার চালচলন ঈষৎ উগ্র, কাজকর্মে দৃষ্টি প্রখর।

কারখানার কর্মচারীদের অনেকে শঙ্কা বোধ করেছে। গত উৎসবে বড় সাহেবের ঘোষণা অনুযায়ী তাদের পাওনাগণ্ডা মেটেনি এখনো। অনেক কিছুই প্রতিশ্রুতির সুতোয় ঝুলছে। কেউ কেউ ধীরাপদর কাছে প্রস্তাব করেছে, বড় সাহেবকে বলুন না, যাবার আগে এদিকের যদি কিছু ব্যবস্থাপত্র করে যেতেন…। তানিস সর্দার পরামর্শ করতে এসেছিল, দলবলে বড় সাহেবের কাছে এসে তারা একটু সরব আবেদন পেশ করে যাবে কি না। হাসি চেপে ধীরাপদ আশ্বাস

দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বড় সাহেবের সঙ্গে তার কথা হয়েছে, ছেলের সঙ্গে আর লাবণ্যর সঙ্গে পরামর্শ করে আপাতত যতটা করা সম্ভব তিনি করতে বলেছেন।

সিতাংশু দিনের অর্ধেক প্রসাধন বিভাগের কাজ দেখে। সেখানে সে নতুন ম্যানেজার নিযুক্ত করেছে একজন। বেলা দুটোর পর এই অফিসে আসে। লাবণ্যর ঘরে নিজের সেই পুরনো টেবিলেই বসে। বড় সাহেবের কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই আর। হুকুমমত বিয়ে করে ছেলে যে গুণের পরিচয় দিয়েছে আপাতত সেটা সব কিছুর উর্ধ্বে। তাছাড়া, তাঁর অনুপস্থিতিতে মালিক তরফের প্রধান একজন দরকার। চেক-টেক সই করা আছে, আরো অনেক রকমের দায়িত্ব আছে। ভাগ্নের ওপর এ দায়িত্ব দেওয়া চলে না ধীরাপদও বোঝে। নিজের কাজকর্ম দেখাই ছেড়েছে সে। সেখানে এখন সিনিয়র কেমিস্ট জীবন সোম সর্বেসর্বা।

অমিতাভ মামাকে কড়া নোটিস দিয়েছিল, বাইরে পা বাড়াবার আগে তার গবেষণা বিভাগ চালু করে দিয়ে যেতে হবে। মোটামুটি স্কীমও একটা দিয়েছে সে, কিন্তু সেটা খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ কারো হয়েছে বলে ধীরাপদর মনে হয় না। কাগজপত্রগুলো বড় সাহেব তার কাছে চালান করেছেন, বলেছেন, দেখো কিভাবে মাথা ঠাণ্ডা করবে, সতুর সঙ্গেও পরামর্শ করে নিও।

সিতাংশু পরামর্শ কিছু করেনি, ভাল-মন্দ একটা কথাও বলেনি। কাগজ-পত্রগুলো নিজের হেপাজতে রেখে দিয়েছে। মনে মনে বেশ একটা অস্বস্তি নিয়েই দিন কাটাচ্ছিল ধীরাপদ, অনাগত দুর্যোগের ছায়া দেখছিল। অমিতাভর এই প্রেরণার সবটাই একটা সাময়িক খেয়াল বলে মনে হয়নি তার, একেবারে তুচ্ছ করার মত মনে হয়নি। সে বিজ্ঞান বোঝে না কিন্তু সত্তার তাগিদ বোঝে। এই দুর্দম দুরন্ত লোকের মধ্যেই সাধনার ক্ষেত্রে যে সমাহিত তন্ময়তা নিজের চোখে দেখেছে, তা উপেক্ষার বস্তু নয়। কিন্তু এ নিয়ে ধীরাপদ ভাবনা-চিন্তার অবকাশও পায়নি, অফিসের কয়েক ঘণ্টা বাদে সর্বদাই বড় সাহেবের প্রবাসের প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত সে।

ধূমকেতুর মত অমিতাভ সেদিন তার অফিসঘরে এসে হাজির। মারমুখো মূর্তি।

আপনি মস্ত অফিসার হয়ে বসেছেন, কেমন ?

আগে হলে ধীরাপদর হাত থেকে কলম খসে যেত। এখন অতটা উতলা হয় না। মানুষটার প্রতি তার আকর্ষণ কমেনি একটুও, কিন্তু মুখোমুখি হলে এক ধরনের প্রতিকূল অনুভূতিও জাগে।

বসুন। কি হয়েছে ?

মামার কাছ থেকে আমার কাগজপত্র নিয়ে আপনি কোন্ সাহসে চেপে বসে আছেন ? এ পর্যন্ত কি অ্যাকশন নিয়েছেন তার ? অমিতাভ বসেনি, সামনের চেয়ারটায় হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল, ক্রুদ্ধ প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটাতেও ঝাঁকুনি পড়ল।

অ্যাকশন নেবার মালিক আমি নই। আপনার কাগজপত্র সব সিতাংশু বাবুর কাছে।

মুহূর্তের জন্য থমকালো অমিতাভ, তার কাছে কে দিতে বলেছে ?

আপনার মামা।

রাগে ক্ষোভে নীরব কয়েক মুহূর্ত। ডাকল, আমার সঙ্গে আসুন একটু।

পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। লাবণ্য আর সিতাংশুর ঘরে। পিছনে ধীরাপদ দুই টেবিল থেকে দুজনে একসঙ্গে মুখ তুলল। অমিতাভ সোজা সিতাংশুর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

ইনি বলছেন আমার কাগজপত্রগুলো সব তোর কাছে ?

কোন্ কাগজপত্র ?

রিসার্চ স্কীমের ?

ও, হ্যাঁ।

সরোষে ধীরাপদর দিকে ফিরল অমিতাভ, কবে দিয়েছেন আপনি ?

দিন পাঁচ-ছয়—

ধীরাপদর জবাব শেষ হবার আগেই সিতাংশুর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।—ওগুলো আমার চাই, এক্ষুনি।

সিতাংশুর ঠাণ্ডা উত্তর, ওগুলো এখন আমার কাছে নেই, ওপিনিয়নের জন্য এ লাইনের দুজন এক্সপার্টকে দেখতে দিয়েছি।

রাগে অপমানে নির্বাক খানিকক্ষণ। চেয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে সেই চোখেই ওধারের টেবিলের সহকর্মিণীটিকেও বিদ্ধ করে নিল একবার। ফেটে পড়ার বদলে প্রথমে ব্যঙ্গ করল একপশলা।—তোর একজন এক্সপার্ট তো সামনেই দেখছি, আর একজন কে ?

না, রমণী-মুখ একটুও আরক্ত হয়ে উঠল না। আরও বেশি স্থির, নির্বিকার মনে হল। সিতাংশু রূঢ় জবাব দিতে যাচ্ছিল কিছু কিন্তু তার তার আগেই অমিতাভ গর্জে উঠল, কেন আমাকে না জানিয়ে সেটা বাইরের লোকের কাছে দেওয়া হয়েছে ? হোয়াই ?

চেঁচিও না। এটা অফিস। তোমার জিনিস বলেই ওপিনিয়ন চেয়ে পাঠানো হয়েছে, অন্যের হলে ছিঁড়ে ফেলা হত। টাকা তোমারও না আমারও না, তুমি চাইলেই লিমিটেড কোম্পানীর টাকায় রাতারাতি রিসার্চ বিলডিং গজাবে না।

প্রতিষ্ঠানের ভাবী প্রধানের মতই কথাগুলো বলল বটে, ধীরাপদ মনে মনে তা স্বীকার না করে পারল না। অমিতাভ ঘোষ আর দাঁড়ায়নি, ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলা কাঁপিয়ে নিচে চলে গেছে।

দিনকয়েকের মধ্যেই বাবার অফিসঘরে সিতাংশু আলোচনার বৈঠক ডেকেছে। কিন্তু অমিতাভ সেটা মিটিং ভাবেনি, তার অপমানের আসর ভেবেছে। তার থমথমে মুখের দিকে চেয়ে ধীরাপদর সেই রকমই মনে হয়েছে। চশমার পুরু কাচের ওধারে দুই চোখ থেকে সাদাটে তাপ ঠিকরে পড়েছে একে একে সকলের মুখের ওপর—বড় সাহেবের, ছোট সাহেবের, লাবণ্যর, সিনিয়র কেমিস্ট জীবন সোমের—ধীরাপদরও।

বৈঠক দশ মিনিটও টেকেনি, তার মধ্যেই ওলট-পালট যেটুকু হবার হয়েছে। আলোচনাটা আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্যে শুরু বা সম্পন্ন করার ইচ্ছা ছিল হয়ত সিতাংশুর। অন্যথায় বাকি কজনকে ডাকার কারণ নেই। কিন্তু হিমাংশুবাবু সে অবকাশ দিলেন না, ভাগ্নের মুখ দেখেই তিনি বিপদ গনেছেন। ঘরোয়া আলাপের সুরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি করতে চাস না চাস এদের বুঝিয়ে বলেছিস?

স্বভাব অনুযায়ী লোকটা ক্ষেপে উঠলেও হয়ত কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত বোধ করত ধীরাপদ। কিন্তু তার বিপরীত দেখছে, চোখের পলক পড়ে না এমনি ধীর, শান্ত।

এঁদের বোঝার দরকার নেই। তুমি কি বুঝেছ?

বড় সাহেবের হাতের পাইপটা অনেক গোলযোগের সহায় বটে। পাইপ পরখ করলেন, একটা কাঠি বার করে খোঁচালেন একটু, তারপর দাঁতে চালান করলেন। এই ফাঁকে হাসছেন অল্প অল্প।—যে তাড়া তোর আমি আর সময় পেলাম কোথায়? আপাতত যাতে হাত দিতে চাস সেটা কতদিনের ব্যাপার?

সেটা তোমার ছ মাসে এক চক্কর য়ুরোপ ঘুরে আসার মত ব্যাপার নয় কিছু, ছ দিনে হতে পারে, ছ মাস লাগতে পারে, ছ বছরেও কিছু না হতে পারে। তোমাকেও পারমানেন্ট রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের কথা বলা হয়েছিল।

তা তো হয়েছিল। পাইপটা এবারে ধরানো দরকার বোধ করলেন তিনি, তারপর বললেন, সেভাবে ফেঁদে বসতে গেলে টাকা তো অনেক লাগে।

যেখানে যাচ্ছ ভাল করে দেখে এলো রিসার্চে তাদের টাকা লাগছে কিনা।

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আঁচে সিতাংশু উক্তিটা সমর্থন করল যেন। বলল, ওদের কোন্ একটা কোম্পানী রিসার্চে চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ করে বছরে শুনেছি।

আশ্চর্য, এবারও অমিতাভ ঘোষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল না। কঠিন সংযমের বাঁধন টুটল না। ফিরে তাকালো শুধু, চশমার কাচ আর একটু বেশি চকচকে দেখল। রসিকতাটা শুধু জীবন সোমই যা একটু উপভোগ করেছেন, তবে স্পষ্ট করে হাসতে সাহস করেননি তিনিও। আড়চোখে ধীরাপদ লাবণ্যর দিকে তাকালো একবার মনে হল সেই মুখেও চাপা অস্বস্তির ছায়া।

বাবার বাক্যালাপের এই আপসের সুরটা আদৌ পছন্দ নয় সিতাংশুর। পাছে তিনি গণ্ডগোল বাধান সেই আশঙ্কায় অপ্রিয়ভাষণের দায়টা সে নিজের কাঁধেই তুলে নিল। বেশ স্পষ্ট করে ঘোষণা করল, রিসার্চে কি সুফল হবে না হবে সেটা পরের কথা, আন্‌প্রোডাকৃটিভ ইন্‌ভেস্টমেন্টে টাকা ঢালার মত অবস্থা নয় কোম্পানীর এখন।

কথাগুলো ঘরের বাতাস শোষণ করতে থাকল খানিকক্ষণ ধরে। বড সাহেব শব্দ না করে ডান হাতের পাইপটা বাঁ হাতের তালুতে ঠুকলেন কয়েকবার। লাবণ্য টেবিলের কাচের ওপর তর্জনীর আঁচড় কাটতে লাগল। জীবন সোম চিবুক বুকে ঠেকিয়ে নিজের পরিচ্ছদ দেখছেন। ধীরাপদর মূক দ্রষ্টার ভূমিকা।/

অমিতাভ চেয়ার ঠেলে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

এর আধ ঘণ্টা বাদে ধীরাপদ নিজের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে বড় সাহেবকে গাড়িতে উঠতে দেখেছে, সঙ্গে ছোট সাহেবকেও। তারও ঘণ্টাখানেক বাদে লাবণ্য এলো তার ঘরে। বর্তমানে তার সঙ্গে বাক্যালাপের ধারাটা নিছক প্রয়োজনের আঁট-সুতোয় বাঁধা। সপ্তাহে ক'টা কথা হয় হাতে গোনা যায়।

লাবণ্য বসল না, ধীরাপদও বলল না বসতে। লাবণ্য বলল, ব্যাপারটা খুব ভালো হল না বোধ হয়···। একেবারে বাতিল না করে ছোট করে আরম্ভ করা যেত।

ধীরাপদ হাসতেই চেষ্টা করল, আপনার মতটা কাউকে জানাতে বলছেন?

মিস্টার মিত্রকে জানাতে পারেন।

তার থেকে আপনি সিতাংশুবাবুকে বললে কাজ হতে পারে মনে হয়।

চোখে চোখ রেখে লাবণ্য সায় দিল, হতে পারে। কিন্তু এরপর এক মিস্টার মিত্র ছাড়া আর কেউ কিছু করলেও কাজ হবে না।

অর্থাৎ অমিতাভ ঘোষের মাথা ঠাণ্ডা হবে না। লাবণ্য আসার আগের মুহূর্তেও ধীরাপদর দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। কিন্তু সেই দুশ্চিন্তার সঙ্গিনী লাভ করে তুষ্ট হওয়া দূরে থাক; উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। একটু থেমে বক্র-গাম্ভীর্যে জিজ্ঞাসা করল, কোম্পানীর ছোটখাটো রিসার্চ ইউনিট একটা দরকার ভাবছেন, না ব্যক্তিগতভাবে অমিতবাবুর দিকটা চিন্তা করে বলছেন ?

ডাক্তার হিসেবে তাঁর কথা চিন্তা করেই বলছি।

আবির্ভাবের থেকেও প্রস্থানের গতি আরো মন্থর। ধীরাপদ ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। কার্জন পার্কের লোহার বেঞ্চির ধীরাপদ চক্রবর্তী এতখানি ভাগ্যের প্রসন্নতা সত্ত্বেও আজ নিজের নিভৃতে যতখানি দেউলে, তার সবটার মূলে এই একজন। তাই তার এ দেখাটা সহজ নয়, সুস্থও নয়।

তবু সুযোগমত বড় সাহেবের কাছে প্রস্তাবটা উত্থাপন করবে ভেবেছিল। কিন্তু যাবার আগে হিমাংশুবাবু ভাগ্নের মাথা ঠাণ্ডা রাখার যে নিশ্চিন্ত হদিস দিয়ে গেলেন, শুনে ধীরাপদর মুখে কথা সরেনি। হদিস দেওয়া নয়, পরোক্ষে তিনি তাকে নিগূঢ় দায়িত্ব দিয়ে গেলেন একটা।

—তোমার দিদিকে বুঝিয়ে বলো। সবদিক ভেবেচিন্তে দেখতে বলে তাঁর মত করাও। এই কাজটা করো দেখি—ডু ইট্‌। তা বলে তাড়াহুড়ো করে গোল বাধিয়ে বসো না। রাদার টেক্‌ ইউওর টাইম অ্যাণ্ড গো স্লো। তিনি রাজি হলে আমাকে জানিও, একটা টেলিগ্রাম করে দিও না হয়, সম্ভব হলে কিছু আগেই চলে আসতে চেষ্টা করব।

ভাগ্নের জন্যে আর একটুও উতলা নন তিনি। ছেলের বিয়েটা দিয়ে ফেলতে পেরেই তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত। দু দিন আগে হোক দু দিন পরে হোক, ভাগ্নে শেকল পরবে। লাবণ্য সেই শেকল, তাঁর মনের মত জোরালো শেকল। বাধা এখন চারুদি। বাধাটা হিমাংশুবাবুর কাছে অন্তত উপেক্ষা করার মত তুচ্ছ নয়।

তুচ্ছ না হলেও দুরতিক্রমণীয় ভাবছেন না। তার ওপর ধীরাপদ আছে যোগ্য চক্রী।

॥ তেইশ ॥

বড়র জায়গায় বড় কেউ না বসলে একটা ফাঁক চোখে পড়েই। বড় সাহেব রওনা হয়ে যাবার দিনকতকের মধ্যে ধীরাপদর কাছে অন্তত তেমনি একটা ফাঁক

স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সিতাংশুর প্রথর তত্ত্ব এখানে কর্মস্থলের হাওয়া পালটেছে বটে, ফাঁকটা ভরাট হয়নি।

আগে দিনের অর্ধেক প্রসাধন শাখায় কাটিয়ে তারপর এখানে আসত সিতাংশু। এখন সেই রীতি বদলেছে। সকালে সোজা এই অফিসে আসে, লাঞ্চের পর ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা দেড়েকের জন্য প্রসাধন শাখা দেখতে বেরোয়। এই শাখাটির সঙ্গেও লাবণ্য সরকারের কোনরকম স্বার্থের যোগ দেখা দিয়েছে কিনা কেউ জানে না। কিন্তু তাকেও প্রায়ই সঙ্গে দেখা যায়।

বড় বড় পার্টিগুলোর সঙ্গে সংযোগ রক্ষার দায়িত্বও তারা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। একসঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে বেরোয়। কাগজে কলমে তার রিপোর্ট শুধু ধীরাপদ পায়। বড় কোনো স্যাংশনের ব্যাপারেও তাই। স্থির যা করার তারাই করে, প্রয়োজন হলে সিনিয়র কেমিস্ট জীবন সোমের পরামর্শ নেওয়া হয়। পরামর্শের জন্য আজকাল প্রায়ই তাঁকে এ দালানে আসতে দেখা যায়। লাবণ্য সরকারের পরে তিনিই সব থেকে বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছোট সাহেবের। ধীরাপদর শুধু নির্দেশ অনুযায়ী কাজ চালানোর দায়িত্ব।

আপত্তি নেই। ঝামেলা কম, ভাবনা-চিন্তা কম। কাজে এসেও অবকাশ মিলছে খানিকটা। ধীরাপদ যেন মজাই দেখে যাচ্ছে বসে বসে। মজা দেখতে গিয়ে সেই একটা দিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন বড় সাহেবের মন বুঝে কর্তব্য ঠিক করার জন্য লাবণ্য তাকে নার্সিং হোমে ডেকেছিল। বড় সাহেবের মনোভাবটা সেদিন তাকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিল ধীরাপদ। পারিবারিক প্ল্যানে অনভিপ্রেত কিছু ঘটে সেটা বড় সাহেব চান না জানিয়ে সিতাংশুর সঙ্গে অমিতাভকেও জুড়েছিল। কিন্তু সেই রাগে লাবণ্য এই কর্তব্য বেছে নিল? সেদিনও সে ঝলসে উঠেছিল মনে আছে, বলেছিল, ঘটে যদি তিনি আটকাবেন কি করে?

ছেলের বিয়ে দিয়েও আটকাতে পারেন কিনা সেই চ্যালেঞ্জ এটা? সিতাংশুর সঙ্গে কোন্ ধরনের প্যাক্ট হয়েছে লাবণ্যর?

হাসতে গিয়েও হাসা হল না। চ্যালেঞ্জ হোক আর যাই হোক সিতাংশু উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য যে, তার রিসার্চের স্কীম বাতিলের ফলাফল ভেবে এখনো লাবণ্য সরকার বিচলিত হয়, অস্বস্তির তাড়নায় ধীরাপদর ঘরে না এসে পারে না। পারেনি।

বিয়ের পরেও ছোট সাহেবের ঠিক এইরকম হালচাল দেখবে কেউ ভাবেনি। অনেকদিন আগের মতই সসঙ্গিনী তার ছোট সাদা গাড়িটা চোখের আড়াল হতে

না হতে অনেককে মুখ টিপে হাসতে দেখা গেছে, অনেককে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে দেখা গেছে। ধীরাপদ আর মেম-ডাক্তারের প্রসঙ্গে বউয়ের আবিষ্কারটা নিজেদের মধ্যে কতটা ফলাও করে প্রচার করেছে তাল্লিস সর্দার, ধীরাপদ জানে না। কিন্তু তার চোখেও বিভ্রান্ত কৌতূহল লক্ষ্য করেছে। সম্ভব হলে জিজ্ঞাসাই করে বসত, এ আবার কি রকম-সকম দেখি বাবু? ভদ্রজনদের এই রীতি নিয়ে সে বউয়ের সঙ্গেই জটলা করে হয়ত।

নতুন বউ আরতির সঙ্গে লাবণ্যর প্রাথমিক আলাপটা বড় সাহেবের মারফৎই হয়েছে মনে হয়। সিতাংশুর বিয়ের পর দু মাসের মধ্যে বারতিনেক সে প্রেসার চেক করতে এসেছিল। আর শেষ এসেছে বড় সাহেবের যাত্রার আগের সন্ধ্যায়। সেটা প্রেসার দেখতে নয়, এমনি দেখা করতে। ধীরাপদ উপস্থিত ছিল সেখানে, সিতাংশু ছিল, আরতি ছিল। শুধু অমিতাভ ছিল না। বড় সাহেব খোশমেজাজে ছিলেন সন্ধ্যাটা। ঠাট্টা করেছেন, লাবণ্যকে প্রায়ই আজকাল নাকি গম্ভীর দেখছেন তিনি। বলেছেন, তোমার নিজের ব্লাডপ্রেসার চেক-টেক করেছ শিগ্‌গীর? আবার বউয়ের কাছে লাবণ্যর কড়া ডাক্তারীর প্রশংসা করেছেন, বলেছেন, লাবণ্যর রোগীরা ওষুধ খেয়ে যত সুস্থ বোধ করে, ধমক খেয়ে তার থেকে কম সুস্থ বোধ করে না। হাসছিল কম বেশি সকলেই। আরতি হাসছিল আর সকৌতুকে লাবণ্যকে দেখছিল। বড় সাহেব আরতিকে বলেছেন, দরকার বুঝলেই এঁকে টেলিফোনে খবর দেবে, তোমার তো আবার ঘন ঘন মাথাধরার রোগ আছে। লাবণ্যকে বলেছেন, তুমিও একটু খেয়াল রেখো—

কড়া ডাক্তারটির প্রসঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে আর কোনো শুভ সম্ভাবনার ইঙ্গিত ইতিমধ্যে বউয়ের কাছে তিনি ব্যক্ত করেছেন কিনা ধীরাপদ জানে না। যে রকম নিশ্চিন্ত আনন্দে আছেন, একেবারে অসম্ভব মনে হয় না। তিনি রওনা হয়ে যাবার এই তিন সপ্তাহের মধ্যে অন্তত লাবণ্য বউয়ের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখার কোনো তাগিদ অনুভব করেনি। সে এলে এমন কি বউকে টেলিফোন করলেও খবরটা ঘুরে ফিরে মানুকের মারফৎ কানে আসত। খবর থাকলেই মানুকে খবর দেয়, তার কাছে দরকারী বা অদরকারী বলে কিছু নেই।

কিন্তু ধীরাপদ সেদিন এই বউটির মধ্যেই একটুখানি বৈচিত্র্যের সন্ধান পেল।

গোডাউনের স্টক দেখে দালানের দিকে ফিরছিল। বড় সাহেবের লাল গাড়িটা গাড়িবারান্দার নিচে এসে থামতে দেখে অবাক। শুধু সে নয়, এদিক-ওদিক থেকে আরো অনেকের উৎসুক দৃষ্টি এদিকে আটকেছে। ছোট সাহেবের

সাদা গাড়ি সামনেই দাঁড়িয়ে, এ গাড়িতে কে এলো ?

ড্রাইভারের পাশ থেকে ব্যস্তসমস্ত মানকে নামল। পিছনের দরজা খুলে আরতি। বেশবাস আর প্রসাধন-শ্রীর সঙ্গে মানকের সেই পুরনো বর্ণনা মিলছে। জমজমে সাজ-পোশাক আর কপোলে অধরে লালের বিন্যাস। কিন্তু মানকের পটে-আঁকা মূর্তি নয় আদৌ, উল্টে উজ্জ্বল শিখার মত বলা যেতে পারে।

এই মেয়েই ঘরের বধূবেশে এত অন্যরকম যে হঠাৎ ধোঁকা খেতে হয়। ধীরাপদ আরো হতভম্ব তাকে এইখানে দেখে। অদূরে দাঁড়িয়ে গেছে সে। ড্রাইভার আর দারোয়ান শশব্যস্তে বউরাণীকে ভিতরে নিয়ে চলল। পিছনে মানকে।

দোতলার বারান্দায় শুধু মানকের সঙ্গেই দেখা হল ধীরাপদর। বোকার মত এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। অকূল-পাথারে আপনজনের সাক্ষাৎ মিলল যেন, মানকে আনন্দে উদ্ভাসিত।—বউরাণীকে ব্যবসা দেখাতে নিয়ে এলাম বাবু! বাবুর মুখে তবু সপ্রশ্ন বিস্ময় লক্ষ্য করেই হয়ত বাহাদুরির সবটা নিজের কাঁধে নেওয়া সঙ্গত বোধ করল না সে। উৎফুল্ল মুখেই কার্য-কারণ বিস্তার করল। খাওয়া-দাওয়ার পর বউরাণী ওকে ডেকে বলল, মানিক চলো বাবুদের কারবার দেখে আসি, মস্ত ব্যাপার শুনেছি, ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলো—

বউরাণীর হুকুম, মানকে না নিয়ে এসে করে কি! তবু ছোট সাহেবকে সে একটা টেলিফোন করতে পরামর্শ দিয়েছিল। বউরাণী বলেছেন, টেলিফোন করতে হবে না, টেলিফোন করার কি আছে! আর কেউ না থাকলে ধীরুবাবুই সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবেন আমাদের।

তার দরকার হয়নি, ছোট সাহেব আর লাবণ্য দুজনেই আছে। বউরাণী তাদের ঘরেই গেছে।

কারখানা ভালো করে দেখতে হলে ঘণ্টা দুই লাগে। কিন্তু বউরাণীর কারখানা দেখা আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে গেল। নিচে থেকে পরিচিত হর্ন কানে আসতে উঠে ধীরাপদ জানালার কাছে এসে দেখল, সামনে হাস্যবদন মানকে আর পিছনে তার বউরাণীকে নিয়ে লাল গাড়ি ফিরে চলল।

ভাবতে গেলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু না। অস্বাভাবিক ভাবছেও না ধীরাপদ। তবু সেদিনটা তলায় তলায় বিস্ময়ের ছোঁয়া একটু লেগেই থাকল। অবশ্য পরদিনই ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক এক সপ্তাহের মুখে মানকের দ্বিতীয় দফা আনন্দের ঝাপটা লাগতে ভিতরটা সজাগ হয়ে উঠল। রাত বেশি নয়

তখন ; এ সময়টা ধীরাপদ ঘরে থাকলে আর মান্‌কের হাতে কাজ না থাকলে ঘুরে-ফিরে সে বার বার এসে দর্শন দিয়ে যায়। তাকে এড়ানোর জন্য ধীরাপদ অনেক সময় ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকে, নয়তো নাকের ডগায় একটা বই ধরে থাকে।

মান্‌কে হাঁটু মুড়ে শয্যার পাশে মেঝেতে বসে পড়ল। বলার মত সংবাদ কিছু আছে এটা সেই লক্ষণ, ফলে ধীরাপদর মুখের কাছ থেকে বই সরল।

আজ আবার বউরাণীকে নিয়ে নয়া কারখানা দেখে এলাম বাবু—সেই সাজের কারখানা।

নয়া কারখানা বলতে প্রসাধন-শাখা। মান্‌কে জানালো, বউরাণীর দেখা-শোনার শখ খুব, সবেতে আগ্রহ। তার ধারণা, ভার দিলে বউরাণীও মেম-ডাক্তারের মত বড় বড একটা 'ডিপাটমেণ্টো' চালাতে পারেন।

এটুকুই বক্তব্য হলে মান্‌কের বসার কথা নয়। শ্রোতার মুখের দিকে চেয়ে কৌতূহলের পরিমাণ আঁচ করতে চেষ্টা করল সে, তারপর গলা নামিয়ে একটা সংশয় ব্যক্ত করল।—বউরাণী আগে থাকতে না বলে না কয়ে এভাবে হুট করে বেরিয়ে পড়েন তা বোধ হয় ছোট সাহেবের খুব পছন্দ নয় বাবু। আজ গম্ভীর গম্ভীর দেখলাম তেনাকে। মেম-ডাক্তার অবশ্য খুব খুশি হয়েছেন, নিজেই ঘুরে দেখালেন শোনালেন, তারপর একগাদা সাজের 'দব্য' দিয়ে দিলেন সঙ্গে।

মান্‌কের ওঠার লক্ষণ নেই, আর কিছু বলারও না। বইটা আবার মুখের সামনে ধরবে কি না ভাবছিল ধীরাপদ।

বাবু—

দৃষ্টিটা তার মুখের ওপরে ফেলল আবার।

ভাগ্নেবাবুর কি হয়েছে বাবু ?

কেন ?

মান্‌কের মুখে অস্বস্তির ছায়া, ইয়ে—বউরাণী আজ সকালেয় শুধোচ্ছিলেন। ভাগ্নেবাবু এদানীং দু বেলার এক বেলাও বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করেন না, বাড়িতে থাকেও না বড়—

বলতে বলতে মান্‌কে হঠাৎ আর একটু সামনে ঝুঁকে ফারাক কমালো। চাপা উত্তেজনায় ফিস ফিস করে বলল, বউরাণী বাড়িতে অমনি সাদাসিধে ভাবে থাকেন আর মিষ্টি মিষ্টি হাসেন—কিন্তু ভেতরে ভেতরে তেজ খুব বাবু, কাল রেতে স্ব-কণে শুনেছিলাম ছোট সাহেবকে করকরিয়ে কি সব বলছিলেন। ছোট

সাহেব মুখ ভার করে বলেছিলেন···কেয়ার-টেক্ বাবুও বউরাণীকে একদিন অমনি কড়া কথা বলতে শুনেছিলেন—ছোট সাহেব বউরাণীকে খুব ভয় করেন বলেন উনি!

মান্কের ধারণা বউরাণীর এই মেজাজের সঙ্গে ভাগ্নেবাবুর অস্থির মতির কিছু যোগ আছে। নইলে আজই সকালে বউরাণী হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন, আচ্ছা মানিক, দাদার কি হয়েছে জানো? মান্কে মাথা নেড়েছে, ভাগ্নে-বাবুর কিছু হয়েছে সেটা সে দেখছে, কিন্তু কেন কি হয়েছে তা জানবে কি করে? তাই মাথা খাটিয়ে বউরাণীকে সে বলেছে, ধীরুবাবু জানতে পারেন। শুনে বউরাণী তক্ষুনি আদেশ করলেন, ধীরুবাবুকে একবার ওপরে ডেকে নিয়ে এসো। কিন্তু মান্কে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে না নামতে ফিরে ডাকলেন আবার, বললেন, এখন ডাকতে হবে না, থাক—

মান্কে উঠে যাবার পরেও তার সমস্ত কথাগুলো বহুবার ধীরাপদর মগজের মধ্যে ওঠা-নামা করেছে। আরতির এই তীক্ষ্ণ দিকটা সেইদিনই ধীরাপদর চোখে পড়েছিল, সেজেগুজে যেদিন ফ্যাক্টরীতে এসেছিল। কিন্তু সিতাংশুকে কড়া কথা বলার সঙ্গে অমিতাভ ঘোষের কিছু হওয়া না হওয়ার কি যোগ বোঝা গেল না। মান্কের ওপরেই মনটা বিরূপ হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে এই একটি মেয়ের মধ্যেও অশান্তির বীজ ছড়ানো হয়ে গেছে তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মান্কেকে একটু কড়া করে শাসন করা দরকার। আগেই করা উচিত ছিল।

ধীরাপদ উঠে সিঁড়ির ওপাশের ঘরে উঁকি দিল। ঘর অন্ধকার। গত এক মাসের মধ্যে তিন-চার দিনের বেশি অমিতাভর সঙ্গে দেখা হয়নি। আর কথা একটাও হয়নি। অমিতাভ মুখ ঘুরিয়ে চলে গেছে, সেই যাওয়াটা দুনিয়ার সব কিছুর ওপর পদাঘাত করে যাওয়ার মত। বাড়িতে থাকেই না বড়, থাকলেও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কারখানায় আসা বন্ধ একরকম, খরগোশ নিয়ে এক্সপেরিমেন্টও বন্ধ। ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে হঠাৎ এক-একদিন এসে হাজির হওয়ার খবর পায়। ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টে ঘোরে, আর যখন খুশি যা খুশি ছবি তোলে। তার গুণমুগ্ধ অনুগতদের মুখের খবর, সে এলে সিনিয়র কেমিস্ট জীবন সোম ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করেন। কারণ চীফ কেমিস্ট এক-একদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওয়ার্কশপে বসে থাকে, এমন কি সকলের ছুটি হয়ে গেলে একাই বসে থাকে। কাগজে-কলমে তো এখনো সিনিয়র কেমিস্টের মুরুব্বী তিনি, ভদ্রলোক বলেনই বা কি?

সকলের বিশ্বাস যে কারণেই হোক, চীফ কেমিস্টের মাথাটা এবারে ভালমতই বিগড়েছে। ধীরাপদর আশঙ্কাও অন্যরকম নয়। ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে লোকটা কোথায় কোথায় ঘোরে, সমস্ত দিন করে কি, কি ছবি তোলে, কার ছবি? ছবির কথা মনে হলেই তার ঘরের অ্যালবাম দুটোর কথা মনে পড়ে। ওর একটা খুলেই ধীরাপদকে পালাতে হয়েছিল। কিন্তু সেই উদ্ধত অসংবৃত বিস্মৃতির খোরাক লোকটা আর কোথায় পাবে? কার ছবি তুলছে?

পরদিন। ধীরাপদ অফিসে যাবার জন্য সবে তৈরী হয়েছে। খানিক আগে ছোট সাহেবের সাদা গাড়ি বেরিয়ে গেছে। ক্ষুব্ধ মুখে সামনে এসে দাঁড়াল কেয়ার-টেক্ বাবু। তার দিকে চেয়ে ধীরাপদ অবাক।

বাবু! আমরা চাকরি করি বলে কি মানুষ নই? বিচার নেই বিবেচনা নেই হুট্ করে এতকালের চাকরিটা খেলেই হল?

চাপা উত্তেজনায় লিকলিকে শরীরটা কাঁপছে তার, টাকে ঘাম দেখা দিয়েছে। ধীরাপদর মুখে কথা সরে না খানিকক্ষণ—কি হয়েছে?

মানকের জবাব হয়ে গেল। অফিস যাওয়ার মুখে ছোট সাহেব তার পাওনা-গণ্ডা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলেন।

কেন? না জিজ্ঞাসা করলেও হত, আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মর্জি। বলব না তো আর কি বলব? উত্তেজনা বাড়ছে কেয়ার-টেক্ বাবুর, রাগের মাথায় মানকেকেই গালাগাল করে নিল একপ্রস্থ।—ওটা এক নম্বরের গাধা বলেই তো, মাথায় একরত্তি ঘিলু নেই বলেই তো—কতদিন সমঝে দিয়েছি, ছোট সাহেবের চোখের ওপরে দিনরাত অমন বউরাণীর পায়ের কাছে ঘুরঘুর করিস না, অত ভালমানুষি দেখাস না—এখন টের পেলি তো মজাটা!—উল্টো সওয়াল হয়ে যাচ্ছে খেয়াল হতে একমুখেই মানকের পক্ষ সমর্থন করল আবার।—তা ওরই বা দোষটা কি বাবু, মনিব ইনিও উনিও। বউরাণী কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবে না? কোথাও নিয়ে যেতে বললে নিয়ে যাবে না? তা হলে তো আবার ও-তরপ থেকে জবাব হয়ে যাবে! পরিবারের মন যুগিয়ে চললে চাকরি যায় এমন তাজ্জব কথা কখনো শুনেছেন? ছোট সাহেবের রাগ পড়লে আপনি একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলুন বাবু, এ দুর্দিনে চাকরি গেলে চলবে কেন!

অফিসে যেতে যেতে ধীরাপদ আর কিছু ভাবছিল না, ভাবছিল শুধু কেয়ার-টেক্ বাবুর কথা। মানকের চাকরি গেছে শুনলে দু হাত তুলে নাচলেও যেখানে অস্বাভাবিক লাগত না—তার এই মূর্তি আর এই বচন! হঠাৎ চোরের মার দেখে একাদশী শিকদারের আর্ত উত্তেজনার দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। বুকের

তলায় কি যে ব্যাপার কার, হদিস মেলা ভার।

কিন্তু একাদশী শিকদারের না হোক, কেয়ার-টেক্ বাবুর চিত্ত-বিক্ষোভের হদিস সেই রাতেই মিলল। মিলল চারুদির বাড়িতে।

অফিসে বসে চারুদির টেলিফোন পেয়েছে, অফিসের পর একবার যেতে হবে, কথা আছে। টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে ধীরাপদ ঠিক করেছিল যাবে না। চারুদির এই ডাকটা অনুরোধ নয়, অনেকটা আদেশের মত। সেদিন বলতে গেলে ধীরাপদকে তাড়িয়েই দিয়েছিলেন। চারুদি ব্যবসায়ের মনিবদেরই একজন বটে, কিন্তু এই মনিবের মন যুগিয়ে না চললে মান্কের মত তার চাকরি যাবে না।

বিকেলে বাড়ি এসে দেখে মান্কেরও চাকরি যায়নি। বরং মুখখানা ঠুনকো গাম্ভীর্যের আড়ালে হাসি হাসি লাগছে। চা-জলখাবার দিতে এলে ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, তোমার জবাব হয়ে গিয়েছিল শুনলাম ?

গেছ্‌ল। আবার বহাল হয়েছি।

গাম্ভীর্য টিকল না, চেষ্টা সত্ত্বেও মুখের খাঁজে খাঁজে হাসির জেল্লা ফুটে উঠতে লাগল। তারপর মজার ব্যাপারটা ফাঁস করল। বিকেলে ছোট সাহেব ফিরতে বউরাণীর ঘরে মান্কের ডাক পড়েছিল। বউরাণী ওকে বললেন, এখানে তোমার জবাব হয়ে গিয়ে থাকে তো আমার বাপের বাড়ি গিয়ে কাজে লাগো—মাইনে যাতে এখানের থেকে বেশি হয় আমি বলে দেব। মান্কে পালিয়ে এসেছিল, ছোট সাহেব বেরিয়ে যেতে আবার ডেকে বললেন, কোথাও যেতে হবে না, কাজ করোগে যাও।

ওনাদের মধ্যে আরো কথা হয়েছে বাবু, বড় সাহেবের ঘরে দাঁড়িয়ে কেয়ার-টেক্ বাবু স্ব-কর্ণে শুনেছে! বিস্ময়ে আনন্দে মান্কের ভ্রু চোখ কপালের দিকে ঠেলে উঠছে, আমি ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসতে ছোট সাহেব বউরাণীকে বলেছেন, তুমি চাকরবাকরের সামনে আমাকে অপমান করলে কেন ? বউরাণীও তক্ষুনি বেশ মিষ্টি করে পাল্টা শুধিয়েছেন, তুমি ওকে যেতে বলে আমাকে অপমান করোনি ?

ব্যস্, ছোট সাহেবের ঠোঁট সেলাই একেবারে! মান্কে হি-হি করে হেসে উঠল।

মান্কের সত্যিই চাকরি যাক ধীরাপদ একবারও চায়নি। বরং চিন্তিত হয়েছিল। চিন্তা গেল বটে, কিন্তু একটুও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না। বসে থাকতে ভালো লাগল না। চারুদির বাড়ি যাবে না ভেবেছিল তবু সেখানে যাবার জন্যই ঘর ছেড়ে বেরুল। সিঁড়ির ওপাশের সরু কালি বারান্দায় মুখোমুখি

বসে কাচের গ্লাসে চা খাচ্ছে মানুকে আর কেয়ার-টেক্ বাবু। ফিস ফিস করে কথা বলছে আর হাসছে। অন্তরঙ্গতার দৃশ্যটা আর কোনো সময়ে চোখে পড়লে অভিনব লাগত। আজ লাগল না। ধীরাপদ ওদের অগোচরে বেরিয়ে এলো।… স্বার্থের বাঁধন পলকা হলেও বড় সহজে টোটে না।

চারুদির বাড়ির ফটকের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল ধীরাপদ। ইচ্ছে করেই গাড়িটা ভিতরে ঢোকালো না। বাড়ির দিকে চোখ পড়তে হঠাৎ ট্যাক্সিটা থামিয়েছে, তারপর লালমাটির পথ ভেঙে হেঁটে আসছে। বারান্দার একটা থামে ঠেস দিয়ে সিঁড়িতে বসে আছে পার্বতী। সামনের দিকে মুখ, মনে হবে বাগান দেখছে। বসার শিথিল ভঙ্গি এমনি স্থিরনিশ্চল যে জানা না থাকলে মাটির মূর্তি বলেও ভ্রম হতে পারে। ধীরাপদ একেবারে সিঁড়ির গোড়ায় দু হাতের ব্যবধানের মধ্যে এসে দাঁড়ানো সত্ত্বেও টের পেল না।

ভালো আছ ?

পার্বতী চমকালো একটু। ফিরে তাকালো, শাড়ির আঁচলটা বুক-পিঠ ঢেকে গলায় জড়িয়ে দিল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল। ভালো আছে।

বিকেলের আলোয় আসন্ন সন্ধ্যার কালচে ছোপ ধরেছে বলেই হয়ত মুখখানা অন্তরকম লাগছে একটু। কিন্তু ধীরাপদর চোখে সুন্দর লাগছে। পার্বতী এখনো যেন খুব কাছে উপস্থিত নয়, তার শান্ত মুখ থেকে এখনো দূরের তন্ময়তার ছায়া সরেনি।

কেন বলা দরকার বোধ করল ধীরাপদ জানে না, বলল, আসার জন্যে টেলিফোনে জোর তাগিদ দিয়েছেন চারুদি—

মা ভেতরে আছেন।

পার্বতী না চাইলে কথা বাড়ানো যায় না। ধীরাপদ ভিতরের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু হঠাৎ হাল্কা লাগছে তার, ভালো লাগছে। পার্বতীর চোখে কোনো অনুযোগ দেখেনি, ভর্ৎসনা দেখেনি, ঘৃণা দেখেনি, বিদ্বেষ দেখেনি। এই মেয়ে এক মুহূর্তের জন্যেও নিজের কোনো দায় অন্যের ঘাড়ে ফেলেছে বলে মনে হয় না।

তাকে দেখা মাত্র চারুদির ঈষদুষ্ণ অভিযোগ, অফিস তো সেই কখন ছুটি হয়েছে, এতক্ষণ লাগল আসতে ?

মুখের দিকে এক নজর তাকিয়েই বোঝা গেল, চারুদির স্নায়ুর ধকল কাটা দূরে থাক, বেড়েছে আরো। মুখ ছেড়ে কানের ওপরের দু ধারের লালচে চুলও

ভেজা। অনেকবার জল দেওয়া হয়ে গেছে বোধ হয়। ধীরাপদ ইজিচেয়ারে বসে হাল্‌কা জবাব দিল, তোমার কথাটা বেশ জরুরী মনে হচ্ছে।

যথারীতি শয্যায় বসলেন চারুদি।—অফিস থেকেই আসছ তো, খাবে কিছু?

না। আজকাল যে রকম অভ্যর্থনা জুটছে—ও পাট সেরেই আসি।

হাসার কথা, কিন্তু চারুদি ভুরু কোঁচকালেন।—ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বরণ-কুলো সাজিয়ে অভ্যর্থনা করতে হবে? পর না ভেবে যখন যা দরকার নিজে চাইতে পার না?

পারি। এখন সমস্যাটা কি বলো শুনি।

কিন্তু চারুদি চট্‌ করেই বললেন না কিছু। খাটে পা তুলে ঠেস দিয়ে বসলেন। তারপর চুপচাপ বসেই রইলেন খানিক। সে দেরিতে এলো বলেই রাগ, নইলে প্রয়োজনটা খুব জরুরী কিছু নয় যেন।

এর মধ্যে অমিতের সঙ্গে তোমার কিছু কথা হয়েছে?

না।

দেখা হয়েছে?

এবারেও একই জবাব দিলে ক্ষোভের কারণ হতে পারে। বলল, যেটুকু হয়েছে একতরফা, তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকছেন।

এরকম পাগলের মত করে বেড়াচ্ছে তার রিসার্চের প্ল্যান বাতিল হয়েছে বলে, না আর কোনো কারণ আছে?

আর কি কারণ?

চারুদি এরপর বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসলেন একটা, অভয় বলছিল, বউয়ের কানভাঙানি দিচ্ছে সন্দেহ করে সিতাংশু পুরনো চাকরটাকে আজ জবাব দিয়েছে?

অভয় কে?

তোমাদের কেয়ার-টেক্‌ বাবু। শুনলাম, লাবণ্যর সঙ্গে আজকাল আবার সিতাংশুর খুব ভাব-সাব হয়েছে, অমিতেরও সেই জন্যেই অত গাত্রদাহ নয় তো?

ধীরাপদর চোখের সামনে থেকে একটা পরদা সরে গেল। না, কোনো কিছুর মূলে মান্‌কে নয় তাহলে—মূলে ওই কেয়ার-টেক্‌ বাবু। ও বাড়ির সব খবর এ বাড়িতে পৌঁছয় তারই মুখে, আর বউরাণীর কানভাঙানি যদি কেউ দিয়ে থাকে—দিয়েছে সে-ই, মান্‌কে নয়। এ কাজ করার পক্ষে মান্‌কে নির্বোধই বটে, আর ধীরাপদও নির্বোধের মতই সর্ব ব্যাপারে তাকে দায়ী করে আসছে।

ওই জন্যেই সকালে ওই মূর্তিতে তার শরণাপন্ন হয়েছিল কেয়ার-টেক্ বাবু, মানুকের জবাব হয়ে যাবার মধ্যে নিজের বিপদের বিভীষিকা দেখেছিল সে।

একটু ভেবে বলল, না তা নয়, রিসার্চ প্ল্যান নাকচ হতে নিজে যেভাবে জলছেন তিনি, তাতে আর কারো ভাব-সাব তাঁর চোখে পড়ছে না।

একেবারে নাকচ হল কেন তাহলে? আর তোমরাই বা চুপচাপ বসে আছ কেন? যে রকম ক্ষেপে উঠেছে, একটা কিছু বিপদ হতে কতক্ষণ! আমাকে হুকুম করে গেছে, আমার চার আনা অংশ কড়ায়-গণ্ডায় তুলে নিতে হবে, নিজের ছ আনা অংশও ছাড়িয়ে নেবে, ভিন্ন কোম্পানী করবে তারপর—তুমি এলে তোমাকেও নেবে। এই সব পাগলামি করছে আর উকীল ব্যারিস্টারের কাছে ছোটাছুটি করছে। আমি সায় দিইনি বলে পারে তো আমাকে খুন করে, ঘন ঘন নানা রকমের পরামর্শদাতা এনে হাজির করছে বাড়িতে। এর কি হবে? নাকি কোর্ট-কাছারি হয়ে একটা কেলেঙ্কারি হোক তাই চায় সকলে? তোমাদের বড় সাহেবকে কালই একটা জরুরী খবর পাঠাও, সব খুলে লেখো তাঁকে—

ব্যাপারটা এদিকে গড়াচ্ছে ধীরাপদ ভাবেনি। একটা ভাঙনের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ। কিন্তু এ যেন কিছু একটা বলার মত প্রশস্ত মুহূর্তও বটে। বলল, বড় সাহেব এজন্যে একটুও চিন্তিত নন, আমাকে ওষুধ বাতলে দিয়ে গেছেন তিনি, এখন তুমি রাজী হলেই হয়।

চারুদি সোজা হয়ে বসলেন, চিন্তাক্লিষ্ট মুখে কঠিন রেখা পড়তে লাগল, তপ্ত চোখে শঙ্কার ছায়াও একটু। চাপা ঝাঁজে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে রাজী হলে কি হয়?

বিয়েতে। অমিতবাবু আর লাবণ্য সরকারের বিয়েটা দিয়ে ফেললেই সব দিকের গোলযোগ মেটে, আর কোনো দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না। তোমাকে বুঝিয়ে বলে মত করানোর জন্যে আমাকে বিশেষ করে বলে গেছেন তিনি।

আমার মতামতে কি যায় আসে, বিয়ে দিক! চারুদির লালচে মুখে আগুনের আভা, কণ্ঠস্বরেও আগুনের হল্‌কা। তীক্ষ্ণ কটু কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন তিনি, কিন্তু এদিকের কি হবে?

কোন্ দিকের?

আমাকে আক্কেল দেবার জন্যে ওই যে হতভাগী পোড়ারমুখী পেটে ধরেছে একটাকে, তার কি হবে? সে কি করবে? দুনিয়ায় উনি আর ওর ভাগ্নেই শুধু মানুষ, তারা নিশ্চিন্ত হলেই সব হয়ে গেল—আর কেউ মানুষ নয়, আর কেউ

কিছু নয়, কেমন ?

ধীরাপদ যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেলো একটা, নিস্পৃহতার আবরণটা অকস্মাৎ ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে চারুদিকেই দেখছে সে। এইজন্যই গেল দিনে চারুদির অমন ক্ষিপ্ত মূর্তি দেখেছিল, পার্বতীর ওপর অমন ক্ষিপ্ত আক্রোশ দেখেছিল !

চারুদি দম নিলেন একটু, একটু সংযতও করলেন নিজেকে। গলার স্বর অত চড়ল না কিন্তু তেমনি কঠিন। বললেন, বড় সাহেবের হয়ে পরামর্শ করতে আসার আগে অমিতকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, কি হবে—তারপর যেন অন্য ভাবনা ভাবে, নইলে আমিই তাকে ভালো করে শিক্ষা দেব। সবই খেলা পেয়েছে—

এই আগুনে-খেলার গোড়ার প্রশ্রয়টা কে দিয়েছে সে কথা মনে হলেও বলা গেল না। খানিক নীরব থেকে ধীরাপদ শুধু জিজ্ঞাসা করল, তিনি জানেন…?

তার জানার দায়টা কী ? চারুদি আবারও ফুঁসে উঠলেন, সে দিনরাত রিসার্চের ভাবনা ভাবছে না ? মস্ত মানুষ না সে ? আর বলবেই বা কে, মুখে কালি লেপেও দেমাকে মাটিতে পা পড়ে হতভাগীর ? বললে মাথা নিতে আসবে না ?

হঠাৎ দরজার ওধারে চোখ যেতে সেই উগ্র মূর্তিতেই চারুদি থমকালেন, তারপর নিরুপায় হয়েই আবারো জ্বলে উঠলেন যেন, শুনছিস কি পাথরের মত দাঁড়িয়ে ? এই তো বললাম ওকে—কি করবি তুই আমার ?

ধীরাপদও ঘাড় ফিরিয়েছে, তার পরেই আড়ষ্ট। দরজার ওধারে পাথরের মতই পার্বতী দাঁড়িয়ে—কিন্তু পাথরের মত কঠিন নয় একটুও। কমনীয়। শাড়ির আঁচলটা বুক-পিঠ ঘিরে গলায় তেমনি করে জড়ানো। চারুদির দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইল খানিক, ধীরাপদকেও দেখল একবার। তারপর নিঃশব্দে চলে গেল।

একটা বিভ্রান্তির মধ্যে কেটেছে ধীরাপদর সেই রাতটা। আর থেকে থেকে চারুদির বিরুদ্ধেই রুক্ষ হয়ে উঠেছে ভিতরটা। রাগে জ্বলে পুড়ে দু দিনই মুখে কালি লেপা আর কালি মাখার কথা বলেছেন চারুদি। কেবলই মনে হয়েছে নিজে একটা শিশু-অঙ্কুর প্রতিরোধ করতে পেরেছেন বলেই এমন কথা চারুদির মুখে সাজে না। চকিতের দেখায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পার্বতীর সেই মুখে কোথাও এতটুকু কালোর ছায়া দেখেনি ধীরাপদ, কোথাও একটা কালির আঁচড় চোখে পড়েনি। কুমারী জীবনের এই পরিস্থিতিতে ওভাবে দরজার কাছে এসে

দাঁড়াতে শুধু পার্বতীই পারে বুঝি, দাঁড়িয়ে অমন নিঃশব্দে সে-ই আবার চলে যেতে পারে। চারুদির ধারণা, শুধু তাঁকে জব্দ করার জন্যেই ইচ্ছে করে এই প্রতিশোধ নিলে পার্বতী। কিন্তু ধীরাপদর একবারও তা মনে হয় না। তার ইচ্ছাটুকুই শুধু সত্যি হতে পারে, সেই ইচ্ছার মূলে আর যাই থাক, প্রতিশোধের কোনো জ্বালা নেই। তার দরজার কাছে এসে দাঁড়ানোর মধ্যে ধীরাপদ এতটুকু অভিযোগ দেখেনি, যাতনা দেখেনি, মর্মদাহ দেখেনি। সেখানে এসে আর তাদের দিকে চেয়ে পার্বতী নিঃশব্দে শুধু নিরস্ত হতে বলেছে তাদের। আর কিছুই বলেনি, আর কিছুই চায়নি।

সিঁড়ির থামে শিথিল দেহলগ্ন সেই দূরের তন্ময়তা ধীরাপদ ভুলবে না।

অফিস থেকে ফিরে সে অমিতাভর ঘরে উঁকি দেয় একবার। তারপর রাতের মধ্যে অনেকবার। কিন্তু বেশি রাতে ছাড়া তার দেখা মেলে না। আবার ফেরেও না প্রায়ই। মনে মনে কি জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ধীরাপদর নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় খুব।

সেদিন অফিস থেকে ফিরেই হতভম্ব। তার ঘরে রমণী পণ্ডিত বসে।

উদভ্রান্ত দিশেহারা মূর্তি। মুখ পোড়া কাঠের মত কালচে, দেখলেই শঙ্কা জাগে বড় রকমের ঝড়ে দিক-কূল হারিয়েছেন। তাকে দেখা মাত্র গলা দিয়ে একটা ফোঁপানো শব্দ বার করে উঠে কাছে এলেন, তারপরেই অকস্মাৎ বসে পড়ে তার দুই হাঁটু জাপটে ধরলেন।

সর্বনাশ হয়েছে ধীরুবাবু, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমার কুমু আর নেই, তাকে আপনি খুঁজে বার করে দিন!

ধীরাপদ এমনই হকচকিয়ে গেল যে, কি বলবে কি জিজ্ঞাসা করবে দিশা পেয়ে উঠল না। বিমূঢ় বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিক, তারপর রমণী পণ্ডিতকে টেনে তুলে বিছানায় বসিয়ে দিল।

কি হয়েছে?

পণ্ডিত আর্তনাদ করে উঠলেন, তিন দিন ধরে কুমু নেই, থানায় খবর দিয়েছি, সমস্ত কলকাতা চষেছি—কেউ কিছু বলতে পারলে না। তাকে কারা ধরে নিয়ে গেছে ধীরুবাবু, হয়ত সরিয়েই ফেলেছে—

দু হাতে মুখ ঢাকলেন। ধীরাপদ হাঁ করে চেয়ে আছে, তাঁকেই দেখছে। এমন উদভ্রান্ত শোক না দেখলে ব্যাপারটাকে হয়ত অনেকটা সহজ ভাবেই নিতে

পারত সে। একটু আত্মস্থ হয়ে রমণী পণ্ডিত জানালেন, তিন দিন আগে খেয়ে-দেয়ে যেমন বেতের ঝুড়ি বানানোর কাজে বেরোয় তেমনি বেরিয়েছিল কুমু, ফিরে এসে বাবার সঙ্গে ভাই-বোনদের জামাকাপড় আর মায়ের জন্য শাড়ি কিনতে যাবে বলে গিয়েছিল। লোকে যাই বলুক, বাবা-মা ভাই-বোন অন্ত প্রাণ মেয়েটার। কক্ষনো সে নিজের ইচ্ছেয় কোথাও যায়নি, পণ্ডিতের দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েটা কারো ষড়যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। মেয়ের শোকে গণুদার হাতে-পায়ে ধরেছেন পণ্ডিত, তাঁর কেবলই মনে হয়েছে সে হয়ত জানে কিছু, কিন্তু গণুদা ভয়ানক রেগে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিয়েছে তাঁকে।

হঠাৎ একি হল ধীরাপদর? বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই দেহের সমস্ত কোষে কোষে অণুতে অণুতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি একটা, তারপরেই নিস্পন্দ একেবারে। শুধু মাত্র কোনো একটা সম্ভাবনায় এমন প্রতিক্রিয়া হয় না, সম্ভাবনাটা নিদারুণ কিছু সত্যের মতই অন্তস্তল ছিঁড়ে-খুঁড়ে চেতনার গোচরে ঠেলে উঠছে।

সেই লোকটা কে? সুলতান কুঠির পথে চার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সেদিন গণুদা যার সঙ্গে কথা কইছিল, সেই কোট-প্যাণ্ট পরা ঘাস-রঙা সিগারেটের টিন হাতে লোকটা কে?

কে? কে? কে? কে?

আলো জ্বললে যেভাবে অন্ধকার সরে, ধীরাপদর চোখের সুমুখ থেকে বিস্মৃতির পরদাটা পলকে সরে গেল তেমনি। অনেক—অনেকদিন আগে তাকে প্রথম দেখেছিল কার্জন পার্কের লোহার বেঞ্চিতে বসে। গোপনীয় বাক-বিতণ্ডার পর পকেটের পার্স বার করে একজন অশুভ মূর্তি লোকের হাতে গোটাকয়েক নোট গুঁজে দিতে দেখেছিল। দ্বিতীয় দিন দেখেছিল গড়ের মাঠে বসে, একদা লাইট পোস্ট আর বাস স্টপের ক্ষীণ-যৌবন-পসারিণী কাঞ্চনের সঙ্গে। যেদিন মেয়েটার পসারই লুঠ হয়েছিল—দাম মেলেনি।...এই লোকের কাছেই বঞ্চিত হয়েছিল, বঞ্চিত হয়ে ভয়ে ভগ্ন-বিকীর্ণ হতাশায় কাঁদতে কাঁদতে কাঞ্চন অন্ধকার মাঠে তার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

সেই লোক! কার্জন পার্কের সেই লোক, গড়ের মাঠের সেই লোক!

সম্বিৎ ফিরতে ধীরাপদ ডাকল, আমার সঙ্গে আসুন।

ট্যাক্সি ছুটেছে সুলতান কুঠির দিকে। ধীরাপদ স্থাণুর মত বসে। পাশে রমণী পণ্ডিত। তাঁর শোক আর বিলাপে ছেদ পড়েছে আপাতত, আশা-আশঙ্কা নিয়ে ফিরে ফিরে দেখছেন। কথা কইতেও ভরসা পাচ্ছেন না খুব।

ট্যাক্সিটা সুলতান কুঠির খানিক আগে ছেড়ে দিয়ে ধীরাপদ হাঁটা-পথ ধরল।

পিছনে রমণী পণ্ডিত, তাঁর অবসন্ন পা দুটো সামনের লোকটার সঙ্গে সমান তালে চলছে না।

ধীরাপদ দাঁড়িয়ে গেল, মজা পুকুরের ওধারে একলা গণুদা বসে। রমণী পণ্ডিতকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে পুকুরটা ঘুরে একলাই ওধারে চলল। একটা অপ্রিয় পরিস্থিতি এড়ানো গেল, সোনাবউদি আর ছেলেমেয়েদের চোখের ওপর গণুদাকে বাইরে ডেকে আনার দরকার হল না। ওখান থেকে সুলতান কুঠি দেখাও যায় না, গাছগাছড়ার আড়ালে পড়ে।

গণুদা আড়ালই নিয়েছে। ধীরাপদ আর ওপারে রমণী পণ্ডিতকে দেখে বিষম চমকে উঠল। পাংশু শুকনো মুখ আরো শুকিয়ে গেল।

কুমু কোথায়? নরম করে সাদাসিধে ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে ধীরাপদ।

ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মত গণুদা বসা থেকে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। তারপরেই রাগে ফেটে পড়তে চাইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? আমি কার খবর রাখি? আমাকে জিজ্ঞাসা করার মানে কি?

কুমু কোথায়?

বা রে! গণুদার রাগের জোর কমছে, তাই গলা বাড়ছে। এবারের কোপটা রমণী পণ্ডিতের ওপর। ওই উনি বলেছেন বুঝি আমার কথা? এত বড় জ্যোতিষী হয়েছেন, গুনে মেয়ে কোথায় বার করুন—আমার কাছে কেন? আমি কি জানি? উনি নিজে জানেন না কেমন মেয়ে ওঁর? গণুদার ফরসা মুখ কাগজের মত সাদা, রাগে কাঁপছে।

ধীরাপদ দেখছে তাকে। সঙ্কটে পড়লে অনেক পারে মানুষ। একসঙ্গে পাঁচটা কথা জুড়তে পারত না গণুদা, তার এই মূর্তি আর এই কথা!

চার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সেদিন যার সঙ্গে কথা কইছিলেন সেই লোকটা কে? ধীরাপদর কণ্ঠস্বর আরো শান্ত, কিন্তু আরো কঠিন।

কো—কোন্ লোক?

চকচকে চেহারা, চকচকে স্যুট পরা, হাতে খাস-রঙা সিগ্যারেটের টিন—

ইয়ে, আমি—তার কি? দুই চোখে অব্যক্ত ত্রাস গণুদার। রাগের মুখোশটা একটানে খুলে নিয়ে তারই আতঙ্কগ্রস্ত মুখের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে যেন।

তাকে আমি চিনি। তাকে কোথায় পাওয়া যাবে এখন?

আমি জানি না, আমি কিছু জানি না। নিজেকে টেনে তোলার শেষ উগ্র চেষ্টা গণুদার।

ধীরাপদ অপেক্ষা করল একটু। তারপর যাবার জন্য পা বাড়িয়েও ফিরল একবার। তেমনি অনুচ্চ কঠিন স্বরে বলল, পুলিস আপনার মুখ থেকে কথা বার করতে পারবে।

জোর গেল, পায়ের নিচে মাটি নড়ল, সব ক'টা স্নায়ু একসঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ল। হঠাৎ দু হাতে ধীরাপদর হাত দুটো আঁকড়ে ধরল গণুদা, সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠল, গলা জিভ ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ।

আমাকে বাঁচাও ধীরু। ওই লোকটা ঠিক এই করবে আমি জানতুম না। আমাকে বাঁচাও ধীরুভাই!

লোকটা ধরা পড়েছে আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে। সঙ্গে একটা সুসংবদ্ধ দলের হদিস পাওয়া গেছে।

কুমুকে থানায় আনা হয়েছে। আরো কয়েকটি নিখোঁজ মেয়ের সন্ধান মিলেছে।

আর, একাদশী শিকদারের খবরের কাগজ পড়ার তৃষ্ণা বরাবরকার মত মিটে গেছে।

রহস্যটা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট এখন। তিনি ঘরের কোণে সেঁধিয়েছেন। আর তাঁকে কোনদিন কাগজের প্রত্যাশায় উন্মুখ আগ্রহে কদমতলার বেঞ্চিতে বসে থাকতে দেখা যাবে না। যে ত্রাসে সকালে উঠেই তিনি কাগজ হাতে নিতেন আর যেটুকু খবরের ওপর চোখ বুলিয়েই সেই দিনটার মত নিশ্চিন্ত হতে পারতেন—চকচকে স্যুট-পরা ঘাস-রঙের সিগারেটের টিন হাতে লোকটাকে পুলিস জালে আটকানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই সব কিছুর নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

লোকটা একাদশী শিকদারের ছেলে।

গণুদাকে সনাক্ত করার জন্য পুলিস সেই ছেলেকে সুলতান কুঠিতে নিয়ে এসেছে। বাঁচার তাড়নায় বিপর্যয়ের মুখে লোকটা গণুদাকেও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে। ঘটনাটা সাবালিকার প্রতি একটা বিচ্ছিন্ন মোহ প্রমাণ করতে পারলে তার শাস্তি লাঘবের সম্ভাবনা। তার বক্তব্য, মেয়েটাকে গণুদাই তার হাতে তুলে দিয়েছে। আর, মেয়েটাও স্বেচ্ছায় এসেছে।

সেই একদিন ঘরের কোণ থেকে একাদশী শিকদারকেও টেনে বার করেছে পুলিস। জেরা করেছে। মামুলী জেরা। শিকদারমশাই সব কথার জবাব দিয়ে উঠতে পারেননি। চেষ্টা করেছেন, মুখ নড়েছে, ঠোঁট দুটো নড়েছে—স্বর বেরোয়নি। কোটরাগত চোখ দুটো ছেলের সর্বাঙ্গে ওঠানামা করেছে। ধীরাপদ

আড়ষ্ট হয়ে দেখছিল, হঠাৎ চোরের মারের কথা মনে পড়েছে তার। একাদশী শিকদারের সেই অসহায় উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনারও হদিস মিলেছে। চোরের জায়গায় নিজের অপরাধী ছেলেকে বসিয়ে জনতার বিচারের বিভীষিকা দেখেছিলেন তিনি।…শকুনি ভটচাযকে তোয়াজ করে চলতেন কেন একাদশী শিকদার? গোপনে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাতেন তাঁকে দিয়ে—কারো মঙ্গলের জন্য, হয়ত বা কারো সুমতির জন্যও। রমণী পণ্ডিতের বদ্ধ ধারণা শকুনি ভটচায কিছু দুর্বলতার আভাস পেয়েছিলেন, তাই তাঁর মৃত্যুতেও শিকদার মশাইকে শোকগ্রস্ত মনে হয়নি তেমন।

ধারণাটা এমন নির্মম সত্যের আগুনে দগদগিয়ে উঠতে পারে কেউ ভাবেনি। ছেলেকে নয়, দু চোখ টান করে একাদশী শিকদারকেই দেখছিল ধীরাপদ। মৃত্যু-ছোঁয়া ঘোলাটে চোখের তারায় আর বলির ভাঁজে ভাঁজে স্নেহের অক্ষরে বিধাতার অভিশাপ রচনা দেখছিল।

কুমু ভয় পেয়েছিল। অন্যথায় একাদশী শিকদারের ছেলের একার জবাব-দিহিতে গণুদা এতটা জড়িয়ে পড়ত কিনা বলা যায় না। কিন্তু মেয়েটা মারাত্মক ভয় পেয়েছিল। পুরুষের যে মোহ এতদিন সে রঙিন বস্তু বলে জেনে এসেছে, এই ক'টা দিনে তার বীভৎস নিষ্ঠুরতার দিকটাও দেখা হয়ে গেছে বোধ হয়। তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসার পরেও নিরাপদ বোধ করছিল না, আসামীর সামনে বসে কাঁপছিল থরথর করে। সেই দিশাহারা চাউনি দেখে ধীরাপদর মনে হয়েছে, তখনো মাংস-লোলুপ একটা নেকড়ের সামনেই বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে।

পরে কুমুর ভীতত্রস্ত জবানবন্দি থেকে পুলিসের খাতায় একটা বিস্তৃত সন্ধানের উপকরণ সংগ্রহ হয়েছে। শুধু নিপীড়ন নির্যাতন নয়, অনেক রকমের ভয় দেখিয়ে দলের একজনের স্ত্রী সাজিয়ে আসামী কুমুকে বাইরে চালান দেবার ব্যবস্থা করেছিল। পুলিসের জেরায় গণুদার নামটাও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। লোকটার সঙ্গে গণুদাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল, তার বিশেষ বন্ধু, মস্ত কারবারী—এই বন্ধু সদয় থাকলে কুমুর আর ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হবে না। পুলিসের একটা ঈষদুষ্ণ ধমক খেয়ে কুমু স্বীকার করেছে, অকারণে একবার গণুদা তাকে টাকাও কিছু দিয়েছে।

গণুদাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

তার আগে ঘটনার একটা মোটামুটি আভাস ধীরাপদ পেয়েছে। প্রাণের দায়ে গণুদা যা বলেছিল তা মিথ্যে নয় হয়ত। মেয়েরা যে ফার্মে বেতের ঝুড়ি

কার্ডবোর্ড বাক্স ইত্যাদি বানায় একাদশী শিকদারের ওই ছেলেকে প্রায়ই সেখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেত। কার ছেলে সেটা জানা গেছে লোকটাকে পুলিসে ধরার পর। গণুদাও সেখানে চাকরির চেষ্টায় আসত প্রায়ই। নিজেকে লোকটা একজন বড় কনট্রাকটর বলে পরিচয় দিয়েছিল। সেধে গণুদার সঙ্গে আলাপ করেছে, সে আলাপ ঘনিষ্ঠ হতেও সময় লাগেনি। তাকে সুদিনের আশ্বাস দিয়েছে আর দফায় দফায় টাকাও দিয়েছে। একটা মেয়ের সঙ্গে খাতির করার লোভে এভাবে টাকা কেউ দিতে পারে গণুদার ধারণা ছিল না। বড়লোকের যেমন রোগ থাকে তেমনি রোগ ভেবেছিল। পণ্ডিতের ওই মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র যা, দু দিন আগে হোক পরে হোক তার সাহায্য ছাড়াও লোকটা তাকে হাত করবেই জানত। তাই ফালতু আসছে ভেবে নির্বোধের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিয়েছে গণুদা, অভাবের তাড়নায় লোভ সামলাতে পারেনি।...কিন্তু এ যে এত বড় ষড়যন্ত্রের ব্যাপার সে কল্পনাও করেনি।

প্রধান আসামীসহ গণুদাকে অদূরের পুলিসভ্যানে চালান দিয়ে অফিসার ভদ্রলোক আবার দাওয়ায় ফিরে এলেন সোনাবউদির স্টেট্‌মেন্ট নেবার জন্য। ধীরাপদর তড়িতাহত বোধশক্তি এতক্ষণে একটা বিপরীত ঘায়ে সজাগ হল যেন। সোনাবউদি দরজা ধরে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে, উমা আর ছোট ছেলে দুটোর চোখে-মুখে বোবা ত্রাস। সম্ভব হলে অফিসারটিকে ফেরাত ধীরাপদ। সম্ভব নয়, নিজের ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বসালো তাঁকে। সোনাবউদিকে ডাকতে হল না, বাইরে এসে তার দিকে তাকাতেই বুঝল। মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু, তারপর নিজের অগোচরেই যেন এক পা দু পা করে এ ঘরে এসে দাঁড়াল।

এক অব্যক্ত বেদনায় ধীরাপদর তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল সেদিকে, অন্য দিকেই মুখ ফিরিয়েছিল। কিন্তু সোনাবউদির মুখে জেরার জবাব শুনে সশঙ্কে ফিরে তাকায়নি শুধু, সম্ভব হলে হাতে করে তার মুখ চাপা দিত। ঠিক এ ধরনের জবাব পাবেন অফিসারটি আশা করেননি হয়ত, মুখে প্রশ্ন করছেন, হাতের পেন্সিল দ্রুত চলছে। সোনাবউদির চোখে পলক পড়ছে না, প্রায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে সমস্ত জেরারই উত্তর দিচ্ছে। ধীর অনুচ্চ, কিন্তু এত স্পষ্ট সত্য যে ধীরাপদর উদ্বেগভরা দুই চোখে শুধু নিষেধের ভাষা। সোনাবউদি তা দেখেনি, একবার তাকায়ওনি তার দিকে।

সুযোগ বুঝে ক্রমশ স্থূল কলাকৌশল-বর্জিত হয়ে উঠতে লাগল জেরার ধরন। সোজাসুজি, স্পষ্টাস্পষ্টি। গণুদার কতদিন চাকরি গেছে, কি কি অপরাধে এতকালের চাকরি গেল, রেস বা জুয়ার নেশা ছিল কিনা, মদ খেত কিনা—। সব

প্রশ্নেরই জবাব অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিপজ্জনক স্বীকৃতির মতই। যার প্রসঙ্গে বলা তার সঙ্গে কোনরকম ইষ্ট-অনিষ্টের যোগ নেই যেন সোনাবউদির।

এর পরের আচমকা প্রশ্নটা আরো অনাবৃত।—পণ্ডিত মশাইয়ের ওই মেয়েটির সঙ্গে আপনার স্বামীর ব্যবহার কি রকম দেখেছেন?

ভালো।

কি রকম ভালো?

তাকে সাহায্য করার আগ্রহ ছিল।

ধীরাপদ পটের ছবির মত দাঁড়িয়ে। পুলিস অফিসার পরিতুষ্ট গাম্ভীর্যে নোট করলেন, তারপর নিঃসঙ্কোচে জেরাটা স্থূল বাস্তবের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন।—এতদিন হয়ে গেল আপনার স্বামীর চাকরি নেই, আপনার সংসার চলছে কি করে?

তাঁর টাকাতেই।

তিনি টাকা পেলেন কোথায়?

এই প্রথমে সোনাবউদি ধীরাপদর দিকে তাকালো একবার, তারপর তেমনি মৃদু স্পষ্ট জবাব দিল, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা ছিল।

ধীরাপদ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে, পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্বন্ধেও তেমন সচেতন নয় যেন। এতক্ষণ সত্যি কথাই বলে এসেছে সোনাবউদি, কিন্তু এও কি সত্যি ভাববে? এদিকে পুলিস অফিসারের দু চোখ অবিশ্বাসে ধারালো হয়ে উঠল, গলার স্বরও রুক্ষ শোনালো। বললেন, যা জিজ্ঞাসা করছি সত্যি জবাব দিন, বাজে কথা বলবেন না—মাসকয়েক আগে উনি নিজে থানায় এসে আমার কাছে ডায়রি করে গেছেন তাঁর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা চুরি গেছে—

চুরি যায়নি।

পুলিস অফিসার ঝাঁজিয়ে উঠলেন, চুরি না গেলে লেখালেন কেন? সে টাকা কোথায়?

আমার কাছে।

ধীরাপদ হাঁ করে দেখছে, হাঁ করে শুনছে। কিন্তু সোনাবউদির মুখের দিকে চেয়ে কিছুই বোঝার উপায় নেই। ওই মুখে কোনো ভয় কোনো দ্বিধা কোনো অনুভূতির লেশমাত্র নেই। নিষ্পলক মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। জেরা ভুলে পুলিস অফিসারটিও নীরবে কয়েক মুহূর্ত দেখলেন তাকে। এক কাজে এসে আর এক ব্যাপারের হদিস মিলবে ভাবেননি। সুর পাল্টে জিজ্ঞাসা করলেন, কত টাকা ছিল?

সাড়ে চার হাজার।

এই ক'মাসে আপনার সব খরচ হয়ে যায়নি নিশ্চয় ?

সোনাবউদি নিরুত্তর।

আর কত আছে ?

নিশ্চল মুহূর্ত দুই একটা, সোনাবউদি যন্ত্রচালিতের মত ফিরে দরজার দিকে অগ্রসর হতে গেল। কিন্তু তার আগেই বাধা পড়ল, কোথায় যাচ্ছেন ?

অস্ফুট স্বরে সোনাবউদি বলল, নিয়ে আসছি।

সত্যি মিথ্যে যাচাই করার জন্য পুলিস অফিসার নিজেই বাকি টাকা দেখতে চাইতেন, এই উদ্দেশ্যেই এভাবে প্রশ্ন করা। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞ চোখে যাচাই হয়ে গেল বোধ হয়। বললেন, থাক, দরকার নেই। আপনি ও টাকা পেলেন কোথায় ?

তাঁর কোটের পকেট থেকে।

কবে নিয়েছেন ?

যেদিন তিনি পেয়েছেন।

তিনি টের পাননি ?

না।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে ধীরাপদ সোনাবউদির দিকেই চেয়ে আছে। কিন্তু তাকেও যেন ঠিক দেখছে না। তার মগজের মধ্যে তোলপাড় চলেছে কিছু একটার। সেই রাতের দৃশ্যটা চকিতে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। গণুদাকে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সোনাবউদিকে চমকাতে দেখেছিল, তার চোখে ত্রাসের ছায়া দেখেছিল। রিক্শ ভাড়া মিটিয়ে ফিরে আবার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সোনাবউদির অন্য মূর্তি দেখেছে। আর, প্রায় বেহুঁশ গণুদা খেদে ভেঙে পড়ছিল তখন···

পুলিস অফিসারের জেরা শেষ হয়েছে। এবারে ঈষৎ সদয় কণ্ঠেই বললেন, আচ্ছা আপনি যান।

সোনাবউদি যন্ত্রের মতই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ধীরাপদর নির্বাক দৃষ্টিটা দরজা পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করল। পুলিস অফিসার এর পর তাকে কি দু-এক কথা জিজ্ঞাসা করেছেন খেয়াল নেই। তিনি চলে যাবার পরেও একা ঘরে ধীরাপদ কতক্ষণ বসেছিল হুঁশ নেই।···

দুটো মাস টানা-হেঁচড়ার পর কেস সেসানে গেছে।

এবারে আবার কম করে দু-তিন মাসের ধাক্কা। এ পর্যন্ত ব্যবস্থাপত্র যা

[illegible] ধীরাপদই করেছে। উকিলও সেই দিয়েছে। গণুদাকে জামিনে ছাড়িয়ে আনতে চেষ্টা করা হয়েছিল, বিচারক সে আবেদন নাকচ করেছেন। ব্যবস্থা-পত্রের ব্যাপারে সোনাবউদি এগিয়েও আসেনি, বাধাও দেয়নি। এমন কি দু মাসের মধ্যে ধীরাপদর সঙ্গে দুটো কথাও হয়নি। ধীরাপদ অনেকবার সুলতান কুঠিতে এসেছে। দরকারে এসেছে, বিনা দরকারেও। আসাটা কেমন করে সহজ হয়ে গেছে। বক্তব্য কিছু থাকলেও উমার মারফৎ বলে পাঠিয়েছে। নয়ত উমা আর তার ভাই দুটোকে নিয়ে সময় কাটিয়েছে।

সোনাবউদিকে প্রথম বিচারপর্বে হঠাৎ একদিন মাত্র কোর্টে দেখেছিল ধীরাপদ। কোর্ট থেকেই তাকে ডাকা হয়েছে ভেবেছিল। কিন্তু তাও নয়। পরে রমণী পণ্ডিতের মুখে শুনেছে নিজে থেকেই এসেছিল। চুপচাপ একধারে বসেছিল, ধীরাপদ সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু একটিও কথা হয়নি। তার নিষ্পলক দু চোখ আসামীর কাঠগড়ার দিকে। তারপর ঘণ্টাখানেক না যেতে হঠাৎ একসময় লক্ষ্য করেছে সোনাবউদি নেই। রমণী পণ্ডিতের সঙ্গে এসেছিল, তাঁর সঙ্গেই চলে গেছে।

রমণী পণ্ডিত কেস করছেন না, কেস চালাচ্ছে সরকার। কিন্তু গোড়া থেকেই তাঁকে আর তাঁর মেয়েকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলেছে। কাঁদ কাঁদ মুখে রমণী পণ্ডিত অনেকবার ধীরাপদকে বলেছেন, যা হবার হয়ে গেছে, তিনি কারো ওপর প্রতিশোধ নিতে চান না, কোন উপায়ে কেস বন্ধ করা যায় কি না। ধীরাপদ বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু লোকটার দিকে চেয়ে কিছু বলতেও পারেনি। ওই বাতাহত মুখ যেন জীবিত মানুষের মুখ নয়। তার ওপর আরো অবাক হয়েছে, সোনাবউদির দুর্ভাগ্যে এই মানুষেরই প্রচ্ছন্ন অনুভূতির আবেগ লক্ষ্য করে। নিজের এত বড় ক্ষতি সত্ত্বেও মনে মনে উল্টে তিনিই যেন ওর কাছে অপরাধী হয়ে আছেন।

কেস সেসানে চালান হয়েছে সোনাবউদিকে ডেকে ধীরাপদ সে খবরটা জানাবে কিনা ভাবছিল। সোনাবউদি ডাকলে আসবে, শুনবে, কিন্তু একটি কথাও বলবে না, একটা কথাও জিজ্ঞাসা করবে না। তার এই দুর্বহ নীরবতার সামনে ধীরাপদ সব থেকে বেশি অস্বস্তি বোধ করে।

উমা ঘরে এলো। তার দু চোখ লাল। একটু আগে কেঁদেছে বোঝা যায়। একটু-আধটু মারধরে মেয়েটা কাঁদে না বড়, বেশিই হয়েছে হয়ত।

মা বকেছে ?

দাঁতে করে পাতলা ঠোঁট দুটো কামড়ে উমা প্রথমে সামলাতে চেষ্টা করল

নিজেকে। না পেয়ে ধীরাপদর কোলে মুখ গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। বলল, বাবাকে ওরা ছেড়ে দিল না ধীরুকা।

উমার মাথার ওপর হাতটা থেমে গেল ধীরাপদর। খবরটা তাহলে সোনা-বউদি জেনেছে। রমণী পণ্ডিত জানিয়েছেন হয়ত। আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। এই মুহূর্তে ওই অমানুষকে হাতের কাছে পেলে কি করে সে? এই অবুঝ কচি মেয়ের বুকটা তাকে কি করে দেখায়?

তখনো সন্ধ্যা হয়নি। ঘরের আলোয় সবে টান ধরছে। দোরগোড়ায় সোনাবউদিকে দেখে ধীরাপদ ফিরে তাকালো। উমা তক্ষুনি উঠে মায়ের পাশ ঘেঁষে প্রস্থান করল। সোনাবউদি ঘরে ঢুকল। কিছু বলবে। কিছু বলার আছে। নইলে আসত না। দু মাসের মধ্যে নিজে থেকে আসেনি। আজই এলো বলে কৌতূহল ছেড়ে তলায় তলায় একটা অজ্ঞাত শঙ্কাই উঁকিঝুঁকি দিল।

শান্তমুখে সোনাবউদি বলল, আবার বিচার হবে শুনছি...আপনি এ পর্যন্ত অনেক করেছেন, আর কিছু করতে হবে না।

ধীরাপদ নিরুত্তর। গণুদা যত অমানুষই হোক, এই সঙ্কটের মুহূর্তে অনেক সময়েই কেমন অকরুণ মনে হয়েছে সোনাবউদিকে। আজও মনে হল।

এ কথায় সে কান দেবে না—সেটা তার মুখ দেখে বোঝা গেছে কি না জানে না। তেমনি শান্ত অথচ আরো স্পষ্ট স্বরে সোনাবউদি আবার বলল, এরপর যা হবার হবে, আপনি নিজের কাজ ফেলে এ নিয়ে আর ছোটাছুটি করেন আমার তা ইচ্ছে নয়।

সব সময় আপনার ইচ্ছেমতই চলতে হবে ভাবেন কেন?

ধীরাপদ আপন তো কেউ নয়, তার বলতে বাধা কি...। কথা ক'টা আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তারপর মাথা গোঁজ করে থেকেও সোনাবউদির নীরব দৃষ্টিটা মুখের ওপর অনুভব করেছে। কিন্তু একটু বাদে তেমনি শান্ত মৃদু জবাব শুনে সচকিত।

আপনি চলেন বলে ভাবি।

ধীরাপদ মুখ তুলেছে। তারপর চেয়েই আছে। ঘৃণা নয়, বিদ্বেষ নয়, ওই স্তব্ধতার গভীরে একটু যেন হাসির আভা দেখেছে। আর তারও গভীরে কোথায় যেন বহুদিনের আগের দেখা এক বিস্মৃতপ্রায় স্নেহ-সমুদ্রের সন্ধান পেয়েছে।

এই ব্যাপারে এ পর্যন্ত আপনার কত টাকা লেগেছে?

অতর্কিত ধাক্কা খেল, যদিও ঠিক এ প্রশ্নটা না হোক, তাকে আজ এ ঘরে আসতে দেখে এই গোছেরই কিছু একটা আশঙ্কা করেছিল। জবাব না দিয়ে

ধীরাপদ অন্ত দিকে চেয়ে রইল।

কত লাগল আমাকে জানাবেন। সোনাবউদি অপেক্ষা করল একটু, তারপর তার মনোভাব বুঝেই যেন আস্তে আস্তে আবারও বলল, আপনার কাছ থেকে আরো অনেক বড ঋণই নেব, কিন্তু এই যন্ত্রণার বোঝা আর বাড়াতে চাই নে, এ টাকাটা তার সেই টাকা থেকেই দিয়ে ফেলতে চাই।

ধীরাপদর চকিত দৃষ্টি আবারও সোনাবউদির মুখের ওপর এসে থামল, তারপর প্রতীক্ষারত দুই চোখের কালো তারার গভীরে হারিয়ে গেল যেন।

সোনাবউদির এবারের কথা ক'টা আরো মৃদু, আরো শান্ত।—ওই টাকার জন্তে আপনার অনেক দুর্ভোগ হয়েছে। কিন্তু এত বড় অন্যায় আমি আর কার ওপরে করতে পারতুম ?···টাকা আমি নিয়েছি জানতে পেলে ছেলেপুলে নিয়ে পরদিন থেকেই উপোস শুরু হত।

সোনাবউদি আর দাঁড়ায়নি।

একটা উষ্ণ তাপে ধীরাপদর কপালটা চিনচিন করছে। ঠাণ্ডা কিছু লাগাতে পারলে আরাম হত, ভালো লাগত।

···আরো ভালো লাগত, আরো ঠাণ্ডা হত, যে চলে গেল তার দুই পাযেব ওপর কপালটা খানিক রাখতে পারলে।

॥ চব্বিশ ॥

শুধু সুলতান কুঠিতে নয়, ধীরাপদ সর্বত্রই একটা অনাগত বিপর্যয়ের ছায়া দেখছে।

বড সাহেবের বাড়িতে অসন্তোষ, চারুদির বাড়িতে অসন্তোষ, কারখানায় অসন্তোষ, এমন কি ধীরাপদর মগজের মধ্যেও কি এক অসন্তোষের বাষ্প জমাট বাঁধছে। কেবলই মনে হয় এই সবগুলি অসন্তোষেব ধারা কোথাও এসে মিলবে তার খরবেগে তখন অনেক কিছুই তলিয়ে যাবে।

অর্গ্যানিজেশন চীফ সিতাংশু মিত্র অর্গ্যানিজেশনে মেতেছে। প্রেম-দেউলে পুরুষ অনেক সময় নেশাসক্ত হয় নাকি। ছোট সাহেবকে সংগঠনের নেশায় পেয়েছে। দুর্বলের দাপটে ভযের থেকেও অস্বস্তি বেশি। ঘরের সবুজ আলোয় একজনের কোলে তার মুখ-থুবডানো দুর্বল চেহারাটা ধীরাপদর দেখা আছে। কিন্তু লাবণ্য সরকার প্রকাশ্যে আগের থেকেও আরো অনেক কম জাহির করে নিজেকে। একেবারে নিজস্ব আওতার কিছু না হলে কোনো কাগজপত্রে তার মন্তব্য বা সইসাবুদও দেখা যায় না বড। তবু ধীরাপদর ধারণা, যে কারণে মহিলা এক-

জনকে মন দেওয়া সত্ত্বেও আর একজনকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে এতকাল, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই কারণটা আরো জটিল বই সরল হয়নি।

বহুদিন আগে অফিসের কাজে লাবণ্যকে নিয়ে সিতাংশু একবার বোম্বাই গিয়েছিল। ফলে বড় সাহেব বিরূপ হয়েছিলেন, অমিতাভ ক্ষেপে উঠেছিল। সম্প্রতি একজন সমুদ্রপারে আর একজন কাছে থেকেও অনেক দূরে। কিন্তু খুব কাছে তৃতীয় একজন আছে। একই উপলক্ষে এবারে আর এক বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হল ধীরাপদ।

রাতে মান্‌কে এসে কথায় কথায় জানালো, বউরাণীর মাথা-টাথা ধরে থাকবে, ওষুধের দোকানে ফোন করে মেম-ডাক্তারের খোঁজ করছিলেন। মেম-ডাক্তার আসছেন হয়ত…

মন বলে বস্তুটাকে ধীরাপদ ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়, কিন্তু এরা এক-একটা নাড়াচাড়া দিয়ে সজাগ করবেই। ধীরাপদ জানে মেম-ডাক্তার আসবে না। সকালের প্লেনেই তারা বোম্বাই পৌঁছে গেছে। আসতে আসতে কাল বিকেল। ভালো, ভালো, এতদিনের মধ্যে দিন বুঝে সময় বুঝে বউরাণীর তাহলে আজই মাথা ধরেছিল। খুব ভালো। ধরতেই পারে, দেহযন্ত্রের সারথি এই মাথাটা, কম ব্যাপার নয়।

পরদিন সকালে চায়ের অপেক্ষায় বসেছিল, নির্লিপ্ত-বদন মান্‌কে খালি হাতে এসে খবর দিল, বউরাণী আপনাকে ওপরে গিয়ে চা খেতে বললেন।

বউরাণীর মাথার আওতায় নিজেও পড়তে পারে ভাবেনি। শুনে ধীরাপদ খুব স্বস্তিবোধ করল না। বউরাণীর তলব এই প্রথম। এযাবৎ আড়াল থেকে তার যত্ন-আত্তির আভাস পেয়েছে।

বড় সাহেবের ঘরে টিপয়ে চায়ের সরঞ্জাম রেখে অপেক্ষা করছিল। মাথার কাপড়টা খোঁপার ওপর নেমে এসেছিল, একটু তুলে দিয়ে তাকালো। সলাজ মিষ্টি অভিব্যক্তি, আপনাকে ওপরে ডেকে বিরক্ত করলাম…বসুন।

সঙ্কোচ নেই বটে, কিন্তু ঘরের বউয়ের সহজাত নম্রতাটুকু সুশোভন। টিপয়ের সামনের চেয়ারটায় বসে ধীরাপদ সহজভাবেই বলল, না, বিরক্তি কিসের।

খাবারের ডিশটা এগিয়ে দিয়ে বউরাণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা করতে লাগল। এই অভ্যর্থনার পিছনে একটা প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য ধীরাপদ অনুভব করছে। কি ভেবে সে নিজেই জিজ্ঞাসা করে বসল, কাল রাতে আপনি অসুস্থ বোধ করছিলেন নাকি?

হাত থামল, মুখ তুলল—পলকের বিড়ম্বনা। তারপরেই প্রশ্নের হেতু

বুঝল। দুই ভুরুর মাঝে ওই চকিত কুঞ্চনের আভাস মানুকের প্রতি বিরক্তিসূচক হয়ত।

না…। চা করা শেষ হতে জিজ্ঞাসা করল, দেব ?

ধীরাপদ ঈষৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, আমি ঢেলে নেব'খন, আপনি বসুন।

একটু সরে গিয়ে খাটের বাজু ধরে দাঁড়াল সে, বসল না। বলল, আমাকে তুমি বলবেন, আমার নাম আরতি।

নাম জানে, কিন্তু প্রস্তাবটা অপ্রত্যাশিত। এ বাড়িতে বড় সাহেব ধীরাপদকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন বটে, কিন্তু এতটা করেছেন নিজেও জানত না। এর পর আরো সহজ হওয়ার কথা, অথচ বিপরীত হল। হাসতে চেষ্টা করে সে শূন্য পেয়ালাটা কাছে টেনে নিল।

আরতি এগিয়ে এসে পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে আবার খাটের বাজু ধরে দাঁড়াল। ধীরাপদর এও ভালো লাগল, মিষ্টি লাগল, অথচ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। শিখার মত সেজেগুজে মানুকেকে বাহন করে যে মেয়ে স্বামীর ফ্যাক্টরী দেখতে যায়, এই আটপৌরে বেশবাস আর মিষ্টি সৌজন্যের মধ্যেও সেই মেয়েই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

দু মাস হল আপনাকে খুব ব্যস্ত দেখছি, কারখানার কাজ বেড়ে গেছে বুঝি ?

না…অন্য একটা ঝামেলা নিয়ে আছি। ফ্যাক্টরীর কিছু না—

কাল সকালে উনি বম্বে চলে গেলেন, পরে শুনলাম লাবণ্য দেবী গেছেন। খুব জরুরী কিছু ব্যাপার বোধ হয় ?

যে মেয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল নির্দ্বিধায় তার সামনেও সে এতটাই স্পষ্ট হযে উঠতে পারে ধীরাপদ ভাবেনি। অথচ বলার ধরনে তির্যক আভাসমাত্র নেই, যেন খবর করার মত সহজ সরল প্রশ্নই একটা।

ঠিক জানি নে…

দুই এক মুহূর্তের বিনয়-নম্র প্রতীক্ষা। ধীরাপদ চায়ের পেয়ালা মুখে তুলেছে।

শ্বশুরমশাই যেভাবে বলেন, মনে হয় কারবারের মাথা বলতে এখন আপনি। এঁরা কেন গেলেন আপনি জানেনও না ?

ধীরাপদ নিরুত্তর, চায়ের পেয়ালা নামায়নি। আরতির সৌজন্যে চিড খেতে দেখল না, পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মত কি লেগে আছে। শ্রদ্ধেয়-জনের সঙ্গে শ্রদ্ধাসহকারেই কথা কইছে, কিন্তু সেও মিত্তিরবাড়ির বউ, জিজ্ঞাসা যা করছে তার যথাযথ উত্তর সে প্রত্যাশা করে মনে হল।

একটু থেমে ঘুরিয়ে সেই গোড়ার প্রশ্নেরই পুনরুক্তি করল, এখানেও দিন-রাতের খাটুনি দেখছি, বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ারও সময় হয় না···কারখানার কাজের চাপ এখন খুব বেশি নাকি ?

ধীরাপদ পেয়ালা নামালো। সহজভাবেই বলল, নিজে সব দিক দেখাশুনা করছেন তাই চাপ একটু বেশিই পড়েছে।

আরতি আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি, কিন্তু এর পরেও একটা অনুক্ত জিজ্ঞাসা তার চোখে লেগে ছিল। সিতাংশু একা সব দিক দেখাশুনা করছে, না সঙ্গে এক-জন আছেন···তিনি কতটা আছেন ? দুজনে একসঙ্গে বম্বে যাওয়ার মত সত্যিই কিছু জরুরী কাজ পড়েছিল কিনা সেটুকু জানাই বোধ হয় আসল উদ্দেশ্য ছিল তার। নিজের অজ্ঞাতে ধীরাপদ তার জবাবও দিয়ে ফেলেছে। সে জানে না মানেই তেমন গুরুতর প্রয়োজন কিছু ছিল না। অন্তত আরতি তাই ধরে নিয়েছে। কিন্তু ধীরাপদ সত্যিই সঠিক জানত না। হয়ত বা ফিল্ড্ অর্গ্যানিজেশনেই গেছে সিতাংশু। বোম্বাই মস্ত মার্কেট। সঙ্গে ডাক্তার থাকলে সুবিধেও হয়। লাবণ্যর মত ডাক্তার থাকলে অনেকগুণ বেশিই সুবিধে হয়।

ভিতরে ভিতরে মেয়েটার ভালরকম মানসিক দুর্ভোগ শুরু হয়েছে।···বড় বেশি স্পষ্ট মেয়েটা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কম। কিন্তু বেশ মেয়ে, ধীরাপদ খুশি হয়েছে। অফিসের পরিবেশে সিতাংশু এমনিতেই গম্ভীর, এর পরের কয়েকটা দিন আরো বেশি গম্ভীর মনে হয়েছে তাকে। তার বোম্বাই সফরের স্টেটমেন্টে দেখা গেছে, বছরে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকার ব্যবসা বাড়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু অন্দরমহলের ক্ষোভের জের কোথায় এসে ঠেকল সে সম্বন্ধে মান্কের মুখ থেকেও কিছু আভাস পাওয়া গেল না। সে জানলে তার কানে আসতই। সেদিন শরীর অসুস্থ হয়েছিল কিনা জিজ্ঞাসা করে ধীরাপদই হয়ত বোকার মত সতর্ক করে দিয়েছে মেয়েটাকে।

গণুদার কেসটা প্রথম কোর্টেই ঝুলছে তখনো, তাই আগের মত অতটা নিষ্ক্রিয় ভাবনা-চিন্তার অবকাশ ছিল না। তবু এরই ফাঁকে ব্যক্তিগত ভাবনাটা বক্র গতি নিয়েছে। নিভৃতে এই ভাবনাটা লালন করতে ভালো লাগছে ধীরাপদর। সেই ভাবনা লাবণ্য সরকারকে ঘিরে।···সব ক'টা জটিল আবর্তের মূলে সে, তাকে কেন্দ্র করেই যা কিছু। মাটির তলা থেকে গাছের শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নেওয়ার মত এই একজনকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে আনতে পারলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় বোধ হয়। চারুদি ছেলে চায়, পার্বতী আরো বেশি কিছু। গ্লানিমুক্ত বাতাসে একটি শিশুর আবির্ভাব ঘটতে পারে। আরতির মাথা-

ধরা ছেড়ে যেতে পারে, সুস্থ সম্পদে ভরে উঠতে পারে মেয়েটা। আরো অনেক দিকে অনেক কিছু হতে পারে…। ধীরাপদ কি এই সঙ্কল্প নেবে? পুরুষের সঙ্কল্প? আরতির মুখ, চারুদির মুখ, পার্বতীর মুখ, এমন কি যে জাতক এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি সেই মুখের হাসিটুকুরও যেন তার এই সঙ্কল্পের সঙ্গে যোগ।

কিন্তু নিজের ভিতরটাই ধীরাপদর একপ্রস্থ কুয়াশায় ছাওয়া। অন্তস্তলের নিভৃতচারীকে দেখার ভয়ে সেই কুয়াশাও নিজেই পুষছে। লাবণ্যকে গোটাগুটি ভাবে সরিয়ে আনা মানে কর্মস্থল থেকে তাকে বিচ্যুত করা নয়। তার ভগ্নি-পতির বাসনার ইন্ধন যুগিয়ে বড় ডাক্তার হয়ে আসার জন্য তাকে বিলেত পাঠানোও নয়। দুটোর একটার সঙ্গেও আপোস করতে পারে না। তাহলে আর কিভাবে সরিয়ে আনবে? সঙ্কল্প নেবে কেমন করে?

রমেন হালদারের চাকরি গেল।

খুব সঙ্গত কারণেই গেল। আগে হলে কেসটা ধীরাপদর কাছেই আসত। তা আসেনি। বরখাস্তের নোটিস সিতাংশু সই করেছে। কিন্তু ধীরাপদর কাছে এলে সেও একই নিষ্পত্তি করত। রমেন হালদারের চাকরি যেত।

চুরি ধরা পড়েছে। দোকানের ওষুধ সরিয়ে অন্য দোকানে সস্তায় চালান দিচ্ছিল। কতদিন ধরে এ কাজ শুরু হয়েছে সঠিক জানা যায়নি। অন্য দোকান থেকে সস্তায় সেই ওষুধ কিনে একজন মুখচেনা খদ্দের ম্যানেজারকে চোখ রাঙাতে এসেছিল—এই দোকানে দাম এত বেশি নেওয়া হয় কেন?

ওষুধের প্যাকেট হাতে করে ম্যানেজার হতভম্ব, প্যাকেটে এই দোকানের সাঙ্কেতিক দাগ। ভুলবশতই হোক বা ওষুধ নিয়ে কেউ যাচাই করতে আসতে পারে না ভাবার দরুনই হোক, পেন্সিলের দাগটা তোলা হয়নি। ম্যানেজার প্যাকেট হাতছাড়া করেননি। চুরির ব্যাপারে কেউ গণ্ডগোল পছন্দ করে না। ম্যানেজার প্যাকেটসহ সেই দোকানে গিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলার উপক্রম করতেই তারা সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে। তারা জানে ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া ওষুধ, কত ডাক্তার কত রকমে কত ওষুধ সংগ্রহ করে। তারা সস্তায় পেয়েছে, কিনেছে।

ম্যানেজার লাবণ্য সরকারকে জানিয়েছেন। সে তাঁর লিখিত রিপোর্ট আদায় করে সিতাংশুকে দিয়েছে। তারপর সেই রিপোর্টসহ বরখাস্তের কপি ধীরাপদর কাছে এসেছে। শুধু তাই নয়, ম্যানেজারের মৌখিক অভিযোগের দরুন কাঞ্চনকেও আপাতত সাসপেণ্ড করা হয়েছে। তার চাকরি থাকবে কি থাকবে না সেটা

বিবেচনা-সাপেক্ষ।

ধীরাপদ ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছিল। তিনি সেই পুরানো কথাই বলেছেন। সেই সঙ্গে একটা নতুন কথাও।

রমেনের চুরি হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। তবু একেবারে চাকরি যাক্ সেটা তিনি চাননি। কয়েক বছর আগেও এরকম একটা কেস্ হয়েছিল। হাতে পায়ে ধরতে বড় সাহেব সেই লোকটিকে ক্ষমা করেছিলেন। এ কথা তিনি মিস সরকারকে জানিয়েছিলেন, চাকরিটা যাতে থাকে সেই অনুরোধও করেছিলেন। ছেলেটাকে সকলেই ভালবাসে, লোভে পড়ে করেছে। ম্যানেজারের আসল রাগ কাঞ্চনের ওপর, তাঁর বিশ্বাস ওই মেয়েটার জন্যই এই কাণ্ড করেছে সে—তাকে টাকা-পয়সাও দেয় হয়ত, যার দরুন নিজের খরচ চালাতে পারে না। ওই মেয়েটার ফাঁদে পা দিয়েই লোভের ফাঁদে পা দিয়েছে সে। ম্যানেজার জানালেন, মিস সরকার কোনো কথা কানে তোলেননি। কিছুদিন ধরেই তিনি ছোকরার ওপর বিষম তেতে ছিলেন। তাঁর ধারণা, রমেন মিস সরকারের এক আত্মীয়ের কাছে তাঁর নামে কিছু বলেছে। মিস সরকার নিজেই একদিন ম্যানেজারকে ঘরে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর আত্মীয়টি দোকানে এলে কার সঙ্গে কথা-বার্তা হয়—শুধু রমেনের সঙ্গেই কিনা।

বাড়ি ফিরে ঘরের আব্ছা অন্ধকারে অস্ফুট শব্দ করে ধীরাপদ আঁতকে উঠেছিল একেবারে। তারপরেই স্থির। দু পা আঁকড়ে ধরে পায়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে কাঞ্চন। বিকালেই এসেছিল হয়ত, মানুকেই এ ঘরে এনে বসিয়ে থাকবে, তারপর খেয়াল করে আর আলো জেলে দিয়ে যায়নি।

আজ ধীরাপদর একটুও মায়া হল না, একটুও মমতা বোধ করল না। ম্যানেজারের মতই একটা হাসিখুশি ভালো ছেলের অধঃপতনের মূলে এই মেয়েটাকেই দেখছে সেও।...রমেনের বিধবা মা আছে শুনেছিল, বড় ভাইটা পাগল, আরো একটা নাবালক ভাই আছে।

ওঠো।

উঠল না।

ওঠো—। কণ্ঠস্বর আরো রুক্ষ, আরো কঠিন।

এইবার উঠল।

ধীরাপদ ঘরের আলো জ্বালল, চেয়ারটা টেনে বসতে দিল, তারপর মুখের দিকে না চেয়ে বলল, তোমাদের কোনো ব্যাপারে আমি নেই, এখানে এসেছ কেন? কে বলেছে এখানে আসতে?

কাঞ্চন মাথা নাড়ল। কেউ বলেনি।

আমার কাছে কেন এসেছ?

এসেছে কিছু বলতে। ধীরাপদ শুনতে প্রস্তুত নয়, কিন্তু বাধা দেবার আগে যে ক'টা কথা বলল তারপর আর বাধা দেওয়া গেল না। ঠিক এই কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে।

কাঞ্চন নিজের জন্য দয়াভিক্ষা করতে আসেনি, ও দয়ার যোগ্য নয় জানে। তার বাঁচার দাবি অনেক আগেই ফুরিয়েছিল, এই বাঁচাটুকুই অনেক বাড়তি। কিন্তু রমেনের কোনো দোষ নেই, সব দোষ ওর—দাদা দয়া করে রমেনকে বাঁচান। সে লোভে পড়ে এই কাজ করেছে, ওকে নিয়ে আলাদা দোকান করার আশায় হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়েছিল। ও না থাকলে সে এসব কিছুই করত না, এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠার জন্যে পাগল হত না। একটি একটি করে পয়সা জমাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু অভাবের তাড়নায় তাও না পেরে শেষে এই কাজ করেছে। চাকরি গেলে রমেনের আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না, দাদা তাকে রক্ষা করুন, ওর চাকরিটা নিয়ে তার চাকরিটা রাখুন।

বলতে বলতে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

তাকে কোনরকম আশ্বাস না দিয়ে বিদায় করার পরেও একটা দৃশ্য ধীরাপদ কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারছিল না। একদিন না একদিন নিজস্ব একটা দোকান হওয়ার সম্ভাবনায় ছেলেটার সেই আশা-জ্বলজ্বলে মুখখানা। তার দোকানে তাকে নেবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে আশার আলোটা চতুর্গুণ হয়েছিল, কিন্তু লজ্জায় ভেঙে পড়ে বলেছিল, যাঃ, দাদা ঠাট্টা করছেন!

পরদিন কোম্পানীর স্টেশন ওয়াগনে বাড়ি ফিরছিল, ধীরাপদর চোখ দুটো একটা শুকনো বিবর্ণ পাংশু মুখের ওপর ধাক্কা খেয়ে অন্যদিকে ফিরল। ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে নির্দেশ দিল না। থামালেই বরং ড্রাইভার ধমক খেত। ফটক থেকে খানিকটা দূরে রমেন দাঁড়িয়েছিল। কার প্রতীক্ষায় তাও জানে। কাতর দৃষ্টিটা মুহূর্তের মধ্যেই বিঁধিয়ে দিতে পেরেছিল, কিন্তু ফল হয়নি।

পরদিন অফিসেই এলো। তার ঘরে। ধীরাপদ মুখ তুলতেই তার চেয়ারটার দিকে এগোলো সে।

দাঁড়াও।

রমেন দাঁড়িয়ে পড়ল। শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁট দুটো ঘষে নিল একবার।

আঙুল দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিল ধীরাপদ, যাও—।

তবু সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আগুন জলল মাথায়, কঠোর কণ্ঠে বলল; চোরের জন্যে আমি কোনো সুপারিশ করিনে, যাও এখান থেকে, নইলে দারোয়ান ডাকব।

রমেন তবু দাঁড়িয়ে। তবু কিছু বলতে চায়। ধীরাপদ এবারে চেয়ারসুদ্ধ ঘুরল তার দিকে। এরা বুঝি পাগলই করে দেবে তাকে। কিন্তু আর কিছু বলার অবকাশ হল না। দরকার হল না। দরজা ঠেলে লাবণ্য ঘরে ঢুকল।

রমেন চলে গেল।

লাবণ্যর আসার কারণ বোঝা গেল। কোনো রকম ভনিতা না করে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, আপনি এই ছেলেটাকে প্রশ্রয় দেন কেন?

ধীরাপদ চেয়ারটা ঘুরিয়ে ঠিক করে নিল। শান্ত, সংযত।—কি প্রশ্রয় দিতে দেখলেন?

ও এখানে আসে কোন্ সাহসে? ওকে কারবারের ত্রিসীমানায় আসতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে।

মুখের দিকে সরাসরি চেয়ে এখন আর কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করে না ধীরাপদ।—ওকে বরখাস্ত করেও ওর ওপর আপনাদের রাগ যায়নি দেখছি। কেন?

কঠিন কিছু একটা বলার প্রস্তুতিই শুধু দেখা গেল, বলল না কিছু। তেমনি ধীরেসুস্থে ধীরাপদ আবার বলল, চুরি করলে মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না আপনাকে কে বলল? রোজগারের পথ বন্ধ হয়েছে, ওর আসাই স্বাভাবিক।

কে বললে বন্ধ হয়েছে? রোজগারের অনেক পথ জানা আছে ওর, এখানে না এসে সেই চেষ্টা করতে বলুন গে।

তপ্ত জবাব ছুঁড়ে প্রস্থান করল। ধীরাপদর মনে হল লাবণ্যর অসহিষ্ণুতা একটু বেড়েছে।…ছোট সাহেবের জোরে জোর বেড়েছে হয়ত। কাজে মন দিতে চেষ্টা করত, কিন্তু লাবণ্যর শেষের উক্তি বাধা সৃষ্টি করছে। ম্যানেজারের কথাগুলো মনে পড়ছে।…ভগ্নিপতি সর্বেশ্বরবাবুটিকে মনে পড়ছে। রমেনের রোজগারের আর কি পথ জানা আছে?…ছিল হয়ত, এখন সে পথও বন্ধ।

কি ভেবে সেই বিকেলেই ধীরাপদ লাবণ্যর ভগ্নিপতির বাড়ি এসে হাজির। লাবণ্যর সঙ্গেই একদিন এসেছিল, আবার আসার জন্য ভদ্রলোক অনেক করে বলে দিয়েছিলেন।

সেই বাড়ি, ঘর। দেয়ালের খোপে লাল গণেশমূর্তি, রেকাবিতে শুকনো বাতাসা। দেয়ালে কড়ি-গাঁথা গোবরছাপ। পুরনো বইয়ে ঠাসা তাক,

সেগুলোর মাঝে মাঝে একটা দুটো চকচকে নতুন বই। সর্বেশ্বরবাবুর বড় মেয়ে তাকে বসিয়ে বাবাকে খবর দিতে গেল। ধীরাপদ আজও বেছে বেছে রমণী পণ্ডিতের বই কখানাই টেনে নিল। সেদিন ছিল একখানা, এখন আরো দুখানা চটি বই হয়েছে। এই বই দুখানারও সর্বস্বত্ব দে-বাবুর। বই অজস্র বিক্রি হলেও দে-বাবুর লেখকরা টাকার মুখ দেখেন না।

অপ্রত্যাশিত পায়ের ধুলো পড়তে সর্বেশ্বরবাবু আজও বিনয়ে গলে গলে পড়তে লাগলেন।—কম ভাগ্য তাঁর! মহৎ জন কথা দিয়ে গিয়েছিলেন আসবেন, সত্যিই এলেন—এ কি সোজা সৌভাগ্য! এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বাড়ি দেখে মনে পড়ে গেল? এও ভাগ্য ছাড়া আর কি! সেই সৌভাগ্যই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দশমুখে ঘোষণা করতে লাগলেন তিনি।—বসুন বসুন, না এখানেই বা বসবেন কেন, একেবারে ভিতরেই চলুন, আপনি বাইরের ঘরে বসবেন কেন!

তার আগেই ধীরাপদ বসে পড়েছে। এখানেই ভালো লাগছে তার। কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর সর্বেশ্বরবাবু ঘর ছেড়ে বেরুবার উদ্যোগ করতে ধীরাপদ বাধা দিল। ভয়ানক অসুস্থ সে, জলটুকুও মুখে দেবার উপায় নেই, সেজন্যে পীড়াপীড়ি করলে তাকে এক্ষুনি উঠতে হবে। ভদ্রলোকের ফরসা মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠল, সেদিনও ব্রাহ্মণ শুধু মুখে চলে গিয়েছিলেন, আজও তাই। সবই ভাগ্য, এত অসুস্থ যখন তিনি আর পীড়াপীড়ি করেন কি করে?

বই ক'টার দিকে চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সলজ্জ উৎসাহ, আজও এইসব বই-ই বার করেছেন, আপনার নিশ্চয় চর্চা আছে কিছু। নেই? তাহলে পড়তে ভালো লাগে বুঝি? লাগবেই তো। ভদ্রলোকের লেখার ক্ষমতা আছে—জলের মত সরল মনে হয় সব, পড়লেই বোঝা যায় মস্ত গুণী মানুষ। হঠাৎ দ্বিগুণ আগ্রহ, আচ্ছা, এই ভদ্রলোককে একবার পাওয়া যায় না? আমার কিছু ক্রিয়া-কর্ম করানোর ছিল, নিজের আর ছেলেপুলের কুষ্টিগুলোও দেখাতাম।...এসব লোক কারো বাড়ি-টাড়ি আসেন না, না?

বইয়ের দোকানে লিখুন।

লিখব কি, আমি নিজেই গিয়েছিলাম। তারা আরো একগাদা আজেবাজে বই গছালে কিন্তু ঠিকানা দিলে না। মহাপুরুষ ব্যক্তি...নিষেধ-টিষেধ আছে বোধ হয়। ঠিকানা পেলেই তো লোকে গিয়ে হামলা করবে।

ঠিকানা না পেয়ে ভদ্রলোকের শ্রদ্ধা আরো অনেক গুণ বেড়েছে, রমণী পণ্ডিতকে মহাপুরুষ ঠাওরেছেন। প্রয়োজনে দে-বাবুও মহাপুরুষ বানিয়ে থাকতে পারেন তাঁকে।

অন্যান্য দু-পাঁচ কথার পর প্রশংসাটা ধীরাপদর দিকেই বাঁক নিল আবার। সত্যিই বড খুশির দিন আজ সর্বেশ্বরবাবুর, তাঁর মহত্ত্ব আর বিচার-বিবেচনার কথা এত শুনেছেন যে দু কান ভরে আছে—

সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল ধীরাপদ, এটুকুই সুযোগের মত। হাসিমুখে তক্ষুনি বলল, কিন্তু এত সব যার মুখে শুনেছেন তার তো চাকরি গেল—

সর্বেশ্বরবাবু সচকিত। ঢোক গিললেন, তাই নাকি! ইয়ে, কেন? কেন?

আপনি কি ওর সম্বন্ধে লাবণ্য দেবীকে কিছু বলেছেন?

রমেনের সম্বন্ধে! না তো…ইয়ে, রাগের মাথায় অবশ্য একদিন দু-এক কথা বলে ফেলেছিলাম। তবে আমার বিশ্বাস ছোঁড়াটা অনেক বানানো কথাও বলে—

আপনার কাছ থেকে এ পর্যন্ত টাকাও অনেক নিয়েছে বোধ হয়?

না…মানে, অনেক না। অভাবী ছেলে, মাঝে-মধ্যে দু-দশ টাকা এমনিই দিতুম। কিন্তু টাকার কথা তো লাবুকে আমি বলিনি।

ও নিজেই স্বীকার করেছে। ধীরাপদ গম্ভীর।

লাবুর কাছে? ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন।

না, আমার কাছে।

আপনি তাহলে দয়া করে এটা আর কাউকে বলবেন না। অভাবের সময় এসে হাত পাতলে কিছু না দিয়ে পারিনে, অথচ শুনলে কে কি ভাববে ঠিক নেই। চাকরি গেল কেন? কাজকর্ম কিছু করত না বুঝি?…ওই জন্যেই লাবু ক্ষেপেছে তাহলে, কাজে হেলাফেলা করলে তার কাছে মাপ নেই। আপনি দয়া করে তাকে টাকার কথাটা বলবেন না…বলবেন না তো? পাজী ছোক্‌রা আপনার কাছে স্রেফ মিছে কথা বলেছে মশাই, অভাবে কেঁদে হাত পাততো তাই দিতুম, আর কিছুর জন্যে না—যাক্‌গে লাবুকে এসব কিছুই বলার দরকার নেই। বলবেন না, কেমন?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, বলবে না। হাসতে না পারলেও হাসিই পাচ্ছে এখন। নিরীহমুখে জিজ্ঞাসা করল, লাবণ্য দেবীকে বিলেত পাঠানোর কথা বলছিলেন সেদিন, তার কি হল?

কই আর হল। কিছুই হল না। সখেদে বড় নিঃশ্বাস ফেললেন একটা, তারপর কি মনে হতে ধীরাপদর হাত দুটো সাগ্রহে চেপে ধরলেন।—আপনি একটু চেষ্টা করে দেখবেন? কৌশলে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখুন না—আপনার অনেক

ক্ষমতা, অনেক গুণ, আপনার সম্বন্ধে তো কিছু আর বাড়িয়ে বলেনি ছোঁড়াটা, দেবতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে আপনাকে দেখেছি—কয়ারই কথা, আপনি চেষ্টা করলে যেতে রাজী হতেও পারে। কি হবে গোলামী করে? ছুটো বছর ঘুরে এলে কত বড় ভবিষ্যৎ! আমি এতখানি করেছি, এখন গোলামী করতে দেখলে ভালো লাগে? যায় যদি আমি বিশ-তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারি, আরো বেশিও পারি—

এই লোকের কাছ থেকে রমেন হালদার টাকা নেবে না তো আর কার কাছ থেকে নেবে? বাইরে এসে ধীরাপদর মনে হচ্ছিল, রমণীর পায়ে এমন আত্ম-নিবেদনের নজির আর দেখেনি। নিজে নাগাল না পাক, শ্যালিকাটি আর কারো নাগালের বাইরে গেলেও ভদ্রলোকের শান্তি।

পরদিন। অফিসে সেই থেকে চুপচাপ বসে আছে ধীরাপদ। তার সামনে ছুটো জিনিস।

একটা রমেন হালদারের চিঠি।

চিঠি ডাকে এসেছে। রমেন লিখেছে, দাদা তাকে তাড়িয়ে দেবেন শুনেও এসেছিল। তার যোগ্য শাস্তি হয়েছে। নিজের অদৃষ্টে কি আছে সে জানে, কিন্তু তার অপরাধে নিরপরাধ কাঞ্চনকে কেন শাস্তি দেওয়া হবে? তার কোনো দোষ নেই। দাদা দেবতার মত, একবার তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন, বিনা দোষে আবার যেন তাকে সেই ঘৃণ্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে না দেন। এই কথা বলতেই সে দাদার কাছে এসেছিল, আর দাদার এই দয়াটুকু ভিক্ষে চেয়েই সে চিঠি লিখছে।

সেদিন ওই মেয়েটা তার দু পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছিল, রমেনের কোনো দোষ নেই, তাকে নিয়ে দোকান করার লোভে ফাঁদে পা দিয়েছে, সব দোষ তার—তার যা হয় হবে, দাদা যেন ওকে বাঁচান। কেন কেন কেন? কেন এমন হয়? চোরের বুকে আর দেহজীবিনীর বুকের মধ্যেও এ কোন্ বস্তুর কারিগরী? কোন্ দুর্নিরীক্ষ্য অবুঝের খেলা?

দ্বিতীয় জিনিসটা ম্যানেজারের মতামতসহ কাঞ্চনের ফাইল।

ধীরাপদর বিবেচনার জন্য এটা পাশের ঘর থেকে এসেছে। কেন এসেছে অনুমান করা কঠিন নয়। কাঞ্চনের নিয়োগের ব্যাপারে অমিতাভ ঘোষের ইচ্ছের জোর ছিল। বরখাস্তটা সিতাংশুর হাত দিয়ে হলেও তাতে লাবণ্যর হাত আছে ভাবতে পারে সে। অতএব ধীরাপদ রাখতে ইচ্ছে হলে রাখুক, বিদায় দিতে হলে বিদায় দিক।

বিকেলের দিকে ফাইলটা টেনে নিয়ে ধীরাপদ খসখস করে বরখাস্তের নির্দেশই দিল। তারপর রমেনের ফাইল তলব করে তার বাড়ির ঠিকানা নোট্ করে পকেটে রাখল।

দেরি করতে ভরসা হয় না। আজকালকার ছেলেদের বিশ্বাস নেই কিছু। ঠিকানা মিলিয়ে যেখানে এসে দাঁড়াল সেটা একটা বস্তিঘর। রমেন বাড়িতেই ছিল। আর তাকে দেখে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধীরাপদ যা বলার পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে বলে এসেছে। রমেন হাঁ করে শুনেছে, তারপর তার দু গাল বেয়ে ধারা নেমেছে। কিন্তু তখনো নড়তে পারেনি সে, তখনো স্বপ্ন দেখছে যেন। স্বপ্নের কথা শুনছে যেন।

সমস্ত নিষ্ক্রিয়তা ঝেড়ে ফেলে ধীরাপদ আবার কাজে মন দিয়েছে। কর্মচারীদের অসহিষ্ণুতা ক্রমশ বাড়ছিল। বড় সাহেবের বিগত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের প্রাপ্যের একটা বড় অংশ বাকি বলে তারা ক্ষুব্ধ। তা ছাড়া যে সব সুবিধে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, তারও কোনরকম লক্ষণ দেখছে না, তোড়-জোড় দেখছে না। ধীরাপদ এইসব ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করতে এলো সিতাংশুর সঙ্গে। সিতাংশু দু কথায় ফিরিয়ে দিল তাকে, কোম্পানীর এখন অনেক খরচ অনেক ঝামেলা—এখন এসব ভাবার সময় নয়।

অতএব ধীরাপদ সব কাজ ফেলে কোম্পানীর আয়ব্যয়ের নথিপত্রের মধ্যে ডুবে রইল দিনকতক। তারপর আবার এলো।

বক্তব্য, বর্তমান পরিস্থিতিতে কোম্পানী স্বচ্ছন্দে কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিতে পারে। আর ঘোষণা অনুযায়ী নতুন ব্যবস্থায়ও কিছুটা এগোনো যেতে পারে। হিসেবের ফাইলটা তার সামনে রাখল।

ওটা আবার ঠেলে দিয়ে সিতাংশু রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল, এসব নিয়ে আপনাকে এখন কে মাথা ঘামাতে বলেছে?

আপনার বাবা। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে যতটা করা সম্ভব করতে বলে গেছেন।

কিন্তু আমি আপনাকে বলেছি কিছু করতে হবে না, এখন কিছু হবে না।

ধীরাপদ ফাইলটা হাতে তুলে নিল, লাবণ্যর দিকে ফিরল তারপর।—আপনারও তাই মত বোধ হয়? তিনি আপনার সঙ্গেও পরামর্শ করতে বলে-ছিলেন।

লাবণ্য জবাব দিল না। সিতাংশুর দিকে চেয়ে মনে হল, চূড়ান্ত কিছু একটা

জবাব এবারে সে-ই দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখে কিছু বলল না।

ধীরাপদ বলল, তাহলে আপাতত আমি চলি। আপনার বাবা ফিরে আসুন। তাঁরও আর আমাকে দরকার আছে কিনা একবার এসে জেনে যাব।

সিতাংশু হকচকিয়ে গেল, কিছুটা লাবণ্যও। ধীরাপদ দু-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে দরজার দিকে পা বাড়ালো। সিতাংশু বাধা দিল, তার মানে আপনি এতদিন আর আসবেন না ?

ধীরাপদ ঘুরে দাঁড়াল, বলল, তার মানে তাই।

নিজের ঘরে এসে বসল। চেয়ার-টেবিলময় ঘরটাসুদ্ধ ঘুরছে চোখের সামনে। এই জবাব দিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে ও ঘরে ঢোকেনি। কর্মচারীদের এর পর ছোট সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেবে, সে এসব ব্যাপারে থাকবে না—এই কথাটাই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে আসবে স্থির করেছিল। লাবণ্য ঘরে না থাকলে হয়ত সেই কথাই বলে আসত। কিন্তু সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল। যে কথা আগে মনেও আসেনি সেই কথাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হিসেবের ফাইলটা অ্যাকাউন্টেন্ট-এর জিম্মায় রেখে এলো। শুধু তাঁকেই জানিয়েছে কিছুদিন সে হয়ত আর আসবে না—দরকারী কাগজপত্র সব যেন ছোট সাহেবের কাছে পাঠানো হয়।

রাস্তা। বছর কতক আগেও এই রাস্তাই সম্বল ছিল। কিন্তু বুকের ভিতর আজ একটা শূন্যতা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, আগে তা উঠত না। এবারে কি করবে ? সুলতান কুঠিতে ফিরবে ? হিমাংশুবাবুর বাড়িতে এর পর থাকা চলে না। কিন্তু সুলতান কুঠিতে ফেরার চিন্তাটাও বাতিল করে দিল। সেখানেও নয়, আর কোনোখানে। যেখানে তাকে নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল নেই, কারো আগ্রহ নেই। হাতে টাকা থাকলে এরকম জায়গা অনেক মিলবে। কত টাকা আছে ব্যাঙ্কে ? ঠিক মনে করতে পারছে না কত আছে। দিনকয়েক হল এক ধাক্কায় হাজার তিনেক কমেছে, হঠাৎ হাসি পেল, রমেন আর কাঞ্চনের সঙ্গে গিয়েই যোগ দেবে নাকি ?

মন্দ টাকা থাকার কথা নয় এখনো, কিছুকাল নিশ্চিন্তে চলে যাবার কথা। তারপর দেখা যাবে। ধীরাপদ নিশ্চিন্ত বোধ করতে চেষ্টা করছে। একটা ট্যাক্সি নিয়েই বাড়ি ঢুকল। আদেশ অনুযায়ী হতভম্ব মানুকে ট্যাক্সিতে তার জিনিসপত্র তুলে দিল। একটু ফাঁক পেলেই ছুটে গিয়ে সে বউরাণীকে খবরটা দিয়ে আসত। কিন্তু সেই ফাঁক ধীরাপদ তাকে দিল না। ট্যাক্সিতে উঠে তাকে জানালো, বউরাণীকে যেন বলে দেয়, আপাতত তার এখানে থাকার সুবিধে হল না।

না, চারুদির বাড়িতেও নয়, খুব একটা সাধারণ মেসে এসে উঠল। সেখানেই কাটল দিনকতক। মনে মনে মাঝের এই ক'টা বছর স্বপ্ন বলে ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু তবু থেকে থেকে মনে হল, স্বপ্নটা বড় তুচ্ছ কারণে ভেঙে গেছে। অফুরন্ত সময়, দিনরাতের চব্বিশ ঘণ্টাই নিজের দখলে। আগে যেমন ছিল। অথচ এই অবকাশ দুঃসহ বোঝার মত বুকের ওপর চেপে বসছে।

কার্জন পার্কের সেই পরিচিত বেঞ্চটায় এসে বসল সেদিন। কিন্তু সেই ধীরাপদ বদলে গেছে। বসে বসে কালের কাণ্ড দেখার সেই চোখ গেছে, মন গেছে। দূরের প্রাসাদলগ্ন বড় ঘড়িটা তেমনি চলছে, কিন্তু ধীরাপদর মনে হচ্ছে থেমে আছে। বেশিক্ষণ বসা গেল না, উঠে পড়ল। চৌরঙ্গীর দিকেও চোখ পড়ছে না, অথচ এই চৌরঙ্গীর দিকে চেয়ে চেয়ে কতদিন কত কি আবিষ্কার করেছে সে।

অম্বিকা কবিরাজের দোকান। তেমনি আছে বোধ হয়, কিন্তু ধীরাপদর চোখে আরো নিষ্প্রভ লাগছে। কবিরাজ মশাইও আরো বুড়িয়ে গেছেন। তাকে দেখে খুশি। সত্যিকারের বড় যে, বড় হয়েও পুরনো সম্পর্কের মায়া শুধু সে-ই ছাড়তে পারে না—বলে মন্তব্য করলেন। বিকৃত আনন্দে একসময় রমণী পণ্ডিতের কথা তুললেন, বললেন, তার কি মাথার ঠিক আছে, সেই সব ওষুধের জন্যে হাতেপায়ে ধরছে মশাই—তার মেয়েটাকে কারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কাগজে পড়েছেন তো?

ধীরাপদকে দেখে আরো বেশি খুশি নতুন পুরনো বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবু। চা না খাইয়ে ছাড়লেন না, বড় হয়েও পুরনো সম্পর্ক ধীরাপদ ভোলেনি—তিনিই কি ভুলেছেন! তাঁর অবস্থা আগের থেকে আরো ফিরেছে মনে হল। —আপনি এখন হাজার দুই পাচ্ছেন মাসে, না? পণ্ডিত সেই রকমই বলছিল একদিন। দে-বাবু ধীরাপদকে আপ্যায়ন করেননি, দু-হাজারওলাকে আপ্যায়ন করেছেন। তিনিও শেষে রমণী পণ্ডিতের কথাই তুলেছেন, বই ক'টা তো মন্দ কাটছিল না তার, কিন্তু আর লিখবে কি, অন্যকে আশা-ভরসাই বা কি দেবে—নিজেই খাঁচা-কলে পড়ে গেছে। কাজকর্মের নাম নেই, কেবল হাত পেতেই আছে, টাকা দাও আর টাকা দাও—আচ্ছা লোক ঠেকিয়ে দিয়ে গেছেন মশাই!

না, সংস্থানের জন্য আবার যদি পথে পথে ঘুরতেও হয়, এই দুই দোকানের কাছ দিয়ে অন্তত ধীরাপদর আর ঘেঁষা চলবে না। সুলতান কুঠির দিকে চলল। ওদিকের খবর কিছু আছে কিনা জানে না। গণুদার সেসানের কেস চলছে পুরোদমে। তাছাড়া কেন কে জানে রমণী পণ্ডিতের সঙ্গেও একবার দেখা হওয়া

বাঞ্ছনীয় মনে হচ্ছে।

দেখা হল। মজা-পুকুরের ধারে কুঠিবাসীদের চোখের আড়ালে একদিন গণুদা যেখানে বসেছিল, রমণী পণ্ডিত সেখানে একা বসে। ধীরাপদকে দেখে বিড়বিড় করে কুশল প্রশ্ন করলেন। নিষ্প্রভ কোটরগত দুই চোখে মৃত্যু-ছোঁয়া হতাশার ছায়া দেখল ধীরাপদ। আগেও দেখেছে, কিন্তু এই মন দিয়ে দেখেনি হয়ত। রমণী পণ্ডিত কেসের খবর দিলেন—নতুন খবর কিছু নেই, একভাবেই চলছে। তারপর সখেদে বললেন, মেয়েটা যদি আঁতুড়ে মরত ধীরুবাবু—

ধীরাপদ চেয়ে চেয়ে দেখছে তাঁকে। যা হতে পারত তা দেখছে না, যা হয়েছে তাই দেখছে। তাঁর ছেলের থেকে মেয়ে বড়, তাই ওই মেয়েকে দিয়েই একদিন অনেক আশা করেছিলেন ভদ্রলোক।

—আজও ওই গণুবাবুর বউ চাল পাঠাতে তবে হাঁড়ি চড়েছে, অথচ দু দিন বাদে তার নিজের কি হবে ঠিক নেই। হঠাৎ ধীরাপদর হাত দুটো আঁকড়ে ধরলেন রমণী পণ্ডিত, এই বয়সে আর কোন্ রাস্তায় যাব ধীরুবাবু? এই করে আর কতকাল টানব?

ধীরাপদ দেখছে। সোনাবউদির চাল পাঠানোর কথা শুনে ভিতরে মুহূর্তের জন্যে একটু নাড়া পড়েছিল, তারপর আবার তেমনি ঠাণ্ডা, প্রায় নির্লিপ্ত। কালের কাণ্ড দেখতে বসে অনুভূতির বন্যায় নিজে ভাসলে দেখায় ফাঁক থেকে যায়।

হাত ছেড়ে দিয়ে রমণী পণ্ডিত দৃষ্টি ফেরালেন, মজা-পুকুরের দিকে চেয়ে রইলেন। ধীরাপদ দেখছে, ওই মজা-পুকুরটার সঙ্গে ভদ্রলোকের বেশ মিল। কিন্তু তেমন করে ছেঁচতে পারলে ওটা তো আবার নতুন জলে টলমল করে উঠতে পারে, এঁর কি সেই আশাও নেই?

তেমনি নিরাসক্ত মুখে ধীরাপদ আশাই দিল। আধ ঘণ্টাখানেক লেগেছে এই আশার বারতা সম্পূর্ণ করতে। তারপর যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই রমণী পণ্ডিতের নিষ্প্রভ দুই চোখের জরা সরে গেছে, হতাশা সরে গেছে—জীবনের আলো চিকচিকিয়ে উঠেছে। পিঁজরাবদ্ধ পশু হঠাৎ মুক্তির হদিস পেলে যেভাবে থমকে তাকায়, তার সঙ্গে মেলে এই চাউনিটা।

ধীরাপদ সুলতান কুঠির দিকে চলেছে। কোনো ন্যায়-অন্যায় বোধ তাকে উতলা করছে না। যতটুকু মিয়াদ এই জীবনের ততটুকু বাঁচতে হবে, এর মধ্যে ন্যায়-অন্যায় কি? প্রতি মুহূর্তে বাঁচার নিঃশ্বাসে কত শত জীবাণু মরছে—ন্যায়-অন্যায় দেখছে কে? লোভ কামনা বাসনার ওপর তো দুনিয়া

চলছে, ওই আলেয়া কাকে না টানছে? এরই থেকে রমণী পণ্ডিত যদি জীবনের রসদ সংগ্রহ করতে পারে করুক, ক্ষতি কি? এক ভাবে না এক ভাবে সবাই তাই করছে। লাবণ্য সরকারের ভগ্নিপতির অনেক টাকা, লোভের ইন্ধন যোগাতে পারলে অনায়াসে তিরিশ-পঁয়তিরিশ হাজার পর্যন্ত খরচ করতে পারেন। দৈবা-নুকূল্যের আশায় এই রমণী পণ্ডিতের মতই একজন মহাপুরুষকে খুঁজছেন তিনি। একটু আগে পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই বয়সে আর কোন্ রাস্তায় যাবেন তিনি? ধীরাপদ যে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে সেটা লাবণ্য সরকারের ভগ্নিপতি সর্বেশ্বরবাবুর বাড়ির ঠিকানায় এসে থেমেছে। এখন মহাপুরুষের হাতযশ। ধীরাপদর ন্যায়-অন্যায় ভাবার দরকার নেই।

আজও ছেলেমেয়েরা নয়, সোনাবউদিই ঘরে এলো। দু-এক পলক নিরীক্ষণ করে দেখল তাকে। ফিরে ধীরাপদও। সোনাবউদির মুখ কালচে দেখাচ্ছে, চোখের কোলে কালি ভেসে উঠেছে।

আপনি আজকাল কোথায় আছেন?

ধীরাপদ অবাক, তার ওদিকের কোনো আভাস সুলতান কুঠিতে পৌঁচেছে ভাবেনি। সত্যি জবাবই দিল।—একটা মেসে।

কেন?

নিরুত্তর। একটু থেমে সোনাবউদি ঠাণ্ডা সুরে সংবাদ দিল, গত কয়েক-দিনের মধ্যে অনেকে তার খোঁজ করে গেছে, কারা এসেছে একে একে তাও জানালো।

প্রথমে এসেছেন আপনি যে বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়ির ছেলের বউ, নাম বললেন আরতি। একজন লোকের সঙ্গে গাড়িতে এসেছিলেন। আপনি এখানে এলেই আপনাকে অবশ্য একবার পাঠিয়ে দিতে বলে গেছেন। তিনি আট দিন আগে এসেছিলেন।

ধীরাপদ অবাক।...আরতি এসেছিল, কেয়ার-টেক্ বাবুকে সঙ্গে করে নিশ্চয়। কিন্তু আশ্চর্য...

দিনকয়েক আগে এসেছিলেন লাবণ্য সরকার। আপনি এখানে থাকেন না, তিনি ভাবেননি। বলার পরেও বিশ্বাস করেছেন কিনা জানি না। তাঁর ধারণা, আমি আপনাকে বললে আপনি কারখানায় ফিরে যাবেন। বলার জন্যে অনুরোধ করে গেছেন।

ধীরাপদ নির্বাক। সোনাবউদি আবারও থামল একটু, তেমনি ভাবলেশ-শূন্য।

চার দিন আগে আপনার দিদি আপনার খোঁজে ড্রাইভার আর গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। পরশু দিন অমিতাভ ঘোষ এসেছিলেন। তিনি কিছু বলে যাননি।

ধীরাপদ হতভম্বের মত বসে। এতগুলো সম্ভাবনা স্বপ্নের অগোচর ছিল। চারুদি খবর পেলেন কি করে জানে না। অমিতাভর আসাটা আরো অবাক হবার মত। তার একবারের অসুখে সবাই যখন ছোটাছুটি করে এসেছিল, তখন একমাত্র সে-ই আসেনি।

সংবাদ দেওয়া শেষ করে সোনাবউদি চুপচাপ চেয়ে ছিল তার দিকে। মুখ তুলে ধীরাপদ হাসতেই চেষ্টা করল একটু।

আপনি কি কাজ ছেড়ে দিয়েছেন নাকি ?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল। কিন্তু তাও খুব স্পষ্ট করে নয়। অর্থাৎ ঠিক ছাড়েনি।

সোনাবউদি আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না, এখানে না এসে মেসে আছে কেন তাও না।

সুলতান কুঠি থেকে সোজা হিমাংশুবাবুর বাড়ি চলে আসতে ধীরাপদ আর একটুও দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেনি। আজকের দিনটা ছাড়লে ঠিক এগারো দিন আগে এই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। প্রথমেই মান্‌কের মুখোমুখি। বিস্ময় আর কৌতূহলের ধাক্কা সামলে চট্‌ করে সুমুখ থেকে সরে গেল সে। বাধা পড়ার আগেই তাড়াতাড়ি বউরাণীকে খবর দিতে ছুটল হয়ত। ধীরাপদ নিচের ঘরে এসে বসতে না বসতে ফিরে এলো। তার হাতে খাম একটা। বিলেতের খাম।

বউরাণী দিলেন—

খাম হাতে নেবার আগেই ধীরাপদ অনুমান করেছে বড় সাহেবের চিঠি। খুলে পড়ল। না, সে কারখানায় যাচ্ছে না বা এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে খবর পাননি। এই চিঠিতে অন্তত তার কোন আভাস নেই। কিন্তু চিঠিখানা প্রচ্ছন্ন অনুযোগে ভরা। ছেলের চিঠিতে জেনেছেন, কারখানার প্রায় সকল ব্যাপারে তার আন্তরিক সহযোগিতার অভাব। ছেলের প্রতি তার বিরূপ মনোভাবের দরুন তিনি দুঃখপ্রকাশ করেছেন। লিখেছেন, ছেলেকে তিনি একরকম পাকাপাকি ভাবেই তাঁর জায়গায় বসিয়ে এসেছেন, তার সঙ্গে মতের মিল বা মনের মিল না হলে চলবে কেন ? লিখেছেন, ধীরাপদর ওপর তাঁর অনেক আস্থা অনেক

নির্ভয়, ছেলেরও সে ডান হাত হয়ে উঠবে এই আশা তাঁর। মতের অমিল যদি কিছু হয়ও, সেটা যেন কোনরকম মনোমালিন্যের হেতু হয়ে না দাঁড়ায়—অন্তত তিনি ফেরা পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করা হয়।

ভিতরটা জ্বালা-জ্বালা করছিল ধীরাপদর। ছেলের প্রতি বাৎসল্য স্বাভাবিক। কিন্তু সেটা উজিয়ে উঠে অতি বিশ্বস্তজনকেও যখন সংশয়ের চোখে দেখতে শেখায়, তখন এমনিই জ্বলে বোধ হয়। সিতাংশু কি লিখেছে তার বাবাকে জানে না, যাই লিখুক, ধীরাপদর কর্তব্যের দিকটাই বড় সাহেবের বড় করে ভাবার দরকার হয়েছে। ভেবে এই চিঠি লিখেছেন। মোলায়েম মিষ্টি অক্ষরগুলোর মধ্য দিয়ে ধীরাপদ নিজের কর্মক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ চিত্রটা দেখতে পাচ্ছে।

চকিতে উঠে দাঁড়াল, মানুকের বউরাণী আরতি আসছে। বাইরে যাতায়াতের প্রয়োজন ছাড়া এ পর্যন্ত কখনো নিচে নামতে দেখা যায়নি তাকে। মাথায় ছোট ঘোমটা, নম্র পদক্ষেপ, অথচ আসার মধ্যে একটুও জড়তা নেই।

আমাকে ডাকলেই তো হত—

আমার আসতে অসুবিধে কি…। মৃদু জবাব, আপনি আমাকে কিছু না জানিয়ে চলে গেলেন?

ধীরাপদ বিব্রত বোধ করল, এ বাড়ি থেকে যেতে হলে তাকে জানিয়ে যাওয়া দরকার সে আভাস দেয়নি—বিস্ময়টুকু মিষ্টি দাবির মত শোনালো।

আরতি একবার এদিক-ওদিক তাকালো, তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনার জিনিসপত্র কোথায়?

জবাব না দিয়ে ধীরাপদ এবারও বিব্রতমুখে হাসল শুধু। এই মেয়েটিকে অন্তত ছোট ভাইয়ের বউয়ের মত ভাবতে ইচ্ছে করে।

দু-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আরতি নির্দ্বিধায় বলল, শ্বশুরমশাই যাবার আগে আপনার কথাই বার বার বলে গেছেন। কোন রকম অসুবিধে হলে, কোন কিছু দরকার হলে তক্ষুনি যেন আপনাকে জানাই—আপনি থাকলে কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই।…কিচ্ছু না বলে আপনি এভাবে চলে যেতে পারেন আমি ভাবিনি।

চুপ করে থাকা ছাড়া ধীরাপদ এবারেও কিই বা বলতে পারে? এভাবে কেউ অনুযোগ করতে পারে জানলে যেত না হয়ত। অন্তত না বলে যেত না নিশ্চয়। কিন্তু এও মুখ ফুটে বলার কথা নয়।

যেতে যদি হয় তিনি ফিরে এলে যাবেন। মিষ্টি মুখখানা গম্ভীরই দেখাচ্ছে এখন, বলল, তখন আমারও কিছু চিন্তা করার আছে। তিনি ফিরে আসার পরেও

কি হয় আমি সেই দেখায় অপেক্ষায় আছি। আপনার জিনিসপত্র নিয়ে আসুন।

সেদিনের মত আজও এই নিঃসঙ্কোচ ঋজু স্পষ্টতাটুকুই ধীরাপদকে অভিভূত করেছে। মেসে জবাব দিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরল। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত তখন। কিন্তু ফিরে নিজের ঘরে ঢোকা হল না, জিনিসপত্র মানুকের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে পায়ে পায়ে ডাইনের বড় হল-এর দিকে এগোলো অমিতাভ ঘরে আছে, তার ঘরে আলো জ্বলছে।

হ্যালো হ্যালো হ্যালো গ্রেট্ ম্যান! ভিতরে আসুন, আমি তো আপনার অপেক্ষাতেই দিন গুনছি।

ধীরাপদ ভিতরে এসে দাঁড়াল। এত উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক লাগছে না খুব। একটানা অনিয়মে চোখ-মুখ শুকনো অথচ কি এক অশান্ত উদ্দীপনায় জ্বলজ্বল করছে। চেয়ারটা খাটের সামনে টেনে নিয়ে বসতে গিয়ে ছোটখাটো ধাক্কা খেল একটা। অবিন্যস্ত শয্যায় ছড়ানো কাগজপত্রের মধ্যে সেই ফোটো অ্যাল্‌বাম।··· এই উচ্ছ্বাস আর উদ্দীপনার উৎস কি তাহলে ওটাই? ফোটো থেকে আগের পার্বতীকে আবিষ্কার করছিল বসে বসে?

তারপর? আপনার আদর্শের ভরাডুবি হয়েছে? নাও হ্যাভ ইউ রিয়ালাইজ্‌ড্—কি করতে পাবেন আর কি করতে পারবেন না?

ধীরাপদ চুপচাপ দেখছে তাকে। এত কাছ থেকে এত ভালো করে শিগ্‌গীর দেখার সুযোগ হয়নি। খুশির ছটায় ধীরাপদ কিছুটা বিভ্রান্ত। উতলাও। এই খুশির তলায় তলায় গনগনিয়ে জ্বলছে কিছু।

—কিন্তু আমাকে না বলে সব ছেড়েছুড়ে আপনি পালিয়েছিলেন কেন? হোয়াই ডিড ইউ লীভ? ওদের মুখে রাজভোগ তুলে দিয়ে এইভাবে যাব আমরা ভেবেছেন? যখন যাব সব ঝাঁজরা করে দিয়ে যাব—বাট্ ওয়েট, সময় আসুক। একগোছা টাইপ-করা কাগজ তার মুখের সামনে নেড়ে দিল, অ্যাটর্নির নোটিস—সব তছনছ করে পাইপয়সা অবধি বুঝে নেব—তারপর আরো আছে, দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ—

জোরেই হেসে উঠল। ধীরাপদ ভাবছে, কদিন ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া হয়নি লোকটার? ক'রাত ঘুমোয়নি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে গেলে বিপরীত হবে। কাগজের গোছার দিকে হাত বাড়াতে হাসি থামিয়ে অমিতাভ ছদ্মগাম্ভীর্যে ভুরু কোঁচকালো।—আপনাকে বিশ্বাস কি?

আপাতত আর কিছু না হোক এই একজনের বিশ্বাসটুকু যে ষোল আনা লাভ হয়েছে, ধীরাপদর তাতে একটুও সন্দেহ নেই। বিশ্বাস অমিতাভ তাকে আগেও

করত, কিন্তু এত করত কিনা সন্দেহ। এই নবলব্ধ বিশ্বাসের জোয়ারে ভেসেই সে তার খোঁজে সুলতান কুঠি পর্যন্ত হানা দিয়ে এসেছে। কারখানার সংস্রব ছেড়ে-ছুড়ে ডুব দিয়েছিল বলে চোখ রাঙালেও মনে মনে তার মত অত খুশি আর বোধ হয় কেউ হয়নি, সেটা তার প্রথম অভ্যর্থনার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা গেছে। তার চোখে সে এখন স্বার্থের কষ্টিপাথরে যাচাই করা জোয়ালো রকমের খাঁটি মানুষ একটা।

হাত গুটিয়ে নিয়ে নিস্পৃহ গাম্ভীর্যে ধীরাপদ জবাব দিল, বিশ্বাস করার জন্তে কে আপনাকে সাধছে?

অমিতাভ খলখলিয়ে হেসে উঠল আবারও। অ্যাটর্নির কাগজের গোছা একধারে ঠেলে দিয়ে অ্যাল্‌বামটা টেনে নিল।—ওসব উকীলের কচিকচি কি বুঝবেন, তার থেকে এটা দেখুন, দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ—

কিছু না বুঝে অ্যাল্‌বামের মলাট উল্টে ধীরাপদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ঘরে দুটো অ্যাল্‌বাম দেখেছিল, এটা অন্যটা। পার্বত্যরমণীর যৌবন ধরা সেই অ্যাল্‌-বামটা নয়। কিন্তু এও অবাক ব্যাপার, এত সব কি এতে—কিছুই বোধগম্য হল না চট্‌ করে। নানারকম অ্যাকাউণ্টের কপি বা ফোটো কপি, আর ফ্যাক্টরীর কর্মরত পরিবেশের ছবি। কোম্পানীর অ্যাকাউণ্টে ডাইরেক্টরদের অর্থাৎ হিমাংশু মিত্রের আর সিতাংশু মিত্রের পারসোন্যাল ড্রইংস্‌, ব্যক্তিগত প্রচারের খাতে স্ফীতকায় ব্যয়ের অঙ্ক, লাবণ্য সরকারের ফ্রী কোয়ার্টারের খাতে বছরে কত টাকা ব্যয় হয়, কত টাকার ওষুধ যায়, সেখানকার বেডে কত রোগী আসে ইত্যাদির হিসেব, গত বার্ষিকী উৎসবে প্রতিশ্রুতি এবং প্রাপ্তির খসড়া, এমন কি পাকা চাকুরে রমেন হালদারের বরখাস্তের কপি পর্যন্ত আছে ওতে। ছবিগুলো আরো দুর্বোধ্য। কর্মচারীদের ওষুধভরতি শিশির লেবেল তোলা আর লেবেল আঁটার ছবি অনেকগুলো। আরো খানিক খুঁটিয়ে দেখে ধীরাপদ হতভম্ব। ওষুধভরতি লেবেল তোলা শিশিতে নতুন লেবেল আঁটা হচ্ছে বোঝা যায়। একটা বড় রকমের ধাক্কা খেয়ে ধীরাপদ সচকিত হয়ে উঠল। হৈ-চৈ করে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুখে দুর্নামের কালি মাখাতে হলে আগের নজিরগুলো ফেলনা নয়, কিন্তু এই ব্যাপারটা বিপজ্জনক।

তার দিকে চেয়ে অমিতাভ হাসছে। চশমার পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে সেই হাসির আভা তার মুখের ওপর পড়ছে।

এ কি কাণ্ড?

কেন, কিছু নয় মনে হচ্ছে? অমিতাভ ঘোষ চাপা আনন্দে ভরপুর।

কিন্তু এসব কি পাগলামি করতে যাচ্ছেন আপনি?

কী? হাসি মিলিয়ে গিয়ে ফরসা মুখ লাল হল মুহূর্তের মধ্যে। এতটা বিশ্বাসের যোগ্য কি না এখন তাই আবার খুঁটিয়ে দেখছে। ধীরাপদর মুখটা চোখের ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে দেখছে। কণ্ঠস্বরেও চাপা আগুন ঝরল, বলল: এ যেন আর কেউ জানতে না পারে।

চালে ভুল হয়ে গেল ধীরাপদরও মনে হয়েছে। কিন্তু এক্ষুনি এই ভুল শুধরে দ্বিগুণ বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠার অস্ত্র আছে তার হাতে। সেই অস্ত্র লোকটার হাতে তুলে দেবে কি না চকিতে ভেবে নিল। হিমাংশু মিত্রের চিঠিখানা অন্তস্তলে নতুন করে জ্বালা ছড়ালো একপ্রস্থ।···কর্মক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ চিত্রটাও তো দেখা হয়ে গেছে। অঘটন ঘটেই যদি জোরালো রকমই ঘটুক না। ভাঙন যদি ধরেই, হুড়মুড়িয়েই ভাঙবে না হয় সব। কিন্তু এই লোকের বিশ্বাসের ওপর পুরোপুরি দখল নেওয়াই দরকার। হয়ত বা তাতে করে ভাঙন রোধ করাও যেতে পারে। লোকটাকে বশে আনতে পারলে হয়ত বা আরো অনেক কিছু হতে পারে।··· চারুদি ছেলে পেতে পারে, পার্বতী আরো বেশি কিছু পেতে পারে, আর গ্লানিমুক্ত বাতাসে একটি শিশুর আবির্ভাব ঘটতে পারে। অমিতাভকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ধীরাপদর কারখানার গোলযোগের কথা একবারও মনে হয়নি, জীবনের এই পথে তাকে ফেরানো যায় কি না সেই কথাই শুধু মনে হয়েছে।

বলল, আমাকে বিশ্বাস কি, দেখবেন কালই হয়ত জানাজানি হয়ে গেছে।

পরিহাস বুঝেও অমিতাভর চোখের ধার নরম হল না, এসব ব্যাপারে ঠাট্টাও বরদাস্ত হবার নয়।

ধীরাপদ নির্লিপ্ত মুখে আবার বলল, আমাকে না জিজ্ঞাসা করে কোনরকম গণ্ডগোল বাধিয়ে বসবেন না যদি কথা দেন, তাহলে হয়ত ছবি তোলার আরো দু-একটা সাবজেক্ট্ আমি বলতে পারি—

এই এক কথা শুনেই ভিন্ন মানুষ আবার। চোখে-মুখে উৎসুক আগ্রহ। —কী?

কথা দিচ্ছেন?

আঃ, বলুন না! আমি এক্ষুনি কিছু করতে যাচ্ছি না, করলেও আর কেউ না জানুক আপনি জানবেন।

ধীরাপদ নিশ্চিন্ত যেন। বলল, অনেক বড় বড় ব্যবসাতে ট্যাক্সের গণ্ডগোল এড়ানোর জন্যে অনেকরকম ব্যবস্থা থাকে শুনেছি, আমাদেরও আছে কিনা খোঁজ

করে দেখতে পারেন।

শোনা মাত্র নড়েচড়ে বসল অমিতাভ ঘোষ, এমন একটা জানা ব্যাপার মনেও পড়েনি, আশ্চর্য! নীরব প্রশংসার বন্যায় ধীরাপদকে চান করিয়ে দিল যেন, তারপর জিজ্ঞাসা করল, আর কি?

আর, কোনো কোনো বড় কারখানায় অনেক ফিক্‌টিশাস লেবারও থাকে শুনেছি, যাদের কোনো অস্তিত্ব নেই—আমাদের এখানে সপ্তাহে কত লোক টিপসই দিয়ে মজুরি নিয়ে যাচ্ছে আর সত্যি সত্যি কত লোক আছে একবার খোঁজ করে দেখলে পারেন। মনে হয়, লোকের থেকে টিপসইয়ের সংখ্যা দিন-কে-দিন বাড়ছে।

অমিতাভ ঘোষ লাফিয়ে উঠল একেবারে। এও বলতে গেলে জানা ব্যাপারই, অথচ সময়ে মনে পড়েনি। হিংস্র আনন্দে গোটা মুখ উদ্ভাসিত। তার কাঁধ ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিল গোটাকয়েক, আপনি সাঙ্ঘাতিক লোক, আমারই মনে পড়া উচিত ছিল—ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল, সিম্পলি ওয়াণ্ডারফুল!

ধীরাপদ গম্ভীর, বসুন, আরো কথা আছে—

অমিতাভ তক্ষুনি বসে পড়ল আবার। উন্মুখ প্রতীক্ষা। আঘাত যদি দিতেই হয় এটাই সুসময় ধীরাপদর কাছে—এই উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনার মুখেই। সহজ মুখেই বলল, আপনি পার্বতীর সম্বন্ধে চিন্তা কি করছেন?

আচমকা এই বিপরীত ধাক্কার প্রতিক্রিয়া যেমন হবে ভেবেছিল তেমনই হল। বিস্মিত, বিভ্রান্ত। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

তার কোলে ছেলে আসছে। আপনার ছেলে।

একনজর তাকিয়েই বোঝা গেল খবরটা এই প্রথম শুনল। এমন বিমূঢ় হতচেতন মূর্তি আর দেখেনি। কিন্তু অস্ত্রোপচারে বসে চিকিৎসকের মায়া করতে গেলে চলে না। ধীরাপদও সেই গোছের নির্মম। বলল, চারুদি আপনাকে চান, কিন্তু এইভাবে এই ব্যাপারটা চান না। ফলে ওই মেয়েটাকেই মুখ বুজে সব গঞ্জনা ভোগ করতে হচ্ছে—

অমিতাভর চাউনিটা ধারালো হয়ে উঠেছে একটু একটু করে। উক্তির মধ্যে আতিশয্য বা ছলচাতুরীর আভাস আছে কিনা দেখছে। ছাড়া পশুকে খাঁচার দিকে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে বুঝতে পারলে সে যেভাবে তাকায় তেমনি চেয়ে আছে।

আর একজনের, বিশেষ করে, এই একজনের অনুভূতি-বিপর্যয় ঘটাতে হলে যতটা দরকার ততটাই ধীর শান্ত ধীরাপদ। বলল, আপনার মাথায় মস্ত মস্ত

গবেষণা ঘুরছে, কিন্তু আমি ওসব বুঝি না। আমি কাছের মানুষদের ভাল-মন্দ বুঝি শুধু। এদের মাথায় এই নিগ্রহের বোঝা চাপিয়ে আপনি যত বড় গবেষণাতেই মেতে থাকুন, আমি সেটা বড় করে দেখব না। এরকম হলে আপনি আমাকে শত্রু বলে জেনে রাখুন।

অমিতাভ বিড়বিড় করে বলল, থামুন—

ধীরাপদ নিষ্পলক চেয়ে আছে তেমনি, তার থামার সময় হয়নি এখনো। প্রতিক্রিয়া দেখছে।—পার্বতী ভিক্ষে চাইতে জানে না। জানলে এসব কথা আপনাকে আমার মুখ থেকে শুনতে হত না। আমি চারুদির কাছে শুনেছি। ছেলের জন্যেও সে আপনার কাছে ভিক্ষে চাইতে আসবে না, একটি কথাও বলবে না, মনে মনে আপনাকে শুধু ঘৃণা করে যাবে।

স্টপ্ ··

ধীরাপদর কানেও গেল না যেন, নির্মম বিশ্লেষণে মগ্ন সে।—হয়ত আপনার থেকেও বড সম্ভাবনা নিয়ে আসছে কেউ, কিন্তু আপনার হাত দিয়েই তার মূলে ঘা পডবে। এরপর তাকে জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু কেউ ভাববে না—পথে-ঘাটে এমন অনেক জঞ্জাল দেখে আমরা মুখ ফিরিয়ে নিই। আমার মতে এও হত্যাই। আপনারা বিজ্ঞানভক্ত, এর থেকে অনেক সহজ হত্যার রাস্তা আপনাদের জানা আছে। যে আসছে সে আসবে কি আসবে না আপনি ভাবুন এখন—

স্টপ্। স্টপ্। স্টপ্। উদ্‌ভ্রান্ত ক্ষিপ্ত আক্রোশে অমিতাভ তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল। যেভাবে চিৎকার করে উঠে এলো, আঘাত করে বসাও বিচিত্র ছিল না। চোখের আগুনে তাকে দগ্ধ করে দু হাতে অমিতাভ ঘোষ নিজের চুলের গোছাই টেনে ছেঁডার উপক্রম করল, তারপব মাতালের মত টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘর খোলা। দরজার আঙটায় তালাচাবি ঝুলছে। শয্যায় অত যত্নের গোপনীয় কাগজপত্র ছড়ানো।···ভালো নাটক হয়ে গেল। লোকটা অমিতাভ ঘোষ বলেই হল। এই রকমই হবে আশা ছিল ধীরাপদর। এই নাটকের জন্যেই অনেকদিন ধরে একটা নীরব প্রস্তুতি চলছিল। উঠে অ্যাটর্নির লেখা কাগজের গোছা আর অ্যালবামটা দেয়ালের কাছে খোলা সুটকেসের মধ্যে রাখল, তারপর দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো। রাতে এক সময় কেয়ার-টেক্ বাবুকে ডেকে চাবিটা তার জিম্মায় রাখল—অমিতবাবু এলেই ওটা যেন তাঁকে দিয়ে দেওয়া হয়।

। পঁচিশ ।

এতকালের মধ্যে চারুদি এই বাড়িতে কোনদিন ধীরাপদকে টেলিফোনে ডাকেন নি। গলা শুনেই বোঝা গেল তিনি বেশ ঘাবড়েছেন। সাড়া পেয়ে প্রথমেই অসহিষ্ণু বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাজকর্ম ছেড়ে চলে গেছলে নাকি কোথাও?

কাজকর্ম ছাড়ার খবর বা আবার ফেরার খবর কার মুখে শুনেছেন ধীরাপদ ফিরে আর সে প্রশ্ন করল না। শুধু জানালো, কোথাও যায়নি, তবে দিনকতক অফিসে অনুপস্থিত ছিল বটে।

চারুদিও আর এ প্রসঙ্গ তুললেন না। তাঁর গলার স্বরে উৎকণ্ঠা ঝরল।—কি ব্যাপার বলো তো, তুমি অমিতকে কিছু বলেছ নাকি? তার কি হয়েছে?

কি হয়েছে?

কানে রিসিভার ঠেকিয়ে শান্ত মুখে শুনল কি হয়েছে। গতকাল একটু বেশি রাতে অমিতাভ চারুদির বাড়ি গিয়েছিল। তার সে চেহারা দেখে চারুদি ভয়ই পেয়েছিলেন। একটা কথারও জবাব না দিয়ে সে অনেকক্ষণ পাগলের মত চেয়েছিল শুধু। তারপর বিড়বিড় করে জিজ্ঞাসা করেছে, পার্বতী কেমন আছে। চারুদি ভয় পেয়ে পার্বতীকে ডাকতে গিয়েছিলেন, অমিতাভ মাথা নেড়ে নিষেধ করেছে। তারপর হঠাৎ চারুদির কোলে মুখ গুজেছে। একটানা দু ঘণ্টা মুখ গুজে পড়েছিল, একটু নড়েচড়েনি পর্যন্ত। তারপর অত রাতে উঠে চলে গেছে, চারুদির ডাকাডাকিতে কান দেয়নি।

কি বলেছ তুমি ওকে? এই তো কদিন আগে তুমি অফিসে আসা ছেড়ে দিয়েছ বলে কত খুশিতে ছিল, তোমার সুখ্যাতি মুখে ধরে না—কি হল হঠাৎ? ওকে যে ডাক্তার দেখানো দরকার—

ধীরাপদ টেলিফোনে কিছু বলেনি, শুধু আশ্বাস দিয়েছে কোনো ভয় নেই। বলেছে যা হয়েছে ভালই হয়েছে—খুব ভালো হয়েছে। দু-একদিনের মধ্যেই দেখা করবে কথা দিয়ে তাড়াতাড়ি টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছে। চারুদিকে মিথ্যে আশ্বাস দেয়নি, সে নিজেই বিশ্বাস করতে চাইছে ভালো হয়েছে—খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু ভালো হওয়ার তুষ্টিটুকু কেন যে উপলব্ধি করছে না সেটাই আশ্চর্য।

কারখানায় কর্মচারীদের খুশির অভ্যর্থনায় ধীরাপদ রীতিমত বিব্রত বোধ

করল। তারা শুধু খুশি নয়, উত্তেজিতও। গত ক'টা দিনের বিচ্ছেদের ব্যাপারটা দশগুণ পল্লবিত হতে তাদের উত্তেজনা পুষ্ট করেছে। এ নিয়ে প্রকাশ্যে জটলা হয়েছে, প্রকাশ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছে। দল বেঁধে তাঁরা ছোট সাহেবের কাছে প্রাপ্য দাবি করেছে, আর জেনারেল সুপারভাইজারের কি হয়েছে জানতে চেয়েছে। ব্যাপারটা প্রতিদিন ঘোরালো হয়ে উঠছিল। ছোট সাহেব সেই চিরাচরিত বক্র রাস্তাটাই নিয়েছে, যা দিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করেছে। অন্যায় আচরণের জন্য অনেককে লিখিত ওয়ার্নিং দিয়েছে, তানিস সর্দার আর তিন-চারজন পাণ্ডাকে 'শো কজ' নোটিস দিয়েছে—শৃঙ্খলাভঙ্গ আর অন্যায় বিক্ষোভ সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত তারা, কেন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ দর্শাতে বলেছে।

ঘণ্টাখানেকের আগে ধীরাপদ নিচে থেকে দোতলায় উঠতে পারেনি। সব শুনে বিরক্ত হয়েছে, বিড়ম্বিত বোধ করেছে। ওপরে নিজের ঘরেও সুস্থির হয়ে বসতে পারেনি। প্রায় চুপিসাড়ে একের পর এক ভদ্রলোকেরাও এসে তার খবর করেছে, আনন্দ জ্ঞাপন করেছে। এমন একটা সরগরম ব্যাপার হয়ে উঠবে জানলে ধীরাপদ যাবার আগে ভাবত।

উঠে পাশের ঘরে এলো।

লাবণ্য আর সিতাংশু দুজনেই ঘরে ছিল। দুজনেই মুখ তুলল। কিন্তু সে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সিতাংশু গম্ভীর ব্যস্ততায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, কোনদিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজার আড়াল না হওয়া পর্যন্ত ধীরাপদ ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল তাকে। সিতাংশুর মুখখানা কঠিন বটে, কিন্তু শুকনোও। ধীরাপদর কেমন মনে হল, সেটা এখানকার এই ঝামেলার দরুন নয়। এখানকার ব্যাপারে ছোট সাহেব অনেকটাই বেপরোয়া আজকাল। এমন কি তার সঙ্গে একটা রূঢ় বোঝাপড়ায় এগিয়ে এলেও হয়ত খুব বিস্মিত হত না। তার বদলে এই আচরণ অপ্রত্যাশিত।

মনে হল তাকেও হয়ত কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে কারো কাছে। তাকেও লাগামের মুখে রেখে একজন কৈফিয়ৎ তলব করতে পারে। তার ঘরের একজন। আসল ঝামেলার উৎসটা হয়ত সেইখানেই।

দিব্বি সহজ ভাবে লাবণ্যর সামনের চেয়ারটা টেনে বসল। সোজাসুজি দৃষ্টি বিনিময়। বলল, কাল বড় সাহেবের চিঠি পেলাম। আপনারা ঠিকমত আমার সহযোগিতা পাচ্ছেন না জেনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, বেশ ক্ষুণ্ণ হয়ে লিখেছেন।

একটু অবাক হয়েই লাবণ্য বলে বসল, এখানকার ব্যাপার তো তাঁকে কিছু

জানানো হয়নি।

এখানকার কোন্ ব্যাপার?

লাবণ্য থমকালো। তারপর অনেকটা নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে জিজ্ঞাসা করল, আপনার এভাবে চলে যাবার মত কোনো কারণ ঘটেছিল? বড় সাহেব ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলত না?

চলত যে সেদিন সেটা আপনারা বুঝতে দেননি। তবে আমি তাঁর ফেরার অপেক্ষাতেই ছিলাম।

আর ইতিমধ্যে একটু-আধটু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হোক সেরকম ইচ্ছেও ছিল বোধ হয়?

ধীরাপদ হাল্কা জবাব দিল, এটুকু আপনাদের হাতযশ। আপনি আমার খোঁজে সুলতান কুঠিতে গেছলেন শুনলাম, সোনাবউদি জানালেন, এখানে আসার জন্যেও বিশেষ করে বলে এসেছেন। সেই জন্যেই এলাম···কিন্তু আমি এলে আপনাদের অসুবিধে ছাড়া সুবিধে তো কিছু দেখি না।

লাবণ্য চেয়ে আছে, মুখের রুক্ষ ছায়া স্পষ্টতর। চোখে চোখ রেখে কথা কইতে এখন আর একটুও সঙ্কোচ নেই ধীরাপদর। কিন্তু সঙ্কোচ না থাকলেও অন্য বিড়ম্বনা আছে। উষ্ণ, রমণীয় বিড়ম্বনা। তাই ওঠা দরকার এবার।

এদিকে যে সব ওয়ার্নিং আর নোটিস-টোটিস দিয়েছেন সেগুলো তুলে নিন, তারপর দেখা যাক।

ঈষৎ রূঢ়কণ্ঠে লাবণ্য বলে উঠল, নোটিস আমি দিইনি—

ধীরাপদ উঠে দাঁড়িয়েছে। লঘু কৌতুকে একটু চেয়ে থেকে বলল, তাহলে যিনি দিয়েছেন তাঁকেই তুলে নিতে বলুন। আমাকে দেখেই তো তিনি উঠে গেলেন, বাক্যালাপেও আপত্তি মনে হল—আমার হয়ে আপনিই তাঁকে এই অনুরোধটা করুন। কর্মচারীরা কর্মচারীই বটে, কিন্তু সব সময়ে ছড়ি উঁচিয়ে সেটা মনে রাখতে বললে তাদের ভালো লাগার কথা নয়।

বচনের ফলাফল দেখার জন্য আর অপেক্ষা না করে নিজের ঘরে চলে এলো। কটা দিনের দুর্বহ নিষ্ক্রিয়তা থেকে নিজেকে টেনে তোলার জন্যই একাগ্রভাবে কাজের মধ্যে ডুব দিল। কিন্তু মনে মনে একজনের প্রতীক্ষা করছে সে। অমিতাভ ঘোষের। ইতিমধ্যে দিন দুই সে অফিসে এসেছে টের পেয়েছে। অ্যাকাউন্টেন্ট বলেছেন। নইলে জানতেও পারত না। ধীরাপদর সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার। কেন দেখা হওয়া দরকার জানে না। দেখা হলে কি বলবে তাও না। ভিতরে সারাক্ষণ একটা অস্বস্তি, দেখা না হওয়া পর্যন্ত সেটা যাবে না।

অমিতাভ বেশি রাতে বাড়ি ফিরলেও ধীরাপদ টের পায়। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তখন সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না। চারুদির টেলিফোনের কথা ভেবে উতলা বোধ করে। তবু না। সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত দরজা বন্ধ থাকে, তখন ইচ্ছে করলে দরজা ঠেলে ঢুকতে পারে। তাও হয় না। অনুকূল অবকাশ মনে হয় না সেটা।

কিন্তু অবকাশ আর হলই না। আচমকা ঝড় এলো একটা। এত বড় ব্যবসায়ের অস্তিত্ব বিড়ম্বিত হবার মত ঝড়। সে ঝড়ের ইন্ধন এলো বাইরে থেকে, যার জন্য একটি প্রাণীও প্রস্তুত ছিল না। এমন কি অমিতাভ ঘোষও না।

খবরের কাগজে সেদিন একটা ছোট্ট খবর চোখে পড়ল ধীরাপদর। না পড়তেও পারত। সাধারণের লক্ষ্য করার মত খবর কিছু নয়। এই ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে সেও লক্ষ্য করত না। জাপান থেকে নতুন ওষুধ বেরিয়েছে একটা—ছোটখাটো আবিষ্কারই বলা যেতে পারে। চিলেটেড আয়রন ইনট্রামাস-কুলার ইন্‌জেক্‌শান—নানাজাতীয় রক্তাল্পতার ব্যাধিতে এই আবিষ্কার বিশেষ ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা।

ধীরাপদ চমকে উঠেছিল। অমিতাভ ঘোষ আজ ক'বছর ধরে কি নিয়ে গবেষণা-মগ্ন? কি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল সে? কি জন্যে গবেষণা বিভাগ খোলার এত তাগিদ ছিল তার? এই রকমই তো কি একটা শুনেছিল। এই ব্যাপারই তো। তাড়াতাড়ি অফিসে এসে তিন দিন আগের সাপ্তাহিক মেডিক্যাল জার্নাল খুলেছে। তার পরেই চক্ষুস্থির তার। ও কাগজের কাছে খবরটা ছোট নয়। তারা ওই আবিষ্কার সম্বন্ধে ফলাও করে লিখেছে। ওই ব্যাপারই যে, ধীরাপদর আর একটুও সন্দেহ নেই।

হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত ভয়ে আড়ষ্ট সে। মনে পড়ল গত তিন দিন ধরে বেশি রাতেও অমিতাভর বাড়ি ফেরার সাড়াশব্দ পায়নি। এখন মনে হচ্ছে, সে বাড়ি ফেরেই নি মোটে। আরো দু দিন মুখ বুজে অপেক্ষা করল, মাঝরাত পর্যন্ত কান খাড়া করে কাটালো। যত রাতেই ফিরুক সামনে গিয়ে দাঁড়াবে।

ফেরেনি।

ধীরাপদ চারুদিকে টেলিফোন করল। তিনি উতলা না হন এইভাবেই কথা কইল। তার না যেতে পারার ব্যাপারে অনেকগুলো কৈফিয়ৎ খাড়া করল প্রথম, এমন কি নিজের সুস্থ শরীরকে অসুস্থ বানালো। চারুদি চুপচাপ শুনলেন শুধু, একবারও অনুযোগ করলেন না বা আসার তাগিদ দিলেন না। শেষে ধীরাপদ অমিতাভর কথা জিজ্ঞাসা করল—ক'দিন বাড়িতে দেখা নেই, তার,কি খবর?

জাকরি কিন্তু জবাব দিলেন, জানেন না। ইতিমধ্যে সেখানেও সে যায়নি।

আরো কয়েকটা দিন গেল। ধীরাপদ ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠেছে। শেষে আর থাকতে না পেরে সিতাংশুর অনুপস্থিতিতে জার্নাল খুলে জাপানের নয়া ওষুধের বিবরণ লাবণ্যকে দেখালো সে। ডাক্তার হিসেবে তারই আগে দেখার কথা, কিন্তু দেখেনি।

দেখা মাত্র মুখ শুকোলো তারও। বিগত ক'টা দিনের ব্যক্তিগত সমাচারও শুনল। লাবণ্য নির্বাক।

তারপর ঝড়।

সেই ঝড়ের ধাক্কায় ছোট সাহেব সিতাংশু মিত্রের স্থির গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে গেছে। ক্ষিপ্ত দিশাহারা হয়ে উঠেছে সে। মুহুর্মুহু ডাক পড়ছে ধীরাপদর, কখনো বা নিজেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। দিশাহারা ধীরাপদ আর লাবণ্য সরকারও।

পর পর দুটো সমন এসেছে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নামে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের প্রতিনিধি হিসেবে সিতাংশু সেই সমন গ্রহণ করেছে। একটা হাইকোর্ট থেকে, অন্যটি ফৌজদারী আদালত থেকে। আরজির নকলসহ সমন। অভিযোগের দীর্ঘ জোরালো তালিকা। তহবিল তছরুপ, তহবিল অপচয়, প্রবঞ্চনা, জাল কর্মচারী নিয়োগ, ব্যক্তিগত প্রচারের খাতে অপব্যয়, লাবণ্য সরকারের ফ্রী কোয়ার্টারের খাতে অর্থব্যয় এবং সেখানকার বেড-এ বিনামূল্যে কোম্পানীর ওষুধ চালানো, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইচ্ছাকৃত ও স্বার্থপ্রণোদিত পরিচালনার গলদ ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাইকোর্টে অমিতাভ ঘোষ ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের অপসারণ দাবি করেছে, এবং যতদিন তা না হয় ততদিনের জন্য অচিরে রিসিভার নিয়োগের আবেদন জানিয়েছে। আর ফৌজদারী আদালতে ফৌজদারী মামলা রুজু করেছে।

পরদিন সকালেই লাবণ্যর দাদা বিভূতি সরকারের সপ্তাহের খবরে জোর খবর, গরম খবর, বিষম খবর।

বিজ্ঞাপন বাদ দিলে কাগজের সবটাই প্রায় এই খবর। সপ্তাহের খবর কোম্পানীর গোড়া ধরে টান দিয়েছে! কার টাকায় ব্যবসায়ের পত্তন হয়েছিল প্রথম, আর সেই লোকেরই কি অবস্থা এখন, কেসের বিস্তৃত সমাচার, কত ভাবে টাকা অপচয় হয়, প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কর্মচারীদের বঞ্চিত ভাগ্য, বড় সাহেবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তাঁর বর্তমান সফরের উদ্দেশ্য, অস্তিত্বশূন্য কর্মচারীর ফিরিস্তি—ইত্যাদির পরে নতুন লট-এর সঙ্গে মিয়াদ-ফুরনো পুরনো ওষুধ বিক্রির রহস্য।

ছোট বক্স হয়ফে শুধু সংবাদ পরিবেশন করেনি, রঙ্গ-ব্যঙ্গ করে টিকা-টিপ্পনীসহ ঝাঁজালো সম্পাদকীয় মন্তব্যও লেখা হয়েছে এই নিয়ে।

ঝড়ের ঝাপ্টায় সমস্ত কারখানায় মৃত্যুর স্তব্ধতা। বড় সাহেবের কাছে জরুরী তার পাঠানো হয়েছে, সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি যেন রওনা হন। সিতাংশু বারকতক ট্রাঙ্ককলেও ধরতে চেষ্টা করেছে তাঁকে কিন্তু তিনি এক জায়গায় বসে নেই বলেই ধরা যায়নি। টেলিগ্রামও চট্ করে পাবেন কিনা সন্দেহ।

এদিকে লাবণ্য স্তব্ধ সব থেকে বেশি। ধীরাপদ তার কারণও অনুমান করতে পারে। বিভূতি সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের যোগটা ভুলবে কেমন করে? ধীরাপদ সেইদিনই বিভূতি সরকারের বাড়ি অর্থাৎ তাঁর সাপ্তাহিক খবরের অফিসে এসেছিল। দু-একজন কম্পোজিটারের সঙ্গে শুধু দেখা হয়েছে, তাঁর ঘর বন্ধ। খবর পেয়েছে দিনকয়েকের জন্য বাইরে গেছেন তিনি। ধীরাপদ ফিরে এসেছে।...যেতেও পারে বাইরে, অনেক টাকা পকেটে এলে তবে এর মধ্যে নাক গলানো সম্ভব। এই কাগজ সম্বন্ধে বা কাগজের খবর সম্বন্ধে লাবণ্য একেবারে নির্বাক। ধীরাপদর ধারণা সেও দাদার খোঁজে এসেছিল আর একই অনুপস্থিতির সংবাদ নিয়ে ফিরে গেছে।

কিন্তু ধীরাপদ আর একটা ভয়ে বিভ্রান্ত। শুধু টাকার লোভে বিভূতি সরকারের অতটা দুঃসাহসিক ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়া সম্ভব কিনা বুঝছে না। হাতেনাতে প্রমাণ না দেখে তিনি কিছু করেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু অমিতাভ ঘোষ কতটা প্রমাণ হাতছাড়া করেছে? কি হাতছাড়া করেছে?

রাত একটা-দেড়টার কম নয় তখন। বহুবার এপাশ ওপাশ করার পর সবে একটু তন্দ্রার ঘোর এসেছে। পার্টিশনের ওধারে মানকের নাকের খেলা তেমন করে আর কানের পর্দায় ঘা দিচ্ছে না। হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠে ধীরাপদ এপাশ ফিরল, তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

ধীরুবাবু! ধীরুবাবু—

আব্ছা অন্ধকারে ধীরাপদ দু চোখ টান করে তাকালো। সামনে অমিতাভ ঘোষ। অস্ফুট স্বরে হেসে উঠল সে, চাপা গলায় বলল, এরই মধ্যে ঘুমুলেন নাকি?

হাত বাড়িয়ে ধীরাপদ টেবিল ল্যাম্পের সুইচ টিপতে যাচ্ছিল, বাধা দিল। —থাক, আলো জালতে হবে না, আপনাকে ডাকতে এলাম, আমার ঘরে আসুন।

ধীরাপদ তক্ষুনি বিছানা থেকে নেমে এলো। আশ্চর্য, কখন ফিরেছে! সারাক্ষণ তো জেগেই ছিল, কিন্তু টের পায়নি। অথচ ফিরলে সাধারণত টের পায়। অবশ্য আজ আসবে একবারও ভাবেনি। এই বাড়িতেই আর তার দেখা মিলবে কিনা সে রকম সন্দেহও হয়েছিল।

—বসুন। নিজে অগোছালো শয্যায় বসল। হাসছে। উদ্‌ভ্রান্ত, স্নায়ু-সর্বস্ব হাসি। হাসির সঙ্গে চাপা উত্তেজনা।—মজাটা কেমন দেখছেন বলুন?

ভালো।

ভালো, না? প্রতিভা ছিল কিনা টের পাচ্ছে এখন সব, কেমন? এখন ওরা কি করবে? বিদেশের বার-করা ওষুধ বেচে কমিশন লাভ করবে, এই তো? করাচ্ছি লাভ, সব তছনছ করে না দিতে পারি তো—। হেসে উঠল, হাঁ করে দেখছেন কী?

ধীরাপদ সত্যিই দেখছে আর বিপন্ন বোধ করছে। চারুদি অত্যুক্তি করেন নি, সত্যিই চিকিৎসা দরকার। এই মুখ এই নাক-চোখ দিয়ে আলগা রক্ত ছোটাও বিচিত্র নয় বুঝি। কিন্তু সে তো পরের কথা, এখন একে প্রকৃতিস্থ করতে হলে সহজ কথায় হবে না, নাটকীয় কিছুই বলা দরকার। কি বলবে?

বলল, প্রতিভার শেষ ফল দেখছি।

জলজলে চোখ দুটো মুখের ওপর থমকালো, কি রকম?

এ যুগের সব প্রতিভারই শেষ ফল তো ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বিনাশ—

ডোণ্ট টক্‌ রট্‌! চেঁচিয়েই উঠল প্রায়, আমি আপনার বক্তৃতা শুনতে চাই না! বিশ্বাসের গোড়াতেই ঘা পড়েছে যেন, সমস্ত মুখে সংশয় উপচে উঠল। আমি যা করেছি আপনার তাহলে সেটা পছন্দ নয়?

এ রাস্তায় হবে না বুঝে ধীরাপদ সুর বদলে ফেলল।—আমার পছন্দ অপছন্দর কথা হচ্ছে না, আপনি কথা দিয়েছিলেন কিছু করার আগে আমাকে জানাবেন, এখন দেখছি আপনি আমাকেও বিশ্বাস করেন না।

জালা গেল, যাতনাও কমল। ওই মুখেই আবার হাসির আভাস জাগতে সময় লাগল না। আগের উত্তেজনার মধ্যেই ফিরে আসছে আবার। বলল, আপনি আচ্ছা ছেলেমানুষ···বিদেশ থেকে ওই ওষুধের খবর পড়ে আমার মাথার ঠিক ছিল ভেবেছেন? তা ছাড়া কত কাণ্ড করতে হল এর মধ্যে যদি জানতেন, অ্যাটর্নি বলেছে, আপনি যে দুটো পয়েন্ট মনে করিয়ে দিয়েছেন বড় মোক্ষম পয়েন্ট সে দুটো।

আগের মতই হেসে উঠল সে। ধীরাপদ বাইরে শান্ত, কিন্তু মস্তিষ্ক দ্রুত

কাজ করে চলেছে। জিজ্ঞাসা করল, বিভূতি সরকারের কাগজে তো চালা খবর বেরিয়েছে দেখলাম, আপনার সেই সব কাগজপত্র আর অ্যালবামটাও এখন তাঁর হাতেই বোধ হয়?

অমিতাভ প্রায় অবাক, নির্বোধের কথা শুনছে যেন। আবার আনন্দও হচ্ছে।—এই বুদ্ধি আপনার···এই জন্যেই বুঝি ঘাবড়েছেন? মশাই টাকায় সব হয় আজকাল, বুঝলেন? সব হয়—তাকে শুধু কাগজপত্রগুলো দেখিয়েছি সব, আর কয়করে তিন হাজার টাকার নোট নাকের ডগায় ছুলিয়েছি, তাতেই কাজ হয়েছে। চালিয়ে গেলে পরে আরো দু হাজার দেব বলেছি। তিনি সব নোট্ করে নিয়েছেন, ছবির কপি চেয়েছিলেন তাও দিইনি—অবিশ্বাস করবে কেন, তার পিছনে তো দাঁড়াবই জানে—হাইকোর্ট আর ক্রিমিন্যাল কোর্টের নকল দেখেছে না?

ধীরাপদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। চেষ্টা করে আবারও অন্তরঙ্গ হৃদ্যতায় ছেলেমানুষি উপদেশ দিল, কোনো ডকুমেণ্ট হাতছাড়া করবেন না, অ্যাটর্নির কাছেও নয়।

অমিতাভ হাসছে। উত্তেজনায় ভরপুর আত্মতুষ্টির হাসি। বলল, মশাই অ্যাটর্নিও মানুষ, নাকের ডগায় টাকা দোলালে তারও মাথা বিগড়োতে পারে সে জ্ঞান আমার আছে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

নিশ্চিন্ত থাকা সহজ নয় যেন, একটু ইতস্তত করে ধীরাপদ বলল, কিন্তু যে ব্যাপারে নামছেন সেটা তো দু-পাঁচ হাজারের ব্যাপার নয়, টাকা তো অনেক ছড়াতে হবে।

কত? এক লক্ষ? দেড লক্ষ? আমার টাকা নেই ভাবেন নাকি? আমি শেষ দেখব, বুঝলেন?

ধীরাপদ বুঝেছে। এই মুহূর্তে অন্তত বেসুরো একটা কথা বলাও ঠিক হবে না, এতটুকু বিপরীত আঁচ সহ্য হবে না। বরং অন্য কিছু বলা দরকার, খুব অন্তরঙ্গ কিছু। এইভাবে একটানা স্নায়ুর নিষ্পেষণ চললে শেষ দেখার অনেক আগে নিজেকেই নিঃশেষ করবে লোকটা।

খানিক চুপ করে থেকে খুব শান্ত মুখে বলল, আমার একটা কথা শুনবেন?

জ্বলজ্বলে দৃষ্টিটা থমকালো একটু, জবাব দিল না। জিজ্ঞাসু প্রতীক্ষা।

তার আগে একটা কথা, আমাকে আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন!

কি বলবেন বলুন?

সত্যিই বিশ্বাস করেন, নাকি নাকের ডগায় টাকা দোলালে আমিও উল্টো

রাস্তায় চলতে পারি মনে করেন ?

চকিত অবিশ্বাসের ছায়াই দেখা দিল মুখে, তপ্ত বিরক্তিতে বলে উঠল, এসব কথা উঠছে কেন, কি বলবেন বলুন না ?

সাধারণ কথা ক'টা যাতে খুব সাধারণ না শোনায়, ধীরাপদ সেই জন্যেই সময় নিল আরো একটু। তারপর অন্তরঙ্গ সুরে বলল, এই সব ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে আপনি দিনকতক সময়মত খাওয়া-দাওয়া করুন, সময় মত ঘুমোন। আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেছেন এর মধ্যে ?

এই সামান্য ক'টা কথা এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছুবে ধীরাপদও আশা করেনি। এক মুহূর্তে সব অবিশ্বাস সব সংশয় কেটে গেল যেন, শিশুর অসহায় যাতনা ফুটে উঠল মুখে। একটা উদ্গত অনুভূতি সামলে উঠতে চেষ্টা করেও পারল না, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ধীরাপদর দুটো হাত আঁকড়ে ধরল। অস্ফুট ত্রাস—ধীরুবাবু, আপনি ঠিক বলেছেন! আমি খেতে পারি না, ঘুমুতে পারি না, সব সময় কি জানি কি ভয়—এ আমার কি হল ধীরুবাবু ?

মর্মছেঁড়া অদ্ভুত কথা, অদ্ভুত ব্যাকুলতা! আর কারো মুখে শুনলে বুকের ভিতরটা এমন মোচড় দিয়ে উঠত কিনা বলা যায় না। কয়েক মুহূর্ত ধীরাপদও অসহায় বোধ করল। তারপর কি ভেবে পরামর্শ দিল, দিনকতক না হয় আপনার মাসির কাছে গিয়ে থাকুন না ?

মাথা নাড়ল, তাও পারবে না। বলল, এই ব্যবসায়ে মাসির স্বার্থও তো কম নয়, তার স্বার্থেও তো ঘা পড়েছে, এখন আর মাসিই বা আমাকে আগের মত দেখবে কেন ? উত্তেজনা বাড়ল, তা ছাড়া আমি সেখানে যাই কি করে এখন, তারা তো আমাকে শত্রু ভাবছে !

তারা বলতে আর কে ধীরাপদ বুঝেছে। পার্বতী। শান্ত গলায় বলল, ভাবছে না।

আবারও সেই আগ্রহ, সামনে ঝুঁকে এলো। আপনি কি করে জানলেন ?

আমি জানি। সেখানে কেন, এখানেও আপনার কোনো ভয় নেই।

নেই—না ? আমিও জানি, কেউ আমার কোনো ক্ষতি করবে না জানি, ক্ষতি করতে পারবে না। তবু এ রকম হচ্ছে কেন ? সর্বক্ষণ এ কিসের ভয়

ধীরাপদ তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, তখনকার মত ঠাণ্ডা করে নিজের ঘরে চলে এসেছে। কিন্তু মনে যা হয়েছে সে কথাটা বলতে পারেনি। জবাব দিতে পারেনি কিসের ভয়, কেন ভয়।...ভয় তার নিজেকেই। অন্তস্তলে ধ্বংসের বীজ বুনেছে।

সেখানে ধ্বংসের ছায়া পড়েছে। যে মানুষ শুধু সৃষ্টির স্বপ্নে সৃষ্টির তন্ময়তায় বিভোর—ওই বীজ পুষ্ট হলে আর ওই ছায়া ঘোরালো হলে অন্তরতম সত্তা কেঁপে উঠবে না তো কী? বক্ষ ভেদ করে যে হাউইয়ের আগুন ছুটিয়েছে, এ পর্যন্ত সেটা তো শুধু তার নিজের বুকেই ফিরে এসেছে।

আশার কথা, লোকটা আজ এই প্রথম অসহায় শিশুর মতই একান্তভাবে বিশ্বাস করেছে তাকে, তার ওপর নির্ভর করেছে। কিন্তু ধীরাপদ কি করবে, কি তার করার আছে ভেবে পাচ্ছে না। আর ভাবতেও পারছে না সে।...আজ থাক্, পরে চিন্তা করবে। পরে ভাববে।

পরে ভাবার অবকাশ হল না। বিচারে গণুদার জেল হয়েছে।

দলবলসহ একাদশী শিকদারের ছেলের জেল হয়েছে—কারো দশ বছর কারো আট বছর। গণুদা নতুন আসামী, নতুন হাতেখড়ি, তার জেল হয়েছে চার বছর। সশ্রম কারাদণ্ড।

রায় যেদিন বেরুবে সেদিন ধীরাপদ কোর্টে উপস্থিত ছিল। আর সেই একদিন সোনবউদিও। বিচারক রায় দিলেন। গণুদা শুনল, সোনাবউদি শুনল, ধীরাপদ শুনল। ধীরাপদ শুধু শুনল না, দেখলও। বিচারক রায় ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস আসামীদের ভার নেবে। তাই নিল। পুলিসের সঙ্গে গণুদা চলে গেল। কিন্তু যাবার আগে গণুদা কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র থমকে দাঁড়িয়েছিল।

সেই ক'টা মুহূর্ত ধীরাপদ ভুলবে না।

গণুদা দাঁড়িয়েছিল। মুখ তুলে সোনাবউদিকে দেখেছিল। সেই মুখে শুধু নির্বাক বিস্ময়। জীবনে সেই একটা মুহূর্তই যেন সে স্ত্রীকে দেখে গেছে—দেখে গেছে কিন্তু বোঝেনি। আর সোনাবউদিও তেমনি করেই তাকিয়েছে তার দিকে। রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, স্নিগ্ধ নীরব দুই চোখে শুধু যেন বলতে চেয়েছে, যেটুকু হওয়া প্রয়োজন ছিল সেইটুকুই হয়েছে। যাও, ঘুরে এসো।

বিস্ময় শুধু গণুদার নয়, ধীরাপদরও। হয়ত বিচারের ফল এই হত, হয়ত সোনাবউদির বিবৃতিতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু অনুভূতির রাজ্যে তার প্রতিক্রিয়া অন্যরকম। সোনাবউদি পুলিসের কাছে যে এজাহার দিয়েছিল পরেও তা অস্বীকার করেনি। বিচারক তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সোনাবউদি চুপ করে ছিল। সেই নীরবতা স্বীকৃতির সামিল। তাই শুধু গণুদার নয়, ধীরাপদরও কেমন মনে হয়েছে, সোনাবউদি গণুদাকে শাস্তির মুখে ঠেলে না দিক্, তাকে রক্ষাও করতে চায়নি।

...এই কারণেই গণুদার এই বিস্ময় আর এই চাউনি।

সোনাবউদিকে নিয়ে ধীরাপদ সুলতান কুঠিতে ফিরল। ট্যাক্সিতে একটি কথাও হয়নি। সমস্তক্ষণ সোনাবউদি রাস্তার দিকেই চেয়েছিল। সুলতান কুঠিতে ফিরে পাশের খুপরি ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। সেখানেই চুপচাপ বসে আছে। বড় ঘরে উমা নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, ছেলে দুটো সঠিক বোঝেওনি কি হয়েছে।

সন্ধ্যের আগে একবার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল ধীরাপদ। কিন্তু সেখানেও ধাক্কা খেয়েছে একটা। দূরে, ঘরের ভিতর থেকে গলা বার করে দাঁড়িয়ে আছেন একাদশী শিকদার। এতদিনের মধ্যে ধীরাপদ এই আবার দেখল তাঁকে। কিন্তু না দেখলেই ভালো ছিল। শেষ খবরটা পাবার আশাতেই ওভাবে দাঁড়িয়ে আছেন হয়ত। অভিশাপ বহনের দৃশ্যটি সুসম্পূর্ণ, ধীরাপদ চোখ ফিরিয়ে নিল। মনে হল মুমূর্ষু নিষ্প্রভ ঘোলাটে দুই চোখের মিনতি তাকে টানছে। অথচ সত্যিই তিনি ডাকছেন না। ধীরাপদ কি করবে? কাছে গিয়ে খবরটা দেবে?...থাক্, খবর জানতেই পারবেন একসময়ে।

ভিতরে চলে এলো। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়েছে। সুলতান কুঠির রাত গাঢ় হতে সময় লাগে না। সোনাবউদি সেই খুপরি ঘরেই বসে। আর খানিক বাদে ছেলেমেয়ে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে হয়ত। এর পরের ব্যবস্থা-প্রসঙ্গে সোনাবউদির সঙ্গে খোলাখুলি কিছু কথা হওয়া দরকার। অবশ্য তাড়া নেই, কথা দু দিন বাদে হলেও চলবে। কিন্তু আজকের এই স্তব্ধতা খুব স্বাভাবিক লাগছে না, সোনাবউদি কি আশা করেছিল গণুদা ছাড়া পাবে? একবারও তা মনে হল না, আশা করলে নিজের বিবৃতি অস্বীকার করত। করেনি যে সেই অনুতাপ?

পায়ে পায়ে ধীরাপদ খুপরি ঘরে ঢুকল। চৌকিতে সোনাবউদি মূর্তির মত বসে। কোনরকম অনুতাপ বা অনুভূতির চিহ্নমাত্র নেই। ধীরাপদ কাছে এসে দাঁড়াল, একেবারে চৌকির সামনে। সোনাবউদি তাকাল তার দিকে, দেখল। কিন্তু যে দেখল সে যেন ওই মূর্তির মধ্যে উপস্থিত নেই, চেতনার অন্য কোনো প্রান্তের অনেক দূরের কিছুতে তন্ময়। অথচ তখনো ধীরাপদর দিকেই চেয়ে আছে তাকেই দেখছে।

আর ভেবে কি করবেন, উঠুন—

অনুচ্চ, সামান্য ক'টা কথার শব্দতরঙ্গের মধ্যে এমন কিছু সান্ত্বনাও ছিল না, আশ্বাসও না। কিন্তু সোনাবউদির যেন দিশা ফিরল আস্তে আস্তে, নিজের মধ্যে ফিরে এলো। দৃষ্টি বদলালো, জীবনের বিষম কোনো মুহূর্তে হঠাৎ সব থেকে

প্রয়োজনের মানুষকে একেবারে নাগালের মধ্যে পেলে যেমন হয়, সোনাবউদির চোখে সেই আলো সেই আগ্রহ। দু হাত বাড়িয়ে ধীরাপদর হাত দুটো ধরল, সর্বাঙ্গে চকিত শিহরণ একটু। আয়ত পক্ষ্মরেখায় জলের আভাস, কিন্তু জল নেই। ধীরাপদ চেয়ে আছে, স্বচ্ছ দুটি কালো তারায় গভীরে তার দৃষ্টিটা যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

অস্ফুট স্বরে, প্রায় ফিস ফিস করে, সোনাবউদি বলল, কি হবে ধীরুবাবু, এর পর কী হবে ?

অনাগত দিনের বার্তা কি ধীরাপদর মুখেই লেখা আছে ? দু হাতের মুঠোয় সোনাবউদি তার হাত দুটো আরো একটু জোরে আঁকড়ে ধরল। এই মুখ এই চোখ এই আকুলতা ধীরাপদ আর কি কখনো দেখেছে ? সোনাবউদিকে নিশ্চিন্ত করার জন্য হঠাৎ কত কথার ঢেউ তোলপাড় করে ঠেলে উঠতে চাইছে বুকের তলা থেকে। কিন্তু মুখ দিয়ে বেরুলো শুধু দুটি কথা, যে কথা অনেকদিন ধীরাপদ বলতে চেয়েছে, অনেকদিন মনে মনে বলেছে।

বলল, আমি তো আছি। ভয় কি...

সঙ্গে সঙ্গে কি হয়ে গেল। হাতের স্পর্শ থেকে মনে হল সোনাবউদির সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কেঁপে উঠল একবার। মনে হল, সেই কাঁপুনি দুই ঠোঁটের ফাঁকে এসে ভাঙতে চাইল। মনে হল, আয়ত পক্ষ্মরেখার ওধারে কালো তারায় অতল থেকে চকিত ঢেউ উঠল একটা। তারপরেই এক নিবিড় আকর্ষণে ধীরাপদ বসে পড়ল, তারপর কোথায় হারিয়ে যেতে লাগল জানে না। সোনাবউদি বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে তাকে, দুই ব্যগ্র বাহু আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে তাকে। বিহ্বল আবেগে তার গালের ওপর নিজের গাল দুটো ঘষছে। একটা হাত তার ঘাড়ে মাথায় চুলের ঝাঁকড়ায় সমস্ত মুখের ওপর বিচরণ করে বেড়াল কয়েক মুহূর্ত, বিড়বিড় করে বলে গেল, আমি জানি, আমি জানি, না জানলে এত পারি কোন্ ভরসায়...। ছোট ছেলের মতই তার মাথাটা সবলে টেনে এনে নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রাখল, কপালের ওপর গাল রেখে শেষবারের মতই বুকের মধ্যে আর দুই হাতের নিবিড়তার মধ্যে আঁকড়ে ধরে থাকল তাকে।

ঘরের দরজাটা খোলা।

বাঁধন ঢিলে হল একসময়। ছেড়ে দিল। উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দেখল দু-এক পলক। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল।

ধীরাপদ বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত। নিস্পন্দ, কাঠ। একটা স্পর্শের শিহরণ লাগছে এক-একবার, সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে। অনেকক্ষণ বাদে সম্বিত ফিরল, সাড়

ফিরল। উঠে এই খুপরি ঘর থেকে—এই সুলতান কুঠি থেকেই ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। আর কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তার হাতে পায়ে কেমন করে যেন শেকল পড়ে গেছে। তার নড়াচড়ার উপায় নেই, একজনের ইচ্ছে ভিন্ন এই ঘর ছেড়ে তার কোথাও যাবার শক্তি নেই।

রাত বাড়ছে। ওধার থেকে রান্নার টুকটাক আওয়াজ আসছিল কানে, সেটা আর শোনা যাচ্ছে না। খুব সংক্ষেপেই রান্না সেরেছে মনে হয়।...উমা আর ছেলে দুটোর খাওয়া হয়ে গেল বোধ হয়। এবারে তার ডাক পড়বে। সে খেয়ে নেবে। তারপর...তারপর কি হবে?

ডাক পড়ল না। তার খাবার নিয়ে সোনাবউদি এ ঘরেই এলো। এক হাতে মেঝেতে জল ছিটিয়ে জায়গা মুছে থালাটা রাখল। একটা আসন পেতে দিল। ধীরাপদ অবাক হয়ে দেখছে। এমন শান্ত সুন্দর আর বোধ হয় সোনা-বউদিকে কোনদিন দেখেনি। চোখ ফেরানো যায় না এখন, অথচ এই মুহূর্তেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবার ইচ্ছেটা আরো বেশি অনুভব করছে।

জলের গেলাস রেখে সোনাবউদি তাকালো তার দিকে। যন্ত্রচালিতের মত উঠে এসে ধীরাপদ খেতে বসল। মাথা গোঁজ করে খেতে লাগল। পলকের দেখা সোনাবউদির ওই চাউনিটুকু বুকের তলায় নড়াচড়া করছে। ঠিক এমনি স্নিগ্ধ নীরব দৃষ্টি আজই যেন কোথায় দেখেছে। কোর্টে দেখেছে। সোনাবউদি যখন গণুদার দিকে চেয়েছিল, তখন।

কিন্তু খাওয়া তো হয়ে গেল। আর একটু বাদেই সুলতান কুঠির রাত নিঝুম হবে।...তারপর কি হবে?

মুখ তুলল একবার। সোনাবউদি অদূরে বসে। নিষ্পলক চেয়ে আছে। দেখছে তাকে। ধীরাপদ তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। সোনাবউদির চোখে-মুখে একটুও অস্বস্তির ছায়া নেই, কোনো উত্তেজনার রেখামাত্র নেই। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাসের মত দেখল। কালো তারায় শুধু মমতার ধারা দেখল যেন।

উঠুন। আপনার অনেক রাত হয়ে গেছে আজ।

গোড়ার ওই রাতটুকু কি স্বপ্ন? ধীরাপদ স্বপ্ন দেখেছিল? আবারও মুখ তুলল, তারপর চেয়েই রইল।

এত রাতে আর ট্রাম-বাসের জন্য অপেক্ষা করবেন না, একটা গাড়ি ধরে নিয়ে চলে যান।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেও ভুল হয়ে গেল ধীরাপদর। চেয়ে আছে, আর

মনে হচ্ছে এতক্ষণের শিকলটা বুঝি ভেঙে ভেঙে মিলিয়ে যাচ্ছে।

শান্তমৃদু স্বরে সোনাবউদি বলল, আপনি আছেন আমার আর ভয়-ভাবনা নেই। তবু মন অবুঝ হলে এক কথাই ঘুরে ফিরে বলি।···ডাকলে আপনাকে পাবো তো?

এই মুহূর্তে আবার ধীরাপদর বলতে ইচ্ছে করছিল, না ডাকলেও পাবেন। বলা গেল না। মাথা নাড়ল শুধু।

মুখের দিকে চেয়েই সোনাবউদি ভাবল কী, হাসলও একটু। এই হাসি-টুকুরও যেন তুলনা নেই। বলল, শিগ্‌গীরই ডাকব কিন্তু···। আচ্ছা রাত হল, উঠুন এখন—

পর পর তিন-চারটে দিন একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে কেটে গেল ধীরাপদর। প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি একটা বিস্ফোরণের মুখে এসে ঠেকেছে খেয়াল নেই, অমিতাভর ক্ষিপ্ততার দিকে চোখ নেই। সবই দেখছে সবই শুনছে, নিয়মিত কাজে যাচ্ছে, কাজ করছে—কিন্তু ভিতরের মানুষটার সঙ্গে কোন কিছুর যোগ নেই। সে সারাক্ষণ প্রতীক্ষারত আর সারাক্ষণ উতলা। টেলিফোন বেজে উঠলে চমকে ওঠে, খামে নিজের নামে চিঠি দেখলে খাম খুলতে গিয়ে আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে যায়। একটা ডাক শোনার আশঙ্কায় দু কান উৎকর্ণ সর্বদা। সুস্থ চিন্তার অবকাশে সোনাবউদির কথা হেঁয়ালির মত লেগেছে। ডেকে পাঠাবার আগে প্রকারান্তরে যেতে নিষেধ করেছে হয়ত। সেই ডাকের দুর্বহ প্রতীক্ষা, অথচ প্রতীক্ষার অবসান হোক একবারও চায় না। সোনাবউদির ডাক এলেই যেন এক চরম সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়াতে হবে তাকে, নিঃশব্দে পা বাড়াতে হবে। সে রাতের নিবিড় স্পর্শ আজও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, কিন্তু আশ্চর্য সেই স্পর্শের জ্বালা নেই যাতনা নেই তাপ নেই। সেই স্পর্শের অনুভূতিতে সর্বাঙ্গ সিরসিরিয়ে বুকের ভিতর থেকে একটা নিটোল ভরাট কান্নাই শুধু গলা বেয়ে উঠতে চায়। আর কিছু নয়।

ডাক এলে ধীরাপদ কি করবে? শিগ্‌গীরই ডাকবে বলল কেন সোনা-বউদি? উঠতে বসতে চলতে ফিরতে কথা ক'টা ভয়ের একটা সংকেতের মত কানে লেগে আছে কেন?

ডাক এলো।

সকালে সবে চায়ের পেয়ালা মুখে তুলেছে, হন্তদন্ত হয়ে রমণী পণ্ডিত এসে হাজির। কেউ তাঁকে নিয়ে আসেনি, নিজেই ঢুকে পড়েছেন। বড় হলঘরের এধারে আসার আগেই তাঁর কথা কানে এলো।—ধীরুবাবু শিগ্‌গীর চলুন,

গণুবাবুর বউটির বোধ হয় কিছু হয়ে গেল—

পেয়ালাটা হাত থেকে নামায় নি ধীরাপদ। কথাগুলো কানের ভিতর দিয়ে উপলব্ধির দোরে এসে পৌঁছনোর আগেই সমস্ত চেতনা সমস্ত বোধশক্তি নিষ্ক্রিয়, অসাড়। কাছে এসে রমণী পণ্ডিত আবার বললেন, শিগ্‌গীর চলুন। সকাল হলেই বার বার করে আপনাকে খবর দিতে বলে রেখেছিলেন, কিন্তু এরই মধ্যে কি হয়ে গেল আমরা কিছু বুঝতে পারছি না, উঠুন! বসে রইলেন কেন—?

আবারও একটা ঘা খেয়েই যেন চেতনা ফিরে আসছে। হাতের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখল। সামনে রমণী পণ্ডিত দাঁড়িয়ে। উনি বলছেন কিছু, তাকে উঠতে বলছেন, সোনাবউদির কিছু হয়েছে বলছেন।

উঠে দাঁড়াল। অকস্মাৎ সর্বাঙ্গের সব ক'টা স্নায়ু একসঙ্গে কেঁপে উঠল। সমস্বরে চিৎকার করে উঠতে চাইছে তারা, কি হয়েছে? কি হয়েছে সোনাবউদির? স্যাণ্ডেল জোড়া পায়ের কাছেই ছিল, ত্রস্তে জামাটা টেনে গায়ে পরে নিল। তারপর একটা উদ্‌ভ্রান্ত অনুভূতি দমন করে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। যেতে যেতে রমণী পণ্ডিত সংক্ষেপে সমাচার জানালেন, কাল রাতে গণুবাবুর বউ তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তিনি খুব অসুস্থ বোধ করছেন, সকাল হলেই নিজে গিয়ে যেন ধীরুবাবুকে একবার খবর দেন আর তাকে ডেকে আনেন। আর যদি সম্ভব হয় তা হলে ধীরুবাবু যেন তাঁদের অফিসের সেই মহিলা ডাক্তারটিকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসে। রমণী পণ্ডিত তক্ষুনি একজন ডাক্তারের খোঁজে যেতে চেয়েছিলেন, বউটির মুখ দেখে অসুখ কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু উনি তাঁকে ঘরে ডেকে এনে অসুস্থ বোধ করার কথা বলতে তাঁর কেমন ভয় ধরেছিল। বউটি নিষেধ করলেন, বললেন, সকালের আগে কিছু করার দরকার নেই, সকাল হলেই তিনি যেন সোজা ধীরুবাবুর কাছে চলে আসেন। কিন্তু সকালের মধ্যেই এমন কাণ্ড হবে কে জানত? সকালে এখানে আসার আগে একবার খোঁজ নিতে গিয়ে রমণী পণ্ডিত দেখেন গণুবাবুর মেয়েটা কাঁদছে আর চিৎকার করে মাকে ডাকাডাকি করছে— সঙ্গে ছেলে দুটোও। কিন্তু বউটির কোনো সাড়াশব্দ নেই, তিনি নিজেও ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া পাননি। একেবারে বেহুঁশ। মনে হয়েছে নিঃশ্বাসও পড়ছে না। সেখান থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়েছেন রমণী পণ্ডিত, সোজা এখানে চলে এসেছেন। গিয়ে কি দেখবেন জানেন না—

রমণী পণ্ডিতকে আর একটা ট্যাক্সি ধরে নিয়ে চলে যেতে বলে ধীরাপদ এই ট্যাক্সিতে উঠে বসল। ট্যাক্সি লাবণ্য সরকারের নার্সিং হোমের পথে ছুটল। ধীরাপদ মূর্তির মত বসে। বুকের ভিতরটা গুমরে গুমরে উঠতে চাইছে, সে উঠতে দিচ্ছে না।...সোনাবউদি এই ডাকাই তো ডাকবে, এই ডাকাই তো ডাকতে পারে সোনাবউদি! ধীরাপদর মত এমন নির্বোধ আর কে? এত বড় নির্বোধ আর কে আছে জগতে? কিন্তু সোনাবউদির কি সত্যিই কিছু হয়ে গেছে? কি হতে পারে ধীরাপদ ভেবে পাচ্ছে না। কেমন করে হতে পারে ধীরাপদ ভেবে পাচ্ছে না। ভাবতে গিয়ে দুর্বোধ্য জট পাকিয়ে যাচ্ছে একটা। হয়ত কিছুই হয়নি, হয়ত সোনাবউদি শুধু অসুস্থই হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার কথামত ধীরাপদ লাবণ্যকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে কেন? ধীরাপদর ভয় করছে কেন? অজ্ঞাত ত্রাসে বুকের ভিতরটা নিস্পন্দ কেন?

লাবণ্য অবাক। মুখের দিকে চেয়ে ঘাবড়েও গেছে একটু—কি হয়েছে?

এক্ষুনি আসুন একবার।

কিন্তু কি হয়েছে? কারো অসুখ নাকি?

হ্যাঁ, সোনাবউদির। সঙ্গে ট্যাক্সি আছে, তাড়াতাড়ি এলে ভালো হয়।

লাবণ্য তবু দাঁড়িয়ে আরো একটু নিরীক্ষণ করে দেখল তাকে, তারপর ভিতরে চলে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ব্যাগ হাতে ফিরে এলো আবার। নিচে নামল। ধীরাপদ আগে আগে, লাবণ্য পিছনে। ট্যাক্সিতে উঠল। ট্যাক্সি ছুটল।

লাবণ্য ফিরে তাকালো।—কি অসুখ?

জানি না। সকালে লোকের মুখে খবর পেয়েছি। ধীরাপদ রাস্তার দিকে ফিরে বসল।

সুলতান কুঠি। দাওয়ার সামনে ট্যাক্সি থামল।

ট্যাক্সি থেকে নেমেই দু পা কাঠ ধীরাপদর। সোনাবউদির ঘরের দিকে একনজর তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে দিল, বড় দেরিতে এসেছে সে, যা হবার হয়ে গেছে। ব্যাগ হাতে লাবণ্য তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল। কলের মূর্তির মত পায়ে পায়ে ধীরাপদও। দু চোখ টান করে দেখছে সে। সব দেখছে।

...মেঝেতে বিছানা পাতা। সোনাবউদি শয়ান। অঘোরে ঘুমুচ্ছে মনে হয়। পাশে উমা বসে ফ্রকের আঁচলটা মুখে গুঁজে দিয়ে কাঁদছে। ছেলে দুটোও মায়ের দুধারে পুতুলের মত বসে আছে আর ফ্যালফ্যাল করে এক-একজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। সোনাবউদির মাথার কাছে ঘোমটা টেনে বসে বোধ হয়

রমণী পণ্ডিতের স্ত্রী, ওধারে হাঁটুতে মুখ গুঁজে কুমু। পণ্ডিতের অন্ত ছেলেমেয়ে-গুলোও এধার-ওধার থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুকলাল দারোয়ান, ভিতরে রমণী পণ্ডিত।

শিয়রের পাশে বসে পড়ে লাবণ্য তাড়াতাড়ি সোনাবউদির হাত টেনে নিল। হাতটা মুষ্টিবদ্ধ। নাড়ি দেখল। তারপরেই ঘাড় ফিরিয়ে চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করল একটা। ক্ষিপ্রহাতে স্টেথোস্কোপের জট ছাড়িয়ে যন্ত্রটা বুকে লাগাল, বুকের ওপর নিজেও ঝুঁকে পড়ল প্রায়। স্তব্ধ মুহূর্ত গোটা কয়েক, কান থেকে স্টেথোস্কোপ ফেলে দিয়ে ব্যাগটা কাছে টেনে নিল।

সেটা খোলার আগে হাত থেমে গেল। ব্যাগ ছেড়ে আস্তে আস্তে সোনা-বউদির একটা চোখের পাতা টেনে দেখল। তারপর ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে ফিরে তাকালো। সকলকেই দেখে নিল একবার, ধীরাপদকেও।

আপনারা একবার বাইরে যান। রমণী পণ্ডিতের ঘোমটা টানা স্ত্রীও উঠে দাঁড়াতে তাঁকে শুধু বলল, আপনি থাকুন।

ধীরাপদ নিজের ঘরে এসেছে। তার কোলে মুখ গুঁজে উমা এতক্ষণে শব্দ করে কাঁদার অবকাশ পেয়েছে। ছেলে দুটো তেমনি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে মাথা গোঁজ করে রমণী পণ্ডিত দাঁড়িয়ে। দোরগোড়ায় পাংশুমুখে শুকলাল দারোয়ান।

খানিক বাদে লাবণ্য এলো। উমা চমকে মুখ তুলল, তারপর ছুটে চলে গেল। মায়ের কাছেই গেল। ছেলে দুটোও অনুসরণ করল। তারা না বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত লাবণ্য কিছু বলল না। শুকলাল এরই মধ্যে একটা মোড়া ঘরে রেখে আবার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লাবণ্য বসল। প্রথমে রমণী পণ্ডিতের দিকে তাকালো একবার, তারপর ধীরাপদর দিকে। জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রমহিলার স্বামী তো জেলে, না?

ধীরাপদ নির্বাক। বিচারের খবর কাগজে উঠলেও লাবণ্যর সেটা লক্ষ্য করা বা গণুদাকে চেনার কথা নয়। পরক্ষণে মনে হল, খবরটা ওই পাশের ঘর থেকেই সংগ্রহ করেছে, রমণী পণ্ডিতের স্ত্রীর কাছ থেকে। কিন্তু লাবণ্য বলছে না কেন কিছু? কি বলবে সে? প্রতিটি নীরব মুহূর্ত বুকের ওপর মুগুরের ঘা দিচ্ছে। ও-ঘরে উমার কান্না।

ব্যাগ খুলে লাবণ্য প্যাড বার করল। তারপর রমণী পণ্ডিতের দিকেই তাকালো আবার। বলল, বড় রকমের শক পেয়েছেন, কার্ডিও ভাস্কুলার ফেলিওর…হার্ট আর ব্লাডপ্রেসার একসঙ্গে কোলাপ্‌স্ করেছে।

ডেথ সার্টিফিকেট লিখল। প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে ধীরাপদর হাতে দিল। তারপর ব্যাগ বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। যাবে।

সব মিলিয়ে মিনিট কুড়িও নয়। ট্যাক্সিটা বাইরে অপেক্ষা করছে। লাবণ্য ট্যাক্সিতে উঠল। ধীরাপদ যন্ত্রচালিতের মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আপনি এখন এঁদের সঙ্গেই আছেন তো ?

ধীরাপদ মাথা নেড়েছে হয়ত।

বিকেলে নয়তো সন্ধ্যার পরে একবার আমার ওখানে আসবেন। কথা আছে।

ট্যাক্সি চোখের আড়াল হয়ে গেল। ধীরাপদ দাঁড়িয়ে আছে। উমার আর্তকান্না কানে আসছে। মাথার ওপর আগুনের গোলার মত সূর্য জ্বলছে, সামনে রমণী পণ্ডিত দাঁড়িয়ে।···হাতে এটা কী ! ও! ডেথ সার্টিফিকেট··· সোনাবউদি আর নেই ! কার্ডিও ভাস্‌কুলার ফেলিওর। হার্ট আর ব্লাডপ্রেসার একসঙ্গে কোলাপ্‌স্ করেছে। হার্ট আর ব্লাডপ্রেসার···

এতকাল নিজের চোখ দুটোর ওপর ধীরাপদর ভারী আস্থা ছিল। সকলে যা দেখে না সে তাই দেখে। কিন্তু চোখের ওপর দিয়ে কত কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে সে কি দেখতে পাচ্ছে ? দেখলে তো বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যাবার কথা। আজ তা হচ্ছে না।

উমা আর ছেলে দুটোকে তারস্বরে কেঁদে উঠতে দেখেছে। উমা যদিও বুঝেছে, ছেলে দুটো মোটেই বোঝেনি তাদের মাকে কাঁধে তুলে কোথায় নিয়ে গেল সকলে। তারা ভয় পেয়ে আর দিদির কান্না দেখে কেঁদে উঠেছে। ধীরাপদ চেয়ে চেয়ে দেখেছে, অনুভব করতে চেষ্টা করেছে। পারেনি।

চিতার আগুন জ্বলে উঠেছে। সোনাবউদির দেহ ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে। ধীরাপদ নিনিমেষে দেখছে। কিন্তু এই দেখাটাও অন্তস্তলে পৌঁছুচ্ছে না।

স্টেশন ওয়াগনে করে লাবণ্য এলো। লাবণ্য শ্মশানে আসতে পারে ভাবেনি। ধীরাপদ বিমূঢ় চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। মিনিট দুই দাঁড়িয়ে লাবণ্য চিতা জ্বলতে দেখল। তারপর ধীরাপদর সামনে এসে দাঁড়াল। তার পাশে রমণী পণ্ডিত বসে।

সাদাসিধে ভাবে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখন যাচ্ছেন না তো ? আমি এলাম একবার দেখতে···

চলে গেল। লাবণ্য কি দেখে গেল ? কার্ডিও ভাস্‌কুলার ফেলিওরে

চিতার আগুন ঠিক ঠিক জলছে কি না?…না জললে তার সমস্যা। কিন্তু ধীরাপদ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কেন? কার্ডিও ভাস্‌কুলার ফেলিওর না, বাড়িতে উমা আর ছেলে দুটোর কান্না না, সামনের ওই চিতার আগুনও না।

কিছুই দেখছে না, কারণ সারাক্ষণ নিজের মধ্যে ডুবে শুধু একটা জবাব হাতড়ে বেড়াচ্ছে সে। সেই খোঁজার তাড়নায় বাকি সব ক'টা অনুভূতি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। চোখের সুমুখ থেকে দুর্বোধ্যতার পরদাটা এখনো সরেনি।

বিকেল গেল। সন্ধ্যা গড়াল। রাত হল। সুলতান কুঠির রাত। রমণী পণ্ডিতকে দিয়ে খাবার আনিয়ে মেয়েটাকে আর ছেলে দুটোকে খাইয়েছে। তারপর ওদের জড়িয়ে ধরে শুয়েছে, ঘুম পাড়িয়েছে। আর আশ্চর্য, নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছে কখন।

একেবারে সকালে চোখ মেলেছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসেছে। প্রথমেই মনে হয়েছে সোনাবউদি আর নেই —এটা সত্যি কিনা? সত্যি। তার মেয়ে আর ছেলেরা জড়াজড়ি করে ঘুমুচ্ছে। তা হলে সোনাবউদি নেই। কেন নেই?…কার্ডিও ভাস্‌কুলার ফেলিওর, হার্ট আর ব্লাডপ্রেসার একসঙ্গে কোলাপ্‌স্‌ করেছে। সোনাবউদির মৃত্যুর ওপর ওগুলো কয়েকটা হিজিবিজি শব্দের বোঝা। কেন নেই সোনাবউদি? তাকে ডাকবে বলেছিল, ডেকেছে। কিন্তু সোনাবউদি নেই কেন?

ঘুমন্ত মেয়ে আর কচি ছেলে দুটোর দিকে চোখ গেল। আজ বুকের ভিতরে মোচড় পড়ছে, চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে। না, সোনাবউদিকে সে কোনদিন ক্ষমা করবে না. সোনাবউদি আছে কি নেই, ছিল কি ছিল না—সে চিন্তাও ভিতর থেকে নির্মূল করে দিতে চেষ্টা করবে। ওরাও যাতে মা ভোলে সেই চেষ্টা করবে। এই মাকে ওদের মনে রেখে কাজ নেই।

গতকাল সন্ধ্যায় লাবণ্য দেখা করতে বলেছিল। বলেছিল কথা আছে। ধীরাপদর মনেও ছিল না।…লাবণ্য শ্মশানে গিয়েছিল কেন? অনুমান করতে পারে, কিন্তু থাক্, ভেবে কাজ নেই! লাবণ্যর প্রতি কৃতজ্ঞ।

আজও সন্ধ্যার আগে সুলতান কুঠি থেকে বেরুবার অবকাশ পেল না ধীরাপদ। মা ভোলানোর চেষ্টাটা কম দুরূহ নয়। ওই নির্মম মাকেও ওরা সহজে ভুলতে চায় না। এদিকের অন্যান্য ব্যবস্থায় শুকলাল দারোয়ানকে বড় কাছে পেয়েছে। সে না থাকলে ধীরাপদ হিমসিম খেত। কুমুও ঘুরেফিরে কতবার এসেছে ঠিক নেই। রমণী পণ্ডিত এসেছেন, এমন কি ঘোমটা টেনে তাঁর স্ত্রীও। মানুষ অবিমিশ্র ভালো না হোক, অবিমিশ্র মন্দও যে নয় ধীরাপদ সেটুকুই অনুভব

করতে চেষ্টা করেছে।...এক সোনাবউদি ছাড়া ধীরাপদ সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

শুকলালকে ঘরে বসিয়ে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফেরার আশ্বাস দিয়ে ধীরাপদ লাবণ্যর নার্সিং হোমে এলো।

কিন্তু নার্সিং হোম আর নেই। বাইরের ঘরটা তেমনি আছে। ভিতরের ঘরে একটাও বেড নেই। ঘরটা যে রোগীর আবাস ছিল তাও বোঝা যায় না। একেবারে ফাঁকা। কোর্টের সমনের কথা মনে পড়ল। একটা নয়, দু-দুটো সমন। নিরাপত্তার প্রয়োজনে নার্সিং হোম রাতারাতি উঠে গেছে।

কড়া নাড়ল। সব ঘর খোলা যখন লাবণ্য ভিতরেই আছে। ছিল। তক্ষুনি বেরিয়ে এলো, বাইরের ঘরে বসলো দুজনে।

কাল এলেন না, ক্লান্ত ছিলেন?

ধীরাপদ চুপ করে রইল। ক্লান্তি এখনো। রাজ্যের ক্লান্তি।

লাবণ্য কুশনে গা এলিয়ে একটু একটু পা দোলাচ্ছে, আর তার দিকেই চে আছে।—এদিকের সব ভালো মত হয়ে গেল?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল।

চিকিৎসকসুলভ নিস্পৃহতা সত্ত্বেও লাবণ্যর কৌতূহল চাপা থাকল না। বলল, ভদ্রমহিলা আমি যাবার অনেকক্ষণ আগে মারা গেছেন মনে হল, আপনি আমাকে ডাকতে আসারও আগে।...এত দেরিতে খবর দিলেন কেন?

চকিতে খেয়াল হল কি বলতে চায়। ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায়, রোগিণী মারা গেছে জেনেই তাকে ডাকতে আসা হয়েছিল। সন্দেহ অস্বাভাবিক নয়, ধীরাপদ বলল, আমিও জানতুম না, খবর পেয়ে আগে সোজা আপনার কাছে এসেছি।

লাবণ্যর দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, কিন্তু প্রশ্নটা নরম গলাতেই করল।—আগে আমার কাছে কেন?

উনি আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

উনি কে?

সোনাবউদি।

বিস্মিত দৃষ্টিটা মুখের ওপর থেমে রইল একটু, কবে কার কাছে বলেছিলেন?

আগের দিন রাতে, পণ্ডিত মশায়ের কাছে।

আবারও সংশয়ের ছায়া পড়ল মুখে, আপনার সোনাবউদি তখন অসুস্থ ছিলেন?

পণ্ডিত মশাইকে বলেছিলেন, অসুস্থ বোধ করছেন, সকাল হলেই যেন আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

ও। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল চুপচাপ খানিক। তারপর স্বাভাবিক স্বরেই জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রমহিলার মৃত্যুটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয় আপনি বুঝেছেন বোধ হয়?

বুকের তলায় হৃৎপিণ্ডটা সংযত করতে বেগ পেতে হল। ধীরাপদ মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

কেমন করে বুঝেছে সেটা আর লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল না, মুখের দিকে চেয়ে শুধু অপেক্ষা করল একটু। তারপর অনেকটা নিজের মনেই বলে গেল, গুচ্ছের সিডেটিভ খেয়েছেন, অত সিডেটিভ পেলেন কোথায়, আশ্চর্য! শেষে আর জল দিয়ে গেলেননি, মুড়ির মত চিবিয়েছেন। হাঁ করিয়ে দেখলাম মুখের মধ্যে তখনো ছিল, দু-একটা বিছানায় কাঁধের নিচেও পড়েছিল।

ধীরাপদর চোখের সুমুখ থেকে দুর্বোধ্যতার পরদাটা এবারে সরছে আস্তে আস্তে। সোনাবউদির রাতে ঘুম হত না শুনেছিল, শুকলাল দারোয়ানকে দিয়ে প্রায়ই ঘুমের ওষুধ কেনাত শুনেছিল। শুধু শুকলাল কেন, গণুদাকে দিয়েও কেনাত হয়ত, তখনও গণুদা জেলের বাইরে। আর হয়ত নিজেও সংগ্রহ করত। নইলে এত পেল কি করে? কতদিন ধরে সোনাবউদি এই ঘুমের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে? কবেকার সংকল্প এটা? এমন স্বার্থপরের মত ঘুমোবার মতলব সোনাবউদি কতদিন ধরে করে আসছে?

শোনার পর ধীরাপদ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে একটু। সঙ্কল্পটা অনেকদিনের জানার পর তার যেন হাল্কা বোধ করার কারণ আছে কিছু।...পরে ভাববে। লাবণ্য এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলেনি। অন্য আলোচনার ইচ্ছে ছিল বোধ হয় তার। বড় সাহেব টেলিগ্রাম পেলেন কিনা সেই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছিল।

ধীরাপদ উঠে পড়ল। শরীরটা ভালো ঠেকছে না জানিয়ে আর অপেক্ষা করল না। এরপর কারবারের আসন্ন দুর্যোগের কথা উঠত, অমিতাভ ঘোষের মারাত্মক পাগলামির কথা উঠত, বিভূতি সরকারের সপ্তাহের খবরের কথাও উঠত কিনা বলা যায় না। সামনে গুরুতর সমস্যা, গুরুতর সংকট। কিন্তু আজ আর কোন কিছুতে মন দিতে পারছে না ধীরাপদ। কবে পারবে তারও ঠিক নেই।

সুলতান কুঠিতে ফেরার আগে মিত্তিরবাড়িতে এলো একবার। গতকাল থেকে সে নেই, সেখানে তারা হয়ত ভাবছে। খবরটা জানিয়ে যাওয়া দরকার। তা ছাড়া ও বাড়ির বাস এবারে তো উঠলই মনে হয়।

কেয়ার-টেক্ বাবু জানালো, মানুকেকে নিয়ে বউরাণী গেছে বাপের বাড়িতে। রাত হয়ে গেল, এখনো ফিরছে না দেখে সে চিন্তিত। তাকেই খবরটা দিল

ধীরাপদ, বউরাণী এলে তাকে জানাতে বলল, আপাতত তার এখানে থাকা সম্ভব নয়, পরে একদিন এসে বউরাণীর সঙ্গে দেখা করবে।

শয্যার ওপাশের টেবিলের ওপর তার নামের খাম একটা। বাংলায় নাম-ঠিকানা লেখা। কেয়ার-টেক্ বাবু জানালো আজ দুপুরেই এসেছে ওটা। খামটা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে কি যে হল ধীরাপদ জানে না। মুহূর্তের জন্ত ধমনীর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল বুঝি, বুকের স্পন্দন থেমে গেল। তারপরেই প্রবল নাড়াচাড়া পড়ল, আস্তে আস্তে ধীরাপদ বিছানায় বসল।

বাবু কিছুক্ষণ থাকবে ভেবে কেয়ার-টেক্ বাবু চলে গেল। ধীরাপদর চোখের সামনে খামের ওপরের অক্ষরগুলো নড়েচড়ে আবার স্থির হল। চেনা অক্ষর নয়, পরিচিত লেখাও নয়। কিন্তু ধীরাপদ নিঃসংশয়ে জানে এ চিঠি কোথা থেকে এসেছে, এই শেষ লেখা কে লিখেছে।

ধীরুবাবু,

আপনাকে ডাকব বলেছিলাম, ডাকলাম তো? এখন রাগ করুন আর যাই করুন, কথা ফেলার সাধ্য আপনার নেই। বলেছি না, আপনি আছেন না জানলে এত ভরসা আমি পেলাম কোথায়? সত্যি বলছি, কাল কি হবে ভেবে আমার এতটুকু দুঃখ নেই, আতঙ্ক নেই। শুধু আপনাদের বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করেই যা দুঃখ। নইলে এ পরিণতির জন্যে আমি কতদিন ধরে তিলে তিলে প্রস্তুত করেছি নিজেকে ঠিক নেই। সেই যেদিন চাকরি খুইয়ে তখনকার মত মনস্তাপী হয়ে আমাকে শুনিয়েছিল, আর তার বাঁচার ইচ্ছে নেই, একমাত্র আত্মহত্যা করলেই সব দিক রক্ষা হয়, জয়েণ্ট লাইফ ইন্সিওরেন্সের দশ হাজার টাকা আমাকে দিয়ে যেতে পারে—সেই দিন থেকেই।

বিশ্বাস করুন, তার মুখের দিকে চেয়ে সেইদিন সেই মুহূর্তে কেমন করে যেন আমি নিজের এই পরিণতিটা দেখেছিলাম। দেখে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে দেখাটা সয়ে গেছে। তারপর সহজ হয়েছে। শেষে এত সহজ হয়েছে যে এক-এক সময় এই মরণদশার মধ্যেও নিজের মনে হেসেছি আর আপনাদের রমণী পণ্ডিতের গণনার বাহাদুরি দিয়েছি। আজ তাঁর কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আপনি আমাকে বরাবর ছেলেমেয়ের প্রতি নিষ্ঠুর বলে এসেছেন। কিন্তু সত্যি সত্যি নিষ্ঠুর হতে পারলে তো বাঁচতুম। শুধু ওদের দিকে চেয়েই আমি আর কোনো পথ দেখলাম না। টাকাটা পেলে ওরা যদি বাঁচে ভেবে মৃত্যুটা খুব ত্রাসের মনে হয়নি আমার। এভাবে টাকা পেতে বিবেকে লেগেছে, প্রবঞ্চনা মনে

হয়েছে। কিন্তু হলেও তার দাম তো কম দিচ্ছি নে, আমি এই দেহটা বয়ে বেড়িয়ে কি করতে পারতুম ?

আমার বিচার ভগবান করবেন। আপনি শুধু গরীবের ছেলেমেয়ের মত মেয়েটা আর ছেলে তুটোকে একটু মানুষ করে দেবেন। দেবেনই জানি। জেলে তার সঙ্গে দেখা করে যা ব্যবস্থা করা দরকার করবেন। ব্যবস্থার ভার আমি আপনাকে দিয়ে গেলাম তাকে জানাবেন। আমার স্থির বিশ্বাস এতে কোনো বাধা হবে না। লোকটাকে আপনারা যত বড় অমানুষ দেখেছেন ঠিক ততটাই অমানুষ সে নয়। অন্তত ছিল না। লোভ তাকে বিষিয়েছে, এই দিনের অভিশাপ তাকে বিষিয়েছে। আমি তাকে রক্ষা করতে পারিনি। কিন্তু ভগবান রক্ষা করেছেন। সে বাইরে থাকলে আমার এই যাওয়াও যে ব্যর্থ হত সেটা এখন সে বুঝবে একটুও সন্দেহ নেই। আর তার ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই, আপনিও রাগ রাখবেন না। যতখানি আয়ু সে আমার ক্ষয় করেছে ভগবান আরো ততখানি সুস্থ পরমায়ু তাকে দিন।

এইবারে আপনাদের রমণী পণ্ডিতকে ডাকব, কাল ভোরে আপনাকে খবর দিতে বলব। সম্ভব হলে আপনাদের লাবণ্য সরকারকেও ডাকতে বলব। তার কথা কেন মনে হচ্ছে জানি না। ডাক্তার এনে আপনারা তো হৈ-চৈ করবেনই জানা কথা, এই দেহটা নিয়ে টানা-হেঁচড়াও হবে হয়তো। যদিই এড়ানো যায়।

কোনোরকম পাগলামো করবেন না, আমার নিষেধ থাকল। ছেলেমেয়ের জন্যে আর আমি একটুও ভাবি না। আপনাকে নিয়েই আমার ভয়। নিজের ওপর কোনো অনিয়ম অত্যাচার করতে গেলেই আপনার যেন মনে হয় সোনাবউদি দেখছে। আপনার কোনো ক্ষতি আমার সহ্য হবে না। ভগবানের কাছে শত কোটি প্রার্থনা লাবণ্য যেন আপনাকে চিনতে পারে।

—সোনাবউদি

মাথাটা ঘুরছে একটু একটু। ও কিছু নয়, আলোটা চোখে বেশি লাগছে। উঠে আলো নিবিয়ে আবার এসে বসল। শুতে পারলে আর একটু ভালো লাগবে। বিছানায় গা ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর থেকে নাড়ি-ছেঁড়া যাতনায় হাহাকার করে যে অবোধটা ডুকরে উঠতে চাইল, বালিশে প্রাণপণে নিজের মুখ চাপা দিয়ে তার মুখ চাপা দিতে চেষ্টা করল ধীরাপদ।

সোনাবউদি তুমি এ কি করলে!

তুমি এ কি করলে সোনাবউদি!

করতে চেষ্টা করেছে।...এক সোনাবউদি ছাড়া ধীরাপদ সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

শুকলালকে ঘরে বসিয়ে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফেরার আশ্বাস দিয়ে ধীরাপদ লাবণ্যর নার্সিং হোমে এলো।

কিন্তু নার্সিং হোম আর নেই। বাইরের ঘরটা তেমনি আছে। ভিতরের ঘরে একটাও বেড নেই। ঘরটা যে রোগীর আবাস ছিল তাও বোঝা যায় না। একেবারে ফাঁকা। কোর্টের সমনের কথা মনে পড়ল। একটা নয়, দু-দুটো সমন। নিরাপত্তার প্রয়োজনে নার্সিং হোম রাতারাতি উঠে গেছে।

কড়া নাড়ল। সব ঘর খোলা যখন লাবণ্য ভিতরেই আছে। ছিল। তক্ষুনি বেরিয়ে এলো, বাইরের ঘরে বসলো দুজনে।

কাল এলেন না, ক্লান্ত ছিলেন?

ধীরাপদ চুপ করে রইল। ক্লান্তি এখনো। রাজ্যের ক্লান্তি।

লাবণ্য কুশনে গা এলিয়ে একটু একটু পা দোলাচ্ছে, আর তার দিকেই চে আছে।—এদিকের সব ভালো মত হয়ে গেল?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল।

চিকিৎসকসুলভ নিস্পৃহতা সত্ত্বেও লাবণ্যর কৌতূহল চাপা থাকল না। বলল, ভদ্রমহিলা আমি যাবার অনেকক্ষণ আগে মারা গেছেন মনে হল, আপনি আমাকে ডাকতে আসারও আগে।...এত দেরিতে খবর দিলেন কেন?

চকিতে খেয়াল হল কি বলতে চায়। ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায়, রোগিণী মারা গেছে জেনেই তাকে ডাকতে আসা হয়েছিল। সন্দেহ অস্বাভাবিক নয়, ধীরাপদ বলল, আমিও জানতুম না, খবর পেয়ে আগে সোজা আপনার কাছে এসেছি।

লাবণ্যর দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, কিন্তু প্রশ্নটা নরম গলাতেই করল।—আগে আমার কাছে কেন?

উনি আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

উনি কে?

সোনাবউদি।

বিস্মিত দৃষ্টিটা মুখের ওপর থেমে রইল একটু, কবে কার কাছে বলেছিলেন?

আগের দিন রাতে, পণ্ডিত মশায়ের কাছে।

আবারও সংশয়ের ছায়া পড়ল মুখে, আপনার সোনাবউদি তখন অসুস্থ ছিলেন?

পণ্ডিত মশাইকে বলেছিলেন, অসুস্থ বোধ করছেন, সকাল হলেই যেন আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

ও। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল চুপচাপ খানিক। তারপর স্বাভাবিক সুরেই জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রমহিলার মৃত্যুটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয় আপনি বুঝেছেন বোধ হয়?

বুকের তলায় হৃৎপিণ্ডটা সংযত করতে বেগ পেতে হল। ধীরাপদ মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

কেমন করে বুঝেছে সেটা আর লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল না, মুখের দিকে চেয়ে শুধু অপেক্ষা করল একটু। তারপর অনেকটা নিজের মনেই বলে গেল, গুচ্ছের সিডেটিভ খেয়েছেন, অত সিডেটিভ পেলেন কোথায়, আশ্চর্য। শেষে আর জল দিয়ে গেলেননি, মুড়ির মত চিবিয়েছেন। হাঁ করিয়ে দেখলাম মুখের মধ্যে তখনো ছিল, দু-একটা বিছানায় কাঁধের নিচেও পড়েছিল।

ধীরাপদর চোখের সুমুখ থেকে দুর্বোধ্যতার পরদাটা এবারে সরছে আস্তে আস্তে। সোনাবউদির রাতে ঘুম হত না শুনেছিল, শুকলাল দারোয়ানকে দিয়ে প্রায়ই ঘুমের ওষুধ কেনাত শুনেছিল। শুধু শুকলাল কেন, গণুদাকে দিয়েও কেনাত হয়ত, তখনও গণুদা জেলের বাইরে। আর হয়ত নিজেও সংগ্রহ করত। নইলে এত পেল কি করে? কতদিন ধরে সোনাবউদি এই ঘুমের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে? কবেকার সংকল্প এটা? এমন স্বার্থপরের মত ঘুমোবার মতলব সোনাবউদি কতদিন ধরে করে আসছে?

শোনার পর ধীরাপদ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে একটু। সঙ্কল্পটা অনেকদিনের জানার পর তার যেন হালকা বোধ করার কারণ আছে কিছু।...পরে ভাববে। লাবণ্য এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলেনি। অন্য আলোচনার ইচ্ছে ছিল বোধ হয় তার। বড় সাহেব টেলিগ্রাম পেলেন কিনা সেই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছিল।

ধীরাপদ উঠে পড়ল। শরীরটা ভালো ঠেকছে না জানিয়ে আর অপেক্ষা করল না। এরপর কারবারের আসন্ন দুর্যোগের কথা উঠত, অমিতাভ ঘোষের মারাত্মক পাগলামির কথা উঠত, বিভূতি সরকারের সপ্তাহের খবরের কথাও উঠত কিনা বলা যায় না। সামনে গুরুতর সমস্যা, গুরুতর সংকট। কিন্তু আজ আর কোন কিছুতে মন দিতে পারছে না ধীরাপদ। কবে পারবে তারও ঠিক নেই।

সুলতান কুঠিতে ফেরার আগে মিত্তিরবাড়িতে এলো একবার। গতকাল থেকে সে নেই, সেখানে তারা হয়ত ভাবছে। খবরটা জানিয়ে যাওয়া দরকার। তা ছাড়া ও বাড়ির বাস এবারে তো উঠলই মনে হয়।

কেয়ার-টেক্ বাবু জানালো, মান্কেকে নিয়ে বউরাণী গেছে বাপের বাড়িতে। রাত হয়ে গেল, এখনো ফিরছে না দেখে সে চিন্তিত। তাকেই খবরটা দিল

ধীরাপদ, বউরাণী এলে তাকে জানাতে বলল, আপাতত তার এখানে থাকা সম্ভব নয়, পরে একদিন এসে বউরাণীর সঙ্গে দেখা করবে।

শয্যার ওপাশের টেবিলের ওপর তার নামের খাম একটা। বাংলায় নাম-ঠিকানা লেখা। কেয়ার-টেক্ বাবু জানালো আজ দুপুরেই এসেছে ওটা। খামটা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে কি যে হল ধীরাপদ জানে না। মুহূর্তের জন্য ধমনীর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল বুঝি, বুকের স্পন্দন থেমে গেল। তারপরেই প্রবল নাড়াচাড়া পড়ল, আস্তে আস্তে ধীরাপদ বিছানায় বসল।

বাবু কিছুক্ষণ থাকবে ভেবে কেয়ার-টেক্ বাবু চলে গেল। ধীরাপদর চোখের সামনে খামের ওপরের অক্ষরগুলো নড়েচড়ে আবার স্থির হল। চেনা অক্ষর নয়, পরিচিত লেখাও নয়। কিন্তু ধীরাপদ নিঃসংশয়ে জানে এ চিঠি কোথা থেকে এসেছে, এই শেষ লেখা কে লিখেছে।

ধীরুবাবু,

আপনাকে ডাকব বলেছিলাম, ডাকলাম তো? এখন রাগ করুন আর যাই করুন, কথা ফেলার সাধ্য আপনার নেই। বলেছি না, আপনি আছেন না জানলে এত ভরসা আমি পেলাম কোথায়? সত্যি বলছি, কাল কি হবে ভেবে আমার এতটুকু দুঃখ নেই, আতঙ্ক নেই। শুধু আপনাদের বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করেই যা দুঃখ। নইলে এ পরিণতির জন্যে আমি কতদিন ধরে তিলে তিলে প্রস্তুত করেছি নিজেকে ঠিক নেই। সেই যেদিন চাকরি খুইয়ে তখনকার মত মনস্তাপী হয়ে আমাকে শুনিয়েছিল, আর তার বাঁচার ইচ্ছে নেই, একমাত্র আত্মহত্যা করলেই সব দিক রক্ষা হয়, জয়েণ্ট লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের দশ হাজার টাকা আমাকে দিয়ে যেতে পারে—সেই দিন থেকেই।

বিশ্বাস করুন, তার মুখের দিকে চেয়ে সেইদিন সেই মুহূর্তে কেমন করে যেন আমি নিজের এই পরিণতিটা দেখেছিলাম। দেখে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে দেখাটা সয়ে গেছে। তারপর সহজ হয়েছে। শেষে এত সহজ হয়েছে যে এক-এক সময় এই মরণদশার মধ্যেও নিজের মনে হেসেছি আর আপনাদের রমণী পণ্ডিতের গণনার বাহাদুরি দিয়েছি। আজ তাঁর কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আপনি আমাকে বরাবর ছেলেমেয়ের প্রতি নিষ্ঠুর বলে এসেছেন। কিন্তু সত্যি সত্যি নিষ্ঠুর হতে পারলে তো বাঁচতুম। শুধু ওদের দিকে চেয়েই আমি আর কোনো পথ দেখলাম না। টাকাটা পেলে ওরা যদি বাঁচে ভেবে মৃত্যুটা খুব ত্রাসের মনে হয়নি আমার। এভাবে টাকা পেতে বিবেকে লেগেছে, প্রবঞ্চনা মনে

হয়েছে। কিন্তু হলেও তার দাম তো কম দিচ্ছি নে, আমি এই দেহটা বয়ে বেড়িয়ে কি করতে পারতুম ?

আমার বিচার ভগবান করবেন। আপনি শুধু গরীবের ছেলেমেয়ের মত মেয়েটা আর ছেলে দুটোকে একটু মানুষ করে দেবেন। দেবেনই জানি। জেলে তার সঙ্গে দেখা করে যা ব্যবস্থা করা দরকার করবেন। ব্যবস্থার ভার আমি আপনাকে দিয়ে গেলাম তাকে জানাবেন। আমার স্থির বিশ্বাস এতে কোনো বাধা হবে না। লোকটাকে আপনারা যত বড় অমানুষ দেখেছেন ঠিক ততটাই অমানুষ সে নয়। অন্তত ছিল না। লোভ তাকে বিষিয়েছে, এই দিনের অভিশাপ তাকে বিষিয়েছে। আমি তাকে রক্ষা করতে পারিনি। কিন্তু ভগবান রক্ষা করেছেন। সে বাইরে থাকলে আমার এই যাওয়াও যে ব্যর্থ হত সেটা এখন সে বুঝবে একটুও সন্দেহ নেই। আর তার ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই, আপনিও রাগ রাখবেন না। যতখানি আয়ু সে আমার ক্ষয় করেছে ভগবান আরো ততখানি সুস্থ পরমায়ু তাকে দিন।

এইবারে আপনাদের রমণী পণ্ডিতকে ডাকব, কাল ভোরে আপনাকে খবর দিতে বলব। সম্ভব হলে আপনাদের লাবণ্য সরকারকেও ডাকতে বলব। তার কথা কেন মনে হচ্ছে জানি না। ডাক্তার এনে আপনারা তো হৈ-চৈ করবেনই জানা কথা, এই দেহটা নিয়ে টানা-হেঁচড়াও হবে হয়তো। যদিই এড়ানো যায়।

কোনোরকম পাগলামো করবেন না, আমার নিষেধ থাকল। ছেলেমেয়ের জন্যে আর আমি একটুও ভাবি না। আপনাকে নিয়েই আমার ভয়। নিজের ওপর কোনো অনিয়ম অত্যাচার করতে গেলেই আপনার যেন মনে হয় সোনাবউদি দেখছে। আপনার কোনো ক্ষতি আমার সহ্য হবে না। ভগবানের কাছে শত কোটি প্রার্থনা লাবণ্য যেন আপনাকে চিনতে পারে।

—সোনাবউদি

মাথাটা ঘুরছে একটু একটু। ও কিছু নয়, আলোটা চোখে বেশি লাগছে। উঠে আলো নিবিয়ে আবার এসে বসল। শুতে পারলে আর একটু ভালো লাগবে। বিছানায় গা ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর থেকে নাড়ি-ছেঁড়া যাতনায় হাহাকার করে যে অবোধটা ডুকরে উঠতে চাইল, বালিশে প্রাণপণে নিজের মুখ চাপা দিয়ে তার মুখ চাপা দিতে চেষ্টা করল ধীরাপদ।

সোনাবউদি তুমি এ কি করলে।

তুমি এ কি করলে সোনাবউদি !

এ তুমি কি করলে সোনাবউদি—!

॥ ছাব্বিশ ॥

বিভূতি সরকারের সপ্তাহের খবরের অফিসের দরজায় কোম্পানীর স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে।

ধীরাপদ ঢুকবে কি ঢুকবে না ভেবে ইতস্তত করল একটু। লাবণ্য সরকার বোঝাপড়া করতে এসেছে তা হলে। সঙ্গে সিতাংশুও এসে থাকতে পারে। ধীরাপদ ঠিক কি উদ্দেশ্যে এসেছে নিজেও জানে না। তিনটে দিন আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটিয়ে কাজে মন দিতে চেষ্টা করেছে। প্রথমেই মনে হয়েছে বিভূতি সরকারের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তাঁর অফিসের লোকের কাছে টেলিফোনে খোঁজ নিয়ে জেনেছে তিনি ফিরেছেন।

তাড়াতাড়ি সুলতান কুঠিতে ফেরার তাড়া ছিল। গণুদার ছেলেমেয়েরা নয় শুধু, গত ছ দিন ধরে সেখানে আর একজন তার জন্য উন্মুখ প্রতীক্ষায় বসে থাকে। অমিতাভ ঘোষ। গত পরশু থেকে সে ধীরাপদর কাছে আছে। তার ঘরে থাকে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ধীরাপদ সোনাবউদির ঘরে থাকে। তিন দিন ধরে সেই চিঠিখানা তার পকেটেই ঘুরছে। এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না, ওটা কাছছাড়া করতে পারে না। ঘুমের ঘোরেও চিঠির কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। মনের এই অবস্থায় স্নায়ুবিধ্বস্ত অমিতাভ ঘোষকে সামলানো বিড়ম্বনা বিশেষ। এই ঝামেলা এড়াতেই চেয়েছিল। কিন্তু ক্ষোভে উত্তেজনায় অবিশ্বাসে আত্মতাড়নায় অসহায় শিশুর মত যে তাকেই শুধু আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছে, তাকে সে ফেরাবেই বা কেমন করে? উল্টে চিন্তিত হয়ে তাকে ডাক্তার দেখাতে হয়েছে, চিকিৎসা করাতে হচ্ছে। প্রয়োজনে ধমকও দিতে হয়। অমিতাভ ক্ষেপে ওঠে, কিন্তু আরো বেশি কাছে আসে।

তার ওখানে আছে সে এ খবরটা চারুদির বাড়ির বা অফিসের কেউ জানে না। তার কড়া নিষেধ, কেউ যেন না জানে।

সকলের অগোচরে বিভূতি সরকারের ওখান থেকে ফিরে যাবে ভেবেও পারল না। থাকলেই বা লাবণ্য অথবা সিতাংশু, ধীরাপদ তার কর্তব্যবোধে এসেছে। বরং ভালই হয়েছে। তারা মুখে না বলুক, মনে মনে বুঝবে সেও নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চেষ্ট বসে নেই। কদিন ধরে শুধু এই কারণেই হয়ত সিতাংশু বিমুখ তার ওপর।

কিন্তু সে নেই। বিভূতি সরকারের ঘরে লাবণ্য একাই বসে। ভিতরে ঢোকার আগে ধীরাপদকে আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। কাহার উদ্দেশে লাবণ্যর তীক্ষ্ণ অপমানকর কটূক্তি কানে এলো। কোন কিছুর জবাবেই সম্ভবত এক ঝলক তরল আগুনের ঝাপ্‌টা মেরে সে চুপ করল। বিভূতি সরকার মাথা নিচু করে কাগজ দেখছেন।

ধীরাপদকে এ সময়ে এখানে দেখবে লাবণ্য আদৌ আশা করেনি মনে হল। আর মনে হল, দেখে অখুশিও হয়নি। বরং এই আবির্ভাব সুবাঞ্ছিত যেন।

কাগজ ফেলে বিভূতি সরকার সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। হাসিখুশি দেখে একটুও বিভম্বিত মনে হল না তাঁকে। বরং এতক্ষণই যেন অসহায় বোধ করছিলেন, তাকে দেখে বল-ভরসা পেলেন।

—আসুন আসুন, কি ভাগ্য, বসুন। সকালে আপনি টেলিফোন করেছিলেন?

—হ্যাঁ। ধীরাপদ একটা চেয়ার টেনে বসল। খুব সহজ মুখেই কুশল প্রশ্ন করল, কেমন আছেন?

বিভূতি সরকারের খাঁজ-পড়া ফর্সা মুখ অমায়িক হাসিতে ভরে উঠল।—ভালো থাকি কি করে বলুন, কাগজ চালানোর কি যে দায় কেউ বোঝে না। ওই দেখুন না, লাবণ্যর উদ্দেশে ইশারা,—সেই থেকে রেগেই অস্থির, আমি কাগজ দেখব না—কে আপন কে পর সেই সেন্টিমেন্ট নিয়ে বসে থাকব? খবরের মত খবর পেলে কাগজওয়ালার আপন-পর জ্ঞান থাকে?

ধীরাপদ লক্ষ্য করল নির্বাক ক্রোধে লাবণ্যের মুখ আবারও লাল হয়ে উঠেছে। অগ্নিক্ষরণের পূর্বাভাস। ধীরাপদ মাথা নাড়ল। কথাটা মিথ্যে নয়।

বিভূতি সরকার বললেন, চাকরি যারা করছে তাদের সঙ্গে এ লেখার কি সম্পর্ক? এটা নিজেদের মান-অপমান ভাবছে কেন তারা? আপনাদের কোম্পানীর এ রকম একটা ব্যাপার—যে পেত সে-ই ছাপত। দু-চার দিনের মধ্যে অন্যান্য কাগজেও রিপোর্ট বেরুবে দেখবেন। সকলে শুধু প্রমাণের অপেক্ষায় আছে।

ধীরাপদ শান্তমুখে জানান দিল, যাতে না বেরোয় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিভূতি সরকার তার মুখের ওপর চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন একটা। বললেন, কিন্তু কাগজের স্বার্থ দেখলে না লিখে পারবে কি করে? ধরেছি যখন, আমার তো আরও অনেক লেখার আছে।

কোন্ স্বার্থ দেখে তুমি লিখেছ আর কোন্ স্বার্থের কথা ভেবে তোমার আরো

লেখার আছে—আমরা জানি না ভেবেছ, কেমন? রাগ সামলাতে না পেরে লাবণ্যর গলা চড়ল আরো,—কত টাকা পেয়ে তোমার এই স্বার্থের জ্ঞান টনটনিয়ে উঠেছে? তুমি আমাকে বললে না কেন, আমি তার ডবল টাকা দিতুম—

আশ্চর্য, এর পরেও বিভূতি সরকার হাসলেন। হেসে ধীরাপদর দিকে চেয়ে বললেন, শুনলেন কথা? তারপর লাবণ্যকে বললেন, খবরটা তোকে আগে জানিয়ে রাখার ইচ্ছে ছিল, বার দুই টেলিফোনও করেছিলাম—কিন্তু তোকে ধরতে হলে তো কাজ ফেলে টেলিফোন নিয়েই বসে থাকতে হয়। কাজের চাপে পরে আর মনেও ছিল না—

কথাটা সত্যি নয় ধীরাপদর বুঝতে দেরি হল না। হয়ত লাবণ্যরও না। আর জেরা না করে রাগে বিতৃষ্ণায় গুম হয়ে বসে রইল সে। বিভূতি সরকার আজ যে নিয়ে রেখেছেন, কাগজে তাঁর আরও লেখার আছে। ধীরাপদ জানে। একটু চুপ করে থেকে খুব নির্লিপ্ত সুরে বলল, যে ব্যাপারে মাথা দিয়েছেন মনে না থাকারই কথা।...কিন্তু আপনি এঁর দাদা বলেই বলছি, এ রকম একটা রিস্ক্ আপনি নিলেন কি করে? যেটুকু লিখেছেন, কোম্পানী তো চুপ করে বসে থাকবে না।

হাসিটুকু বজায় রেখেই বিভূতি সরকার ঈষৎ তপ্ত প্রশ্ন ছুঁড়লেন, কেন, কোর্টে দু-দুটো কেস উঠেছে সেটা মিথ্যে নাকি?

মিথ্যে নয়। কিন্তু কেস রিপোর্ট করার বাইরেও আপনি অনেক কথা লিখেছেন।...তিন হাজার টাকা আপনি হাতে পেয়েছেন, আরো লিখলে আরো দু হাজার পাবেন জানি। কিন্তু কোনো প্রমাণ হাতে না নিয়ে শুধু পাঁচ হাজার টাকার জন্যে এই ঝুঁকি কি করে নিলেন জানি না।

বিভূতি সরকার বিচলিত হয়েছেন বোঝা গেল। সঠিক টাকার অঙ্কটা এই-ভাবে আর একজনের মুখ থেকে শুনবেন আশা করেন নি হয়ত। ফলে যে কারণে অস্বস্তি সেটাই জোর দিয়ে তুচ্ছ করতে চাইলেন। বললেন, সেজন্যে ভাবি না, দরকার হলে প্রমাণও সবই হাতে আসবে।

ধীরাপদ মুচকি হাসল একটু। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভালো কথা। কিন্তু আসার আগে কোনো কাগজঅলা এ রকম ঝুঁকি নিতে পারেন জানা ছিল না। গোলযোগ যদি হয় পাঁচ হাজারের পাঁচ গুণ দিয়েও এর জের সামলানো যাবে না হয়ত। আচ্ছা, চলি—

বসুন, বসুন একটু চা খান, আর আলোচনাটা উঠলই যখন—

না আর বসব না, তাড়া আছে।

তা হলে আমিই যাব একদিন আপনার কাছে কবে যাব বলুন, আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধ তো কিছু নেই—

নেই-ই বা বলি কি করে, সম্ভব হলে আপনার এই কাগজ তুলে দেবার চেষ্টাও কোম্পানীর তরফ থেকে তো আমাকেই করতে হবে। ধীরাপদ নির্লিপ্ত, এরপর আপনি আর কতটা এগোবেন তাই বরং ভাবুন। আচ্ছা, নমস্কার।

বেরিয়ে এলো। এসে কাজ হয়েছে। বিভূতি সরকার আপাতত আর কিছু লিখবেন মনে হয় না। লোভের সঙ্গে ভয়ের একটা সহজাত যোগ আছে। এরপর তাঁর মন সুস্থির হতে সময় লাগবে। অমিতাভ জানতে পেলে ক্ষেপে যাবে। তবে জানার আশঙ্কা কম। অমিতাভর অজ্ঞাতবাসের খবর বিভূতি সরকারের পাবার কথা নয়। এক অমিতাভ নিজে যদি আসে। তাও আসবে না হয়ত, কাগজের মারফৎ যা সে করতে চেয়েছিল তা করা হয়ে গেছে। এখন তার মাথায় দিবারাত্র শুধু কোর্ট ঘুরছে।

লাবণ্যর গম্ভীর মুখেও চাপা বিস্ময় লক্ষ্য করেছে ধীরাপদ। দাদাটি হঠাৎ এ ভাবে ঘায়েল হবেন ভাবেনি বোধ হয়। অবশ্য ক্ষতি যা হবার হয়েই গেছে, তবু খুশি হয়েছে মনে হল।

দাঁড়ান—

ধীরাপদ দাঁড়াল। একেবারে অপ্রত্যাশিত আহ্বান নয়। লাবণ্য কাছে এসে বলল, গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে দেখেও চলে যাচ্ছেন কেন? উঠুন—

দুজনে স্টেশন ওয়াগনে উঠল। মুখোমুখি দুটো বেঞ্চিতে বসল। ড্রাইভারের উদ্দেশে লাবণ্য সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিল, বাড়ি—

ধীরাপদর দিকে ফিরল, আপনি এখন যাবেন কোথায়?

বাড়ি।

কোন্ বাড়ি?

সুলতান কুঠি।

সেখানেই আছেন এখন?

হ্যাঁ।

চেয়ে রইল একটু। ধীরাপদ ভাবল, তাকে সুস্থ দেখাচ্ছে না লাবণ্য এ কথাই বলবে এবার। কিন্তু তা বলল না। বলল, বাড়ি পরে যাবেন, আমার ওখানে চলুন, আপনার সঙ্গে দরকারী পরামর্শ আছে।

লাবণ্যর এই জোরের সুরটা অনেক দিন বাদে শুনল। জোরের কারণও আছে বইকি। সোনাবউদির ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে কম ঝুঁকি নেয়নি।

ডাক্তারের যা করার কথা নয় তাই করেছে। ধীরাপদর জন্তই করেছে। যখনই মনে পড়ে, ধীরাপদ অবাক হয়। অথচ সেই এক সন্ধ্যার পরে লাবণ্য এ নিয়ে আর এতটুকু কৌতূহল প্রকাশ করেনি, একটা কথাও জিজ্ঞাসা করেনি। ভুলেই গেছে যেন।

বুকের কাছটা জালা-জালা করে উঠল। বুকপকেটে সোনাবউদির চিঠিটা মাঝে মাঝে এমনি জালা ছড়ায়। মাঝের এই তিনটে দিনের যে কোনো দুর্বল মুহূর্তে ওটা হয়ত লাবণ্যকে দেখিয়েই ফেলত, যদি না চিঠিতে ওই শেষের কথা ক'টা লেখা থাকত।...ভগবানের কাছে সোনাবউদির শতকোটি প্রার্থনা, লাবণ্য যেন ওকে চিনতে পারে। উদ্গত অভিমানে ধীরাপদ রাস্তার দিকে মুখ ফেরাল, উনি নিজেই যেন কত চিনতে পেরেছেন! চিঠিটা কালই বাক্সে রেখে দেবে।

লাবণ্য সামনের দিকে ঝুঁকল একটু, ঈষৎ আগ্রহে বলল, দাদা তো বেশ ঘাবড়েছে মনে হল, যা বলে এলেন ভাঁওতা না সত্যি?

এ প্রসঙ্গ উঠবে জানে। কিন্তু ধীরাপদর ভালো লাগছে না। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, সত্যি।

কিন্তু দাদা যে বলল অনেকদিন ধরে খুঁটিনাটি অজস্র প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, এমন কি কাজকর্ম খাতাপত্র হিসেব-নিকেশের বহু ফোটো কপি পর্যন্ত আছে।

সে সব তাঁর কাছে নেই।

আপনাকে কে বললে?

অমিতবাবু।

একটু চুপ করে থেকে লাবণ্য আবার জিজ্ঞাসা করল, তাঁর সঙ্গে আপনার এর ভেতর দেখা হয়েছে?

ধীরাপদ জবাব দিল না, দৃষ্টি বাইরের দিকে।

এটুকুতেই লাবণ্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, বলল, আমার সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করতেও আপনার আপত্তি বোধ হয়?

ধীরাপদর দু চোখ আপনিই আবার তার দিকে ফিরল।—আপত্তি নয়, আজ ভালো লাগছে না।

লাবণ্যর এবারের নীরব পর্যবেক্ষণ অনুকূল নয়, ভালো আপনার কোনদিনও লাগে না। কিন্তু আপনার মনে কখন কি আছে খোলাখুলি বললে একটু বুঝে-সুঝে চলার চেষ্টা করা যেত। যখন-তখন অপমান হওয়ার ভয় থাকত না।

যখন-তখন অপমানের অনেক নজির মজুত আছে ধীরাপদ জানে। এই ক্ষোভ সদ্য কোনো কারণ-প্রসূত কিনা বুঝে উঠল না। চেয়ে রইল।

লাবণ্য শান্তমুখে বলে গেল, কাল পথে আপনার রমেন হালদারের সঙ্গে দেখা, পথ আগলে তাদের দোকানে একবার পায়ের ধুলো দেবার জন্তে দু হাত জুড়ে অনেক অনুনয়-বিনয় করল। তার আর কাঞ্চনের দোকান, আপনি দোকান করার টাকা দিয়েছেন—আপনার প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

রমেনের স্বভাব জানা আছে। তবু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, এতে অপমানের কি হল? কিন্তু চুপ করেই রইল, অযথা বিতর্ক করার মত মনের অবস্থা নয়।

লাবণ্য এখানেই শেষ করার জন্ত এ প্রসঙ্গ তোলেনি, সে চুপ করে থাকল না। একটু অপেক্ষা করে বলল, আপনাকে এ রকম উদারতার খেসারত দিতে হবে জানলে চুরির ব্যাপারটা তুচ্ছ করেও ওকে আদর করে রেখে দিতাম।

সোনাবউদিকে চিতায় তোলার সার্টিফিকেট দিয়ে লাবণ্য হয়ত অনেকটাই কিনে ফেলেছে তাকে। নইলে এর জবাবে ধীরাপদর বলার কথা, ভগ্নিপতি সর্বেশ্বরের কাছ থেকে টাকা না নিলে ছেলেটার চাকরি যাবার পরে অন্তত চুরির ব্যাপারটা তুচ্ছই ভাবতে পারত সে।

কিন্তু জবাব না পাওয়াটাও তাচ্ছিল্যের সামিল। নিরীহ মন্তব্যের সুরে লাবণ্য এবারে জিজ্ঞাসা করল, এতগুলো টাকা দিলেন, ওই মেয়েটাও আপনার চোখে বেশ ভালই বলতে হবে···তাই না?

নিরুপায় ধীরাপদ তার মুখ বন্ধ করার জন্তই জবাব এড়িয়ে বলল, আমি যাই করে থাকি কাউকে অপমান করার উদ্দেশ্য নিয়ে করিনি, আপনার সঙ্গে রমেনের কোনদিন রাস্তায় দেখা হতে পারে ভেবেও না। এ আলোচনা থাক্—

অকারণ ঝগড়ার মত শোনাবে বলে হোক, বা তার মুখে-চোখে শ্রান্তির ছাপ লক্ষ্য করে হোক, লাবণ্য আর কিছু বলল না। আরো কয়েক পলক দেখল শুধু, তারপর রাস্তার দিকে ঘুরে বসল।

গাড়ি থামতে নামল তারা। আগে লাবণ্য, পিছনে ধীরাপদ। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠল। লাবণ্য আগে আগে, ধীরাপদ পিছনে। দৃষ্টিটা এত কাছে প্রতিহত হচ্ছে বলে অস্বাচ্ছন্দ্য। সিঁড়ির প্রথম ধাপ থেকেই ধীরাপদর ভিতরে ভিতরে কে সজাগ হয়ে উঠতে চাইছে। সজাগ হলে একটা মৃত্যুর অবরোধও খানিকক্ষণের জন্ত মিলিয়ে যেতে পারে অনুভব করছে। কতকাল ধরে যেন এই চেনা বিস্মৃতির থেকে অনেক দূরে সরে আছে সে।

লাবণ্যের বসবার ঘরের দরজায় মস্ত একটা তালা ঝুলছে। বাড়িতে ঝি-চাকরও নেই বোঝা গেল। হাতব্যাগ থেকে চাবি বার করে লাবণ্য তালা খুলল। ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালল, তার পরের ঘরটারও।—আসুন।

যে ঘরটায় রোগী থাকত সেই ঘরের ভিতর দিয়ে লাবণ্যকে অনুসরণ করল। ঘরটা খাঁ খাঁ করছে, জানলাগুলোও বন্ধ।

পরের ঘরটাও অন্ধকার। ধীরাপদ চৌকাঠের এধারে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। শয্যা-সংলগ্ন দেয়ালের সুইচ টিপে লাবণ্য আলো জ্বেলে আবার ডাকল, আসুন—

ধীরাপদ পায়ে পায়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল। ঘরের মাঝামাঝি একটা ইজিচেয়ার, অদূরে একটা শৌখিন ছোট টেবিল আর একটা চেয়ার। টেবিলে টেলিফোন, খানকতক বই, আর বড় ব্যাগটা। ইজিচেয়ারটা একটু টেনে দিয়ে লাবণ্য বলল, বসুন—

ঘরের জানলাগুলো খুলে দিল। বাইরেটা অন্ধকার। একটা জানলা বরাবর ফুটপাথ-ঘেঁষা ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলছে। ঘরের জোরালো আলোয় ওটা বিচ্ছিন্ন মনে হয়।

ইজিচেয়ারে বসে ধীরাপদ ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। এত বড় ঘরে যেমন ভাবে যা থাকলে মানায়, তেমনি পরিপাটি ভাবে সাজানো গোছানো।

ইলেকট্রিক হিটার জ্বেলে লাবণ্য কেটলিতে চায়ের জল চড়ালো। তারপর এধারের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে তোয়ালে দিয়ে ভিজে হাত মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এলো। তোয়ালে রেখে ছোট টেবিলটার দিকে এগোলো। টেলিফোনের নম্বর ডায়েল করল। কথা শুনে বোঝা গেল কোথায় ফোন করেছে। মেডিক্যাল হোমে জানিয়ে দিচ্ছে, তার যেতে দেরি হবে।

রিসিভার রেখে চা করতে বসল। তাক থেকে আগে ঝকঝকে দুটো পেয়ালা নামিয়ে গরম জলে ধুয়ে নিল বেশ করে, তারপর চায়ের অন্যান্য সরঞ্জাম নামালো।

ধীরাপদর চোখ দুটো আবার অবাধ্য হয়ে উঠছে। একটা মৃত্যুর ছায়াও আড়ালে সরে যাচ্ছে। এই ঘরের বাতাস, ওই শয্যা, আসবাবপত্র, এই ইজিচেয়ারটা—সব কিছুর মধ্যে এক সবল মাধুর্যের স্পর্শ লেগে আছে। জীবনের তাপ ছড়িয়ে আছে। এমন কি ঘরের এই নীরবতাটুকুও স্পর্শবাহী। সচেতন হয়ে ধীরাপদ নিজেকে আবার সেই পুরুষকারহীন গোপনতার কবরের তলায় ঠেলে দিতে চেষ্টা করল। লাবণ্যর চা করা হয়ে এলো। এখনি ফিরবে। ফিরলে তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু তার আগে আরো কয়েকটা মুহূর্ত হাতে

আছে।···ওই দেহতটের প্রতিটি রেখা প্রতিটি তরঙ্গ বড় বেশি চেনা। হাতের মুহূর্ত ক'টা নিঃশেষেই খরচ করছে ধীরাপদ।

লাবণ্য উঠল। আগে ঘরের কোণ থেকে একটা ছোট টেবিল এনে সামনে রাখল। তারপর চা দিল, প্লেটে বিস্কুট। বলল, ঘরে আর কিছুর ব্যবস্থা নেই—। নিজের পেয়ালাটা নিয়ে বিছানায় বসল সে।

সামান্য কথা ক'টা অকূল বিস্মৃতির সমুদ্র থেকে বাস্তবে ফেরার আশ্রয়ের মত। তার দিকে চেয়ে ধীরাপদর মনে হল, এতক্ষণ মহিলা নিজের সমস্যা নিয়েই মগ্ন ছিল, আর কোনো দিকে খেয়াল ছিল না। চোখে-মুখে এখনো গভীর চিন্তার ছাপ। কাচের ওপর থেকে আব্‌ছা বাষ্পকণা মুছে দেবার মত করে দুটো দরদী হাতে ওই মুখের চিন্তার প্রলেপ মুছে দিতে পারলে ধীরাপদ দিত।

চায়ের পেয়ালা আর বিস্কুট তুলে নিয়ে বলল, সব ব্যবস্থারই তো ওলট-পালট দেখছি। খাওয়া-দাওয়া চলছে কোথায়?

বলার এই সুরটা একটুখানি ব্যতিক্রমের মত লাবণ্যর কানে লাগার কথা। লাগল কিনা বোঝা গেল না। চা খেতে খেতে দেখল একটু। তারপর ক্ষুদ্র জবাব দিল, বাইরে।

ধীরাপদ চা খাচ্ছে। বিস্কুট চিবুচ্ছে। আর সহজতার আবরণে মুখখানা ভরাট করে তুলছে। এই সান্নিধ্যে আর কিছুক্ষণ কাটাতে পারলে মাঝের ক'টা দিন সাময়িকভাবে অন্তত ভোলা যাবে।

লাবণ্য চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রাখল। দরকারী পরামর্শের সূচনায় মুখখানা আরো গম্ভীর। ছোট টেবিলটা হাত দুই-তিন সরিয়ে রেখে প্রস্তুত হয়ে বসল। বলল, আপনার মস্ত একটা শোকের ব্যাপার চলেছে বুঝতে পারছি, কিন্তু এদিকে যা শুরু হয়েছে আপনি না দেখলে চলে কি করে?

এদিকে যাই শুরু হোক, লাবণ্যর উক্তির শুরুটা ধীরাপদর পছন্দ হয়নি। শোকের ব্যাপারটা যে বড ব্যাপার নয় কিছু, প্রকারান্তরে তাই বলা। তবু রাগ করল না, একটু আগের ভালোলাগাটুকু ছেঁটে দিতে মন চায় না। জবাব দিল, আমার আর কি দেখার আছে বলুন, সিতাংশুবাবু তো উকিল-ব্যারিস্টারের পরামর্শ নিচ্ছেন···

মামলা-মোকদ্দমা শুরু হয়ে গেলে এই কোম্পানী থাকবে? আর কিছু না হোক সুনাম তো নষ্ট হবেই—

সুনাম গেলে কতটা গেল ধীরাপদ জানে, আশ্বাস দেবার নেই কিছু। বলল, কোম্পানীর মালিকরা এত বড় ভুলের রাস্তায় এগোলে আমি আপনি ভেবে আর

কি করতে পারি। বড় সাহেব আসুন—

মনঃপূত হল না, অসহিষ্ণু সুরে বলল, অমিতবাবুও খুব নির্ভুল রাস্তায় এগোচ্ছেন না।

আমি সব মালিকদের কথাই বলছি। তবে রিসার্চ ল্যাবরেটারি একটা হলে গণ্ডগোল এতটা পাকাতো না হয়ত।

জবাবে এবারেও বক্র ঝাঁজই প্রকাশ পেল।—রিসার্চ ল্যাবরেটারি তো সেদিনের কথা, গণ্ডগোল পাকানোর মালমশলা তিনি যে অনেক আগে থেকে সংগ্রহ করছেন সেটা বুঝতে কারো বাকি নেই।

অপ্রিয় বাদানুবাদ এখনো এড়াতেই চায় ধীরাপদ, তাই চুপ করে রইল। বললে এবারে অনেক কথাই বলা যেত। কিন্তু ক্ষোভ তাতে আরও বাড়বে বই কমবে না।

খানিক গুম হয়ে থেকে লাবণ্য বর্তমান সমস্যার আর একদিকে ফিরল।— ও কথা থাক, এদিকে দাদার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কেমন তা তো জানেন, কিন্তু সে যা করেছে বড় সাহেবের কাছে মুখ দেখানো দায় হবে। এরই বা কি করা যাবে?

ধীরাপদর এবার ভালো লাগছে। লাবণ্যর রাগ ক্ষোভ স্বার্থ ইচ্ছে অনিচ্ছে এমন কি তার বলিষ্ঠতার মধ্যেও একটা বস্তুতন্ত্রীয় স্পষ্টতা আছে যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর মিল। এই মিল থাকলে মনের দিক থেকে সম্ভ্রম বা বিদ্বেষের ব্যবধান ঘোচে।

সিতাংশুবাবুকে বলুন কড়া করে অ্যাটর্নির চিঠি দিক—

সিতাংশুবাবুকে বলব কেন, আপনি দিতে পারেন না?

ধীরাপদর হাসি পাচ্ছিল। গোপন করতে হল। তার ওপর এই নির্ভরতার দাবিও নতুন লাগছে।—পারি, কিন্তু তাতে তো বড় সাহেবের কাছে আপনার মুখ দেখানোর সমস্যা যাবে না, সিতাংশুবাবুর মারফৎ উকিলের চিঠি গেলে তিনি হয়ত তাঁর বাবাকে বোঝাতে পারবেন আপনার পরামর্শ মতই এ কাজ করা হয়েছে —আপনি দাদা বলে খাতির করেননি।

বিদ্রূপ করতে চায়নি, বরং যাকে ভালো লেগেছে, সহজ ঠাট্টার ছলে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপে মগ্ন হবার বাসনাই ছিল। কিন্তু লাবণ্যর বর্তমান মানসিক অবস্থায় রসিকতাটুকুর বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল। নিষ্পলক চেয়ে রইল কয়েক নিমেষ।

এই ব্যাপার ঘটেছে বলে আপনি তাহলে মনে মনে খুশি, কেমন?

বেগতিক দেখে ধীরাপদ এবারেও ঠাট্টার সুরেই জবাব দিল, খু-উ-ব।

আপনি সব সময় আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করেন কেন? আপনার আমি কখনো কোনো ক্ষতি করেছি?

বিস্মৃতির আবেশ গেল। বুকপকেটে সোনাবউদির চিঠিটা থরথর করে উঠল বুঝি। ক্ষতি না করার খোঁচায় লাবণ্য সরকার তার বুকের তলার ক্ষতটার ওপরেই আঘাত দিয়ে বসল। তার সাহায্যে সোনাবউদির দেহ বিনা বিড়ম্বনায় চিতায় তোলা গেছে, ভস্মীভূত করা গেছে—সেই ইঙ্গিত ভাবল। আবারও মনে হল, এই জোরেই কথাবার্তার এমন সুর পাল্টেছে, ধরন-ধারণ বদলেছে।

তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল, আস্তে আস্তে বলল, না, অনেক উপকার করেছেন।

লাবণ্য সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁজিয়ে উঠল, উপকার করার কথা আপনাকে বলা হয়নি! তারপর তপ্তশ্লেষে মন্তব্য করল, উপকার সর্বত্র আপনিই করে বেড়ান দেখছি, আমারও করেছেন বারকয়েক উপকার। সেই ভরসাতেই আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করার ইচ্ছে ছিল, আপনার তাতে আপত্তি থাকলে থাক্—

আপত্তি নেই, বলুন।

পরামর্শের মেজাজে চিড় খেলেও বাস্তব সমস্যাটা ছোট নয়। স্বল্পক্ষণের নীরবতায় সেই উপলব্ধিটাই বড় হয়ে উঠল হয়ত। বলল, দাদা আপনার কথায় তখন ভয় পেলেও চুপ করে বসে থাকার লোক নয়। এর পর অমিতবাবুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ছুটবে নিশ্চয়, আর অমিতবাবুও তো তাকে বিপদে ফেলার জন্য এ কাজ করাননি—

ধীরাপদ বলল, আপাতত তাঁর দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

লাবণ্য সঠিক বুঝে উঠল না, ঈষৎ বিস্মিত।—কেন, তিনি চারু দেবীর ওখানে নেই এখন?

অর্থাৎ চারুদির বাড়ি অথবা তাঁর সঙ্গে অমিত ঘোষের সম্পর্কটা বিভূতি সরকারের অজ্ঞাত নয়।—না, আমার ওখানে আছেন।

সুলতান কুঠিতে?

হ্যাঁ।

মুখে বিস্ময়ের রেখা পড়তে লাগল।—এ খবরটা আপনি বলেন নি তো?

বলার কি আছে?

শুধু বিস্ময় নয়, ধীরাপদর মনে হল খবরটা শোনার পর তার সততায় কতটা বিশ্বাস করা যেতে পারে সেই খটকাও লেগেছে। এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের

অস্তিত্ব ঘোচানোর প্রতিশোধে মেতে উঠেছে যে লোক সে সকলকে অবিশ্বাস করে তার ঘরে তারই সঙ্গে আছে, এটা খুব সহজভাবে নিতে পারার কথাও নয় হয়ত। তবু দৃষ্টিটা ধারালো হয়ে উঠল ধীরাপদর, ভিতরে ভিতরে একটা উষ্ণ স্রোত ওঠা-নামা করতে লাগল।

খানিক চুপ করে থেকে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল, তিনি সব সময়েই বাড়িতে থাকেন?

এখন থাকছেন। শরীর খুব অসুস্থ, বড় ডাক্তার দেখছেন।

ডাক্তারের নামও বলে দিল।

কি হয়েছে?

নতুন কিছু নয়, যা হয় তাই, এবারে আরো বেশি মাত্রায় হচ্ছে।

লাবণ্য তেতে উঠল। অসুখ নিয়েও বিশদ আলোচনার বাসনা নেই বুঝেছে হয়ত। অথচ সংযত স্বরেই বলল, হলে ডাক্তার তা কমাবে কি করে? আপনি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে ফেরাতে চেষ্টা করছেন, নাকি আপনিও ডাক্তারের ভরসাতে আছেন?

আপনার কি মনে হয়?

জবাব পেল না। কিন্তু লাবণ্যর এই মুখও যদি অন্তরের দর্পণ না হয়, তাহলে ধীরাপদর এতকালের এত দেখার গর্ব মিথ্যে। এই দর্পণে সংশয়ের ছায়া দুলছে। ধীরাপদ নিজের সঙ্গে যুঝছে এখনও। সে বিচলিত হবে না, স্নায়ুগুলো বশে রাখবে।

লাবণ্য কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিল কি।—তাঁর সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া দরকার।

বলব। তিনি আমার ওখানে আছেন সেটা কারো জানার কথা নয়...

বক্তব্য বুঝে নিতে সময় লাগল না। লাবণ্যর উষ্ণ দুই চোখ আবার তার মুখের ওপর স্থিরনিবদ্ধ হল।—তাহলে আর যাব না। আপনিই আমার হয়ে তাঁর কাছ থেকে দয়া করে জেনে নেবেন, আমি এখানকার কাজ ছেড়ে দিই—এই তিনি চান কি না। আমি জিজ্ঞাসা করেছি বলবেন। এ পর্যন্ত তাঁর অনেক অন্যায় আমি মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু এবারে তিনি মাত্রা ছাড়িয়েছেন। মামলায় নার্সিং হোমকে জড়িয়ে তিনি আমাকেও অপদস্থ করতে চাচ্ছেন। তাঁকে বলবেন, এ রকম ব্যবহার তিনি কেন করছেন আমি জানতে চেয়েছি।

এমনি এক সুযোগের প্রতীক্ষাতেই ছিল বুঝি। সেটা আসা মাত্র অন্তস্তলের সব বোঝাবুঝির অবসান। মুখ বুজে ধীরাপদও অনেক সহ্য করেছে এতক্ষণ।

যা জানতে চায় এবারে তা সে খুব স্পষ্ট করেই জানাবে। দেরি করলে অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে, তবু সুশোভন অবকাশ দরকার একটু। ততক্ষণে ধীরাপদর নিজের ভিতরটা আর একটু শান্ত হোক, মুখভাব আরো একটু সংযত হোক, নির্লিপ্ত হোক।

তাঁর ধারণা, আপনি দু নৌকোয় পা দিয়ে চলেছেন।...একদিন ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলেন। বোধ হয় সেই জন্যেই...

অমিত ঘোষের এই ধারণাটা লাবণ্য জানত না এমন হতে পারে না। কিন্তু আর একজনের মুখ থেকে সেটা শোনার প্রতিক্রিয়া যতটা দেখবে আশা করেছিল তার থেকে বেশি ছাড়া কম দেখল না। বসার ভঙ্গী বদলালো, মুখের রঙ বদল হল, আয়ত চোখে আগুন ছুটল। পদমর্যাদা আর আত্মবোধের খোলসটাও ভাঙল বুঝি।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কানের পরদা চিরে দিয়ে গেল।—আর উনি? উনি নিজে ক'নৌকোয় পা দিয়ে বেড়াচ্ছেন? তাঁর কাছে একটা ফোটো অ্যাল্‌বাম আছে সেটা একবার চেয়ে দেখে নেবেন, তারপর তাঁর ধারণার কথা শুনতে বসবেন।

অতটাই ক্রুদ্ধ না হলে, এই উক্তি করার আগে লাবণ্য ভাবত একটু। দেখতে যাকে বলছে সেই রমণীটি বর্তমানে সন্তান-সম্ভবা এ খবরটা ধীরাপদ জানাতে গিয়েও চেপে গেল। তার থেকেও সরস কিছু বলার আছে। তাকে দেখতে বলা হয়েছে বলেই যেন দ্বিধাগ্রস্ত জবাবটা বেরুলো মুখ দিয়ে—দেখেছি। আগে আপনার গোটাকয়েক ছবি আছে। পরেরগুলো পার্বতীর।

লাবণ্য স্তব্ধ খানিকক্ষণ। লোকটাকে যেন আবার একেবারে গোড়া থেকে দেখা শুরু করা দরকার। দেখতে গিয়ে তার মুখটা বেশ করে ঝলসে নিল আগে। অনুচ্চ কঠিন স্বরে বলল, ও...তাঁর ধারণার সঙ্গে আপনার ধারণার বেশ মিল হয়েছে তাহলে! থামল একটু, দেখছে। যত বিরোধ আর যত বিদ্বেষের মূলে যেন শুধু এই একজন, আর কেউ নয়। মুখের ওপর চরম একটা আঘাত হেনে বসল তারপর।—আমি যেমনই হই আর যত নৌকোয় পা দিয়ে চলি, আমার জন্যে কাউকে চাকরি খুইয়ে পাগল হয়ে জেলে যেতে হয়নি, আর আমার জন্যে কারো বউকে আত্মহত্যা করেও জ্বালা জুড়োতে হয়নি। বুঝলেন?

ধীরাপদর হঠাৎ এ কি হল? মগজের মধ্যে এ কার দাপাদাপি শুনছে সে? চেয়ার থেকে কে তাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিল? পায়ের নিচে মাটি দুলছে, সমস্ত ঘরটা দুলছে, দেয়ালের আলোটা একটা আগুনের গোলার মত জ্বলছে।

ধীরাপদ জানে না সে কি করছে, জানে না সে কি করবে। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। একেবারে মুখের কাছে। পায়ের সঙ্গে পা ঠেকেছে, হাত দুটো থাবার মত লাবণ্যর দুই কাঁধে চেপে বসেছে, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকেছে।

কি বললে?

এই প্রতিক্রিয়া আর এই স্পর্ধা দেখার জন্ত লাবণ্য প্রস্তুত ছিল না। সর্বাঙ্গের রক্তকণাগুলো ছুটোছুটি করে তার মুখের ওপর ভিড় করল, তারপর সেখানে স্থির হল।

ধীরাপদ আরো একটু ঝুঁকল, হাত দুটো কাঁধ ঘেঁষে বাহুর ওপর আরো জোরে চেপে বসল। তেমনি অস্ফুট কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করল, কি বললে তুমি?

এবারেও লাবণ্য জবাব দিল না। তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল না। নিজেও নড়ল না। তার আগে সে যেন শেষ দেখে নিচ্ছে। দুঃসাহসের দৌড় দেখে নিচ্ছে।

আমার জন্তে কাউকে জেলে যেতে হয়নি, আমার জন্তে কারো বউ আত্মহত্যা করেনি।···কিন্তু তোমার জন্তে তিলে তিলে নিজেকে হত্যা করেছি আমি। করছি। অধঃপতনের একেবারে তলায় এসে ঠেকেছি। দুঃসহ উত্তেজনায় আরো মৃদু আরো নির্মম কঠিন স্বরে ধীরাপদ বলে গেল, শুধু তোমার জন্যে, বুঝলে? একদিন আমি খেতে পেতাম না, কার্জন পার্কের বেঞ্চএ বসে হাওয়া খেয়ে দিন কাটত। কিন্তু সেই ক্ষুধার জালায়ও এভাবে মাথা খুঁড়িনি কখনো। তুমি আমার অনেক—অনেক ক্ষতি করেছ।

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। আরো রূঢ় আরো কঠিন কিছু। বলতে যাচ্ছিল, শুধু নিজের স্বার্থে তৃষ্ণায় জল দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায় যে, পুরুষের এই ক্ষতি সে বুঝবে কেমন করে?

বলা হল না।

তার হাতের মুঠোয় এক রমণীর দেহ। পুরুষের এই সান্নিধ্যেও তীক্ষ্ণ, অবিচলিত। দুই চোখের বিদ্বেষ আর বিদ্রূপের বন্তা ধীরাপদর ঝুঁকে পড়া মুখে এসে ভাঙছে। আঘাতে আঘাতে একটা ব্যঙ্গ-ভরা শূন্যতার গহ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ঘরের বাতাসও যেন এক অপরিসীম অবজ্ঞার ভারে থমকে আছে।

এক ঝলক তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শে ধীরাপদ আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। স্পর্শটা মুখের ভিতর দিয়ে হাড়ের ভিতর দিয়ে পাঁজরের ভিতর দিয়ে বুকের পাতালে এসে মিশল। শিরায় শিরায় বহুদিন যে শিখা জলে জলে উঠতে

চেয়েছে আজ আর কেউ সেটা নিবিয়ে দিল না। যে প্রাণের নেশা বহুবার দু চোখে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে আজ আর কোনো ভ্রূকুটিতে সেটা বাধা পেল না। ইতিহাসের আদিপর্বের যে পুরুষ ক্রুর থেবে বহুবার ব্যবধান ঘোচাতে চেয়েছে আজ আর কেউ তাকে শেকলে বেঁধে টেনে নিয়ে গেল না।

ধীরাপদ চকিতে দেয়ালের দিকে তাকালো একবার। কাঁধ থেকে একটা হাত নেমে এলো। দেয়ালের গায়ের সুইচে খট্ করে শব্দ হল একটা।

অন্ধকার। অশান্ত নির্দয় দুই বাহুবেষ্টনে বন্দিনীর সমর্পণঘন বিপুল বিভ্রম।

ধীরাপদ চোখ মেলে তাকালো। বাণীশূন্য মহা-নৈঃশব্দের গভীর থেকে প্রাণের প্রথম জাগরণের মত। বিস্মৃতির স্তরে স্তরে চেতনার বিদ্যুৎ। কতক্ষণ কেটেছে জানে না। যতক্ষণই হোক, খণ্ডকালের কোনো ছোট পিঞ্জরে সেটা ধরবার মত নয়। সময়ের বেড়া ছাড়িয়ে অস্তিত্বের মরুসমুদ্র পার হওয়ার এই যাত্রা কি সম্ভব? ধীরাপদ স্বপ্ন দেখে উঠল?

সামনের দিকে তাকালো। স্বপ্ন নয়।

আস্তে আস্তে শয্যা থেকে নেমে দাঁড়াল। নিবিড়তা ভঙ্গের অভিযোগে দেহের শিরাগুলো স্পন্দিত হল দু-একবার। ঘরের অন্ধকার এখন আর জোরালো লাগছে না। বাইরের ল্যাম্পপোস্টটা শীর্ণ দূত পাঠাতে চেষ্টা করছে। এতক্ষণ চোখে পড়েনি। ধীরাপদ আর একবার ঘুরে তাকালো। যার দিকে তাকালো সে শয্যায় মিশে আছে তখনো। মুখ দেখা যায় না। কিন্তু ধীরাপদ জানে, আব্ছা অন্ধকারের পরদা ঠেলে দু চোখ মেলে সে তাকেই লক্ষ্য করছে নিঃশব্দে।

বুকের কাছে সেই থেকে খরখর করছিল কি। এখন হাত ঠেকতে মনে পড়ল। সোনাবউদির চিঠিটা। নিস্পন্দ কয়েক মুহূর্ত। নিজের অগোচরেই খামটা হাতে উঠে এলো। দুমড়ে গেছে একটু। আঙুলে করে সেটা ঠিক করে নেওয়ার ফাঁকে আবারও শয্যার দিকে ফিরল একবার। তারপর খামটা ছোট টেবিলটার ওপর রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

রাস্তা। অন্ধকার দিকটা ছেড়ে কখন আলোর ধার ধরে চলতে শুরু করেছে সে। ধীরাপদ যেন নিজেরই নিভৃতের কোনো একটা দরজায় কান পেতে আছে। বিবেকের অস্ত্র হাতে কেউ বেরুবে ওই দরজা খুলে। তাকে বিধ্বস্ত করবে, খণ্ড খণ্ড করে হৃৎপিণ্ডটা কাটবে। কিন্তু সাড়াশব্দ নেই কারো। উল্টে মনে হচ্ছে কত কালের কত যুগের আত্মনিপীড়নকারী একটা জমাট বাঁধা অবরোধ যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে। হঠাৎ খেয়াল হল লঘু পায়ে দ্রুত হেঁটে চলেছে

সে। সুলতান কুঠি পর্যন্ত কি হেঁটেই পাড়ি দেবে নাকি? ঘড়ি দেখলো, রাত মন্দ হয়নি।

ট্যাক্সির প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে পড়ল।...

পরদিন।

নিয়মিত অফিসে এসেছে। নিয়মিত কাজ নিয়েও বসেছে। মনটা কাজে বসছে না খুব। অথচ তেমন অশান্তিও নেই কিছু।

সচকিত হল। ঘরে কারো পদার্পণ ঘটেছে। না তাকিয়েও এই নিঃশব্দ পদার্পণ সে অনুভব করতে পারে। লাবণ্য টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল চুপচাপ। ধীরাপদ ফাইল থেকে মুখ তুলল। কয়েক নিমেষে লাবণ্য গতকালের দেখাটাই যেন শেষ করে নিল। তারপর হাতের খামটা তার সামনে টেবিলের ওপর রেখে যেমন এসেছিল তেমনি ধীর মন্থর পায়ে ফিরে চলল।

সোনাবউদির চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

ধীরাপদর দু চোখ দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করল তাকে। রাগ নয়, তাপ নয়, দুরন্ত বাসনাও নয়—কি একটা যাতনার মত অনুভব করছে। এই যাতনার নাম কি ধীরাপদ জানে না।

সোনাবউদির বিশ্বাসে কোথাও ভুল হয়নি। ধীরাপদ জেলে গণুদার সঙ্গে দেখা করেছে। রমণী পণ্ডিতের চিঠিতে গণুদা স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ আগেই পেয়েছে। ধীরাপদ তাঁকে লিখতে বলেছিল। আজ একটা বিমুখতা দমন করেই সে এসেছিল দেখা করতে। এসেও মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। কিছু বলতেও পারেনি। সোনাবউদির লেখা চিঠিটা শুধু তার হাতে দিয়েছে।

চিঠিটা পড়তে পড়তে গণুদা ঘুরে বসেছে। পড়া শেষ করেও মুখ ফেরায় নি। না, ধীরাপদ আর রাগ করবে না। সোনাবউদিও সেই অনুরোধই করেছে। না করলেও চলত, শেষ পর্যন্ত রাগ থাকত না। মাঝের এই ওলট-পালটের অধ্যায়টা যেন সত্যি নয়। পরম নির্ভরশীলা বধুর ওপর অভিমানে অবুঝ স্বামী অনেক সময় যেমন মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে, তেমনি মুখ ফিরিয়ে বসেছিল গণুদা।

অনেকক্ষণ বাদে চিঠিটা ফেরত দিয়েছে, ফিরে তাকায়নি। বলেছে, তুমি ব্যবস্থা করো, সইটই যা দরকার আমি করে দেব।

চোখের কোণ দুটো থেকে থেকে আজ আবার সিরসির করে উঠছে কেন? ধীরাপদ তাড়াতাড়ি উঠে চলে এসেছে।

তাড়াও ছিল। এখান থেকে সোজা অফিসে যেতে পারবে না। আগে বাড়িতে অমিতাভর কয়েকটা ওষুধ পৌঁছে দিতে হবে। আজ সকালেও বড় ডাক্তার দেখে গেছেন। তার উত্তেজনা বাড়ছে, অস্থিরতা বাড়ছে, নিজেরই বক্ষ বিদীর্ণ করে যেন হাউইয়ের আগুন ছুটিয়েছে সে। সেই আগুনে জ্বলছে। ধীরাপদ দিনকে দিন উতলা হয়ে পড়ছে, ডাক্তার আনলেও লোকটা ক্ষেপে যায়। তার মেজাজের ওপর মেজাজ চড়ালে তবে একটু ঠাণ্ডা হয়।

অফিসে আসতে সেই দেরিই হল। কিন্তু অদূরে গাড়িবারান্দার নিচে বড় সাহেবের লাল গাড়ি। অপ্রত্যাশিত নন্ তিনি, যে কোনো দিন এসে পড়ারই কথা। তবু এরকম ধাক্কা কেন খেল ধীরাপদ নিজেও জানে না।

সিঁড়িতে সিতাংশুর সঙ্গে দেখা। ব্যস্তসমস্ত ভাবে নেমে আসছিল। দাঁড়াল।
—আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? বাবা সেই থেকে আপনাকে খুঁজছেন।

উনি কখন এলেন?

কাল রাতে। ঘরে আছেন, যান—আমি একবার অ্যাটর্নির অফিসে যাচ্ছি।

নেমে গেল। এই নামা দেখে মনে হল তার বল-ভরসা বেড়েছে। ধীরাপদর উর্ধ্বগতি আরো একটু শিথিল হল।

বড় সাহেবের ওপাশের চেয়ারে লাবণ্য বসে আছে। থাকবে জানাই ছিল। ধীরাপদকে দেখে আর একদিকে মুখ ফেরালো। হিমাংশু মিত্র দরজার কাছ থেকে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ানো পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে দেখলেন তাকে।

বোসো।

তাঁর মুখোমুখি বসে ধীরাপদ সহজভাবেই বলল, আপনি কাল এসেছেন খবর পাইনি—

পাইপ-ধরা মুখে স্বাভাবিক কৌতুকের রেশ।—পেলে কি করতে? একটু থেমে হাল্‌কা অনুযোগ করলেন, এই ক'মাসে তুমিই বা ক'টা খবর দিয়েছ?

ধীরাপদ নিরুত্তর বটে, কিন্তু তিনি এসে পড়ায় শুধু ছেলে নয় সে নিজেও এখন স্বস্তিবোধ করছে। এই একজনের উপস্থিতির প্রভাব অন্যরকম।

ঘরে ঢুকলেন জীবন সোম। শুকনো মুখ। তাঁকে ডাকা হয়েছে বোঝা গেল। বড় সাহেব তাঁকে বসতে বলে শান্ত গাম্ভীর্যে নির্দেশ দিলেন একটা। পারফিউমারি ব্রাঞ্চে অভিজ্ঞ কেমিস্ট দরকার, কাল থেকে তাঁকে সেখানকার কাজের ভার নিতে হবে। মাইনে এখানে যা পাচ্ছেন তাই পাবেন, আর ওই ব্রাঞ্চটা এই কোম্পানীর সঙ্গেই যুক্ত করা হচ্ছে যখন, এখানকার অন্যান্য সুবিধে-গুলোও পাবেন। ওখানকার কাজ সম্পর্কে মোটামুটি একটু আভাসও দিলেন তাঁকে।